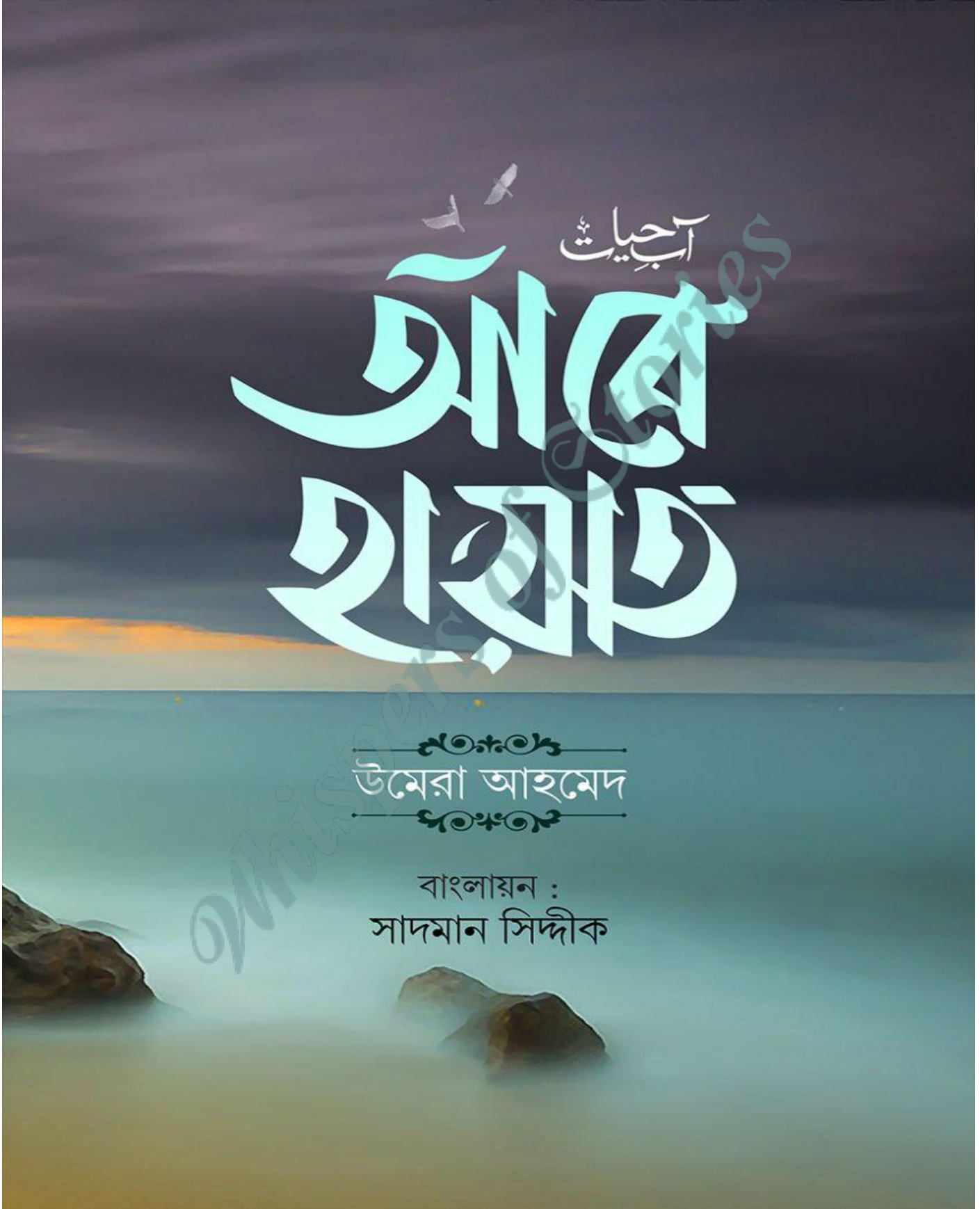




آجیائے

آر ہایڈ

— — — — —
উمیرا আহমেদ
— — — — —

বাংলায়ন :
সাদমান সিদ্দীক

To join our telegram group click here



Whispers of Stories

آب حیات
আবে হায়াত

উমেরা আহমেদ

বাংলায়ন : সাদমান সিদ্দীক

সূচিপত্র

> প্রথম অধ্যায়

আদম ও হাওয়া - ১৫

> দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইতুল আনকাবুত বা মাকড়সার ঘর - ১৩৯

> তৃতীয় অধ্যায়

হাসেল ও মাহসুল - ৩০৭

> চতুর্থ অধ্যায়

ইয়া মুজিবাস সাইলিন - ৪৪৯

> পঞ্চম অধ্যায়

আবাদান আবাদা - ৫৫৯

> ষষ্ঠ অধ্যায়

তাবারাকাল্লাজি - ৬৭৩

Whispers of Stories

প্রথম অধ্যায়

আদম ও হাওয়া

০১

সে দাঁড়িয়ে আছে এক খোলা মাঠে। তার পায়ের নিচে যেন সবুজ মখমল বিছানো। নরম। কোমল। কিংবা তার চেয়েও অধিক মোলায়েম মখমলি ঘাস। যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। হলদে কুঁড়ির মতো ভীষণ, বিষম সবুজ। আর তারপর হঠাৎ সে যেন সমুদ্রের তলদেশে দুর্লভ শ্যাওলার মতো দুর্লভ। পিঠে জলের ফোঁটা নিয়ে, সুবাসিত হাওয়ার তালে। আপন মনে নৃত্য করছে। সবুজ পাতার গায়ে পানির স্বচ্ছ ফোঁটা, টলমল করছে। খানিক বাদেই আবার গড়িয়ে পড়ছে। যেন পাতা থেকে মোতি ঝরছে। নেশায় মাতাল হয়ে এলিয়ে পড়ছে। তারপর আবার আরেক ফোঁটা পাতায় জমা হচ্ছে, ঢলছে, টলছে,



টালমাটাল করছে; আর জোয়ারের প্রথম ঢেউয়ের মতো
নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে, আদর করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এক
অদ্ভুত উচ্ছ্বাসে বিস্তৃত সবুজের একূল থেকে ওকূলে বয়ে
যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবী যেন নৃত্য করছে।

সবুজের গা জুড়ে ফুটে আছে ছোট ছোট ফুল। কত কত রঙের
সেইসব ফুল। এত এত রং আর রঙের সৌন্দর্যে দু-চোখ ভুগ্নিত
হয়ে পড়ছে। ঘাসের ডগায় দোদুল্যমান ফুলেরা ছড়িয়ে আছে,
সমস্ত সবুজ জুড়ে। বাতাসের দমকা দোলায় এক অদ্ভুত
শিহরনে নেচে চলছে তারা।

আকাশ খুব পরিষ্কার। চোখ জুড়ানো হালকা নীলে, নীল
গম্বুজের মতো ছড়িয়ে আছে অসীমো। সেই অসীমের বিস্তৃতি
অনেক, অগাধ। দু-চোখ যেরদিকে যায়, সেদিকেই কূল নেই।
চারদিকে সুবাসিত বাতাস। যেন নেশায় ঢুলছে, মৌমাছির মতো
গুনগুন করছে। যেন প্রতিটি জিনিসের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা
করছে। যেন খানিক হাসছে, খানিক ছুঁয়ে আবারও ফিরে

আসছে। একটু আদর করছে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আবার খানিক থেমেই পুনরায় বয়ে চলছে। তারপর আবার গুনগুনাচ্ছে, ছুটে চলছে। এখানে, ওখানে, সবখানে। এই আছে, এই নেই, এই তো, কোথায় উধাও হলো আবার সে কোনো এক পথে বসে আছে। কোথায় সে পথ? সে কারও অপেক্ষা করছে। কার সে অপেক্ষা? অতঃপর সে একটি দীর্ঘশ্বাস নিল। পথের দুধারে স্যার সারি গাছের একটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো গাছটিতে ভর করে; কিংবা গাছটির ভর কাঁধে করে।

সে এসে পড়েছে। যার অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে আছে সে। তাকে দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে। শুভ্র পোশাক পরিহিতা সে। অতি সূক্ষ্ম-সুন্দর সেই পোশাক। সেটি কি অ্যাটলাস, কিংখাব নাকি রেশমি কাপড়? নাকি অন্য কিছু! এতটা হালকা, এতটা কোমল সেই সাদা গাউনের মতো পোশাক; সামান্য বাতাসেই তা দুলে উঠছে। তার দুধ-সাদা পা, একটু একটু পর উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। সে খালি পায়ে। তার নরম-কোমল পা-জোড়া যেন মোলায়েম ঘাসের আঘাতও সহিতে পারছে না। পা

ফেলেই কয়েক মুহূর্তের জন্য নড়ে উঠছে। আবার যেন
বিভোর হয়ে হেসে উঠছে, নিজেকে সামলে নিচ্ছে। পুনরায়
তুমুল আগ্রহে আরেক কদম ফেলছে।

তার কাজল-কালো চুলগুলো বাতাসের ঝাপটায় কাঁধে এসে
পড়ছে। কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে ঢেউ খেলছে। তার গাল, মুখ
ছুঁয়ে লুকোচুরি করছে। তার মুখে পড়ে, বুকে জড়িয়ে, কাঁধে
এসে থিতু হচ্ছে। পুনরায় বাতাসে দোল খেয়ে কোমর ছুঁয়ে
দিচ্ছে। তার অদ্ভুত সুন্দর কালো, ঝলমলে, রেশমি ঘন
চুলগুলো যেন তার সাদা জামার সাথে একাকার হয়ে, তার
পুরো সত্তাকে নিয়ে নৃত্য করছে।

তার মর্মর-সদৃশ মসৃণ দেহ থেকে, সেই সাদা গাউনটি যেন
বারবার পিছলে পড়ছে। সামলাতে চেয়েও সামলাতে পারছে
না সে। বাতাসের ঝাপটায় তার অপরূপ গঠন ফুটে উঠছে। সেই
বাতাস যেন তার সমস্ত শরীরে চুমু খাচ্ছে। তার ছোঁয়ায় বিভোর
হয়ে, চেতনা হারিয়ে, পাগলের মতো তার চারপাশে ঘুরছে।

ঘূর্ণির মতো ঘুরে ঘুরে তাকে বেঁটন করে নিচ্ছে। বাতাসের আরেক ঝাপটায় তার ঘন কালো রেশমি চুলগুলোও নাচতে শুরু করেছে। সেগুলো তার কাঁধ ও কোমরে, আবেগতাড়িত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে। বাতাসে একটু দোলে দোলে পুনরায় তার মুখে, বুকে এসে আছড়ে পড়ছে। তার গায়ের ঘ্রাণে বিভোর হয়ে, পুনরায় সেগুলো যেন নিজেকে আড়াল করতে তার পিঠের প্রাচীরে লুকিয়ে পড়ছে। কিন্তু লুকিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না। পুনরায় মৃদু হাওয়া আলতো করে সেগুলোকে এনে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এই নৃত্য এখন সাদা গাউনের অংশগ্রহণের পালা। মেয়েটি এবার সামনে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার দিকে মেয়েটির কোনো মনোযোগ নেই। মেয়েটি কেবল চারপাশের প্রতিটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে-মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। অবাধ অবাক ও ভুগুিত হয়ে। বাচ্চামো বিস্ময় ও আগ্রহ নিয়ে। হঠাৎ মেয়েটির দৃষ্টি তার ওপর পড়তেই, মেয়েটি থেমে গেল। উভয়ের চোখাচোখি হলো। তারপর সে সহসাই হেসে উঠল। প্রথমে মুচকি হাসি, তারপর

খিলখিলিয়ে। মেয়েটি এখন তাকে চিনতে পেরেছে। কেননা, সেখানে কেবল সে-ই আছে। সে ছাড়া অন্য কারও কোনো অস্তিত্ব নেই সেখানে। যেন সে আগে থেকেই তাকে চেনে!

সে হাত বাড়াল। মেয়েটি তার হাত ধরে কাছাকাছি হলো। দুজন দুজনার চোখে চোখ রেখে এক অদ্ভুত শিহরনে শিহরিত হলো। তার গভীর-কালো চোখগুলো যেন হাসছে। মুক্তো কণার মতো চমকাচ্ছে। আর এই চমক তাকে দেখে যেন দ্বিগুণ হয়ে পড়েছে। তার সুন্দর গোলাপি ঠোঁটজোড়া ভিজে আছে। যেন একটু আগেই কিছু পান করেছে। খুতনিটা সবসময়ের মতোই উঁচু হয়ে আছে। মেয়েটির সুরাহির মতো সরু গলার দিকে চেয়ে চেয়ে সে তার অপর হাতটিও ধরে নিল। অপর হাতটি ধরতেই মেয়েটির চোখের চমক আর মুখের হাসি আরও গভীর হয়ে পড়ল। তারা যেন এই মুহূর্তটির সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত। পুনরায় তারা একসাথে হেসে উঠল।

: তুমি আমার অপেক্ষা করছিলে?



: হ্যাঁ।

: অনেক দেরি করে ফেললাম বুঝি?

: 'না, খুব বেশি নয়।' বলতে বলতে সে মেয়েটির হাত ধরে ওই পথে হাঁটতে লাগল। বাতাসেরা এখনো তাদের সঙ্গে, তাদের চারপাশের সবুজের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছে।

মেয়েটি এখনো বাচ্চাদের মতো বিস্ময়াভিভূত ও আগ্রহী হয়ে, চারপাশটা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। তার খিলখিল প্রাণখোলা হাসিতে, পরিবেশটা আরও সুন্দর হয়ে উঠছে। সহসাই বাতাসে এক অদ্ভুত সুন্দর সুর বেজে উঠল। সে চমকে গেল। পুনরায় খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাত থেকে হাত সরিয়ে মেয়েটি ওই পথ ধরে হাঁটতে লাগল। একটু সামনে গিয়েই সে দু-হাত ছড়িয়ে, আকাশের দিকে মুখ করে, নৃত্যের মতো করে ঘুরতে লাগল। ছেলেটি আনমনে হেসে ফেলল। মেয়েটি ওই

পথ ধরে অভিজ্ঞ ব্যালে নর্তকির মতো নাচতে নাচতে সামনে এগিয়ে গেল। তার গায়ের সাদা গাউনটি এখন তার সাথে সাথে ফুলের মতো পাপড়ি খুলে নাচতে লাগল। মেয়েটি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। বাতাসের সুবাসিত ঝাপটা তাকে যেন আলতো করে ধরে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে এখনো ওভাবেই হাসছে। নৃত্যের মতো করে বাহু ছড়িয়ে ঘুরছে। ছেলেটি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি এখন গুনগুন করে কিছু বলছে। অমনি বাতাসে যেন কোনো সুর বেজে উঠল। শুরুতে প্রথম, তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ- এভাবে পুরো মহাবিশ্ব যেন এক মহাকাব্যিক সুরে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। মেয়েটি এখনো বাতাসে নেচে চলছে। কোনো মোলায়েম মখমলি পর্দার মতো দুলে দুলে বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউ খেলছে। ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি নাচতে নাচতে আবারও খিলখিল করে হাসছে।

অতঃপর তার দিকে তাকিয়ে উপর থেকেই একটি হাত বাড়িয়ে দিল। যেন সে ছেলেটিকে তার কাছে, আকাশের উচ্চতায়



যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। মেয়েটি আবারও হেসে উঠল। যেন
সে হাত ধরে টান দিলে ছেলেটিও তার কাছে, শূন্যে উঠে
যাবে।

ঠিক তা-ই হলো। মেয়েটির হাত ধরতেই ছেলেটিও হাওয়ায়
ভাসতে লাগল। এখন দুজন দুজনার হাত ধরে বাতাসে নৃত্য
করছে-ভূমি থেকে দূরে, মেয়েটির কাছে; মেয়েটির পাশে
দাঁড়িয়ে। হঠাৎ সে থেমে গেল। তার সাথে যেন পুরো মহাবিশ্বও
থেমে গেল। ছেলেটি খানিক আকাশের দিকে তাকাল। সহসাই
পুরো আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। দিন, রাতের আঁধারে
পালটে গেল। কিন্তু সেই রাতটি দিনের চেয়েও সুন্দর হয়ে
উঠল। অন্ধকার আকাশ, ঝলমলে তারায় সেজে গেল। অসংখ্য
তারা। অগণিত রঙের সেতারা। তাদের মধ্যমণি হয়ে ফুটে
আছে চাঁদ। সেই চাঁদে কোনো কলঙ্ক নেই। দাগ নেই। আছে
শুধু আলো। আভা। নিদাগ আলোভরা চাঁদ।

দিনের আলো উজ্জ্বল, প্রশান্তিদায়ক, ঝলমলে, মোহাচ্ছন্নকারী।
আর রাতের আলোতে আছে অসংখ্য রং। মহাবিশ্বে এমন রং
তারা কবে দেখেছিল? কোথায় দেখেছিল? রাতের পৃথিবী যেন
অগণিত রঙে স্নান করছে। একটি তারা মিটিমিটি করছে।
পৃথিবীতে একটি বং ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর আরেকটি
মিটিমিটি করতেই আরেকটি রং ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর
আরেকটি তারা; আরেকটি রং। এভাবে অসংখ্য তারার অগণিত
রঙে ভরে উঠছে পৃথিবী। যেন আসমানে আলোর মিছিল। সে
মেয়েটির হাতে হাত ধরে, চরম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে।
তার বিস্ময়, তার উচ্ছ্বাস যেন তাকে প্রফুল্ল করে রেখেছে।
তাকে যেন সুখের সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

তারা এখন মাটিতে নেমে পড়েছে। রাতের আঁধার উধাও হয়ে
দিনের আলোতে বদলে গিয়েছে। সবুজ, ফুল, পাতা, সুবাসিত
হাওয়া; সবই আগের মতো আছে। তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে
মেয়েটি মাটির দিকে তাকাল। দেখল, সবুজ কোমল ঘাসে থরে
থরে ফুল। হাত বাড়তেই মুঠো ভরে গেল ফুলে। অতঃপর



আরেক মুঠো, আরেক মুঠো। অতঃপর বিস্তৃত সবুজ জুড়ে
ফুটন্ত সারি সারি সমস্ত ফুল যেন চুম্বকের মতো তার কাছে
আসতে লাগল। শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি
কোটি, অসংখ্য, অগণিত ফুল। এতবেশি যে, এখন আর সে দু-
হাতে ধরে রাখতে পারছে না। তাই ফুলগুলো এখন তার চুলে,
জামায়, শরীরে এসে ভর করেছে। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে
পড়ছে। বিভোর, মোহাচ্ছন্ন হচ্ছে। আর তারপর সে ফুলগুলো
হাতের ইশারায় বাতাসে ছড়িয়ে দিল। চোখের পলকেই
ফুলগুলো আকাশের দিকে উঠে গেল। সমস্ত আকাশ ফুলে
ফুলে ভরে উঠল। অতঃপর কয়েক মুহূর্ত সেই ফুলগুলো বৃষ্টি
হয়ে ঝরে পড়ল। ফুলের বৃষ্টিতে দুলে দুলে তারা হাসছে। বৃষ্টির
ফোঁটার মতো পাপড়ির ফোঁটা দু-হাত পেতে মুঠোয় পুরছে।
দৌড়াচ্ছে। একজন আরেকজনের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। তারপর
হঠাৎ ফুলবৃষ্টি বন্ধ হয়ে আগের মতোই ফুলগুলো সবুজ ঘাসে
ঘাসে গিয়ে ঝুলে পড়ল-যেখানে তারা একটু আগেই ফুটেছিল,
সেখানেই, সেই শাখায়।



তারা আবারও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তাতে এখন মেঘ দেখা যাচ্ছে। তুলোর স্তূপের মতো উড়ন্ত মেঘ। সব মেঘ এসে ওখানে ভিড় করছে। অতঃপর মেয়েটি একফোঁটা বৃষ্টি ঝরতে দেখল। হাত বাড়িয়ে সে তা মুঠোয় পুরে নিল। ফোঁটাটির দিকে তাকিয়ে সেটি পুনরায় আকাশের দিকে ছুড়ে দিল। ফোঁটাটি পুনরায় জমিনে ফিরে এলো। কিন্তু সে একা ফিরে এলো না। সে আরও অসংখ্য ফোঁটা নিয়ে ফিরে এলো। নরম ছোঁয়ায় সুড়সুড়িময় ফোঁটা নিয়ে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর তারা বাচ্চাদের মতো হাসতে হাসতে, দৌড়াতে দৌড়াতে, বৃষ্টির পানি একে অপরের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল। এটি বৃষ্টিই। এতে পড়ন্ত ফোঁটাগুলো পানিই। তবু এই বৃষ্টিতে, এই পানিতে তাদের চুল, শরীর কিছুই ভিজছে না। এ যেন স্বচ্ছ মোতির বৃষ্টি। এই মোতিগুলো তাদের হাত-পায়ের নাড়াচাড়ায় দূরে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। পড়তে পড়তে সবুজ ঘাস ও ফুলের উপর স্বচ্ছ মোতিগুলোর স্তর জমে গেছে। যেন মাটিতে কেউ কাচের টুকরো ছড়িয়ে রেখেছে। আর তারা সেই কাচের উপর হাঁটছে। জায়গাটিকে ভালোবেসে তারা সেখানে থামছে, ছুটছে, হাত

নাড়াচ্ছে। হাতের ইশারায় আকাশের মেঘগুলো এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা হলেই আবার নিজের কাছে ডেকে আনছে। তারা যেন আকাশের ক্যানভাসে পানি দিয়ে ইচ্ছামতো ছবি আঁকছে। এমন করতে করতে তারা এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা থেমে গেল। বৃষ্টিও উধাও হলো। মাটি থেকে পানির ফোঁটা গায়েব হতে লাগল। মেঘরাশি অদৃশ্য হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এমন, যেন ওখানে কখনো মেঘ বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই ছিল না। সে এখন মেয়েটির হাত ধরল। মেয়েটি চমকে তার দিকে তাকাল। ছেলেটি ফিসফিসিয়ে বলল-তোমাকে কিছু দেখাতে চাই।

: 'আরও কিছু?' মেয়েটির আনন্দ আরও বেড়ে গেল।

: হ্যাঁ, আরও কিছু।

: 'কী?' মেয়েটি আপনা-আপনিই প্রশ্ন করে ফেলল। জবাবে ছেলেটি মুচকি হাসল। মেয়েটি বাচ্চাদের মতো পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল, 'বলুন না কী?'

ছেলেটি আগের চেয়েও বেশি রহস্যময় মুচকি হাসল। সে এখন মেয়েটির হাত ধরে ওই নতুন রাস্তাটির দিকে পা বাড়াল। আর একটু এগোতেই দুজনেই দূর থেকে কিছু একটা দেখতে পেল।

আচমকা সালারের চোখ খুলে গেল। রুমে পরিপূর্ণ অন্ধকার ছেয়ে আছে। সাথে সাথে সে বুঝে উঠতে পারছে না, সে এখন কোথায়। তার কানে দূরের মসজিদ থেকে সাহরির ঘোষণা ভেসে এলো। রুমের গাঢ় অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ইমামা ও স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তার। সে কিছু একটা স্বপ্ন দেখছিল। এখন স্বপ্ন ভাঙতেই সে জেগে উঠেছে। স্বপ্নে সে ইমামাকে কিছু একটা দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু কী? সেটি তার কিছু মনে পড়ছে না। 'ইমামা' মুহূর্তের জন্য তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। ইমামা কোথায়? তাহলে কি এটা স্বপ্ন

ছিল? সে একেবারে চমকে উঠল। দম বন্ধ করেই পাগলের মতো বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালাল। নিমিষে রুমের অন্ধকার উধাও হয়ে যেতেই ত্বরিত ডান পাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল। তার বন্ধ নিশ্বাস স্বাভাবিক হলো। ইমামা তার পাশেই আছে। সেইসাথে সে নিজের ব্যাপারেও নিশ্চিত হলো যে, সে এখন জেগেই আছে, স্বপ্ন দেখছে না।

ল্যাম্পের আলো চোখে পড়তেই ইমামা ঘুমের ঘোরেই বাহু চেপে চোখ ঢেকে ফেলল। সালার পাশ ফিরে ল্যাম্পের আলো কমিয়ে দিল। ইমামাকে সে এখন জাগাতে চাচ্ছে না। ইমামা তার পাশেই শুয়ে আছে। কয়েক ফুট দূবে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে। তার এক হাতে এখন বালিশ জড়ানো, অপর হাত চোখের উপর চেপে আছে। তার আধো-খোলা হাতের তালু আর কবজিতে মেহেদির সুন্দর নকশা দেখা যাচ্ছে। নকশাগুলো এখন আঙুটে আঙুটে উঠে যাচ্ছে। তবু নকশাগুলো তার হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আছে। সালারের হঠাৎ মনে পড়ল, এই মেহেদি তো সে অন্য কারও জন্য লাগিয়েছিল। তার মুখে

আচমকা হাসি ফুটে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য সে দু-চোখ বন্ধ করে ফেলল। 'অন্য কারও জন্য?' গত সন্ধ্যাটি তার চোখের সামনে, সিনেমার দৃশ্যের মতো কয়েক সেকেন্ডেই ভেসে উঠল। নয় বছর পর সে এই চেহারাটি সায়েদা আন্নার উঠানে এই প্রথম দেখেছিল। মাঝখানে নয় বছর কোথাও যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সালার আরেকটু সামনে ঝুঁকল। ইমামার চোখ থেকে আলতো করে তার হাতটি সরিয়ে, ল্যাম্পের হলুদ আলোয় নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ইমামা গভীর নিশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত ইমামার ঘন-গভীর এই নিশ্বাস যেন তার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করছে। তাকে বাঁচিয়ে তুলছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে যেন কোনো এক মায়াজালে আটকে পড়ছে। আনমনে সে ইমামার দিকে তাকিয়েই আছে। দেখেই যাচ্ছে। এখন সে তার মুখে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো আলতো করে আঙুল ট্রেনে সরিয়ে দিচ্ছে। তার চেহারার ঝলমলে আকাশটিকে চুলের ঘনকালো মেঘ অবমুক্ত করছে।

অ্যালার্মের শব্দে ইমামার ঘুম ভাঙল। চোখ বুজেই সে টেবিল হাতড়ে অ্যালার্ম ঘড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা বন্ধ তো হলোই না, উলটো হাতের ধাক্কায় নিচে পড়ে গেল। এতে তার ঘুম একদম উধাও হয়ে গেল। অ্যালার্মের শব্দে এখন তার অস্বস্তি হতে লাগল। সে বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কম্বল সরিয়ে বেরিয়ে এল। আর অমনি কাঁপতে শুরু করল। এখন প্রচণ্ড শীত। তাই পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে পশমি শালখানা খুঁজতে লাগল। কিন্তু সেখানে পেল না। নিচে কার্পেটের দিকে উঁকি দিল। সেখানেও পেল না। তার হঠাৎ মনে পড়ল, রাতের বেলা শালটা সোফায় রেখে এসেছে। কিন্তু বেডরুম থেকে বের হয়ে, পাশের রুমে যাওয়ার সাহস হলো না। অ্যালার্ম এখনো বেজেই চলছে। কিন্তু কোথায় গিয়ে পড়েছে ঘড়িটা, এখনো দেখতে পাচ্ছে না তা। সে এখন আরও বিরক্ত হচ্ছে। হঠাৎ কী মনে পড়তেই সে সালারের বিছানার

দিকে তাকাল। সেটা একদম ফাঁকা। মুহূর্তেই তার মনে পড়ে গেল, এখন সে কোথায়। নিমিষেই বিরক্তি ও অ্যালার্মের শব্দ; দুটোই উধাও হয়ে গেল। এখন সাহরির সময়। আর সে এখন সালারের বাসায়। এটি তার জীবনের নতুন অধ্যায় এবং সেই অধ্যায়ের প্রথম দিন।

ইমামা পুনরায় তার বিছানায় বসে পড়ল। কম্বলের এক কোণ টেনে কাঁধে জড়াতে লাগল। তার কাঁপুনি এখন একটু কমতে শুরু করেছে। এবার সে মনোযোগ দিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল। সালার রাতে ওখানে ঘড়ি রেখেছিল। কিন্তু এখন সেটা ওখানে নেই। টেবিলে একটি ছোট প্যাড আর কলমও ছিল। পাশে একটি কার্ডলেস ফোন। তার পাশেই একটি পানির বোতল ও মোবাইল ছিল। তার আবারও অ্যালার্ম ঘড়ির কথা মনে পড়ল। তার স্পষ্ট মনে আছে, রাতে সে অ্যালার্ম সেট করেনি। এটা নিশ্চয় সালারের কাজ। হয়তো সে নিজের জন্যই অ্যালার্ম সেট করেছিল।



তারপর হঠাৎ তার মাথায় যেন এক বিস্ফোরণ হলো। রাতে সে যে পাশে শুয়েছিল, এটা তো সে পাশ নয়। নিশ্চয় রাতে ঘুমের ঘোরে সালারের পাশে চলে এসেছে। সালারও তাকে বাঁধা দেয়নি। কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল। অতঃপর অসম্ভব গা-ছাড়া ভাব নিয়ে সেলফোনে সময় দেখল। দেখতেই এক ঝটকায় কন্ডল ছুড়ে উঠে বসল। সাহরির আর দশ মিনিট বাকি। তাকে জাগানোর জন্যই হয়তো সালার এই অ্যালার্ম লাগিয়ে গিয়েছে। হঠাৎই তার রাগ হলো। সালার নিজেও তো তাকে জাগাতে পারত!

কাপড় পালটে লাউঞ্জে আসতে আসতে তার রাগ নেমে গেল। আজ অন্তত ইমামা খুশিমনে তার সামনে যেতে চায়। রেস্ট রুমের ডাইনিং টেবিলে সাহরি রাখা হয়েছে। ইমামা দ্রুত কিচেনে গেল প্লেট আনতে। কিন্তু সিল্কে দুজন মানুষের এঁটো প্লেট দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই খাবার নিশ্চিত ফোরকানের বাসা থেকেই এসেছে। আর সালার ফোরকানের সাথে বসেই খেয়ে নিয়েছে। সে শুধু শুধুই এটা ভেবে খুশি

হয়েছে যে, আজ সালারের বাসায় প্রথম সাহরি, সে হয়তো তার সাথেই থাকবে। কিন্তু সে আগেই খেয়ে নিয়েছে।

বিষণ্ন মনে ইমামা একটি প্লেট নিয়ে ডাইনিং টেবিলে চলে এলো। কিন্তু কয়েক লোকমার বেশি খেতে পারল না। সালারের অন্তত আজকের দিনটা তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। একসাথে বসে খাবার খাওয়া উচিত ছিল। এমন ব্যবহারে ইমামা সত্যিই কষ্ট পেয়েছে। তাই কয়েক লোকমা খেয়েই বিষণ্ন মনে সব এঁটো বাসন ওঠাতে থাকল। বাসন ধুতে ধুতে আজানের সময় হয়ে এলো। আজান শুনতে শুনতে তার হঠাৎ মনে পড়ল, সালারকে তো বাসার কোথায় দেখলাম না! তার মন খারাপি আরও বেড়ে গেল। বাসনগুলো সিন্কে ফেলেই সে বাইরে চলে এলো। সব রুম খুঁজে খুঁজে দেখল। কোথাও সালারকে পেল না। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তেই বাইরের দরজার কাছে গেল। দরজায় তালা দেওয়া। কিন্তু ডোর-চেইন সরানো। 'সে নিশ্চয় বাসায় নেই' ইমামা ভাবল। 'কিন্তু কোথায় গেছে?' এ নিয়ে ইমামা আর মাথা ঘামাল না।



ইমামার মন খারাপি আরও বেড়ে গেল। আজ বিয়ের পরদিন। আর আজকের দিনেই সালার তাকে একা বাসায় ফেলে কোথায় চলে গেল! বলেও গেল না। গত রাতে সালারের বলা সব কথা, এখন তার কাছে মিথ্যার গাটি মনে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে পুনরায় কিচেনে ফিরে এলো সে। ভীষণ বিষণ্ণ মনে সিন্ধের বাসনগুলোর দিকে এক ধ্যানে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। সে সালারের 'প্রিয়তমা' থেকে এখন 'স্ত্রী' হয়েছে। কিন্তু তা তো আর দুয়েক দিনেই হয়নি। আদর-আবদার রক্ষা না করুক, খোঁজখবর তো রাখবে অন্তত। কথাটা ভাবতেই তার মনঃকষ্ট আরও বেড়ে গেল। 'কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কীভাবে একজন মানুষ এমন পালটে যায়? অথচ রাতেই তো সে কত কত কথা বলল!' তার বিষণ্ণতা বেড়েই চলল। 'সে নিশ্চয় ওসব মিথ্যা বলেছে। আর নয়তো একটু হলেও তো খেয়াল রাখত আমার।' তার বিষণ্ণতা এখন যন্ত্রণায় রূপ নিচ্ছে।

ইমামা নামাজ পড়ে বসে আছে। অথচ সালারের এখনো কোনো হৃদিস নেই। তার একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। নামাজ পড়তে গেলে তো এতক্ষণে ফিরে আসার কথা! ভাবতে ভাবতে ইমামা মাথা ঝাঁকিয়ে, এই দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

০৩

সালার অনেকক্ষণ পর বাসায় ফিরল। ফিরে দেখল ইমামা গভীর ঘুমে নিমগ্ন। বেড রুমের লাইট অফ, হিটার অন। সে আর ফোরকান সবসময় ফজরের অনেক আগেই মসজিদে চলে যায়। ওখানে গিয়ে বসে বসে তিলাওয়াত করে। তারপর ফজর পড়ে ওই ভবনেই জিমে চলে যায়। সেখানে ঘন্টাখানেক আউটিং করে বাসায় ফিরে। কিন্তু আজ 'আমনা'র 'ইমামা' হয়ে যাওয়ার গল্প বলতে বলতে ফিরতে অনেক দেরি হলো। সাহরিতে ফোরকান তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল। খাবার দিতে এসে ফোরকান হতভম্ব হয়ে গেল। গত রাতে সালারের

ওসব কথা সে তার মানসিক চাপের ফলে আবোল-তাবোল কিছু মনে করেছিল। কিন্তু না, সালার তো এখন মানসিকভাবে ঠিক আছে। রীতিমতো খেয়ে চলছে। তার এমন স্বাভাবিক আচরণ দেখে ফোরকানের অস্বাভাবিক ঈর্ষা হলো। ঈর্ষা করা ছাড়া আর কীই-বা করার ছিল তার!

ফোরকানকে চুপচাপ তার দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সালার জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' ফোরকান প্রত্যুত্তরে বলল, 'আজ একটা নজরটিকা লাগিয়ে নিয়ো।'

: 'আচ্ছা...!' সালার হেসে ফেলল।

: 'আমি দুষ্টুমি করছি না।' ফোরকান গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল। সালারের গল্পটি বোঝার চেয়ে হজম করতেই বেশি কষ্ট হচ্ছে তার। এত বছর পর আবারও সে ইমামাকেই ফিরে পেয়েছে! বিষয়টি সত্যিই এত সহজে হজম করার মতো নয়। যে-কেউ এটি সহজেই মেনে নিতে পারবে না; একমাত্র সালার

ব্যতীত। যে সালার এখন অতি নিশ্চিন্তে কাঁটা চামচের ডগায় করে অমলেটের শেষ টুকরোটি মুখে পুরে দিচ্ছে!

: 'যদি সাদকা-টাদগা করতে পারো, তাহলে আরও ভালো।' ফোরকান তার প্রতিক্রিয়ার দিকে না তাকিয়ে পুনরায় বলল। কিন্তু সালার এখনো চুপ। ফোরকানের হঠাৎ আমনার কথা মনে পড়তেই বলল, 'আচ্ছা, আমনা সাহরি করবে না?'

: 'সে এখনো ঘুমাচ্ছে। আমি অ্যালার্ম সেট করে দিয়ে এসেছি। তাছাড়া সাহরির এখনো অনেক সময় বাকি।' সালার একটু উদাসীনভাবেই বলল। ফোরকান তার এমন উদাসীন জবাবে হতভম্ব হয়ে চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সালার এবার একটু রেগে গেল, 'এবার থামো ফোরকান! এভাবে চোখ বড় বড় করে দেখা বন্ধ করো।'

: তুমি খুব নেককার মানুষ সালার! আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট।



অমলেটের আরেকটি টুকরো খেতে খেতে সালার থমকে গেল। তার ক্ষুধা যেন হুট করেই উবে গেল। আর একটি কথাও বলল না। চুপচাপ প্লেট নিয়ে কিচেনে চলে গেল। ফোরকান একটু আগেই তার চেহারায় আনন্দ, শিহরন, প্রাপ্তি ও প্রশান্তির যে ঝলক দেখেছিল, তা যেন মুহূর্তেই ধোঁয়া হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিষয়টি ফোরকানের কাছে অদ্ভুত লাগল। তাই সে মসজিদে যেতে যেতে সালারকে প্রশ্ন করল, 'হুট করে এমন চুপ হয়ে গেলে যে! আমার কোনো কথায় কষ্ট পেয়েছ?'

সালার চুপ রইল। কোনো উত্তর করল না। অবশেষে জগার্স খুলে মসজিদে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আমাকে তুমি যা ইচ্ছা বলো, সমস্যা নেই। কিন্তু নেককার মানুষ বলো না।'

জবাবে ফোরকান কিছুই বলতে পারল না। সালার ততক্ষণে মসজিদে ঢুকে পড়েছে।

এগারোটার দিকে কলের শব্দে ইমামার ঘুম ভেঙে গেল। ডাক্তার সিবতে আলি কল করেছেন। উনার গলা শুনতেই তার মন ভারী হয়ে এলো।

: 'আমি কি আপনার ঘুমে ডিস্টার্ব করলাম?' তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা-সুলভ ভঙ্গিতে বললেন।

: 'না, আমি উঠে পড়েছিলাম আগেই।' সে বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে মিথ্যা বলল। তিনি তার খোঁজখবর নিতে লাগলেন। ইমামা বিষণ্ণ মনে হুঁ-হ্যাঁ করে করে জবাব দিতে লাগল। আরও কয়েক মিনিট কথা বলে তিনি কল রেখে দিলেন।

তিনি কল কাটতেই ইমামার চোখ পড়ল তার ফোনের দিকে। ফোনের স্ক্রিনে সালারের নামটি ঝলমল করছে। সালার তাকে মেসেজ করেছে। ইমামার মনে পড়ছে না, কবে সে সালারের

নম্বর সেভ করেছিল। এটাও নিশ্চয় সালারেরই কাজ। ইমামা মেসেজগুলো পড়তে শুরু করল।

'প্লিজ, ঘুম থেকে উঠে আমাকে মেসেজ দিয়ো। জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।' মেসেজটা পড়ে অজান্তেই ইমামার খুব রাগ হলো। 'এত জলদিই আমার কথা মনে পড়ে গেল?' মেসেজের সময়ের দিকে চোখ ফেলে ইমামা বিড়বিড় করল। সেটি সম্ভবত ১০:৫০ এ।

'অফিসে যাওয়ার সময় আমার কথা মনে পড়ল না; এখন অফিসে গিয়ে কীভাবে মনে পড়ল!' ইমামার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগল। হয়তো তা ঠিকই হচ্ছে। গত রাতে সে প্রধান মেহমান ছিল। আর আজ ভোরে তার সাথে অপরিচিত মানুষের মতো ব্যবহার করছে। ইমামার মনে সালারের ব্যাপারে আপাতত এমন ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছে। সালারের প্রতি অভিমান করে, তার ব্যাপারে এমন এমন কথা ভাবছে, যা সালারের জল্পনা-কল্পনাতেও নেই।

ইমামা কেমন অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ছে। বিছানা গুছিয়ে সে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো। বাসার নীরবতায় তার বিষণ্ণতা আরও বেড়ে গেল। জানালা গলে সূর্যের আলো রুমে এসে পড়ছে। রান্নাঘরে থালা-বাসন এখনো ওভাবেই পড়ে আছে। বিষণ্ণ মনেই সে গোসল করতে গেল। বাথরুমে যাওয়ার আগে ফোন চেক করল। সেখানে কোনো মেসেজ কিংবা মিসড কল; কোনোটাই দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ ফোন হাতে বসে রইল সে। তারপর সমস্ত রাগ-অভিমান একপাশে রেখে তাকে মেসেজ করল। ইমামা ভেবেছে, সালার মেসেজ পেয়ে সাথে সাথেই কল করবে। কিন্তু তার এই ভাবনা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট; কোনো রিপ্লাই নেই। ইমামা তার আমিত্বকে আবারও ধুলোয় মিশিয়ে পুনরায় তাকে মেসেজ দিল। 'মাঝে মাঝে মেসেজ তো যায় না, যেতে দেরি হয়।

নেটওয়ার্কও সমস্যা করে।' ইমামা নিজেকে এসব মিথ্যা সাক্ষ্যনা দিয়ে সায়েদা আম্মাকে কল করল।

: 'আরে বেটা! আমি তো সেই কখন থেকে তোমার ফোনের অপেক্ষায় বসে আছি। এখন সায়েদা আম্মার কথা মনে পড়ল!' সায়েদা আম্মা ইমামার গলা শুনতেই অভিযোগ করলেন। জবাবে ইমামা এই-সেই অজুহাত শোনাতে লাগল। সায়েদা আম্মা সেসবে মনোযোগ না দিয়ে পরবর্তী প্রশ্ন করলেন, 'সালারকে নিয়ে সন্তুষ্ট আছ তো?'

তিনি মনে হয় ভুল সময়ে, ভুল মানুষকে, ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছেন। সালারের নাম শুনতেই তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠল সে। তার কান্না শুনে সায়েদা আম্মা খুব ঘাবড়ে গেলেন।

: 'কী হয়েছে বেটা? আরে এভাবে কাঁদছ কেন? আমার তো খুব অস্থির লাগছে তোমার কান্না দেখে। কী হয়েছে আমনা?'

চিত্তায় সায়েদা আম্মার শীতল ঘাম বেরোতে লাগল। 'সালার কি কিছু বলেছে?'

: 'তাকে বিয়ে করাই ঠিক হয়নি আমার।' ইমামা উনার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সরাসরি বলল। সায়েদা আম্মার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। 'আমি আপনাকে আগেও বলেছিলাম, ওকে বিয়ে করব না।' বলতে বলতে ইমামা কাঁদতে লাগল।

: 'সালার কি তার আগের বউয়ের কথা বলে তোমাকে?' সালারকে নিয়ে সায়েদা আম্মার মনে যে একমাত্র আশঙ্কা ছিল, প্রথমে তিনি সেটাই উল্লেখ করলেন।

: 'আগের বউ!' কাঁদতে কাঁদতে ইমামা অবাক হয়ে ভাবল। কিন্তু সালারের প্রতি তার এতটা রাগ জমে আছে যে, সে কোনো কিছু না ভেবেই বলল, 'জি।'

সায়েদা আম্মার যেন ধাক্কা লাগল। এই আশঙ্কা তো উনার মনে ছিল। কিন্তু উনি অন্তত এটা ভাবেননি যে, বিয়ের প্রথম দিনেই সালার তার আগের বউয়ের আলোচনা

ইমামার সাথে করবে। ইমামা কী রাগ করবে! এখন তো সায়েদা আম্মার নিজেরই খুব রাগ হচ্ছে। মনে মনে আফসোসও হচ্ছে। ভাবছে, আসলেই তো! কী দরকার ছিল রাস্তা থেকে ধরে এনে দু-পয়সার একটা ছেলের হাতে আমনাকে এভাবে তুলে দেওয়ার!

: 'তুমি চিন্তা করো না। এ ব্যাপারে আমি নিজেই সিবতে আলি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলব।' সায়েদা আম্মা খুব রেগে গেছেন। সাহরি থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ইমামার মন ভারী হয়ে ছিল। এখন সায়েদা আম্মার সাথে কথা বলে অনেক হালকা লাগছে তার। ইমামা এতক্ষণ ধরে যেমন পক্ষপাতমূলক একজন মানুষ চাচ্ছিল, তেমন মানুষ সে পেয়ে গেছে। সায়েদা আম্মা তার

পক্ষ নিয়েই কথা বলছেন। উনার সাথে কথা বলে এখন তার টলটল চোখের পানি ঝরাও বন্ধ হয়ে গেছে।

বাসা থেকে দশ মাইল দূরে সালারের অফিস। এই মুহূর্তে অফিসের বোর্ডরুমে বসে সে ইভ্যালুয়েশন টিমকে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। প্রেজেন্টেশনের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে সে এখন একজনের প্রশ্নের উত্তরে 'বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা' বিষয়ক আলোচনা করছে। এদিকে তার কল্পনাতেও নেই যে, বাসায় বসে তার এক দিনের বউ এবং নয় বছরের প্রিয়তমা তার বিশ্বাসের মান-সম্মান ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। অথচ 'বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা'র আলোচনা ইভ্যালুয়েশন টিমের চেয়ে ইমামাকে শোনানো বেশি দরকার।

'ঘুমও হয়েছে, কান্নাও হয়েছে; এখন আর কী বাকি!' রিসিভার রেখে টিস্যু পেপারে নাক-চোখ মুছতে মুছতে ইমামা ভাবল। তার হঠাৎ রান্নাঘরের থালা-বাসনের কথা মনে পড়ল। গা-ছাড়াভাবে সে রান্নাঘরে গিয়ে সেসব ধুতে লাগল। অতঃপর

সন্ধ্যায় পরার জন্য সে কাপড় বের করতে বেডরুমে এলো। আর তখনই ফোন বেজে উঠল। ফোন হাতে নিতে নিতেই কল কেটে গেল। সালার ফোন করেছে। এটা ছিল তার চতুর্থ কল। ইমামা ফোন হাতে নিয়ে তার পরবর্তী কলের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোনো কল এলো না। তার বদলে মেসেজ এলো। মেসেজে সে প্রোগ্রাম জানাল, 'এক ঘণ্টা পর ডাক্তার সিবতে আলির ড্রাইভার এসে তাকে নিয়ে যাবে। সালারও ইফতারের পর সোজা সেখানেই চলে যাবে।' ফোনটা দেওয়ালে ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করল ইমামার। কিন্তু সেটা তো তার নিজের ফোন। এটা ভেঙে গেলে সালারের কী যায় আসে!

সালার গত রাতে ভালোবাসার দাস্তান খুলে বসেছিল। আর সেজন্য ইমামা আজ আশার পাহাড় জমিয়ে বসে আছে। অথচ গত রাতের প্রতিটি কথায় অজান্তেই ইমামা অস্বস্তি দিচ্ছে। তার মনে একেকটি গিঁট বেঁধে ফেলেছে। এখন গিঁটে ভরা সেই আঁচলটিই তাকে প্রচণ্ড

ইমামা মাত্র ডাক্তার সিবতে আলির বাসায় এসে পৌঁছাল। ডাক্তার সাহেব বাসায় নেই। উনার স্ত্রী কুলসুম আন্টি নিজের মেয়ের মতো তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। সেও বিষণ্ণতা চেপে নিজেকে যতটুকু হাসিখুশি দেখানো সম্ভব, দেখাল। আন্টির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে আন্টির সাথে মিলে ইফতারি, শরবত বানাতে লাগল।

ডাক্তার সিবতে আলি ইফতারের একটু আগেই এসেছেন। তিনি ইমামার গুরুগম্ভীর ভাব খেয়াল করলেন। কিন্তু তার এই মন খারাপির কারণ সালার হতে পারে, এটা তিনি ভাবছেন না। ভাববেনই-বা কী করে! সালারের মতো এমন নেক ইনসানকে নিয়ে এমন ভাবনা কল্পনাতেও আসে না।

০৫

সালার ইফতারের আধা ঘন্টা পর এলো। ইমামার সাথে চোখাচোখি হতেই সে বুঝে ফেলল, কিছু একটা হয়েছে। সে



হালপুরসি করাতে ইমামা কোনো উত্তর করল না। এমনকি ডাক্তার সিবতে আলি ও তাঁর স্ত্রীর মতো আন্তরিকতা নিয়ে অভ্যর্থনাও জানাল না। কেবল জোর করে ভদ্রতামূলক হাসি হেসে রান্নাঘরে চলে গেল। সালারের মনে হলো, সে হয়তো ভুল ভাবছে। কারণ, ইমামা কেন তার ওপর রাগ করবে?

সালার ডাক্তার সিবতে আলির সাথে বসে গল্প করছে। কিন্তু মনে মনে বিগত চব্বিশ ঘণ্টার একটা ছবি চোখের সামনে এনে খোঁজাখুঁজি করছে, সে কোথায় কোন ভুল করেছে? যে ভুলের কারণে ইমামার মন খারাপ হতে পারে। কিন্তু এমন কিছুই তার মনে পড়ল না। তাদের মাঝে শেষ কথা হয়েছিল রাতে। ইমামা তার বাহুতে মাথা রেখে গল্প করতে করতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল। মন খারাপ থাকলে তখন অস্থির থাকত। এভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না।

'আমি অন্তত এমন কিছুই করিনি, যাতে তার মন খারাপ হবে। হয়তো এখানে আসার পরই কিছু হয়েছে।' সালার নিজেকে

অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে দিতে ভাবল। 'কিন্তু এখানে এসে এমন কী হতে পারে? আমি হয়তো একটু বেশিই আবেগী হয়ে ভাবছি। এটা আমার ভুল ধারণাও হতে পারে।' সে নিজেকে এখন সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে কোনো সমস্যার ইঙ্গিতই দিয়ে চলছে। যদিও আজ নয় বছর পর ইমামার সাথে তার দেখা হয়েছে, কিন্তু নয় বছর আগেকার ইমামাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। মন খারাপ হলে ইমামার চেহারা কেমন হয়, সেটাও তার মুখস্থ।

সবাই খেতে বসেছে। খাবার টেবিলে বসে বেশিরভাগ কথা ডাক্তার সাহেব আর সালারই বলল। ইমামা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আন্টির সাথে খাবার পরিবেশনেই ব্যস্ত রইল। এখনো সে চুপ করেই আছে।

খাবার শেষে সালার ডাক্তার সাহেবের সাথে তারা পড়তে গেল। হাফেজ হওয়ার পর এই প্রথম তিলাওয়াত করতে গিয়ে সে আটকাল। একবার নয়, দুই-দুবার। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে

আনার চেষ্টা করল। তবু বারবার তার মনোযোগ ছুটে যেতে লাগল। অবশেষে তারাবি শেষ করে তারা বাসায় ফিরে এলো।

ডাক্তার সাহেবদের থেকে বিদায় নিয়ে, বাসায় না গিয়ে ইমামাকে নিয়ে সে সায়েদা আন্নার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হলো। তখন রাত সাড়ে দশটা। রওনা দিয়ে গাড়িতে উঠেও ইমামা একদম চুপ হয়ে আছে। কিন্তু তার এমন নীরবতায় সালার আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। অবশেষে তাকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'তুমি কি আমার ওপর রেগে আছ?'

ইমামা গাড়ির জানালা গলে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি কেন রাগ করব তোমার ওপর?' এটি বলে সে আগের মতোই জানালা গলে তাকিয়ে রইল। উত্তর শুনে সালার কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

: হ্যাঁ, আমিও ভাবছি, এমন কিছু তো হয়নি যে, তুমি আমার ওপর রাগ করবে।

সালারের উত্তরে তার রাগ আরও বেড়ে গেল। মনে মনে বলতে লাগল, তাহলে আমি পাগল নাকি যে, শুধু শুধুই রাগ করে বসে থাকব! আমি মন খারাপ করে আছি, অথচ এটা সে এখনো খেয়ালই করেনি।

: 'আমি তোমাকে অনেকগুলো কল করেছি। কিন্তু তুমি রিসিভই করেনি।' সালার গাড়ি চালাতে চালাতে বলল। এটা ভেবে ইমামার ভালোই লাগল যে, রিসিভ না করে ভালোই হয়েছে। তার মানে সে বুঝতে তো পেরেছে, আমি ইচ্ছা করেই তার কল ধরিনি।

: 'তারপর আমি বাসার নম্বরে কল করলাম। সেখানেও ব্যস্ত দেখাল। তুমি নিশ্চয় ব্যস্ত ছিলে তখন, তাই রিসিভ করতে পারোনি।' সালার একদম স্বাভাবিকভাবে বলে চলছে। তার

কথায় উদাসীনতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এদিকে তার এমন উদাসীনতায় ইমামার রাগ আরও বেড়েই চলছে। ইমামার হঠাৎ ফোনের কথা মনে পড়ল। তার ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেছে। 'আমার ফোনকার্ড কিনতে হবে।' সালার তাকে বলতে শুনল। ইমামা তারপর হ্যান্ডব্যাগ খুলে সেখান থেকে কিছু বের করতে লাগল। অবশেষে যে জিনিসটি সে ব্যাগ থেকে বের করে সালারের হাতে দিল, তা দেখে সালার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে তার হাতে এক হাজার টাকার একটা নোট তুলে দিয়েছিল। ইমামা তার স্তব্ধতা খেয়াল করল না। সে জানালার ফাঁক গলে বাইরে ফোনকার্ডের দোকান খুঁজতে লাগল। সালার তার হাত পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'ফেরার পথে কিনে নেব। আর এই নোটের প্রয়োজন নেই।' ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। 'তুমি যখন আমার কেউ ছিলে না, তখন চোখ বন্ধ করে তোমাকে আমার সেলফোন দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এখন কি তোমার থেকে টাকা নেব আমি?'

গাড়িতে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো। দুজনেরই একসাথে কিছু একটা মনে পড়ল। যা মনে পড়ল, তা যেন সময়কে সেখানেই থামিয়ে দিল।

অনুভূতিশূন্যভাবে ইমামা হাতের নোটটি ভাঁজ করতে লাগল। সে তার সমস্ত ধার ফিরিয়ে দিয়েছিল। উলটো ফোন, ফোনের বিল এবং তার পেছনে যা খরচ করেছিল, তার চেয়ে বেশিই ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অনুগ্রহ? নিঃসন্দেহে তার অনুগ্রহের ভার অনেক বেশিই। ভাঁজকৃত নোটটি সে পুনরায় ব্যাগে ভরে নিল। সালারের এমন আন্তরিক উত্তরে ভার থেকে পুঞ্জীভূত সন্দেহের কুয়াশা একদম উধাও হয়ে গেল। কিংবা কিছুক্ষণের জন্য ইমামার কাছে এমনটাই অনুভূত হলো।

বাইরে রাস্তায় অনেক কুয়াশা। সালার খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে। ইমামার ইচ্ছা করল, তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে। কিন্তু সে বলল না। হয়তো কিছু ভাবতে থাকল, কিংবা কিছু বলার জন্য শব্দ খুঁজে ফিরল।

: 'আজ সারা দিন কী করলে?' সালার পুনরায় কথা শুরু করতে চেষ্টা করল। পুরোটা দিন এক ঝলকে ইমামার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইমামার খুব লজ্জা অনুভূত হলো। আজ সারা দিন যা কিছু করেছে, তা তাকে বলার মতো নয়।

: 'ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।' সে পুরো দিনটিকে দুই শব্দেই শেষ করে দিল।

: হ্যাঁ, আমি জানতাম। জেগে থাকলে অবশ্যই আমার কল রিসিভ করতে।

আবারও নীরবতা ছেয়ে গেল।

: 'পাপা, মাম্মি আর আনিতা আসছে কাল সন্ধ্যায়।' সালার কিছুক্ষণ পর বলল। ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। 'তোমাকে দেখতে' সালার আরেকটু বাড়াল। অবশেষে

শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে তার প্রথম দেখা হতে চলেছে।
ভাবতেই ইমামার পেটে মোচড় দিয়ে উঠল।

: 'উনাদেরকে তুমি আমার কথা বলেছ?' সে অত্যন্ত সংযত ও
পরিমিত শব্দে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, এখনো বলিনি। তবে আজকে ফোন করে পাপাকে বলব।'
সালার জানালা গলে বাইরে তাকাতে তাকাতে বলল। ইমামা
তার চেহারা পড়ার চেষ্টা করল। কোনো দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ,
উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, আতঙ্ক, ভয়, আফসোস; কিছুই সে খুঁজে
পেল না তাতে। তাকে দেখাচ্ছে একদম অনুভূতিহীন। তার
মনে যদি কিছু থেকেও থাকে, তাহলে সে তা অত্যন্ত
নিপুণভাবে লুকিয়ে রেখেছে। সালার বুঝতে পারল, ইমামার
অনুসন্ধানী চোখ তার চেহায়ায় কিছু খুঁজতে চেষ্টা করছে। তাই
সে ইমামার দিকে তাকাল। তাকিয়ে হাসল। ইমামা এবার
অবচেতনেই তার চোখ সরিয়ে নিল।

: আনিতার ফ্লাইট সাড়ে পাঁচটায়। আর পাপারটা সাতটায়। আমি কাল ব্যাংক থেকে তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে চলে যাব। সেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে নয়টা-সাড়ে নয়টার মধ্যে বাসায় চলে আসব। এটা তুমি কী পরেছ?' সালার হঠাৎ তার জামার দিকে তাকাতেই বলল। 'তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর তোমার তবে মনে পড়ল, আমি কিছু পরেছি।' এটা ভাবতেই ইমামার অভিমান আরও বেড়ে গেল।

: 'জামা।' ইমামা উত্তর করল। সালার তার কথায় অজান্তেই হেসে ফেলল।

: 'জামা পরেছ জানি। এজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি।'

ইমামা ঘাড় ফিরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। ভাবল, সালার এখন তার প্রশংসা করে কিছু বলবে। সে আরও ভাবল, দেরি হলেও শেষপর্যন্ত আমার জামা তার চোখে তো পড়েছে। তার অভিমান একটু কমে এলো।

: 'এটা কী রঙের?' সালার এভাবেই তার পায়ে প্রথম কুড়ালটা মারল। তার প্রশ্ন শুনে ইমামার ইচ্ছা করল, চলতি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে। তার মানে সে ভালো করে আমার দিকে তাকায়নি।

: 'জানি না।' ইমামা ওভাবেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অসম্ভব উদাসীনভাবে

বলল।

: 'হ্যাঁ, আমিও ঠিকমতো ধরতে পারিনি। আজকালকার মেয়েরা পরেও এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জামা।' সালার তার অভিমান বুঝতে না পেরে নিজের মতো করে মন্তব্য করল।

সালার জিঙ্ক ও কপার শেডের জামাটিকে অদ্ভুত বলে চলছে। ইমামার মন কষ্টে ভরে উঠল। সালার এখন স্বামীদের

ঐতিহাসিক ভুলগুলো একের পর এক পুনরাবৃত্তি করে চলছে। ইমামার এবার তার কথার উত্তর দিতেই ইচ্ছা করল না। সে এর যোগ্যও নয়। তার মনে পড়ল, সালার গতকালও তার পোশাকের প্রশংসা করেনি। পোশাক! পোশাক তো দূরের কথা, সে তো তারই কোনো প্রশংসা করেনি। ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু প্রশংসা? হ্যাঁ, প্রশংসা তো করেনি! ইমামা যেন গত রাতের কথা মনে করে বিষয়টি সত্যায়ন করার চেষ্টা করল। তার কষ্ট লাগল। সালারের চোখে কি তাকে এতটুকুও সুন্দর লাগেনি যে, একবার হলেও একটু প্রশংসা করত! একটা বাক্য, একটা শব্দ কিংবা কিছু একটা বলত। আবারও তার নিজের প্রতি মায়া হতে লাগল। নারীদের কাছে ভালোবাসার প্রকাশ আর তার সৌন্দর্যের প্রশংসা, দুটো কখনোই এক নয়। তারা পুরুষের কাছে ভালোবাসাও চায়, তাদের মুখে সৌন্দর্যের প্রশংসাও চায়। কিন্তু পুরুষরা এখানে ভুল করে।

গাড়ি চালাতে চালাতে সালার বুঝতেও পারেনি, কথা শুরু করতে গিয়ে কেমন এক গুরুতর বিষয়ের আলাপ তুলে ফেলেছে। সালার যেন খেলতে খেলতে ভয়ংকর এক বোমের উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পা ওঠালেই এখন সেই বোম ফেটে যাবে।



দেখতে দেখতে তারা এখন সায়েদা আম্মার বাড়িতে চলে এসেছে। গলিতে গাড়ি পার্ক করে সালার আবারও ইমামার চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করল। সে আবারও একে তার মনের ভুল মনে করল। 'একটু আগেই ডাক্তার সিবতে আলির বাসাতেও এই সন্দেহ হয়েছিল আমার। আমার এমন হচ্ছে কেন? ইমামা কেন সারাক্ষণ আমার ওপর রাগ করে থাকবে?' সালার নিশ্চিন্তে ভাবল।

সায়েদা আম্মা দরজা খুলেই ইমামাকে জড়িয়ে ধরলেন। খানিক পর কাঁদতেও শুরু করলেন। সালার বিরক্ত হলো। 'এতদিন একসাথে ছিল। এজন্য একজন আরেকজনকে নিশ্চয় খুব মিস করছে।' অবশেষে সে নিজেকে বোঝাল। কিন্তু সায়েদা আম্মা সালারের সালামের কোনো জবাব দিলেন না। এমনকি তাকে সবসময়ের মতো গলায় জড়িয়ে আদরও করলেন না। তিনি ইমামাকে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে কান্না করতে করতে তাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সালার বোকার মতো দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল। 'উনার কী হলো?' এই প্রথম তার খটকা লাগল। এবার একে নিছক সন্দেহ বলে ঝেড়ে ফেলতে পারল না সে। 'কিছু একটা তো হয়েছে। কিন্তু কী?' সালার কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গেট বন্ধ করে সে ভেতরে চলে গেল।

ভেতরে সায়েদা আম্মা আর ইমামা কী নিয়ে যেন কথা বলছিল। তাকে দেখে দুজনেই চুপ হয়ে গেল। সালার ইমামাকে চোখ মুছতে দেখল। সালারের আবারও দুশ্চিন্তা হতে লাগল।



: 'আমি চা নিয়ে আসছি। বাদাম আর গাজরের হালুয়া বানিয়েছি আজ।' বলতে বলতে সায়েদা আন্মা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সালার আনমনেই উনাকে থামাল। বলল, 'সায়েদা আন্মা! আমাদের জন্য কিছু আনতে হবে না। আমরা খাবার খেয়েই আসছি। চা-ও পান করেছি। কেবল আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।' সালার বলতে বলতে থেমে গেল। সে বুঝতে পারল, এই প্রস্তাব মূলত তাকে করাই হয়নি। সায়েদা আন্মা পুরোপুরি ইমামার দিকেই ফিরে আছেন। সায়েদা আন্মার প্রস্তাবে কিছু খেতে ইমামার মধ্যে কোনো আপত্তিও দেখা যাচ্ছে না।

আনবেন?' বলতে বলতে ইমামা সায়েদা আন্মার সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল। সালার : 'আমি খাব, আর আপনার সাথে আমিও আসছি। আপনি একা কাভাবে আবারও বোকার মতো ওখানে বসে রইল।



পনেরো মিনিট ধরে সে ওখানে বসে ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছে।
রুমের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে। অবশেষে সায়েদা
আম্মা ও ইমামার আগমন হলো। ইমামার চোখ এখন আগের
চেয়ে বেশি লাল হয়ে আছে। ফুলেও গেছে। নাকের অবস্থাও
এমন। লাল হয়ে আছে সেটাও। নিশ্চিত সে রান্নাঘরে বসে বসে
কান্না করেছে। কিন্তু কেন? সালারের কাছে এখন সবকিছু
গুলিয়ে যাচ্ছে। এই কান্না তো সায়েদা আম্মাকে মিস করার
কান্না মনে হচ্ছে না। সায়েদা আম্মার চোখে এখন আগের
চেয়েও বেশি শীতলতা ফুটে আছে।

এই মুহূর্তে সালারের চায়ের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। আর না
আছে হালুয়ার প্রতি কোনো টান। এখন সে যা-ই খাবে,
সেটাতেই তার বদহজম হবে। কিন্তু এই গুমোট পরিবেশ তাকে
প্রয়োজনাতিরিক্ত সতর্ক করে দিয়েছে। অসম্মতি প্রকাশ না
করে সে চুপচাপ প্লেটে সামান্য হালুয়া নিল। ইমামা ডাক্তার
সিবতে আলির বাসার মতোই এখানেও তাকে জিজ্ঞেস না

করেই তার চায়ে দুই চামচ চিনি দিয়ে সামনে রেখে দিল। এবার সে নিজে হালুয়া খেতে লাগল।

কয়েক মিনিট পর অবশেষে সায়েদা আম্মার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হাতের প্লেটটি একপাশে রেখে নাকের ডগায় চশমাটি ঠিক করতে করতে তিনি তীক্ষ্ণ চোখে সালারের দিকে তাকালেন। বললেন, 'স্ত্রীদের অনেক হুক আদায় করতে হয়।' হালুয়ার চামচ নাড়াতে নাড়াতে সালার থমকাল। সে প্রথমে সায়েদা আম্মার দিকে তাকাল, তারপর ইমামার দিকে। সেও থমকে ছিল। ঘাবড়েও ছিল অনেকটা। সালারের আড়ালে তার ব্যাপারে ভালো-মন্দ বলা এক বিষয়। কিন্তু এমন সামনাসামনি বসে সেসব বলা অন্য বিষয়। যেখানে ওসব অভিযোগের অনেক কিছুই নিছক মিথ্যা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে। ইমামা সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সালারের কাছে সায়েদা আম্মার প্রশ্নটি প্রশ্ন নয়, সরাসরি মন্তব্য মনে হলো। 'জি' সে উনার কথায় একাত্মতা পোষণ করল।

: 'যে স্বামী তার স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, সে স্বামীর ঠিকানা জাহান্নাম।'
সায়েদা আন্মা উনার পরবর্তী বাক্যটি বললেন। সালার এবার
সাথে সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পারল না। কারণ, সে
নিজেই পুরুষ। আবার স্বামীও। ইমামার জন্য সে জীবন দিতে

পারে, ঠিক আছে। কিন্তু সরাসরি স্ত্রীর সামনে বসে এমন কথায়
একাত্মতা পোষণ করা মানেই নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল
মাঝে। বিয়ের পরদিনই সে স্ত্রীর প্রতি এতটা আনুগত্য দেখাতে
পারছে না। হতে পারে এ কথার ফলে বাকি সারা জীবন
আফসোস করবে। সালার এবার কিছু না বলে চায়ের কাপে
চুমুক দিল। তার এমন নীরবতা সায়েদা আন্মাকে আরও রাগিয়ে
দিল।

: যে অন্যের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাকে কখনো মাফ করেন
না।

হালুয়া খেতে খেতে সালার সায়েদা আম্মার এ কথাটি নিয়ে ভাবল। তারপর একাত্মতা পোষণ করে মাথা নাড়ল, 'জি, একদমা।'

সায়েরদা আম্মা তার এমন নির্লজ্জতায় উত্তেজিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, কেমন পুরুষ, বউয়ের মনে আঘাত দেয়, আবার নির্লজ্জের মতো তার শাস্তিতে সহমতও পোষণ করে।

: কোনো ভদ্র পরিবারের মানুষের স্বভাব এমন হতে পারে না, তারা কারও মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে তাকে আগের বউয়ের গল্প শোনাতে শুরু করবে।

ইমামার যেন জান বের হয়ে যাচ্ছে অবস্থা। এটা আসলেই একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

: 'আপনার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আম্মা!' পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করল সে। সালার পালানুক্রমে তাদের দুজনের দিকেই

তাকাল। সে এ কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না। আর আগের কথাগুলোর সাথে এ কথার কী সম্পর্ক, সেটাও সে বুঝতে পারল না। না বুঝলেই কী, একাত্মতা পোষণ করতে তো কোনো সমস্যা নেই। কথা তো ঠিক।

: 'ঠিক বলছেন আপনি।' অবশেষে সালার বলল।

তার বিনয় সায়েদা আম্মাকে আরও ভড়কে দিল। 'দেখতে কেমন ভদ্র-সদ্র! এজন্যই তো সিবতে আলি ভাইও ধোঁকা খেয়েছে। তাকে চিনতে পারেনি।' যুক্তি দেখিয়ে সায়েদা আম্মা ডাক্তার সিবতে আলির ভুলকে ক্ষমার তালিকায় নিলেন।

: 'আমনার বিয়ের জন্য অনেক ঘর এসেছিল।' সায়েদা আম্মা কথার ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন। তিনি বুঝতেও পারছেন না, তিনি একজন ভুল মানুষকে ইমামার গুরুত্ব বোঝাতে ভুল লেকচার দিতে বসেছেন। সালার হালুয়ার প্লেট হাতে নিয়ে এক

পলক ইমামার দিকে তাকাল। তারপর সায়েদা আম্মার দিকে। সায়েদা আম্মা অসম্ভব জোশ-উচ্ছ্বাস নিয়ে বলেই চলছেন।

: ওই যে সামনের বাসার জহুর সাবের বড় ছেলে, আমনাকে কোথায় যেন দেখে ফেলেছিল। তারপর তো মা-বাপকে সাফ সাফ জানিয়ে দিল, বিয়ে যদি করতেই হয়, তাহলে এই আমনাকেই করবা। এজন্য খালাতো বোনের সাথে করা ছোটকালের বাগদানও ভেঙে দিল।

সালার এবার হালুয়ার প্লেট টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। আর যাইহোক, ইমামার এমন কোনো বিয়ের প্রস্তাব সে মজা করে হালুয়া খেতে খেতে শুনতে পারে না। ইমামা এবার সায়েদা আম্মাকে থামানোর চেষ্টা করেনি। খুবই সস্তা আলাপ এসব। কিন্তু সেও যেন চাচ্ছিল, সালার বুঝুক সে কত মূল্যবান। তাকে নিছক স্ত্রী মনে করা যাবে না। সে তার চেয়েও বেশি দামি।

: 'ছেলের মা আমাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে জুতার তলা ক্ষয় করে ফেলেছে। এলাকার সমস্ত মুরবিবকে দিয়ে বলিয়েছে। এমনকি ইংল্যান্ডে আমার ছেলেদের কাছে ফোন করেও এই বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেছে।' সায়েদা আন্মা বলে চলছেন। সালার এখন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছে। আর ইমামা যেন এসবের কিছুই শুনছে না-এমন ভাব নিয়ে বসে বসে হালুয়ার প্লেটে চামচ ঘোরাচ্ছে।

: তার মা বলছিল, যত টাকা মোহর চান, লিখে নিয়েন। কেবল আপনার মেয়েটাকে আমাদের মেয়ে বানিয়ে দিন।

সালার সায়েদা আন্মাকে দেখিয়ে এমনভাবে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, বোঝাতে চাচ্ছে যেন তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার এই আচরণে সায়েদা আন্মার প্রচণ্ড রাগ পেল। এসব কাহিনি বলার পর উনি সালারের কাছে অন্তত এমন উদাসীনতা প্রত্যাশা করেননি। 'আজও একটু আগেও তার মা এসেছিল। অনেক দুঃখ করে বলছিল, তার ছেলের ওপর আমি অনেক

জুলুম করে ফেলেছি। একবার নয়, দুই-দুবার। বলছিল, আমাদের ফেলে কোন অচেনা-অজানা একটা মানুষ ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, আমার ছেলেকে চোখে পড়ল না আপনার! রানির মতো করে রাখত আমনাকে। তাকে দেখে দেখে জীবন কাটাত।' সায়েদা আম্মা এখন অতিরঞ্জনের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। অথচ উনার কথায় সামনে বসা লোকটির চেহারায় এখানো প্রভাবিত কিংবা মুগ্ধতা নামের কোনো জিনিসই প্রকাশ পেল না। বরং সে গম্ভীর হয়ে উনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এখন সায়েদা আম্মার মনে হচ্ছে, সালারের সাথে আমনার বিয়ে দিয়ে সত্যিই তার কপাল পুড়লাম। অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। এমন প্রচণ্ড শীতেও গ্লাসভরতি ঠান্ডা পানি নিয়ে এক শ্বাসে খেয়ে ফেললেন।

তার এমন নীরবতায় ইমামারও অনেক কষ্ট লাগল। গত রাতে সে ইমামাকে কত কিছুই না বলল। আর এখন সায়েদা আম্মার সামনে বলার জন্য তার কাছে একটা শব্দও নেই। সে কতটা মূল্যবান এটা বোঝানোর জন্য তার কাছে কোনো কথাই নেই।



অথবা সে তার খেয়াল রাখবে, এজন্য ওয়াদা করবে, কিংবা কোনো সাক্ষ্য দিবে, বা অন্য কিছু বলবে। জবাবে তো কিছু একটা বলা উচিত ছিল তার। ইমামার এখন নিজেকে অদ্ভুত মূল্যহীন ও তুচ্ছ মনে হতে লাগল। যাতনা আরও কিছুটা গাঢ় হলো। দূরত্ব আরও কিছুটা বাড়ল। সে অন্য কারও সামনে তার প্রশংসা করে দুটো কথা বলার মতো যোগ্যও মনে করল না? আচ্ছা, একাকী আমার প্রশংসা না হয় না-করে, এখানে উনার সামনে অন্তত কিছু বলে দিত। কিছু একটা বলত। তার মন আবারও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সে এটা কখনো চায়নি, সালার তার সাথে আট-দশটা স্বামীর মতোই আচরণ করবে। অথচ সে নিজেই তার কাছে আট-দশটা স্ত্রীর মতো প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে।

: 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এখন আমাদের যাওয়া উচিত। সকালে আমার অফিস আছে। ইদানীং কাজের চাপ একটু বেশি।' সালারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিনীতভাবে সায়েদা আম্মাকে বলে উঠে দাঁড়াল। সে এখন

ইমামার দাঁড়ানোর অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইমামা টেবিলের প্লেটগুলো ট্রেতে ওঠাতে ওঠাতে নিতান্ত শীতল গলায় বলল, 'আমি আজ এখানে সায়েদা আম্মার সাথেই থাকব।'

সালার ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। ইমামা গত কয়েক ঘন্টায় একবারও এমন কিছু বলেনি, সে সায়েদা আম্মার এখানে থাকবে। আর এখন, একেবারে খাড়ার মধ্যেই এমন সিদ্ধান্ত!

: 'হ্যাঁ, একদম। এখানেই রেখে যাও ওকে।' সায়েদা আম্মা সাথে সাথেই জোর দিলেন। এদিকে ইমামা তার মুখে 'না' শোনার অপেক্ষা করতে লাগল।

: 'ঠিক আছে। সে থাকতে চাচ্ছে যেহেতু, আমার কোনো আপত্তি নেই।' সালার খুব সরলভাবেই বলল। প্লেট ওঠাতে ওঠাতে ইমামা অবিশ্বাস্যভাবে তার দিকে তাকাল। সে তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক মিনিটও জোরাজুরি করল না। 'সে কি এতটাই বিরক্ত হয়ে গেছে তার কারণে?' ইমামা ভাবল।

তারপর সালার কিছু বলার আগেই ঝপ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

সায়েদা আম্মা অসম্ভব কঠোর চোখে সালারের দিকে তাকালেন। সালার যেন এই কাজটি করে তার ওপর আরোপিত সমস্ত অভিযোগকে সত্যায়ন করে দিল। সালার না ইমামার এভাবে চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারল, আর না সায়েদা আম্মার এই রহস্যময় চোখের মর্ম বুঝতে পারল। যতটা অস্বস্তিকর ছিল এই কথোপকথন, ঠিক ততটাই অপ্রত্যাশিত ছিল হুট করে ইমামার এমন সিদ্ধান্ত। তবু সে সায়েদা আম্মার সামনে আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করে মন খারাপ করতে চাচ্ছিল না। তাই থাকার অনুমতি দিয়ে দিল।

: 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই।' সে সায়েদা আম্মার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের উঠোনে চলে এলো। সে ভেবেছিল, ইমামা রান্নাঘরে বাসন রেখে তাকে বিদায় জানাতে

আসবে। কিন্তু সে এলো না। সালার সায়েদা আম্মার সাথে
কতক্ষণ

উদ্দেশ্যহীন কথা বলতে বলতে তার অপেক্ষা করতে থাকল।
সায়েদা আম্মার চেহারা এতটা ভাবলেশহীনতা না থাকলে সে
ইমামাকে ডেকে দেওয়ার জন্যও বলত। কিন্তু এটা বলতে
এখন তার সংকোচ হচ্ছে।

সায়েদা আম্মার বাড়ি থেকে বের হয়েই সে প্রথমে তাদের
সামনের বাড়িটির দিকে তাকাল; যে বাড়ি থেকে ইমামার জন্য
এত অসংখ্যবার প্রস্তাব এসেছে। এখান থেকে একা যেতে তার
বুকে লাগছিল। এতগুলো বছর সে তাকে ছাড়াই থেকেছে।
একাকিত্ব কখনো তাকে যাতনা দেয়নি। কিন্তু এক রাত সে তার
সাথে কাটিয়েই এখন, একাকিত্বের মর্ম বুঝে গিয়েছে। এখান
থেকে বাসায় ফেরার পথ তার কাছে জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘতম
পথ মনে হচ্ছে।



: 'কাল ভাই সাহেবের ওখানে যাব। উনাকে সবকিছু বলব।
উনিই সালারের সাথে কথা বলবেন।' সায়েদা আন্মা ইমামার
পাশে বসতেই বললেন। উনাকে অনেক চিন্তিত দেখাচ্ছে।
ইমামা উনার কথার না সমর্থন করল, আর না বিরোধিতা। এখন
তার কিছু বলতেই ইচ্ছা করছে না। কম্বল জড়িয়ে বিছানায় বসে
চুপচাপ সায়েদা আন্মার কথা শুনতে থাকল সে।

: 'ঠিক আছে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো বেটা! ভোরে সাহরিতে
উঠতে হবে।' সায়েদা আন্মার হঠাৎ সাহরির কথা মনে পড়ল।
বিছানা ছেড়ে রুম থেকে বেরোতে বেরোতে সায়েদা আন্মা
জিজ্ঞেস করলেন, 'লাইট নিভিয়ে দেব?' প্রশ্নটি শুনতেই তার
মাথায় যেন কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। সেই বিস্ফোরণে
ধুম করে গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। 'না থাকুক' ভেজা
গলায় বলতে বলতে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সায়েদা আন্মা
দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

রুমের নীরবতা তাকে সালারের কথা মনে করিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, ভালোই তো, আমি নেই, লাইট জ্বালিয়ে আরামে ঘুমাবে এখন। এটাই তো চাচ্ছিল সে।' আবারও তার যন্ত্রণা হতে লাগল। তখনই তার ফোন বেজে উঠল। মুহূর্তের জন্য ইমামার রক্তপ্রবাহ তীব্র হয়ে গেল। সালার অবশেষে তাকে কল করেছে। প্রচণ্ড অভিমানে ফোনটি টেবিলের ওপর ছুড়ে মারল। 'সাথে নিয়ে গেল না, আর এখন আমার কথা মনে পড়ছে!' তার যাতনা এখন রাগে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। 'আমি এমন কেন করছি? শুধু শুধু তিলকে তাল বানাচ্ছি।' সে যেন নিজের পর্যালোচনা করল। আর এই পর্যালোচনা তাকে আরও যন্ত্রণা দিল। আমি হয়তো খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। নয়তো সে ইচ্ছা করেই আমাকে এড়িয়ে চলছে। সে বোঝাতে চাচ্ছে, তার কাছে

আমার কোনো মূল্য নেই। বন্ধুবান্ধব, ফ্যামিলি, অফিস-কেবল এগুলোই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সালারের থেকে এবার দ্বিতীয় আর কোনো কল এলো না। কয়েক সেকেন্ড পর মেসেজ এলো। ইমামার বিশ্বাস ছিল, সালার তাকে বলবে, তোমাকে মিস করছি। অথচ মেসেজে ফোনের একটি রি-লোড ব্যালেন্স কার্ডের নম্বর লিখে পাঠিয়েছে সে। তার নিচে ছোট করে দুটি শব্দ-'গুডনাইট সুইটহার্ট!'

প্রথমে তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। আর এখন প্রচণ্ড কান্না। আগেও তার চোখে সালার সিকান্দারের চেয়ে খারাপ কেউ ছিল না; আর এখনো তার চেয়ে খারাপ কাউকে মনে হচ্ছে না।

০৭

: 'আমনার সাথে কথা বলাও, আমি আর তাইয়েবাও তার সাথে কথা বলি। বিয়ে করে ফেলেছ, তাকে ঘরেও নিয়ে এসেছ। এখন আমাদের জন্যও কি কোনো কাজ বাকি আছে? নাকি



নেই?' সিকান্দার উসমান সালাম-কালামের পর সুযোগ পেয়েই বলে উঠলেন।

: 'সে আজ তার বাবার বাড়িতে আছে।' সালার একটু ভেবে বলল।

: 'তো প্রিয় পুত্র! তুমিও তোমার স্বশুরবাড়িতেই থেকে যেতে। মুখ উচিয়ে বাসায় চলে আসছ কেন?' সিকান্দার তাকে ধমকালেন। প্রত্যুত্তরে সে হাসল।

: 'মান্নি পাশেই?' সে প্রসঙ্গ পালটাল।

: হ্যাঁ, কেন? কথা বলবে?

: না, আপাতত আপনার সাথে বলব। বরং বিষয়টা একটু বেশিই সিরিয়াস।

সিকান্দার একদম সোজা হয়ে বসে পড়লেন। এটা 'সালার সিকান্দার।' সে যেহেতু বলছে 'বিষয় সিরিয়াস' তার মানে বিষয়টা নিশ্চিত সিরিয়াস।

: কী বিষয়?

: আমনার ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে চাই।

সিকান্দার গুলিয়ে গেলেন। বিয়ের পরই সে উনাকে আমনার কথা জানিয়ে ছিল। সে ডাক্তার সিবতে আলির মেয়ে। কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে খুব তাড়াহুড়োয় তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল। সিকান্দার উসমান ডাক্তার সিবতে আলিকে চিনতেন। সালারের মাধ্যমে উনার সাথে দু-তিনবার দেখাও হয়েছে। সে ডাক্তার সিবতে আলির

মেয়ের জায়গায় অন্য যেকোনো মেয়েকেও যাদ, তাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করত, তবু তারা তাতে কোনো আপত্তি

করতেন না-উনি এবং উনার ফ্যামিলি এতটাই মুক্তচিন্তার মানুষ। 'আর সালার তো সর্বক্ষেত্রেই "স্পেশাল" কেস। সে স্বাভাবিক মানুষের মতো বিয়ে করবে, এটা তো সম্ভবই নয়।'- এটি ছিল তাইয়েবার মন্তব্য। তার বিয়ের সংবাদে তিনি খানিকটা অভিমান আর অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বলেছিলেন এই কথাগুলো। আর এখন সে বলছে, আমনার ব্যাপারে কিছু বলতে চায়!

সালার খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। কথা কোথেকে শুরু করবে, বুঝে এলো না। 'আমনা মূলত ইমামা।' জীবনে কোনো কিছুতে সে কখনো ভূমিকা টানেনি, আজ কীভাবে টানবে! অপর পাশে একদম নীরবতা ছেয়ে গেল। সিকান্দারের মনে হলো, উনি হয়তো ভুল শুনেছেন।

: 'মানে? মানে কী?' তিনি যেন সত্যায়ন চাইলেন।



: 'ইমামাকে ডাক্তার সাহেব উনার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সে এত বছর উনার কাছেই ছিল। তিনি তার নিরাপত্তার জন্য তার নাম বদলে দিয়েছিলেন। বিয়ের সময় আমি জানতাম না, এটা ইমামা। কিন্তু সে ইমামাই।' শেষ বাক্যটি বলা তার কাছে বোকামি মনে হলো। সিকান্দার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সামনের বিছানায় বসে পড়লেন। বসে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তাইয়েবা তখন স্টারপ্লাসে টিভি শো দেখছিলেন। আর এটা ভালোই ছিল। নয়তো এই বিস্ফোরক সংবাদ শুনে তিনিও অস্থির হয়ে যেতেন।

সিকান্দার ওভাবেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে খালি পায়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে এলেন। তাইয়েবা অবাক চোখে উনাকে এভাবে তাড়াহুড়ো করে বাইরে যেতে দেখলেন। 'এই বাপ-ছেলের রোমান্সই শেষ হয় না। আজকে দুই ঘণ্টা লাগিয়ে তারপর ই ফিরবো।' তাইয়েবা খানিক অভিমানী হয়ে ভাবলেন। তারপর পুনরায় টিভি শোতে মগ্ন হয়ে গেলেন।

এদিকে বাইরে লাউঞ্জে সিকান্দার উসমানের চৌদ্দ স্তর আলোকিত হয়ে গেছে। উনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। তিনি একটু আগেই তাইয়েবাকে তার ছোট ছেলের সেটেল হওয়ার খুশির কথা বলছিলেন। তার অলিমার প্ল্যান করছিলেন। কিন্তু তিনি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন, এটা তার ছোট ছেলে 'সালার সিকান্দার'।

সালারের সাথে টানা দুই ঘণ্টা কথা বলে তিনি বেডরুমে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাইয়েবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সিকান্দার উসমানের ঘুম ও স্বস্তি দুটোই বিদায় নিয়েছে।

০৮

ইমামা প্রায় আড়াইটার দিকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছাল। তাকে ডাক্তার সিবতে আলির ড্রাইভার নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই সে উভয় বেডরুম চেক করল।



বাথরুমেও উঁকি দিল। কিন্তু বেডরুম কিংবা বাথরুম, দুটোই পরিচ্ছন্ন ও গোছানো পেল। সালার সম্ভবত অফিসে যাওয়ার আগে সবকিছু নিজেই গুছিয়ে গিয়েছে। ফলে ইমামার নিজেকে আবারও 'কমহীন' মনে হলো।

একটি বেডরুম আগে থেকেই হয়তো গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অপর বেডরুমটি সে স্টাডি রুম হিসেবে ব্যবহার করত। সেখানে বইপত্রে ঠাসা একটি রেক। বাকি রেকগুলোতে সিডি ও ডিভিডির স্তুপ জমে আছে। বসার রুমের রেকগুলোতেও সিডি ও ডিভিডি ভরে আছে। কিন্তু সেখানে এর তুলনায় অল্পই। রুমে কিছু বাদ্যযন্ত্রও পড়ে আছে। পাশেই একটি স্টাডি টেবিল, তাতে একটি কম্পিউটার রাখা হয়েছে। ওই স্টাডি টেবিলটি ওই রুমের একমাত্র জায়গা, যেখানে কাগজপত্র, ফাইল এবং ডেস্ক অর্গানাইজার এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। সালার যাওয়ার আগে হয়তো সেটা গোছাতে ভুলে গিয়েছে। কিংবা সে তাড়াহুড়োয় ছিল।

একবার তার মনে হলো, কাগজগুলো গুছিয়ে রাখি। একটু পরই সে এই ইচ্ছা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। তার ভয় হলো, এই কাজ সে সালারের মতো এত নিখুঁতভাবে করতে পারবে না। আর যদি কোনো কাগজ উলট-পালট হয়ে যায়, তাহলে? সে দরজা লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ফ্রিজ এবং ফ্রিজারে খাবার অনেক কিছুই আছে। তার ধারণা, এর মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট খাবারই ফোরকান ও নওশীনের আপ্যায়নের ফলাফল। সালারের ব্যক্তিগত কেনা জিনিসের মধ্যে ছিল ফলমূল, ড্রিংকস, অল্পবিস্তর কৌটা ও প্যাকেটজাত আইটেম।

সে কয়েকটা কৌটা বের করে দেখল। সেগুলোর প্রায় সবই সি-ফুড বা সামুদ্রিক খাবার। ইমামা শুধু একটি খাবারই অপছন্দ করত আর তা হলো, সি-ফুড। অথচ রোজা না থাকলে সে কৌটার গায়ে আঁকা চিংড়ি ও কাঁকড়ার ছবি দেখে একটু খেয়ে দেখার কথাও ভাবত। এতটাই লোভনীয় দেখাচ্ছিল সেগুলো কৌটার গায়ে। সে অত্যন্ত হতাশ হয়ে কৌটাগুলো পুনরায় ফ্রিজে রেখে দিল। নিশ্চয় সেগুলো সাজিয়ে রাখার জন্যই

কিনে আনেনি। কিনে যেহেতু এনেছে, তার মানে এগুলো সে খায়ও। তার খারাপ মুড আরও খারাপ হয়ে গেল। তার ব্যাপারে এমন আর কী কী তথ্য বাকি আছে!

সে রান্নাঘরের আলমারিগুলো খুলে খুলে দেখে, লাগিয়ে দিল। বুঝতে পারল, এই রান্নাঘরে ফ্রিজ ছাড়া কেবল কয়েকটি আলমারি আর রেকই আছে। এছাড়া আর কিছুই নেই। রান্নাঘরটিতে কেবল নাশতা, স্যান্ডউইচের মতো হালকা খাবার ও চা-কফি বানানো হয়। ওখানে সে ফ্রাই প্যান বা কড়াই ছাড়া রান্নাবান্না করার অন্য কোনো বাসনপত্র খুঁজে পেল না। ক্রোকাকারিতে একটি ডিনার সেট, কয়েকটি পানি ও চা-সেট, কিছু মগ বা একটি ব্রেকফাস্ট সেট দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে তার বাসায় খুব বেশি কেউ আসত না। ঘুরেফিরে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সে এখনো বাসার একমাত্র যে জায়গাটিতে যায়নি, তা হলো ব্যালকনি। তাই দরজা খুলে ব্যালকনিতে এলো। বাসার একমাত্র



জায়গা এটি, যেখানে এসেই তার মন ভালো হয়ে গেল। ছয় ফুট চওড়া, বারো ফুট লম্বা ছাদঘরের মতো ব্যালকনিটিকে ছাদবাগান বলাই বেশি উপযুক্ত হবে। বিভিন্ন আকারের গামলায় বিভিন্ন রকমের ফুল ও গুল্ম লাগানো হয়েছে এখানে। প্রচণ্ড শীতেও তাদের হাষ্টপুষ্ট অবস্থা বলছে, তাদের পেছনে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করা হয়েছে। এখানে আশেপাশের ব্যালকনিগুলো থেকেও সে সবুজ লতাগুল্ম ও ফুলের ডগা উঁকি দিতে দেখছে। কিন্তু সালারের ব্যালকনির পরিবেশ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি সুন্দর।

লাউঞ্জের বড় বড় জানালাও এই ব্যালকনির দিকেই মুখ করা। জানালার ধারে, দেওয়ালের গা ঘেঁষে ব্যালকনির মেঝেতে একটি মাদুর পাতা রয়েছে। 'সে হয়তো এখানে এসে বসে থাকে। কিংবা রোদে শুয়ে থাকে। সম্ভবত উইকেভে।' আর নয়তো শীতকালে এই মাদুর পেতে রাখার কোনো কারণ ইমামার বুঝে এলো না। ব্যালকনির রেলিং ঘেঁষে একটি টুল পড়ে আছে। সে নিশ্চয় এখানে এসে বসে। আশেপাশে

তাকিয়ে দেখে। রেলিংয়ে মগের কিছু দাগও দেখা যাচ্ছে।
এখানে বসে চা অথবা কফি পান করে। কিন্তু কখন? নিশ্চয়
রাতে। ইমামা ভাবতে ভাবতে ঝুঁকে নিচে তাকাল। সে তৃতীয়
তলায় দাঁড়িয়ে আছে। নিচে ভবনের লন ও পার্কিং। একটু দূরে
কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তাও দেখা যাচ্ছে। এটি একটি
অভিজাত এলাকা, তাই রাস্তায় বেশি ভিড় নেই। ঘুরেফিরে
ইমামা পুনরায় ভেতরে চলে এলো।

রুমে এসে কাপড় পালটে সে এখন চুল আঁচড়াতে যাবে, এমন
সময় কলিংবেল বেজে উঠল। তৎক্ষণাৎ তার মাথায় নওশীনের
নামই এলো। কিন্তু দরজা খুলে দেখল রেস্টুরেন্টের এক
ডেলিভারি বয় দাঁড়িয়ে আছে।

: 'আমি অর্ডার করিনি।' ইমামার মনে হলো, ছেলেটি হয়তো
ভুল ঠিকানায় চলে এসেছে। প্রত্যুত্তরে ছেলেটি ঠিকানাসহ
সালার সিকান্দারের নাম পুনরাবৃত্তি করল। কয়েক মুহূর্তের জন্য
সে নিশ্চুপ হয়ে গেল। সালারের ব্যাপারে সে এতটাও উদাসীন

নয় যে, তার জন্য খানিক ইফতার বানাতেও ভুলে যাবে। ইমামা ভাবল, সালার হয়তো তার বাবা-মাকে আনতে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এয়ারপোর্টে পৌঁছার ব্যস্ততায় হয়তো তার কথাই মনে নেই তার। খাবারগুলো হয়তো তাদের জন্যই অর্ডার করেছে।

সে সালারকে কল করল। সালার সাথে সাথে রিসিভ করল। বলল, সে এখন এয়ারপোর্টে যাচ্ছে। রান্নাঘরে প্যাকেটগুলো রাখতে রাখতে এখন তার অভিমান ও

অসন্তুষ্টি একটু কমে এলো। ইমামা তাকে অর্ডারের কথা বলতেই সে বলল, 'আমি প্রায় সময় রাতের খাবার এখান থেকেই আনাই। খুব ভালো রান্না করে তারা।' সে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল। 'ভাবলাম, উনাদের নিয়ে বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণ তুমি না খেয়ে বসে থাকবে। তাই পাঠিয়ে দিলাম।'

ইমামা তাকে শুকরিয়া বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল, এই কাজ তার জন্য অনেক কঠিন। সালারকে এই একটি শব্দ বলতে তার মধ্যে এক অদ্ভুত সংকোচ কাজ করছে।

০৯

সালার সোয়া নয়টার দিকে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরল। কলিংবেলের শব্দে ইমামার অজান্তেই ভয় হতে লাগল। ভেতরে-ভেতরে সে সালারের পরিবারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। প্রতিবেশী হিসেবেও তাদের দুই পরিবারে অসম্ভব আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল। পরে এসব ঘটনা তো সেই আনুষ্ঠানিক সম্পর্ককেও শেষ করে দিয়েছিল। অনেক বছর আগে সিকান্দার উসমানের সাথে বলা কথাগুলো তার এখনো মনে আছে। সেই কালের জন্যই হয়তো এখন তার মনে এই ভয় চেপে বসেছে।

বাইরের দরজা খুলতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে, হাত কাঁপছে। তবু কাঁপা কাঁপা হাতেই সে দরজা খুলল। সিকান্দার উসমান ও বাকি দুজনও আন্তরিকভাবে তার সাথে দেখা করল। সে তাদের চেহারায যে রুক্ষতা ও অসন্তুষ্টি খুঁজে ফিরছিল, তৎক্ষণাৎ তা দেখতে পেল না। ফলে তার ভয় কিছুটা কমে এলো। তারপর সবাই মিলে ফোরকানের বাসায় রাতের খাবার খেল। ওখানে বসে খাবার খেতে খেতে তার ভয় আরও কিছুটা কমে গেল।

আনিতা ও তাইয়েবা, তারা দুজনেই খুব মনখুলে তার ও নওশীনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নওশীন ও ফোরকান, সালারের বাবা-মায়ের সাথে আগেও দেখা করেছে। তবে আনিতার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। তাদের উভয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু এখন তাদের ছেলে-মেয়ে। ইমামা একদম চুপচাপ মনোযোগী শ্রোতার মতো তাদের আলোচনা শুনছে। কারণ, সে চাচ্ছিল না, ফোরকানের বাসায় তাকে নিয়ে বা তার বিয়ে কোনো কথা হোক।

খাবার শেষে সালারের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো তারা। সিকান্দার ও তাইয়েবা সিটিং রুমে এসে বসলেন। তারা ইমামার সাথে কথা বলতে লাগলেন। ইমামা এই প্রথম তাদের বাচনভঙ্গিতে লুকানো দুশ্চিন্তা টের পেল। ইমামার পরিবার এই বিষয়টি নিয়ে এখন কী হাঙ্গামা করবে, সেই দুশ্চিন্তা। উনাদের দুশ্চিন্তা দেখে তার ভরসা পুনরায় উবে গেল। যদিও তারা ইমামার সামনে তার পরিবার ও হাশেম মুবিন সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে তারা অলিমা অনুষ্ঠান ইসলামাবাদ না করে লাহোরেই করতে চাচ্ছেন। উনারা এ ব্যাপারে সালারের মতামত শুনতে চাচ্ছেন। কিন্তু সে চুপ করে আছে। আলোচনাকালীন একটু পরপর দীর্ঘ নীরবতা নেমে আসছে। ইমামা বুঝতে পারল, তার জন্য তারা মনখুলে কথা বলতে পারছেন না। তাই সে ঘুমের বাহানা করে উঠে আসতে চাইল। জবাবে সিকান্দার উসমান বললেন, 'অবশ্যই বেটা, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সাহরির সময় উঠতে হবে তোমার। আমরা তো আরও কিছুক্ষণ গল্প করব।'

ইমামা উঠে রুমে চলে এলো। এই মুহূর্তে ঘুমানোটা খুব কঠিন। দুদিন আগেও সে যেসব আশঙ্কা নিয়ে ভাবেওনি; এখন সেগুলো নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে, সিকান্দার উসমান তাদের বিয়েটা গোপনই রাখতে চাচ্ছেন। যাতে হাশেম মুবিন তাদের ব্যাপারে জানতে না পারেন। সে দীর্ঘক্ষণ বিছানায় বসে বসে, এসব বিপদ ও আশঙ্কা নিয়ে ভাবতে থাকল। এই মুহূর্তে এই প্রথম তার উপলব্ধি হলো, তাকে বিয়ে করে সালার কত বড় বিপদ টেনে এনেছে। তাকে যে-ই বিয়ে করত, তারই বিপদ হতো। কিন্তু সালার সিকান্দারের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাকে বিয়ে করা মানেই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। 'হাশেম মুবিন সর্বোচ্চ কী করবেন?' ইমামা ভাবল। 'আমাকে আর সালারকে তো প্রাণে মেরে ফেলবেন না।' ইমামার মনে এখনো এই অন্ধবিশ্বাস আছে যে, তার পরিবার এটুকু ছাড় অবশ্যই দিবে। বেশির চেয়ে বেশি তাকে জোর করে তাদের সাথে নিয়ে যেতে চাইবে। তারপর সালারের থেকে তালুক নিয়ে অন্য কোথাও তার বিয়ে দিতে চাইবে। তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। সবকিছু হয়তো এত সহজ নয়,

যতটা সহজ সে মনে করছে; কিংবা মনে করার চেষ্টা করছে।
এটি নিছক পালিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করার মতো মামুলি
বিষয় নয়। এটি ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়। ভাবতেই তার পেটে যেন
মোচড় দিয়ে উঠল। সে আবারও বিছানায় এসে বসে পড়ল।

এবার এই প্রথম সালারকে বিয়ে করাটা তার ভুল মনে হতে
লাগল। সে ঘুরেফিরে আবারও সেই খাদের কিনারে এসে
দাঁড়িয়েছে, যে খাদ থেকে সে এতগুলো বছর পালিয়ে
বেড়িয়েছে।

: 'এখন কী হবে?' বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাইয়েবা বললেন।

: 'এখন হওয়ার আর বাকি আছে কী?' প্রত্যুত্তরে সিকান্দার
উসমান বললেন। তিনি ভালো করেই জানেন, তাইয়েবার
কথার ইঙ্গিত কোন দিকে।

: হাশেম মুবিন যদি জেনে ফেলে?

'এজন্যই তো তাকে বলেছিলাম, ইমামাকে লাহোরেই রাখতে, ইসলামাবাদে না আনতে। তাছাড়া পিএইচডির জন্য তো সালার আগামী বছর চলেই যাবে, ততদিন এসব ঢাকা দেওয়া সম্ভব।' চশমা খুলতে খুলতে সিকান্দার উসমান বললেন। তিনিও ঘুমানোর জন্য শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাইয়েবা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'আমার কাছে তো ইমামাকে একদম সাধারণ মেয়েই মনে হলো।'

: 'তোমার ছেলের চেয়ে ভালো।' সিকান্দার সাথে সাথে উত্তর করলেন। তাইয়েবা খানিক অসন্তুষ্ট হলেন।

: কেন? সালারের থেকে কীভাবে ভালো? তার তো কোনো তুলনাই হয় না। সত্যি করে বলেন তো, ওর মধ্যে কি এমন কিছু আছে, যার জন্য তার জন্য নয় বছর অপেক্ষা করেছে সে?

সিকান্দার হেসে উঠলেন।

: 'এভাবে হাসছেন কেন?' তাইয়েবা তেতে উঠলেন।

সিকান্দার উসমান সত্যিই এখন অনেক খুশিমনে আছেন।

: আমি সত্যিই খুশি। কারণ, আমার ছেলে অনেক খুশি। এত বছর পর তাকে এভাবে গল্প করতে দেখলাম। আমি জীবনে কখনো তার মুখে এমন খুশির ঝিলিক দেখিনি। ইমামার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে, আমার কাঁধ থেকে যেন এক বিশাল বোঝা নেমে গেছে। তার সামনে আমি কতটা লজ্জিতবোধ করতাম, তা তোমার ধারণা আছে!

তাইয়েবা চুপচাপ উনার কথা শুনলেন। মনে মনে তিনি অস্বীকার করলেন, সিকান্দার মোটেও ভুল কিছু বলছেন না।



ঘুমের মধ্যে সে তার দু-হাতে দড়ি বেঁধে তাকে টানছে। এত শক্ত করে বেঁধেছে যে, তার কবজি কেটে রক্ত ঝরছে। প্রতিটি টানেই সে ব্যথার প্রচণ্ডতায় অজান্তেই চিৎকার করে উঠছে। তাকে কোনো এক বাজারে, অসংখ্য মানুষের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দু-পাশে দাঁড়িয়ে মানুষেরা অটুহাসি হাসি হেসে তাকে ব্যঙ্গ করছে। অতঃপর তাকে রশি বেঁধে টানতে থাকা লোকটি পুরো শক্তিতে তাকে ছুড়ে মারল। সে হাঁটু গেঁড়ে সেই পাথুরে রাস্তায় খুবড়ে পড়ল।

! ইমামা! ইটস মি. উঠে পড়ো। সাহরির আর কিছুক্ষণ বাকি আছে।" সে আঁতকে উঠে বসল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেখল, সালার তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে নাড়া দিয়ে তাকে ডাকছে।

'সরি! আমি হয়তো তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' সালার দুঃখ প্রকাশ করল। ইমামা কতক্ষণ শূন্য মগজে তার দিকে তাকিয়ে

রইল। বিগত বছরগুলোতে সে এসব স্বপ্ন দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। স্বপ্নের সেই ধারাবাহিকতা এখনো বন্ধ হয়নি।

: 'কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন?' ইমামা কোলের ওপর হাত রেখে বসেছে। সালার তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করল। সালারের মনে হলো, সে এখনো ঘুমের ঘোরেই আছে। জবাবে ইমামা মাথা নাড়াল। তার মানে সে এখন সজাগই আছে।

: 'তুমি কম্বল ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?' সালার গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বলল। ইমামা চমকে বিছানায় কোণে কম্বলের দিকে তাকাল। সেটা ওভাবেই পড়ে আছে। ভাঁজ করা। সালারও নিশ্চয় রাতে ঘুমুতে আসেনি। এলে কম্বল জড়িয়ে দিত অবশ্যই। রুমের হিটার চালুই আছে। আর নয়তো ঠান্ডায় সে জেগে উঠত। 'জলদি আসো, কেবল দশ মিনিট বাকি আছে।' সালার তার হাতে পানির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে সে সিটিং এরিয়াতে এলো। এসে দেখল, সালার সাহরি করে ফেলেছে। এখন চা বানাচ্ছে। লাউঞ্জে বা কিচেনে আর কাউকে চোখে পড়ছে না। ডাইনিং টেবিলে তার জন্য আগেই প্লেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে 'আমি চা বানাচ্ছি।' ইমামা সাহরি না করে মগ বের করতে লাগল।

: 'তুমি নিশ্চিন্তে বসে সাহরি করো। আজান দিয়ে দেবো। আমি আমার জন্য চা বানাতে পারি। চাইলে তোমার জন্যও বানাতে পারব।' সালার তার হাত থেকে মগ রেখে, তাকে খেতে পাঠিয়ে দিল। ইমামা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

: বাকি সবাই ঘুমাচ্ছে?

: হ্যাঁ, একটু আগেই শুয়েছে। সারা রাত তো কথা বলছিলাম আমরা। হয়তো আমাদের কথার শব্দে তোমার ডিস্টার্ব হয়েছে।

: 'না, আমি ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম।' তার স্বর ভারী হয়ে আছে।
সালারের কাছে তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

: 'খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছ কি?' সে চায়ের মগ টেবিলে রেখে,
চেয়ার টেনে তার পাশে বসে পড়ল।

: 'স্বপ্ন!' সে চমকে উঠল। 'না, এমনি।' সে খেতে লাগল পুনরায়।
'সকালে কয়টায় নাশতা করবে তারা?' ইমামা প্রসঙ্গ পালটে
বলল। সালার হাসল।

: তারা! তারা কারা? এরা এখন তোমার নতুন পরিবার। মাম্মি,
পাপা বলে ডাকো তাদের। আর আনিতাকে আনিতা বলে।

ইমামা মনে মনে লজ্জা পেল। সে আসলেই কাল রাত থেকে
উনাদেরকে কেবল 'এরা, তারা' বলেই ডাকছে।

: 'নাশতা তো করবেন না। তবে ঘণ্টাখানেক পর উঠে যাবেন। দশটায় ফ্লাইট।' সালার তার লজ্জা টের পেয়ে প্রসঙ্গ পালটাল।

: 'সকাল নয়টায়! এত জলদিই কেন চলে যাচ্ছেন?' সে অবাক হলো।

: 'তোমাকে দেখতে এসেছেন তারা। আজ দুটায় পাপার একটা মিটিং আছে, আর আনিতা তো ছেলে-মেয়েকে বোয়ার কাছে রেখে এসেছে। তার ছোট মেয়ে মাত্র ছয় মাসের।' সালার বলে চলল। 'নাশতা করবেন না, তবে চা পান করবেন। বানিয়ে দিয়ো তুমি। আমি এখন নামাজ পড়েই চলে আসব। তারপর উনাদের সাথেই বের হব। উনাদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে, ওখান থেকেই অফিসে যাব।' বলতে বলতে সালার হাই চেপে, চায়ের খালি মগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইমামা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

: ঘুমাবে না তুমি?

: না, সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ঘুমাব।

: 'আজ ছুটি নিয়ে নিতে।' ইমামা পিঠাপিঠি বলল। সিন্ধের দিকে যেতে যেতে সালার পেছন ফিরে ইমামার দিকে তাকাল। তারপর আচমকাই হেসে ফেলল।

: ঘুমানোর জন্য অফিস থেকে ছুটি নিতাম? আমার পেশায় এমন নিয়ম নেই।

: 'রাতে তুমি ঘুমাওনি, এজন্য বলছিলাম।' ইমামা তার কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

: আমি টানা ৪৮ ঘন্টা করে না ঘুমিয়ে, কত কত দিন জাতিসংঘে কাজ করেছি। সেটাও প্রচণ্ড শীত ও গরমে, দুর্যোগপীড়িত অঞ্চলগুলোতে। আজ তো মনোরম পরিবেশে নিজের

অ্যাপার্টমেন্ট বসে, বাবা-মায়ের সাথে গল্প করেছি। আজ ক্লান্ত
হব কেন?

কথা বলতে বলতে বাইরে থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলো।

: 'এখন প্লিজ এই মগটাও ধুতে যেয়ো না। আমার প্লেট ধোয়া
এখনো বাকি। একসাথে ধুয়ে নেবা।' ইমামা তাকে চায়ের মগ
খালি করতে দেখে থামাল। সালার মগ থেকে টি-ব্যাগ বের করে
ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিল।

: 'ঠিক আছে, ধুয়ে নিয়ো।' সালার খুশিমনে মগ সিন্কেস ওপর
রেখে পেছন ফিরল। দেখল, ইমামা ঝুড়ির ঢাকনা খুলে সেখান
থেকে টি-ব্যাগ হাতে নিয়ে বিবর্ণ চেহারায় ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে
আছে। তাকে মূর্তির মতো এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে
সালার এক পলক তার দিকে তাকাল, তারপর তার চোখের
অনুসরণ করে ঝুড়ির দিকে।

'ওহ... নন অ্যালকোহল ড্রিংক।' বলেই সে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল। ইমামা মিছেমিছি লজ্জিত হলো। সালার ভেবেছিল, ইমামা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ময়লার বুড়ির ভেতরের আদা-বিয়ারের কৌটাটি দেখতে পাবে না। তবু সালার বুঝতে পেরেছিল, কী দেখে সে এমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে।

ইমামা 'আদা' পরে পড়েছিল। আগে পড়েছিল 'বিয়ার।' আর এটা সালার সিকান্দারের বাসা না হলে তার চোখ আগেই নন অ্যালকোহল-এর ওপরেই পড়ত। কিন্তু এখানে তার মন আপনা-আপনিই অপরদিকে চলে গিয়েছে। কারণ, সালারের ব্যাপারে তার সকল ধারণা আগে থেকেই নেতিবাচক। এবার ঝুঁকে টি-ব্যাগ ছুড়তে ছুড়তে সে নন অ্যালকোহল লেখাটিও কৌটার গায়ে পড়ে নিল। সে এখন তার লজ্জা কাটানোর চেষ্টা করছে। 'না জানি সালার এখন কী ভাবছে আমার ব্যাপারে!' ইমামা ভাবল। তাছাড়া সালারও থমকে গিয়েছিল। তারা একে

অপরের মাঝে যে সেতু বানানোর চেষ্টা করছে, তা কখনো এদিক থেকে ভেঙে পড়ছে, তো কখনো ওদিক থেকে।

সালার সর্বশেষ আট বছর আগে মদ পান করেছিল। কিন্তু সে এনার্জি এবং নন অ্যালকোহল ড্রিংক প্রায় প্রতিরাতেই পান করে। এতে তার কাজে চঞ্চলতা ফিরে পায়। ময়লার বুড়ির কাছে ইমামাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে সে এক মুহূর্তেই বুঝে গিয়েছিল, সেখানে কোন জিনিসটি তাকে এমন হতভম্ব করতে পারে!

সে কর্পোরেট জগতের মানুষ। যেসব পাটিতে সে যায়, সেখানে ড্রিংকস টেবিলে মদও থাকে। তাকে খেতে বললে সে না করে। তার না-করাতে বিগত আট বছরে কেউ এটা ভাবেওনি যে, সে মিথ্যা বলছে। কেননা, তারা কেউই নয় বছর আগের উশৃঙ্খল সালার সিকান্দারের সাথে পরিচিত না। কিন্তু একজন মানুষ, যে কেবল দুদিন আগে তার বাসায় এসেছে, তার কাছে সালারের যেকোনো কাজে সন্দেহ করার মতো উপযুক্ত ও পাকাপোক্ত

প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। 'এমন তো হবেই। আগে এমন উলটাপালটা কাণ্ড না করলে, তাহলে না বিশ্বাস করত। এখন যেহেতু অতীত নিদাগ নয়, সুতরাং তার বিশ্বাস অর্জন করতে একটু সময় তো লাগবেই।' বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে সালার সমস্ত অভিযোগ নিজের কাঁধে নিয়ে, ইমামাকে নিরপরাধ ঘোষণা করে গেল।

: 'তোমার কাপড় প্রেস করে দেব?' ইমামা বেডরুমে এসে জিজ্ঞেস করল। সালার তখন ড্রয়িংরুমে ওয়ারড্রোব খুলে কাপড় বের করছিল।

: 'না, আমার কাপড় তো প্রেস হয়েই আসে।' একটা হ্যান্ডার বের করতে করতে সে পেছন ফিরে মুচকি হাসল। ইমামার হঠাৎ কানের দুলের কথা মনে পড়ল।

: আমার কানের দুল দেখেছ কোথাও? আমি ওয়াশরুমে রেখেছিলাম। ওখানে পাইনি আরা।

: 'হ্যাঁ, আমি ওখান থেকে এনেছিলাম। ওটা ড্রেসিং টেবিলের উপর।' বলতে বলতে সালার দু-কদম এগিয়ে, কানের দুলাটি ইমামার দিকে বাড়িয়ে দিল।

: এটা পুরোনো হয়ে গেছে। আজ আমার সাথে বের হবে। তোমাকে নতুন একটা নিয়ে দেব।

ইমামা দুলা কানে পরতে পরতে থমকে গেল।

: মেডিকেলে অ্যাডমিশন পাওয়ার পর এটা আবু আমাকে দিয়েছিলেন। আমার কাছে এটা পুরোনো নয়। তোমার টাকা নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ইমামা পেছন ফিরে তাকানোর কষ্টটুকুও করল না। বেডরুমের দরজা খুলে সোজা বাইরে চলে গেল। সালার কয়েক সেকেন্ড সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এটা

ছিল ভালোবেসে প্রস্তাব করা, ইমামা সেটা মুখের ওপর ছুড়ে
মেরেছে। অন্তত সালার এটাই উপলব্ধি করল। ইমামার এই
উপলব্ধিটুকুও হলো না যে, ভালোবেসে করা এই প্রস্তাবকে সে
প্রয়োজন নিবারণী জিনিস বানিয়ে দিয়েছে। সে পুরুষ, প্রয়োজন
ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। সে নারী,
প্রয়োজন ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য করতে করতে জীবন
শেষ করে দেয়।

১১

ডাক্তার সিবতে আলি সেদিন ভোরেই সায়েদা আন্নার সাথে
দীর্ঘ আলাপ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি দু-তিন দিন পর
উনার খোঁজখবর নিতে ফোন করতেন। আজও হালপুরসি
করতেই ফোন করেছিলেন। উনার গলা শুনতেই তিনি ফেটে
পড়লেন। ডাক্তার সিবতে আলি অবিশ্বাস্যভাবে উনার কথা
শুনতে লাগলেন। সায়েদা আন্নার কোনো কথাই তিনি বুঝতে
পারছিলেন না। তাই অস্থির হয়ে ইমামাকে ফোন করলেন।

ইমামার জল্পনা-কল্পনাতেও ছিল না যে, সায়েদা আন্না সত্যি সত্যি সবকিছু ডাক্তার সাহেবের কাছে বলে দিবেন। আর সেটাও এত জলদি!

ডাক্তার সিবতে আলি তার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করেই প্রশ্ন করলেন, 'সায়েদা আপা আমাকে বললেন যে, আপনার নাকি সালারের প্রতি কিছু অভিযোগ আছে।' উনাকে অসম্ভব চিন্তিত লাগছিল। ইমামার গলা একেবারে শুকিয়ে গেল। তার বুঝে এলো না, সে স্বীকার করবে, নাকি অস্বীকার? তার নীরবতা ডাক্তার সিবতে আলিকে আরও চিন্তিত করে দিল।

: আর সালার আপনার সাথে কোন প্রথম স্ত্রীর কথা আলোচনা করে?

ইমামা আপনা-আপনিই ঠোঁট কামড়াতে লাগল। তার মাথা কোনো কাজ করছে না। সে সালারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগকে, সালারের ঢুটি বলেই পুনরাবৃত্তি করতে চাচ্ছিল।



কিন্তু সমস্যা হলো, সে ডাক্তার সিবতে আলির সাথে এতটাও খোলামেলা না। সে চাইলেও সায়েদা আন্নার সাথে যা কিছু বলেছিল, সেসব উনার কাছে বলতে পারবে না। সায়েদা আন্নার কাছে বলার সময় সে কিছু কিছু বাড়িয়েও বলেছিল। এখন সে বুঝতে পারছে না, সায়েদা আন্না তার কোন কথাটি উনার কাছে কীভাবে বলেছেন। তার ধারাবাহিক নীরবতা সিবতে আলিকে আরও চিন্তিত করে দিল।

: বেটা! যা কিছু হয়েছে, আমাকে বলুন। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

: আব্বু! সে আমাকে খুব এড়িয়ে চলে। আমার সাথে ঠিকমতো কথা বলে না।" সে সাহস করে বলতে শুরু করল। দুই বাক্য বলার পর সবকিছু ভুলে গেল। যা কিছু মনে ছিল, তা সে তাকে বলতে পারবে না। 'সালার একদিনও তার পোশাকের প্রশংসা করেনি। তার সাথে বসে সাহরি করেনি। ইফতার করেনি। অফিস থেকে দেরি করে ফিরে। সকালে তাকে না বলেই চলে যায়।

এতদিন ধরে তাকে ফোরকানের বাসার খাবার খাওয়াচ্ছে।
বিয়ের পরদিনই সে তাকে সায়েদা আম্মার বাড়িতে রেখে চলে
এসেছে'-এসব উনাকে বলার মতো না।

ডাক্তার সিবতে আলি তার অভিযোগ দুটি নিয়ে চিন্তা করে
বললেন, 'সে আপনার সাথে আরও বিয়ের কথা আলাপ
করেছে?' ইমামা কয়েক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়াল। সে জানে, সে
সায়েদা আম্মার কাছে মিথ্যা বলেছে। আর এটাই সেই মিথ্যা,
যা সায়েদা আম্মাকে সবচেয়ে বেশি রাগিয়ে তুলেছে।

: না, সায়েদা আম্মা হয়তো কোথাও ভুল বুঝেছেন। এমন কিছু
তো নেই।' সে লজ্জিত মুখেই খণ্ডন করল। অপর পাশে সিবতে
আলি স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন।

: 'পরশু আপনাকে সায়েদা আম্মার ওখানে কেন রেখে
গিয়েছিল?' তিনি অপর অভিযোগ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে
সরাসরি বললেন। 'আমাদের বাসায় যখন ছিলেন, তখন তো

ওখানে থাকার কোনো ইচ্ছা ছিল না আপনার। পথে কি আপনাদের মাঝে কোনো ঝগড়া হয়েছে?" এখন তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করলেন, যার উত্তর হ্যাঁ বা না-তে দেওয়া যায়।

: জি।

: 'আমার বুঝে আসছে না...'। তিনি বলতে বলতে থেমে গেলেন। ইমামা ও সায়েদা আম্মা সালারের যে রূপ তুলে ধরছে, তা উনার কাছে একদম নতুন। 'ঠিক আছে, আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার এখানে চলে আসুন। সালারকেও ইফতারে ডেকে নেব। তখন আমি তার সাথে কথা বলে নেব।'

ইমামা অজান্তেই চোখ বন্ধ করে নিল। এই জিনিসটিই সে চাচ্ছিল না। আর এটিই হতে চলেছে এখন।

: 'সে ইদানীং অনেক দেরি করে অফিস থেকে ফিরে। কাল রাতেও নয়টায় ফিরেছে। হয়তো আজকে আসতে পারবে না সে।' ইমামা নিচু গলায় বলল।

: 'আমি কল করে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি।' ডাক্তার সাহেব বললেন।

: 'জি।' সে বহু কষ্টে বলল। 'যে আপনার কথায় চোখ বন্ধ করে একটা অজানা-অচেনা মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে, সে আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে কীভাবে অফিসে বসে থাকবে?' ইমামা মনে মনে ভাবল।

সে জানে, সিবতে আলি কী উত্তর পাবেন। কল কেটে সে আনমনে নখ খুঁটতে লাগল। সালারের প্রতি তার অভিযোগ ছিল, তা ঠিক। কিন্তু সে এটাও চায়নি যে, বিয়ের চতুর্থ দিনেই সালারকে নিয়ে এমন বিচার বসুক।



: 'হ্যালো সুইটহার্ট!' পাঁচ মিনিট পর সে তার ফোনে সালারের ঝলমলে গলা শুনল। তখন সে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে লাগল। 'ঘুম থেকে জেগে অন্তত একটা মেসেজই করতে। কল দিতে। ঘুম থেকে উঠেই বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি হতে শুরু করবে?' সালার এখানকার পরিস্থিতি না জেনেই তাকে জ্বালাতন করছিল। সালারের এমন নির্বোধ আন্তরিকতা দেখে ইমামার অপরাধবোধ আরও বেড়ে গেল। ডাক্তার সাহেব নিশ্চয় তাকে এত কিছু বলেননি। শুধু ইফতারের দাওয়াতের কথাই বলেছেন। এদিকে সালার ফোনে বলেই চলছে, 'ডাক্তার সাহেব একটু আগেই ইফতারে দাওয়াত দিলেন। আমি উনাকে বলেছি, আজ আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসব। তোমাকেও সাথে নিয়ে যাব।'

ইমামা এবার একটা আশার আলো দেখতে পেল। 'সালার আগে অ্যাপার্টমেন্টে এলে তার সাথে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারতাম।

দুঃখ প্রকাশ করে ডাক্তার সাহেবের বাসায় আজ কী হতে চলেছে, সেসব জানিয়ে দিতাম।" ভাবতে ভাবতে ইমামা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। 'হ্যাঁ, এটা হতে পারে।' সে সিদ্ধান্ত নিল।

: 'কিন্তু তুমি যদি আগেই যেতে চাও, তাহলে তোমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেই?' সালার পরের বাক্যেই তাকে প্রস্তাব দিল।

: 'না, না। আমি তোমার সাথেই যাব।' ইমামা আপনা-আপনি বলে উঠল।

: 'ওকে। আমি তাহলে উনাকে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তুমি কী করছ এখন?' ইমামার বলতে ইচ্ছা করল, সে তার জন্য খোঁড়া গর্ত থেকে এখন নিজে বাঁচার চেষ্টা করছে। 'ফোরকানের বুয়া আসবে আজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে। সাধারণত তো সে আমি অফিসে আসার পরপর সকালেই চলে আসে। কিন্তু এখন তুমি ঘুমাচ্ছ বলে তাকে আপাতত সকালে আসতে নিষেধ করে

দিয়েছি। তুমি ভাবিকে কল করে জিজ্ঞেস করো, উনি তাকে কখন পাঠাবেন?" সালার হয়তো অফিসে অবসর আছে এখন। তাই এতক্ষণ কথা বলছে।

: কিছু তো বলো জান! এত চুপ কেন?

: : 'না...ওহ... আমি... এমনিই।' ইমামা তার প্রশ্নে ইতস্তত হলো। 'তুমি এখন ফ্রি আছ?' সে অসম্ভব সতর্ক ভঙ্গিতে বলল। সালার অবসর থাকলে সে এখনই তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল।

: 'হ্যাঁ, ইন্ডালুয়েশন টিম চলে গেছে। অন্তত আজকের দিনটা আমরা নিশ্চিত। তারা ভালো মন্তব্যই করে গেছে।' সালার অত্যন্ত নিশ্চিত্তে তাকে বলে চলছিল। এদিকে ইমামা, তার কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছে না। কীভাবে ওই বিষয়টি শুরু করা যায়, ভেবে দ্বিধাশ্রিত হচ্ছে।

: 'ডাক্তার সাহেব আজ দাওয়াত না করলে, আমি ভেবেছিলাম রাতে বাইরে কোথাও খেতে যাব। ফোর্ট্রেসে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সিবিশন চলছে, সেখান থেকে ঘুরে আসব। আচ্ছা চলো, আমরা উনার বাসা থেকে ডিনার করেই ওখানে ঘুরতে যাব।' সালার বলে চলল। ইমামার আজ বুঝে এলো, 'আঁজলা ভরতি পানিতে ডুবে মরা' প্রবাদটি মানুষ কেন বলে। এটা শুধু প্রবাদ হিসেবেই বলে না। সত্যিই কিছু কিছু পরিস্থিতিতে মরার জন্য আঁজলা ভরতি পানিও যথেষ্ট নয়। সে এখন কথা শুরুর বাহানা খুঁজছে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবে, কিছুই বুঝে আসছে না তার।

: 'ঠিক আছে, আমি তাহলে ডাক্তার সাহেবকে একটু জানিয়ে দেই। নয়তো তিনি অপেক্ষা করবেন।' ইমামা কিছু বলার আগেই সালার কথা শেষ করে কল কেটে দিল। ইমামা ফোন হাতে নিয়ে বোকার মতো বসে রইল।



সালার আনুমানিক চারটার দিকে অ্যাপার্টমেন্টে এলো। ততক্ষণে ইমামা ভেবে নিয়েছে, তার সাথে কীভাবে কথা বলবে। সালার উপরে উঠল না। কল করে তাকে নিচে নামতে বলল। ইমামা নিচে নামতেই সালার গাড়ির দরজা খুলে দিল। পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে মাথা দুলিয়ে তাকে স্বাগত জানাল। সালার তখন ফোনে অফিসের কারও সাথে কথা বলছিল। হ্যান্ডস-ফি কানে লাগিয়ে কথা বলতে বলতে সে গাড়ি চালাতে লাগল। এদিকে ইমামার প্রাণ ওষ্ঠাগত। 'সে যদি পুরো রাস্তা এভাবেই কথা বলে?' একটি সিগন্যালে খানিক থামতেই ইমামা পেছন থেকে সালারের কাঁধে আলতো চাপড় দিল। বিরক্ত চেহারায় তাকে কল রাখার জন্য ইশারা করল। সাথে সাথে ফল হলো। আরও কয়েক মিনিট কথা বলেই সালার কল কেটে দিল।

: 'সরি, এক ক্লায়েন্টের একটু সমস্যা হচ্ছিল।' সে কল কাটতেই বলল। 'ইসলামাবাদ যাবে?'



তার পরের বাক্যটি শুনে ইমামার মাথায় যেন বাজ পড়ল। সে
যা কিছু বলবে ভেবে

এসেছিল, সবকিছু মাথা থেকে উধাও হয়ে গেল।

: 'ইসলামাবাদ?' ইমামা অবিশ্বাস্য চোখে সালারের দিকে
তাকাল।

: 'হ্যাঁ, আমি এই সপ্তাহে যাচ্ছি।' সালার অত্যন্ত স্বাভাবিক
ভঙ্গিতে বলল।

: 'কিন্তু আমি, আমি, আমি কীভাবে যেতে পারি?' সে অজান্তেই
আটকাল। 'তোমার পাপা তোমাকে নিষেধ করে গিয়েছেন,
আমাকে নিয়ে ইসলামাবাদ না যেতে। তবু?'

সালার তার কথা থামিয়ে দিল।

: 'হ্যাঁ, এখন সেই তিনিই বলছেন যে, তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে, নিয়ে যেতে।' সালার নেহায়েত সাবলীল গলায় বলল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমার পরিবার জেনে যেতে পারে।' দীর্ঘ নীরবতার পর অবশেষে ইমামা বলল।

: 'আজ হোক বা কাল, একদিন তো জানবেই।' সালার একই ভঙ্গিতে বলল। 'তোমাকে সারা জীবন লুকিয়ে রাখব, এটা তো সম্ভব নয়।' এবার সে গম্ভীর হয়ে গেল। 'তোমার পরিবার তোমার ব্যাপারে মানুষকে বলেছে যে, তুমি বিয়ে করে বাইরে সেটেল হয়ে গিয়েছ। এখন এত বছর পর তোমাকে কিছু করতে চাইলে, তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়বে। তাই আমার মনে হয় না যে, তারা কিছু করবে।' কথা বলতে বলতে সালারকে একদম নিশ্চিত দেখাচ্ছে।

: 'তাম তাদেরকে চিনো না। জানতে পারলে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। ইমামা চিন্তিত হতে লাগল।

: সেখানে মাঝে মাঝে যাব। চুপচাপ যাব, আবার চলেও আসব।
ওখানে গিয়ে তো
সবার সাথে ঘুরে বেড়াব না, ইয়ার!

তার এমন নিশ্চিন্ততা দেখে ইমামার রাগ হলো।

: 'তারা জানতে পারলেই আমাকে নিয়ে যাবে। তারা আমাকে
মেরে ফেলবে। ইমামা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল।

: মনে করো ইমামা, তারা ঘটনাক্রমে জেনে গেল, কিংবা
এখানেই কেউ তোমারে দেখে ফেলল, তোমার কোনো ক্ষতি
করতে চাইল, তাহলে?

: 'জানতে পারবে না। আমি কখনো বাইরেই যাব না।' সে অজান্তেই বলে চলল।

: এভাবে থাকলে তো তোমার দমবন্ধ হয়ে যাবে!

ইমামা চমকে সালারের দিকে তাকাল। তার চোখে মাসিহের মতো সহমর্মিতা দেখতে পেল।

: 'এতটুকু নিশ্বাস নিয়ে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে সালার! এতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি যখন চাকরি করতাম না, তখন মাসের পর মাস ঘর থেকে বের হতাম না। এত বছর ধরে আমি লাহোরে আছি, অথচ আমি এখানকার বাজার, পার্ক ও রেস্টুরেন্টগুলো কেবল রাস্তায় চলতে চলতে গাড়িতে বসে দূর থেকে দেখেছি, কিংবা টিভিতে বা খবরের কাগজে। এখন আমি যদি ওসব জায়গায় যাই, তাহলে আমি বুঝতে পারছি না, ওখানে গিয়ে আমি কী করব। মূলতানে যখন ছিলাম, তখনো আমার জীবনে হোস্টেল ও কলেজ ছাড়া আর কোনো জায়গা

ছিল না। এখন লাহোরে এসে, এখানেও প্রথমে ইউনিভার্সিটি ও বাসা, আর এখন শুধুই বাসা। এর বাইরে দুনিয়ার সব জায়গা আমার কাছে এখন অদ্ভুত লাগে। মাসে একবার সায়েদা আম্মার সাথে, বাড়ির পাশে একটি ছোট্ট মার্কেটে যেতাম। সেটাই ছিল আমার একমাত্র আউটিং বা বহিঃস্রমণ। সেখানে একটি বুকশপ ছিল। এক মাসের জন্য বই কিনে নিতাম ওখান থেকে। সারা মাস সেগুলো পড়তাম। বইয়ের সাথে সময় কাটানো খুব সহজ।" ইমামা জানে না, তাকে কেন এসব বলে চলছে।

: হ্যাঁ, সময় কাটানো সহজ, কিন্তু জীবন কাটানো নয়।

সালারের প্রত্যুত্তরে ইমামা পুনরায় ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। দেখল, সে মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে।

: তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, সালার!

: 'আমার যায়-আসে। অনেক যায়-আসে।' সালার অবচেতনে তার কথা খণ্ডন করল। 'আমি একটা স্বাভাবিক জীবন কাটাতে চাই। যেমনটা স্বাভাবিক কখনো ছিল তোমার জীবন। তুমি চাও না এই সবকিছু শেষ হয়ে যাক?' বলতে বলতে সালার তাকে প্রশ্ন করল।

: অস্বাভাবিক জীবনই হোক, নিরাপদ তো আছি।

সালার অজান্তেই তার কাঁধে বাহু ছড়িয়ে দিল।

: 'তুমি এখনো নিরাপদই থাকবে, ট্রাস্ট মি; আমাকে বিশ্বাস করো, কিছুই হবে না। আমার পরিবার তোমাকে নিরাপত্তা দিবে। সেই সক্ষমতা তাদের আছে। কী ভাবছ?' সালার বলতে বলতে তার নীরবতা লক্ষ করল।

: 'তোমাকে বিয়ে করা ঠিক হয়নি আমার। কাউকেই বিয়ে করা ঠিক ছিল না। আমার বিয়ে করাই উচিত হয়নি। আমার সাথে

এখন তোমাকেও বিপদে ফেলে দিলাম। এটা ঠিক হয়নি।
ইমামা অসম্ভব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

: 'হ্যাঁ, তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করলে সেটা বাস্তবিকই অন্যায়
হতো। কিন্তু আমার ব্যাপার ভিন্ন। আমি তো বেশ আগে থেকেই
তোমার পরিবারের গালাগাল, বদদোয়া মাথা পেতে নিয়েছি।
এখন করলেও মেনে নিলাম।' সে নেহায়েত উদাসীনভাবে বলে
চলল।

: 'তাহলে কি তোমার সিট বুক করে দেব?'

সালার আসলেই প্রচণ্ড একগুঁয়ে। ইমামা চুপ করে বসে রইল।

১৩

সালারের কাছে আজ ডাক্তার সিবতে আলি ও তার স্ত্রীকে বেশ
গম্ভীর মনে হচ্ছে। এই গম্ভীরতার কোনো কারণ তার বুঝে

আসছে না। ইমামাও খেতে খেতে কোনো কথা বলল না। সে ভাবল, গাড়ির বিষয়টা নিয়ে দুশ্চিন্তা করেই হয়তো চুপ আছে। খাবার শেষে সে লাউঞ্জে বসে চা পান করছে। সেই সময় সিবতে আলি ওই প্রসঙ্গ টানলেন।

: সালার, আপনার প্রতি ইমামার কিছু অভিযোগ আছে।

সে চায়ের ঢোক গিলতে গিলতে থমকে গেল। এই কথাটি যদি ডাক্তার সিবতে আলি না বলে অন্য কেউ বলত, তাহলে একে সে রসিকতা মনে করত। সে খানিক অবাক চোখে উনার দিকে তাকাল। তারপর তার মুখোমুখি বসা ইমামার দিকে। ইমামা তখন হাঁটুর উপর চায়ের কাপ রেখে, চায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। সালারের মাথা

প্রথমে গাড়ির আলোচনার দিকে গেল। 'কিন্তু ইমামা কখন গাড়ির কথাগুলো উনাকে বলল?' সে অসম্ভব হতভম্ব হলো।

: 'জি!' সালার কাপ পুনরায় পিরিচে রাখতে রাখতে বলল।

: 'ইমামা আপনার আচরণে অসন্তুষ্ট।' ডাক্তার সিবতে আলি পরবর্তী বাক্য বললেন। সালারের মনে হলো, তার হয়তো শুনতে কোথাও ভুল হচ্ছে।

: 'জি!' সে অজান্তেই বলল। 'আমি বুঝতে পারিনি।'

: আপনি কি ইমামাকে উপহাস করেন?

সালার একদৃষ্টে ডাক্তার সিবতে আলিকে দেখতে থাকল। বহু কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত পর ইমামার দিকে তাকাল।

: 'আপনাকে এগুলো ইমামা বলেছে?' সালার অবিশ্বাস্যভাবে ইমামার দিকে তাকিয়ে বলল।

: হ্যাঁ, আপনি তার সাথে ঠিকমতো কথা বলেন না।

সালার ঘাড় ফিরিয়ে আবারও ইমামার দিকে তাকাল। সে এখনো চোখ নামিয়ে বসে আছে।

: 'এটাও আপনাকে ইমামাই বলেছে?' সালারের মাথায় যেন বাজ পড়ছে। ডাক্তার সিবতে আলি মাথা নাড়লেন। সালার অবচেতনেই ঠোঁটের এক কোণ কামড়াতে কামড়াতে চায়ের কাপ টেবিলে রেখে দিল। তার মাথা যেন পুরোপুরি গুলিয়ে গেল। এটা তার জীবনের সবচেয়ে দুশ্চিন্তাময় পরিস্থিতিগুলোর একটি।

ইমামা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। লজ্জা, আফসোস তার চোখেমুখে। তারপর সে সালারকে বলতে শুনল, 'আর...?'

যা কিছু হচ্ছে তা ইমামার প্রত্যাশা ছিল না, নিবুন্ধিতা। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, তির ধনুক থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

: 'আর আপনি কোথাও গেলে তাকে বলে যান না। পরশু ঝগড়া করে তাকে সায়েদা আপনার বাড়িতে রেখে আসছেন।'

সালার এবার প্রথমে কুলসুম আন্টির দিকে তাকাল, তারপর ডাক্তার সিবতে আলির দিকে, তারপর ইমামার। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও এমন মনে হতো না, যেমনটা মনে হচ্ছে এখন।

: 'ঝগড়া? আমার সাথে তো কোনো ঝগড়া হয়নি!' সে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল। 'আর ইমামা, ইমামা নিজেই আমাকে বলেছিল, সে সায়েদা আমাদের বাড়িতে থাকতে চায়। আর বিগত চার দিন ধরে তো আমি...'। সে কথা বলতে বলতে

থেমে গেল। কান্নার শব্দ তার কানে এলো। তাকিয়ে দেখল, ইমামা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করতে করতে নাক ঘষছে। কুলসুম আন্টি আর ডাক্তার সাহেবও এবার তার দিকে মনোনিবেশ করলেন। সালার কথা চালিয়ে যেতে পারল না।

কুলসুম আন্টি উঠে তার পাশে এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সালার হতভম্ব হয়ে বসে রইল। ডাক্তার সিঁবতে আলি বুয়াকে পানি আনতে বললেন। সালার এর কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা বা ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সে চুপচাপ বসে ইমামার দিকে তাকিয়ে রইল, আর ভাবতে থাকল, আমি আসলেই একটা বলদ। আর নয়তো চার দিন ধরে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বারবার যে সংকেত দিচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কেন বুঝতে পারলাম না? কেন ইচ্ছা করেই সুধারণাবশত বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলাম?

পাঁচ-দশ মিনিট পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব প্রায় আধাঘণ্টা তাকে বোঝালেন। সে চুপচাপ মাথা নেড়ে উনার কথা শুনতে থাকল। এই অবস্থা দেখে ইমামার প্রচণ্ড লজ্জা অনুভূত হচ্ছিল। এখান থেকে উঠে একাকী সালারের মুখোমুখি হওয়া তার কাছে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে, এটি তার চেয়ে ভালো করে আর কেউ বুঝবে না।

আধাঘন্টা পর তারা উনার বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। ডাক্তার সিবতে আলির বাসা থেকে গাড়ি বের হতেই ইমামা তাকে বলতে শুনল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' সালারের মুখ থেকে এমন কিছু বের হবে, এটাই ইমামা প্রত্যাশা করছিল। সে জানালা গলে বাইরের রাস্তায় চোখ জমিয়ে বসে বসে ক্রমশ ভীত হচ্ছে।

: আমি তোমাকে উপহাস করি, তোমার সাথে ঠিকমতো কথা বলি না, তোমাকে না বলেই চলে যাই, তোমাকে সায়েদা আম্মার বাড়িতে ফেলে এসেছি, ঝগড়া করেছি। তুমি মানুষের কাছে মিথ্যা বলছ?

ইমামা অবচেতনেই তার দিকে তাকাল। 'মিথ্যা' শব্দটি ব্যবহার না করলে হয়তো তার এতটা খারাপ লাগত না। তাই সে প্রতিরোধ করল।

: আমি মিথ্যা বলিনি।



: 'আমি তোমাকে কটাক্ষ করি?' সালারের কথায় গতি চলে এলো।

: 'সেদিন রাতে তুমি আমার অন্ধকারে ঘুমানোর অভ্যাসকে 'অদ্ভুত' বলেছ।

সে অবিশ্বাস্য চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

: ওটা কটাক্ষ ছিল? ওটা তো আমি এমনি বলেছিলাম।

: 'কিন্তু আমার ভালো লাগেনি।' সে মুখ ফসকে বলে ফেলল।

: তুমিও তো আমার আলোতে ঘুমানোর অভ্যাসকে 'অদ্ভুত' বলেছিলে।

ইমামা এবার চুপ করে রইল। সালার এখন সত্যিই খুব রেগে যাচ্ছে। 'আর আমি তোমার সাথে ঠিকমতো কথা বলি না?' সে পরের অভিযোগে এলো।

: 'আমার এমন মনে হয়েছে।' ইমামা এবার প্রতিরোধের ভঙ্গিতে বলল।

: 'মনে হয়েছে!' সালার আরও রেগে গেল। 'তোমার কাছে কেবল মনে হয়েছে, আর তুমি সোজা ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে বলে দিয়েছ?'

: 'আমি উনাকে কিছু বলিনি। সায়েদা আন্মা বলেছেন সব।' ইমামা ব্যাখ্যা করল। সালার কয়েক মুহূর্ত যন্ত্রণায় কিছু বলতে পারল না।

: তার মানে তুমি উনাকেও সবকিছু বলেছ?

ইমামা চুপ করে রইল। সালার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। এখন সে সেদিন রাতে সায়েদা আম্মার এড়িয়ে চলার কারণ বুঝতে পারল।

: 'আর আমি কোথায় যাই যে, যেখানে যাওয়ার আগে তোমাকে বলে যাই না?' সালারের আরেকটি বিষয় মনে পড়ল।

: সাহরির সময় তুমি আমাকে বলে গিয়েছ?

সালার তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

: 'ইমামা! তখন আমি ফোরকানের সাথে মসজিদে যাই। তারপর জিমে গিয়ে আবারও বাসায় চলে আসি। এখন মসজিদেও তোমাকে বলে যেতে হবে?' সে বিরক্ত হলো।

: 'আমি কীভাবে বলব, এত ভোরে তুমি কোথায় যাও। আমার কাজ তো শুধু দূশ্চিন্তা করা।' ইমামা বলল। তার ব্যাখ্যা শুনে সে আরও রেগে গেল।

: আচ্ছা তোমার কী মনে হয়, রমজান মাসে আমি সাহরি করে কোথায় যেতে পারি? কোনো নাইট ক্লাবে? নাকি কোনো গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে? একটা মূর্খও বুঝতে পারবে যে, আমি কোথায় যাই।

ইমামা 'মূর্খ' শব্দটি শুনে তেতে উঠল।

: ঠিক আছে, আমি সত্যিই মূর্খ। হয়েছে?

: 'আর সায়েদা আম্মার বাড়িতে থাকার কথা তো তুমিই বলেছিলে। বলেছিলে না? আর কোন ঝগড়াটা হয়েছে আমাদের?' ইমামা চুপ করে রইল। সালার বলে চলল, 'এত মিথ্যা বলার কী দরকার ছিল?'

তার কথা শুনে এবার ইমামার চোখ টলমল করে উঠল।

: বারবার 'মিথ্যা মিথ্যা' করো না।

: 'ইমামা! যেটা মিথ্যা, সেটাকে আমি মিথ্যাই বলব। তুমি ডাক্তার সাহেবের সামনে আমাকে মুখ দেখানোর যোগ্য রাখোনি। কী কী ভাবছেন তিনি আমার ব্যাপারে!' সালার সত্যিই প্রচণ্ড চিন্তিত। 'আচ্ছা, এসব শেষ করো এখন।' সালার ইমামার গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখে বলল। সে প্রচণ্ড বিরক্ত হলো। 'আমরা এখন যে বিষয়ে কথা বলছি, এখানে কান্নাকাটি করার কোনো সুযোগ নেই, ইমামা!' ইমামা কাঁদতেই থাকল।

: এটা ঠিক না ইমামা! তুমি ডাক্তার সাহেবের বাসায়ও এটাই করেছিলে আমার সাথে। তুমি কান্নাকাটি করতেই আমি আর কিছু বলতে পারিনি।

সালারের রাগ কমে গিয়েছে। কিন্তু অস্থিরতা বেড়ে চলছে। যা কিছু হয়েছে, এটা বিয়ের চতুর্থ দিন। এদিকে ইমামা এক ঘণ্টার ভেতরে এখন দ্বিতীয়বার হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। ইমামার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে এভাবে কান্না করলেও সে চিন্তায় পড়ে যেত। এটা তো ইমামা। তার প্রিয়তমা। সালার অবচেতনেই নরম হয়ে গেল। তার কাঁধে বাহু ছুঁয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। ইমামা মাথা তুলে ড্যাশ বোর্ড থেকে টিস্যু নিয়ে তার রক্তিম নাকে টিস্যু ঘষল। তারপর সালারের সন্ধিতে পানি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'এজন্যই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি। আমি জানতাম, তুমি আমার সাথে এমন ব্যবহার করবে।'

তার কথা শুনে সালার এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। সে তার কাঁধ থেকে হাত সরাতে সরাতে বলল, 'কেমন ব্যবহার? একটু খুলে বলবে?' তার কথার সুরে আবারও অভিমান নেমে এলো। 'অবশেষে আমি কী করেছি তোমার সঙ্গে?'



ইমামা আবারও হেঁচকি তুলে কান্না করতে লাগল। সালার নিরুপায় হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে এখন ড্রাইভিংয়ে না থাকলে নিঃসন্দেহে মাথাও চেপে ধরত। বাকি রাত্তায় দুজনের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। কিছুক্ষণ পর ইমামাও কান্না থামিয়ে দিল। সালার এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।



অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেও দুজনের মধ্যে কোনো কথা হলো না। ইমামা বেডরুমে না গিয়ে লাউঞ্জ রুমেই এক সোফায় বসে পড়ল। সালার বেডরুমে চলে গেল। সে পোশাক পালটে বেডরুমে এসে দেখল, ইমামা এখনো ভেতরে আসেনি। 'ঠিক আছে। কিছুক্ষণ একা একা বসে নিজের আচরণ নিয়ে একটু ভাবা উচিত তারা' সালার বিছানায় শুতে শুতে ভাবল। সে ঘুমাতে চাচ্ছে। তার অভ্যাসমতো লাইটও অফ করেনি। কিন্তু ঘুম একেবারে তার চোখ থেকে উধাও হয়ে গেল। 'ঠিক আছে, ভাবা উচিত, তাই বলে

এত কী ভাবার আছে?' আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন ইমামা এলো না, সালার তখন বিরক্ত হলো। আরও দু-মিনিট অপেক্ষা করে সে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

সালার লাউঞ্জে এসে দেখে, ইমামা এখনো সোফার এক কোণে বসে আছে। দু-পা উপরে তুলে, কোলে একটি বালিশ চেপে। সালার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এখন অন্তত কান্না তো করছে না। সালার লাউঞ্জে এসেছে, সে মাথা তুলেও দেখল না। সে কোলে বালিশ নিয়ে তার সুতা টানছে। সালার তার পাশে সোফায় এসে বসল। সে বসতেই ইমামা বালিশ একপাশে রেখে উঠে যেতে লাগল। সালার তার বাহু ধরে তাকে থামাল।

: 'এখানেই বসো।' সে ধমকের সুরে বলল। ইমামা এক মুহূর্তের জন্য বাহু ছাড়ানোর কথা ভাবল। তারপর ইচ্ছা বদলে ফেলল। সে পুনরায় বসে গেল। কিন্তু তার বাহু থেকে সালারের হাত সরিয়ে দিল।

: 'আমার কোনো ভুল নেই। তবু আই অ্যাম সরি।' সালার সমাধানে আসার প্রথম প্রচেষ্টা করল। ইমামা বিরক্তি ভরে তার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। সালার কিছুক্ষণ তার জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর বুঝতে পারল, ইমামার আপাতত তার সরি অ্যাকসেপ্ট করার কোনো ইচ্ছাই নেই।

: 'তোমার এমন কেন মনে হলো, আমি তোমার সাথে ঠিকমতো কথা বলি না, ইমামা? আমি তোমাকে বলছি।' সালার তার নীরবতা দেখে বলল।

: 'তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ।' এক মুহূর্ত পর অবশেষে সে বলল।

: 'এড়িয়ে চলা?' সালার হতভম্ব হয়ে গেল। 'আমি তোমাকে এড়িয়ে চলেছি? এটা আমি করতে পারি?' সে অবিশ্বাস্যভাবে বলল। ইমামা তার দিকে তাকাল না।

: তুমি এটা কীভাবে ভাবলে? এড়িয়ে চলার জন্য বিয়ে করেছি তোমাকে? তোমাকে এড়িয়ে চলার জন্য আমি এতগুলো বছর তোমার পেছনে অপদস্থ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি?

: 'কিন্তু তুমি তা করছ।' সে এখনো তার কথায় অনড়। 'তুমি মুখে এক কথা বলো, কিন্তু তুমি.....।' সে বলতে বলতে থেমে গেল। তার চোখ টলমল করে উঠল। 'তোমার জীবনে আমার কোনো.... কোনো মূল্যই নেই।'

: 'থামলে কেন? বলো। আমিও জানতে চাই, কী এমন করছি আমি, যার জন্য আমার ব্যাপারে তোমার মনে এত এত ভুল ধারণা জন্মে নিচ্ছে।' সে তার চোখের সিক্ততা এড়িয়ে অসম্ভব গম্ভীরভাবে বলল। 'আমি ভোরে মসজিদে যাওয়ার সময়

তোমাকে বলিনি, অফিসে যাওয়ার সময়ও বলিনি, আর?"
সালার তাকে আলোচনা শুরু করার ইঙ্গিত দিল।

: 'তুমি আমাকে এটাও বলোনি যে, ইফতারে তুমি দেরি করে
আসবে। তুমি ইচ্ছা করলে তো আগেও আসতে পারতো'
ইমামা থামল।

: 'আর?' সালার কোনো ব্যাখ্যা না করেই বলল।

: 'তোমার কথামতো আমি তোমাকে মেসেজ করেছি। কিন্তু
তুমি আমাকে কল করোনি। তোমার বাবা-মাকে এয়ারপোর্ট
থেকে আনতে বা পৌঁছে দিতে আমাকেও সাথে নিয়ে যেতে
পারতো। কিন্তু তুমি আমাকে বলোনি। ঠিক আছে, আমি
বলেছিলাম আমাকে সায়েদা আন্নার বাড়িতে রেখে যাও, কিন্তু
তুমি একবারও আমাকে সাথে নিয়ে আসার কথা বলোনি। উনার
সামনে আমার কতটা অসম্মান হয়েছে এতে।' অশ্রুসিক্ত চোখে
সে বলে চলছে।

সালার অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পানি এখন তার চোখ থেকেই নয়; নাক থেকেও গড়াতে শুরু করেছে। সে মন উজাড় করে কান্না করছে। সালার সেন্টার টেবিলের টিস্যু বক্স থেকে একটি টিস্যু নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিল। ইমামা হাত ঝাড়া দিয়ে তা সরিয়ে ফেলল। সামনে ঝুঁকে নিজেই একটি টিস্যু নিয়ে নিল। টিস্যু দিয়ে সে নাক ঘষতে লাগল, চোখ নয়।

: 'আর?' সালার অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করল। জবাবে ইমামা বলতে চাচ্ছিল, সে তাকে বিয়ের কোনো উপহারও দেয়নি। এটিও ছিল তার একটি কষ্টের জায়গা। কিন্তু এখানে উপহারের কথা উল্লেখ করাটা লজ্জাজনক বিষয়। তাই সেটির কথা বলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ নাক ঘষতে ঘষতে, হেঁচকি তুলে কান্না করতে থাকল। অবশেষে সালার তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এতটুকুই? নাকি আরও কোনো অপরাধ আছে?'

: আমি জানতাম, বিয়ের পর তুমি আমার...।

সালার তার কথা থামিয়ে দিয়ে বাকিটুকু নিজেই বলল, '... সাথে এমনটাই করবে।' আর আমি এও জানি যে, তুমি সবকিছু আগে থেকেই জেনে যাও। সালার তার কথায় এখন অনেক রেগে গিয়েছিল। তবু সে নিজেকে শান্ত করে বলল, 'এখন কি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া যাবে?'

ইমামা চুপচাপ তার নাক ঘষতে থাকল।

: বিয়ের পরদিন আমি যদি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি আসতে পারতাম, তাহলে চলে আসতাম। আজকে তো আসছি জলদি।

: 'তোমার বাবা-মাকে আনার জন্য তো ঠিকই চলে এসেছিলে।' ইমামা হস্তক্ষেপ করল।

: 'সেদিন আমার প্রেজেন্টেশন ছিল না। আর আমি তোমাকে কলও করোছলাম। একবার নয়; কয়েকবার। তুমি তোমার ফোন দেখো। নাকি আমি দেখাব?' সালার চ্যালেঞ্জের সুরে বলল।

: আমি মেসেজ করার সাথে সাথে তো করোনি, তাই না!

: 'তখন আমি মিটিংয়ে ছিলাম। ফোন আমার কাছে ছিল না। বোর্ডরুম থেকে বেরিয়ে প্রথম কলটি তোমাকেই করেছিলাম। রিভিস করা তো দূরের কথা, তুমি ফিরেও তাকাওনি। সায়েদা আম্মার বাড়িতেও আমি তোমাকে কল করেছি। তখনো তুমি রিসিভ করোনি। উলটো ফোন বন্ধ করে দিয়েছ। তাহলে আমারও তো রাগ করা উচিত ছিল। আমার বলা উচিত ছিল, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ। কিন্তু আমি তো এমনটা করিনি। এ নিয়ে তো আমি চিন্তাও করিনি।' সালার এখন তাকে গম্ভীরভাবে বোঝাচ্ছে।

'তোমাকে সাথে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাওয়া তো সম্ভব ছিল না। এয়ারপোর্ট একদিকে, মাঝখানে আমার অফিস, অপরদিকে আমার বাসা। তোমাকে নিতে হলে আগে আমাকে এখানে আসতে হতো। তারপর এয়ারপোর্টে যেতে হতো। দ্বিগুণ সময় লাগত। তাছাড়া এয়ারপোর্টে গিয়ে উনাদের রিসিভ করা তোমার জন্য জরুরি কিছু ছিল না।' সালার এক মুহূর্ত থেমে পুনরায় বলল, 'এখন আমি আমার অভিযোগগুলো বলব?' ইমামা চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। 'তুমি সায়েদা আম্মার বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনটুকুও মনে করোনি।'

ইমামার চোখে এবার নতুন জোয়ার এলো। 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ওখানে থাকতেই দিবে না। কিন্তু তুমি তো আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলে। তুমি আমাকে একবারও চলে আসতে বলোনি।'

সালার অবচেতনেই দীর্ঘ শ্বাস নিল।

: 'আমি কি জানতাম? আমি ভেবেছিলাম তুমি থাকতে চাচ্ছ। তোমার চাওয়া পূরণ করা উচিত। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে চলে আসার জন্য বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু খোদা হাফেজ বলার জন্য হলেও তো তোমার বাইরে আসা উচিত ছিল। আমি পনেরো মিনিট পর্যন্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তুমি এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে আসার কষ্টটুকুও করোনি।

: আমি রেগে ছিলাম, তাই আসিনি।

: রেগে থাকলেও তো, কিছু লৌকিকতা তো থাকে।

ইমামা নিশ্চুপ রইল।

'তুমি ফোরকানকে নিয়ে জেদ করেছিলে, আমি যেন ওখানে না যাই। অনর্থক জেদ। আমার খারাপ লেগেছে। কিন্তু আমি

তোমাকে তাদের বাসায় যেতে বাধ্য করিনি।" সালার এক মুহূর্ত থামল। 'ফোরকান আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফোরকান আর ভাবি সবসময় আমার খেয়াল রেখেছে। এখন এটা আমি মানতে পারি না যে, আমার স্ত্রী তাদেরকে সম্মান করবে না।' সালার তার চোখে ঘনায়মান আরেকটি অশ্রু প্লাবনকে উপেক্ষা করে বলল। ইমামা এবার কোনো ব্যাখ্যা দিল না। সালার বলে চলল, 'আমি তোমাকে এই অভিযোগও করিনি, তুমি আমার বাবা-মাকে একবার কল করেও জিজ্ঞেস করেনি যে, তারা ঠিকমতো পৌঁছেছেন কি না। কিংবা তাদের ফ্লাইটে কোনো গড়বড় হয়েছে কি না।' সালার অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে বলে চলল। ইমামা হতাশ হলো।

: আমার কাছে উনাদের নম্বর নেই।

: তাদের সাথে কথা বলার ইচ্ছা থাকলে আমার থেকে নিয়ে নিতো। তারা তোমার জন্য এখানে এসেছিলেন। তোমার তো এতটুকু দায়িত্ব ছিল যে, তাদের ফ্লাইট কেমন ছিল, অন্তত

সেটাই জিজ্ঞেস করা। অথবা তারা চলে যাওয়ার পর তাদের সাথে কথা বলতে।

: তো তুমি আমাকে বলে দিতে। বলোনি কেন?

: 'আমি বলিনি, কারণ এটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। এটা সাধারণ বিষয়। এটা এমন কোনো বিষয় নয় যে, যার জন্য আমি তোমার ওপর রাগ করব, কিংবা ঝগড়া করে বেড়াব।' ইমামা কিছুই বলতে পারল না। সালার বলে চলল, 'কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধে ঠিকই মামলা সাজিয়ে ফেলেছ। সমস্ত ছোট-বড় বিষয় জমাতে শুরু করেছ। আমার কাছে কোনো অভিযোগ করোনি। কিন্তু সায়েদা আম্মার কাছে গিয়ে সবকিছু বলে এসেছ। এমনকি ডাক্তার সাহেবকেও। অন্য কারও কাছে বলার আগে, তোমার আমার কাছে বলা দরকার ছিল। বলা দরকার ছিল কি না?'

ইমামার কান্না এখন কমতে শুরু করেছে। সালার তাকে অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে বুঝিয়ে চলছে, 'তখন আমি যদি তোমার কথা না মানতাম, তাহলে অন্য বিষয় ছিল। তখন কোনো দিক থেকেই আমার কোনো আপত্তি থাকত না।' ইমামা চুপ করে রইল। সালার একদম ভুল কিছুও বলছে না। 'তুমি ঘুমিয়ে না থাকলে, আমি অবশ্যই তোমাকে বলেই যেতাম। কিন্তু এখন আমি একটা ঘুমন্ত মানুষকে কোথায় যাচ্ছি, সেটা বলার জন্য জাগিয়ে তুলব? এটা তো আমি কখনোই করতে পারব না।' প্রত্যুত্তরে ইমামা কিছুই বলতে পারল না। 'আর এড়িয়ে চলা? আমি অবাক হচ্ছি যে, এই ভাবনা তোমার মাথায় কীভাবে এলো! তোমাকে পাওয়ার খুশিতে, এই চার দিন ধরে আমি যেন সপ্তম আকাশে আছি; আর তুমি বলছ আমি তোমাকে এড়িয়ে চলি!'

: 'কিন্তু তুমি একবারও আমার প্রশংসা করেনি।' ইমামার হঠাৎ সালারের আরও একটি ভুলের কথা মনে পড়ল। সালার চমকে তার দিকে তাকাল।



: 'কীসের প্রশংসা?' সে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। সালারের এই প্রশ্নটি ছিল অসম্ভব বোকামিপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নটি ইমামাকে লজ্জায় ফেলে দিল।

: 'এখন এটাও আমি বলে দেব?' ইমামা প্রচণ্ড রেগে গেল।

: 'তোমার সৌন্দর্যের?' সালার কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে অনুমান করল। ইমামা আরও রেগে গেল।

: 'আমি কখন বললাম যে, সৌন্দর্যের প্রশংসা করো? কোনো একটা জিনিসেরই প্রশংসা করতে। আমার পোশাকের করতে।' ইমামা বলে ফেলল। কিন্তু এই অভিযোগ করে সে আফসোস করতে লাগল। সালারের প্রত্যুত্তরমূলক প্রশ্ন তাকে প্রচণ্ড লজ্জায় ফেলেছে। সালার এক পলক তাকে, তারপর তার পোশাকের দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আনমনেই হাসল।

: 'ইমামা! তুমি নিজেই আমাকে তোমার প্রশংসা করতে বলছ?' সালার হাসতে হাসতে বলল। এটা তার কাছে নিছক রসিকতা মনে হলো। ইমামা ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল।

: করো না। আমি কখন করতে বলছি!

: 'নো, ইউ আর রাইট। তুমি ঠিক বলেছ। আমি আসলেই এখনো তোমার কোনো বিষয়ে প্রশংসা করিনি। করা উচিত ছিল আমার।' সালার পুরোপুরি গম্ভীর হয়ে গেল। ইমামার লজ্জা সে আঁচ করতে পারল।

তারপর ইমামার কাঁধে বাহু ছড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। ইমামা এবার তার হাত ঝাড়া দিল না। তার কান্না এখন থেমে গিয়েছে। সালার অপর হাতে তার হাতটি মুঠোয় পুরে নিল। তারপর আলতো করে তার হাতে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'এসব অভিযোগ সেখানেই হয়, যেখানে কেবল কয়েক দিন সাথে থাকার বিষয়। কিন্তু যেখানে সারা জীবনের ব্যাপার,

সেখানে এসব তুচ্ছ।' সালার তাকে বাহুডোরে বেঁধে কোমল স্বরে বোঝাতে লাগল।

: 'তোমাকে বিয়ে করাটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ আছেও। কিন্তু ভবিষ্যতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ থাকবে কিনা, সেটি নির্ভর করবে তোমার ওপর। আমার প্রতি কোনো অভিযোগ থাকলে, সেটা আমাকে বলো; অন্যকে নয়। আমি কেবল তোমার কাছেই জবাবদিহি করব, অন্য কারও কাছে নয়।' সালার তাকে পরিমিত ও সংযত ভাষায় অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করল। 'আমাদের মাঝে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। তবে বন্ধুর থেকে বেশি আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল আমাদের সম্পর্কে। তাহলে বিয়ের বন্ধন সেই আন্তরিকতাকে নষ্ট কেন করছে?'

ইমামা চোখ তুলে এক পলক তাকে দেখল। সে সালারের চোখেও সেই গাভীর্য দেখতে পেল, যা ছিল তার শব্দে। সে পুনরায় চোখ নামিয়ে ফেলল। 'সালার ভুল কিছু বলছে না।' তার

মন এ কথাটির সাক্ষ্য দিল। এদিকে সালার বলে চলল, 'তুমি আমার জীবনে প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি বস্তুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' সালার তার শব্দগুলোতে জোর দিয়ে দিয়ে বলল। 'কিন্তু এই কথাটি আমি প্রতিদিন তোমাকে বলতে পারব না। তার মানে এই নয় যে, আমার কাছে তোমার গুরুত্ব কমে গিয়েছে। আমার জীবনে তোমার গুরুত্ব এখন আমার হাতে নেই। তোমার হাতে। এটা তুমিই সিদ্ধান্ত নিবে যে, সময়ের সাথে সাথে এই গুরুত্ব তুমি বাড়াবে, নাকি কমাবে?'

তার কথা শুনতে শুনতে ইমামার দৃষ্টি সালারের সেই হাতের পিঠে পড়ল, যে হাত সে আলতো করে তাকে বুলিয়ে দিচ্ছে। সালারের হাতের পৃষ্ঠ অসম্ভব পরিচ্ছন্ন। তাতে পশম নেই বললেই চলে। হাতের আঙুলগুলো কোনো শিল্পীর আঙুলের মতো সুস্নিগ্ধ ও সরু। সাধারণ পুরুষদের হাতের চেয়ে পাতলা। তার হাতের পিঠে সবুজ ও নীল রংগুলো স্পষ্টভাবে ভেসে আছে। কবজিতে ফুটে আছে থামা ঘড়ির হালকা দাগ। সে নিশ্চয় নিয়মিত ঘড়ি পরিধান করে। ইমামা আজ এই প্রথম তার

হাত এত গভীরভাবে দেখছে। হাতগুলো তার অনেক ভালো লাগছে। তার মন আরও কিছুটা বিগলিত হলো। তার ধ্যান এখন কোথায়, সালার তা বুঝতে পারল না। সে তাকে ওভাবেই গভীরভাবে বুঝিয়ে চলছে। 'ভালোবাসা বা বিয়ের উদ্দেশ্য এটা নয়, দুজন দুজনকে হাতের মুঠোয় বন্দি করে রাখবো। এতে সম্পর্ক দৃঢ় হয় না, বরং দম বন্ধ হয়ে আসে। একে অপরকে ছাড় দেওয়া, একে অপরের ব্যক্তিগত অবস্থানকে মেনে নেওয়া, একে অন্যের স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।' ইমামা ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। সে এখন অসম্ভব গভীর হয়ে আছে।

'আমরা যদি সবসময় একে অপরের দোষ-ত্রুটি ও সংকীর্ণতা খুঁজে বেড়াই, তাহলে খুব দ্রুত আমাদের মন থেকে একে অপরের প্রতি সম্মান ও ভক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবো। সম্পর্কে যতই ভালোবাসা থাকুক না কেন, সেখানে যদি সম্মান ও ভক্তি না থাকে, তাহলে সেই ভালোবাসাও শেষ হয়ে যায়। এ দুটো জিনিস ভালোবাসার ঘরের চারটি দেওয়াল। আর চারটি

দেওয়াল ভেঙে গেলে ঘর রক্ষা করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।
ইমামা হতভম্ব চোখে তার দিকে তাকাল। সালার তার চোখে
হতভম্বতা দেখে মুচকি হাসল। 'সুন্দর একটা দর্শন, তাই না?'

ইমামার চোখে পানি ও ঠোঁটে হাসি, দুটোই একসাথে এলো।
সে সম্মতিতে মাথা নাড়াল। সালার তাকে আরও কাছে টেনে
নিয়ে বলল, 'আমি আল্লাহর নিখুঁত বান্দাই হতে পারিনি, তাহলে
তোমার নিখুঁত স্বামী হব কীভাবে, ইমামা! আল্লাহ হয়তো
আমার ভুলগুলো মাফ করে দেবেন। তাহলে তুমিও মাফ করে
দিয়ো।'

ইমামা হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে
সত্যিই এই সালার সিকান্দারকে চেনে না। এই সালার তো সেই
সালার নয়। সালার তার চোখের ফোলা পাপড়ি আঙুলের ডগা
দিয়ে স্পর্শ করতে করতে বলল, 'কী অবস্থা করে ফেলেছ
তোমার চোখের! আমার প্রতি দয়া হয় না তোমার! সে অত্যন্ত
মমতা মিশিয়ে বলল। প্রত্যুত্তরে ইমামা তার বুকে মাথা গুঁজে

দিল। সে এখন অসম্ভব শান্ত হয়ে আছে। সালার একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, অপর হাতে তার মুখে ও গলায় ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে, এই প্রথম লক্ষ করল, কান্নার পর তাকে আরও বেশি সুন্দর লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে এই কথা বলা, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতোই। তার দিকে ইমামার এখন কোনো মনোযোগ নেই। সে তার গায়ের আঁটোসাঁটো নাইট শার্টের প্যাটার্নে আঙুল বোলাচ্ছে।

: 'মভ কালারে তোমাকে খুব মানায়।' সালার ভীষণ রোমান্টিক ভঙ্গিতে তার জামার দিকে তাকিয়ে বলল। তার বুকে দৌড়াতে থাকা ইমামার হাত ছুট করে থেমে গেল। সে মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। সালার তার চোখে অভিমান দেখে মুচকি হাসল। বলল, 'তোমার প্রশংসা করছি।'

: এটা টি-পিংক কালার।

: 'ওহ, আচ্ছা।' সালার বিচলিত হয়ে তার জামার দিকে পুনরায় তাকাল। 'এটা টি-পিংক? আমি আসলে অনেক দিন যাবৎ কাউকে মভ কালার পরতে দেখিনি, তাই।' সালার অজুহাত পেশ করল।

: 'কী? গতকালই তো মভ কালার পরেছিলাম আমি।' ইমামার চোখে অভিমান খানিকটা বেড়ে গেল।

: 'কিন্তু আমি তো ওটা পার্পল কালার মনে করেছিলাম।' সালার দ্বিগুণ বিচলিত হলো।

: 'সামনের দেওয়ালে যে পেন্টিংটা দেখতে পাচ্ছ, ওটার ফুলগুলো পার্পল কালার।' ইমামা কিছুটা ধৈর্যশীলতা দেখানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সালার এবার ওই পেন্টিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে তাকে এটা বলতে পারল না যে, পেন্টিংটা মূলত সে ব্লু কালার মনে করেই কিনে এনেছিল।

ইমামা এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সালার কিছুটা অসহায়ভাবে গভীর নিশ্বাস নিল।

: 'আমার মনে হয়, এই বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে হলে, এখন থেকে পকেটে একটি রং চেনার শেডকার্ড নিয়ে ঘুরতে হবে।' সালার পেইন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়াল।

১৪

আজই প্রথম সালারের আগেই জেগে উঠল সে। অ্যালার্ম বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি। কয়েক মিনিট এভাবেই বিছানায় পড়ে রইল। বুঝতে পারছে না, এখন রাতের কোন প্রহর। হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম ঘড়ি কাছে টানল। তাতে সময় দেখে, অ্যালার্ম বন্ধ করে দিল। তারপর সতর্কভাবে বিছানায় উঠে বসল। অতি সন্তর্পণে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে স্যান্ডেল খুঁজল। সেগুলো পায়ে পরে আবারও লাইট অফ করে দিল।



ঠিক তখনই সালারের পাশের আলো জ্বলে উঠল। সে কখন সজাগ হয়েছে, ইমামা বুঝতে পারল না।

: 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘুমাচ্ছ।' ইমামা সালারের সালামের জবাব দিয়েই বলল।

: 'শব্দ পেয়ে আমি এখনই উঠেছি।' সালার ওভাবেই শুয়ে শুয়ে তার ফোন দেখতে লাগল।

: 'কিন্তু আমি তো কোনো শব্দ করিনি। আমি তো চেষ্টা করছিলাম যাতে তোমার কোনো ডিস্টার্ব না হয়।' ইমামা খানিক অবাক হলো।

: 'আমার ঘুম খুব পাতলা, ইমামা! রুমে সামান্য শব্দ হলেই আমি জেগে উঠি।' সালার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফোন সাইড টেবিলে রাখল।

বলল। : 'আচ্ছা, আমি এখন থেকে খেয়াল রাখব।' ইমামা
কিছুটা দুঃখপ্রকাশ করে।

: 'প্রয়োজন নেই। এমন অল্প ঘুমিয়ে আমার অভ্যাস আছে।
এতে আমার কোনো সমস্যা হয় না।' সে পাশ থেকে আরেকটি
বালিশ নিয়ে মাথার নিচে রেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল।
ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে ইমামা কয়েক মুহূর্ত তার দিকে
তাকিয়ে রইল। প্রতিটি মানুষ একেকটি বই; খোলা কিতাব। যে
বইটি যে-কেউ পড়তে পারে। সালারও তার জন্য একটি খোলা
বই। কিন্তু সেটি চাইনিজ ভাষায় লিখিত। আর ইমামা চাইনিজ
ভাষা পড়তে অক্ষম।

অবশেষে আজ তারা একসাথে সাহরি করল। প্রতিদিনের মতো
সালার ফোরকানের সাথে বাইরে গেল না। সে হয়তো বিগত
কয়েক দিনের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছে। রাতেই ইমামার মন
ভালো হয়ে গিয়েছিল। এখন সালারের এই বাড়তি মনোযোগ

তাকে আরও বেশি উৎফুল্ল করে দিল। মসজিদে যাওয়ার সময়
এই প্রথম তাকে বলে গেল।

: 'ইমামা! আমার অপেক্ষায় থেকো না। নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে
পড়ো। আমি বেশ দেরি করেই আসব।' সালার যেতে যেতে
তাকে তাগাদা দিল। কিন্তু সে তার তাগাদা উপেক্ষা করে,
অপেক্ষায় বসে রইল।

সালার এসে কিছুক্ষণ বাসায় থেকে সাড়ে আটটায় অফিসের
জন্য বের হলো। ইমামা তাকে বিদায় দিয়ে ঘুমাতে গেল।
দ্বিতীয়বার যখন তার চোখ খুলল, তখন এগারোটা বাজে।
কলিংবেলের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। চোখ কচলে বাইরে এসে
দরজা খুলতেই সে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সি এক মহিলাকে
দেখতে পেল। মহিলাটি তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে
সালাম করল।

: 'আমাকে নওশীন সাহেবা পাঠিয়েছেন।' সে তার পরিচয় দিল।
ইমামার হঠাৎ মনে পড়ল, নওশীনদের বুয়া গতকাল রুম
পরীক্ষার করতে এসেছিল। কিন্তু সালার তাকে আজ আসতে
বলেছে। ইমামা তাকে জায়গা করে দিয়ে দরজা থেকে সরে
দাঁড়াল।

: 'এত খুশি হয়েছি! নওশীন সাহেবা যখন বললেন, সালার
সাহেবের বউ চলে আসছে। আমি তো জানিই না, কবে বিয়ে
করল সালার সাহেবা।' ইমামার পেছন পেছন আসতে আসতে
পরিচারিকার কথা শুরু হয়ে গেল।

: 'কোথেকে পরীক্ষার করতে শুরু করবে তুমি?' ইমামা হুট
করে বুঝে উঠতে পারল না, তাকে পরীক্ষার করার জন্য কী কী
নির্দেশনা দিবে।

: 'সাহেবা! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি করে নেব। আপনি
চাইলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।' বুয়া তৎক্ষণাৎ তাকে

প্রস্তাব করল। এটা হয়তো সে ইমামার চোখভরতি ঘুম দেখেই বলেছে।

: না, তুমি লাউঞ্জ থেকে কাজ শুরু করো। আমি এখনই আসছি।

প্রস্তাবটা মন্দ ছিল না। তার সত্যিই খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু সে তাকে এভাবে একা রুমে কাজে লাগিয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারে না।

ওয়াশরুমে এসে ইমামা মুখে পানির ঝাপটা দিল। কাপড় পালটে চুল বেঁধে লাউঞ্জে চলে এলো। এসে দেখে পরিচারিকা তখন ঝাড়ু দিচ্ছে। জানালার পর্দাগুলো সরানো। সূর্য এখনো পুরোপুরি ওঠেনি। কিন্তু কুয়াশা প্রায় কেটে গিয়েছে। লাউঞ্জের জানালা থেকে ব্যালকনির গাছগুলো দেখে তার পানি দেওয়ার কথা মনে পড়ল। পরিচারিকা আবারও কথা শুরু করতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে ইমামাকে ব্যালকনির দিকে যেতে দেখে চুপ হয়ে গেল। এদিকে ইমামা গাছে পানি দিয়ে এসে দেখল,

পরিচারিকা ইতিমধ্যে লাউঞ্জ পরিষ্কার করে, সালারের বেডরুমে চলে এসেছে; যে রুমটিকে সালার স্টাডি রুম হিসেবে ব্যবহার করে।

: 'সালার সাহেব অনেক ভালো মানুষ।' দেড় ঘণ্টায় পুরো অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার হয়ে গেল। ইমামা তাকে চায়ের কথা বলল। চা পান করতে করতে পরিচারিকা আবারও কথা বলতে শুরু করল। তার মন্তব্যে ইমামা কেবল মুচকি হেসেই ক্ষান্ত রইল। কোনো উত্তর করল না।

: 'আপনিও কি উনার মতো বেশি কথা বলেন না?' পরিচারিকা তার ব্যাপারে এই প্রথম তার ধারণা প্রকাশ করল।

: 'আচ্ছা, সালারও বেশি কথা বলে না?' ইমামা ইচ্ছা করেই একে আলোচনার বিষয়বস্তু বানাল।

: 'কোথায় আর বলে! হামিদও সাহেবের ব্যাপারে এই কথাই বলে।' সে হয়তো সালারের হামিদ নামক কোনো পরিচারকের নাম বলল। 'কিন্তু সাহেবা! আপনার স্বামী বড় লজ্জাশীল। উনার চোখে প্রচণ্ড হায়া।'

এটি শুনে ইমামা যেন হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরিচারিকা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথা বলে চলছে। 'ফোরকান সাহেবের মতোই, সালার সাহেবের চরিত্র। ফোরকান সাহেবের তো আল্লাহ দিলে ছেলে-মেয়ে আছে। সালার সাহেব তো একাই থাকতেন এখানে। আমি তো কখনোই এমন একা পুরুষের ঘরে কাজ করি না। খারাপ দুনিয়া দেখেছি আমি। কিন্তু এখানে এতদিন ধরে কাজ করি, সালার সাহেব চোখ তুলেও কখনো আমাকে দেখেননি। আমি অনেকবারই ভেবেছি, বড়ই সৌভাগ্যবতী হবে, যে এই ঘরে বউ হয়ে আসবো।' পরিচারিকা গড়গড় করে বলে চলছিল। আর হিটারের পাশে সোফায় আধশোয়া হয়ে ইমামা যেন কোনো ভাবনায় হারিয়ে যাচ্ছে। পরিচারিকা অবাক হলো, সাহেবা তার

স্বামীর প্রশংসা শুনে খুশি হলো না কেন?' সাহেবা আর কী খুশি হবে, সালারের প্রতি তার এতটুকু প্রত্যাশা তো ছিল ই যে, আর যা-ই হোক; বাসার কাজের মহিলার সাথে সে অন্তত জড়াতে তো পারে না। তারা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পুরুষ, যারা বাসার কাজের মহিলার ওপরও খারাপ নজর রাখে। সালার অন্তত এ ধরনের পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ইমামার এমন ধারাবাহিক নীরবতা দেখে পরিচারিকা তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়ল। ইমামা তাকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করতে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে মহিলাটি বলতে লাগল, 'সাহেবা! কাল একটু তাড়াতাড়ি চলে আসব আপনার বাসায়?'

ইমামা থমকে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে নিশ্চয় এমন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল, যা দেখে পরিচারিকা ঘাবড়ে গিয়েছে। 'সাহেবা! আমার ছোট বাচ্চাটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য বলছিলাম।' মহিলাটি সাথে সাথে বলল। 'আচ্ছা ঠিক আছে।' ইমামা যেন বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে এলো।

কাল তাড়াতাড়ি চলে আসবে, এই আবেদনটি তাকে স্তব্ধ করেনি। তাকে স্তব্ধ করেছে এই দুটি শব্দ-'আপনার বাসা'। এটাই তার বাসা, তার স্বপ্নের ঘর, যার জন্য আনসারের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে গিয়েছে। সে অবিশ্বাস্য চোখে বাসার দেওয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। যার আশায় সে এতগুলো বছর অপদস্থ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। দুনিয়া যাকে এখন 'তার বাসা, তার ঘর' বলে পরিচয় দিচ্ছে, এটা সত্যিই এখন তার ঘর। এটা কোনো আশ্রয়স্থল নয়, যেখানে সে এতগুলো বছর কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে থেকেছে। অশ্রুর একটি ঢল নেমে এলো তার চোখজুড়ে। মাঝে মাঝে মানুষ বুঝতে পারে না, সে কাঁদবে নাকি হাসবে? কাঁদলে, কতটুকু কাঁদবে? হাসলে, কতটুকু হাসবে? সেও এখন তেমনই এক অবস্থা পার করেছে। সে বাচ্চাদের মতো দৌড়ে দৌড়ে বাসার এক রুম থেকে আরেক রুমে যাচ্ছে। সে এখন এই বাসার প্রতিটি রুমেই যেতে পারে। যা ইচ্ছা করতে পারে। কারণ, এটা এখন তার ঘর। এখানে কোথাও যেতে তার কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সে শুধু

নিজের জন্য এতটুকু পৃথিবীই চেয়েছিল। এমন একটি আপন পৃথিবী। এমন একটি জায়গা, যেখানে সে অধিকার নিয়ে থাকতে পারবে। সালার যেন একেবারে কোথাও আড়ালে পড়ে গেল এই বিষয় থেকে। ঘরের বিষয়ে মূলত নারীর কাছে সব পুরুষই এমন পেছনে পড়ে যায়।

সালার তাকে একটু পরপর দুবার কল করল। কিন্তু ইমামা রিসিভ করল না। তৃতীয়বার সালার ল্যান্ড লাইনে কল করল। ইমামা এবার রিসিভ করল। তার গলা শুনতেই সালার বুঝে গেল, সে কান্না করছে। তার গলা ভারী মনে হলো। সালার প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেল।

: কী হয়েছে?

: 'কিছু না।' ইমামা যেন তার কান্না ও গলার অস্বাভাবিকতা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে।



: কান্না করছ কেন?

সালার সত্যিই বুঝতে পারল না, সে কান্না কেন করছে। রাতে তো সব ঝগড়াই সুন্দরভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। সকালে সে তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বিদায়ও দিল। আর এখন? সালার যেন সব গুলিয়ে ফেলছে। অপরদিকে ইমামার বুঝে আসছিল না, সে তাকে কান্নার কারণ কী বলবে! তাকে এটা তো বলতে পারবে না যে, কেউ তাকে 'ঘরওয়ালি বা মালকিন' বলেছে। এর মর্ম সালার বুঝতে পারবে না। শুধু সালার নয়, কোনো পুরুষই এটি বুঝতে পারবে না।

: আন্সু-আব্বুর কথা মনে পড়ছে।

সালার অবচেতনেই একটি দীর্ঘশ্বাস নিল। এই কারণটি তার কাছে যৌক্তিক ও বোধগম্য মনে হলো। সে একদম নিশ্চিত হলো। এপাশে ইমামা একদম নিশ্চুপ। বাবা-মায়ের কথা বলেছে, মিথ্যা বলেছে, এখন কান্নার জন্য যেন নতুন একটি

কারণ পেয়ে গিয়েছে সে। থামতে থাকা অশ্রু, আবারও ঝরতে শুরু করল। সালার কতক্ষণ চুপচাপ তার ফোঁপানি ও হেঁচকি শুনতে থাকল।

সালার ওই বিদেশি ব্যাংকে ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে। এখানকার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিনিয়োগ কেলেঙ্কারিও সে ধরতে পারে। বিপুল লোকসানে পতিত যেকোনো বড় কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখার মতো উদ্ধার পরিকল্পনা সে তৈরি করতে পারে। কোম্পানির মার্জার পিকচার চিত্রায়ণ করা তার বা-হাতের খেল। ৯৯.৯% নিখুঁতভাবে বিশ্ব-শেয়ারবাজারের প্রবণতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে সে। কঠিনতর বিনিয়োগকারীকে রাজি করিয়ে সে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিতে সক্ষম। কিন্তু বিয়ের এই এক সপ্তাহেই সে বুঝে গিয়েছে যে, সে এই কান্নারত ইমামাকে থামাতে পারবে না। সেই সক্ষমতা তার নেই। না সে কান্নার কারণ খুঁজে বের করতে পারবে, আর না তা থামাতে। এই ময়দানে সে একদম আনাড়ি।

: 'পরিচারিকা বাসা পরিষ্কার করেছিল আজ?' একটি দীর্ঘ নীরবতার পর সালার তার কান্না থামাতে নতুন প্রসঙ্গ তুলল। কিন্তু এটি ছিল তার বোকামি নির্বাচন। ইমামার যেন বিশ্বাস হলো না, বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ছে শোনার পর সালার তাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে! গত রাতের সালারের সমস্ত লেকচার একপাশে রেখে সে ফোন রেখে দিল। কল কাটতেই সালার তার ভুল প্রশ্নের ভুল প্রয়োগ বুঝতে পারল। নিরুপায় হয়ে ফোনের অন্ধকার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট সে ফোন হাতে নিয়েই বসে রইল। সে জানে, ইমামা এখন কল করা তো দূরের কথা, রিসিভই করবে না। পাঁচ মিনিট পর সে আবারও কল করল। প্রত্যাশার বিপরীতে ইমামা কল রিসিভ করল। এবার তার কণ্ঠে অভিমান ঝরতে লাগল। কিন্তু তার গলা ধরে আসেনি। সে নিশ্চিত কান্না থামিয়ে দিয়েছে।

: 'আই অ্যাম সরি।' সালার তার গলা শুনতেই বলল।

ইমামা কোনো উত্তর করল না। এই মুহূর্তে ইমামা তার ক্ষমাপ্রার্থনা শুনছে না। সে কেবল একটি বিষয় নিয়েই ভাবছে, সালারের ওপর সে রেগে কেন যায়? তাও এমন ছোট ছোট বিষয়ে! এত বছর ধরে ইমামা যে অনুভূতি ভুলে গিয়েছিল, সেটা ছিল রাগের অনুভূতি। এই অনুভূতি তার কাছে অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল। এতগুলো বছর ধরে সে আল্লাহ ছাড়া কারও প্রতি কখনো কোনো অভিযোগ, কোনো অভিমান করেনি। কারও প্রতি রাগ করা বা কারও প্রতি অভিমানী হওয়া তো অনেক দূরের বিষয়! তাহলে এখন সেই অনুভূতি তার মধ্যে কেন জেগে উঠছে!

সহকর্মী-তাদের কারও প্রতি তার কখনো রাগ আসেনি। হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে অভিযোগ সায়েদা আম্মা, ডাক্তার সিবতে আলি এবং উনার পরিবার, তার সহপাঠী, হতো। কিন্তু সেই অভিযোগ

কখনো শব্দ হয়ে প্রকাশ পেত না। নিঃশব্দেই মিলিয়ে যেত।
কিন্তু এখন কী হয়ে গেল তার?

: ইমামা! কিছু বলো।

সালারের ডাকে সে চমকে উঠল।

: 'নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, আমার নামাজ পড়তে
হবে।' ইমামা তাকে পূর্বের বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিতেই বলল।

: 'আমার ওপর রাগ করোনি তো?' সালার তাকে জিজ্ঞেস
করল।

: 'না।' সে মৃদু স্বরে বলল।



নামাজ শেষে ইমামা সেই একটি প্রশ্নের উত্তরই খুঁজতে লাগল। আর সে তার উত্তর পেয়ে গেল। বিগত নয় বছরে সে এই প্রথম কারও মুখ থেকে তাকে ভালোবাসার কথা শুনেছে। এতদিন সে আশ্রয়দাতাদের ভিড়ে ছিল। এই প্রথম কোনো ভালোবাসার মানুষের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। যে তাকে অসম্ভব ভালোবাসে। তাই অভিযোগ-অনুযোগ, আবদার-বায়না, রাগ-অভিমান-এসব না করে কীভাবে থাকতে পারে সে! সে জানে, সে রেগে গেলে সালার তাকে মানিয়ে নেবে। অভিমান করলে, তাকে বুঝিয়ে নেবে। এটি তার বিশ্বাস, নাকি নিছক ধারণা? যা-ই হোক না কেন, মিথ্যা নয়। এতগুলো বছরে যা কিছু তার মধ্যে জমা হয়েছে, সেগুলো এখন ধীরে ধীরে আগ্নেয়গিরির মতো উদ্দিগরণ হচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতে ইমাম এখন স্বাভাবিক হতে শুরু করল।



সন্ধ্যায় সালার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে তাকে হাসিখুশি দেখে অবাক হলো। এটি প্রত্যাশার বিপরীত। বিশেষ করে দুপুরের ঘটনার পর এমন হাসিখুশি থাকাটা। সালার আজ তাকে ডিনারের জন্য বাইরে নিয়ে গেল। ইমামার প্রচণ্ড ভয় হতে লাগল। তবে আকাশের নিচে বসে বারবিকিউ খাচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তেজিতও ছিল। কতগুলো বছর পর সে এভাবে কোনো রেস্টুরেন্টে, খোলা আকাশের নিচে বসে বারবিকিউ খাচ্ছে।

খাওয়ার পর তারা এমনি কিছু কেনাকাটার জন্য মার্কেটে গেল। সালার অত্যন্ত যত্ন ভরে, মনোযোগসহকারে নিজেকে সামলানোর সুযোগ করে দিল। তার সাথে অল্পস্বল্প কথা বলতে থাকল। খাবার শেষ হতে হতে ইমামা স্বাভাবিক হয়েও গেল।

ঈদের কেনাকাটার ফলে মার্কেটে এখন প্রচণ্ড ভিড়। বহুদিন পর ইমামা এখানে এলো। মার্কেটের চেহারাই পালটে গিয়েছে। সে হতবাক হয়ে নতুন নতুন ব্র্যান্ড ও দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সামনে এগোচ্ছে। আট-নয় বছর আগে

এগুলো এখানে ছিল না। ডাক্তার সিবতে আলির মেয়েরা, অথবা সায়েদা আম্মার ছেলেরা যখন তাদের পরিবার নিয়ে আউটিংয়ের জন্য বাইরে বেরোত, তখন তারা তাকেও সাথে নেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু সে ইচ্ছা করেই তাদের সাথে বের হতো না। তাদের কারও জন্য বাড়তি কোনো ঝামেলার কারণ হতে চাইত না সে। বিয়েকে সে নিছক 'থাকার জায়গার পরিবর্তন' মনে করেছিল। 'অবস্থার পরিবর্তন' নিয়ে কখনো ভাবেনি। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। হোক না তা খুব অল্প, বিরল।

কিন্তু ঘটে অবশ্যই।

: 'কিছু নেবে?' সালারের ডাকে সে চমকে উঠল।

: 'হ্যাঁ, কফি।' সে ইতস্তত করে বলল।

: আমি শপিংয়ের কথা বলছি।



: 'না, আমার সব আছে।' ইমামা মুচকি হেসে বলল।

: 'সব তো এখন আমার কাছেও আছে।' সালার ইমামার দিকে ইঙ্গিত করেই বলল। তার কথায় ইমামার চেহারার লজ্জা ফুটে উঠল। 'আমার প্রশংসা তোমার ভালো লাগল?'

: 'সালার! থামো, এখানে কি আমি তোমাকে প্রশংসা করতে বলেছি?' সে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল।

: 'তুমি জায়গা তো বলোনি। শুধু বলেছ, তোমার প্রশংসা করতে।' সালার তাকে জ্বালাতন করে মজা পাচ্ছে। ইমামা এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে এড়িয়ে গেল। তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে ডিসপ্লেতে সাজানো একটি শাড়ি দেখে অবচেতনেই থেমে গেল। কিছুক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে তার গায়ে পরা রঙের শাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল। ওখানে শোকেসে সাজানো জিনিসগুলোর মধ্যে কেবল এই জিনিসটি তাকে এভাবে থমকে

দিয়েছে। সালার এক পলক ওই শাড়িটির দিকে তাকাল, তারপর তার মুখের দিকে। এরপর স্বাচ্ছন্দ্য বলে উঠল, 'আমার মনে হয় এই শাড়িটিতে তোমাকে খুব মানাবে। চলো নিয়ে নিই।' সালার কাচের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলল।

: 'না, আমার অনেক ফ্যাশনেবল কাপড় আছে।' ইমামা তার বাহুতে হাত রেখে তাকে থামাল।

: কিন্তু বিয়েতে তো আমি তোমাকে কিছুই দেইনি। তাই কিছু দিতে চাচ্ছি।

ইমামা এবার কিছু বলতে পারল না। সত্যিই তার খুব ভালো লেগেছে।

এই বুটিক থেকে তারা শুধু শাড়িই কিনল না, সাথে আরও কিছু স্যুটও নিল। অপর একটি বুটিক থেকে বাসায় পরার জন্য কিছু রেডিমেড পোশাক, সুয়েটার এবং জুতা নিল।

: 'আমি জানি, তোমার কাপড় আছে। কিন্তু আমার কেনা কাপড় পরলে, আমার অনেক ভালো লাগবে। এসব আমি নিজের খুশির জন্য করছি। তোমাকে খুশি করার চেষ্টা করছি না।' তার প্রথম আপত্তির জবাবে সালার অত্যন্ত সরলভাবে বলল। এরপর আর ইমামা কোনো আপত্তি করেনি। তার কিছুটা সংকোচ লাগছিল, কিন্তু একটু পরেই সেই সংকোচ চলে গেল। তারপর সব জিনিস সে নিজের পছন্দেই নিয়েছে।

: 'তোমাকে সব পোশাকেই আমার ভালো লাগে। তাই আমার পছন্দ জিজ্ঞেস করো না।' ইমামা তার পছন্দ জিজ্ঞেস করতেই সে মুচকি হেসে বলল।

: 'লাউঞ্জের জানালায় কার্টেনস (পর্দা) লাগানো দরকার।' ইমামার হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'ব্লাইন্ড (পর্দা) থাকলে কী সমস্যা তোমার?' সালার চমকাল।

: কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কাটেনস আমার খুব ভালো লাগে।
সুন্দর।

: 'কেন নয়?' সালার তার মনের অবস্থা গোপন করে মুচকি
হেসে তাকে বলল। ইমামাকে সে বলতে পারল না, ওই পর্দা
দেখলেই তার বিরক্ত লাগে।

রাত পৌনে বারোটায় একটি ক্যাফেতে তিরামিসু কেক খেয়ে,
আনুমানিক সাড়ে বারোটায় বাসায় ফিরল তারা। ততক্ষণে
গোটা লাহোর শহর পুনরায় কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। কিন্তু
তাদের জীবনের রাস্তা থেকে কুয়াশা সরতে শুরু করেছে।
বাসায় পৌঁছে ইমামা উদ্দেশ্যহীন মনে জিনিসগুলো ছড়িয়ে
সোফায় বসে গেল। বহু বছর পর পাওয়া এই জিনিসগুলোকে
সে কোনো কৃতজ্ঞতা কিংবা অনুগ্রহের ভার নিয়ে নয়, বরং
অধিকারের অনুভূতি নিয়ে দেখছে। নারীদের জন্য অসংখ্য

নিয়ামতের মধ্যে একটি নিয়ামত হলো, স্বামী তার জন্য অর্থ ব্যয় করে। আর এটি নিয়ামত কেন, সে তা আজ বুঝতে পারছে।

ডাক্তার সিবতে আলি ও তার স্ত্রী প্রত্যেক মৌসুমের শুরুতে তাকে কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিস কিনে দিতেন। সায়েদা আন্মাও তার জন্য কিছু না কিছু নিয়েই আসতেন। উনার ছেলেরা এবং ডাক্তার সিবতে আলির মেয়েরাও তার জন্য কিছু না কিছু পাঠাত। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই হাতে স্পর্শ করার সময় সে এমন আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করেনি। সেগুলো খয়রাত ছিল না। কিন্তু তা অধিকারও ছিল না। তা ছিল অনুগ্রহ ও দয়া। আর সে এতগুলো বছর নিজের সত্তাকে অনুগ্রহে অভ্যস্ত বানাতে পারেনি। নিঃসন্দেহে সেটা তার জীবনের একটি অংশ হয়ে গিয়েছিল নীরবে। কিন্তু সালারের দেওয়া এই জিনিসগুলো এটা কেমন অনুগ্রহ। যা কোলে নিয়ে তার এমন অনুভূত হচ্ছে! এটা কি আনন্দ? আজাদি? নিশ্চিততা? প্রশান্তি? নাকি এমন কোনো জিনিস, যা প্রকাশ করার জন্য তার কাছে কোনো শব্দ নেই?

: 'কী দেখছ তুমি?' সালার ওয়াশরুম থেকে কাপড় পালটে, ড্রেসিং রুমের লাইট অফ করে রুমে আসতেই বলল। সালার অবাক হলো। ইমামা যখন থেকে আসছে, জিনিসগুলো ছড়িয়ে সামনে নিয়ে বসে আছে।

: 'কিছু না। আমি এখন তুলেই রাখছিলাম।' ইমামা সেগুলো গোছাতে গোছাতে বলল।

: 'একটি ওয়ারড্রোব আমি খালি করে দিয়েছি। তোমার কাপড়গুলো ওখানেই রাখো। আরও জায়গার প্রয়োজন হলে, গেস্টরুমের আরেকটি ওয়ারড্রোব খালি আছে। তুমি সেটাও ব্যবহার করতে পারো।' সালার রুমে কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে তাকে বলল।

: 'সায়েদা আম্মার বাড়ি থেকে আমার জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে।' ইমামা শপিংগুলো বাক্স ও ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল।

: 'কেমন জিনিস?' সালার এখনো ড্রয়ারে কিছু খুঁজে চলছে।

: 'বাবার বাড়ির উপটৌকনের জিনিস।' ইমামা অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলল।

: 'যেমন?' সালার ড্রয়ার থেকে কিছু পেপার বের করে, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চমকাল।

: বাসনপত্র, ইলেকট্রনিক জিনিস, ফার্নিচারও আছে। কিন্তু সেটা শো রুমে। আরও ছোটখাটো কিছু জিনিস আছে।

সালার পেপারগুলো পুনরায় ড্রয়ারে রেখে তার কথা শুনতে থাকল।

: 'তোমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোনো জিনিস আছে ওখানে?'
সে জিজ্ঞেস করল।

: 'ওগুলো আমার ব্যক্তিগত জিনিসই।' সে অজান্তেই বলল।

: 'সেগুলো উপঢৌকনের জিনিস।' সালার তাকে মনে করিয়ে
দেওয়ার ভঙ্গিতে
বলল।

: 'এখন তুমি বলো যে, আমার উপঢৌকন লাগবে না।' ইমামা
খানিক রাগতস্বরে বলল।

'আমার কোনো প্রকারের জিনিসই লাগবে না।' সালার
দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল।

‘তোমার কি মনে হয়, এই অ্যাপার্টমেন্টে কোনো জিনিসের কমতি আছে? তুমি কি চাও যে, এখানে প্রতিটা জিনিস দুটো করে থাকুক? আনলে রাখবে কোথায়?’ সালার জিজ্ঞেস করল। আর ইমামা ভাবনায় পড়ে গেল।

* ‘এত বছর ধরে আমি আমার জন্য জিনিসগুলো কিনেছি। কিন্তু বেশিরভাগ জিনিস আব্বুর টাকায় কেনা। তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।’ ইমামা এখনো তার কথা মানতে তৈরি নয়।

: ‘ডাক্তার সাহেব উনার তিন মেয়েকেই কি উপটোকন দিয়েছেন?’ সালার এখন জিজ্ঞেস করছে। ‘দেননি। তাই না?’

: ‘তুমি কীভাবে জানো?’ ইমামা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

: ‘তিনি আমাদের নিজেই বলেছেন।’ সালার বলল।

: 'উনার তিন মেয়ের বিয়েই পরিবারে হয়েছে। এজন্য।' ইমামা বলল।

: 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। উপটৌকন না দেওয়াতে তোমার সাথে আমি কোনো খারাপ ব্যবহার করব না। এটা ডাক্তার সাহেবের উপহার হলে আমি অবশ্যই নিতাম। কিন্তু তিনি এগুলো তোমার নিরাপত্তার জন্য দিয়েছিলেন। কারণ, তোমার বিয়ে এমন এক পরিবারে হতে চলেছিল, যাদেরকে তিনি ভালো করে চিনতেন না। কিন্তু আমার ব্যাপারে তো তিনিও ভালো করে জানেন, আর তুমিও।' সালার তাকে বলল।

: 'আমার বাসনপত্র, বিছানার চাদর ও জামাকাপড় আছে। ছোট ছোট কত জিনিস আছে। এত বছর ধরে আমি তা জমাচ্ছি। এখন কীভাবে দিয়ে দেব এগুলো?' ইমামা অসন্তুষ্ট হয়ে আছে।

: 'আচ্ছা ঠিক আছে, যেগুলো তুমি নিজের টাকায় কিনেছ, সেগুলো নিয়ে আসো। বাকিগুলো রেখে দাও। সেগুলো

কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিবো।" সালার আরও একটি সমাধান বের করল। ইমামা এবার কিছুটা ভাবতে লাগল। 'সকালে অফিসে যাওয়ার সময় আমি তোমাকে সায়েদা আম্মার ওখানে নামিয়ে যাব। আর অফিস থেকে আজ একটু আগেই চলে আসব। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়েও দেব।' সালার হাতে কিছু পেপার নিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। সোফার জিনিসগুলো একপাশে সরিয়ে তার পাশে বসে পড়ল।

: 'এখানে যেখানে যেখানে ক্রস চিহ্ন রয়েছে, সেখানে সেখানে সাইন করো।' সালার কিছু পেপার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, হাতে একটি কলম ধরিয়ে দিল।

: 'এটা কী?' ইমামা খানিক অবাক হয়ে পেপারগুলোর দিকে তাকাল।

: আমি আমার ব্যাংকে তোমার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলছি।

: কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট তো আগে থেকেই খোলা আছে।

: 'ঠিক আছে, একটা অ্যাকাউন্ট আমার ব্যাংকেও থাকুক। মন্দ নই আমরা, ভালোই সার্ভিস দেই।' সে রসিকতা করল। ইমামা পেপারগুলোতে সাইন করতে লাগল।

: 'তাহলে কি আগের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেব?' ইমামা সাইন করে বলল।

: 'না, সেটা ওভাবেই থাকুক।' সালার তার হাত থেকে পেপারগুলো নিতে নিতে বলল।

: 'অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তোমাকে কত টাকার চেক দেব?' ইমামা ভেবেছিল এটা বিদেশি ব্যাংক। তাই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য নিশ্চয় মোটা টাকার প্রয়োজন হবে। 'তোমার মোহর আদায় করতে হবে আমাকে। সেটা দিয়েই খুলে দেব।' সালার

পেপারগুলো একটি খামে ভরতে ভরতে বলল। 'এখানে একটি সংখ্যা লিখো।'

ইমামা অবাক হয়ে রাইটিং প্যাডের দিকে তাকাল। সেই প্যাডটিই সালার তার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে কথাটি বলল।

: 'কীসের সংখ্যা?' ইমামা বিক্ষিপ্ত হলো।

: বড় কোনো সংখ্যা। তোমার যে সংখ্যা লিখতে মনে চায়, সেটাই।

: 'কেন?' ইমামা আরও বিক্ষিপ্ত হলো। সালার তার হাতে কলম ধরিয়ে দিল। ইমামা পুনরায় কলম হাতে তো ধরেছে, কিন্তু তার মাথা একদম ফাঁকা হয়ে আছে। কী লিখবে বুঝতে পারছে না।

: 'কত অঙ্কের সংখ্যা?' কয়েক মুহূর্ত পর ইমামা তার সাহায্য চাইল। সালার চিন্তায় পড়ে গেল। তারপর বলল, 'তুমি যদি

তোমার পছন্দমতো কোনো সংখ্যা লিখো, তাহলে কত অঙ্কের লিখবে?'

: 'সাত অঙ্কের।' ইমামা ভাবনায় পড়ে গেল।

: 'ঠিক আছে। তাহলে লিখো।' সালারের চেহারা আচমকাই মুচকি হাসি ফুটে উঠল। ইমামা কিছুক্ষণ সাদা কাগজটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর লিখতে শুরু করল, ৩৭৫২৯৬০। সংখ্যাটি লিখে কাগজটি সালারের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। সংখ্যাটি দেখে সালার কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর পাতাটি প্যাড থেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে আপনা-আপনি হেসে ফেলল।

: 'কী হলো?' ইমামা তার প্রতিক্রিয়ায় আরও কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলো।

: 'কিছু না। কী হবে?' কাগজটি ভাজ করতে করতে সে ইমামার মুখের দিকে অসম্ভব গভীর, অথচ আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকাল।

: 'এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ইমামা তার তাকানোতে অপ্রস্তুত হলো।

: 'তোমার স্বামী আমি। তোমার দিকে তাকাতেই পারি।' ইমামা বুঝতেই পারল না, সালার অত্যন্ত দক্ষভাবে প্রসঙ্গ পালাটয়ে ফেলল। কথা বলতে বলতে সালার কাগজটিও ইতিমধ্যে খামে পুরে নিয়েছে।

: তুমি আমাকে শাড়ি পরে দেখাওনি।

: 'এত রাতে তোমাকে শাড়ি পরে দেখাব?' ইমামা মুচকি হাসল। সালার তার কাছ থেকে উঠে যেতে যেতে থামল। ইমামা এই প্রথম এতটা মনখুলে হাসছে। খিলখিলিয়ে। কিংবা সালারই হয়তো এই প্রথম তাকে এতটা কাছ থেকে হাসতে

দেখছে। পাশের একটি ব্যাগে বক্স পুরতে পুরতে ইমামা অনুভব করল, সালার তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে মুখ তুলে তাকাল। দেখল, সালার সত্যিই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

: এখন আবার কী?

: 'একটা কথা ভাবছিলাম।' সালার এখন গম্ভীর।

: কী?

: 'তুমি শুধু কান্না করলেই নয়; হাসলেও তোমাকে সুন্দর লাগে।'

ইমামার চোখে প্রথমে হতভম্বতা, তারপর চমক আর অবশেষে প্রফুল্লতা ফুটে উঠল। সালার তার প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই অনুভব করতে পারল; যেন তার সামনে কেউ ফ্ল্যাশ কার্ড ধরে দেখিয়ে দিল। ইমামা তার দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে তার

চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। তার কান, গাল, নাক লাল হয়ে উঠল। হয়তো তার ঘাড়ও। সালার জীবনে কখনো কোনো নারী বা পুরুষকে এতটা কাছ থেকে বিবর্ণ হতে দেখেনি। নয় বছর আগেও দু-তিনবার সালার তাকে রেগে গিয়ে এভাবেই লাল হতে দেখেছিল। তখন সেটা তার কাছে অদ্ভুত লাগলেও, বিষয়টি ছিল মনোমুগ্ধকর। আর এখন সে তার প্রিয়তমা হওয়ার পরও ওভাবেই লাল হয়ে উঠতে দেখছে। এই দৃশ্যটি আগের চেয়েও বেশি মনোমুগ্ধকর। 'এই দৃশ্য যেকোনো পুরুষকেই পাগল বানিয়ে দেবে।' তার চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সালার এ কথাটির স্বীকারোক্তি দিল। সে কখনো তার জীবনে আগত কোনো নারীকে এমন 'সাধারণ' কথায়, এতটা লজ্জা পেতে দেখেনি। তাছাড়া এ নিয়ে ইমামার অভিযোগও ছিল যে, সে তার প্রশংসা করে না। তাকে আরও কিছুটা বিরক্ত করতে ইচ্ছা করল সালারের। কিন্তু ইমামা এখন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে জিনিসগুলো ব্যাগে ভরছে। তবে তার হাতে খানিক কম্পন বিরাজ করছে। সে নিশ্চিত সালারের তাকিয়ে থাকায় দ্বিধাশ্রিত হচ্ছে।

কিছু জিনিস এমন হয়, যেগুলো ঘরে আনার পর আপনি বুঝতে পারেন না যে. সেগুলো কোথায় রাখবেন। কেননা, আপনি সেগুলো যেখানেই রাখেন না কেন, ওই জিনিসগুলোর কাছে সেই জায়গাটি অসম্ভব নগণ্য মনে হয়। কিছু জিনিস এমন হয়, যেগুলো ঘরে আনার পর সেগুলো যেখানেই রাখেন না কেন, সেই জায়গাটি সবচেয়ে মূল্যবান এবং দামি হয়ে যায়। সালারের বুঝে আসছিল না, ইমামা তার কাছে ওই জিনিসগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনে সে তার দিকে খানিক ঝুঁকল। ঝুঁকেই আলতো করে তার ডান কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। ইমামা লজ্জায় গুটিয়ে গেল। সালার ওভাবেই আলতো করে তার ডান গালে চুমু খেল। অতঃপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে পড়ল। কিন্তু ইমামা ওখানেই বসে রইল। সালার পেছন ফিরে তার দিকে তাকাল না, বরং ওই পেপারগুলো বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে লাগল। সে পেছন ফিরে তাকালে, ইমামার দৃষ্টি হয়তো তাকে অবাক করে দিত। সে এই প্রথম তার কাঁধে চুমু খেয়েছে। কিন্তু

এই স্পর্শে 'ভালোবাসা' ছিল না। ছিল 'ভরপুর শ্রদ্ধা'। কিন্তু কেন? তা ইমামার বুঝে এলো না।

১৬

পরদিন তারা আনুমানিক দশটায় সায়েদা আম্মার বাড়িতে এলো। ইমামার হাস্যোজ্জ্বল ঝলমলে চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ উনার প্রতিক্রিয়া পালটে গেল। এবার তিনি কেবল সালারের সালামের জবাবই দিলেন না, বরং তার মাথায় ভালোবাসার হাত বুলিয়ে দিয়ে কপালে চুমুও খেলেন।

: 'এই সবগুলোও নিতে হবে।' ইমামা তাকে তার রুমে নিয়ে এলো। সেখানে বইয়ের দুটো আলমারির দিকে ইশারা করে সালারকে বলল। সেখানে প্রায় চারশ বই হবে।

: 'এই বাক্স?' সালার আঙুলের ইশারায় জিজ্ঞেস করল।

: 'না। এই ইজেল, ক্যানভাস ও আঁকাআঁকির সব সরঞ্জামও।'
ইমামা রুমের দেওয়ালের সাথে পেইন্টিংয়ের জিনিসপত্র এবং
কিছু অসম্পূর্ণ পেইন্টিংয়ের দিকে ইশারা করল।

: 'এগুলো অনেক বেশি হয়ে যায় না? বইই তো প্রায় দুই কাটুন
হয়ে যাবে।' সালার বইগুলোর দিকে তাকিয়ে অনুমান করল।

: 'না, এই কয়টা বাক্সই নয়। আরও আছে।' ইমামা বলল। সে
তার ওড়না বিছানায় ছুড়ে ফেলে, হাঁটুতে ভর করে কার্পেটে
বসে খাটের নিচ থেকে আরও একটি কাটুন টানতে শুরু করল।

: 'রাখো, আমি বের করছি।' সালার তাকে থামিয়ে নিজেই সেই
কাটুন টেনে বের করতে লাগল।

: 'খাটের নিচে যতগুলো বাক্স আছে, সবগুলো বের করে
ফেলো। ওগুলোতেই বই।'

ইমামা তাকে নির্দেশনা দিল। সালার ঝুঁকে বিছানার নিচে তাকাল। সেখানে বিভিন্ন আকারের আরও সাত আটটি বাক্স। সালার একে একে সবগুলো বাক্স বের করল।

: 'হয়েছে?' সে দাঁড়িয়ে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা তখন অন্যদিকে মনোযোগী। সে টুলে দাঁড়িয়ে আলমারির উপর থেকে আরও কিছু বাক্স নামানোর চেষ্টা করছে। সালার আবারও তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ওই বাক্সগুলো নামাল। সে ভাবল, এগুলোই হয়তো বইয়ের শেষ বাক্স। কেননা, রুমে বাক্স রাখার মতো আর কোনো জায়গা দেখা যাচ্ছে না আর। কিন্তু এটা ছিল তার ভুল ধারণা। ইমামা এখন আলমারি খুলে ভেতরের একটি খোপ থেকে বের করে বিছানায় রাখতে শুরু করেছে। খোপ থেকেই অন্তত একশ বই বের হয়েছে। সালার দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। আলমারির পর এবার বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ারের পালা। সেগুলোতেও বই। বেডসাইড টেবিলের পর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ও

খোপগুলোর পালা। রুমের মধ্যে যে বুড়িটিকে সালার কাপড়ের বুড়ি ভেবেছিল, সেটাও বই রাখতেই ব্যবহার করা হয়েছে।

সালার রুমের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বই বের করতে দেখছে। বিছানায় পড়া বইয়ের ভূপগুলো এখন বুকশেলফের বইয়ের চেয়েও বেশি দেখাচ্ছে। অথচ এখনো সে প্রবল উৎসাহে রুমের বিভিন্ন স্থানে রাখা বই বের করে চলছে। ইমামা উঠোনের দিকে মুখ করা জানালাগুলোর পর্দা সরাল। তারপর ধীরে ধীরে সবগুলো জানালা খুলে সেগুলো থেকেও কিছু কিছু বই বের করতে লাগল। ওগুলো ওখানে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে রেখেছে। হয়তো বইগুলোকে মাটি ও আদ্রতা থেকে রক্ষা করতেই এই সতর্কতা অবলম্বন।

: 'ব্যস, এই কয়টা বইই।' অবশেষে সে সালারকে অবগত করল। সালার রুমের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাক্স ও

বিছানায় পড়া বইয়ের ভূপের দিকে তাকিয়ে, অত্যন্ত
ধৈর্যসহকারে জিজ্ঞেস করল, 'আরও কোনো জিনিস আছে?'

: 'হ্যাঁ, আমার আরও কিছু ক্যানভাস ও পেইন্টিংসও আছে।
ওকে, আমি নিয়ে আসছি এখনই।' বলেই সে সালারের জবাবের
অপেক্ষা না করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। সালার টেবিলের
উপর থেকে একটি বই হাতে নিল। সেটি একটি উপন্যাস। বাজে
রোমান্টিক লেখক, একজন জনপ্রিয় আমেরিকান
উপন্যাসিকের লেখা। সালার শিরোনামে চোখ বোলাতেই
অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার হাসি চলে এলো। এই উপন্যাসের
নামটি যদি সে ইমামার সামনে উচ্চারণ করত, তাহলে ইমামা
নিশ্চিত লজ্জায় লাল হয়ে যেত। সালার বইটি খুলল।
উপন্যাসের ভেতর প্রথম পৃষ্ঠাতেই খালি পৃষ্ঠায় ইমামা তার
নাম লিখে রেখেছে। বই কেনার তারিখ, কেনার স্থান, যেদিন
পড়তে শুরু করেছিল এবং যে তারিখে শেষ করেছে, তাও
লিখে রেখেছে। সালার অবাক হলো। এসব উপন্যাসকে সে
ফালতু মনে করত। ইমামার হাতে এই লেখকের কোনো বই

থাকবে, এটাও সে কখনো মানতে পারবে না। কিন্তু ইমামা এই বইয়ে এতটা আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তার নাম ও তারিখ লিখেছে যে, যেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। সালার উপন্যাসের আরও কয়েকটি পৃষ্ঠা উলটাল। তারপর অবিশ্বাস্য চোখে উলটাতেই থাকল। উপন্যাসের ভেতর জায়গায় জায়গায় রঙিন মার্কার দিয়ে বিভিন্ন লাইন দাগিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু লাইনের সামনে একটি স্টার, আবার কিছু লাইনের সামনে ডাবল স্টার দিয়ে, লাইনটির গুরুত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘ শ্বাস ফেলেই ক্ষান্ত রইল।

দাগানো ওই লাইনগুলো অশ্লীল রোমান্স, মেকি আবেগ, ব্যর্থ প্রেম ও দ্ব্যবোধক সংলাপে ভরপুর। সেগুলোর পাশে স্টার এঁকে চিহ্নিত করা। সালার ওই উপন্যাসটি রেখে অন্য একটি উপন্যাস হাতে নিল। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম- সব কটাই রোমান্টিক উপন্যাস। একই রকমের প্রেমকাহিনি আর একইভাবে দাগানো। সে জীবনে এই প্রথম এমন রোমান্টিক আর সেটাও মিলস অ্যান্ড বুন আর বারবারা

কাটল্যান্ডের খাঁচের প্রেমকাহিনির এমন 'সিরিয়াস পাঠিকা'র দেখা পেল। বইয়ের ওই ভূপগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে প্রমাণ পেল, ইমামা কোনো 'বই' পড়ে না; কেবল এসব উপন্যাসই পড়ে। রুমের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা দেড়-দুই হাজার বইয়ের মধ্যে সে কেবল কয়েকটি পেইন্টিং, চিত্রকলা ও কবিতার কিছু বই দেখতে পেল। বাকি সব ইংরেজি উপন্যাস।

: 'আর এগুলো নিয়ে যেতে হবে।' একটি বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সালার চমকে উঠল। ইমামা তাকে বইগুলোর ব্যাপারে জানাল। ইমামা অপর রুম থেকে দু-তিনবারে এনে এনে কিছু সম্পূর্ণ আর কিছু অসম্পূর্ণ পেইন্টিংয়ের ভূপও বানিয়ে ফেলল। সালার তখন বইগুলোর দিকে মনোযোগী ছিল। সে পুনরায় হাতের উপন্যাসটি বিছানায় রেখে দিল। কার্পেটে পড়া পেইন্টিংগুলোর দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে উপলব্ধি হলো, সায়েদা আম্মার বাড়ির এখানে-ওখানে টাঙানো পেইন্টিংগুলো ইমামারই বানানো। আর নিঃসন্দেহে ওই

পেইন্টিংগুলো দেওয়ালে ঝোলানো হয়েছিল রুমে অন্য কোনো জায়গা না থাকার কারণেই।

: 'বেটা, এসব কাঠ-কাবারি জঞ্জাল সব এখানে একত্র করেছে কেন? এগুলো কি সাথে নিয়ে যাবে নাকি?' সায়েদা আম্মা রুমে ঢুকেই রুমের অবস্থা দেখে চমকে গেলেন।

: 'আম্মা, এগুলো আমার দরকারি জিনিস।' সালারের সামনে এগুলোকে কাঠ-কাবারি বলায় ইমামার অনুভূতিতে আঘাত লাগল।

: 'এগুলোর কী দরকার আর? এসব তো পুরোনো কাগজ পত্রের সাথে বিক্রি করে দিলেও পারতে। কত বড় ভূপ বানিয়ে ফেলেছ। পেইন্টিংগুলো যেখানে পড়ে ছিল, ওখানেই রেখে দিতে। ছোট্ট একটা ঘর তোমাদের। ওখানে কোথায় রাখবে এসব?' সায়েদা আম্মা বইয়ের ভূপগুলো দেখে বিরক্তিতে অস্থির হয়ে গেলেন। তিনিও নিশ্চিত এই প্রথম ইমামার

সবগুলো জিনিস একসাথে দেখছেন। আর এটা উনার কাছে কোনো সুখকর দৃশ্য নয়।

: না, সমস্যা নেই। সবকিছুই ধরে যাবে। তিনটি বেডরুম। সেগুলো থেকে একটিতে এই জিনিসগুলো রাখব। কিন্তু বাকি জিনিসপত্র এখানেই রেখে যেতে হবে। কম্বল, বিছানার চাদর, গালিচা আর কুশনগুলো।

: 'কিন্তু বেটা, এগুলো তো কাজের জিনিস, তবে এই বই আর পেইন্টিংগুলো দিয়ে কী করবে তুমি?' সায়েদা আন্মা এখনো আপত্তি করছেন।

: 'কোনো সমস্যা নেই। তার বইগুলো দরকারি। এই তো আর কয়টা বাক্স আর পলিথিন ব্যাগই প্যাক করার বাকি আছে।' সালার তার সুয়েটারের হাতা গোটাতে গোটাতে ইমামাকে সর্বশেষ বাক্যটি বলল।



এখন প্রায় তিনটা বাজে। ইমামার ওই জিনিসগুলো এখন গেস্টরুমে ছড়িয়ে আছে। তারা এখন তাদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছে। ফোরকান আজও তাদের ইফতারিতে দাওয়াত করেছে। কিন্তু সালার অপারগতা প্রকাশ করল। এই মুহূর্তে এই জিনিসগুলো গোছানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সালার কিছুদিন আগে একটি দোকানে কিছু অ্যালুমিনিয়াম ও কাচের তাকওয়ালা আলমারি দেখেছিল। আর ওটা একটি ঘটনাক্রমই ছিল যে, সেদিন ওখানে যাওয়াটা তার বিফলে যায়নি। ছয় ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া একই রকমের তিনটি আলমারি গেস্টরুমের একটি পুরো দেওয়াল ঢেকে তাকে স্টাডি রুমে পরিণত করেছিল। কিন্তু এগুলো পেয়ে ইমামা ছিল অসম্ভব খুশি। ওই তিনটি আলমারিতে তার প্রায় সব বইই ধরে গেল। এই বইগুলো এত বছর পর কোনো উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেল। তার পেইন্টিংয়ের ইজেল আর রেক, লন্ড্রির

দেওয়ালে বানানো তাকেই ধরে গিয়েছে। সে উপটৌকনের জিনিসপত্রের মধ্যে থালাবাসন ও বিছানার চাদর ব্যতীত আর কিছুই আনেনি। তখন সে ভাবেনি যে, তার উপটৌকনের জিনিসপত্রের মধ্যে কেবল এই দুটো জিনিসই ব্যবহারের ভাগ্য হবে।

সালারের কিচেন এরিয়া এখন একটি প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে। বাসনপত্র রাখার রেকের কাচ গলে নতুন ক্রোকারি ও কাউন্টারের স্ল্যাবে রাখা রান্নাবান্নার ছোটখাটো কিছু জিনিস, রান্নাঘরের পুরো চেহারাই পালটে দিয়েছে।

সবকিছু গুছিয়ে তারা যখন অবসর হলো, তখন রাত দশটা। ফোরকানের বাসা থেকে তাদের জন্য খাবার এসেছে। কিন্তু ইমামা সেগুলো অত্যন্ত যত্নসহকারে নতুন ক্রোকারিতে করে পরিবেশন করল।

: 'এভাবে ভালো লাগছে না?' খুশির ঝিলিক চোখে ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল। সালার তার সামনে নতুন ব্র্যান্ডের ডিনার প্লেট ও তার আশেপাশে সাজানো চকচকে ক্রোকারির দিকে তাকাল। কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে সেটির দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আমরা যেন কোনো রেস্টুরেন্টের অভিষেক দিনে সর্বপ্রথম ও একমাত্র কাস্টমার। কিন্তু সমস্যা হলো ইমামা, এই ক্রোকারি আর কাটলরি এতটাই নতুন যে, এতে খাবার খেতে মন সায় দিচ্ছে না। আমি কি পুরোনো প্লেটে খেতে পারি?'

সালারের কথা শুনে ইমামার মুড অফ হয়ে গেল। সে অন্তত এই মুহূর্তে এমন কথার প্রত্যাশা করেনি।

: 'কিন্তু এগুলো খুব সুন্দর।' সালার সাথে সাথেই তার ভুল শুধরে নিল। সে বুঝে গিয়েছে, ইমামা এই মুহূর্তে তার দুষ্টমি নেওয়ার মোড়ে নেই। ইমামার চেহারায কোনো পরিবর্তন

এলো না। প্লেটে ভাত নিতে নিতে সালার বলল, 'চলো, খাওয়ার পর আমরা কোথাও কফি খেতে যাই।'

ইমামার চেহারায এবার খানিক কোমলতা প্রকাশ পেল।

: 'রান্নাঘরের জন্য জিনিসপত্র কিনতে হবে।' প্রত্যুত্তরে ইমামা সাথে সাথে বলল।

সালার ভাতের চামচ মুখে পুরতে পুরতে থেমে গেল।

'এখনো আরও জিনিসপত্র কেনা বাকি?' সে অবাক হলো।

: গ্রোসারি জিনিসপত্র লাগবে।

: গ্রোসারি? রান্নাঘরে তো সবই আছে।

: 'চাল, আটা, ডাল, মশলাপাতি কি আছে? কিছুই নেই।' জবাবে ইমামা পালটা

প্রশ্ন করল।

: 'ওগুলো কিনে আমি কী করব? আমি তো কখনো খাবার রান্নাই করিনি।' সালার কাঁধ কুঁচকে উদাসীনতা দেখিয়ে বলল।

: 'কিন্তু আমি তো রান্না করব, তাই না! সারা জীবন তো অন্যের বাসায় খেতে পারি না।' ইমামা গম্ভীর হয়ে বলল।

: 'কিছু কাচের বোতল আর ডিব্বাও লাগবো।' ইমামার স্মরণ হলো।

: 'এই মুহূর্তে এসব কেনাকাটার মোড নেই আমার। আমার খুব ক্লান্তি লাগছে।'

সালার বলল।

: 'আচ্ছা ঠিক আছে, কাল কিনে নেবা' ইমামা সমাধানে এলো।

আজ তারা কফি পান করতে নিকটবর্তী মার্কেট পর্যন্তই গেল।
গাড়িতে করে ফোর্টস স্টেডিয়ামের চারপাশে চক্কর দিতে
দিতে ওখানে বসেই কফি পান করল।

: আলহামদুলিল্লাহ! বইগুলো তো জায়গা পেয়ে গেল।

কফি পান করতে করতে সালার চমকাল। ইমামা জানালা গলে
দূরের শপিংমলগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড়াচ্ছে। তার
অনুভূতিশূন্য মনের কোথাও এখনো বইয়ের কথাই ঘুরপাক
খাচ্ছে।

: 'ওগুলো বই নয়' সালার গম্ভীরভাবে বলল। কফির ঢোক
গিলতে গিলতে ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। 'ওখানে

পাঁচানব্বই শতাংশই উপন্যাস। তাও সব সস্তা প্রেমের গল্প। পাঁচ-দশটা হলেও মেনে নিতাম। এত বছরে জমে জমে বেশির চেয়ে বেশি এক-দুশ হতে পারত। কিন্তু এই রকমের দেড়-দুই হাজার উপন্যাস! তোমার কী অসম্ভব ধৈর্য! এসব বাজে জিনিস পড়েছ, আর সেটাও মার্ক করে দাগ দিয়ে দিয়ে! আমার মতে, পাকিস্তানের সস্তা প্রেমকাহিনির সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা এখন আমার বাসায়।

ইমামা চুপ করে, কফি পান করতে করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। সালার কিছুক্ষণ তার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করল। কিন্তু এত দীর্ঘ নীরবতা দেখে তার ভয় হতে লাগল, ইমামার আবার খারাপ লেগে গেল কি না। বাম বাহু তার কাঁধে ছড়িয়ে দিয়ে সালার যেন তার কাছে নিঃশব্দ ক্ষমা চাইল।

: 'ঠিক আছে। সস্তা প্রেমকাহিনি। কিন্তু এসব আমার ভালো লাগে।' ইমামা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পর বলল। 'সেখানে লোকেরা সবসময় এক হয়, কেউ কারও

থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটা আমার জন্য একটি উইন্ডারল্যান্ড, জাদুর শহর। এখানে সবাই সবার দেখা পায়।" ইমামা জানালা গলে বাইরে তাকিয়ে অন্য কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সালার চুপচাপ তার কথা শুনতে শুনতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। 'জীবনের সবকিছু ব্যর্থতা ও হতাশায় ভরে উঠলে, তখন এমন এক জগতে যেতে পারলে ভালো লাগে। যেখানে সবকিছু মনের মতো। সেখানে তা-ই হয়, যা মানুষ চায়। যা ভাবে, তা-ই পায়। এগুলো মিথ্যা, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এতে আমার জীবনের তিক্ততা কিছুটা কমে যেত। আমি যখন চাকরি করতাম না, তখন উপন্যাস বেশি পড়তাম। কখনো কখনো সারা দিন সারা রাত ভরে। এই উপন্যাসগুলো পড়তে বসলে কারও কথাই আমার মনে পড়ত না। আন্সু, আব্বু, ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগিনা, ভাগ্নে, কেউ না। আর নয়তো সারা দিন বা রাতে ঘুমানোর আগে বাসার কথা মনে না করে থাকাটা খুব কঠিন হয়ে যেত। আমি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখতাম। তারপর আমি এই উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে এক নতুন স্বপ্নের জগৎ

বানিয়ে নিই। আমি উপন্যাস খুললেই জীবন বদলে যেত। তাতে আমার পরিবার থাকত, আমি থাকতাম, জালাল থাকত।’

শেষ বাক্যটি শুনে সালার কফির ঢোক আর গিলতে পারল না। এই মুহূর্তে তার মুখে ওই ব্যক্তিটির নাম শুনে তার কতটা কষ্ট লেগেছে, না কষ্ট নয়, 'কষ্ট' তো এক সামান্য শব্দ; এমন কষ্ট হয়তো মানুষের মৃত্যুর সময় হয়ে থাকে। হ্যাঁ, এই উপন্যাসগুলো যদি তার পূর্ণ দুনিয়া এবং জাদুর শহর হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে তো জালাল আনসারই থাকবে। সালার সিকান্দার তো থাকার কথা নয়। সে তার সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও সাংবিধানিকভাবে একটি সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। হৃদয়ের বন্ধনে তো আবদ্ধ ছিল না। হৃদয়ের বন্ধনে হয়তো এখনো...। আর সেটা তো অতীত। যেখানে জালালুন নসর ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ ছিল না। ইমামার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ব্যথিত মনে কথাগুলো ভাবছে।

এদিকে জালালের নাম বলার সময় ইমামার অনুভবও হয়নি, সে জালালের নাম কার সামনে বলছে আর কেমন আবেগ ও ভঙ্গি মিশিয়ে বলছে। অনুভব হলে সে অবশ্যই আটকাত, নয়তো অন্তত একবার হলেও সালারের দিকে ফিরে তার মুখের দিকে তাকাত। ইমামা এখনো জানালা দিয়ে বাইরেই তাকিয়ে আছে। এখনো 'কোথাও' যেন হারিয়ে আছে। এখনো 'কারও' ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে।

: 'ওই জগতে থাকতে আমার খুব ভালো লাগত। সেখানে আশা ছিল, আলো ছিল, ছিল অপেক্ষা। কিন্তু অপূর্ণতা ছিল না। যাতনা ছিল, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয়। অশ্রু ছিল, তবে তা মুছে দেবার মানুষও ছিল। একমাত্র উপন্যাসই ছিল, যেখানে ইমামা হাশেমকে পাওয়া যেত। সেখানে আমনার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। প্রতিবার ওই উপন্যাসগুলোতে নিজের নাম লিখতে লিখতে যেন নিজেকে সুরণ করাতাম, মূলত আমি কে। পুনরায় উপন্যাস খুললেই সেখানে লেখা নাম আমাকে জানিয়ে দিত, আমি কে। কী আমার পরিচয়। উপন্যাস আমাকে আমার

পুরোনো নামে ডাকত। ওই নামে ডাকত, যে নামে এত বছর ধরে কেউ আমাকে ডাকেনি। গাঢ় অন্ধকারে মাঝে মাঝে এতটুকু অল্প আলোও অনেক বেশি মনে হয়। ওই আলোতে হয়তো মানুষ নিজেই নিজেকে দেখতে পায় না, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব তো অনুভব করতে পারে!" ইমামার গলা এখন ধরে আসছে। বলতে বলতে সে একা একাই চুপ হয়ে গেল। দুজনের হাতের কফি এখন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তারা সেটা পানও করতে চাচ্ছে না এখন আর। ইমামা ড্যাশ বোর্ড থেকে টিস্যু নিয়ে চোখ মুছল। সালার নিঃশব্দে তার হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে নিল। রাস্তার পাশের ময়লার বুড়িতে কাপগুলো ফেলে সালার

পুনরায় গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট করতে করতে সে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল, 'আরেক কাপ কফি দেব?'

: না।



ফলে বাসায় ফেরার কথা যেন অস্বাভাবিক নীরবতায় সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

১৭

: 'অফিসের একটু কাজ আছে আমার, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'
সালার পোশাক পালটে না ঘুমিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

: 'আমি অপেক্ষা করব।' ইমামা তাকে বলল।

: 'না, আমার একটু দেরি হবে।' সালার ইমামার হাতে ধরা
উপন্যাসটি না দেখার ভান করে বলল। সেটি সে রাতে পড়ার
জন্য নিয়ে এসেছে।

সালারের আসলেই অফিসের কিছু কাজ বাকি আছে। কিন্তু
স্টাডি টেবিলে বসতেই সে বুঝতে পারল, কাজটি করতে তার
মন টানছে না। কিছুক্ষণ সে ল্যাপটপ চালু করে টেবিলে বসে

রইল। তারপর হুট করে উঠে গেস্টরুমে চলে এলো। লাইট জ্বালাতেই বইপত্রে ঠাসা আলমারিটি তার চোখে পড়ল। সেটি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো। এই বইগুলো ইমামা কয়েক ঘন্টা আগেই ওখানে রেখেছে। অত্যন্ত যত্নসহকারে ও পরিচ্ছন্ন হাতে। লেখকদের নাম অনুসারে তাকগুলো সে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে রেখেছে। এতক্ষণ এগুলো তার কাছে 'ইমামার বইপত্র' হিসেবেই ছিল। তাই এগুলোর প্রতি তার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার এই বইগুলো আরব সাগরে নিয়ে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। সেটা না পারলেও অন্তত পাঞ্জাবের রাভি নদীতেই নিয়ে ছুড়ে দিতে তো পারবে! তার কাছে এখন এগুলো আর বই নয়; ফালতু আবর্জনা।

ইমামার স্বপ্নের সেই মনের মতো জীবন, যেখানে সে জালালুন নসরের সাথে কাটাত, সেই দেড়-দুই হাজার প্রেমকাহিনির উপন্যাসে, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রেমকাহিনি নয়; ওগুলো বরং দুটি চরিত্রের প্রেমকাহিনি। আর সেটা ইমামা আর জালালের।



মহান ব্যক্তিত্বের জন্য সবসময় উদার হৃদয় আর সহনশীলতার প্রয়োজন হয় না। মাঝে মাঝে অবুঝের মতো ভাব নিয়ে এড়িয়ে যাওয়াও জরুরি। তাকে সাজানো ওই বইগুলো সে সহ্য করতে পারছে না। ইমামার এমন অকপট স্বীকারোক্তির পর কোনো স্বামীই এগুলো সহ্য করতে পারবে না। সেও তো তার স্বামী। সালার বইগুলো তার ঘরে রাখতে চাচ্ছে না। সে চাইলে এমনটা করতেও পারে। ইমামা তার স্ত্রী। কয়েক দিন কান্নাকাটি, মান-অভিমান করে ঠিক হয়ে যাবে। তার এতটাও অধিকার নেই যে, সালারের অসম্মতি সত্ত্বেও বইগুলো সে এখানে রাখতে পারবে। সে নারী, জেদ করতে পারে। কিন্তু স্বামীর অমতে গিয়ে কিছু করতে পারবে না। আর সে পুরুষ। তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো জেদ ধরার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা তার ঘর। এটা তার পৃথিবী। এখানে সে কারও শর্ত মেনে চলবে না, আর না এভাবে জীবন কাটাবে। তারা ইচ্ছাধিকার নিয়েই পৃথিবীতে আসে, আর ইচ্ছাধিকার নিয়েই জীবন কাটায়।

তো এ বিষয়ে সবচেয়ে সহজ সমাধান হলো, সমাজ ও মস্তিষ্কের সমাধান। আর কঠিন সমাধান হলো, হৃদয়ের সমাধান। হৃদয় বলছে, 'বাদ দাও এসব। তুমি জানো এটি বিষের ঢোক, তবু গিলে ফেলো।' হৃদয় না বললেও সে এই জিনিসগুলো তার বাসা থেকে ছুড়ে ফেলতে পারবে না। এগুলোর মালিক তো ইমামা। যে বইগুলো একসময় ইমামার ক্ষতের মলম হয়ে প্রশান্তি দিয়েছিল, এগুলো সে ফেলে দিতে পারে না। এসব গল্পে সে যাকেই কল্পনা করুক না কেন, কিন্তু তাতে লেখা আছে ইমামার নাম। এটা সেই নাম, যা তার আত্মার অংশ। 'ধৈর্য অনেক প্রকারের হয়। কিন্তু কোনো প্রকারই আসান নয়।' ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালার কথাটি ভাবল। তারপর লাইট অফ করে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।



: সালার!

কিং চেয়ারে বসে ছিল সে। ইমামার ডাকে চমকে উঠল। ইমামা এখনো দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

: 'তুমি ঘুমাওনি এখনো? আমার কারণে চিন্তিত?'

'তাহলে সে বুঝতে পারল অবশেষে?' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল। দেখল, তার চোখে এক অদ্ভুত ভয় ও অস্থিরতা কাজ করছে। তার গায়ে নাইটি আর উপরে পশমি শাল জড়ানো। সালার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসে তাকে দেখতে লাগল। এখন সে চেয়ার ঝোলানো বন্ধ করে দিয়েছে। তার নীরবতা ইমামাকে আরও অস্থির করে তুলল।

: 'তোমার পরিবার কিছু বলেছে? কিংবা আমার পরিবারের কেউ কিছু বলেছে?'

ইমামা এসব কী ভাবছে? সালার আনমনে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল।
হায়! কারণ যদি 'এটাই' হতো, 'ওটা' না হতো-যেটা প্রকৃত
কারণ ছিল!

: 'আমার পরিবার কী বলবে? আর তোমার পারবারই-বা কী
করবে?' সালার মৃদু গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা
ওভাবেই বিক্ষিপ্ত মনে ওখানেই দাঁড়িয়ে রহল, যেন এই প্রশ্নের
উত্তর তার নিজেরই জানা নেই। কিন্তু সালার চুপচাপ তাকে
দেখতে থাকল। এমনভাবে, যেন ইমামার মনে হয় সালার
মিথ্যা বলছে। সালার অবাক হাচ্ছে যে, ইমামা কীসব দুশ্চিন্তা
মাথায় নিয়ে বসে আছে! এই মুহূর্তে ইমামার প্রতি তার দয়া
হতে লাগল।

: 'এখানে আসো।' সালার সোজা হতে হতে তার বাম হাত ধরে
টানল। সে দ্বিধাস্থিত হলো, থমকাল, তারপর তার কোলে
আবদ্ধ হয়ে গেল। সালার তার উভয় হাত তার শালের ভেতর

টুকিয়ে, শালটি তার গায়ে আরও সুন্দর করে জড়িয়ে তার পিঠে ছোট্ট বাচ্চার মতো চাপড় দিল। কপালে চুমু খেল।

: কেউ কিছু বলেনি। কেউ কিছু করেওনি। সবাই সবার জীবন নিয়ে ব্যস্ত। আর কখনো কিছু হলেও সেটা আমি দেখে নেব। তুমি এখন ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দাও।

: তাহলে তুমি চিন্তিত কেন?

: 'আমি...? আমার ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা থাকে।' সালার বিড়বিড়াল। বাহুতে জড়ানো ইমামা মাথা তুলে তার চেহারা দেখার চেষ্টা করল। বিয়ের এতদিনে এই প্রথম সে সালারকে এমন গম্ভীর দেখেছে।

: সালার, তুমি...।

: 'আমি চিন্তিত নই। আর হলেও সেটার কারণ তুমি নও। আর আমাকে কখনো এই প্রশ্ন করবে না।' ইমামার কথা পূর্ণ হওয়ার আগেই সালার তার কথা খামিয়ে দিয়ে, একটু কঠিন স্বরে উলটো তাকে শাসিয়ে দিল। ইমামা যেন তার মন পড়তে চেষ্টা করছে। সে কতক্ষণ কিছুই বলতে পারল না। তার ভঙ্গিমাও ছিল অনেক কঠিন। সালার সেটা বুঝতে পারল।

: 'কী বলছিলে তুমি? রান্নাঘরের কিছু জিনিসপত্র লাগবে?' সালার এবার অসম্ভব কোমল স্বরে প্রসঙ্গ পালটাল। ইমামা পুনরায় তাকে ওই জিনিসগুলোর নাম বলল।

: আগামীকাল রাতে যাব এসব কিনতে।

ইমামা এবার কিছুই বলল না। সালারের বুকে মাথা রেখে দেওয়ালে টাঙানো সফট বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে অনেক নোটস, ডেড লাইনের তালিকা ও অদ্ভুত

অদ্ভুত কিছু ইনডেক্স সংবলিত চাট দেখতে লাগল। তারপর সে সালারকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাংকে তুমি কী করো?'

সালার এক মুহূর্তের জন্য চমকাল। তারপর সে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বোর্ডের দিকে তাকাল।

: 'আমি অনর্থক কাজ করি।' সে বিড়বিড়াল।

: 'আমার কাছে ব্যাংক কখনোই ভালো লাগে না।' ইমামা বুঝতেও পারছে না, সে কেমন ভুল সময়ে ব্যাংক সম্পর্কে তার মন্তব্য পেশ করেছে।

: 'জানি, তুমি ডাক্তার পছন্দ করো।' সালারের ভঙ্গিতে শীতলতা ছেয়ে গেল।

: 'হ্যাঁ, ডাক্তার আমার কাছে ভালো লাগে।' ইমামা সরল মনে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে অনুভূতিশূন্যভাবে, একজন ব্যাংকারের

বুকে মাথা ঠেকিয়ে কথাটিতে জোর দিয়ে বলল। এটা বলার সময় ইমামার জালালের কথা মনে পড়ল না। কিন্তু সালারের পড়ল।

: 'কই, তুমি আমাকে বললে না তো, ব্যাংকে তুমি কী করো?'
ইমামা পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি পাবলিক রিলেশনশিপ সেক্টরে আছি।' এই মিথ্যাটি সে কেন বলল, তা সে নিজেও জানে না। ইমামা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে স্বস্তির নিশ্বাস নিল।

: এটা তবু ভালো। ভালো হয়েছে, তুমি সরাসরি ব্যাংকিংয়ে জড়িত নেই। তুমি কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছ সালার?

: 'গণসংযোগ নিয়ে।' সে একের পর এক মিথ্যা বলতে থাকল।

: এই সাবজেক্ট আমার খুব পছন্দ। তোমার অন্য কিছু হওয়া উচিত ছিল।

: 'অর্থাৎ ডাক্তার?' সালার জ্বলে উঠল। কিন্তু ইমামা খিলখিলিয়ে হাসল। 'গণসংযোগ নিয়ে পড়ে তো আর ডাক্তার হতে পারব না।' সালার জবাব দিল। ইমামা যদি তার মুখের দিকে একবার তাকাত, তাহলে এমন মনখুলে যা-তা বলে যেত না।

: 'আমি ডাক্তারদের ঘৃণা করি।' সালার শীতল গলায় বলল। ইমামা আচমকা তার বুক থেকে সরে পড়ল।

: 'কেন?' সে অবাক হয়ে সালারের মুখ দেখতে লাগল। সালারের চেহারা একদম প্রতিক্রিয়াহীন। ইমামা অন্তত তা পড়তে সক্ষম নয়।

: 'এমনিই।' সালার কাঁধ কুঁচকে অত্যন্ত উদাসীনভাবে বলল।

: 'এমনিই কীভাবে হয়? কোনো কারণ অবশ্যই আছে।' ইমামা অপ্রস্তুত হলো।

: 'তুমি ব্যাংকার পছন্দ করো না কেন?' সালার পিঠাপিঠি প্রশ্ন করল।

: 'তারা অসৎ হয়।' ইমামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল।

: 'ব্যাংকাররা?' সালার অবিশ্বাস্য চোখে বলল।

: 'হ্যাঁ।' ইমামা এখনো গম্ভীর। সালারের বাহু থেকে বেরিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সালার তাকে থামানোর চেষ্টা করল না। ইমামা এখন একদম কাছে গিয়ে বোর্ডটি দেখছে। তাতে লাগানো নোট ও ডেড লাইনগুলো পড়ছে।

সালারকে গর্বভরে বলতে শুনল। : 'ব্যাংকাররা মানুষের অর্থ ও সম্পদ নিরাপদ রাখে।' ইমামা তার পেছনে দাড়িয়ে।

: 'আর অর্থ মানুষের ইমান নষ্ট করে দেয়।' ইমামা পেছন না ফিরেই প্রত্যুত্তর করল।

: 'তারপরও মানুষ আমাদের কাছেই আসে।' সালার একই ভঙ্গিতে বলল। এবার ইমামা পেছন ফিরল।

: 'কিন্তু তারা আপনাদের ওপর ভরসা করে না।' ইমামা মুচকি হাসছে। কিন্তু সালার গম্ভীর। সে চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হ্যাঁ-বাচকে মাথা নাড়াল।

: একজন অসৎ ব্যাংকার কেবল আপনার অর্থ নিতে পারে। কিন্তু একজন অসৎ ডাক্তার আপনার জীবন নিয়ে যেতে পারে। তাহলে বেশি ভয়ংকর কে?

ইমামা এবার কিছু বলতে পারল না। কয়েক মিনিট সে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু পেল না। তারপর সে হুট করে

সালারকে বলল, 'আমি যদি ডাক্তার হতাম, তখনো কি তুমি ডাক্তারদের ঘৃণা করতে?'

ইমামা এখন তাকে মানসিক চাপে ফেলতে চাচ্ছে। এটা ভুল। কিন্তু এখন এটা ছাড়া আর সে কীই-বা করতে পারে?

: 'আমি সম্ভাবনার ওপর কোনো সিদ্ধান্ত দেই না। সিদ্ধান্ত দেই বাস্তবতার ওপর। যেখানে 'যদি' বলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই, সেখানে আমি মতামত পেশ করতেও পারি না।' সালার কাঁধ কুঁচকে স্পষ্ট ভাষায় বলল। ইমামার চেহারা কিছুটা ধূসর হয়ে উঠল। উত্তর ছিল অপ্রত্যাশিত, অন্তত সালারের কাছ থেকে এমনটা প্রত্যাশা ছিল না তার।

: আর বাস্তবতা হলো, তুমি আমার স্ত্রী। আর তুমি ডাক্তার নও। আমি একজন ব্যাংকার, সেইসাথে আমি ডাক্তারদের ঘৃণা করি।

সালারের স্বরের শীতলতা এবার ইমামাও টের পেল। এটি কি স্বরের শীতলতা নাকি চোখের শীতল কঠোরতা? সে যাইহোক, প্রত্যুত্তরে ইমামা কিছুই বলতে পারল না। নড়তেও পারল না। গত এক সপ্তাহে সালার তো তার সাথে এভাবে কখনো কথা বলেনি।

: 'অনেক রাত হয়েছে, আমাদের ঘুমিয়ে পড়া উচিত।' দেওয়াল ঘড়িতে নজর বুলিয়ে ইমামার দিকে তাকিয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে বেডরুমে চলে গেল। ইমামা দেওয়াল লাগোয়া দোলায়মান চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে রইল। সালারের মুড পরিবর্তনের কোনো কারণ সে খুঁজে পেল না। সে তো এমন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলেনি যে, যার জন্য সালার এমন কঠিন শব্দ ব্যবহার করবে! ইমামা ওখানে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যকার আলোচিত কথাগুলো পুনরায় শুরু থেকে মনে করার চেষ্টা করল।

হয়তো ব্যাংকারদের ব্যাপারে আমার মন্তব্য তার ভালো লাগেনি। ইমামা যেন পর্যবেক্ষণ করল। কিন্তু কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত আসতে পারল না।



ইমামা কিছুক্ষণ পর বেডরুমে এলো। এসে দেখল লাইট অন। সালার ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বিছানায় এসে বসে পড়ল। সারা দিন কাজ করে খুব ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন তার ঘুম একদম উধাও হয়ে গিয়েছে। সালারের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহের সমস্ত আশঙ্কা তার মনে পুনরায় জেগে উঠল। সালার তার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিল, ইমামাও সেদিক ফিরে বসে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সালার তার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। ঘুমন্ত সালারকে বেশ প্রশান্ত লাগছে তার কাছে।

'অবশেষে পুরুষেরা এত তাড়াতাড়ি বদলে যায় কেন? এতটা ভরসাহীন হয়ে ওঠে কেন?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইমামা ভাবল। তার মর্মপীড়া আরও বেড়ে গেল। জীবন এতটাও নিরাপদ হয়ে ওঠেনি, যতটা আমি একটু আগে ভেবেছিলাম। সালার নিশ্চয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নয়। ইমামা হাত বাড়িয়ে লাইট অফ করে দিল। কিন্তু ঘুমানোর জন্য সে শুয়ে পড়ল না। অন্ধকারে সালার পুনরায় তার দিকে পাশ বদলাল।

: তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?

: এখনই ঘুমিয়ে যাব।

সালার হাত বাড়িয়ে বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিল। ইমামা চুপচাপ কন্ডল টেনে সোজা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। সালার কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পুনরায় লাইট নিভিয়ে দিল। ইমামাও পুনরায় চোখ খুলল।

: তোমার তো সাহরিতেও উঠতে হবে ইমামা!

ইমামা অবাক হলো, অন্ধকারেও তাকে চোখ খুলতে কীভাবে দেখে ফেলল সে! ঘাড় ফিরিয়ে সে সালারের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

: 'তুমি জানো সালার, দুনিয়ার সবচেয়ে অনর্থক কাজ কোনটি?'
ইমামা তার দিকে পাশ ফিরে বলল।

: কী?

: 'বিয়ে।' সে অবচেতনেই বলে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর সে সালারকে বলতে শুনল, 'I agree. আমিও একমত।'

ইমামার অজান্তেই দুঃখ লাগল। সালারের অন্তত এ বিষয়ে দ্বিমত করা উচিত ছিল। অন্ধকারে ইমামা তার বাহু জড়িয়ে

ধরতে অনুভব করল। সালার তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতে খেতে বলল, 'গুড নাইট।' এটা ছিল ইমামাকে ঘুম পাড়ানোর আরও একটি প্রচেষ্টা। ইমামা কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল। তারপর কিছুটা অস্থির হয়ে বলল, 'সালার!' সালার অনিচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চোখ খুলল।

: কী হয়েছে তোমার?

: 'কিছু না।' এখানে মিথ্যা বলাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ, সত্যিটা ক্ষতিকর হয়ে পড়বে। 'তুমি আমার সাথে এত কঠোর ব্যবহার করলে!' ইমামা অবশেষে অভিযোগ করল।

: 'অফিসের কিছু কাজ নিয়ে আমি বিরক্ত। হয়তো এজন্য কঠোর হয়ে গেছে।' সালার দুঃখ প্রকাশ করল। কথা বলতে বলতে সালার তার চুলে আঙুল ফেরাচ্ছিল।

অফিসের কী সমস্যা?

: এগুলো হয়ই ইমামা। You just don't worry. তুমি কোনো চিন্তা করো না। যদি পরে কখনো আমার এমন মুড হয়, তাহলে তুমি টেনশন করো না। আর আমাকে বেশি প্রশ্নও করো না। আমি নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাব।

তার যুক্তি ইমামার বুঝে এলো না। তবে সে নিশ্চিত হয়ে গেল।

: আমি দুশ্চিন্তা করছিলাম, কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমার কোনো কথা তোমার খারাপ লেগেছে। আমি ব্যাংকারদের মন্দ বলেছিলাম না, এজন্য।

: 'আমি তো তোমার সাত খুন মাফ করতে পারি। এটা তো কোনো বিষয়ই নয়।'

সালার পুনরায় দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল।

: তুমি ঠিকই বলেছ, ডাক্তারদের মাঝেও অনেক মন্দ গুণ থাকে। কিন্তু আমার কেবল ভালো লাগে তাদের, এতটুকুই। ব্যস, ডাক্তারির প্রতি আমার ভালোবাসা কাজ করে। আমিও তাদের সমস্ত ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পারি।

সালারের ঘুম একদম উধাও হয়ে গেল। ইমামা এবার অন্য আরেকটি প্রসঙ্গ টেনে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সে তাকে নতুন আঙ্গিকে একই বিষয়ে টেনে নিচ্ছে।

: 'সত্যিই তুমি ডাক্তারদের ঘৃণা করো?' ইমামা এখন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করছিল।

: যেটা তোমার পছন্দ, সেটা কি আমি ঘৃণা করতে পারি? দুষ্টুমি করছিলাম আমি।

জবাব শুনে ইমামার চোঁটে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। এবার সেও সালারকে বাছ বন্ধনে আবদ্ধ করতে করতে বলল, 'এখন আমার

ঘুম পাচ্ছে, তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো।" ইমামা চোখ বন্ধ করে ফেলল। সালার তার চুলে আঙুল ফেরাতে থাকল। প্রিয়তমাদের দুটি বিষয় সর্বজনীন। তারা উদাসীন হয়, আর নিজের উদাসীনতার ব্যাপারে অজ্ঞও হয়। আর এ দুটি বৈশিষ্ট্য তার প্রিয়তমার মাঝেও রয়েছে। জালালুন নসরের প্রতি তার আবারও প্রচণ্ড হিংসা অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু ঈর্ষা তার নিজের প্রতিই হলো, এই ভেবে যে, ইমামা এখন তার কাছেই আছে, তার হয়েই আছে।

১৮

: 'সাহেব আপনার কাছে খবরের কাগজের কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন। আর এগুলো হলো ম্যাগাজিন। এগুলোর মধ্যে যেগুলো ভালো লাগে বলে দিন, আমি নিয়মিত দিয়ে যাব।' পত্রিকার হকার তার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিতে দিতে বলল। তাতে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের বড় একটি তালিকা লেখা। ইমামা ঘুমাচ্ছিল। কলিং বেলের শব্দ শুনে উঠে

এসেছে। কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না যে, লোকটি কী বলছে।
সালারের বাসায় সে কেবল রবিবারে খবরের কাগজ দেখেছিল।
আর সেটা সালার হকারের কাছ থেকে নিজেই কিনেছিল। সে
নিজে অফিসেই খবর পড়ে। এখন নিশ্চয় ইমামার জন্যই
খবরের কাগজের বন্দোবস্ত করছে। ইমামা একনজর তালিকা
দেখে হকারকে একটি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের কথা বলল।
লোকটি পত্রিকাটি তার হাতে ধরিয়ে চলে গেল। ইমামা হাই
তুলতে তুলতে পত্রিকা নিয়ে ভেতরে এসে রেখে দিল। দশটা
বাজতে চলেছে। জানালার বাইরে কুয়াশা হালকা হতে শুরু
করেছে। তবে এখনো খানিক আবছা ছায়া রয়ে গেছে।

পরিচারিকা আসতে আসতে সে পত্রিকা পড়ে ফেলল। সে আজ
একা আসেনি। তার সাথে মালিও এসেছে। মালি ফোরকানের
গাছগুলো দেখতে এসেছিল। সালারের বাগান দেখতে রবিবারে
আসে সে। মাঝে মাঝে নওশীন নিজেই তার সাথে এগুলো
দেখতে আসে। সালারের অ্যাপার্টমেন্টের একটি চাবি তাদের

কাছেও আছে। ইমামা আছে বলে নওশীন আজ মালিকে একাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইমামা ছাদে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিচে চলে এলো। ওখানে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারল, মালিকে নির্দেশনা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সে

নিপুণভাবে তার কাজ করে চলছে। ইমামা ফিরে রুমে চলে এলো। পরিচারিকা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে রান্নাঘরের বাসনপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখে, সেগুলোর প্রশংসা করল। ইমামা অবচেতনেই খুশি হলো।

: 'আপা, এই ঘরটা এখন ঘরের মতো লাগছে।' সে ইমামাকে বলল। সে এখন সালারের স্টাডি রুম ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করছে। ইমামা মুচকি হেসে সালারের টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল।



: 'আপা, আমি করছি, আপনি রাখুন।' পরিচারিকা তাকে বাধা দিল।

: না, সমস্যা নেই। তুমি বাকি কাজ করো। আমি এখন অবসর আছি, তাই করছি। ইমামা তাকে এটা বলতে পারছে না যে, সে চায় না সালারের কোনো জিনিস এদিক, সেদিক হয়ে যাক। কিন্তু এটা ভাবতে ভাবতে সে এটা ভুলে গেল যে, এই বাসায় এতদিন এই পরিচারিকাই এসব পরিষ্কার করেছে।

মেল ট্রে-টা নিমন্ত্রণপত্রের বন্ধ ও খোলা খামে প্রায় ভরে আছে। ইমামা একটি খাম খুলে দেখল। সেটি কোনো এক ইফতার অনুষ্ঠানের দাওয়াতি কার্ড। একে একে সবগুলো খামই সে খুলে দেখতে লাগল। সবগুলো কার্ডই কোনো না কোনো ইফতার পার্টি কিংবা কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কিছু কিছু কার্ডে তো সে দু-তিন জায়গায় আমন্ত্রিত রয়েছে। সালার নিশ্চয় অসম্ভব সামাজিক জীবনযাপন করছে। ইমামা ভাবল। আমি এখানে এক সপ্তাহ ধরে আসার কারণে সে হয়তো এসব

কোনো অনুষ্ঠানেই যেতে পারছে না। এটা ইমামার আরও একটি পর্যবেক্ষণ। পনেরো-বিশটি কার্ড দেখেই তার মন আনন্দে ভরে গেল। কার্ডগুলো উঠিয়ে পুনরায় রেখে দিল। আরও কিছু কার্ড দেখলে কিংবা নিচের মেলের কোনো খামের ঠিকানার দিকে খেয়াল করলে হয়তো সে সালারের পদমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারত। বুঝতে পারত সে ইনভেস্টমেন্ট সেক্টরে রয়েছে, পিআরপি-তে নয়। এই মিথ্যাটা অন্তত ধরতে পারত ইমামা।

: 'আপা, রাতে কি কোনো মেহমান আসছিল?' পরিচারিকার গলা শুনে সে চমকাল। ছাইদানি হাতে নিয়ে সে খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছিল।

: 'না।' ইমামা প্রশ্ন না বুঝেই উত্তর করল।

: 'তাহলে এই সিগারেট কে খেয়েছে? সালার সাহেব তো সিগারেট খান না।' পরিচারিকা প্রচণ্ড অবাক হয়ে আছে। ইমামা

কতক্ষণ কিছুই বলতে পারল না। পরিচারিকা যেন সালারের সিগারেট না খাওয়ার বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে চাচ্ছে। অর্থাৎ সালার কি সত্যিই ধূমপান করে না? মাঝেমধ্যে এক-আধটা সিগারেট পান করে না!?! খায় হয়তো। আর পরিচারিকা সেটাকে মেহমানদের পান করা সিগারেট মনে করে থাকে।

: 'ওহ! হ্যাঁ, তার কিছু বন্ধু এসেছিল। আমার মনেই ছিল না।' কয়েক মুহূর্ত পর ইমামা বলল। আরও কিছু বলার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল।

: 'আমি দেখছি।' বলেই ইমামা বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল।

: 'লন্ড্রি নিতে এসেছি।' দরজায় একটি ছেলে সালারের কিছু ধোয়া শুকনো কাপড় হ্যাঙ্গারে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে একটি বিল পেপার বাড়িয়ে দিতে দিতে ছেলেটি বলল, 'কাপড় চেক করে নিন।'

বিলের সাথে লব্ধিতে পাঠানো কাপড়ের লিস্টও দেওয়া আছে। ইমামা কাপড়গুলো লাউঞ্জে এনে একে একে লিস্টের সাথে মেলাতে লাগল। কাপড় ঠিকঠাক আছে। পরিচারিকা ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। ইমামা বিলের টাকা আনতে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল, পরিচারিকা লব্ধি বয়ের হাতে সালারের ময়লা কাপড়ের একটি ব্যাগ ধরিয়ে দিচ্ছে। তাতে একটি তালিকাও সাঁটানো আছে। নিশ্চয় সেটা ওই ময়লা কাপড়গুলোরই তালিকা। লব্ধি বয় তখন একটা কাগজে কিছু নোট করছে।

: 'আপা, আপনার কোনো কাপড় দিতে হবে?' পরিচারিকা তাকে আসতে দেখেই জিজ্ঞেস করল।

: 'না, আমি এই বিল দিতে আসছি।' ইমামা বিলের টাকা ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিল। প্রত্যুত্তরে উলটো ছেলেটি একটি রশিদ তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

: 'বিল তো মাসের শুরুতেই সংগ্রহ করে ফেলা হয়' পরিচারিকা তাকে থামাল। সে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে এলো। ইমামাও ভেতরে এসে রশিদের ওপর চোখ বোলাল। এটা সালারের কাপড়ের লিস্ট, যেগুলো মাত্র নিয়ে গেল।

: 'লন্ড্রির কাপড় তুমি কোথেকে এনেছ?' ইমামা লিস্ট পড়তে পড়তে পরিচারিকাকে থামাল।

: 'সালার সাহেব ব্যাগে কাপড় ভরে ওপরে লিস্ট করে রেখে যান। ব্যাগ লন্ড্রিতেই রাখেন তিনি।' এটা বলে পরিচারিকা পুনরায় ভেতরে চলে গেল। ইমামা বিলের দিকে তাকাল। লন্ড্রি তো সে নিজেই করতে পারত। প্রতি সপ্তাহে এর পেছনে এত টাকা খরচ করা অপচয়। ইমামা ভাবল।

পরিচারিকা তখনো ওখানেই আছে, এমন সময় এক লোক পর্দা নিয়ে এলো। পর্দা তারা বানাতে দিয়েছিল।

: 'আপা, আপনি কোনো পর্দা বানাতে দিয়েছিলেন?'
ইন্টারকমে রিং বাজতেই পরিচারিকা ফোন কানে চেপে
ইমামাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা খানিক অবাক হলো।

: হ্যাঁ, কেন?

নিচে গেটে একজন সেটা নিয়ে আসছে। দারোয়ান ইন্টারকমে
কল করে এর কথাই জিজ্ঞেস করছে। 'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। আপা
পর্দা বানাতে দিয়েছেন।' পরিচারিকা ইমামাকে জিজ্ঞেস করে
দারোয়ানকে বলল। ফোন রেখে সে পুনরায় লাউঞ্জ পরিষ্কার
করতে লেগে গেল। কিচেন কাউন্টারে গ্লাস সেট পরিষ্কার
করতে করতে ইমামার অদ্ভুত হীনম্মন্যতা হতে লাগল।
এতদিনে আসতে-যেতে সে অনেকবারই সে ইন্টারকম
দেখেছে। কিন্তু তার মাথায় আসেনি যে, এখানে দরজা এত
কাছে। তাহলে এই ইন্টারকমের কী প্রয়োজন এখানে? অথচ
পরিচারিকা এদিকে এই বাসার প্রতিটি জিনিস তার চেয়ে অধিক
বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা ও সহজতার সহিত ব্যবহার করছে।

: সালার, লাউঞ্জ এখন সুন্দর লাগছে না?

সালার লাউঞ্জের জানালায় লাগানো নতুন পর্দাগুলোর দিকে তাকাল। একটু আগেই সে বাসায় ফিরেছে। ইমামা অব্যাহত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে, আসতেই তাকে পর্দার কথা জানান দিল। সে না বললেও, লাউঞ্জে পা ফেলতেই সালার এই স্পষ্ট পরিবর্তনকে উপেক্ষা করতে পারত না।

: 'অনেক।' সে তার হতাশা লুকিয়ে বলল। ইমামা গর্বভরে পর্দার দিকে তাকাল।

সালার আজও পথেই ইফতারি করে এসেছে। ইমামা ইফতার করেছিল ফোরকানের বাসায়। আর এখন তারা দুজন একসাথে বসে নিজেদের বাসায় ডিনার করছে।

: 'তো জনাবা, আজকের দিন কেমন কাটল?' খাওয়া শুরু হতেই সালার তাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা তাকে সারা দিনের কাজ বলতে লাগল। বিয়ের পর এটা তাদের মধ্যে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা। পুরো দিনে সালার তাকে দুবার এক-দেড় মিনিটের জন্য কল করেছিল। কিন্তু আলোচনা কেবল ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

: 'তার মানে আজ অনেক কাজ করতে হয়েছে?' সালার তার পুরো দিনের বিস্তারিত বয়ান শুনে বলল।

: 'কী কাজ? আমি কী করেছি? আমি তো কিছুই করিনি।' তার কথায় ইমামা খানিক অবাক হয়ে বলল।

: যতটুকুই করেছ, অনেক।

: 'আগামী সপ্তাহ থেকে আমি নিজেই তোমার কাপড় ধুয়ে দেব।' ইমামা সালারের কথা উপেক্ষা করে বলল। 'সেইসাথে ইস্ত্রিও করে দেব।'

: 'আমি তোমাকে কাপড় ধোয়ার জন্য আনিনি।' সালার তার কথা রুখে দিল।

: আমি জানি। কিন্তু আমি অবসর বসে থাকি সারা দিন। তাছাড়া নিজের কাপড়ও তো ধুতেই হয়। তাহলে তোমারগুলোও ধুতে পারব।

: 'তুমি তোমার কাপড়ই কেন ধোবে? লব্ধি ভ্যান প্রতি সপ্তাহে আসে। তুমি তোমার কাপড়ও দিয়ে দিবে।' সালার খাওয়া থামিয়ে বলল।

: 'টাকা নষ্ট হবে।' সে অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে ফেলল।

: 'কোনো সমস্যা নেই।' সালার কাঁধ কুঁচকে একই ভঙ্গিতে বলল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকাল।

: আর আমি সারা দিন কী করব?

: 'ওসবই, যা বাকি মহিলারা করে। শুয়ে থাকো, টিভি দেখো, ফোনে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করো।' সালার মুচকি হেসে বলল।

: 'আমার কোনো বন্ধু নেই।' ইমামা হুট করে গম্ভীর হয়ে গেল। সালার খানিক অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

: কেউ তো থেকে থাকবে?

: না, কেউ নেই।

: কেন?

ইমামা খেতে খেতে কিছু ভাবতে লাগল। তারপর বলল, 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমি এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম যে, কাউকে বন্ধু বানানোর কথা মনেও আসেনি। বন্ধুত্ব হলে প্রশ্ন হতো। প্রশ্ন হতো, আমার সম্পর্কে, আমার পরিবার সম্পর্কে। তারপর কেউ যদি বাসায় আসত, আর সে আগে থেকেই আব্বুর ফ্যামিলি কে চিনে থাকত, তাহলে? অথবা সায়েদা আম্মাকেই চিনত। ওই সময়ে বন্ধুত্ব আমার জন্য চরম মূল্যের ছিল। সেই সক্ষমতা আমার ছিল না। তারপর অফিস জব যখন নিলাম, তখন সহকর্মীদের সাথে কমবেশি গালগল্প হতো। কিন্তু একা থেকে আমি এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, মানুষের সাথে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না। তাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে পারতাম না। তাদের বাসায় যেতে পারতাম না। তাহলে বন্ধুত্ব হবে কীভাবে? তাই বই পড়তে ভালো লাগত আমার। পেইন্ট করতে ভালো লাগত।

: 'মানুষের সাথে মেলামেশা করবো। বন্ধু গড়বো। আগের বিষয় ছিল ভিন্ন। কিন্তু এখন তোমাকে কিছুটা মিশুক হতে হবে। এখন তোমার ঘর আছে। সহকর্মীদের দাওয়াত করতে পারো। অন্তত ফোনে তাদের সাথে মনখুলে কথা বলতে পারো।' সালার তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে লাগল।

: 'তুমি নিজে মিশুক, তাই বলছ।' ইমামা জবাবে বলল।

: 'হ্যাঁ, আমার চাকরির জন্য মিশুক হওয়া প্রয়োজন। রমজানের পর অনুষ্ঠান আছে। কিছু দিনার অনুষ্ঠানও আছে। কিছু বন্ধুদের সাথে তোমাকেও দেখা করা। ভালো লাগবে তোমার।' সালার তাকে বলল।

: 'আমি তোমার ডেস্কের ওপর দেখেছি, ইফতার, দিনারের আমন্ত্রণপত্র। আমার জন্য তুমি এসবে যাচ্ছ না আজকাল?' ইমামা জিজ্ঞেস করল।

: 'না, আমি ইফতার পাটি বা ডিনারে যাই না।' সালার ভাসাভাসা-ভাবে বলল।

: 'কেন?' ইমামা অবাক হলো।

: কারণ, আমি মনে করি এই পাটিগুলো মাহে রমজানের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা বিনষ্ট করে। আমি রমজানে কারও বাসায় ইফতার করতে যাই না।

: 'কিন্তু ফোরকানের বাসায় তো যাও।' ইমামা অকপটে বলে ফেলল। সালার হেসে দিল। আর তারা এখনো ফোরকানের বাসা থেকে আসা খাবারই খাচ্ছে।

: 'ফোরকানের বাসায় আমি রমজানের আগে থেকেই খাই। সে যদি আমাকে ইফতার বা ডিনারের জন্য ডাকে, তখন খাবারের জন্য বাড়তি বিশেষ কোনো আয়োজন করে না। আমরা তা-ই খাই, যা স্বাভাবিক দিনে তাদের বাসায় রান্না হয়। কিন্তু স্বাভাবিক

দিনে তাদের বাসায় এই বিশেষ খাবারগুলো রান্না হয় না।
বলতে বলতে সালার টেবিলে উপস্থিত তিন চারটি আইটেমের
দিকে ইশারা করল।

: 'তাহলে?' ইমামা দ্বিগুণ অবাক হলো।

: 'এই সমস্ত আয়োজন ফোরকান আর ভাবি তোমার জন্য
করেছে। কারণ, আমাদের নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে। তাই
তোমার জন্য সাহরি আর ইফতারিতেও বিশেষ ব্যবস্থা করা
হচ্ছে। আর নয়তো আমরা তো সাধারণ খাবারই খাই। রমজান
মাসে আমরা আমাদের রান্নাখরচ অন্যান্য মাসের তুলনায়
অর্ধেক করে দেই। আর বাকি অর্ধেকের টাকা দিয়ে আমরা অন্য
কোনো পরিবারের পুরো রমজানের বাজার-সদাই করে দেই।
খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তোমার।' সালার তাকে মনোযোগী
করল। সে নিজে খাবার শেষ করে এখন মিষ্টি খাচ্ছে। এটা ছিল
ডাক্তার সিবতে আলির বাসার নিয়ম। রমজান মাসে উনার ঘরের

খরচ অর্ধেক হয়ে যেত। বাসার দুই পরিচারকের মাসিক খরচ ওখান থেকেই করতেন।

: 'ইমামা!' সালার আবারও তাকে খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করাল। সে খাবার খেতে লাগল। সালার মিষ্টিও খেয়ে ফেলেছে। এখন ইমামার খাবার শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। পাশাপাশি সে ফোনে মেসেজ করতেও ব্যস্ত। সে অনেকটা বদলে গিয়েছে। আর তার ভেতরকার এই পরিবর্তন, অনেকটাই ডাক্তার সিবতে আলির অনুগ্রহের ফসল। আর কতটুকু তার নিজের চিন্তার ফসল, তা অনুমান করা কঠিন। সালার খাবার খেতে বসে সবসময় ইমামার খাওয়া শুরু করার অপেক্ষা করে। খেতে খেতে কিছু না কিছু সে তার পাতে তুলে দেয়। আর তার খাওয়া শেষ হওয়ার পরেই টেবিল ছেড়ে ওঠে। ইমামা এই বিষয়গুলো খেয়াল করতে চায়নি। কিন্তু সে এগুলো খেয়াল না করে থাকতেও পারে নি। সালার অদ্ভুত। 'অদ্ভুত!' এটা ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ তার মাথায় এলো না।

রাতের খাবারের পর তারা রান্নাঘরের জন্য বাজার-সদাই করতে গেল। ইমামা যদি সালারের রমজান মাস সম্পর্কিত এই আলোচনা না শুনত, তাহলে নিশ্চিত সে অনেক লম্বা-চওড়া একটি তালিকা বানিয়ে বসেছিল। কিন্তু সে কেনাকাটার সময় খুব হিসাব করে কেনাকাটা করল। বেশিরভাগ জিনিস ডিববা ও বোতলজাতই ছিল। রান্নাবান্নার জিনিস সে খুব কমই কিনল। আজ তারা অন্য একটি জায়গায় কফি পান করল।

: 'তোমার ওই সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে?' গাড়িতে ইমামার হঠাৎ খেয়াল হলো।

: 'কোন সমস্যা?' সালাার চমকে তার দিকে তাকাল।

: 'ওই, যার জন্য গতকাল রাতে তুমি খুব চিন্তিত ছিলে।' ইমামা তাকে মনে করিয়ে দিল। সালাার অবচেতনেই বিড়বিড়াল, 'হায়! যদি এমনটাই হতো।'

: 'তার মানে হয়নি?' ইমামা চিন্তিত হলো।

: 'হয়ে যাবো' সালার এক অদ্ভুত হাসি হেসে তার দিকে তাকাল। 'পরশু আমি করাচি যাচ্ছি।' সালার প্রসঙ্গ পালটাল।

: 'কতদিনের জন্য?' ইমামা চমকাল।

: 'ভোরে গিয়ে রাতে ফিরে আসব। আমি মাসে দু-তিনবার করাচি যাই। তুমিও যাবে সাথে?' সালার হাসল। ইমামা হতবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

: এক দিনের জন্য?

: হ্যাঁ।

: তুমি অফিসের কাজে যাচ্ছ, আমি কী করব ওখানে?

: 'তুমি আনিতার সাথে শপিংয়ে চলে যেয়ো। সে তোমাকে করাচি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে। আগে কখনো গিয়েছ ওখানে?'
সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'না।' ইমামা কিছুটা উচ্ছ্বসিত হতে শুরু করেছে। সমুদ্র তার খুব প্রিয়। আর জীবনে এই প্রথম সে সমুদ্র দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

: 'আমি আনিতার সাথে প্রোগ্রামের ব্যাপারে আলোচনা করি। আমি অফিসে, তুমি আমার বোনের সাথে মার্কেটে। আমরা তো আপাতত এভাবেই হ্যানমুন উদযাপন করতে পারি।' সালার আবারও তার সাথে ঠাট্টা করল। ইমামা হাসতে লাগল। সালারকে সে বলতে পারল না যে, যে জীবন সে কাটিয়ে এসেছে, তার তুলনায় এই স্বাধীনতা তার কাছে জান্নাতের মতো লাগছে।



: 'এটা কী?'

ইমামা কিনে আনা বাজার-সদাই, ডিব্বা ও বোতলগুলোতে ভরছে, এমন সময় সালার স্টাডি রুম থেকে একটি খাম নিয়ে রান্নাঘরে এলো।

: 'এতে তোমার চেক বুক রয়েছে।' সালার তাকে বলে খামটি কাউন্টারে রেখে চলে গেল। ইমামা খাম খুলে ভেতরের চেক বুকটি বের করল। সাথে একটি পে স্লিপও বেরিয়ে এলো। সেটি ৩০ লাখ টাকার স্লিপ। ইমামার মনে হলো, সে হয়তো পড়তে ভুল করছে। সে স্লিপটি পুনরায় পড়ল। সেটি আসলেই ৩০ লাখের স্লিপ। সালার তার অ্যাকাউন্টে ৩০ লাখ টাকা কেন জমা করাবে? নিশ্চয়ই সালারের কোনো ভুল হয়েছে। ইমামা খাম হাতে করে স্টাডি রুমে চলে এলো। এসে দেখল সালার কম্পিউটারে কাজ করছে।

: 'সালার, তুমি জানো, তুমি কত বড় একটা ভুল করেছ?'
ভেতরে এসেই ইমামা বলল।

: 'কী ভুল?' সালার চমকে উঠল। ইমামা তার কাছে এসে পে
স্লিপটি সামনে মেলে
ধরল।

: এটা দেখো একটু, এটা কী?

: 'পে স্লিপ।' সালার এক পলক তাকিয়ে পুনরায় কম্পিউটারে
দৃষ্টি দৌড়াতে লাগল।

: আমার অ্যাকাউন্টে তুমি কত জমা করিয়েছ?

: '৩০ লাখ।' ইমামা হতবাক হলো। 'আরও কিছু বাকি আছে।
সাত লাখের চেয়ে একটু বেশি। কয়েক মাসের মধ্যে সেটাও

দিয়ে দেবা" সালার কিছু একটা টাইপ করতে করতে উদাসীনভাবে বলে চলল।

: 'কিন্তু কেন দিবে আমাকে? কী জন্য?' সে হতভম্ব হয়ে রইল।

: 'তোমার মোহরানা বাবদ।' সালার একই ভঙ্গিতে বলল।

: 'আমার মোহর তো দুই লাখ টাকা ছিল।' ইমামার মনে হলো সালার হয়তো ভুলে গিয়েছে।

: 'সেটা ছিল আমনার। আমি তোমাকে আরও বেশি মোহরানা দিতে চাই।' সালার কাঁধ কুঁচকে বলল।

: 'কিন্তু এটা তো অনেক বেশি সালার!' ইমামা একদম গম্ভীর হয়ে গেল। 'তোমাকে কে বলেছে যে আমাকে এত টাকা দাও?'

: 'তুমি নিজেই আমাকে লিখে দিয়েছ এই সংখ্যা।' সালার এবার মুচকি হাসতে হাসতে মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকাল।

: 'আমি? কবে...!' সে বলতে বলতে থেমে গেল। 'ওই পরিমাণ তুমি এজন্যই লিখিয়েছিলে?' তার মনে পড়ে গেল।

: 'হ্যাঁ।' সালারের ভাবলেশহীনতা এখনো বহাল রয়েছে।

: 'তুমি কি পাগল?' ইমামার অজান্তেই হাসি পেল।

: 'হয়তো।' সালার অবচেতনেই বলল।

: 'আচ্ছা, আমি যদি ১০০ কোটি লিখে দিতাম তাহলে কী করতে?' ইমামা এখন বিদ্রূপ করল।

: তাহলে ১০০ কোটিই দিয়ে দিতাম।

: বাহ কী দানশীল! কোথেকে দিতে? প্রতারণা করতে?

সালার হুট করেই অসন্তুষ্ট হলো।

: 'কেন করতাম? কামিয়ে দিতাম?' সালার তার কথায় মনঃক্ষুণ্ণ হলো।

: তখন সারা জীবন কামিয়েই যেতে হতো তাহলে।

: 'ভালোই হতো, সারা জীবন তোমার ঋণী হয়ে থাকতাম! আসলেই ভালো হতো। তাহলে কি ১০০ কোটি চাও?' সালার ঠাট্টা করে হেসে বলল। ইমামার চোখে

হঠাৎ কয়েক বছর আগের সালার ভেসে উঠল।

: 'কেন দিচ্ছ?' সে গম্ভীর হয়ে কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল।

: আমার স্ত্রী তুমি, তাই।

: এত টাকা কোথেকে এসেছে তোমার কাছে?

: 'ইমামা, এটা আমার জমানো টাকা' সালার অসম্ভব সহনশীলতা প্রদর্শন করে বলল।

: 'জমানো টাকা, তাহলে আমাকে কেন দিচ্ছ?' ইমামা খানিক অসন্তুষ্ট হলো।

: 'আমার মনে চায়, তোমাকে দেই। এই পুরো দুনিয়া যদি আমার হতো, তাহলে এই সমস্ত দুনিয়া তোমাকে দিয়ে দিতাম। আমি উপার্জন করছি। টাকা হয়ে যাবো। এতে আমার কিছু যায়-আসে না।' কী রাজকীয় ভঙ্গি তার!

: কিন্তু এত বিশাল পরিমাণ...!

সালার তার কথা খামিয়ে দিল।

: 'আমি এত বিশাল পরিমাণ দিতে চাইনি। কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো মোহরানা দিতে চেয়েছি। এজন্য তোমাকে একটি পরিমাণ লিখতে বলেছিলাম। তুমি জানো, যেদিন তুমি এই পরিমাণ লিখেছিলে, সেদিন আমার অ্যাকাউন্টে ঠিক ওই পরিমাণ টাকাই ছিল।' সালার এখন সংখ্যাটি পুনরাবৃত্তি করতে করতে হাসছে। 'এখন তুমি একে কী বলবে? ঘটনাচক্র? আমার কাছে ঘটনাচক্র মনে হয়নি। ওই অর্থ আমার কাছে তোমার আমানত ছিল। কিংবা পাওনা ছিল। এজন্য তোমাকে দিচ্ছি। ৩০ লাখ দিয়েছি। কিছু টাকা ধার নিয়েছি তোমার থেকে। নয়তো আগামী দুই-তিন মাস এখান-ওখান থেকে চাইতে হতো। তাই তুমি নিশ্চিন্তে রাখো এই টাকা। আমার যদি কখনো প্রয়োজন

হয় আমি তোমার কাছে চেয়ে নেব। এখন কি আমি একটু কাজ করব?

ইমামা কিছুই বলল না। সে দরজা চাপিয়ে বাইরে চলে এলো।
ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে আবারও সে ওই পে স্লিপটি
দেখতে লাগল। এই মানুষটিকে সে কখনোই বুঝতে পারবে না।
কখনোই না। সে দায়িত্বহীন নয়। এই কিছুদিনে ইমামা সেটি
বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সে বুদ্ধিমানও নয়। অন্তত এই পে স্লিপ
তাকে সে কথাই বলছে। এর দ্বারা সে যদি তাকে খুশি করতে
চেয়ে থাকে, তাহলে সে হয়নি। অনুগ্রহশীল হতে চাইলে, তা
হতে পেরেছে। তার কাঁধ যেন অনুগ্রহের ভারে ঝুঁকে পড়েছে।
এমন অনুগ্রহ তো সে জীবনে অন্য কারও কাছে চেয়েছিল।
এমন প্রত্যাশা তো সে ভিন্ন কারও কাছে করেছিল। এই টাকা
তার সত্তাকে ভেজা কাঠে পরিণত করেছে না, তাকে অকার্যকর
করে তুলছে তার অপার অনুগ্রহ। ইমামা তার সমান হতে
চাচ্ছে। কিন্তু হতে পারছে না। তাই বলে ওই মানুষটির দেহ দীর্ঘ

হচ্ছে, এমন না। বরং ইমামার অস্তিত্বই ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে
পড়ছে।

২০

: 'ইমামা, আমরা কাল সকালে না গিয়ে আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছি।
রাতে করাচিতে থাকব। তারপর আগামীকাল রাতেই ফিরে
আসব। সাতটায় ফ্লাইট। আমি সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় তোমাকে
তুলে নিয়ে যাব। তুমি গুছিয়ে নাও।' সালার বারোটোর দিকে
ফোন করে করাচি যাওয়ার নতুন প্রোগ্রাম জানাল। ইমামা
একদম ভয় পেতে লাগল। এত তাড়াতাড়ি গোছানো! ঠিক
আছে, সে এক রাতের জন্য যাচ্ছে, তারপরও। সালার এখন
তাকে তার জন্য কী কী কাপড় গোছাবে তা বলে দিচ্ছে। কাপড়
গোছাতে গোছাতে ইমামা অসম্ভব অস্থির অনুভব করছে।

সালার সাড়ে পাঁচটায় বাসার নিচে এসে পৌঁছাল। ইমামা নিচে নেমে এলো। সে জানে, সালার গাড়িতেই ইফতার সেরে নিয়েছে। তবু সে তার জন্য একটি বক্সে কিছু খাবার ও জুস নিয়ে এলো। এয়ারপোর্টে যেতে যেতে কথা বলতে বলতে তারা দুজনেই সেগুলো খেতে থাকল। সাড়ে ছয়টায় তারা এয়ারপোর্টে পৌঁছাল। ততক্ষণে বোর্ডিং শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা ফাস্ট ক্লাসে সফর করছে। তাই জ্যামের কারণে আসতে কিছুটা দেরি হলেও সালার কোনো দুশ্চিন্তা করছে না। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে প্লেনে উঠতে উঠতে ফাস্ট ক্লাসের আরও কিছু পেসেঞ্জারের সঙ্গে সালারের সালাম-কালাম হলো। দুয়েকজনের সাথে ইমামাকেও পরিচয় করিয়ে দিল। তারা সবাই কর্পোরেট সেক্টরের লোক। কিংবা কেউ সালারের কাস্টমার।

প্লেন ছাড়ার কয়েক মিনিট পর অন্য একটি কোম্পানির একজন এক্সিকিউটিভ, কোনো একটা বিষয়ে সালারের সঙ্গে আলোচনা করতে তার কাছে এলো। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলে, তার

কাছে দুঃখ প্রকাশ করে সালার সেই এক্সিকিউটিভের সাথে তার সিটে চলে গেল। ইমামা কিছুক্ষণ তার ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে একটি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল। সালার অবশেষে প্লেন অবতরণের ঘোষণার পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলো। এসে সে 'সরি' বলে তার পাশে বসে সিট বেল্ট বাঁধতে লাগল।

বিরক্ত তো হওনি তুমি?

: 'না, আমার তো খুব ভালো লাগছিল।' ইমামা অসম্ভব অভিমান ভরে উত্তর করল। সে এখনো ম্যাগাজিন থেকে চোখ সরায়নি। সালার আলগোছে তার হাত থেকে ম্যাগাজিনটি নিয়ে পাশ দিয়ে অতিক্রমরত বিমানবালার হাতে ধরিয়ে দিল। মেয়েটি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

: 'এটা অভদ্রতা।' বিমানবালা যাওয়ার পর ইমামা খানিক চাপা স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করল।



আত্মবিশ্বাস ও অবিচলতা-ভরে বলল। ইমামার বুঝে এলো না।
সে তার সাথে : 'হ্যাঁ, তা তো ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমার
দিকে তাকাচ্ছিলে না।' সালার অভিমান করবে নাকি রাগ।

: তাদের সঙ্গে তুমি যে পরিমাণ কথা বললে, আমার সঙ্গে তুমি
তো কখনো এত কথা বলো না।

সালার তার অভিযোগ শুনে হাসল।

দেয়। : ব্যাংকের কাস্টমার তারা। এসব কথা বলার জন্যই
কোম্পানি আমাকে টাকা

ইমামা খানিক ভৎসনামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

: কী ভীষণ বস্তুবাদী তুমি!

এ 'হ্যাঁ, তা তো আছিই।' সে শান্তভাবে জবাব দিল।

: আমিও তোমাকে টাকা দিতে পারি।

সালার তার কথায় চমকাল।

: 'আরে! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, এই মুহূর্তে তো তুমি আমার চেয়েও বেশি বড়লোক। আমার ব্যাংকের কাস্টমারও তুমি। আমি তোমার কাছে ঋণীও। সুতরাং তোমার সাথে কথা বলা তো আমার কর্তব্য।' সালার হাসতে হাসতে বলল।

: 'ব্যাংকাররা...'। ইমামা কিছু বলতে শুরু করেছিল। সালার হঠাৎই তার হাত ইমামার ঠোঁটে চেপে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি আমার সফর খারাপ করতে চাই না, ইমামা! ফিরে এসে তোমার কাছে শুনব, ব্যাংকাররা কেমন।' সালার একেবারে গম্ভীর হতে হতে বলল। ইমামা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এতে গম্ভীর হওয়ার মতো কী আছে! সে ভাবল।

অবশেষে তারা অবতরণ করার পর হোটেলের গাড়ি
এয়ারপোর্ট থেকে তাদের তুলে নিয়ে গেল।

: 'আমি ভেবেছিলাম আমরা আনিতার বাসায় উঠব।' ইমামা
গাড়িতে বসেই বলল।

: 'আমি কখনোই আনিতার বাসায় থাকিনি। আমি হোটেলেই
থাকি।' সালার তাকে বলল। 'প্রায়ই করাচি আসা-যাওয়া করি
আমি।' সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে বলে
চলল। 'মাঝে মাঝে তো এখানে এলে আনিতার সাথে কথাও
হয় না।'

ইমামা তার মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। এদিকে
সালার ফোনে ধারাবাহিক মেসেজ করে চলছে। পাশাপাশি
রাস্তার দুই ধারে অতিক্রমরত জায়গা সম্পর্কেও ইমামাকে
জানান দিচ্ছে। তাহলে তো তোমার সাথে আমার আসা ঠিক
হয়নি। আমার কারণে...।

হঠাৎ তার এমন কথায় সালার তাকে থামিয়ে দিল।

: তোমাকে সাথে এনে আমার খুব ভালো লাগছে। তাছাড়া আনিতার পরিবারের সাথে দেখা করানোর জন্য তোমাকে এখানে নিয়ে আসতেই হতো আমার।

ইমামা গভীর চোখে তার চেহারা পড়ার চেষ্টা করল।

'সত্যি বলছি।' সে ইমামার চোখে চোখ রেখে বলল। 'আমার সাথে এসে তোমার ভালো লাগছে না?' সালার হুট করে প্রশ্ন করে বসল। ইমামা হেসে ফেলল।

: 'আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রথম অবস্থান করছেন।' হোটেলে চেক-ইন করতে করতে রিসেপশনের ছেলোটী মুচকি হেসে বলল। এই ফাইভ-স্টার হোটেলের কয়েকটি রুম স্বতন্ত্রভাবে সালারের ব্যাংক বুক করে রেখেছিল। এসব রুমে

নিয়মিত অবস্থানকারীদের মধ্যে সালারও একজন। কিন্তু আজ প্রথম ছেলেটি তার স্ত্রীকে দেখছে।

সালার মুচকি হেসে মাথা নেড়ে স্বাক্ষর করতে লাগল। ছেলেটি এখন ইমামার সাথে কিছু সৌহার্দপূর্ণ কথাবার্তা বলছে। কেউ যেন ইমামার চারপাশে বিদ্যমান খাঁচার শিক ধীরে ধীরে ভেঙে দিচ্ছে। বাইরের এই জগতে সে বিমোহিত হয়ে পড়ছে। যে জগতের সাথে সে সালারের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছে।

সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন বিলাসবহুল হোটেলে আনিতা ও তার পরিবার তার জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছে। সালার ও ইমামা আধা ঘন্টায় তৈরি হয়ে, আনুমানিক সাড়ে এগারোটার দিকে ওখানে পৌঁছায়। আনিতা আর তার স্বামী ছাড়াও তার স্বশুরবাড়ির কিছু মানুষও সেখানে ছিল। এটি ছিল সালার ও তার স্ত্রীর জন্য একটি পারিবারিক নৈশভোজ। ইমামাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়। তার ইতস্তত বোধ প্রথম কয়েক মিনিটেই কেটে যেতে থাকে।

আনিতারা ছিল যথেষ্ট মুক্তমনা পরিবার। তাদের বিয়ের ব্যাপারে প্রথাসিদ্ধ আলোচনার পর, গল্পের প্রসঙ্গ পালটে গেল। এখানে ইমামা ছিল প্রধান মেহমান। কিন্তু সেখানকার কেউ তার প্রতি টেলিস্কোপ পেতে রাখেনি। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। এই বিষয়টি ইমামাকে তাদের প্রতি আরও বিশ্বাসী করে তোলে। খাওয়া এখনো শুরু হয়নি, তরল পানীয় পান করতে করতে তারা গল্প করছে। আলোচনায় ইমামা মুচকি হেসে হেসে নিছক একজন নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করছে। তার অধিকাংশ মনোযোগ সৈকতের বিলাসবহুল দৃশ্যের আশেপাশে দৃষ্টিগোচর-রত সমুদ্র এবং শহরের আলোকিত আলোর প্রতি।

তারা খোলা আকাশের নিচে বসে আছে। করাচিতে লাহোরের মতো শীতের প্রকোপ নেই। কিন্তু সৈকতে বসে তার শীত অনুভূত হচ্ছে। আসার আগে সালারতাকে উষ্ণ শাল নিয়ে আসতে না বললে, এখন নিশ্চিত তার দাঁতে দাঁত বাড়ি খেত।

এখানে বিদ্যমান সমস্ত নারী সোয়েটারের পরিবর্তে এ ধরনের
শাল কাঁধে ছড়িয়ে বসে

আছে।

: 'সালার, আমি ওখানে সামনে গিয়ে সমুদ্র দেখতে চাই।'
ইমামা তার পাশে বসা সালারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে
বলল।

: 'তাহলে যাও।' সালার নিশ্চিত্ত মনে বলল।

: 'আমি কীভাবে যাব? এভাবে একা! আমার সাথে আসো।' সে
তার পরামর্শে আবেগাপ্লুত হয়ে বলল।

: 'না, তুমি একা যাও। দেখো, আরও কত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।
তুমিও গিয়ে দেখে আসো।' সালার তাকে বলল। সালার এখন
ইমামার কোলের ব্যাগ উঠিয়ে নিচে রাখতে রাখতে উচ্চৈঃস্বরে

তাকে বলছে। ইমামা খানিক ইতস্তত করে এই লম্বা টেবিলের চারপাশে উপবিষ্ট সদস্যদের প্রতি খানিক নজর বোলাল। তারা সবাই গল্পে মশগুল। তাদের কেউই তার দিকে মনোনিবেশ করে নেই। ইমামা কিছুটা সাহস করে উঠে দাঁড়াল। তার বাম পাশে বসা আনিতা তাকে লক্ষ করল।

: 'ওখানে গিয়ে দেখো, ওখান থেকে অনেক সুন্দর দেখা যায়।'
আনিতা ইশারায় তাকে নির্দেশনা দিল। ইমামা মাথা নাড়ল।

সে ছাড়া ওখানে আরও কিছু পরিবার ছিল। সালার ঠিকই বলছিল, একটু পরপর তার মতোই কেউ না কেউ উঠে, ওই জাহাজের ডেকের মতো খোলা জায়গার কিনারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। ইমামা টেবিল ছেড়ে উঠতে ভয় পাচ্ছিল। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করল। সালার ওখানে বসে ঠান্ডা পানীয় পান করতে করতে তাকে যেতে দেখল। ইমামা পুনরায় কিছুটা ভীত হয়ে পেছন ফিরে তার দিকে তাকাল। সালার দুবারই মুচকি হাসল। এটা নয় বছর

আগের আত্মবিশ্বাসপূর্ণ ইমামা নয়। যে ইমামা মাঝরাতে বাড়ির দেওয়াল টপকে তার রুমে চলে এসেছিল। তাকে বিয়ে করেছিল। তারপর বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল।

সে ওয়াসিমের এই বোন সম্পর্কে ওয়াসিমের কাছে অনেক কিছু শুনেছিল। কিন্তু বিগত দশ দিন ধরে সে যে মেয়েটিকে দেখছে, এটা সেই মেয়ে নয়। কালের পরিক্রমা যে তাগুব তার ওপর চালিয়েছিল, তার চেয়ে অধিক তাগুব সে নিজে সৈকতের ধারে গমনরত মেয়েটির ওপর করেছিল। তার আচার-আচরণ পুরোই পালটে গিয়েছে। টানা নয় বছর যদি কোনো মানুষকে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, ভয় ও চাপে ফেলে নির্দিষ্ট কয়েক জায়গায় সীমাবদ্ধ করে, বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়-তাহলে সে কতটা বিভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, নিরাপত্তাহীন আর নির্ভরশীল হয়েপড়তে পারে! এর চাক্ষুষ প্রমাণ সে ইমামার মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। আর এই বিষয়টি তাকে কষ্টও দিচ্ছে। সালার তাকে অন্তত এই অবস্থায় দেখতে চাচ্ছে না।

: 'সালার, সালার!' সে আনিতার ডাকে আচমকা চমকে গেল।
আনিতা গায়ের জোরে তার কাঁধে থাপ্পড় বসিয়েছিল।

: 'তাকে ওখানে না-ই পাঠাতে! এখন পাঠিয়েই যেহেতু
দিয়েছ, দু-চার মিনিটের জন্য চোখ দুটো অন্য কিছু দিকেই
নিবন্ধ করো। এভাবে কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে?'
আনিতা এখন তাকে শাসাচ্ছে। সালার মুচকি হেসে সোজা হয়ে
বসল। তার বোনের স্বামী গোফরান তাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে।

বাতাস ইমামার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। সে ওগুলো
বারবার কানের পেছনে নিয়ে সামলানোর চেষ্টা করছে।
চুলগুলো না বেঁধে খোলা রাখার জন্য আফসোসও করছে। এই
প্রচণ্ড বাতাসে শিফনের হালকা ওড়না মাথায় ধরে রাখার চেষ্টা
সে ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওই পশমি শালটি তার সূক্ষ্ম শিফনের
জামাটি উড়তে তো বাধা দিতে পারছে না, কিন্তু তার দেহকে
আবৃত করতে সক্ষম হচ্ছে। সে বহু বছর পর আজ কোনো

খোলা জায়গায় চুল খুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার এতে অসম্ভব অদ্ভুত লাগছে। সে যদি সালারের সাথে না হতো, তাহলে কখনোই এই অবস্থায় কোনো উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার কল্পনাও করতে পারত না। দশ দিন আগেও বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সে তার মুখও ঢেকে রাখত। সেটিই ছিল তার একমাত্র বেষাভূষা, যেটির মাধ্যমে সে নিজেকে নিরাপদ ভাবত। সালারকে বিয়ে করার পর সে তার মুখ ঢাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সে তার কাছে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

অন্ধকার সমুদ্রের জলে আলোর প্রতিবিশ্ব দেখতে দেখতে সে আবারও গলায় প্যাঁচানো ওড়নাটি মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করল। তার চেষ্টার দিকে তাকিয়ে থাকার মতো এখানে কেউ নেই। আর এই কাজটি, এমন প্রচণ্ড বাতাসে শাল, ওড়না ও খোলা চুলে সম্পূর্ণ করাটা খুব সহজ বিষয়ও নয়।

: আমি তোমার চুল গুছিয়ে দেব?



ইমামা যেন শক খেয়ে পিছন ফিরল। তারপর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

: 'তুমি তো আমাকে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছ।' সে সালারকে তার পেছনে দেখে হঠাৎই বলে ফেলল। সে কখন কখন এসেছে, ইমামা টেরই পায়নি। 'আমার ওড়নাটা একটু ধরবে?' সে সালারের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওড়নাটি তার হাতে ধরিয়ে দিল। এখন তাকে অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

: 'আমাকে বলা উচিত ছিল তোমার, এখানে এত তীব্র বাতাস। তাহলে আমি অন্তত খোলা চুলে আসতাম না।' সে তার চুলগুলোর আলগা খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে তাকে অভিযোগের সুরে বলল। সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইমামা এখন তার শাল খুলে তার হাতে দিয়ে ওড়না নিয়ে নিচ্ছে।

: এটা কী রং?

ইমামা ওড়নাটি মাথা ও গলায় পর্যাঁচাতে পর্যাঁচাতে তার প্রশ্ন
শুনে থমকে গেল।

: গাঢ় লাল। কেন?

সালার তার কাঁধে শাল জড়াতে জড়াতে বলল, 'আমি
তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম, এই রঙে তোমাকে অনেক সুন্দর
লাগছে।' বলতে বলতে সালার তার বাম গালে আঙুলের ডগা
দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিল। ইমামার চোখে বিস্ময় প্রকাশ
পেল।

পরমুহূর্তে সালার বুঝে উঠতে পারল না, তার পোশাক বেশি
রক্তবর্ণ নাকি তার চেহারা? সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘশ্বাস
ফেলেই রয়ে গেল।

: তুমি যদি এমন ছোটখাটো কথাতেই এমন লাল হয়ে যাও, তাহলে তো বিষয়টা প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াবে। অচিরেই তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।

ইমামা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

অবশেষে তারা প্রায় আড়াইটার দিকে হোটেলে ফিরল। ইমামার এত প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল যে, সে অলংকার খুলে মুখ তো ধুলো, কিন্তু কাপড় না পালটেই শুয়ে পড়ল।

২১

সালার ভোরে কখন অফিসে বেরিয়েছে, ইমামা টেরই পায়নি। সে দশটার দিকে উঠল। জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হতে হতে, আনিতা এসে উপস্থিত হয়ে গেল। তারা প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেল থেকে চেক আউট করে বের হলো। তারপর সে আনিতার সাথে করাচির বিভিন্ন শপিংমলে ঘুরেফিরে দেখতে

লাগল। আনিতা সালারের দেওয়া ক্রেডিট কার্ডটি ইমামাকে ব্যবহার করতেই দিল না। সেই তাকে শপিং করিয়ে দিল।

শপিং শেষে আনিতা তাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। ইমামা সেখানে ইফতার করল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তারা এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বের হলো। আর তখন সালারের সাথে তার কথা হলো। সেও এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে। ইমামা সালারের আগেই এয়ারপোর্টে পৌঁছাল। বোর্ডিং এখনো শুরু হয়নি। এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে পৌঁছাতেই আবারও সালার কারও না কারও সাথে হাই-হ্যালো করতে লাগল। এই ফ্লাইটেই সালার সাধারণত করাচি যাওয়া-আসা করে। তার মতোই বাকি যাত্রীরাও এর নিয়মিত প্যাসেঞ্জার। সালারের এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইমামা কোনো আপত্তি করল না। কারণ, সেআজ অনেক খুশি। সে খুশি, এটা তার চেহারায় ফুটে আছে। অপরদিকে তার এই খুশি সালারকে হতবাক করছে।

: 'এই নাও তোমার ক্রেডিট কার্ড ও টাকা।' লাউঞ্জে বসে ইমামা কিছুক্ষণ পরেই তার ব্যাগ থেকে দুটো জিনিসই বের করে সালারের হাতে ধরিয়ে দিল। 'আনিতা আমাকে বিল দিতে দেয়নি। সে-ই সমস্ত বিল পে করেছে। এখন তুমি তাকে দিয়ে দিয়ো।' ইমামা তাকে বলল।

: 'কেন? সে যদি দিয়ে থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা তারই দেওয়া উচিত ছিল।' সালার ক্রেডিট কার্ড তার ওয়ালেটে রাখতে রাখতে বলল। হাতের টাকাগুলো সে পুনরায় ইমামার ব্যাগে পুরে দিল।

: কিন্তু আমরা তো তাকে বা তার পরিবারকে কিছুই...।

সালার তার কথা রুখে দিল।

: 'পরেরবার এলে তার জন্য তুমি কিছু নিয়ে এসো। দু-চার সপ্তাহ পর সে এমনিতেই তার নতুন বাসায় উঠবে। তো করাচি

এসে তোমার ভালো লাগল?' সালার প্রসঙ্গ পালটাল। ইমামার চেহারা পুনরায় ঝলমলিয়ে উঠল। সে তাকে আনিতার সাথে যাওয়া জায়গাগুলোর কথা বলতে লাগল। সালার মুচকি হেসে শুনতে থাকল। ইমামা বাচ্চাদের মতো জোশ ও উচ্ছ্বাসে শপিংয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে লাগল।

: 'আমি আব্বু, আন্টি এবং সায়েদা আমার জন্যও কিছু গিফট নিয়েছি।' সে বলল।

: 'আচ্ছা!' সালার আগ্রহ দেখাল। কিন্তু কী গিফট তা জিজ্ঞেস করল না।

: ফোরকান ভাইয়ের পরিবার এবং তোমার বাবা-মায়ের জন্যও।

: 'ইমামা, তারা কেবল আমার বাবা-মাই নন। তাদের সাথে তোমারও একটা সম্পর্ক আছে।' সালার আপত্তি করল। ইমামা এখনো তার বাবা-মায়ের উল্লেখ ওভাবেই করে। ওই মুহূর্তে

তার হুট করে মনে পড়ল, সালারের জন্য সে কিছুই কিনেনি।
এটা কি ভুল ছিল, নাকি উদাসীনতা? কিন্তু শপিং করার সময়
সালারের কথা তার মনেই আসেনি। তার প্রচণ্ড লজ্জা হলো।

: 'কী হলো?' সালার তাকে চুপ দেখে জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ
সে চুপ করে রইল। তারপর লজ্জিত চেহারায় বলল, 'সালার,
তোমার জন্য কিছু কিনতে মনে ছিল না আমার।'

: 'কোনো সমস্যা নেই। তুমি তোমার জন্য শপিং করেছ,
তাহলে মনে করো, তা আমার জন্যই করেছ।' সালার সেই
মুচকি হাসি ধরে রেখে তার কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে তাকে
যেন সান্ত্বনা দিল।

'তবু তোমার জন্য কিছু কেনা উচিত ছিল।' ইমামা প্রশান্ত হলো
না। 'কিন্তু তোমার কথা মনেই পড়েনি।'

তার প্রিয়তমা নিষ্ঠুর, সে তা জানে।

: 'কোনো সমস্যা নেই, যেখানে মনেই পড়েনি, সেখানে উপহার কীভাবে কিনবে? উপহার তো তাদেরকে দেওয়া হয়, যাদের কথা মনে পড়ে।' সালারের কথায় অভিমান

ছিল না, কিন্তু ইমামার কাছে অভিমান মনে হলো। সে লজ্জাতুর হয়ে নিশ্চুপ বসে রইল।

: 'আর কী কী কিনেছ?' তার লজ্জা উপলব্ধি করে সালার পুনরায় তার সাথে কথা বলতে শুরু করল।

: 'আনিতাকে আমার ভালো লেগেছে।' ইমামা তার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

: যাক, বেশ ভালো। কাউকে তো তোমার ভালো লেগেছে। আমি না হই, আমার বোনই হোক।

ইমামা অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। সালারের চোখে মুচকি হাসি ফুটে আছে। সে গম্ভীর নয়। ফলে ইমামা নিশ্চিত হলো।

: 'জানো আমি আর কী কী নিয়েছি?' ইমামা পুনরায় বলতে শুরু করল। সালার আনমনে হাসল। সালার যদি ইমামার মুখে তার ব্যাপারে কিছু শোনার প্রত্যাশা করে থাকে, তাহলে সেটা ভুল!

২২

পরবর্তী দুদিন ইমামা বেশ খোশ মেজাজে ছিল। প্রতিটি কথায় তার করাচির কথা মনে পড়ত। তার এই খুশি সালারকে হতবাক করত। সালার ভাবল, করাচি শহর তার ভালো লেগেছে। কিন্তু সে এটা বুঝতে পারল না যে, বিষয় শহরের নয়, বিষয় মুক্তির স্বাদ লাভের। সে যদি তাকে নবাব শাহ শহরেও নিয়ে যেত, তবু সে এমনই ঘোরে থাকত। সে এখন খোলা আকাশে নিশ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত হতে শুরু করেছে। দীর্ঘ একটি সময় দমবন্ধ

থাকার পর মানুষ তো কিছুক্ষণ এমন গভীর শ্বাসই নেয়।
যেমনটা সে নিচ্ছে।

পরদিন তারা ডাক্তার সাহেবের কাছে গেল। সালারের সঙ্গে সে
খোশ মেজাজে আছে, এ দৃশ্যটি তার চেহারায়ে ফুটে ছিল। তবু
সায়েদা আন্মা কৌশলগত কিছু পদ্ধতিতে সালারের সামনে
আমনার জন্য সামনের বাড়ির ছেলেটির উন্মাদনা ও
ভালোবাসার আরও একটি গল্প শোনানো জরুরি মনে করলেন।
সালার সেটি অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শুনল। এবার কথার মাঝখানে
সায়েদা আন্মাকে সালার থামানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে
তাতে ব্যর্থ হলো। সায়েদা আন্মার ধারণা ছিল, সালারকে
একজন আদর্শবান, অনুগত স্বামী বানানোর জন্য এ ধরনের
লেকচার প্রদান আবশ্যিক। বিশেষ করে যখন সেই স্বামী
অতীতে কোনো নারীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইমামা বুঝতে
পারছিল না, এখন সে সায়েদা আন্মাকে তার ও সালারের
অতীত সম্পর্কের ব্যাপারে কীভাবে বলবে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল,
এই সত্য প্রকাশ করার পর সায়েদা আন্মা উলটো তার প্রতিই

না জানি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। আপাতত এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার কোনো পথ তার মাথায় আসছে না।

২৩

: 'ইসলামাবাদ যাওয়া খুব দরকার?'

শুক্রবার রাতে ইমামা আব্বারও চিন্তায় পড়ে গেল। এমনটা নয় যে, সে ওখানে যেতে চায় না। সে যেতে চায়। কিন্তু পাশাপাশি সে অদ্ভুত এক ভয়ে ভীতও।

: 'অনেক বেশি দরকার।' সালার বিছানায় বসে ল্যাপটপে ইমেইল চেক করছে।

: 'সেখানে তোমার কী কাজ?' ইমামা হাতের উপন্যাসটি বন্ধ করতে করতে বলল। সালার কনুইয়ে ভর করে তার দিকে পাশ ফিরে, তাকে দেখতে লাগল।

: 'আমাকে গ্রামে যেতে হবে।' এবার সে স্ক্রিনে দৃষ্টি জমিয়ে নিজের কাজ করতে করতে বলল।

: 'কোন গ্রাম?' ইমামা চমকাল।

: 'ইসলামাবাদ থেকে যেতে দু-ঘণ্টা লাগে।' সে গ্রামের নামটি উল্লেখ করে বলল, 'ওখানে আমি একটি স্কুল এবং অন্যান্য কিছু প্রজেক্ট পরিচালনা করছি। স্কুলের ভবন কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে। সেটা দেখতে যেতে হবে আমাকে। গত সপ্তাহে যাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু যেতে পারিনি।'

ইমামা বিক্ষিপ্ত চোখে তাকে দেখতে লাগল। তার দীর্ঘ নীরবতা এবং তার ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি উপলব্ধি করেই সালার উলটো তার দিকে তাকাল। ইমামার চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'তুমিও সাথে চলো, দেখে আসবো।' বলেই সালার পুনরায় স্ক্রিনে চোখ ফেরাল।

: 'তুমি একাই যাও।' ইমামা বলল।

: 'আমি তো তোমাকে নিয়েই যাব।' সালার পীড়াপীড়ি করল।
'তা ছাড়া পাপা যেতে বলেছেন। হ্যাঁ, তুমি যদি গ্রামে যেতে না
চাও, তাহলে যেয়ো না। কিন্তু ইসলামাবাদ তো তোমাকে
যেতেই হবে।' সালার যেন অকাট্য ভঙ্গিতে বলল। ইমামা
পুনরায় বালিশে মাথা রাখতে রাখতে খানিক অভিমানে
উপন্যাস খুলে বসল।

: 'এই উপন্যাসের গল্পটা কী?' সালার তার মন খারাপ বুঝতে
পারল। ইমামা কোনো উত্তর করল না।

: 'নায়ক-নায়িকাদের পোশাকের অতিরিক্ত প্রশংসা করে
এসবো আর নয়তো তাদের সৌন্দর্যের।' সালার এখন তাকে
জ্বালাতন করছে। ইমামা তাকে উপেক্ষা করল। এটি একটি
ঘটনাক্রমই যে, এই মুহূর্তে সে যে পৃষ্ঠাটি পড়ছে, তাতে

নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্যের প্রশংসাই করা হচ্ছে। ইমামার হাসি পেল। উপন্যাস দিয়ে মুখ ঢাকতে ঢাকতে সে অপরদিকে পাশ বদলাল। সে চাচ্ছে না, সালার এখন তার হাস্যরত প্রতিক্রিয়া দেখুক। সালারও তখন নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইল।

২৪

'সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিন। আমরা এখন ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছি। এই মুহূর্তে এখানে সন্ধ্যা সাতটা। এখানকার তাপমাত্রা...' বিমানের কেবিন স্টাফদের কেউ একজন ইংরেজির পর উর্দুতে আনুষ্ঠানিক বিদায়ি বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করছে। বিমান থামার জন্য ধীরে ধীরে টার্মিনালের দিকে এগোচ্ছে। বিজনেস ক্লাসের একটি সিটে বসে সালার তার সেলফোন অন করে বুকের সেফটি বেল্ট খুলল। ইমামা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

: 'কোথায় হারালে?' সালার ইমামার কাঁধে চাপড় দিল। সে চমকে তার দিকে তাকাল। তারপর তার সেফটি বেল্ট খুলতে লাগল। সালার এখন লাগেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে তার ব্যাগগুলো বের করছে। একজন ফ্লাইট সিটওয়ার্ড তাকে সাহায্য করল। উভয়ের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ কিছু বাক্য আদান-প্রদান হলো। সালার এই ফ্লাইটে যাতায়াতকারী নিয়মিত যাত্রীদের একজন। এই ফ্লাইটের কর্মীরাও তাকে চেনে। বিমানের সিঁড়ির দিকে যাওয়ার আগে সালার পেছন ফিরে ইমামাকে বলল, 'কোট ইত্যাদি শীতের পোশাক নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার। কেবল সোয়েটারেই শীত আটকানো যাবে না।'

: 'এটা শুধু তোমার নয়, আমারও শহর। আমি জন্মেছি এখানে। বিশ বছর কাটিয়েছি এখানে। আমি জানি, কেমন শীত পড়ে এখানে। এই সোয়েটারই যথেষ্ট।' ইমামা অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে তাকে বলল। সালার বিদ্রূপাত্মক মুচকি হাসল। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই ঠান্ডা বাতাসের প্রথম দমকাই তাকে বুঝিয়ে দিল, সালার ঠিকই বলেছে। ইমামা তার দাঁতের কটকট

কাঁপুনি শুনতে পেল। সালার চুপচাপ তার বাহুতে ঝোলানো জ্যাকেটটি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। সে অত্যন্ত অনুগতভাবে, খানিক লজ্জিত হয়ে জ্যাকেট পরে নিল। ইসলামাবাদ বদলে গিয়েছে। সে বিব্রত হয়ে ভাবল। অ্যারাইভাল লাউঞ্জের এক্সিটের দিকে এগোতে এগোতে সালার এক মুহূর্তের জন্য থমকাল।

: 'একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি ইমামা!' সে নিতান্ত সরলভাবে বলল।

: 'কী হয়েছে?' ইমামা মুচকি হাসল।

: পাপা জানেন না যে, আমরা আজ ইসলামাবাদ আসছি।

ইমামার মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল। সালার তাকে থামতে দেখে সেও থেমে গেল। ইমামা অবিশ্বাস্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সালার তার কাঁধ ব্যাগের পট্টিটা ঠিক করল।

হয়তো টাইমিংটা ভুল হয়ে গেছে। ট্যাক্সিতে বলাই সবচেয়ে ভালো ছিল। এখন যদি সে যেতে না চায়! সালার মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ইমামা এখনো অপলক দৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সালারও ওভাবেই তাকিয়ে রইল। অপরাধ করেও এভাবে তাকিয়ে থাকা, যদিও এটা নির্লজ্জতা, তবু এটা ছাড়া এখন আর সে কীই-বা করতে পারে!

অবশেষে সে ইমামার চোখের অবিশ্বাস্যতাকে রাগে পরিণত হতে দেখল। এরপর তার চেহারা লাল হতে লাগল। সে ধারাবাহিক দুই সপ্তাহ যাবৎ সিকান্দার উসমান ইসলামাবাদ যেতে বলেছে বলে তাকে পীড়াপীড়ি করেছে। সিকান্দার উসমানের আমন্ত্রণ না হলে, সালারের কথায় সে কখনো এখানে আসত না। আর এখন সে বলছে, তা মিথ্যা ছিল। সিকান্দার না বলা সত্ত্বেও ওখানে যাওয়ার কারণ কী? তা ইমামা অনুমান করতে পারছে। আর এই মুহূর্তে সে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য তো তার মনে চাইল, লাউঞ্জ থেকে

বের হতেই না করে দিতে। সালারের প্রতি তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে এখন।

: 'সরি!' সালার নিশ্চিন্তে বলল। ইমামা আরও কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চারপাশে তাকিয়ে গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল। ইমামা এমন খোলামেলা জায়গায় নিরুপায় হয়ে এর চেয়ে বেশি রাগ দেখাতে পারছে না। সালারও বুঝতে পারছিল যে, সে এটাই করবে। সে জ্যাকেট খুলে ছুড়ে দেওয়ার মতো করে সালারের দিকে নিক্ষেপ করল।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ।' সালার জ্যাকেট সামলাতে সামলাতে বলল। সে ধন্যবাদ দিল, ইমামা জ্যাকেটটি তার মুখে ছুড়ে মারেনি বলে। ইমামা এখন রেগে বহির্গমন গেটের দিকে যাচ্ছে। সালার অবাক হলো, ইমামা তার থেকে তার ব্যাগ নিয়ে নিল না কেন! নিয়ম অনুযায়ী এটা তার রাগের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল।

: 'আমার ব্যাগ দাও।' বহির্গমন গেট থেকে বের হওয়ার আগেই ইমামা পেছন ফিরে প্রায় গর্জন করে তাকে বলল। সালার শান্তভাবে তার হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দিল।

ট্যাক্সিতে বসার আগ পর্যন্ত দুজনের মাঝে কোনো কথা হলো না। ইমামা পুরো রাস্তা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। সালারও তাকে ডাকার চেষ্টা করল না। এই মুহূর্তে তার রাগ ঠান্ডা হওয়ার জন্য কথা না বলাই ঠিক মনে করল। সালার এখন বাসায় ফিরে সিকান্দার উসমান ও তাইয়েবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবতে লাগল। এখন পরবর্তী বজ্রপাত তাদের ওপর হতে যাচ্ছে।

২৫

গাড়ি এখন তাদের বাড়ির বাম পাশের রাস্তার মোড় ঘুরছে। ইমামার পুরো শরীর যেন শীতল হয়ে গেল। এটা শীতের জন্য



নয়, এটা ভয়ও নয়, এটা অন্য কিছু। নয় বছর পর সে তার বাড়ি, এই রাস্তা আর এই মোড়কে দেখছে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। চোখ ভিজতে শুরু করল। সালারের প্রতি সমস্ত রাগ, সমস্ত ক্ষোভ যেন ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল। এটা কি আনন্দ? নাকি অন্য কিছু? কী এটা-যা সে গাড়িটি তার বাড়ির দিকে এগোতে দেখে অনুভব করল? তার বাড়ির গেট, সালারের বাসার গেট থেকে একটু দূরে। সে এতটুকু অনুমান করতে পারল, গেটটি বন্ধ। তবে বাড়ির বাইরের বাতি জ্বলছে।

গাড়ির হর্নের শব্দে গার্ড বাইরে তাকাল। তারপর সে গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে গেট খুলে দিল। সালার ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ডিগ্নি থেকে ব্যাগ বের করছে। ইমামা এবার তার ব্যাগ নিজেই নিতে পীড়াপীড়ি করল না। গার্ড তাদের জিনিসপত্র নেওয়ার চেষ্টা করল না। কারণ, সে জানে সালার নিজের জিনিস নিজেই বহন করতে অভ্যস্ত। কিন্তু সে সালারের সাথে আগত মেয়েটির দিকে অবাক চোখে, আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে রইল। যে মেয়েটি গেট থেকে ভেতরে আসা পর্যন্ত প্রতিবেশী বাসার

দিকে পাগলের মতো দেখতে দেখতে হেঁটে চলছে। যাদের সাথে বহু বছর ধরে সিকান্দার উসমানের যোগাযোগ বন্ধ।

কুয়াশা সত্ত্বেও ইমামা হাশেম মুবিনের বাড়ির উপরের তলার কিছু বেডরুমের জানালা গলে আগত আলো দেখতে পেলে। তার বেডরুমেও আলো জ্বলছে। এখন হয়তো ওখানে অন্য কেউ থাকে। ওয়াসিম কিংবা সা'দ। অথবা তার কোনো ভাতিজা বা ভাতিজি। ইমামা চোখে বর্ষণরত ঢল মুছতে মুছতে ওই জানালাগুলোতে যেন কোনো ছায়া, কারও স্পষ্ট অবয়ব খোঁজার চেষ্টা করছে।

: 'ভেতরে যাই?' ইমামা তার বাহুতে সালারের নরম ছোঁয়া অনুভব করল। সে চোখ কচলাতে কচলাতে মাথা নাড়িয়ে সামনে পা বাড়াল। সে জানে, ইমামা কাঁদছে। কিন্তু সে তাকে কাঁদতে বাঁধা দিল না। সে কেবল তার হাত নিজের হাতে পুরে নিল।

সিকান্দার উসমান তখন লাউঞ্জে ফোনে কোনো বন্ধুর সঙ্গে খোশগল্প করতে করতে তাইয়েবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাইয়েবা তখন কিছু একটা আনাতে বেডরুমে গিয়েছেন। সিকান্দারের যদি অফিস থেকে ফিরতে দেরি না হতো, তাহলে তারা দুই স্বামী-স্ত্রী এখন কোনো ইফতার অথবা ডিনার পাটিতে থাকতেন। ফিরতে দেরি হওয়ায় যেতে পারেননি।

লাউঞ্জে সবার আগে উনার সাথেই ইমামার দেখা হলো। কোনো ভূত দেখলেও সিকান্দার উসমানের এমন অবস্থা হতো না, যা এই মুহূর্তে তাদের দুজনকে দেখে হচ্ছে। তিনি ফোনে কথা বলতে ভুলে গেলেন।

: 'জব্বার, আমি তোমাকে পরে ফোন করছি।' উনি বসা থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উনার বন্ধুকে বলে, কল কেটে দিলেন। এই মুহূর্তে সালারের প্রতি তিনি যা অনুভব করছেন, তা প্রকাশের জন্য 'রাগ' শব্দটি তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তিনি লাহোরে গিয়েও এই বোকাচন্দ্রকে ইমামাকে নিয়ে ইসলামাবাদ আসতে নিষেধ করে

এসেছেন। এমনকি বিগত কয়েক দিন ধরে ফোনে প্রতিটি কথার পরেই এই কথাটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর সেও প্রতিবার আনুগত্যের সহিত 'ওকে' বলে এসেছে। ওই আনুগত্য উনার তখন পছন্দ হয়নি। আর না পছন্দ হয়েছিল এত সরলভাবে 'ওকে' বলা। উনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় উনাকে এ ব্যাপারে সংকেত দিচ্ছিল। সালার বিগত কয়েক বছরে অনেক বদলে গিয়েছে। অসম্ভব অনুগত হয়ে গিয়েছে। উনার সামনে মাথা নুয়ে বসে থাকে। খুব কমই উনার কোনো কথায় দ্বিমত পোষণ কিংবা আপত্তি করে। কিন্তু সে তো 'সালার সিকান্দার'। এটি উনার চতুর্থ সন্তান, যে সন্তানটি ঘুমালেও তিনি সতর্ক হয়ে থাকেন।

শুধু সালারই নয়, ইমামাও দূর থেকেই সিকান্দার উসমানের চেহারার পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া আঁচ করে ফেলল।

: 'ডোন্ট ওয়ারি। চিন্তা করো না। পাপা আমাকে খানিক লজ্জা দিবে, কিন্তু তোমাকে কিছু বলবে না।' দূর থেকে সিকান্দার উসমানের দিকে এগোতে এগোতে সে ইমামাকে মৃদুস্বরে

বলল। ইমামা মাথা তুলে তার 'স্বামী'র 'নিশ্চিততা' দেখল। তারপর প্রায় দশ মিটার কাছে আসতেই দেখল তার 'শ্বশুরের 'ভাব।' তৎক্ষণাৎ তার বুঝে এলো না, এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। সে এটা ভেবে বেশি ভীত হচ্ছিল যে, সিকান্দার উসমান সালারকে এখন অপমান করবেন।

উসমানকে সে সবসময়ের মতো গলায় জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল, যেন সে উনার : 'আসসালামু আলায়কুম পাপা!' হাতের ব্যাগগুলো নিচে রেখে সিকান্দার দাওয়াত পেয়ে এখানে এসেছে। সিকান্দার উসমান ত্রুদ্ব চোখে তাকিয়ে উনার হাত পেছনে নিতে নিতে বললেন, 'তোমাকে নিষেধ করেছিলাম না?'

: 'জি।' সালার অসম্ভব আনুগত্যের সহিত সেই প্রশ্নের উত্তর করল। তার গলা চেপে ধরতে ইচ্ছা করল সিকান্দার উসমানের।

: 'কীভাবে এসেছ?' কয়েক মুহূর্ত পর তিনি পরবর্তী প্রশ্ন করলেন।

: 'টেক্সি করে।' ঝটপট জবাব এলো।

: টেক্সি ভেতরে এনেছিলে?

: 'না, গেটেই নেমেছি।' সে দৃষ্টি নত করে নেহায়েত গুণধরের মতো বলল।

: তাহলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও সালাম জানিয়ে আসতে!

সালার এবার চুপ রইল। কারণ, সে জানে, এটা কোনো প্রশ্ন নয়; কোনো পরামর্শও নয়।

: 'বেটা, আপনি কেমন আছেন?' সালারকে কঠিন চোখে দেখতে দেখতে তিনি এবার ইমামার কাছে এলেন। উনার স্বর এখন বদলে গিয়েছে। ইমামা এতক্ষণ প্রচণ্ড ঘাবড়ে বাপ-বেটার মধ্যকার কথোপকথন শুনছিল। সিকান্দার উসমানকে নিজের

দিকে এগোতে দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ সিকান্দারের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।

: 'আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো?' উনি তাকে কাছে টেনে অত্যন্ত স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন। 'আর শরীর ঠিক আছে? চেহারা এমন লাল হয়ে আছে কেন?' সিকান্দারও তার চোখের সিত্ততা ও দুশ্চিন্তা বুঝতে পারলেন।

: 'জি...ওটা জি...।' সে আটকাল।

: 'ঠান্ডার কারণে। আসসালামু আলায়কুম, মান্নি কেমন আছেন আপনি?' সালার পুনরায় ব্যাগ টানতে টানতে প্রথম বাক্যটি সিকান্দারকে বলল। আর দ্বিতীয়টি দূর থেকে আগত তাইয়েবাকে, যিনি তাদের দেখে যেন কাতরে উঠলেন।

: 'সালার, এখানে আসার কী দরকার ছিল? একটু তো দয়া করো।' তিনি এখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

: 'তাইয়েবা, ইমামাকে চায়ের সাথে কোনো ওষুধ দাও। আর ডিনার পাটি এখন বাদ দাও।' সিকান্দার উসমান এখন তাকে সাথে নিয়ে এগোতে এগোতে তাইয়েবাকে বললেন। তাইয়েবা এখন সালারকে একপাশে চাপিয়ে ইমামার দিকে এগিয়ে এলেন। কী হয়েছে ইমামার?

: 'কিছু না, আমি ঠিক আছি।' সে তাইয়েবার গলায় জড়াতে জড়াতে প্রতিরোধের ভঙ্গিতে বলল।

: 'আপনারা এখন ডিনার পাটিতে যান, আমাদের নিয়ে ভাববেন না। বাসায় যা আছে আমরাও খেয়ে নেব।' সালার, সিকান্দার উসমানকে বলল। সে জানত, এখন তাদের কোথাও দাওয়াত আছে। এই মুহুর্তে বাসায় নিশ্চয় খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। সিকান্দার তার কথা শোনার কষ্টটুকুও করলেন না। প্রথমে তিনি ইন্টার কমে কল করে গার্ডদের সিকিউরিটির ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা দিলেন। তারপর ড্রাইভারকে পাশের

কোনো রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খাবারের নাম লিখালেন।
খানসামাকে ডেকে চায়ের কথা বললেন।

: 'প্লিজ পাপা, আমাদের জন্য আপনি আপনার প্রোগ্রাম
ক্যানসেল করবেন না। আপনারা যান।' সালার, সিকান্দার
উসমানকে বলল।

: যাতে তুমি আমাদের অনুপস্থিতিতে নতুন কোনো বিপদ
ডেকে আনতে পারো, তাই না?

সিকান্দারের কথায় সে হাসতে লাগল। তার হাসি সিকান্দারকে
আরও উত্তেজিত করে দিল। ইমামা যদি তার পাশে বসে না
থাকত, তাহলে সিকান্দার উসমান তাকে আচ্ছামতো শায়েস্তা
করে দিতেন।

: 'আমি যখন তোমাদের বলেছি, আপাতত এখানে এসো না, তাহলে ইমামা, আপনার অন্তত তাকে বোঝানো উচিত ছিল।' সিকান্দার এবার ইমামাকে বলছিলেন।

এদিকে ইমামা শুরু থেকেই অসম্ভব লজ্জিত ও অনুভূতিশূন্য হয়ে আছে।

: 'পাপা, ইমামা তো আমাকে নিষেধ করছিল। আমিই জোর করে নিয়ে এসেছি তাকে।' ইমামার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই সালার বলে ফেলল। সিকান্দার প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। উনার সন্তানদের কেউ আজ পর্যন্ত উনার সামনে বসে, এতটা গর্বিত ভঙ্গিতে, উনার কথা অমান্য করার জানান দিতে পারেনি। সালার আর কিছু না বলে, পরিচারককে জিনিসপত্র রুমে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে সালারের সাথে গুরুত্বসহকারে কথা বলা দরকার। কিন্তু একাকী। সিকান্দার ভাবলেন।

সালারের রুমে এসেই ইমামা চুম্বকের মতো জানালার দিকে গেল। অতঃপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওখান থেকে তার বাড়ির বাম অংশ চোখে পড়ছে। তার বাড়ির উপরের তলা, তার রুমের জানালা, ওয়াসিমের রুমের জানালা, উভয় রুমেই আলো জ্বলছে। কিন্তু উভয় রুমের পর্দা ছড়ানো। কেউ যদি এখন সেই পর্দাগুলো সরিয়ে তার মতো জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেতাকে অনায়াসে দেখতে পাবে। জানা নেই, চিনবে কি না। সে এতটাও তো বদলেনি যে, কেউ তাকে চিনবেই না। তার রক্তের আপনজন তো...। অশ্রু শ্রোতের মতো সব বাঁধ ভেঙে তার চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল। এটা কবে ভেবেছিল, জীবনে কখনো পুনরায় এই বাড়িটি দেখতে পাবে সে। তার জীবনে এসবের কী প্রয়োজন ছিল? তার সাথেই এমনটা হতে হবে!

সালার নেহায়েত নিঃশব্দে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। সে জানালা দিয়ে দৃশ্যমান বাড়িটির দিকে তাকাল। অতঃপর ইমামার চোখের বহমান অশ্রুর দিকে। ওভাবেই নিঃশব্দে

ইমামার কাঁধে বাহু ছড়িয়ে, তাকে সান্ত্বনা দিতে, তার কপালে চুমু খেল।

: 'ওটা আমার রুম।' বহমান অশ্রুসমেত ইমামা তাকে বলল।

: যেখান থেকে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে।

ইমামা অশ্রুসিক্ত চোখে হেসে ফেলল।

: 'আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম না, সালার!' সে প্রতিরোধ করল। সালার তার রুমের জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর আমি জানতামই না, এটা তোমার রুম। আমি ভাবতাম এটা ওয়াসিমের রুম। আমি তো এখানেই কাপড় পালটাতাম।' সালার খানিক চিন্তিত হলো।

: আমি কী জানি তুমি কী করতে! আমার রুমের জানালা তো বন্ধ থাকত।

: 'কেন?' সালার খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: 'তুমি শটস পড়ে বেডরুমে ঘুরে বেড়াতে, তাই। আর ভেবেছ আমি জানালা খোলা রাখব! তোমার কোনো লজ্জাই ছিল না। তুমি কীভাবে বেডরুমে এভাবে ঘুরে বেড়াতে?' ইমামা এখন চোখ মুছতে মুছতে তার প্রতি অভিমান করছে। সে বুঝতেই পারেনি, সালার কতটা শান্তভাবে তার মনোযোগ ওই দিক থেকে সরিয়ে ফেলেছে।

: তুমি কেমন মানুষ ছিলে?

সালার এবার কিছুই বলল না। এই প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না।

: 'খাওয়ার জন্য তোমাকে ডাকতে এসেছি। তুমি চেঞ্জ করে ফেললে চলি!' সে হুট করে প্রসঙ্গ পালটাতে পালটাতে

ইমামাকে বলল। ইমামা সালারের প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকাল না।
সে আবারও জানালা দিয়ে দৃশ্যমান বাড়িটির দিকে তাকিয়ে
রইল। ২৬

সালার প্রায় দুইটার দিকে রুমে এলো। সে ভেবেছিল, ইমামা
হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে এখনো জানালার সামনে বসে
বাইরে তাকিয়ে আছে। তার বাড়ির লাইট এখন বন্ধ হয়ে গেছে।
দরজা খোলার শব্দে সে পেছন ফিরে তাকাল।

: 'তোমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল, ইমামা!' তার সাথে
চোখাচোখি হতেই সালার বলল। ইমামা জানালার সামনে
চেয়ার পেতে দু-পাশ তুলে হাঁটুতে বাহু জড়িয়ে বসে আছে।

: ঘুমিয়ে যাব।

: ওখানে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখো, সব বেডরুমের লাইট
অফ।

ইমামা পুনরায় ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। সালার কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ওয়াশরুমে চলে গেল। দশ মিনিট পর কাপড় পালটে ঘুমানোর জন্য বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

: 'ইমামা, এখন থামো। এভাবে তাকিয়ে থেকে কী হবে?'
বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে ইমামাকে বলল।

: আমি কখন বললাম যে কিছু হবে! তুমি ঘুমাও।

: তুমি ওখানে বসে থাকলে আমারও ঘুম আসবে না।

: 'কিন্তু আমি তো এখানেই বসে থাকব।' সে একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল। তার একগুঁয়েমি সালারকে অবাক করল। তার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইমামা, তুমি বিছানায়

এসে শুলেও, এখান থেকেও তোমার বাড়ি দেখা যায়।" সালার পুনরায় চেষ্টা করল।

: এখান থেকে অনেক কাছে।

সালার এবার কিছুই বলতে পারল না। ইমামার স্বরে বিদ্যমান কিছু একটা তার মনে দাগ কাটল। কয়েক গজের দূরত্বও তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ওটা শুধু তার বাড়িই নয়। কয়েক গজের নৈকট্য তার কাছে অনেক কিছু। নয় বছর পর সে এই বাড়িটি দেখছে।

: 'আমাদের বাসার উপরের তলায় একটি রুম আছে। ওই রুমের জানালা দিয়ে তোমাদের বাড়ির লন এবং পোর্চ পর্যন্ত দেখা যায়।' সালার শুয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল। ইমামা হুট করে উঠে তার কাছে চলে এলো। কোন রুম? আমাকে দেখাও।' তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: 'দেখাতে পারি, যদি তুমি ঘুমিয়ে যাও। সকালে আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব।' সালার চোখ খুলে বলল।

: 'আমি একাই যেতে পারব।' ইমামা অসম্ভব অভিমানে সোজা হয়ে পড়ল।

: উপরের তলা বন্ধ।

ইমামা যেতে যেতে থেমে পড়ল। তাকে একদম হতাশ দেখাতে লাগল।

: 'সালার, আমাকে উপরে নিয়ে যাও।' এরপর ইমামা তার কাঁধ নাড়াতে লাগল।

: 'এখন তো নিয়ে যাব না।' সালার নির্দিধায় বলল।

: 'আমাকে কি তুমি একটুও ভালোবাসো না?' ইমামা তাকে আবেগের ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে।

: 'বাসি। এজন্যই তো নিয়ে যাচ্ছি না। সকালে ওখানে যেয়ো। তোমার পরিবারের লোকেরা তখন বাড়ি থেকে বের হবে। তুমি তখন তাদেরকেও দেখতে পাবে। এখন আর কী দেখবে?' সালার প্রচণ্ড জোর দিয়ে বলল।

: 'তা ছাড়া আমি জানি না, চাৰি কার কাছে। সকালে পরিচারকের কাছে জিজ্ঞেস করে নেব।' সালার মিথ্যা বলল। উপরের তলা তাল দেওয়া নয়। কিন্তু ইমামাকে থামানোর জন্য এছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই। ইমামা খানিক হতাশ হয়ে পুনরায় জানালার দিকে যেতে লাগল। সালার তার হাত টেনে ধরল।

: আর রুমের তাল তখনই খুলব, যদি তুমি এখন ঘুমিয়ে যাও।

ইমামা কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন
অঙ্গসমর্পণ করতে করতে বলল, 'আমি বিছানার এ পাশে
ঘুমাব।' সালার চুপচাপ নিজের জায়গা ছেড়ে দিল। কম্বল সরিয়ে
তার জন্য জায়গা করে দিল। 'এছাড়া আমি লাইটও জ্বালিয়ে
রাখব।' ইমামা তার খালি করা জায়গায় বসতে বসতে বলল। সে
এখন ক্রাউনের গায়ে হেলান দিয়ে, উভয় হাঁটু ভাঁজ করে
বিছানায় বসে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'আলোতে আমার ঘুম আসবে না।' সালার হাঁটু ও পায়ে কম্বল
জড়াতে জড়াতে বলল।

: 'তোমার তো আলোতেই ঘুম আসে।' সে খানিক বিরক্ত হয়ে
বলল।

: 'এখন অন্ধকারে আসে।' সালার পিঠাপিঠি উত্তর করল।

: তাহলে আমার আলোতেই ঘুম আসে।

তার কথায় সালার মুচকি হাসল। একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ঘুমের প্রতি তোমার অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।" কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সালার খানিকটা ঝুঁকে সাইট টেবিল ল্যাম্প অফ করতে লাগল। ইমামা অভিমানী চেহারায়ে বসে রইল। কিন্তু সালারকে থামানোর চেষ্টা করল না। রুমে এখন আধো অন্ধকার। কিন্তু বাইরের আলোর কারণে ইমামার বাড়িটি এখন আগের চেয়ে বেশি স্পষ্ট দেখাতে শুরু করল।

: 'এভাবে তাকিয়ে থেকে কী হবে?' সালার এখন খানিকটা অধৈর্য হয়ে গেল।

: হতে পারে কেউ জানালার পর্দা সরিয়ে, ওখানে এসে দাঁড়াবে।

এটি তার নিছক ইচ্ছা নয়, আকুল প্রত্যাশা। আর সালার এ প্রত্যাশাকে গুঁড়াতে পারে না।



: 'সকালে আমাদেরকে গ্রামে যেতে হবে।' সালার এখন জানালা থেকে তার মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করল।

: 'আমি যাব না, আমি এখানেই থাকব।' ইমামা সরাসরি অস্বীকার করল। সালারও এমনটাই ভেবেছিল।

: 'তোমাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই নিয়ে এসেছি।' সালার খানিক অভিমানী হয়ে বলল।

: 'তুমি যাও, কোনো গ্রামের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।' সে স্পষ্ট ভাষায় বলল। সালার কম্বল সরিয়ে একদম বিছানা ছেড়ে উঠে, জানালার পর্দা ছড়িয়ে দিল। বাইরের আলো আসা বন্ধ হতেই রুম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ইমামা অসম্ভব অভিমানে শুতে শুতে কম্বলে মাথা ঢেকে নিল।



সালারের ডাকে তার চোখ খুলল। সাহরির আর অল্প কিছুক্ষণ বাকি আছে। ইমামা উঠে সবার আগে জানালা থেকে পর্দা সরাল। সালার সহমর্মিতার চোখে তার দিকে তাকাল। ইন্টারকম তুলে খানসামাকে রুমে খাবার দিয়ে যেতে বলল। ওপাশে ইমামার রুমের লাইট জ্বলছে। কিন্তু জানালার সামনে এখনো পর্দা ছড়ানো। সে যেন হতাশ হলো। হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে আসতে আসতে খানসামা রুমে খাবার রেখে চলে গেল। তারা অত্যন্ত নীরবে খাবার খেল। খাবার শেষ হতে ইমামা বলল, 'এখন চাবি নিয়ে আসো, উপরে যাই।'

: আমাকে নামাজ পড়ে আসতে দাও।

: না, আমি আমার বাড়ি দেখবাসালার এবার যেন ইমামার সামনে অস্ত্র নামাতে বাধ্য হলো। তাকে নিয়ে উপরের তলায় চলে এলো। রুমের দরজা খোলা দেখে ইমামা তার দিকে

অসম্ভব অভিমানে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। এই মুহূর্তে সে এত খুশি যে, সালারের কোনো কথাতেই তার রাগ হচ্ছে না।

এই রুমের জানালার সামনে দাঁড়াতেই সে যেন নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল। এখান থেকে তার বাড়ির পুরো লন ও পোর্ট দেখা যাচ্ছে। লনের চিত্র একদম পালটে গিয়েছে। যখন সে এখানে ছিল, তখন এমন ছিল না। এখন এখানে ওই দুটো চেয়ারও নেই, কিন্তু আগে ছিল। লনের লতাগুল্মগুলো এখন আগের চেয়েও বেশি বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অশ্রুর একটি নতুন প্রবাহ তার চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল। সালার এবার তাকে কিছু বলল না। বলাটা অনর্থক। এই মুহূর্তে ইমামা কান্না করবে, এটা সে জানে।

সালার মসজিদে নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ফিরে এলো। প্রত্যাশামাফিক ইমামা তখনো রুমে ফিরে আসেনি। সালার গ্রামে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে

তাকে খোদা হাফেজ জানাতে উপরে এলো। তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সে আগেই বাদ দিয়ে দিয়েছে।

আড়াই ঘণ্টা পরও জানালার সামনে সে ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সালারের আগমনেও সে পিছন ফিরে তাকাল না। সালার তাকে না ডেকে রুমের একপাশ থেকে একটি সোফা ঠেলে জানালার পাশে নিতে লাগল।

: 'এখানে বসো তুমি, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো' সোফা ঠেলে তার কাছে নিয়ে সালার তাকে সম্বোধন করল। আর তখনই সে ইমামার চেহারা দেখল। তার মুখ অশ্রুতে ভিজে আছে। চোখ ও নাক লাল হয়ে গেছে। সালার ঘাড় ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল। সেখানে একটি গাড়িতে কিছু বাচ্চা চড়ছে। আর একটি মহিলা তাদের খোদা হাফেজ বলছে।

: 'রিজওয়ানের ছেলে-মেয়ে?' গাড়ি স্টার্ট হতে দেখে সালার ইমামাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা কিছুই বলল না। অপলক দৃষ্টে

কাঁপা ঠোঁটে এক ধ্যানে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সালার তাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। নয় বছর! দীর্ঘ একটি সময়। জানি না তাদের কাকে কাকে সে চিনতে পেরেছে! আর কাকে কাকে পারেনি! তাদের মধ্যে কাকে এই প্রথম দেখছে সে! আর কাকে কাকে দ্বিতীয়বার! ওই মহিলাটি এখন বিদায় জানিয়ে ভেতরে চলে গিয়েছে।

তার কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে সালার বলল, 'বসে পড়ো।' ইমামা সোফায় বসতে বসতে ওড়নার আঁচলে চোখ ও নাক ঘষতে চেষ্ঠা করল। কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য তার চেহারা শুকিয়ে উঠল। বর্ষণ আবারও শুরু হলো। সালার হাঁটুতে ভর করেখানিকক্ষণ তার সামনে বসল। সে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ইমামার উভয় হাত তার হাতে পুরে নিল। হাত দুটো অসম্ভব ঠান্ডা। অতঃপর সে তার হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রুমের শীতলতা এই প্রথম সে অনুভব করল। হিটার অন করে রুমের আলমারিতে কোনো কম্বল খোঁজার চেষ্ঠা করল। একটি কম্বল পেয়েও গেল।

: 'আমি গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছি, সন্ধ্যার আগেই চলে আসব। দশ-এগারোটার দিকে পাপা ও মাম্মি উঠে পড়বেন। তখন তুমি নিচে চলে এসো।' তার পায়ে কম্বল জড়িয়ে দিতে দিতে সালার তাকে বলল। ইমামা এখনো ওড়নার আঁচলে নাক ও চোখ ঘষছে। কিন্তু তার চোখ এখনো জানালার বাইরে। সালার ও এই রুমের প্রতি যেন তার কোনো খেয়ালই নেই। সালার তাকে কী বলছে, সে তা শোনেনি। এটা সালার জানেও। তবু খোদা হাফেজ বলে সে চলে গেল।

ইমামা পরবর্তী চার ঘন্টা ওভাবেই সোফায় স্থবির হয়ে বসে রইল। আজ সে নয় বছর পর একে একে তার তিনজন ভাইকেই বাড়ি থেকে বের হতে দেখল। তাদের দেখতে দেখতে সে হেঁচকি তুলে কান্না করতে লাগল। এখানে বসে বসে তার মনে হচ্ছিল, এখানে এসে সে ভুল করেছে। আসা উচিত হয়নি তার। এতগুলো বছর ধরে সে ধৈর্যের যে বাঁধ বেঁধে এসেছে, এখন সেই বাঁধ আটকে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে সে ইসলামাবাদেই আসতে চায়নি। আর এখন এখান থেকে যেতে চাচ্ছে না। এমনটাও তো হতে পারে, সে এভাবেই লুকিয়ে-চুরিয়ে এই বাসাতেই থাকবে। এভাবেই প্রতিদিন তার বাড়ির সদস্যদের দেখবে। তার জন্য তো এটাই অনেক কিছু। এটা বোকামি চিন্তাভাবনা। সে এখন তা-ই ভাবছে, যা করলে সে এখানে তার বাবা-মায়ের বাড়ির আশেপাশে থাকতে পারবে!

সালার গ্রামে পৌঁছে কয়েক ঘণ্টা পর সিকান্দার উসমানকে ফোন করল।

: 'আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, পরিচারক যখন বলল, ইমামা উপরে গেস্টরুমে আছে। আমি চিন্তা করছিলাম, না জানি সে ওখানে কী করছে!' সালার উনাকে ইমামাকে উপর থেকে ডাকার জন্য বলতেই, প্রত্যুত্তরে তিনি সালারকে এটা বললেন। 'কী দরকার ছিল শুধু শুধু তাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার! তোমার রুম থেকেই তো তার বাড়ি দেখা যায়।'

: 'কিন্তু গেস্টরুম থেকেই সে তার বাড়ির সদস্যদের দেখতে পারে।' সালার নির্ভয়ে বলল। সালারের সাথে কথা শেষ করে সিকান্দার উসমান উঠে উপরের তলায় চলে গেলেন। দরজায় টোকা দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

: 'বেটা, নিচে আসেন। আমাদের সাথে কিছুক্ষণ বসেন।' বলতে বলতে সিকান্দার ভেতরে এলেন। ইমামা খানিক অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে এখানে উনার আগমনের প্রত্যাশা করেনি। তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই সিকান্দার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তার চোখদুটো প্রচণ্ড ফুলে আছে।

: 'কান্নার কী হলো বেটা!' সিকান্দার তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন।

বলল। : 'না ওই আমি...' সে প্রচণ্ড লজ্জাকাতর হয়ে উনার দিকে না তাকিয়েই

: 'চলুন, নিচে যাই। তাইয়েবাও আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল।' সিকান্দার পুনরায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এটা সালার নয়, যাকে সে মুখের উপর না করে দেবে। 'জি' বলে সে সোফায় ছড়ানো কম্বল ওঠাতে লাগল। সিকান্দার তাকে থামিয়ে দিলেন।

: পরিচারক গুছিয়ে নেবে, আপনি চলে আসুন।

তার চেহারা দেখে তাইয়েবাও অস্থির হয়ে পড়লেন। বিয়ে যে অবস্থাতেই হোক, তার পরিবার তো এমন এক পরিবার, যাকে তারা দীর্ঘ সময় ধরে চেয়েছেন। যাদের ঘরের দেওয়ালে তাদের দেওয়াল মিশে আছে। ওই সম্পর্কের পাশাপাশি, পুত্রবধূ হওয়ার সুবাদে তাদের ওপর এখন বাড়তি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তিনি নিজেও ইমামাকে শৈশব থেকে দেখে আসছেন। একটা পর্যায় পর্যন্ত তিনিও ইমামার সাথে পরিচিত ছিলেন।

উনারা তাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। তারপর সিকান্দার তাকে আরাম করতে বললেন। রুমে এসে সে কিছুক্ষণ জানালার কাছে বসে রইল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাড়ে চারটার দিকে পরিচারক ইন্টারকমে কল করে তাকে জাগাল। ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সিকান্দার এবং তাইয়েবাবাও তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সালার ও ইফতারের কয়েক মিনিট আগে এসে পৌঁছাল। আজ রাতেও সিকান্দার ও তাইয়েবার কোথাও দাওয়াত রয়েছে। কিছুক্ষণ তাদের সাথে কথা বলে 'খোদা হাফেজ' জানিয়ে তারা চলে গেলেন। রাত বারোটোর দিকে তারা ফিরলেন। এগারোটায় সালার ও ইমামার ফ্লাইট ছিল। তাইয়েবা চলে যাওয়ার আগে ইমামাকে কিছু উপহার দিতে আসতেই, ইমামারও তাদের জন্য করাচি থেকে কেনা উপহারগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সালার তাইয়েবার

সাথে দেখা করে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ল। ইমামা অবাক হলো।

: 'তুমি আমাকে দশটায় জাগিয়ে দিয়ো।' সে ইমামাকে নির্দেশনা দিল।

: 'এগারোটায় ফ্লাইট। দেরি হয়ে যাবে না তো আবার!' ইমামা খানিক ভাবতে ভাবতে বললানা, সময়মতো পৌঁছে যাব।' সালার চোখ বন্ধ করতে করতে বলল। ইমামা কিছুক্ষণ বসে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পুনরায় উপরের ওই রুমে চলে এলো।

তাদের বাড়ির পোর্চে এখন কোনো গাড়িও দাঁড়ানো নেই। আজ সাপ্তাহিক ছুটি। তারা নিশ্চয় বাড়িতে নেই। কোথায় যেতে পারে? ইমামা অনুমান করার চেষ্টা করল। নয় বছর পর এটা অনুমান করা অনেক কঠিন। তার প্রত্যাশা ছিল, ওখানে বসে থাকলে তাদের ফেরার সময় দেখতে পাবে। কিন্তু দশটা পর্যন্ত

কোনো গাড়ি এলো না। সে বিষণ্ণ মন ও সিন্ত চোখে উঠে নিচে চলে এলো। সালারকে জাগানোর দরকার হলো না। সে বের হওয়ার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে আগেই দাঁড়িয়ে আছে। ইমামার মন আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তাহলে সবকিছু ছেড়ে আবারও চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে?

বাইরে পোর্টে ড্রাইভার একজন গার্ডকে সঙ্গে করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সিকান্দার উসমান গার্ডকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সাথে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাদের জন্য তিনি সার্বিক সতর্কতামূলক পস্থা অবলম্বন করছিলেন। সালার জিনিসপত্র গাড়িতে রেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে নিল। ইমামা হতবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

: আমরা গাড়িতে করেই করাচি যাচ্ছি, পাপা এলে উনাকে বলে দিয়ে।

ড্রাইভার খানিক আপত্তি করার চেষ্টা করল। সিকান্দার হয়তো তাকে কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু সালারের একটা ঝাড়িই থাকে শান্ত করে দিল।

: 'এখন আবার এতটাও আনুগত্য দেখানোর প্রয়োজন নেই যে, আমরা গেট ছেড়ে বের হতেই পাপাকে ফোন করে সব বলে দিবে।' সালার গাড়িতে বসে গার্ডকে বলল। সালারের বিশ্বাস ছিল, গেট পার করতেই গার্ড সিকান্দারকে ফোন করে সব বলে দিবে। এজন্য গেট পার করেই সালার নিজেই সিকান্দারকে কল করল। সে সিকান্দারের সাথে কলে কথা বলে বলে কিছুক্ষণ উনাকে ব্যস্ত রাখতে চাচ্ছে। গার্ড যেন উনাকে এখনই কলে না পায়।

: 'পাপা, আমরা বের হচ্ছি। ভাবলাম আপনার সাথে কথা বলি।' সালার সিকান্দার উসমানকে বলল।

: ভালো করেছে।



: 'একটু মাম্মির সাথেও কথা বলিয়ে দাও।' সিকান্দার কিছু বলার আগেই সে সিকান্দারকে বলে উঠল। সালার ভয় পাচ্ছিল, এই মুহূর্তে ড্রাইভার কল করলে তার ইনকামিং কল দেখে সিকান্দার উসমান চমকে যেতে পারেন। সে যদি গাড়িতে বসে উনার সাথে কথা বলে, তাহলে ড্রাইভার কেন এখন কল করবে! মোটকথা, তাইয়েবাকলে কথা বলার সময় কারও ইনকামিং কল চেক করেন না। আর করলেও উনি চমকাবেন না। পরবর্তী পনেরো মিনিট সে তাইয়েবার সাথে কথা বলতে থাকল। তার কাণ্ড দেখে ইমামা অবাক হচ্ছিল। কিন্তু সালার তাকে এডিয়ে গেল। সে কখনো এত দীর্ঘ সময় কথা বলে না। এখন ছুট করে সে যেন একদম বাচাল হয়ে গেছে। এপাশে তাইয়েবাও অবাক হচ্ছিলেন। সিকান্দার ডিনার টেবিলে বাকিদের সাথে গল্প করছিলেন। পনেরো মিনিট কথা বলার পর সালার যখন নিশ্চিত হলো, ড্রাইভার এতক্ষণে সিকান্দারকে একাধিকবার কল করে বিরক্ত হয়ে কল করা বন্ধ করে দিয়েছে,

কিংবা পুনরায় কল করলেও আরও কিছুক্ষণ পরে করার চেষ্টা করবে, তাই

এখন সে খোদা হাফেজ বলে কল কেটে দিল। বারোটোর আগে তাইয়েবা ও সিকান্দারের ফিরে আসার কোনো প্রত্যাশা নেই। তাছাড়া এখন যদি দশ-বিশ মিনিট পরেও ড্রাইভারের সাথে উনার কথা হয়, ততক্ষণে সে অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলবে।

: 'সড়কপথে আসার কী দরকার ছিল?' কল কেটে দিতে দেখে ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'এমনিই, মন চাচ্ছিল। কিছু স্মৃতি সতেজ করতে চাই।' সালার ফোন রাখতে রাখতে বলল।

: 'কীসের স্মৃতি?' ইমামা অবাক হলো।

: তোমার সাথে প্রথম সফরের স্মৃতি।

ইমামা কিছুক্ষণ তার চেহারা থেকে চোখ সরাতে পারল না। সে এই মানুষটিকে কী বলত যে, ওই সফরের কথা সে মনে করতে চায় না? ওটা তার জন্য সফর ছিল না। অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পথ-অতিক্রম করা ছিল। ভবিষ্যৎ তখন তার সামনে অন্ধকার ভয়ংকর ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত পথজুড়ে ওই ভূত তাকে ভয় দেখিয়ে চলেছিল।

: 'ওই সফরটি আমার জন্য সুখকর ছিল না।' সে ক্লান্ত স্বরে সালারকে বলল।

: 'আমার জন্যও ছিল না।' সালারও একই স্বরে বলল। 'সেটি ধারাবাহিক অনেকগুলো বছর আমাকেও আঘাত করেছে। দেখতে আসছি, এখনো আঘাত করে কি না!' সালার কথা শেষ করতে করতে, ইমামার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

ইমামা চুপ রইল। বহু বছর আগের সে রাতটি তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। চোখের সামনে কেবল রাতই নয়, বরং জালালও এলো। সে রাতের যাতনার একটি প্রান্ত জালালের সত্তার সাথেও বাঁধা ছিল। অপরটি তার নিজের পরিবারের সাথে। ইমামা এই দুটোকেই হারিয়ে ফেলেছে। আকাশের সূর্য ঠিক আগের মতোই ওঠে, কিন্তু তার জীবন তার আগের মতো নেই। কখনো সে ভাবত, এই রাতটিকে সে একটিকষ্টের স্মৃতি হিসেবেই ভাববে, তাকদির হিসেবে নয়। তার চোখ ভিজতে লাগল। পাশে বসা মানুষটি আজ তার অশ্রুর ব্যাপারে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সেদিন ছিল। সালার কিছুই না বলে হাতের মুঠোয় তার হাত পুরে নিল। ইমামা চোখ মুছতে লাগল। তার জীবনের অঙ্কিত রেখায়, এই মানুষটির নাম কোথাও ছিল না। জীবন কাকে কার সাথে মিলিয়েছে, কোন সম্পর্ককে কোথায় নিয়ে ভেঙেছে, বুঝতেই পারেনি। নিঃশব্দে পথ অতিক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু অতিক্রান্ত ঠিকই হচ্ছে।

: এখন খুব সতর্কভাবে গাড়ি চালাচ্ছি।



সালারের এই কথায় ইমামার বহু বছর আগের বেপরোয়া
ড্রাইভিংয়ের কথা মনে পড়ল।

: 'জীবনের গুরুত্ব বুঝে গেছ এখন?' সে সালারের হাত থেকে
হাত সরাতে সরাতে বলল।

: তোমার জন্য সতর্ক চালাচ্ছি।

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। নীরবতার আরও একটি বিরতি
এলো।

তারা এখন শহরের সীমা পেরিয়ে গেছে। রাস্তায় কুয়াশা চোখে
পড়তে শুরু করেছে। এখানে কুয়াশা গভীর নয়, তবে আছে।

: 'পরে কখনো এই পথে একাকী সফর করেছ?' কিছুক্ষণ পর
ইমামা জিজ্ঞেস করল।

: 'গাড়িতে যেতে ইচ্ছা করলে মোটর-ওয়েতে যাই। ব্যস, কয়েক মাস আগে একবার এসেছিলাম।' সালার বলে চলল। 'পাপা যখন তোমার হাতের লেখা চিরকুট দিয়েছিলেন। কী দুঃসহ ছিল সেই রাত!' সে যেন যন্ত্রণায় কাতরাল, পরক্ষণেই হেসে উঠল। 'যাকে পাওয়ার আশা ছিল, সে রাতে আমি তাকে ধ্বংস হতে দেখেছি। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সেই রাতটি তোমার কী যাতনায় কেটেছে। যন্ত্রণার চেয়েও অনেক বেশি, মৃত্যু থেকে খানিকটা কম। কিন্তু একে শুধু যন্ত্রণা বললেও ভুল হবে।' উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে বলতে বলতে সে ইমামাকে যা বোঝাতে চাচ্ছে, তা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছে। ওই কাচ গলে ইমামাও একদিন ভাবনায় হারিয়েছিল। সে এখন ভেজা চোখে, সিটে পিঠ ঠেকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

: 'পুরো পথ আমি কেবল এটাই ভাবছিলাম, এখন আমি কী করব। জীবনে কী করব। আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক

হায়াত দিয়েছেন। তোমার সাথে সেদিন খারাপ করেছিলাম। আমার সাথে খারাপ হওয়াটা তো আমার প্রাপ্য ছিল। মনে নেই। তোমার সাথে আমি সেদিন কীভাবে কথা বলেছিলাম?' সালার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে, এক মুহূর্ত ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য উভয়ের চোখাচোখি হলো। সালার দৃষ্টি লুকিয়ে মাথা সোজা করে ফেলল। সফর পুনরায় নীরবে হতেলাগল। তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক যেন নীরবতাকেও কথোপকথনে রূপান্তরিত করছে। শব্দ এ মুহূর্তে নীরবতার চেয়ে অধিক অর্থপূর্ণ হতে পারছে না।

ইমামাও মাথা সোজা করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। কুয়াশা এখন গাঢ় হচ্ছে। তারা যেন এখন রাস্তায় নয়, বরং নিজেদের অতীত কুয়াশায় প্রবেশ করছে। গাঢ়, গভীর, হাত দেখা যায় না এমন ঘনীভূত প্রগাঢ় কুয়াশায়। সেই কুয়াশা তার ভেতরে কতকিছু লুকিয়ে রেখেছে। যা কিছুই রেখেছে, তা এখন অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢুকে গেছে। কিন্তু বিস্মৃত হয়নি। সেলফোনের রিংটোন তাদেরকে চমকে দিল। স্ক্রিনে

সিকান্দারের নম্বর চমকাচ্ছে। সালার হাসতে লাগল। ইমামা তার উদ্দেশ্যহীন হাসির অর্থ বুঝতে পারল না।

: 'হ্যালো!' সালার কল রিসিভ করে এতটুকুই বলল। সে অবাক হলো, সিকান্দার উসমানের কল এত দেরিতে আসার কথা না। ড্রাইভার হয়তো উনি বাসায় ফেরার পর ই সালারের অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। সালার ফোনের ভলিউম কমিয়ে দিল। সিকান্দার তাকে যা কিছু বলবেন, সে চাচ্ছে না তা ইমামার কানেও যাক।

: 'জি, জি।' সালার এখন আনুগত্যের সুরে উত্তর করছে। ওদিকে সিকান্দার তার ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আর করবেনই-না বা কেন, উনাকে বোকা বানানো ছিল সালারের বা হাতের খেল। এই অনুভূতিটাই সিকান্দারের রাগকে আরও প্রচণ্ড করে তুলছে। কিছুক্ষণ আগে তিনি উনার ফোনে ড্রাইভারের মিসড কল খেয়াল করলেন। আর তার সাথে কথা বলে তিনি যেন রক্তের ঢোক পান করলেন। এই সময়ে

সড়কপথে লাহোর যাওয়া, এটি সালারের সর্বোচ্চ নিবুদ্দিতার
পরিচায়ক। কিন্তু সে যতটা নীরবে-নিভৃতে উনার চোখে ধুলো
ছিটাল, এটা উনাকে আরও বেশি উত্তেজিত করেছে।

: 'এখন রাগটা একটু কমান পাপা! আমরা এখন একদম
নিরাপদ। নিশ্চিন্তে সফর করছি।' অবশেষে সে সিকান্দারকে
বলল।

: তুমি জাফরকে ধমকি দিয়ে গিয়েছিলে, সে যেন আমাকে
এসব না জানায়?

: ধমকি? আমি তো কেবল তার কাছে ভদ্রতার সহিত নিবেদন
করেছিলাম, যাতে সে এখনই আপনাকে কিছু না জানায়।
ডিনার পাটি রেখে আপনি শুধু শুধুই দুশ্চিন্তা করতেন। সে
অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উনাকে বলে চলল।

: আমি দোয়া করি সালার! তোমার সন্তান যেন তোমার মতোই হয়। তোমাকে যেন এতটাই অপদস্থ করে, যতটা তুমি আমাদের করছ। তখন তুমি বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা কেমন বুঝতে পারবে।

সালার হাসতে লাগল।

: পাপা, এমন কথা বললে আমি সন্তানই জন্ম দেব না। তার কথায় ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। 'পাপা বলছেন যে, আমাদের সন্তান খুব তাড়াতাড়ি আসুক।' ইমামাকে চমকাতে দেখে ফোনে কথা বলতে বলতে তাকে বলল। ইমামা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার বুঝে এলো না, এটা এমন দোয়ার জন্য কেমন সময় আর কেমন নিয়ম! অপর পাশ থেকে সিকান্দার এটি শুনে নিরুপায় হয়ে হেসে উঠলেন। উনার রাগ কমতে লাগল। বহু বছর পর সালারকে শাসাতে উনার এভাবে কথা বলতে হচ্ছে। তারপর তিনি সালারকে জিজ্ঞেস করলেন,

তোমরা এখন কোথায়? প্রত্যুত্তরে সিকান্দারকে নিজের অবস্থান জানিয়ে ফোন রেখে দিল সে।

: 'পাপা রাগ করছিলেন?' ইমামা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

: 'খুশি হওয়ার মতো তো কোনো বিষয় নয়।' সালার প্রত্যুত্তরে বলল।

: 'তুমি মিথ্যা কেন বলো?' ইমামা যেন তাকে লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করল।

: 'কারণ, আমি যদি সত্য বলি, তাহলে মানুষ আমাকে সেটা করতে দিবে না, যেটা আমি করতে চাই।' বাহ কী যুক্তি! সেটাও আবার অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে!

: হোক তোমার মিথ্যার কারণে অন্য কেউ কষ্ট পাক!

: আমার মিথ্যার কারণে কেউ কষ্ট পায় না; বরং রাগান্বিত হয়।

তাকে বোঝানো অনর্থক। এটা সালার। ইমামা এখন অনুমান করতে পারছে, সিকান্দার তাকে ফোনে কী বলে থাকতে পারেন।

রাতের প্রায় শেষপ্রহরে তারা ওই সার্ভিস স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাল।

: 'এই জায়গাটি মনে আছে তোমার?' সালার গাড়ি থামাতে থামাতে তাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা কুয়াশা আবৃত জায়গাটির চারপাশে তাকাল। সেখানে কিছু বৈদ্যুতিক বাতি কুয়াশা ও অন্ধকার তাড়ানোর জন্য লড়ছে।

: 'না' সে সালারকে বলল।

: এটা সেই জায়গা, যেখানে নেমে তুমি নামাজ পড়েছিলে।



ইমামা খানিক অস্থির চোখে জায়গাটিতে পুনরায় চোখ বোলাতে শুরু করল। এখন সে এটি খানিকটা চিনতে পারছে। সেও দরজা খুলে নেমে পড়ল। তার শরীরে একটি কম্পন বয়ে গেল। আজও সে একটি সোয়েটার ও চাদর জড়িয়ে আছে। যেখানে বসে তারা একদিন চা পান করেছিল, সেই রুমটি এখন বদলে গিয়েছে।

: 'চা ও চিকেন বার্গার।' সালার চেয়ারে বসতে বসতে যে লোকটি হাই তুলতে তুলতে তাদেরকে ভেতরে নিয়ে এসেছিল, তাকে বলল। সালারের অর্ডার শুনে ইমামা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। এখন ওগুলো খেতে পারবে?

সালার জানে তার ইশারা কোন দিকে। সালার কিছু না বলে মুচকি হাসল।

: 'শেষবার আমরা ওখানে বসে ছিলাম। তুমি ওখানে নামাজ পড়েছিলো।' সালার

হাতের ইশারায় রুমের বিভিন্ন অংশ দেখাতে দেখাতে বলল। ইমামার মনে নেই রুমের বিভিন্ন জায়গায় চেয়ার-টেবিল পাতা ছিল। ফজরের আজান হতে এখনো অনেক সময় বাকি। এখন এখানে কর্মরত কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। এখানকার চা ও বার্গার এখন আর অতটা খারাপ নেই, যতটা ছিল তখন। পরিবেশনও যথেষ্ট ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের কারোরই এখন আর খাবারের স্বাদ কিংবা পরিবেশনের দিকে কোনো লক্ষ নেই। দুজনেই নিজস্ব অতীতকে পুনর্জীবিত করতে ব্যস্ত। এটি কেবল কয়েক ঢোক আর কয়েক লোকমার গল্প নয়। এটি দুটো জীবনের গল্প। যে জীবন রেল লাইনের মতো না জানি কত পথ ঘুরে একই স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। তারা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে রেল লাইন তার গতিপথ বদলায়। তাদের সমস্ত দূরত্ব-নৈকট্য; মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন তারা একে অপরের সঙ্গী।

আজ এই পথে কিছু নতুন স্মৃতি জমা হলো। তাদের বিয়ের পর সড়কপথে এটি তাদের প্রথম সফর। আজকের এই নতুন স্মৃতি পুরোনো স্মৃতিকে মুছে দিতে শুরু করেছে। টেবিলে বিলের টাকা রেখে সে উঠে দাঁড়াল। ইমামাও তার অনুসরণ করল। হাঁটতে হাঁটতে সালার তার ডান হাতে ধরল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকাল। দেখল, সালারের চেহারায় একটি কোমল মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে।

: 'ইমামা, ওই পিস্তলটি কোথায়?' বিন্ডিং থেকে বের হতে হতে তার প্রশ্ন শুনে সে চমকাল। কীসের কথা তার মনে পড়ছে। ইমামা হাসতে লাগল।

: 'আববুর কাছে।' সে সালারকে বলল।

: 'সত্যিই তুমি চালাতে জানো?' না জানি সালার কীসের সত্যতা চাচ্ছে।

: 'হ্যাঁ' ইমামা মাথা নাড়াল। 'কিন্তু তাতে কোনো গুলি ছিল না' তার পরবর্তী বাক্য শুনে সালার আচমকা থমকাল। 'আমার কাছে কেবল পিস্তলই ছিল।' ইমামা নিশ্চিত্তে বলে চলল। সালার অজান্তেই হেসে ফেলল। তার চোখে ইমামা ধুলো ছিটিয়েছিল, নাকি আল্লাহ? সে বুঝতে পারল না। ওই পিস্তলটি তাকে যে পরিমাণ শকড় ও উত্তেজিত করেছিল, সে যদি তখন বুঝতে পারত তাতে কোনো বুলেট নেই, তাহলে সালার সেদিন নিশ্চিত তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েই আসত। পিস্তল হাতে নিয়ে সেদিন ইমামাকে এতটা আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত্ত কেন দেখাচ্ছিল? সালার তা এখন বুঝতে পারছে।

: 'তুমি ভয় পেয়েছিলে?' ইমামা হাসছে। জানালার সামনে বসে কাকে কাকে দেখেছিল, পরবর্তী দু-তিন দিন পর্যন্ত ওগুলো সে সালারকেও বলতে থাকল। শেষমেশ তার কথা একটি বাক্যে গিয়ে থেমেছিল, 'সালার, আমরা কি ইসলামাবাদে থাকতে পারি না?'

সালার বিছানায় বসে ল্যাপটপ কোলে নিয়ে ইমেইল করতে ব্যস্ত। এদিকে বিগত আধা ঘণ্টা ধরে সে ইসলামাবাদের কথাই বলে যাচ্ছে। আর সালার অসম্ভব ধৈর্যের সাথে সেই কথাগুলো শুনে চলছে। তার উত্তরও করছে।

: 'না' নিজের কাজে ব্যস্ত সালার বলল।

: কেন?

: কারণ, আমার চাকরি এখানে।

: তুমি চাকরি বদলে ফেলো।

: বদলাতে পারব না।

ইমামা কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল। তারপর বলল, 'আমি একা কি ইসলামাবাদে থাকতে পারি না?'

অবশেষে সালার স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকাল।

: 'এর মানে কী?' সালার তাকে প্রচণ্ড গভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, আমি একা ওখানে থাকতে পারব। তুমি প্রতি সপ্তাহে আসা-যাওয়া করো।

মুহূর্তের জন্য সালারের মনে হলো, সে দুষ্টুমি করছে। কিন্তু সে দুষ্টুমি করছে না।

: 'আমি প্রতি সপ্তাহে ইসলামাবাদ যেতে পারব না।' সালার অসম্ভব সহনশীলতা নিয়ে তাকে বলল। ইমামা কিছুক্ষণ চুপ রইল। সালার পুনরায় ল্যাপটপের দিকে মনোযোগী হয়ে গেল।

: তাহলে তুমি মাসে একবার আসা-যাওয়া করো।

সালার তার কথার চেয়ে বেশি তার নিশ্চিত্ত ভাব দেখে
থমকাল।

: 'কখনো কখনো আমি মাসে একবারও ওখানে যেতে পারি
না।' সে বলল।

: তাহলেও কোনো সমস্যা নেই।

: 'তার মানে তোমার কিছুই যায়-আসে না?' সালার ইমেইল
করতে ভুলে গেল।

: 'আমি তো এটা বলিনি।' ইমামা হুট করে বলে উঠল। সে
ধারণাও করতে পারেনি, ইমামা এতটা স্পষ্টভাবে তার মনের
কথাগুলো বলে ফেলবে।

: পাপা এবং মান্নি ওখানে একাকী থাকেন। এ...।: 'না, ভয় তো পাইনি। কিন্তু ঝুঝ হয়ে গিয়েছিল। পুরো রাত্তা তুমি অসহায়ভাবে কান্না করছিলে। অথচ তোমার কাছে পিস্তল ছিল। আমি প্রত্যাশাই করতে পারিনি, তুমি আমার ওপর পিস্তল ধরবে। তোমার অশ্রু আমাকে ধোঁকা দিয়েছে।' সে খানিক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলে চলল। ইমামা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

তারা দুজনেই এখন গাড়িতে বসে আছে। বসার পরও গাড়ি স্টার্ট না করে সালার যখন উইন্ডস্ক্রিন গলে বাহিরে তাকিয়ে রইল, ইমামা তখন বলল, 'গাড়ি স্টার্ট করছ না কেন?'

: 'আমার মাথায় কেন এলো না, তোমার পিস্তল খালিও হতে পারে। কেন মাথায় এলো না?' সালার যেন বিড়বিড় করে আত্ননাদ করে উঠল।

: 'এখন কান্না শুরু করে দিয়ো না।' ইমামা তাকে বিদ্রূপ করল।
'তা ছাড়া তুমি এটা জেনে গেলে কী করতে?'

: 'আমি সোজা গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিতাম তোমাকে।'
সালার গাড়ি স্টার্ট করতে করতে বলল।

: 'তোমার লজ্জা লাগত না?' ইমামা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

: 'তোমার লেগেছিল? যখন তুমি আমার ওপর পিস্তল
ধরেছিলে? আমি তোমার অনুগ্রহকারী ছিলাম।' সালারও একই
ভঙ্গিতে বলল।

: অনুগ্রহকারী ছিলে। তুমি আমাকে ধমকাচ্ছিলে।

যা-ই করছিলাম, আমার অন্তত এটা প্রাপ্য ছিল না যে, তুমি
আমাকে পিস্তল ঠেকাবে।

'কিন্তু আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি।' ইমামা প্রতিরোধের ভঙ্গিতে

বলল।

: তাহলে আমি কোন ক্ষতিটা করে ছিলাম?

গাড়ি এখন পুনরায় রাস্তায় চলতে শুরু করেছে। লাহোরের সীমানায় প্রবেশ করা পর্যন্ত ইমামা আবারও তার ওপর অভিমান করে বসল।

২৭

ইমামা পরবর্তী দু-তিন দিন ইসলামাবাদের ঘোরেই আছে। ওখানে যেতে যতটা ভীত ছিল সে, এখন সেই ভয় কাটতে শুরু করেছে। আর তার চূড়ান্ত ফলাফল হলো, সে এখন

ইসলামাবাদ যেতে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষা করছে। সেই
গেস্টরুমেরসালার তার কথা খামিয়ে দিল।

: 'উনারা ওখানে একা থাকেন না। আম্মার ও ইউসরাও থাকেন
তাদের সাথে। ইদানীং উনারা পাকিস্তানের বাইরে আছেন।
দ্বিতীয় কথা হলো, পাপা এবং মাম্মি অনেক সামাজিক মানুষ।
উনাদের এতটা সেবার প্রয়োজন নেই, যতটা প্রয়োজন
আমার।' সালার প্রচণ্ড গুরুত্বারোপ করে বলল। ইমামা কিছুক্ষণ
চুপচাপ তার কোলের ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বইল। তারপর
বিড়বিড় করে বলল, 'ইসলামাবাদে আমি অনেক ভালো থাকব।'

: 'তার মানে আমার সাথে ভালো নেই?' সালার অস্থির হলো।

: 'ওখানে বেশি ভালো থাকব।' ইমামা এখন সরাসরি তার
অগ্রাধিকার জানাচ্ছে।

: 'পাপা ঠিকই বলেছেন, তোমাকে ইসলামাবাদ নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি আমার। বাবা-মায়ের কথা শোনা উচিত ছিল আমার।' সালার অজান্তেই আফসোস করল। 'দেখো, আমি যদি তোমাকে ইসলামাবাদ পাঠিয়ে দেই, তাহলে কতদিন ওখানে থাকতে পারবে? আগামী বছর আমরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাব।' সালার তাকে ভালোবেসে আরেকবার বোঝানোর চেষ্টা করল।

: তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তুমি তো পাকিস্তানে আসা-যাওয়া করবেই।

সালারের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলো। জীবনে কেউ কখনো তার প্রতি এতটা অনাগ্রহ

দেখায়নি।

: 'আমি আমেরিকায় থাকব, আর আমার স্ত্রী এখানে থাকবে, এতটা অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারব না আমি।' সালার এবার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল। ইমামা কিছুক্ষণ চুপ রইল। খানিক পর সালার তার কাঁধে পরম ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় হাত রাখল।

: সালার, তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করে, তাকে সাথে নিয়ে যাও।

এবার যেন সালারের চেতন উবে গেল। যদি এটি দুষ্টুমি হয়ে থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত বাজে। আর যদি সত্যি সত্যি পরামর্শ হয়ে থাকে, তাহলে তা অসম্ভব পাষণ্ড হৃদয়ের পরামর্শ। সালার কতক্ষণ অবিশ্বাস্যভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বিয়ের তৃতীয় সপ্তাহেই তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে করে সে তার বাবা-মায়ের কাছাকাছি থাকতে পারে।

: 'শোনো, আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি।' ইমামা তার প্রতিক্রিয়া দেখে কিছুটা ভীত হয়ে তাকে আরও কিছু বলার চেষ্টা করল। সালার অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তার হাত ঝটকে সরিয়ে দিল। খবরদার! আবার কখনো তুমি আমার সামনে ইসলামাবাদের নাম মুখে আনলেও ভালো হবে না। আর তাম তোমার বেওকুফি পরামর্শ তোমার কাছে রাখো। এখন আমার মাথা খাওয়া বন্ধ করে ঘুমাও।' সালার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেল। ল্যাপটপ নিয়ে অসম্ভব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেল। ইমামার বুঝে এলো না, এখানে এত রাগ করার কী হলো! এই মুহূর্তে তার সত্যিই উপলব্ধি হচ্ছে না, নিজের বাবা-মায়ের ভালোবাসায় কেমন স্বার্থপর ও নির্বোধের মতো ভাবতে শুরু করেছে সে।

লাইট বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার ঘুম এলো না। বারবার তার সালারের কথা মনে পড়তে লাগল। কতক্ষণ শুয়ে থেকে আচমকা রুম থেকে বেরিয়ে এলো।

সালার লাউঞ্জের হিটার চালু করে পাশের সোফায় বসে কাজ করছিল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সে থমকাল।

: 'এখন আবার কী?' ইমামাকে দেখতেই সে প্রচণ্ড অভিমানে বলল।

: 'কিছু না। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি।' এভাবে কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করাতে ইমামা খানিক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। 'কফি বানিয়ে দেই তোমাকে?'

: 'আমার প্রয়োজন হলে, আমি নিজেই বানিয়ে নেব।' সালার একই ভঙ্গিতে বলল। ইমামা তার পাশে সোফায় এসে বসে পড়ল। কিছুই না বলে চুপচাপ সালারের বাহুতে হাত রেখে, তার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। এটি অনুতাপের বহিঃপ্রকাশ। সালার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। তাকে পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ল্যাপটপে নিজের কাজ করতে থাকল। কিন্তু এটি খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সে তার কাঁধে মাথা এলিয়ে, তার এত

কাছে বসে থাকবে, আর সে তাকে উপেক্ষা করবে, এমনটা হতে পারে না। এটা হতে পারত, সে যদি তার কেবল স্ত্রী হতো। কিন্তু এটি ইমামা। ল্যাপটপের কিবোর্ডে চলন্ত আঙুল থামতে শুরু করল। তারপর একটি গভীর নিশ্বাস ফেলে বিড়বিড়াল, 'এখন এভাবে বসে থাকলে আমি কাজ কীভাবে করব?'

: 'তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?' ইমামা অসন্তুষ্ট হলো।

: আমি কি তোমাকে চলে যেতে বলতে পারি? প্রচণ্ড বেওকুফি কথা বলেছ তুমি আমাকে।

: এমনিই বলেছিলাম। কে জানত, তুমি এমন দুর্ব্যবহার করবে আমার সঙ্গে?

সালার হতভম্ব হয়ে গেল।

: 'দুৰ্য্যবহার? কী দুৰ্য্যবহার করেছি আমি তোমার সঙ্গে? যা তুমি বলেছ, এর জন্য তোমার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।' সালার ভেবেছিল সে আফসোস প্রকাশ করবে। কিন্তু এখানে তো বিষয়টিই উলটো হচ্ছে! ইমামা প্রচণ্ড অভিমানে তার কাঁধ থেকেমাথা তুলে উপরে তাকাতে তাকাতে বলল, 'এখন আমি তোমার কাছে কী দুঃখ প্রকাশ করব?'

: 'সালার তার উখিত চিবুকের দিকে তাকাল। কী আত্মসম্মান! কী অহংকার! সালার যেন তাকে দিয়ে এ কাজ করাতেই পারবে না।

: 'দুঃখ প্রকাশ করব তোমার কাছে?' অভিমানী দৃষ্টি ও উখিত চিবুকে সে পুনরায় জিজ্ঞেস করেছে। সালার নেতিবাচকে মাথা দোলাতে দোলাতে তার চিবুকে চুমু খেল। তার এই আত্মসম্মান সালারকেই রাখতে হবে। সে তার মাথা নত দেখার প্রত্যাশী নয়।

: 'না, তোমাকে দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়ে আমি কী করব।' সে অত্যন্ত আলতো করে তার চিবুকে চুমু খেতে খেতে বলল। ইমামার ঠোঁটে আচমকাই মুচকি হাসি ফুটে উঠল। কী আত্ম অহংকার! যা তার চোখে চমকাচ্ছে। হ্যাঁ, ইমামা কীভাবে তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে! তার বাহু থেকে পৃথক হতে হতে ইমামা তাকে বলল, 'এখন তুমি আমাকে সরি বলো। কারণ, তুমি দুর্ব্যবহার করেছ।' সে এখন নিশ্চিন্তে আবদার করছে। সালার মুচকি হাসল। সে এখন অপরাধীর কাছ থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি চাচ্ছে।

: 'আই অ্যাম সরি।' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল।

: 'ঠিক আছে। এখন আবার কখনো এটা বলো না যে, আমি যেন ইসলামাবাদের কথা না ওঠাই।' ইমামা এখন মহান হৃদয়ের অধিকারীর মতো তার এক্সকিউজ গ্রহণ করতে করতে তাকে সতর্ক করল। সালারের ঠোঁটজুড়ে মুচকি হাসির রেখা ফুটে

উঠল। তাহলে সব সমস্যার মূলে ছিল ইসলামাবাদ! ইমামা হয়তো এই আশঙ্কা করছিল, সালার আর কখনো তাকে ওখানে নিয়ে যাবে না। আর এই আশঙ্কার ফলেই ঘুম রেখে এখন তার কাছে ছুটে এসেছে। এখানে এসেই কী দারুণ ভঙ্গি তার! কী প্রচণ্ড আত্মগর্ব! অথচ তার কিছুই নেই এখানে। যা কিছুই আছে, তা অন্য কারও (সালারের) অনুগ্রহ। এসব ভেবে সালার হেসে উঠল।

: 'কী হলো?' ইমামা বিক্ষিপ্ত হয়ে বলল।

: 'কিছু না।' সালার খানিক সামনে ঝুঁকে অত্যন্ত কোমল ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় তাকে ওভাবেই জড়িয়ে ধরে তার মাথা ও কপালে চুমু ঝুঁকে দিল, যেভাবে সে প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে দরজায় তাকে দেখেই করে। 'গুড নাইট!' সালার এখন তাকে খোদা হাফেজ বলল।

: 'গুড নাইট!' ইমামা তার শাল গায়ে জড়াতে জড়াতে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে যেতে যেতে সে পেছন ফিরে সালারের দিকে এক পলক তাকাল। সালার তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে বিদায়ি ভঙ্গিতে মুচকি হাসল। ইমামাও প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসল। ইমামা বেডরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। সালার দীর্ঘক্ষণ লাউঞ্জ থেকে তার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

এই নারীটি যেই পুরুষের জীবনেই আসত, সে সৌভাগ্যবান হতো। কিন্তু সে সৌভাগ্যবান নয়। তাছাড়া 'সৌভাগ্যে'র আর প্রয়োজনই-বা কি বাকি রয়ে গেছে তার।

২৮

: 'হাবিব সাহেবের স্ত্রী আমার বাড়িতে কয়েকবারই এসেছে। প্রতিবার আমনার জন্য কিছু না কিছু নিয়েই আসত। বলত, আমাদের বিয়ের কোনো উপটৌকন লাগবে না। কেবল আমনাকে দিলেই হবে। শুধু কী বলতই। বলো যে, অনুনয়-

বিনয় করত। ইমামার অফিসে একদিন তার ছেলেকেও নিয়ে গিয়েছিল। ছেলেও মায়ের সাথে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ছোট থেকেই আমার সামনে বড় হয়েছে।" সালার উঠানে চৌকিতে বসে মাথা নিচু করে, লাল ইটের ফ্লোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সায়েদা আম্মার আলোচনা শুনে যাচ্ছে। বিগত আধা ঘন্টা ধরে সে এভাবেই চুপচাপ বসে আছে। তার নীরবতা সায়েদা আম্মাকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করছে। দুর্ভাগা হুঁ-হ্যাঁ কিছুই বলছে না। বলতে চাইলে একেবারেই বলে দে যে, আপনি আপনার এমন গুণধর মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিয়ে আম্মাকে সম্মানিত করেছেন। কিংবা এটাই বলে দে যে, অনেক গুণবতী আপনার মেয়ে। তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে ধারাবাহিক ফুঁসছেন।

আজ রবিবার। সালার ইমামার সাথে ভোরে বাকি জিনিসপত্রগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে এসেছে। ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য জিনিস কিছু দাতব্য সংস্থায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। ইমামা এতে কোনো আপত্তি করেনি। কিন্তু সায়েদা আম্মাকে

তাদের দুজনের কেউই বলেনি যে, এই জিনিসগুলো তাদের বাসায় নয়; বরং অন্য কোথাও যাচ্ছে।

বিকেল হয়ে আসছে। তারা সবকিছু গুছিয়ে ওখানেই রোদে পাতা একটি চৌকিতে বসে পড়ল। ইমামা রান্নাঘরে ইফতারি তৈরি করছে। তারা আজ এখানেই ইফতারি করবে। রোদের কারণে সালার তার সোয়েটার খুলে চৌকির এক কোণে রেখে দিল। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের হালকা ঘাম মুছল। এটি ছিল ইমামার বিয়ের প্রস্তাবের চতুর্থ উপাখ্যান।

বাটিতে আটা গুলতে গুলতে ইমামা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঠোনে বসা সালারকে দেখল। বেচারার প্রতি ইমামার দয়া হলো। রান্নাঘর থেকেই সে সায়েদা আন্নার সমস্ত কথা শুনতে পাচ্ছে। আর সেই কথাগুলো কতটা আপত্তিকর, তাও সে অনুমান করতে পারছে। তিনবার ইমামা বিভিন্ন বাহানায় সায়েদা আন্মাকে ওখান থেকে সরানোর চেষ্টা করল-আলোচনার প্রসঙ্গ পালটাতে। কিন্তু সে রান্নাঘরে ফিরে আসতেই বাইরের উঠোনে

আবারও একই আলোচনা শুরু হতো। 'অনেক উঁচা লম্বা যুবক। তোমার চেয়ে আধা ফুট উচাই হবে।' হাবিব সাহেবের ছেলের দৈহিক বর্ণনা দিতে দিতে সায়েদা আন্মা মাত্রাতিরিক্ততার সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করছিলেন। সালার নিজেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। তার চেয়ে আধা ফুট উঁচু হওয়া মানে, প্রায় পৌনে সাত ফুট। পুরো লাহোর শহরে এমন ছেলে পাওয়া অসম্ভব নয়; তবে জটিল অবশ্যই।

: 'আন্মা, জিরা খুঁজে পাচ্ছি না।' ইমামা জানালায় ঊঁকি দিয়ে সায়েদা আন্মাকে ডাকল। এটি ছাড়া উনাকে ভেতরে আনার অন্য কোনো পথ নেই।

: 'আরে বেটা, ওখানেই তো, যেখানে সবসময় থাকে। জিরা আবার কোথায় যাবে!' সায়েদা আন্মা উঠতে উঠতে বললেন। ইমামা জিরার কৌটা তরকারির ঝুড়িতে ফেলে দিল। কিছুক্ষণ সে সায়েদা আন্মাকে জিরা খোঁজায় ব্যস্ত রাখতে চাচ্ছে।

তারপর আরও কিছু কাজ ধরিয়ে দেবে উনাকে। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পরিকল্পনা করছে।

: 'মৌলবি সাবের কাছ থেকে পানি পড়া এনে দেব তোমাকে। ওটাই সালারকে পান করিয়ো। এতে তার মন নরম হবে।' সায়েদা আন্মা রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে যা বললেন, তা শুধুই ইমামা নয়; উঠোনে বসে সালারও শুনতে পেল।

: 'কেন? কী হয়েছে?' ইমামা চমকে জিজ্ঞেস করল। সে এখন আলু কেটে কেটে পাত্রে রাখছে।

: 'কেমন পাষণ মন তার! একটা কথায় যদি সহমত পোষণ করত!' তিনি এখন হতাশা প্রকাশ করছেন।

: 'আন্মা, আপনি যদি এসব কথা বলেন, তাহলে সে কীভাবে সহমত প্রকাশ করবে? এসব কথা আর বলবেন না। তার খারাপ

লাগে হয়তো।" ইমামা চাপা স্বরে সায়েদা আম্মাকে নিষেধ করল।

: 'কেন বলব না! সেও জানুক আমাদের মেয়ে কোনো ফ্যালনা জিনিস নয়। লাখে এক। এই জিরা কোথায় গেল?' সায়েদা আম্মা কথা বলতে বলতে জিরার কৌটা হারানোর দুশ্চিন্তাও করছেন।

: 'আমি আপনাকে বললাম না! সে এখন আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে।' ইমামা আম্মাকে বোঝাল।

: 'তুমি অনেক ধৈর্যশীল, বেটা! আমি কি জানি না? আমার সামনেই তো কোনো কথা বলে না সে তোমার সাথে। আড়ালে আর কী করে!' সায়েদা আম্মা বশীভূত হলেন না। উঠোনে চৌকিতে বসে সালার জুতা খুলে ফেলল। মাথার নিচে সোয়েটার রেখে চৌকিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ভেতর থেকে সায়েদা আম্মা ও ইমামার কথার আওয়াজ এখনো আসছে। কিন্তু সালার এখন ওদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে।

লাল ইটের দেওয়ালে ছড়ানো সবুজ তৃণ-গুল্মের দিকে তাকিয়ে আছে। রোদ এখন পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে এখনো তাপ রয়েছে। সামনের কোনো বাড়ির ছাদ থেকে কয়েকটি কবুতর উড়ে উঠোনের উপর দিয়ে চলে গেল। সেগুলোর মধ্যে একটি কবুতর উঠোনের দেওয়ালে বসে পড়ল। দীর্ঘ একটি সময় পর রোদে শুয়ে সে এমন প্রশান্তি অনুভব করেছে। মূলত রোদে প্রশান্তি ছিল না, প্রশান্তি ছিল জীবনে। সে দু-চোখ বন্ধ করে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত পর চমকে চোখ খুলল। ইমামা নিঃশব্দে তার মাথার নিচে একটি বালিশ রাখার চেষ্টা করেছে। তাকে চোখ খুলতে দেখে ইমামা ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'এভাবে তোমার ঘাড় ব্যথা করবে।' সোয়েটার সরাতে সরাতে বলল। সালার চুপচাপ বালিশ মাথার নিচে নিয়ে নিল। ইমামা তার সোয়েটারটি ভাঁজ করে কাঁধে ফেলে ভেতরে চলে গেল। এমন আদর-ভালোবাসার কথা তো সে কখনো ভাবেনি। এমন আদর-ভালোবাসা সে চায়ওনি। জীবনসঙ্গী করার ইচ্ছা ছিল, তাকে পেয়েছে। আর কিছু পাক বা না পাক। সে পুনরায় চোখ বন্ধ করে ফেলল।

: 'ঘুমিয়ে পড়েছে কি?' সায়েদা আম্মা জানালা দিয়ে ইমামাকে দেখে তাকে ভেতরে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন।

জি, ঘুমাচ্ছে।

: 'আচ্ছা! আমি তো ভেবেছিলাম তাকে আরেকটু বোঝাব। এ ঘুমিয়ে কেন পড়ল?' সায়েদা আম্মার হতাশা ও উদ্বেগ; দুটো একসাথেই হলো।

: 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আম্মা! আপনি তো দেখলেনই কত কাজ করল সে। মজদুরদের সাথে মিলে জিনিসপত্র ওঠাল। গতকালও বাসায় অনেক কাজ করেছে। ইদানীং ব্যাংকেও অনেক ব্যস্ত থাকে।' ইমামা নিচু স্বরে সায়েদা আম্মাকে বলে চলল। রান্নাঘরের জানালা সে বন্ধ করে দিল। সালারের ঘুম কেমন কাঁচা সে জানে।

: হ্যাঁ, কিন্তু...।

ইমামা সায়েদা আম্মাকে আন্তে করে থামাল।

: আম্মা, আন্তে কথা বলুন, সে আবার উঠে যাবে।

: 'দেখ বেটা, তুই কতটা খেয়াল রাখিস ওর। আর সে।' সায়েদা আম্মা বিমর্ষ হলেন। ইমামার ভেতরটা এখন পুড়ে যাচ্ছে। সালারের ব্যাপারে সে সায়েদা আম্মার কাছে ওসব গিবত না করলে, সায়েদা আম্মা তাকে এখন বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু এখন সমস্যা হলো, তাকে লাখো বিশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, না জানি তার মনে সালারের প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে কী কী ভাবনা জেগে আছে! সেসব ভাবনা তাকে দুশ্চিন্তাও আশঙ্কায় ফেলে রাখে। তার এখন মনে হয়, ইমামা নিশ্চয়ই তার কাছে কিছু না কিছু লুকায়। সালারের সাথে সে এতটা ভালো নয়, যতটা ভালো সে এখানে দেখায়। এই সন্দেহের কারণ ইমামার

ব্যাপারে বলা গল্পগুলোতে সালারের এমন নির্লিপ্ত নীরবতা ও।
অথচ তার এমন সব কথার কারণেই সালার চুপ থাকে।

এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে ইমামা একটি জিনিস শিখেছে, আর তা হলো, নিজের স্বামীর ব্যাপারে অন্য কারও কাছে অভিযোগ করা উচিত নয়। তার মুখনিঃসৃত কিছু শব্দের কারণে এখন দুজনকেই চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

২৯

রক্ত কোথেকে ঝরছে, সালার অনুমান করতে পারল না। কিন্তু তার হাতে রক্ত লেগে আছে। সে যন্ত্রণাকাতর ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর ঝুঁকে পরনের সাদা জামার দিকে তাকাল। তার পোশাক নিদাগ, ঝলমলে। পুনরায় হাতের রক্ত ও দেহের যন্ত্রণার কারণে সে বুঝতে পারল না। তার মুঠো থেকে রক্তের কয়েক ফোঁটা তার সাদা পোশাকে এসে পড়ল।



: সালার, আসরের সময় চলে যাচ্ছে, নামাজ পড়ে নাও।

সে হড়বড় করে উঠল। ইমামা তার পাশে দাঁড়িয়ে, তার কাঁধ নাড়াতে নাড়াতে তাকে জাগাচ্ছে। সালার প্রথমে চারপাশে তাকাল। তারপর উভয় হাতের দিকে। তালু একদম পরিষ্কার। এলোমেলো নিশ্বাস নিচ্ছে সে। ইমামা তাকে নাড়া দিয়ে চলে গেল। সালার উঠে বসল। এটা স্বপ্ন ছিল। চৌকিতে বসে স্বপ্নটি মনে করার চেষ্টা করতে করতে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগল। বহুদিন পর সে এমন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখল। উঠোনের রোদ এখন ঢলে পড়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সে ঘড়ির দিকে তাকাল। আসরের জামাতের সময় চলে গিয়েছে। এখন তাকে ঘরে নামাজ পড়তে হবে। পায়ের মোজা খুলতে খুলতেও সে স্বপ্নটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে লাগল। ইমামা ততক্ষণে তার সোয়েটার ও অজুর জন্য স্যাণ্ডেল নিয়ে এসেছে।



: 'শরীর ঠিক আছে তোমার?' তাকে সোয়েটার দিতে দিতে ইমামা এই প্রথম তার মুখের দিকে তাকাল। তার চেহারা লাল মনে হলো। সে সালারের কপালে হাত রেখে তার তাপমাত্রা পরিমাপ করল।

: 'জ্বর নেই, রোদে শোয়ার কারণে হতে পারে।' সোয়েটার পরতে পরতে সালার তাকে বলল। ইমামাকে তার কাছে কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন মনে হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইতুল আনকাবুত বা মাকড়সার ঘর

০১

এ সপ্তাহেও সালার তার সঙ্গে ইমামাকে করাচি নিয়ে গেল। কিন্তু এবার রাতের ফ্লাইটে এলো। তারা আগের মতো এবারও ওই হোটেলেই অবস্থান করল। সালার অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিল। ইমামা তখন আনিতার সাথে ঘুরে বেড়িয়েছে। সালারের সাথে তার পুনরায় দেখা হয়েছে আগের বারের মতোই এয়ারপোর্টে। ইমামা কেমন নিশ্চুপ হয়ে আছে। সালার তা খেয়াল করল। কিন্তু তার সাথে এই ফ্লাইটে তার ব্যাংকের কিছু বিদেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ছিল। তাই ফ্লাইটে ইমামার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো না।



এয়ারপোর্টে নেমে গাড়িতে উঠে প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করল,
তুমি এমন চুপচাপ কেন?

: কার সাথে কথা বলব? তুমি তো ব্যস্ত ছিলে।

: 'আচ্ছা এখন কথা বলো।' সালার প্রসঙ্গ পালটাতে পালটাতে
বলল। 'কেমন ছিল আজকের দিন?'

: ভালো।

: আজ কোথায় গিয়েছিলে?

প্রত্যুত্তরে সে সালারকে আনিতার সঙ্গে যাওয়া জায়গা তিনটির
নাম বলল। কিন্তু তার কথায় সালার আগের মতো উচ্ছ্বাস
দেখতে পেল না।

: তোমার বেতন কত সালার?

সালার মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। ইমামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে
আছে। সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হেসে উঠল।

: এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার সবটা এই চার্জকোথাও
জমি কিনে নিই সালার।" তার কথা এড়িয়ে গিয়ে ইমামা বলল।

: 'ইমামা, আমার কাছে দুটো ফ্ল্যাট আছে। পাপা দিয়েছেন।
ইসলামাবাদে বাড়ি করা তো কঠিন কিছু না।' সালার তাকে
সান্ত্বনা দিল।

: 'কত বড় ফ্ল্যাট?' ইমামা একদম উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল।

: ২৫৩ স্কয়ার মিটার।

: 'এতটুকুই! ৫-৬ শ স্কয়ার মিটার হলে না হতো।' ইমামা হুট
করে হতাশ হয়ে পড়ল।

: 'হ্যাঁ, আড়াইশো স্কয়ার কম হয়ে যায়, ৫-৬ শ স্কয়ার হওয়া দরকার।' সালারও একাত্মতা প্রকাশ করল।

: তার চেয়ে কম হলেও হবে। একপাশে সবজি চাষ করব, পশুও থাকবে। একটি সামার হাউস বানাৰ। তাতে গ্রীষ্মে সময় কাটাৰ। একটি মাছের খামারও বানিয়ে নেব।

তার প্ল্যানিং শুনে সালারের মনে হলো, ইমামা হয়তো জায়গা অনুমান করতে ভুল

করেছে।

: 'এতটুকু জমিতে এই সবকিছু করা সম্ভব নয়।' সালার আঙু করে বলল। ইমামা

চমকে উঠল।

: কিন্তু আমি তো ২-১ একরের কথা বলছি।

তার কথা শুনে সালার মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল।

: ইসলামাবাদে তুমি একর একর জমি কোথায় পাবে?

খানিক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল।

: 'ইসলামাবাদের বাইরে তো পাওয়া যাবে, তাই না?' ইমামা এখনো গম্ভীর।

: তাহলে তুমি বাড়ি বানানোর কথা না বলে, বলো যে ফার্ম হাউস বানাব।

: না, ফার্ম হাউস না। একটি বিশাল উন্মুক্ত জায়গায় ছোট্ট একটি বাড়ি। যেমন কোনো উপত্যকা। পাহাড়ে ঘেরা নির্জন স্থান। এমন জায়গায় বাড়ি।

: 'পাপারও একটি ফার্ম হাউস আছে। কখনোসখনো আমরা যাই ওখানে। তোমাকেও নিয়ে যাব ওখানে।' সালার পুনরায় কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল।

: 'আমি ফার্ম হাউসের কথা বলছি না। আমি মূল বাড়ির কথা বলছি।' ইমামা এখনো তার কথায় অটল।

: 'আমি যে ধরনের চাকরি করি, তাতে এ রকম ফার্ম হাউস বা শহরের বাইরে আবাসন তৈরি করে সামলাতে পারব না। অন্তত যতদিন আমি চাকরিতে আছি আমি মজা করছি না।

: আমিও মজা করছি না। আমি তোমার স্বামী, কিন্তু নির্বোধ নই।

: আমরা যে অ্যাপাৰ্টমেন্টে থাকি, সেটা তোমাৰ ব্যক্তিগত?

এই প্ৰশ্নটি সালারকে অধিক হতবাক কৰে দিল।

: না, এটা ভাড়াই। কিন্তু তুমি এসব কেন জিজ্ঞেস কৰছ?

তাৰ জবাব শুনে ইমামাৰ চেহাৰায় হতাশা স্পষ্ট হয়ে উঠল।
এবাৰ সালার গম্ভীৰ হয়ে গেল।

: এমনি জিজ্ঞেস কৰলাম। ভেবেছিলাম তোমাৰ হবে ওটা।
আমি ভাবছি, তুমি আমাকে যে টাকা দিয়েছ, তা দিয়ে কোনো
ফ্ল্যাট কিনে নেবা।

: 'ইমামা! সমস্যা কী?' সালার এবাৰ তাৰ কাঁধে বাহু ছড়িয়ে
বলল।

: 'কোনো সমস্যা নেই। আমাদের নিজেদের একটা বাড়ি তো থাকার উচিত।' ইমামা এখনো গম্ভীর।

: 'তুমি আনিতার বাসা দেখে এসেছ?' বিস্ফোরণের মতো করে সালারের হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'হ্যাঁ।' ইমামা মাথা নাড়ল। সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার অনুমান সত্য হলো। 'তার বাসাটা অনেক সুন্দর না?' ইমামা এখন সালারকে জিজ্ঞেস করছে।

: 'হ্যাঁ, অনেক সুন্দর।' সালার হাত সরাতে সরাতে বলল।

: 'তুমি সুইমিংপুলের নৌকা দেখেছ?

: না, আমি অনেক মাস আগে তার বাসা দেখেছিলাম। তখন পুরোপুরি সাজানো হয়নি। তাছাড়া সুইমিংপুলে নৌকার কী কাজ?

: আসল নৌকা না। একদম ছোট। কাঠের তৈরি মনে হয়। কিন্তু সাথে অন্য কোনো উপাদানও আছে। তাতে একটি ছোট উইন্ডমিল আছে, এর বাতাস নৌকাটিকে পুরো সুইমিংপুলে নাড়াচাড়া করায়।

সালার মুচকি হেসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইমামা তাকে নৌকাটির প্রতিটি অংশ নিয়ে খুঁটে খুঁটে বর্ণনা দিচ্ছে।

: 'আনিতা আমার ওপর অনেক বড় জুলুম করেছে।' ইমামা চুপ হতেই সালার বলল।

: 'কেন?' সে চমকাল।

: আমার বিয়ের তৃতীয় সপ্তাহেই আমার স্ত্রীকে তার বাসা দেখিয়ে দিয়েছে।

'কোথাও জমি কিনে নিই সালার।' তার কথা এড়িয়ে গিয়ে ইমামা বলল।

: 'ইমামা, আমার কাছে দুটো ফ্ল্যাট আছে। পাপা দিয়েছেন। ইসলামাবাদে বাড়ি করা তো কঠিন কিছু না।' সালার তাকে সান্ত্বনা দিল।

: 'কত বড় ফ্ল্যাট?' ইমামা একদম উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল।

: ২৫৩ স্কয়ার মিটার।

: 'এতটুকুই! ৫-৬ শ স্কয়ার মিটার হলে না হতো।' ইমামা হুট করে হতাশ হয়ে

পড়ল।

: 'হ্যাঁ, আড়াইশ স্কয়ার কম হয়ে যায়, ৫-৬ শ স্কয়ার হওয়া দরকার।' সালারও একাত্মতা প্রকাশ করল।

: তার চেয়ে কম হলেও হবে। একপাশে সবজি চাষ করব, পশুও থাকবে। একটি সামার হাউস বানাব। তাতে গ্রীষ্মে সময় কাটাৰ। একটি মাছের খামারও বানিয়ে নেব।

তার প্ল্যানিং শুনে সালারের মনে হলো, ইমামা হয়তো জায়গা অনুমান করতে ভুল করেছে।

: 'এতটুকু জমিতে এই সবকিছু করা সম্ভব নয়।' সালার আঙু করে বলল। ইমামা চমকে উঠল।

: কিন্তু আমি তো ২-১ একরের কথা বলছি।

তার কথা শুনে সালার মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল।

: ইসলামাবাদে তুমি একর একর জমি কোথায় পাবে?

খানিক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল।

: 'ইসলামাবাদের বাইরে তো পাওয়া যাবে, তাই না?' ইমামা এখনো গম্ভীর।

: তাহলে তুমি বাড়ি বানানোর কথা না বলে, বলো যে ফার্ম হাউস বানাব।

: না, ফার্ম হাউস না। একটি বিশাল উন্মুক্ত জায়গায় ছোট একটি বাড়ি। যেমন কোনো উপত্যকা। পাহাড়ে ঘেরা নির্জন স্থান। এমন জায়গায় বাড়ি।

: 'পাপারও একটি ফার্ম হাউস আছে। কখনোসখনো আমরা যাই ওখানে। তোমাকেও নিয়ে যাব ওখানে।' সালার পুনরায় কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল।

: 'আমি ফার্ম হাউসের কথা বলছি না। আমি মূল বাড়ির কথা বলছি।' ইমামা এখনো তার কথায় অটল।

: 'আমি যে ধরনের চাকরি করি, তাতে এ রকম ফার্ম হাউস বা শহরের বাইরে আবাসন তৈরি করে সামলাতে পারব না। অন্তত যতদিন আমি চাকরিতে আছি তাছাড়া বড় শহরে একর জমি পাওয়া অনেক কঠিন। এগুলো তোমার ওইসব রোমান্টিক উপন্যাসে হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে নয়। যে জিনিস সম্ভব ও বাস্তবিক, সেটা হলো, কয়েক বছর পর কোনো একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট নিয়ে নেব। অথবা আড়াইশ স্কয়ার জায়গায় কোনো বাড়ি বানিয়ে নেব। এর চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই করতে পারি যে, ৫-১০ বছর পরে ইসলামাবাদ কিংবা লাহোর থেকে বাইরে কোনো ফার্ম হাউস বানিয়ে নেব। কিন্তু আমি জানি যে, ২০ অথবা ৩০ বছরে আমরা দশ-বিশবারের চেয়ে বেশি ওখানে যেতে পারব না। আর গেলেও কয়েক দিনের জন্য। সেটা আমাদের জন্য একটি সাদা

হাতি সাব্যস্ত হবে। যার পেছনে প্রতিমাসে আমাদের ব্যয় হবে।" সালার বুঝতে পারেনি যে, সে একটু বেশি খোলাখুলি কথা বলে ফেলেছে। ইমামার চেহারা খানিক ধূসর হয়ে উঠল। সালার তাকে বাস্তবিক কথাই বলছিল। ইমামা আর কোনো কথা বলল না। তার নীরবতা পুরো রাস্তায় সালারকে যন্ত্রণা দিতে লাগল।

: 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বাড়ির একটি স্কেচ বানিয়ে দিয়ো। সম্ভব হলে বানানো যেতে পারে।' ঘুমানোর আগে সে দায়সারাভাবে ইমামাকে বলল। মুহূর্তেই ইমামার চেহারা বদলে গেল। ছোট্ট একটি কথা তাকে এতটা খুশি করে তুলবে, সালার ভাবতেও পারেনি।



অ্যালার্মের শব্দে সালার জেগে উঠল। দেখল, ইমামা পাশে নেই।

: 'আজ তুমি আগে উঠে পড়েছ।' ইমামা রান্নাঘরে কাজ করছিল। সালার তখন সাহরির জন্য ওখানে গেল। প্রত্যুত্তরে সে মুচকি হাসল। সালারের অবাক লাগল।

আজ সে খুব তাড়াতাড়ি সাহরি করতে তাগাদা দিচ্ছে। কিন্তু কেন দিচ্ছে, এই রহস্য বেশিক্ষণ রহস্য হয়ে রইল না। খাওয়া শেষ হতেই ইমামা তার স্কেচ-বুক নিয়ে হাজির।

: এই যে বাড়ির জন্য আমার পছন্দের স্কেচ।

সাহরি খেতে খেতে সালার প্রচণ্ড চমকে উঠল। তার নির্দেশনামতো ইমামার কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি কর্ম সম্পাদন কামনা করেনি। ইমামা স্কেচ-বুক খুলে নিয়ে তার সামনে বসে রইল। টিস্যু দিয়ে হাত মুছতে মুছতে স্কেচ-বুকটি সালার হাতে নিল। এক পলক তার বানানো স্কেচটির দিকে তাকাল। একে বাড়ির চেয়ে বেশি প্রপাটি মনে হলো। এই স্কেচে রাতে বলা প্রতিটি জিনিস যুক্ত করেছে। পাহাড়ের ছায়ায়

উন্মুক্ত ময়দানে একটি ছোট বাড়ি। তার সামনে একটি হ্রদ। তার আশপাশে ছোট ছোট স্ট্রাকচার ও সামার হাউস। সে তার স্ট্রাকচারগুলোতে রংও করেছে। শুধু এতটুকুই নয়, এর পরও আছে। সালারকে সে স্কেচ-বুক বন্ধ করতে দেখে তাড়াহুড়ো করে পরবর্তী পৃষ্ঠাও খুলে দেখাল। ওটা নিশ্চিত বাড়ির পেছনের অংশ। সেখানে গরুর ঘর ও পাখিদের আবাসস্থল আঁকা হয়েছে। তাতে রাতের বেলা মাছের খামারের স্কেচও এঁকে রেখেছে।

: 'তুমি রাতে ঘুমাওনি?' স্কেচ-বুক বন্ধ করতে করতে সালার তাকে প্রশ্ন করল। 'কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম না করলে এই স্কেচ বানানো সম্ভব নয়।'

সালারের এমন পর্যবেক্ষণ ইমামাকে যেন হতাশ করল। স্কেচ দেখার পর সালারের মুখ থেকে সে অন্য কিছু শোনার প্রত্যাশা করেছিল।

: 'সুন্দর না?' সালারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বলল। কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে সালার অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

: অনেক সুন্দর!

দীর্ঘ নীরবতার পর সালারের মুখে এমন উত্তর শুনে ইমামা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

: তোমার ফ্ল্যাট দুটো বিক্রি করে, কোনো জায়গায় আমরা একটু বড় কোনো...।

: 'একটু বড়! তুমি অন্তত এক একর জমির কথা বলছ। জমিন তো কোনো না কোনোভাবে কেনাই যাবো। কিন্তু এই বাড়ি তৈরির সম্পূর্ণ খরচ, তদারকি করার জন্য আমাকে বিলিয়নিয়ার না হলেও অন্তত কোটিপতি হতে হবে।' সালার তার কথা

থামিয়ে দিয়ে বলল। ইমামা অভিমানে স্কেচ-বুক বন্ধ করে ফেলল।

: 'ঠিক আছে, আমি এখন থেকে বাড়ির কথা বলব না।' মুহূর্তেই সে উঠে স্কেচ-বুক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। সালার কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে ভ্যাবলার মতো বসে রইল। সে এখন অত্যন্ত হাস্যকর একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। সালার সাহরি শেষ করে বেডরুমে চলে এলো। এসে দেখল, ইমামা স্কেচ-বুক খুলে সোফায় বসে আছে। সালারকে দেখে তা বন্ধ করে সাইড টেবিলে রেখে দিল।

: 'এখনই যদি তোমার বাড়ির প্রয়োজন হয়, তাহলে কিনে দেই তোমাকে।' সালার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে তার পাশে সোফায় বসতে বসতে বলল।

: 'আমার এমন বাড়ি চাই।' সে আবারও স্কেচ বুক ওঠাল।

: 'এক একর হোক বা না-হোক; কিন্তু এমন একটি বাড়ি বানিয়ে দেব তোমাকে। ওয়াদা। কিন্তু এখন বাড়ি নিয়ে তোমার এই হোম মেনিয়া বা পাগলামি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।' সে ইমামার কাঁধে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে গেল। ইমামা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই প্রশান্ত হয়ে গেল। আপাতত 'ওয়াদা' শব্দটিই তার জন্য যথেষ্ট!

০২

রমজানের অবশিষ্ট দিনগুলোও এভাবেই কাটল। ঈদের পরপরই সালারের ব্যাংক নতুন একটি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান শুরু করতে চাচ্ছে। তাই এই দিনগুলোতে সালার

এটা নিয়ে অনেক ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ইমামার ব্যস্ততার পরিধি বাসা থেকে শুরু হয়ে বাসাতেই এসে শেষ হয়। সালার তাকে দিনে দু-তিনবার অফিস থেকে কল করে।

কয়েক মিনিট কথা বলে। ইমামা ভেবেছিল, এটা তার সাময়িক ব্যস্ততা। কিন্তু সে ভাবতেও পারেনি, এটা তার সবসময়ের

ব্যস্ততা। বরং সে বিয়ের সময়টাতে সাময়িকভাবে ব্যস্ততা একটু কমিয়ে নিয়েছিল। মার্কেটে মার্কেটে ঈদের প্রস্তুতির ফলে ভিড় বেড়েই চলছে। সালার তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতি রাতে এক-আধা ঘণ্টার জন্য তাকে বাইরে নিয়ে যায়। ইমামা প্রতিরাতে এই একটি ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

তারা ঈদের দুদিন আগেই ইসলামাবাদ চলে এলো। কামরান আর মুইজও তাদের পরিবারসহ পাকিস্তানে এসেছে। তারা তাদের সাথে ফোনে কথা বলেছিল। কিন্তু সালারের স্ত্রী হিসেবে এটা তাদের প্রথম দেখা। তারা সবাই ইমামার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সাক্ষাৎ করেছে। সে কে, এটা সবাই আগে থেকেই জানে। তাই কেউ কোনো প্রশ্ন করল না।

ইমামা সিকান্দার উসমানের প্রশস্ত ও বিস্তৃত সিটিং এরিয়ায় বসে আছে। ওখানে বসা সবার গালগল্প শুনছে। সালারের তিন ভাইয়ের স্বশুরবাড়িই ইসলামাবাদে। এই মুহূর্তে তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ঈদ উপলক্ষ্যে স্বশুরবাড়ি থেকে আগত

উপটৌকন। এখানে বসে বসে ইমামার হীনম্মন্যতা হতে লাগল। তার ও সালারের কাছে কারও থেকে প্রাপ্ত উপটৌকনের আলোচনা করার কোনো প্রসঙ্গ নেই।

ইসলামাবাদ আসার আগে ডাক্তার সিবতে আলি, সায়েদা আম্মা এবং ফোরকান ছাড়াও উনার মেয়েরাও তাদের জন্য কিছু কাপড় পাঠিয়েছিল। কিন্তু নিজের বাবা-মায়ের বাড়ি থেকে তো কিছুই আসেনি। কিছু জিনিসের অভাব সারা জীবন তাদের থেকে যাওয়ারই ছিল।

: 'ঈদের জন্য তুমি কী বানিয়েছ?' কামরানের স্ত্রী যোহা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি?' ইমামা খতমত খেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবার দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হলো।

: সালার কাপড় এনে দিয়েছে। জামা-পায়জামাই।

: 'ইমামার জন্য তো ঈদের পোশাক আমিও বানিয়েছি। এটা তার প্রথম ঈদ। ঈদে তো তুমি আমার বানানো পোশাকটিই পরবো।' তাইয়েবা হস্তক্ষেপ করে বললেন। তুমামা মুচকি হাসতে চেষ্টা করল। এটা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারছে না। তার কাঁধের বোঝা যেন আরও কিছুটা ভারী হয়ে গেল।

০৩

: 'সকালে তুমি আমার সাথে যাচ্ছ?' রাতের পোশাক পরে কিছুক্ষণ আগে সালার ওয়াশরুম থেকে বের হলো। আগের বারের মতো এবারও ইমামা জানালার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

: 'হ্যাঁ।' সে সালারের দিকে না তাকিয়েই বলল।

: 'শরীর ঠিক আছে তোমার?' বিছানায় বসতে বসতে সালার তাকে গভীরভাবে লক্ষ করল।

: 'হ্যাঁ' সে একই উদাসীন ভঙ্গিতে উত্তর করল। সালার কন্মল টেনে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পেছন ফিরে ইমামা তার দিকে তাকাল। সালার এখন তার ফোনে অ্যালার্ম সেট করছে। ইমামা কিছুই না ভেবে সালারের দিকে এগিয়ে এলো। সালার চমকে তার দিকে তাকাল। ইমামা চুপচাপ তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। সেলফোন টেবিলে রাখতে রাখতে সালার হতবাক হলো। ইমামাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখন তাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। কারণ, সালার আগের মতোই তার উদাসীনতাকে ইসলামাবাদ আসার কারণই মনে করল। সালার শুয়ে শুয়ে তার হাত মুঠোয় পুরে নিল। ইমামা তার হাতের ভেতর নিজের গুটিগুটি হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ তুলে সালারের দিকে তাকাল।

: আমাকে বিয়ে করা উচিত হয়নি তোমার।

সালার হতভম্ব হয়ে রইল।



: 'তাহলে কাকে বিয়ে করা উচিত ছিল?' সালার হতবাক হলো।

: যে-কাউকেই, আমি ছাড়া যে-কাউকে।

: 'সুন্দর পরামর্শ, কিন্তু দেহিতে পেলাম।' বিষয়টি সালার দুষ্টুমিতে উড়িয়ে দিতে চাইল। ইমামা হাত সরিয়ে নিল।

: এখন তুমি আফসোস করছ, তাই না?

সালার উঠে বসে পড়ল।

: 'আমি কেন আফসোস করব?' সে এখন গম্ভীর হয়ে গেলাসেটা তুমি জেনে থাকবো।' ইমামা উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সালার তাকে থামাল।

: না, আমি জানি না, বলো।

ইমামা সত্যিই হতভম্ব হলো।

: 'তোমারও হয়তো মনে চায় কেউ তোমাকে কাপড় দিক, উপহার দিক, এবং...'। ইমামা তার কথা শেষ করতে পারল না। প্রথমে তার গলা ভারী হলো, তারপর অশ্রু গড়াতে লাগল। সালার বোকার মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যে কথা তার কল্পনা-জল্পনাতেও ছিল না, ইমামা সেটা ভেবেই নিজেকে অপরাধী করে রেখেছে।

: 'হায় আল্লাহ! ইমামা তুমি এসব কী ভাবছ?' সালার সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রইল।

ইমামা তার চোখ কচলে মোছার চেষ্টা করল।

: 'ব্যস, আমাকে বিয়ে করা উচিত হয়নি তোমার।' ইমামা ভেঙে পড়ল। এখানে বিষয়টি শুধু উপহারের নয়; বরং লাউঞ্জে

উপস্থিত সবার মাঝে বসে যে অনুভূতি হচ্ছিল, বিষয়টি মূলত সেটি।

প্রত্যুত্তরে সালার কিছু না বলে, জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। সে শান্ত হলো না। তার হাত ছাড়িয়ে উঠে চলে গেল। আধা ঘণ্টা ওয়াশরুমে কান্না করে তার মন তো হালকা হলোই না, উলটো মাথাব্যথা শুরু হলো। কাপড় বদলে পুনরায় যখন রুমে এলো, দেখল, সালার তখনো লাইট জ্বালিয়ে ওভাবেই বসে আছে। ইমামার খানিক লজ্জাবোধ হলো। তাকে কিছু না বললেই ভালো ছিল। সে সালারের দিকে না তাকিয়েই বিছানার অপর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। সালারও লাইট অফ করে শুয়ে পড়ল, ইমামাকে আর ডাকল না। ইমামার জন্য যেন এটি প্রত্যাশিত নিয়ামত সাব্যস্ত হলো।

: 'ইমামা বিবি, আপনি অতটাও বুদ্ধিমতী নন, যতটা আমি ভেবেছিলাম। এমন অনেক বিষয় আছে, যেখানে আপনি নির্বুদ্ধিতার প্রদর্শন করে বসেন।' পরদিন গ্রামে যেতে যেতে



গাড়িতে বসে সালার তাকে বলল। ইমামা সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। আপাতত তার নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছা নেই।

: ছুট করে কী হয়ে যায় তোমার!? কেন আজীবনে জিনিস ভাবতে থাকো?

: 'এসব তুমি বুঝবে না।' ইমামা নীরস ভঙ্গিতে বলল। হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির জামাকাপড় ও উপটোকনের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। তোমার কি মনে হয় যে, শ্বশুরবাড়ি থেকে আগত কাপড় আমি ঈদে পরব? কিন্তু তোমার যদি দুঃখ হয় যে, তুমি উপহার পাওনি...।

দিল। : 'হ্যাঁ, আমার দুঃখ আছে। তাহলে?' ইমামা প্রচণ্ড অভিমানে তার কথা থামিয়ে

: 'তাহলে আমি তোমাকে কিনে দেই এসব। আগেও দিয়েছি।'
সালারের গলা খানিক নরম হলো।

: 'এসব তুমি বুঝবে না।' ইমামা একই ভঙ্গিতে বলল।

: হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু তুমিও একটি কথা বুঝে নাও, কিছু
জিনিস তুমি কখনোই বদলাতে পারবে না। তা তোমাকে মেনে
নিতেই হবে।

: তাতে কী হয়েছে?

: কিছু না হলে কান্না করছ কেন?

দিল। : 'সবাই হয়তো ভেবেছে, আমার পরিবার...।' কষ্টে সে
কথা মাঝপথেই ছেড়ে

: কেউ তোমাকে কিছু বলেছে?

: না।

: তাহলে?

: বলেনি, কিন্তু মনে মনে তো হয়তো ভেবেছে।

: 'তুমি তাদের মন পর্যন্ত যেয়ো না। আমি যা বলছি, শুধু তা-ই শোনো।' সালার তার কথা খামিয়ে দিয়ে বলল। 'এগুলো অনর্থক। স্বাভাবিক পারিবারিক বিয়ে হলেও আমি স্বশুরবাড়ি থেকে উপটোকন নেওয়াটা পছন্দ করতাম না। যে প্রথাগুলো আমি পছন্দ করি না, সেগুলোর জন্য আমার কোনো আক্ষেপ আর আফসোসও নেই। তোমার চেয়ে মূল্যবান কোনো উপহার কী হতে পারে আমার কাছে?' সালার জানে, ইমামা তার কথায় প্রভাবিত হচ্ছে না। তাই তাকে আর বেশি কিছু বলল না।



এই প্রশস্ত ও বিস্তৃত কম্পাউন্ড এবং তার ভেতরকার ছোট-বড় ভবনগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য ইমামাকে হতভম্ব করে দিল। সে সালারের মুখে স্কুল ও অন্যান্য প্রজেক্টের ব্যাপারে ভাসাভাসা আলোচনা শুনে ছিল। কিন্তু তার ধারণা ছিল না, এই কাজটি এতটা সুশৃঙ্খলভাবে হচ্ছে।

এখন ঈদের ছুটি চলছে। কম্পাউন্ডে আজ কেবল স্বাস্থ্যকেন্দ্রই খুলেছে। এই মুহূর্তেও এখানে রোগীদের একটি ভালো সংখ্যা উপস্থিত আছে। সালারের গাড়ি কম্পাউন্ডে ঢুকতে দেখে ক্ষণিকের জন্য সেখানে হইচই পড়ে গেল। কেয়ারটেকার, স্টাফরা একদম সতর্ক হয়ে গেল। ওখানে কর্মরত অধিকাংশই এখন ছুটিতে আছে। আর যারাই এখানে উপস্থিত আছে, তারা কম্পাউন্ডের শেষ প্রান্তে অ্যানেক্সির সামনে সালারের গাড়ি থামতেই, গাড়ি থেকে অবতরণরত সালারের সাথে চাদর পরিহিতা মেয়েটির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সালার প্রথমে অ্যানেক্সির দারোয়ানের সাথে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে, তার বিয়ের ব্যাপারে জানাল। সালার জানে, সে ভবনের অপর পাশে যাওয়ার আগেই তার বিয়ের সংবাদ চারপাশে ছড়িয়ে যাবে।

অ্যানেক্সির সামনের লন পার হতে হতে ইমামা অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে আশেপাশে নজর বোলাল। বহু সময় পর এমন খোলা পরিবেশে শ্বাস নিচ্ছে সে। কিছুক্ষণের জন্য তার সমস্ত হতাশা যেন উবে গেল।

: 'আমরা এখানে বসি।' অ্যানেক্সির বারান্দায় পৌঁছাতেই সে সালারকে বলল। সালার তখন দারোয়ানকে বলে দরজা খোলাচ্ছে।

: 'না, এখানে একটু পর তোমার ঠান্ডা লাগবে। ভেতরে লাউঞ্জে বসেও তুমি সবকিছু সুন্দরভাবে দেখতে পাবে। আপাতত আমি

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি চক্রর দিয়ে আসবা। তুমি এখানে বসতে চাইলে বসো।" সালার তাকে বলল।

: 'না, আমি তোমার সাথেই যাব।' ইমামা তৎক্ষণাৎ বলল।

: 'একসময় আমরাও এখানে থাকতে আসবা।' সালার অনিচ্ছাকৃতভাবেই বলে ফেলল।

: 'আচ্ছা!' ইমামার মনে হলো সালার হয়তো তাকে বাহানা করে সান্ত্বনা দিচ্ছে। দশ মিনিট পর সালার তাকে কেন্দ্রীয় ভবন ও তৎসংশ্লিষ্ট অপর অংশগুলো দেখাতে লাগল। সেইসাথে স্টাফকেও কিছু নির্দেশনা দিতে থাকল। 'সাহেব, তারা সবাই বলছিল মিষ্টি খাওয়াতে।' দারোয়ান সালারকে বাকিদের আবদার পৌঁছে দিল।

: 'ঠিক আছে, আজ তাহলে ইফতার এবং ইফতার পরবর্তী রাতের খাবারের ব্যবস্থা করে নেন। আমি ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি।' সালার মুচকি হেসে বলল।

এখানে দুই ঘণ্টা কাটানোর পর ইমামা যখন এখান থেকে তার সাথে বাসার উদ্দেশ্যে বের হলো, তখন এই প্রথম সালারের প্রতি তার মনে সম্মানের খানিক অনুভূতি জাগ্রত হলো।

: 'এসব কিছু কেন করছ?' ইমামা পথে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'নিজের ক্ষমার জন্য।' উত্তর ছিল অপ্রত্যাশিত। কিন্তু উত্তরদাতাও তো ছিল সালার সিকান্দার!

: 'আমার ধারণা ছিল না যে, তুমি এতটা দয়ালু!' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে ইমামা তাকে বলল।

: 'না, আমি দয়ালু নই। আর না কারও প্রতি করুণা করে এসব করছি। বরং দায়িত্ব মনে করে করছি। দয়ালু হলেই-বা সমস্যা কী ছিল।' শেষ বাক্যটি যেন সালার বিড়বিড়িয়ে বলল।

: কীভাবে শুরু করেছ এসব?

সালার তাকে ফোরকানের সাথে সাক্ষাৎ এবং এই প্রকল্পের সূচনা সম্পর্কে বলতে লাগল। ইমামা চুপচাপ শুনতে থাকল। সালার চুপ হতেই ইমামা যেন প্রশংসার ভঙ্গিতে বলল, 'অনেক জটিল কাজ ছিল।'

: না, জটিল তো ছিল আমার পূর্বের লাইফস্টাইল বদলানো।

ইমামা কিছু বলতে পারল না। তার ইঙ্গিত যদিকে ছিল, তা মনে করাও অনেক

কষ্টদায়ক।

: 'যে-কেউই এমন কাজ করতে পারবে না।' ইমামা মৃদুস্বরে বলল।

: 'যে-কেউই করতে পারবে। কিন্তু করতে চায় না। মানবসেবা কারও চ্যাটলিস্টে থাকে না। আমি সৌভাগ্যবান যে, আমার লিস্টে তা এসে পড়েছে।' সালার হাসল।

: 'তুমি অনেক বদলে গিয়েছ।' ইমামা তাকে গভীরভাবে লক্ষ করতে করতে বলল। সালার মুচকি হাসল।

: 'জীবনই বদলে গিয়েছে, আমি কীভাবে না বদলে থাকতে পারি! না বদলালে তো স্বপ্নের বাড়ির পক্ষ থেকে ঈদের উপটৌকনের অপেক্ষায় বসে থাকতাম।

তার বিদ্রূপে ইমামা এবার মন খারাপ করল না। আমি বিশ্বাস করি, আমি একজন সাধারণ মানুষ।' ইমামা স্বীকারোক্তি দিল।

: 'সাধারণ নও। জীবনকে কাছ থেকে দেখোনি এখনো।' সালার গম্ভীরভাবে দ্বিমত প্রকাশ করল।

: 'এটা অন্তত আমাকে বলো না। জীবন আমাকে অনেক কিছু দেখিয়েছে, শিখিয়েছেও।' ইমামা খানিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তার কথা খণ্ডন করল।

: 'যেমন?' সালার প্রশ্ন করল।

: কী শেখায়নি জীবন! গুণে শেষ করতে পারব না। জীবন আমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে।

: না, শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। সালার অদ্ভুতভাবে মুচকি হাসল। সে সোজা কথা কখনোই বলে না। আবার সবসময়

বাঁকও বলে না। 'ভালো লাগছে কি?' রাস্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে
গাড়ি চালাতে চালাতে সালার তাকে প্রশ্ন করল।

: 'কী?' ইমামা তার দিকে তাকিয়েই প্রচণ্ড বিব্রত হলো।

: তুমি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছ, তাই বললাম।

ইমামা হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর
অনিচ্ছাকৃতভাবেই হেসে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য
সালারকে তার সত্যিই অসম্ভব ভালো লাগল।

০৬

এশার কিছুক্ষণ আগে ঈদের চাঁদের ঘোষণা হলো। এই ঘোষণা
শুনেই সিকান্দার উসমান তাদেরকে এক ঘন্টার ভেতর শপিং
শেষ করে বাসায় ফিরতে বললেন। তারা শপিং করেনি, বরং
একটি রেস্টুরেন্টে ডিনার করেছে। তারপর পার্কারে মেহেদি



লাগিয়ে, চুড়ি কিনে ফিरे এসেছে। সালার অন্তত আজকের রাতটিতে বেশ সতর্ক। সিকান্দার উসমানের নির্দেশনা উপেক্ষা করেছে না। কেননা, ইমামার বাড়িতে আজ একের পর এক গাড়ি এসেই চলছে। তাছাড়া তারাও সেই মার্কেটেই যায়, যেখানে সালারের পরিবার যায়।

সাড়ে দশটার দিকে তারা বাসায় পৌঁছে গেল। বাসায় তখন কেউ ছিল না। বিগত দুই ঘণ্টা যাবৎ সালারকে বিভিন্ন জন কল করে চলছে। সেও কল রিসিভ করে তাদের কথা শুনে চলছে। বাসায় পৌঁছা অবধি এই ধারাবাহিকতা চালু রইল। ইমামা অসন্তোষ হতে লাগল। "আসো কফি বানাই, তারপর মুভি দেখি।" সালার অবশেষে তার অসন্তোষ উপলব্ধি করল।

: 'আমি হাত ধুয়ে আসব?' ইমামা হাতের মেহেদির দিকে তাকিয়ে বলল।

: না, আমি বানাব কফি। তুমি শুধু আমার সাথে রান্নাঘরে আসো।

: বানাতে পারবে তো?

: 'অনেক ভালো করে' সালার ফোন রাখতে রাখতে বলল।

মেহেদি লাগানো উভয় হাতে রান্নাঘরের টেবিলে কনুই লাগিয়ে সে তার কফি বানানোর দিকে তাকিয়ে রইল। সালার রান্নাঘর থেকে ব্ল্যাক কারেন্ট ও চকলেট ফাজ কেকের দুটি টুকরো উঠিয়ে কফি-ট্রেতে রাখতে লাগল। তা দেখে ইমামা বলল, 'আমি রান্নাঘরে এসে কোনো ফায়দা হলো?'

: 'হ্যাঁ, তুমি আমাকে সঙ্গ দিয়েছ।' সালার ট্রে উঠিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল।

: তুমি একা একাই বানাতে পারতো। শুধু শুধু আমাকে সাথে নিয়ে এলে।

: তোমাকে দেখে দেখে বানিয়েছি বলে বেশি স্বাদ হয়েছে।

ইমামা তার কথায় হাসল।

: এটা অত্যন্ত সস্তা কথা!

: ও তাই নাকি? তোমার রোমান্টিক উপন্যাসেও তো নায়কেরা এমনই কথা বলে। :

'তুমি আমার বই নিয়ে কথা বলো কেন?' ইমামা একদম রেগে গেল।

: 'ওকে, ওকে, সরি।' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সালার ট্রে এক হাতে নিয়ে, অপর হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল।

: 'কী মুভি এনেছ?' বেডরুমে এসে সোফায় বসতে বসতে ইমামা জিজ্ঞেস করল। মার্কেট থেকে আসার সময় সালার

মুভিশপ থেকে কিছু সিডি কিনে এনেছে। সিডি প্লেয়ারে মুভি লাগাতে লাগাতে সালার ওই মুভিগুলোর নাম পুনরাবৃত্তি করল। তারপর রিমোট নিয়ে কম্বল উঠিয়ে নিজেও সোফায় এসে বসল। দুজনের পায়ে কম্বল ছড়িয়ে, টেবিলের প্রান্ত থেকে কফির মগ উঠিয়ে ইমামার দিকে বাড়িয়ে দিল।

: 'চুমুক দাও তুমি, ধরতে হবে না।' ইমামাকে সে মেহেদি মাখা হাতে মগ ধরতে বাঁধা দিল। স্ক্রিনে এখন সিনেমার কলাকুশলীদের নাম ভাসছে। ইমামা কফির ঢোক গিলল।

: 'কফিটা ভালো।' ইমামা মুচকি হেসে মুগ্ধতা প্রকাশ করল। 'ধন্যবাদ।' সালার অপর হাতে তার মগটি ওঠাল। তারা দুজন এখন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওখানে এখন চার্লিজ থেরনকে দেখা যাচ্ছে। ইমামা অভিনেত্রীর প্রতি সালারের নিমগ্নতা লক্ষ করল। তার কেমন যেন অস্থিরতা হতে লাগল। অথচ এই অভিনেত্রীকে ইমামা চেনে না।

: 'এটা কে?' ইমামা তার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল।

: 'তুমি জানো না?' সালার এখন কাঁটা চামচে করে কেকের টুকরো তার মুখে

তুলে দিচ্ছে।

: না।

: চার্লিজ থেরন। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম নারী।

মিষ্টি কেক মুহূর্তেই ইমামার কাছে তেতো লাগতে লাগল।
এদিকে সালার এখন স্ক্রিনের দিকে পরিপূর্ণ মগ্ন।

: 'খুব সুন্দর না?' কেক খেতে খেতে সালার চোখ তুলে ইমামার দিকে তাকাল।

: 'ঠিক আছে, কিন্তু...' ইমামা শান্তভাবে বলল।

: 'আমার কাছে তো সুন্দর লাগে।' ফ্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সালার বিড়বিড়াল। মুভি থেকে ইমামার আগ্রহ উঠে গেল।

: 'সুন্দর আছে, কিন্তু বাজে অভিনেত্রী।' কয়েক পর্ব দেখার পর ইমামা বলল।

: 'অস্কার পেয়েছে।' এখানো সালারের দৃষ্টি ফ্রিনের ওপর। এটা শুনে ইমামার কাছে চার্লিজকে এখন আরও বেশি বাজে লাগতে লাগল।

: 'তার নাক আমার পছন্দ হয়নি।' কয়েক মুহূর্ত পর ইমামা বলল।

: 'নাকের দিকে কে তাকায়?' সালার একইভাবে বিড়বিড় করে বলল। ইমামা চমকে তার দিকে তাকাল। দেখল, সালার গম্ভীর হয়ে আছে।

: তারপর?

: তার চুল আমার খুব ভালো লাগে।

ইমামা পুনরায় ফ্রিনের দিকে তাকাল। না চাইতেও সালারের হাসি পেল। হাসতে হাসতে সে ইমামাকে জড়িয়ে ধরল।

: তুমি একটুও বুদ্ধিমান নও।

: 'কেন? কী হয়েছে?' তার হাসির কারণ ইমামার বুঝে এলো না।

: কিছু না, মুভি দেখো।

ইমামা রিমোট হাতে নিয়ে সিডি প্লেয়ার বন্ধ করে দিল।'কী হলো?' সালার চমকাল।

: 'ফালতু মুভি। তুমি আমার সাথে কথা বলো।' ইমামা যেন ঘোষণা করে দিল।

: 'কথাই তো বলছি। মেহেদি নষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়?' সালার তার হাতের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল।

: 'না, শুকিয়ে গেছে, আমি এখনি হাত ধুয়ে আসছি।' সে রিমোট রেখে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে দেখল, মুভি পুনরায় চলছে। ইমামাকে আসতে দেখে সে মুভি বন্ধ করে দিল। ইমামা এসে তার পাশে বসে পড়ল। কফি পান করতে করতে সালার তার হাতের মেহেদি ধীরে ধীরে দেখতে লাগল।

: 'মেহেদি তোমার হাতে অনেক সুন্দর লাগে।' তার হাতের কবজিতে আঁকা কারুকার্যে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল। ইমামা অকারণ মুচকি হাসল। 'চুড়ি কোথায়?' সালারের হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'পরব?' সে উচ্ছ্বসিত হলো।

: হ্যাঁ।

সে চুড়ি পরে পুনরায় তার কাছে এলো। লাল চুড়িতে তার হাত সেজে উঠল। দু-হাত মেলে ধরে সালারকে সে তার চুড়ি দেখাল।

: 'পারফেক্ট!' সালার মৃদু হেসে বলল। সে এখন তার চুড়িতে আঙুল বোলাচ্ছে। 'মুজেন্জা মনে হয় এসব।' কয়েক মুহূর্ত পর সালার বলল। বাহুতে আবদ্ধ করে ইমামাকে সে তার সাথে জড়িয়ে নিল। ইমামা তার বুকে মাথা ছেড়ে দিল। এই

লোকটিকে সে ভালোবাসে না। কিন্তু প্রতিবার তার নৈকট্যে এমনই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভূত হয়। এর কারণ হয়তো তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক। নাকি অন্য কিছু!

: 'একটা কথা বলি, শুনবে?' সালার তার চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে কোমল স্বরে বলল।

: 'কী?' তার বুকে মাথা রাখা ইমামা, মাথা তুলে তার দিকে তাকাল।

: কথা দাও আগে।

: 'ওকে।' ইমামা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কথা দিল।

: মুভি দেখতে দাও আমাকে।

ইমামা প্রচণ্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তার গা ছেড়ে আলাগা হয়ে গেল।



: আমি এগুলো দেখার জন্য এনেছি, ইমামা!

: অন্যান্য মুভিও এনেছ। ওগুলোর মধ্য থেকে কোনোটা দেখো।: ওকে, ঠিক আছে।

বলল।

ইমামা অবাক হলো, এত তাড়াতাড়ি কীভাবে মেনে নিল সে! সিডি প্লেয়ারে মুভি পালটে সে পুনরায় সোফায় এসে বসে পড়ল।

ওঠাতে

: 'এখন খুশি তো?' ইমামাকে সে জিজ্ঞেস করল। ইমামা প্রশান্ত হয়ে পুনরায় তার সাথে মিশে বসল। তার বুকে মাথা রেখে সে সিনেমার কলাকুশলীদের নাম দেখতে থাকল। সালার তার

পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ইমামার ঘুম চলে এলো। তার চোখ লেগেই যাচ্ছিল, এমন সময় চার্লিজ খেরন তার চোখে পড়ল। কিছুই না বলে মাথা তুলে সে সালারের দিকে তাকাল।

: 'আই অ্যাম সরি। তিনটি মুভিই তার।' সালার লজ্জাতুর হেসে বলল। 'দেখতে দাও না প্লিজ!' সে যেন অনুনয় করল। কয়েক মুহূর্ত ফ্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে ইমামা বলল, 'তার প্রশংসা করতে পারবে না।'

ব্য নিশ কন থ

: 'ওয়াদা করছি।' সালার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল।

: 'খেরন সুন্দরী নয়।' ইমামা যেন তাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিল।

: 'একদম নয়।' সালারও সম্মতি জানাল।

: সে বাজে অভিনেত্রী।

: হ্যাঁ, অসম্ভব বাজে।

ইমামা নিশ্চিত হলো।

: এছাড়া তুমি তাকে আর কখনো ওই দৃষ্টিতে দেখবে না, যে
দৃষ্টিতে আগে

দেখতে।

সালার এবার হেসে উঠল।

: কোন দৃষ্টিতে দেখি আমি?

: তুমি শুধু দেখো না, ঘুরঘুর করে তাকিয়ে থাকো।

: 'কে এমন করবে না? সে এতটা...' সালার বলতে বলতে থেমে গেল।

: 'বলে ফেলো, এতটা সুন্দর সে।' ইমামা তার কথা পূর্ণ করে দিল।

: তোমার জন্য আমি তাকে বোন বানাতে পারব না।

: তাহলে কেবল অভিনেত্রীই মনে করো।

: 'অভিনেত্রী তো মনে করছি ইয়ার! বাদ দাও, আমি দেখছি না। অর্ধেক মুভি তো এভাবেই কেটে গেল।' সালার এবার খানিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রিমোট চেপে মুভি অফ করে দিল। ইমামা অসম্ভব প্রশান্ত হয়ে সোফা থেকে জিনিসপত্র গোটাতে

লাগল। কস্মলটা একটু নিয়ে আসবে তুমি?' ওয়াশরুমের দিকে
যেতে যেতে ইমামা

বলল।

: 'জি, নিয়ে আসব। আরও কোনো হুকুম থাকলে সেটাও বলুন।'
সালার কস্মল ওঠাতে ওঠাতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বিড়বিড় করল।

◇◇◇

সিকান্দার উসমান ঈদের উপহার হিসেবে তাকে একটি
ব্রেসলেট দিলেন। সালার ব্যতীত বাকি সবাই ইমামাকে কিছু না
কিছু দিয়েছে। ইমামার ধারণা, সালার এবার নিশ্চয়ই তাকে
কোনো অলংকার উপহার দেবে। অবচেতনেই যেন সে
অপেক্ষা করছিল, সালার তাকে কিছু দেবে। কিন্তু এবারও সে
তাকে কিছু টাকা দিল। ইমামা খানিক হতাশ হলো। কিন্তু
সালারের কাছে কোনো অভিযোগ করল না।

ঈদের রাতে শহরের উপকণ্ঠস্থ সিকান্দার উসমানের ফার্ম হাউসে একটি পারিবারিক নৈশভোজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। ওখানে সালারের স্ত্রী হিসেবে ইমামা সবার সাথে পরিচিত হচ্ছে। তাইয়েবার বানানো লাল পোশাকে তাকে একদম নববধূর মতো লাগছে। এসব দেখে এখন ইমামার উপলব্ধি হচ্ছে, ইসলামাবাদে আসা এবং সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। এখানে প্রাপ্ত এই সম্মান ও মর্যাদার অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল তার।

খোলা পরিবেশে গ্রিল পাটি চলাকালীন ইমামা তার প্লেট নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ফার্ম হাউসের বারান্দার কাঠের সিঁড়িতে এসে বসল। বাকি সদস্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে খোলা সবুজ মাঠে ডিনার করতে করতে বিভিন্ন কাজে মশগুল।

: 'তুমি এখানে এসে কেন বসে পড়লে?' ইমামার দিকে আসতে আসতে সালার

দূর থেকে বলল।

: 'এমনিই, শাল নিতে এসেছিলাম। তারপর এখানেই বসে পড়েছি।' বলতে বলতে ইমামা মৃদু হাসল। তার পাশ ঘেঁষে বসতে বসতে ইমামা তরল পানীয়ের গ্লাস দু-পায়ের মাঝখানে সিঁড়িতে রেখে দিল। ইমামা কাঠের স্তম্ভে হেলান দিয়ে বসে এক হাঁটুতে খাবার প্লেট রেখে, দূরের লনে স্টেজে উপবিষ্ট সংগীতশিল্পীর দিকে তাকিয়ে আছে। সালার একটি কাঁটা চামচে করে তার প্লেট থেকে এক টুকরো কাবাব মুখে পুরে নিল। সেও এখন শিল্পীর দিকে মনোযোগী হলো। শিল্পী ইতিমধ্যে সংগীত গাইতে শুরু করেছে।

: 'উপভোগ করছ?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যাঁ।' ইমামা মুচকি হেসে বলল। সে এখন গজল শুনছে-

তাক



کسی کی آنکھ پر نم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی

زباں پر قصہ غم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی

کिसی کی آنکھ پر نم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی۔

زبان پر قصہ غم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی۔

کس کی آنکھ پر نم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی۔

زبان پر قصہ غم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی۔

کس کی آنکھ پر نم ہے ، محبت ہو گئی ہو گی۔

گے تے تھو

সেটা খুলেই সে নির্বাক হয়ে গেল। ভেতরে ছিল কানের দুলা।
সে যে কানের দুলা প্রায় সময় পরে, প্রায় ওরকমই। চোখ তুলে
সে সালারের দিকে তাকাল।

: 'আমি জানি, এটা তোমার কাছে ততটা মূল্যবান হবে না,
যতটা মূল্যবান তোমার বাবার দেওয়া কানের দুলা। কিন্তু তুমি
এটি মাঝেমধ্যে পরলে, আমার ভালো লাগবে।' দুলাগুলো
নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে তার চোখে জল চলে এলো।
'তুমি পরতে না চাইলে, তবু ঠিক আছে। আমি রিপ্লেস করতে
দিচ্ছি না।' তার চোখে অশ্রু গড়াতে দেখে সালার হুট করে বলে
উঠল। কিছুই না বলে ইমামা তার ডান কানে ঝোলানো দুলাটি
খুলল।

: 'আমি কি পরিয়ে দিতে পারি?' সালার একটি কানের দুলা বের
করতে করতে বলল। ইমামা মাথা নাড়াল। সালার একে একে
তার উভয় কানে পরিয়ে দিল। ইমামা ভেজা চোখে হেসে
ফেলল। সালার অনেকক্ষণ মোহমগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে

রইল। 'সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। আমার চেয়ে বেশি কেউ তোমাকে ভালোবাসতে পারবে না। আমার চেয়ে বেশি কেউ তোমার খেয়াল রাখতে পারবে না। যত্ন নিতে পারবে না। আমার কাছে তুমি ছাড়া মূল্যবান কোনো জিনিস নেই।' তার চোখে চোখ রেখে সে বলে চলছে। 'আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে, তোমাকে আমার করে দিয়ে।' সোজা হতে হতে সে ইমামাকে বলল।

: 'রোমান্স করা হচ্ছে?' পেছন থেকে কামরানের গলা শুনে সে থমকাল।

: 'চেষ্টা করছি।' সালার পেছন না ফিরেই বলল।

: 'শুভকামনা!!' বলতে বলতে কামরান তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। ইমামার বন্ধ শ্বাস পুনরায় চলতে শুরু করল। সে লজ্জা পেয়ে গিয়েছে। সালার এবং তার পরিবার অন্তত এ বিষয়ে স্বাধীনমনস্ক।

কাঠের ওই সিঁড়িগুলোতে একে অপরের পাশে বসে
সংগীতশিল্পীর মধুর সুর শুনে চলছে। আর জীবনের এই মুহূর্ত
স্মৃতি হয়ে থাকছে।০৭

লাহোরে ফিরে ঈদ উপলক্ষ্যে দিনারের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা
শুরু হয়ে গেল। সালার ইমামাকে তার সামাজিক এবং
ব্যাবসায়িক পরিমণ্ডলে পরিচিত করাচ্ছিল। ঈদের চতুর্থ দিনে
এই প্রথম সে তাকে তার ব্যাংকের পক্ষ থেকে আয়োজিত
দিনার পাটিতে নিয়ে গেল। বিশাল একটি হোটেলে আয়োজিত
এই পাটিতে গিয়েই ইমামার ঘাম ঝরতে লাগল। উপস্থিত
লোকদের একটি বড় অংশ বিদেশি পুরুষ এবং নারীতে ভরপুর।
এটি একটি ফ্যামিলি দিনার পাটি। সালার অন্তত তাকে এটি
বলেই নিয়ে এসেছে। কিন্তু এতে কাদের ফ্যামিলি আসবে, তা
তাকে বলেনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, সে এখন মিস ওয়ার্ল্ড বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় এসেছে। এখানে উপস্থিত নারীরা বিশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে। কিন্তু এটি বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে যে, তাদের কে বয়সের কোন স্তরে রয়েছে। ঠোঁটে সিগারেট, হাতে ড্রিংকস নিয়ে তারা একে অপরের সাথে উষ্ণতা ও উচ্ছ্বাসে বিভিন্ন পুরুষের সাথে আলিঙ্গন করতে করতে কথাবার্তা বলছে। শিফনের পোশাকে ওড়না জড়িয়ে নিজেকে ইমামার বোকাসোকা, সেকেলে নারী মনে হচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যেন নিজের ভেতর উঁকি দিতে শুরু করেছে। এই প্রথম সে সালার এবং তার বেশভূষার পার্থক্যও লক্ষ করল।

সালার একটি ব্র্যান্ডেড কালো ডিনার স্যুটের সঙ্গে লাল ডোরাকাটা টাই পরেছে। তাকে দেখে একদম এই পরিবেশেরই একজন মনে হচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের ব্যাপারে এই ভয়ংকর সত্যও উদ্ঘাটন করল যে, তার বেশভূষা সালারের এই লুকের সাথে একদম ম্যাচ করছে না।

এখানে তারা যেন এক অদ্ভুত কাপল। ইমামার মনে হীনম্মন্যতার দ্বিতীয় ঢেউটি অত্যন্ত ভুল সময়ে, ভুল জায়গায় এসে পড়ল। সালার একে একে বিভিন্ন জনের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। সবার এমন আপ্যায়ন ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় ইমামা অবাক হচ্ছে। তারপর ছুট করে তার উপলব্ধি হলো, এর কারণও সালার। এই সম্মানজনক ভদ্রতা ও আচরণ সালার সিকান্দারের জন্যই। ইমামা হাশেমের জন্য নয়। এই পরিচয়ের কার্ড যার গলাতেই ঝুলবে, সেইই এই সম্মানজনক আচরণ লাভ করবে। হোক তার বেশভূষা তার চেয়েও জঘন্য। এসব ভাবতে ভাবতে ইমামার হীনম্মন্যতার পারদ ক্রমশ উপরে উঠছে। সালারের সাথে দাঁড়িয়ে অবশেষে তার বেশভূষার মতোই আরও কিছু নারীর দেখা পেয়ে গেল। ফলে এতে সে কিছুটা আত্মবিশ্বাস পেল।

: 'ড্রিংক প্লিজ!' ওয়েটার মদের ট্রে নিয়ে একদম তার পাশে এসে বলল। ইমামা চমকে ট্রে'র দিকে তাকাল। মদের বোতলে অ্যাপেল জুস দেখতে পেল। একটি গ্লাস হাতে নিল সে। তার

সামনে বিদেশি একজোড়া দম্পতির সাথে কথা বলতে বলতে সালার অবচেতনে, ইমামার দিকে না তাকিয়েই তার হাত থেকে সে গ্লাসটি নিয়ে নিল। ইমামা অবাক হলো। মুহূর্তের জন্য ইমামার মনে হলো, এটি হয়তো সালার নিজেই পান করতে চাচ্ছে। কিন্তু গ্লাসটি হাতে নিয়ে সালার ওভাবেই সেই দম্পতির সাথে কথা বলতে থাকল। ওয়েটার তার আশেপাশে সবাইকে সার্ভ করতে করতে পুনরায় সালারের কাছে এলো। সালার ইমামার থেকে নেওয়া গ্লাসটি অসম্ভব নির্বিকার ভঙ্গিতে, পুনরায় সেটি ট্রেতে রাখতে রাখতে ওয়েটারকে বলল, 'সফট ড্রিংক প্লিজ।'

ইমামার কিছুই বুঝে এলো না। ট্রেতে রাখা তার গ্লাসটিকে সে ক্রমশ দূরে যেতে দেখেছে। অতঃপর সে সালারের দিকে তাকাল। দেখল, সে এখনো কথোপকথনে মশগুল। কয়েক মুহূর্ত পর ওয়েটার অন্য একটি ট্রে নিয়ে উপস্থিত হলো। এবার ইমামা গ্লাস তোলার আগেই, সালার নিজেই একটি ক্লাস তুলে তার হাতে দিল। অপর গ্লাসটি নিজের জন্য হাতে নিল।

: 'ওহহ হ্যালো... সালার!' চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একজন মহিলা সালারের দিকে আসতে আসতে তার সাথে হাত মেলাল। তারপর অসম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সাথে তার কাঁধে হাত রাখল। সালার ওখানকার অন্যান্য পুরুষের মতো নারীদের সাথে আলিঙ্গন করছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু নারীর সাথে হাত মেলাচ্ছিল। ইমামার কাছে এটি হজম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে।

: 'আমাকে কে যেন তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বলছিল। এটি আমার জন্য একটি বড় সুসংবাদ। কবে বিয়ে করেছ তুমি?' মহিলাটি তাকে বলল। সালার অসম্ভব ভদ্রতার সহিত ইমামার পরিচয় করিয়ে দিল। মিসেস লায়েক তার সাথে কথা বলে তাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল। সালার মৃদু হেসে কোনো দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। ইমামা তার পেছনে কাউকে দেখে সালারকে মুচকি হাসতে দেখল।

: হাই রিমশা!

ইমামা অজান্তেই পেছন ফিরে তাকাল।

: 'ওহ হাই!' রিমশাও মুচকি হেসে তার কাছে এলো। সালার দুজনকে একে অপরের সাথে পরিচয় করাল। রিমশা অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে তার সাথে পরিচিত হলো।

: 'অনেক সৌভাগ্যবান আপনি। আপনার সাথে যদি তার কখনো দেখা না হতো, তাহলে এই বান্দার সাথে আমার বিয়ে হতে চলছিল।' রিমশা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে ইমামাকে বলল। 'ব্যস, সালারের সাথে দেখা হতে আমার খানিক দেরি হয়ে গেল।' সালারও প্রফুল্ল মনে হাসল। রিমশা জিজ্ঞেস করল, অলিমা অনুষ্ঠান কবে?

: ২০ তারিখে ইসলামাবাদে।

ইমামা এবার সালারকে রিমশার কোনো কথা এড়িয়ে যেতে দেখল না। বরং সে তার সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করছে। এই অনুষ্ঠানে সালারের কাছে আগতনারীদের মধ্যে একমাত্র রিমশার সাথেই একটু বেশি আন্তরিক সে। তাই তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারল না ইমামা।

০৮

: 'কিছু বলো।' ফেরার পথে সালার তার নীরবতা উপলব্ধি করে বলল।

: কী বলব।

: কিছু একটা।

ইমামা পুনরায় চুপ হয়ে গেল।

: 'অদ্ভুত লোক সব!' সালার কিছুক্ষণ পর ইমামাকে বিড়বিড় করে বলতে শুনল। সে চমকে তার দিকে মনোযোগী হলো।

: অদ্ভুত কেন?

: 'এমন পোশাকে নারীদের এমন ব্যবহার তোমার ভালো লাগে?' ইমামা তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল।

: তুমি তা-ই পরো, যেটা তোমার ভালো লাগে। তারাও তা-ই পরেছে, যেটা তাদের ভালো লাগে।

ইমামা অবিশ্বাস্য চোখে সালারকে দেখল। তার থেকে অন্তত এমন উত্তর আশা করেনি।

: তোমার একটুও খারাপ লাগেনি?

: আমার কাছে তারা সবাই শ্রদ্ধেয় মানুষ। কিছু আমার গ্রাহক। আর কিছু এমনিই পরিচিত।

: 'তোমার খারাপ লাগবে কেন? তুমি তো পুরুষ! নারীরা এমন পোশাক পরলে তো তোমার অনেক ভালোই লাগবে।' কথা বলতে বলতে ইমামা বুঝতেও পারেনি, তার কথা কতটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সালারের চেহারা লাল হয়ে গেল।

: 'এমন অনুষ্ঠানে আমি পুরুষ হিসেবে যাই না; মেহমান হিসেবে যাই। কে কী পরল, তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার কাছে প্রতিটি নারী তার পোশাকের বাইরে গিয়েও সম্মানযোগ্য। পোশাকের ওপর ভিত্তি করে আমি কারও চরিত্র বিচার করি না। যদি তোমার মনে হয় যে, তুমি ওড়না পরেছ, তাই তুমি সম্মানযোগ্য; আর যে নারী আপত্তিকর পোশাক পরেছে, সে সম্মানের যোগ্য নয়; তাহলে তুমি পুরোপুরি ভুল।' সে কিছুই বলতে পারল না। সালারের কথায় এই প্রথমসে তিক্ততা উপলব্ধি করল। 'কেউ যদি তোমার পর্দার কারণে

তোমার সম্পর্কে এই কথাগুলোই বলে, তাহলে তোমার কেমন লাগবে? এখন যেমন তুমি তাদের ব্যাপারে বলছ!

: 'তুমি তাদের পক্ষ কেন নিচ্ছ?' ইমামা বিরক্ত হলো।

: আমি তাদের পক্ষ নিচ্ছি না। আমি শুধু এটা বলছি যে, অন্যরা কী করে, আর কী না করে তা আমাদের বিষয় নয়।

: এসব তোমার ভালো লাগে?

তার প্রশ্নে সালার হাসল।

: আমার ব্যক্তিগতভাবে এসব ভালো লাগে কি না, এটা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো, এসব অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে হয়। কারণ, আমার চাকরির সুবাদে একটা সীমা অবধি সামাজিকতা বজায় রেখে চলতে হয়।

: একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

সালার অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

: 'আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তাহলে কি তুমি এমন কোনো মেয়েকেই বিয়ে করে নিতে, যেমন মেয়ে ওখানে ছিল?' ইমামা সরাসরি রিমশার নাম বলতে চাইল। কিন্তু বলল না।

: 'তুমি বলতে চাচ্ছ, পর্দাকারিনী এবং বেপর্দা নারী-দুজনের মধ্যে কাকে বিয়ে করতাম আমি?' সালার সরাসরি প্রশ্ন করে বসল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে মূলত এটি জানতে চাচ্ছিল।

: 'সত্যি করে তোমাকে একটি কথা বলব? আমি কোনো নারীকে তার পর্দা দেখেই বিয়ে করতাম না। কোনো নারীর পর্দা করা আর না-করা, আমার কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না। যতটা

গুরুত্বপূর্ণ বাকি কিছু গুণ।" ইমামা আজ একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে। 'একজন নারী, যদিও সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের ওপর আমল করে, মাথা এবং শরীর ঢেকে রাখে। কিন্তু যাকে আমি বিয়ে করতাম, তার মধ্যে এই গুণটি ব্যতীত আরও কিছু গুণ কামনা করতাম।'

: 'কেমন গুণ?' ইমামার মন অনুসন্ধানী হলো।

'ধৈর্য, সহনশীলতা ও আনুগত্য।' ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল। 'ডিগ্রি, ওভার-লুক, ম্যানারিজম এবং পর্দা এই সবকিছুই থাকে মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু এ দুটি গুণ বিরল হতে চলেছে এখন।' ইমামার কোনো সন্দেহ থেকে থাকলে তা এখন দূর হয়ে গিয়েছে: 'আমাকে কেন ভালো লেগেছে তোমার?' অবশেষে সে সালারকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল। 'শুধু পর্দায় তো তোমাকে মোহমুগ্ধ করে না, আনুগত্য এবং সহনশীলতা তো আমি কখনো দেখাইনি। তাহলে?'

: 'জানি না। এটি সেই প্রশ্ন, যার উত্তর কখনো আমি খুঁজে পাইনি। তোমাকে অপছন্দ করার একাধিক কারণ বলতে পারব। কিন্তু পছন্দ করার জন্য আমার কাছে কোনো কারণ নেই।' সালার গাড়ি চালাতে চালাতে বলে চলল।

: 'প্রথমে তুমি আমাকে কৌতূহলী করে তুলতে। তারপর অস্বস্তি দিতে লাগলে, তারপর আমাকে ভীত ও তাড়িত করতে লাগলে। তারপর আমি তোমাকে ঈর্ষা করতে লাগলাম, তারপর হিংসা, এবং সবশেষে মহব্বত।' সালার খানিক অসহায়ভাবে হাসল। 'এই সবগুলো পর্যায়ের মধ্যে কেবল একটি জিনিস একই ছিল, আর তা হলো, আমি তোমাকে কখনোই আমার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। তোমার কথা মনে পড়ত এবং মনে পড়ে। আর আমার মন কেবল তোমার দিকেই ছুটে চলে। অপদস্থ যা করার, তা করে আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার সক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটাই, আর কিছু নয়। তাই আমাকে এটা কখনো জিজ্ঞেসই করো না যে, তোমাকে কেন

ভালো লেগেছে। এটি ভালোবাসার চেয়ে বেশি অসহায়ত্বের
বহিঃপ্রকাশ।"

: যদি এসব কিছু না হতো, তাহলে কি আমার পরিবর্তে অন্য
কাউকে বিয়ে করে নিতে? যেমন রিমশাকে?

সালার চমকে তার দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল।

: তার মানে এই প্রশ্ন রিমশার জন্য করা হচ্ছে। তুমি একটা
বোকা!

: 'তাকে তোমার ভালো লাগে, তাই না?' ইমামা তার হাসি
উপেক্ষা করে গভীর হয়েই প্রশ্ন করল।

: 'হ্যাঁ, তবে একজন বন্ধু এবং সহকর্মী হিসেবে।' সালার বলল।
ইমামা নিশ্চুপ রইল। সালারের মনে হলো, ইমামা কোনো
গভীর চিন্তায় মগ্ন।

: 'কী হলো?' সালার তার হাতে হাত রাখতে রাখতে বলল।

: কিছু না, তোমার সাথে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো লাগছিল।
আর...।

: 'মাঝে মাঝে পাশাপাশি দাঁড়ালে অনেক মানুষকেই ভালো লাগে। এমনকি দুজন শত্রু পাশাপাশি দাঁড়ালেও। তাতে কী!' সালার তার কথা খণ্ডন করল।

: কিছু না। এমনিই মাথায় এলো।

: আমি তোমার সাথে অনেক ভালো আছি, ইমামা! এটি আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। এখন আমার জীবনে আর কোনো অপ্রাপ্তি নেই। তাই তুমি তোমারএসব আজগুবি অনুমান ও কল্পনা থেকে দূরে থাকো। ডিনারে যাও, খাবার খাও,

মানুষের সাথে কথাবার্তা বলো, ব্যস! এতটুকুই। ওই জগৎকে নিজের সাথে বাসায় নিয়ে এসো না।

রাতে উপন্যাস পড়তে পড়তে ইমামা সালারের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল। সালার ল্যাপটপে তার কাজ করছে। উপন্যাস থেকে চোখ সরিয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সালার তার কাজে মগ্ন হয়ে আছে।

: 'সালার!' কিছুক্ষণ পর সে সালারকে ডাকল।

'হ্যাঁ।' ওভাবেই কাজ করতে করতে সালার উত্তর করল।

: 'এমনিতে তুমি অনেক ভালো মানুষ।' তার প্রশংসা করতে সে অদ্ভুত লজ্জা অনুভব করছে।

: 'আচ্ছা।' সালার ওরকমই ব্যস্ত হয়ে আছে। ইমামার মনে হলো সালার হয়তো তার কথা খেয়াল করে শোনেনি।

: 'আমি তোমার প্রশংসা করেছি।' ইমামা পুনরুক্তি করল।

: 'অনেক ধন্যবাদ।' সালারের কথার স্বর আগের মতোই স্বাভাবিক।

: 'তোমার ভালো লাগেনি?' তার এমন স্বাভাবিক ভাব ইমামা মানতে পারছে না।

: 'কী?' সালাার চমকাল।

: আমি তোমার প্রশংসা করেছি।

: আর আমি তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছি।

: 'কিন্তু তোমার ভালো লাগেনি?' ইমামা খানিক অনুসন্ধিৎসু হলো।

: কী ভালো লাগবে আমার? তুমি মূলত আমার কথা শুনে আমাকে ভালো মানুষ বলছ, কর্ম দেখে বলোনি। কর্ম দেখে বললে আমার খুশি লাগত। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন কোনো কাজ তোমার সামনে উপস্থাপন করতে পারছি না।

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। সালার পুনরায় তার ল্যাপটপে মনোযোগী হয়ে পড়ল। ইমামা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুমি আমার হাত থেকে ওই গ্লাস কেন নিয়ে নিয়েছিলে?' হঠাৎ ইমামার ওই বিষয়টি মনে পড়ল।

: কারণ, আমি চাইনি যে, তুমি আমাকে গুলি করো।

ইমামা তার অপ্ৰাসঙ্গিক উত্তর শুনে অবাক হলো।

: এটা কেমন কথা?



: ওটা মদ ছিল। ইমামা নড়তে পারল না।

: 'সরি।' সালার ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল।

ইমামার চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেল। 'এসব পাটিতে হার্ড ড্রিংকসও থাকে। এগুলোকে পুনরায় স্ক্রিনের দিকে মনোযোগী হলো। সোশ্যাল ডিংকস মনে করা হয়।' সালার গুরুত্বসহকারে তাকে বোঝাতে বোঝাতে

ইমামার মন যেন সবকিছু থেকে উঠে গেল। জীবনে এই প্রথম সে মদ দেখেছে। এমনকি হাতেও নিয়েছে। আর যদি সালারের সাথে না দাঁড়াত, তাহলে হয়তো পান করেও ফেলত। তার স্বামী এসব পাটিতে গিয়ে অভ্যস্ত। তাহলে সে কতদিন, কতটুকু নিজেকে এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে! আসলেই কি বেঁচে থাকে, নাকি না? তার বিশ্বাসে আবারও চিড় ধরতে শুরু করল। এক সপ্তাহের ভেতরেই সে কারও চরিত্র বুঝে উঠতে

পারবে না। যেখানে সে বিয়ের প্রথম মাসেই তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত আগে সালারের জন্য হৃদয়ে জাগ্রত শ্রদ্ধা যেন এক সেকেন্ডেই কোথাও উধাও হয়ে গেল। যে আয়নায় সে সালারের প্রতিবিম্ব দেখছিল, সে আয়না যেন পুনরায় কুয়াশাবৃত, ঝাপসা হয়ে গেল। তার বুঝে আসছে আছে। ইমামা উঠে রুম থেকে বেরিয়ে এলো। না, সালারকে সে পরবর্তী কথাটি কী বলবে। সালার তার ই-মেইলের মাঝে মগ্ন হয়ে

অপর বেডরুমের ওয়াশরুমে এসে উদ্দেশ্যহীনভাবে তার বাম হাত ঘষে ঘষে ধুতে লাগল। এটি নিঃসন্দেহে বোকামিপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য আর কিছুই করতে পারছে না সে। অযথাই বাসার প্রতিটি রুমে হাঁটতে লাগল। ঘুম তার চোখ থেকে পরিপূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। 'আল্লাহ তাআলা প্রশান্তির আসমানকে কেন আশঙ্কার জমিন ছাড়া কায়ম করেন না?' সে ভাবল। এই ঠান্ডায় কতক্ষণ ধরে সে

ছাদের রেলিংয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তা তার চিন্তাতেও এলো না।

: 'এখানে কী করছ তুমি?' পেছন থেকে সালারের গলা তার চিন্তার ধারাবাহিকতা ভেঙে দিল। সালার দীর্ঘক্ষণ তাকে রুমে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে।

: 'আমি...।' ইমামা চমকে পেছন ফিরে তার দিকে তাকাল। 'আমি নিচে দেখছিলাম।'

: 'নিচে কী?' সালার তার কাছে এসে নিচে উঁকি দিল।

: 'নিচে...।' ইমামা নিজেও জানে না।

: 'নিচে কিছুই নেই। সালার তার মুখ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করল। তার কাছে ইমামাকে অনুভূতিশূন্য লাগল, কিংবা চিন্তিত। 'ভেতরে যাই?'

ইমামা কিছুই না বলে শাল ঠিক করতে করতে ভেতরে আসতে লাগল। 'তুমি শুয়ে পড়ো। আমি একটু পর আসব।' ইমামা ভেতরে আসতে আসতে বলল। 'আমিকিছুক্ষণ টিভি দেখব।' সালার থমকে গেল। ইমামা রিমোট হাতে নিয়ে টিভি অন করতে লাগল। বিয়ের পর এই প্রথম সে টিভিতে এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে।

: 'টিভিতে কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম দেখাচ্ছে কি?' সে প্রশ্ন করল।

: 'না, এমনিই দেখব।' ইমামা তার দিকে না তাকিয়েই বলল। সে চাচ্ছিল সালার এখান থেকে চলে যাক। কিন্তু সে উলটো তার পাশে সোফায় বসে পড়ল। তারপর ইমামার হাত থেকে রিমোট নিয়ে টিভি অফ করে দিল। ইমামা খানিক বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল।

: আমি মদ পান করি না, ইমামা! এই ফল আমি বহু আগেই
আস্বাদন করে ফেলেছি। এর স্বাদ ও প্রভাব-দুটোই আমার
জানা। আমার না দুঃখ ভোলানোর কোনো প্রয়োজন আছে,
আর না মদমত্ত হয়ে কোনো উন্মাদ আনন্দের দরকার। এটি
আমার কাছে আমার ছেড়ে দেওয়া গুনাহগুলোর মধ্যে একটি।
তুমি প্রতিদিন আল্লাহ তাআলার কাছে কেবল এই দোয়াই
করো, তিনি যেন আমাকে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে দূরে
সরিয়ে না দেন।

ইমামা তার কাছে প্রশ্নের প্রত্যাশা করছিল, উত্তরের নয়। কিন্তু
সে কোনো মনোবিদের মতো তার মন পড়ছিল।

: 'এখন তুমি টিভি দেখতে চাইলে দেখো। আর নয়তো এসে
শুয়ে পড়ো। গুড নাইট।' বলেই সে টিভি অন করে রিমোটটি
ইমামার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, বেডরুমে চলে এলো। ইমামা তখন
তার দিকে তাকিয়েই রইল।

সালারের সাথে সংঘটিত ওই কথোপকথন তার জন্য অনেক সহজতা তৈরি করে দিয়েছে। পুনরায় ডিনারে গিয়ে সে সেখানে উপস্থিত লোকদের চরিত্র বিচার করতে শুরু করেনি। এবার তাদেরকে তার কাছে এতটা খারাপও মনে হয়নি।

: 'তুমি কারও সাথে কোনো কথা বলো না কেন?' ছোট্ট একটি ডিনার অনুষ্ঠান থেকে ফিরে বাসায় পৌঁছে কাপড় বদলাতে বদলাতে সালার তাকে প্রশ্ন করল। ইমামা উপন্যাস পড়তে পড়তে চমকাল।

: কী কথা?

: 'যেকোনো কথা।' সালার বিছানায় বসতে বসতে বলল।

: কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তো আমি উত্তর করি।

: 'তুমিও কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করো।' অনুষ্ঠানে ইমামার নীরবতাকে সে লক্ষ

করেছিল।

: কী জিজ্ঞেস করব?

: 'ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করো। পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। বাচ্চাদের নিয়ে কথা বলতে পারো। হায় আল্লাহ! ইমামা এসব তো কোনো নারীকে বলে দিতে হয় না যে, তারা একে অপরের সাথে কী নিয়ে কথা বলবে।' কথা বলতে বলতে সালার বিব্রত হয়ে পড়ল।

: 'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।' ইমামা খানিক ভেবে বলল।

: এটাই আমার সামাজিক পরিমণ্ডল। এদের সাথে তোমার বারবার দেখা হবে। তাদের মধ্য থেকেই তোমাকে বন্ধু বানাতে হবে।

: 'কিন্তু বন্ধু বানিয়ে আমি কী করব?' ইমামা পুনরায় উপন্যাস খুলতে খুলতে বলল। সালার হাত বাড়িয়ে তার থেকে সেটি নিয়ে নিল।

: 'বই ভালো জিনিস। কিন্তু এর বাইরেও একটি জগৎ আছে। সেটাও সুন্দর।' সালার গম্ভীর হলো। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'মানুষের থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে পালাতে পালাতে এখন তাদের সাথে চলা অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে।' সে নিজেও বুঝতে পারল না, সে কী বলতে চাচ্ছে।

: 'এজন্যই আমি চাচ্ছি, তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা করো। এখন লুকানোর প্রয়োজন নেই। যেখানে আমি তোমাকে নিয়ে যাই, সেখানে তুমি আমার পরিবার। সেখানে কেউ তোমার ব্যাপারে অনুসন্ধান করবে না।' সালার তাকে বোঝাতে লাগল।

: 'আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব।' ইমামা অনুভূতিশূন্যভাবে সালারের থেকে উপন্যাসটি নিতে নিতে বলল।

: 'ভাবিদের ওখানেও আসা-যাওয়া করো।' সালার এখন তাকে নওশীনের ব্যাপারে বলছে।

: 'যাই তো।' ইমামা উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলল। সালার তাকে চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখতে থাকল।

: 'এখন এভাবে তাকিয়ে থেকো না আমার দিকে।' তার দৃষ্টি অনুভব করে ইমামা ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। 'আমি বললাম না, আমি চেষ্টা করব!'

সালার চুপচাপ কম্বল জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ইমামা পুনরায় বই পড়তে লাগল। কিন্তু খানিক পর সালারের দৃষ্টি পুনরায় তার চেহারায় নিবদ্ধ অনুভূত হলো।

: 'এখন আবার কী?' সে খানিক বিরক্ত হয়ে সালারের দিকে তাকাল। কিছু না।

ইমামা তার দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল। সালার অত্যন্ত গভীরভাবে কিছু ভাবছে।

১০

ঈদের দুই সপ্তাহ পর ইসলামাবাদের একটি হোটেলে তাদের অলিমা অনুষ্ঠান সংঘটিত হলো। সালার জেদ না করলে, সিকান্দার উসমান কখনোই এই অনুষ্ঠান ইসলামাবাদে করতেন না। অলিমা অনুষ্ঠান খুব সাদাসিধেভাবে হলো। প্রায়

দুই হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ইমামা প্রচণ্ড অস্বস্তি অনুভব করছিল। তা সত্ত্বেও তার ভালো লাগছিল। নিয়ম তান্ত্রিকভাবে সে সালারের পরিবারের অংশ হয়ে যেন কোনো নিরাপদ ছাদের নিচে স্থান পেল।

অলিমার জন্য তারা দুই সপ্তাহের জন্য বাহামাস এসেছে। পাকিস্তানের বাইরে সালারের সাথে এটি তার প্রথম ভ্রমণ। তাদের দুজনের কেউই জানে না, এই পনেরো দিনের মতো প্রশান্তিময় ও নিশ্চিত সময় জীবনে আর কখনো আসবে কি না। তাদের সম্বন্ধ নতুন; কিন্তু সম্পর্ক প্রাচীন। সালারের ফোন ইন্টারন্যাশনাল রোমিংয়ে রয়েছে। কিন্তু দিনের বেশিরভাগ সময় তা অফ করে রাখে। ব্যাংক ও তৎ-সম্পর্কিত কার্যক্রম তার জীবন থেকে পনেরো দিনের জন্য ছুড়ে ফেলেছে। সালার আগেও দুবার বাহামাস এসেছিল। ওখানকার যেসব স্থানে সামুদ্রিক মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয়, ওই সকল জায়গায় সালার তাকে নিয়ে গেল।

: আমরাও আমাদের বাড়িতে এমন একটি র‍্যাঞ্চ (ফার্ম হাউস) বানাব।

সালার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য তার কাছে এটি হাস্যরস মনে হলো। কিন্তু ইমামা একদম গম্ভীর।

: 'কোথায় বানাবে?' সালার যেন তাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা

করল।

: 'হুদো।' ইমামার চেহারায় আগের মতোই গম্ভীরতা।

: 'আর হুদ কোথেকে আসবে?' সালার হতচকিত হয়ে আছে।

: সেটা তুমি বানাবে।

সালার তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল।

: ওই হ্রদে পানি কোথেকে আসবে?হায়াত

ইমামা এক মুহূর্ত ভাবল।

: নদী থেকে।

সালার হেসে উঠল। কিন্তু ইমামা হাসল না।

: 'পানির নদী আবিষ্কার করা দুধের নদী আবিষ্কার করার চেয়ে বেশি কঠিন, সুইটহার্ট!' বলতে বলতে সে ইমামার কাঁধে বাহু ছড়িয়ে দিল। ইমামা তার হাত সরিয়ে নিল।

: 'তুমি বানিয়ে দিবে না?' এটা প্রশ্ন নয়; হুঁশিয়ারি ছিল।

: 'আমরা এখানে মাঝেমধ্যে আসব। তাছাড়া আগামী বছর আমি তোমাকে মরিশাস নিয়ে যাব। তার পরের বছর মালদ্বীপ।

ইমামা তার কথা খামিয়ে দিল।

: তুমি হুদ বানিয়ে দেবে না?

: 'ইমামা! হুদ আমি কীভাবে বানাব? হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, আমরা এমন জায়গায় বাড়ি বানাব, যেখানে আগে থেকেই প্রাকৃতিকভাবে এমন পানির উৎস রয়েছে।' সালার তাকে বাহানা বানিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল।

: হ্যাঁ, এটা দারুণ বলেছে!

এই বাহানা সাথে সাথে কার্যকরী হলো। সালার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

: 'সালার! তুমি অনেক ভালো।' ইমামা এখন অত্যন্ত ভালোবাসা ভরে তার হাত ধরে বলল।

: 'ইমামা! এটা ব্ল্যাকমেইল।' সালার হাত ধরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপত্তি করল। ইমামা সালারের মিথ্যা বাহানাকে এখন তার গলার কাঁটা বানিয়ে দিচ্ছে।

: 'হ্যাঁ, তাই তো।' ইমামা অত্যন্ত শান্তভাবে কাঁধ কুঁচকে হাসতে হাসতে বলল। এরপর ইমামা আর সারা দিন র‍্যাঞ্জেস কথা মুখে আনেনি। সালার এতে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করল। তার বিশ্বাস ছিল, ইমামা এটা ভুলে যাবে।

ফিরে আসার চার দিন পর সে গর্বিত ভঙ্গিতে সালারকে সেই বাড়ির নতুন ডিজাইন দেখাল। এই ডিজাইনে হৃদের পাশাপাশি র‍্যাঞ্জেসও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই হানিমুনের ফলে সালারকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। ইমামা পৃথিবীর প্রথম নারী, যে কিনা হানিমুনে গিয়ে হৃদ এবং র‍্যাঞ্জেস শপিং করে এনেছে। আর সালার

পৃথিবীর প্রথম স্বামী, যে কিনা এই শপিংয়ে কোনো আপত্তি করেনি। এবং সে আমাকে মিথ্যা সম্পৃক্ত পদবি নয় সে সালারের মি অনুরানটি দেখা একজন মানুষ অনেক স প্রভাবিত তাদের অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়ালে এখন আরও কিছু ছবি যুক্ত হয়েছে। সবগুলোর মধ্যে একটি জিনিসের মিল ছিল। আর তা হলো, সেগুলোর চোখ ও মুখে দৃশ্যমান আনন্দ ও খুশি। আর তাদের ঠোঁটে বিদ্যমান হাসি। তারা একে অপরের অন্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্তত এই ছবিগুলো সে কথাই প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

জীবন ধীরে ধীরে নিজের চেনা ছন্দে ফিরে আসছে। ফিরে এসে সালার পুনরায় ব্যস্ত হয়ে গেল। অফিস থেকে প্রায় দশটার দিকে বাসায় ফিরে। আগের মতো কফি খেতে বাইরে যাওয়ার ধারাবাহিকতা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সালারের নীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ইমামা তার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে। সে এখন নওশীনের সাথে মাঝে মাঝে বাইরে বেরোয়। তার জীবনের পরিমণ্ডল এখন ঘর থেকে বাহির অবধি বিস্তৃত

হতে শুরু করেছে। আর সালার এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিয়েই চলে।

ইমামা রিমোট হাতে বসে চ্যানেল পালটাচ্ছে। হঠাৎ একটি চ্যানেলে তার চোখ আটকে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস হলো না। এটি স্টক মার্কেট সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠান। আর তাতে অংশগ্রহণকৃত দুজন মানুষের মধ্যে সালারও রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য ইমামার বিশ্বাস হলো না, স্ক্রিনে সে সালারকেই দেখছে। কিন্তু খানিক পর নিচে সালারের নাম এবং তার পদবি ভেসে উঠল। 'তাহলে সে আমাকে মিথ্যা বলেছে?' ইমামা তার পদবি দেখে ভাবল। এটি পিআরের সাথে সম্পৃক্ত পদবি নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে টিভিতে তাকে দেখে ইমামা এতটাই উচ্ছ্বসিত যে, সে সালারের মিথ্যা এবং বাহানার দিকে খেয়াল করল না। জীবনে এই প্রথম সে অর্থনীতি সম্পর্কিত কোনো অনুষ্ঠান এতটা আগ্রহভরে দেখছে। আধা ঘণ্টা যাবৎ এই অনুষ্ঠানটি দেখতে দেখতে ইমামার উপলব্ধি হলো, সালার অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী একজন মানুষ। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর

একজন তীক্ষ্ণ মেধার ব্যক্তিত্ব; দক্ষ পেশাদারের মতো। সে এই প্রথম তার চেহারা-সুরত এবং ব্যক্তিত্বের ওপর গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। আর এই প্রথম ইমামা উপলব্ধি করছে, তার গলার স্বর অনেক সুন্দর। বিয়ের দু-মাস পরই নিজের স্বামীকে টিভিতে দেখে সে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

ইমামা পুনরায় যখন তাকে কল করল, সালার তখন লাঞ্চ করে কোনো একটি মিটিংয়ে। মিটিং প্রায় শেষের দিকে। সালার তাই সাথে সাথে কল রিসিভ করল। রিসিভকরে বাইরে এলো।

: 'সালার! তুমি টিভি অনুষ্ঠানে এসেছ?' ইমামা সুযোগ পেতেই প্রশ্ন করল। মুহূর্তের জন্য সালার বুঝতে পারল না।

কী?

: টিভি চ্যানেলে গিয়েছিলে তুমি। আর সেটা আমাকে বলোওনি।



দু-মাস আগে এটি রেকর্ড করা হয়েছিল। তারা এখন সেটি পুনরাবৃত্তি করেছে। সালারের হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'কী করছ তুমি?' সে প্রশঙ্গ পালটাল। কিন্তু ইমামা সেই অনুষ্ঠান নিয়ে কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, তা তার বাসায় ফিরে উপলব্ধি হলো।

: 'আমি সেটি রেকর্ড করে ফেলেছি।' বাসায় এসে সালার খাবার খাচ্ছে। এই মুহূর্তে ইমামা তাকে বলল।

: 'কোনটি?' সালার চমকাল। কারণ, সে এখন অন্য বিষয়ে কথা বলছে।

: তোমার সেই অনুষ্ঠানটি।

: 'এটা রেকর্ড করার মতো কী হলো!' সালার অবাক হলো।

: 'টিভিতে তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল।' ইমামা তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল। 'আর তুমি ইনভেস্টমেন্ট সেক্টরে রয়েছ; পিআর-এ নও।' ইমামা তাকে বলল। সালার মুচকি হাসল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে কিছুই বলল না।

: তোমার অনুষ্ঠান তুমি দেখেছ?

সালার কাঁটা চামচ নিচে নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

: 'সুইটহার্ট! এমন বহু অনুষ্ঠান রয়েছে, যেখানে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রতিদিন আমন্ত্রণ করা হয়। এতে এমন বিশেষ কী আছে যে, সেটি তার স্ত্রীর সাথে বসে দেখতে হবে! এর আগেও অনেক অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতেও কোথাও না কোথাও দেখতে পাবো। এটিও আমার চাকরির একটি অংশ।' সালার তার হাত চাপড়ে পুনরায় কাঁটা চামচ ওঠাতে লাগল। ইমামা কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না।

সালার যেন তার আবেগের ওপর ঠান্ডা পানি ছুড়ে দিয়েছে।
এতে সে লজ্জা বোধ করল।

: 'সালার! সুদ হারাম না?' ইমামা নিজেও বুঝতে পারল না,
সালারের কথার জবাবে এটা কেন বলল। এটা হয়তো তার
পালটা লজ্জাবোধের প্রতিক্রিয়া।

: 'হ্যাঁ।' সালার কাঁটা চামচে করে কাবাবের একটি টুকরো
ওঠাতে ওঠাতে, এক মুহূর্তের জন্য থমকাল।

: 'একদম ওসব জিনিসের মতোই হারাম, যেমন হারাম মিথ্যা,
রাগ, পরনিন্দা, মুনাফিকি, অপবাদ এবং অসততা।' সালার
শান্তভাবে বলে চলল।

: 'আমি এসবের কথা বলছি না।' ইমামা তার কথা রুখে দিল।
প্রত্যুত্তরে সেও ইমামার কথা রুখল।



: কেন? এসব দ্বারা কি সমাজ কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়? ইমামা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

: 'তুমি সুদের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছ?' অবশেষে সে বলল।

: 'না, আমি যুক্তি দিচ্ছি না। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে, আমরা খণ্ডাংশকে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারব না। ইসলামি সমাজকে সুদ ততটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, যতটা করছে অন্যান্য জিনিস।' ইমামা তার মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল। সে বলে চলল, 'আমি যদি পাকিস্তানি সমাজব্যবস্থার পাঁচটি মন্দ দিক সম্পর্কে বলি-দুর্নীতি, দরিদ্রতা, অন্যায়, অসততা এবং সুদ; তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, পঞ্চম অপশনটি কেউ কখনো বেছে নেবে না।' সালার চ্যালেঞ্জ করছে। চ্যালেঞ্জে সে জিততেও পারবে, কারণ, সে সঠিক বলছে। ইমামা নিজেও প্রথমোক্ত চারটির যেকোনো একটিকে সবার আগে নির্মূল করতে চাইবে। ইমামা মনে মনেই এর স্বীকারোক্তি দিল।

'আর সুদ কেবল ব্যাংকিংয়েই নেই। কোনো ইউটিলিটি বিল সময়মতো আদায় না করলে, তাতে অতিরিক্ত চার্জ আরোপ করা হয়। স্কুল-কলেজের বেতন পরিশোধ করতে দেরি হলে তাতে জরিমানা যুক্ত হয়। এগুলোও তো সুদের প্রকার।'

ইমামার কাছে তার ব্যাখ্যার কোনো জবাব নেই।

: 'তাহলে তুমি ব্যাংকিংয়ে এজন্যই আছ যে, সুদকে তুমি অন্যান্য পাপের মতো সাধারণ মনে করো?' ইমামা বিতর্ক শেষ করার চেষ্টা করল।

: না, আমি একে অত্যন্ত মন্দ ও অভিশাপের কাজ মনে করি। আমার মনে করাতে কী হবে? এই চিন্তা করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরা ব্যাংকে কাজ করা বন্ধ করে দিবে? আর অন্যান্য ধর্মের লোকদের এই মাঠে মুক্ত ছেড়ে দিবে? যাতে তারা এসে সবকিছু দখল করে নিতে পারে? আমাদের অর্থব্যবস্থাকে তারা

যাতে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়? যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা আমাদের গলা চেপে ধরে?

ইমামা বিক্ষিপ্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সুদ সম্পর্কিত এটি ছিল তাদের প্রথম বিতর্ক।

১১

রমজান ও রমজান-পরবর্তী সময়ে রান্নাবান্না করার জন্য ইমামা বিশেষ কোনো সুযোগ পায়নি। কিন্তু এখন সে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার জন্য বাসায় রান্না করতে লাগল। সালার সামুদ্রিক মাছ ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষ খাবারের প্রতি আগ্রহী নয়। সামুদ্রিক মাছ প্রচণ্ড অপছন্দ করা সত্ত্বেও সপ্তাহে দুয়েকবার, কৌটাজাত সামুদ্রিক মাছ ব্যতীত ও, বাজার থেকে তাজা মাছ এনে তার জন্য রান্না করে দেয়।

আজ রবিবার। ইমামা দুপুরের খাবার রান্নায় ব্যস্ত। সালার পাশের
রুমে বসে তার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিল। হঠাৎ তার মনে
হলো, ইমামা বোধহয় সিন্ধের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করছে।
রিমোট চেপে টিভি অফ করে, ফোনে বন্ধুকে খোঁদা হাফেজ
বলে, সোফা ছেড়ে উঠে সে রান্নাঘরে চলে এলো। সিন্ধের
সামনে দাঁড়িয়ে ইমামা শুধু কান্নাই করছে না; বরং হাউমাউ
করে কান্না করছে। সালারের মাথায় যেন বাজ পড়ল।

: কী হয়েছে?

না-বোধকে মাথা নাড়িয়ে সে ওভাবেই তার কাজ করতে
থাকল। সালার হাত বাড়িয়ে সিন্ধের টেপ বন্ধ করে দিল।

: 'কান্না কেন করছ তুমি?' সালার সত্যিই বুঝতে পারছে না।
'ইমামা!'

: 'আমার বাবার বাড়িতে কখনো আমাকে এসব ধুতে হয়নি, এসব এখন হচ্ছে।' পানির ট্যাপ পুনরায় চালু করতে করতে সে ভরা গলায় বলল। সে ঠিকই বলছে। তার বাড়িতেও সামুদ্রিক মাছ এতটাই আগ্রহভরে সবাই খেত। কিন্তু সে এগুলো প্রচণ্ড অপছন্দ করত। সালার অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না সে কী বলতে চাচ্ছে।

: আমি তোমাকে কখন বলেছি যে, আমাকে এসব বানিয়ে দাও?

: তুমি নিজে বলেছ, আজ তোমাকে সামুদ্রিক মাছ এনে দেব, আমাকে রান্না করে দিয়ো।

সালার খানিক অভিমানে পানি বন্ধ করে দিল।

: 'রেখে দাও, বেঁধো না।' কঠোরভাবে বলতে বলতে সালার সিঁক থেকে পাত্র উঠিয়ে শেলফে রেখে দিল।

: 'এজন্য কাঁদছি না। কাঁদছি, স্বামীকে যখন রান্না করে খাওয়াতে পারছি, তাহলে মা-বাপকেও রান্না করে খাওয়াতাম!' ইমামা কান্নাভরা গলায় বলল। 'বাহ, কী মনঃকষ্ট! কী আফসোস!' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল।

তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সামুদ্রিক মাছই রান্না করল। কিন্তু তার রক্তিম চোখ দেখে সালারের এতটা অপরাধবোধ হলো যে, সে ঠিকমতো খাবারও খেতে পারল না।

: ধীরে ধীরে আমি এই সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ছেড়ে দেব। আর কখনো তোমাকে এটা রান্না করতে হবে না।

: না. তোমার পছন্দ হলে কেন ছাড়বে? জানি না কেন, হঠাৎ এমনিই তাদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে আমার অপছন্দতা কেটে যাবে।

: আমি...।



ইমামা তার কথা খামিয়ে দিল।

: থাকতে দাও এটা, ব্যস! যদি কিছু ছাড়তেই হয়, তাহলে এনার্জি ড্রিংকস ইত্যাদি ইত্যাদি যা পান করো তুমি, সেগুলো ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে ফ্রেশ জুস বানিয়ে দেব।

সালার হাসতে লাগল। সে সত্যিই ওইসব ড্রিংকসে প্রচুর আসক্ত। এর মূল কারণ ছিল, তার জীবনযাপন পদ্ধতি এবং পেশা। এগুলো পান করে সে সারা রাত শান্তিতে কাজ করত। এখন সে ইমামার হাতে রাঁধা খাবারের অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। রাতে অনেক দেরি করে ফিরলেও ইমামা তাকে গরম গরম রুটি বানিয়ে দিতেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর সালার জীবনে এমন রুটি কখনো খায়নি। নাস্তায় সে এক টুকরো কেক এবং ডিম খেয়ে, এক কাপ চা-কফি খেয়েই দৌড়ে যাবার মানুষ। আর এখন জীবনে এই প্রথম নাস্তায় রুটিন হতে শুরু করেছে। ভাজি ডিম কিংবা সিদ্ধ ডিমের পরিবর্তে এখন

অমলেট হতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে পরোটা হয়। কৌটার পরিবর্তে এখন তাজা জুসের গ্লাস উপস্থিত পায়। দুপুরের জন্য বাসায় তৈরি স্যান্ডউইচ ও সালাদ।

প্রথমদিকে সে ইমামার পীড়াপীড়িতে খানিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাঞ্চার প্যাকেট বাসা থেকে নিয়ে আসত। কিন্তু ধীরে ধীরে তার অনাগ্রহ কমতে থাকে। এটি বাসার খাবার। অনেক মূল্যবান। কেননা, এটি তৈরি করতে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রী অনেকটা সময় ব্যয় করে। সে পানির এই গ্লাসটিতেও অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে, যে গ্লাসটিতে করে প্রতিদিন সে বাসায় ফিরতেই তাকে পানি এগিয়ে দেয়।

: 'আমি দুধ পান করি না।' প্রথমবার গরম দুধের গ্লাস তাকে দিতেই সালার অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল।

: 'কেন?' প্রত্যুত্তরে ইমামা এতটা হতভম্বতা প্রকাশ করল যে, সালার লজ্জিত

হয়ে পড়ল।

: আমার পছন্দ না।

: আমার তো অনেক পছন্দ। তোমার কেন নয়?

: এর স্বাদ আমার ভালো লাগে না।

ইমামা ভাবনায় পড়ে গেল।

: তাহলে আমি এতে ওভালটিন মিশিয়ে দেই।

সালার তার কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই গ্লাস উঠিয়ে পান করে ফেলল। সালার বিষ পান করতে পারবে, কিন্তু ওভালটিন নয়। আর এটাও সে বুঝে নিয়েছে যে, ইমামা দুধ পছন্দ করে। তাই তাকেও দুধ পান করতে হবে। যদিও দুধের উপকারিতা নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

ইমামার বাড়িতে পুরুষদের যেমন যত্ন করা হয়, ইমামা এখানে ঠিক তেমন যত্ন করছে। এটা 'অভ্যাসগত' 'বৈশিষ্ট্যগত' নয়। আর তার এই প্রত্যাশা ছিল না যে, সেই যত্ন করার অভ্যাস তারও মনের কোথাও গেঁথে যাচ্ছে। প্রতিটি নারীর মতো সেও এটা বোঝে, তার এই সমস্ত কাজ সালার কেবল স্ত্রীর দায়িত্ব হিসেবেই গ্রহণ করছে। কেননা, প্রতিটি পুরুষের মতোই সালারও তার প্রশংসা করতে পারছে না। প্রতিটি পুরুষের মতোই 'আই লাভ ইউ' বলা তার কাছে অনেক সহজ। কিন্তু 'আমার জন্য তুমি যা কিছু করছ, তা সত্যি মূল্যবান' এই বাক্যটি বলা কঠিন। আর প্রতিটি পুরুষের মতোই সালারও তার কৃতজ্ঞতাবোধ কেবল উপহার ও অর্থের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করছে।



ইমামার জীবন বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে? নাকি বহু বছর পর আবার শুরু হয়েছে? মার্কেটে মার্কেটে সালার অথবা নওশীনের সাথে ঘুরে বেড়ায়। জিনিসপত্র দেখে। অদ্ভুত অনুভূতির শিকার হতে থাকে সে। এই অনুভূতি-আমার দেখা প্রতিটি জিনিস এখন আমি কিনতে পারব, এই উপলব্ধি। এই অনুভূতি-আমার এখন এমন একটি জায়গা রয়েছে, যেখানে আমি আমার জিনিসগুলো রাখতে পারব। এমন জায়গা, ডাক্তার সিবতে আলির বাসা ছিল না হোস্টেল ছিল না, ছিল না সায়েদা আম্মার বাড়িও। কিন্তু এটি এখন তার নিজের ঘর। কৃতজ্ঞতা, প্রফুল্লতা, প্রশান্তি, তারপর অবিশ্বাস্যতা ও হতভম্বতা। নয় বছর পর যা কিছুই পেয়েছে সে, তা তার সক্ষমতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। কজনই-বা এমন পায়! নয় বছর নামহীন, বংশহীন থাকার পর এখন যখন একটি বংশের অংশ হয়েছে সে, তাহলে কীভাবে হতভম্ব না হয়ে থাকতে পারে সে!

অপদস্থতা ও সম্বলহীনতার সফর যে বংশে গিয়ে শেষ হয়েছে। এটি নিয়ামতের উচ্চশিখর। নিজের বাড়ি থেকে পালানোর পর,



এতগুলো বছরে সে কেবল একটি জিনিসই শিখেছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো। নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের পারদ সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে আসো। সে শিখেছে, অল্পে তুষ্ট থাকা। কিন্তু এগুলো খুব কঠিন ছিলতার জন্য। কারণ, ইতিপূর্বে সে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর জীবনযাপন করে খরচ করা আর তা থেকে বাঁচিয়ে জমা করার চেষ্টা করতে কবে অভ্যস্ত ছিল সে!?! এসেছে। বালির একটি কণাও তার গায়ে খোরের কাঁটার মতো বিঁধে। গুনে গুনে টাকা কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি তাকে অভ্যস্ত করে দিয়েছিল। আর এখন যখন এতগুলো বছর পর তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, এটা তো অসম্ভব যে, কথায় কথায় তার বিগত নয় বছরের স্মৃতি মনে পড়বে না!

প্রয়োজনে সালারের ড্রয়ার থেকে টাকা নিতে গেলেও সে থমকে যায়। এই টাকাগুলোর পেছনে তার কোনো অবদান নেই। আর না কোনো সঞ্চয়। সে সঠিক জানে না এতে কত টাকা রয়েছে। কারণ, সে কখনো এগুলো গুনতে পারেনি। সালার প্রতিদিন এই ড্রয়ারে কিছু না কিছু টাকা রেখে যায়। সে



যদি এই ড্রয়ারের সব টাকা শেষ করেও ফেলে, তবু পরদিন সেখানে পুনরায় টাকা দেখতে পায়। এই টাকা খরচ করার তার অধিকার রয়েছে। তা খরচ করতে সালাহ কখনো কোনো প্রশ্নও করেনি। সে হলো এই ঘরের সর্বময় কত্রী।

ইমামা কিছু কিনতে গেলে আগে গায়ের মূল্য দেখে, তারপর কিনত। নিজের পছন্দ ও ইচ্ছা অনুপাতে কিনত না। কিন্তু এখন মূল্য দেখে ক্রয় করা তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। সালাহ নিজেও জীবনে কখনো সাধারণ ও সস্তা জিনিস ব্যবহার করে অভ্যস্ত নয়। আর এতটাই দরাজদিল সে তার ব্যাপারেও। এটা অসম্ভব যে, কোনো জিনিস তার পছন্দ হবে আর সালাহ তাকে তা নিয়ে দেবে না! এটি কেবল বাজারে দেখতে পাওয়া জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ম্যাগাজিনে কিংবা টিভিতে দেখতে পাওয়া কোনো জিনিসও যদি তার ভালো লেগে যায়, সেটি সে সালাহের কাছে বলে, তাহলে সেই জিনিসটি কয়েক দিনের মধ্যেই তার বাসায় এসে উপস্থিত হয়। তার মূল্য কত,

এতে সালার কোনো ভ্রক্ষেপ করে না। রাতের তিনটায়ও সে যদি কিছু খেতে চায়, তবু সে তাকে তখনই বাইরে নিয়ে যায়।

'আমার মন চাচ্ছে...' এই বাক্যটি বলতে অভ্যস্ত হয়েছে সে। কারণ, আইসক্রিমের দুটি স্কুপ, চাটের একটি প্লেট, এক টুকরো পিৎজা, এক কাপ কফি কিংবা হট অ্যান্ড সাওরের ইচ্ছা হলে- তাকে বকাঝকা কিংবা ধৈর্যের উপদেশ না দিয়ে, তাকে সাথে নিয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিসের খোঁজে, কোনো অভিযোগ না করেই, ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি দৌড়ে বেড়ায়।

বিয়ের এই সংক্ষিপ্ত সময়েও লাহোরের এমন কোনো জায়গা বাকি নেই, যেখানকার প্রসিদ্ধ কোনো খাবারের কথা সে শুনেছে, আর সালার তাকে সেখানে নিয়ে যায়নি। গাওয়ালমন্ডিতে ফজরের পর হালুয়া-পুরির ঘন নাশতা থেকে শুরু করে, পিসির চব্বিশ ঘণ্টা খোলা ক্যাফেতে শেষ রাতে খাওয়ার লেমন টাট পর্যন্ত খাইয়েছে। যেটা খেতে খেতে দেরি হওয়ার ফলে, একবার দুবাইয়ের ফ্লাইটও সে মিস

করেছে। এমন ব্যক্তি কারও মোনাজাতের অংশ হবে না, এটা অসম্ভব। নামাজের পর দোয়ার সময় সালারের কথা তার কখনো মনে করতে হয়নি। এমন সারাক্ষণ তার কথা মনে পড়ে যায়। তার সাথে বিয়ের পর প্রথম নামাজের পরও তার কথা স্মরণে এসে গিয়েছিল আপনা-আপনিই। যখন সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, এমনকি ডাক্তার সিবতে আলির বাসায় তাকে যখন দেখেছিল, তার কথা শুনেছিল, যখন সে প্রথমবার নিজের স্বামীর জন্য পুণ্যের দোয়া করেছিল, তোলে আনার পর এই বাসায় তার প্রথম নামাজের পর, যখন সে তার হৃদয়ে সালারের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার দোয়া করেছিল, তখনো তার কথা মনে পড়েছিল, কিংবা মনে পড়ে।

দিনের এমন কোনো নামাজ নেই, যার পর সে সালারের জন্য নিয়ামত ও প্রতিদানের দোয়া করে না! তখনো করত, যখন সে সালারের প্রতি সন্দিহান ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকত। প্রকৃতপক্ষেই সে ছিল আল্লাহ তাআলার পরে তার সর্বশেষ আশ্রয়। হায়!



কেউ যদি এখন তার কাছে 'আশ্রয়' শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব
জিজ্ঞেস করত!

১৩

: 'তুমি কি নিশ্চিত, তুমি একা থাকতে পারবে?' সালার এখনো
যেন নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। দুই সপ্তাহের জন্য সে নিউইয়র্কে
ব্যাংকের একটি ওয়ার্কশপের কাজে যাচ্ছে।

: 'আমি থেকে যাব। তাছাড়া ফোরকান ভাই আর ভাবিও তো
পাশেই রয়েছে। কিছুই হবে না।' সে সালারকে সান্ত্বনা দিল।
সকাল এগারোটায় তার ফ্লাইট। মাত্র প্যাকিং শেষ করল।

: 'আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে তুমি?' ইমামার কথা শোনার
পর সে বলল।

: 'হ্যাঁ, দুই সপ্তাহেরই তো ব্যাপার!' ইমামা অসম্ভব নিশ্চিততার সহিত বলল।

: 'দুই সপ্তাহে পনেরো দিন।' সালার ব্রিফকেস বন্ধ করতে করতে বলল।

: কোনো ব্যাপার না! কেটে যাবে।

সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

: হ্যাঁ, তোমার তো কেটে যাবে, কিন্তু আমার না। আমি তো এখন থেকেই তোমাকে মিস করতে শুরু করেছি, প্রিয়তমা!

ইমামা হাসতে লাগল। আগেও তো গিয়েছ তুমি। দুই সপ্তাহ আগে দুবাই গিয়েছিলে। গত মাসে সিঙ্গাপুর।' ইমামা সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে স্মরণ করাল।

: 'দুদিনের জন্য দুবাই গিয়েছিলাম। আর চার দিনের জন্য সিঙ্গাপুর। এটা তো দুই সপ্তাহ!

হ্যাঁ, দুই সপ্তাহই তো! দুই মাস অথবা দুই বছর তো নয়।' সে বিস্ময়কর নিশ্চিত মনে বলল। সালার তার দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল।

: 'ঠিক আছে, এটাও ভালো। না আমার কথা মনে পড়বে, আর না আমাকে চোখের সামনে পড়বে। না আমার কোনো কাজ করতে হবে তোমাকে! সময় আর সময় ই থাকবে তোমার হাতে।' জানা নেই এসব বলে সালার তার মুখ থেকে কী শুনতে চাচ্ছে।

: 'হ্যাঁ, অনেক সময় থাকবে। দুয়েকটা পেইন্টিং সম্পূর্ণ করে ফেলব। বাসার আরও কিছু কাজ আছে, সেগুলোও শেষ করে ফেলব। অনেক কিছু আমি প্ল্যান করে রেখেছি।' ইমামা

উপন্যাস হাতে হাই থামানোর জন্য মুখে হাত দিল। সালার হাসতে লাগল।

: 'তোমার জন্য তো তাহলে এটা blessing in disguise অর্থাৎ প্রকারান্তরে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে গেল। আমি তো ভাবিইনি যে, আমার জন্য তোমার এত এত কাজ জমা পড়ে আছে।' তার কথায় যদি অভিমান থেকেও থাকে, তাহলে ইমামা সেটা লক্ষ করেনি। 'ঠিক আছে, এটাও ভালো হলো।' সালার বিড়বিড়াল। 'ভিসা লাগানো থাকলে, আমি তোমাকেও নিয়ে যেতাম।' হঠাৎ তার খেয়াল হলো।

: 'তুমি চিন্তা করো না। আমি এখানে একদম ঠিক থাকব।' তার আগেই ইমামা সাথে সাথে বলল। সালার জবাবের পরিবর্তে চুপচাপ তাকে দেখতে থাকল।

: 'কী দেখছ?' ইমামা তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

: তোমার নিশ্চিন্ততা।

: আমি সিনেমার নায়িকাদের মতো ডায়লগ বলতে পারি না।

: সিনেমার নায়িকারাই কেবল ডায়লগ বলে?

: 'না, নায়কও বলে।' ইমামা নিশ্চিন্ত মনে হাসল। সালার মুচকিও হাসল না। তা দেখে ইমামা পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেল।

: 'তাহলে যেয়ো না। যদি এতই মিস করে থাকো।' সে যেন তাকে চ্যালেঞ্জ করল।

: ভালোবেসে বললে যেতাম না। তুমি তো চ্যালেঞ্জ করে বলছ। কিন্তু আমি তোমার কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব না। তোমার কাছে হারতে আমার ভালো লাগে। তুমি আর আমি।' ইমামা নিশ্চিন্ত মনে বলেছিল।

সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে বলেছিল। : 'আমি একটি বাচ্চা পালতে পারব, চারটি নয়।' সালার যেন হাত উঁচিয়ে চূড়ান্ত

: 'ঠিক আছে, তুমি একটি লালনপালন করো। বাকি তিনটা আমি পালব।' ইমামা নিশ্চিত্তে বলে পুনরায় নিচে তাকিয়ে ছিল।

: ইমামা, আমি কিন্তু দুষ্টুমি করছি না।

: আমিও না।

: চারটি বাচ্চা আমরা পালতে পারব না।

: আমি তো পারব। আমার কাছে তো টাকা আছে, যেগুলো...।

: 'সেগুলো আমি তোমাকে এজন্য দেইনি যে, তা তুমি বাচ্চাদের বাহিনী গড়তে ব্যয় করবে।' সালার বিরক্ত হয়ে তার

কথা থামিয়ে দিয়েছিল। ইমামার খারাপ লাগে। কিছুই না বলে পুনরায় চুপচাপ নিচে দেখতে থাকে।

অভিমান রাগানোর চেষ্টা করে।

: 'সুইটহার্ট! আমাদের...।' সালার তার কাঁধের চারপাশে বাহু জড়িয়ে তার

: 'হাত সরাও!' ইমামা তার হাত ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে ফেলে।

: 'আমি কী করেছি?' সালার বিরক্ত হয়। 'তুমি কি চাও যে, আমি বাসা, অফিস, ডাক্তার আর মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে বুড়া হয়ে যাই?'

: 'তাহলে তুমি কী করতে করতে বুড়া হতে চাও?' পিঠাপিঠি প্রশ্ন আসে। সালার নিরুত্তর হয়ে যায়। ইমামা অভিমান-ভরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

: 'আমার বুঝে আসে না, রাতের বেলায় লোকেরা তাদের বাচ্চাদের কেন বাইরে ছেড়ে দেয়। অন্যকে দেখানোর জন্য বাইরে কেন ফেলে রাখে।' সালার তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, মগ উঠিয়ে ভেতরে চলে আসে। ইমামার তখন অনাকাঙ্ক্ষিত হাসি পায়। সেই কথাগুলো মনে পড়ে এখনো সে হাসছে। রেলিংয়ে মগের দাগের দিকে তাকিয়ে, পুনরায় নিচ থেকে বাচ্চাদের শোরগোল শুনতে পাচ্ছে সে। পেছন ফিরে দেওয়ালঘেঁষা সেই ব্যাকটির দিকে তাকাল সে, সালার যেখানে দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে কখনো সখনো গিটার বাজায়।

ইমামা টেরই পেল না, তার কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে ওভাবেই ভরা মগ নিয়ে পুনরায় রুমে চলে এলো।

১৫

ফজরের পর ধারাবাহিক সে কম্পিউটার নিয়ে বসে রইল। কল না হোক, অন্তত কোনো ইমেইল করুক। বিরতি দিয়ে দিয়ে সে

তাকে চার পাঁচটি মেইল করে, এখন হতাশ হয়ে পড়েছে।
উত্তর আসছে না, এর মানে সে মেইল চেক করছে না।

পরদিন বিষণ্ণতা আরও বেড়ে গেল। আজ সে না কোনো
পেইন্টিং বানাতে পারল, আর না কোনো বই পড়তে। খাবারও
রান্না করেনি। ফ্রিজে থাকা কয়েক দিন আগের খাবার খেয়ে
নিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আগামীকাল সায়েদা আম্মার বাড়িতে
যাওয়ার প্ল্যান করে নিল। তার মনে হচ্ছে, এই একাকিত্ব তাকে
দুর্বল করে ফেলছে। সে এটা ভুলে যাচ্ছে, নয় বছর সে
একাকিত্বে কাটিয়েছে; এর চেয়েও অধিক একাকিত্বে। এর
চেয়েও বেশি খারাপ অবস্থায়। অতঃপর সালারের থেকে সে
তিন লাইনের একটি ইমেইল পেল। সেই তিনটি লাইন অন্তত
তিনশবার পড়ল।

'Hi sweetheart! How are you? This workshop has
really nailed me down, how is your painting going?
Love you.' হাই সুইটহার্ট! কেমন আছ? এই ওয়ার্কশপটি



আমাকে সত্যিই অনেক ব্যস্ত করে ফেলেছে। তোমার ছবি
আঁকা কেমন চলছে? লাভ ইউ।

এই তিন বাক্যের ই-মেইলের প্রত্যুত্তরে সে একটি দীর্ঘ ইমেইল
করল। সেখানে সে তার দৈনন্দিন সমস্ত কার্যক্রম তুলে ধরল।
একের পর এক মিথ্যা লিখল। তাকে এটা কীভাবে বলতে পারে
যে, সে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। বললে, কারণ জিজ্ঞেস করবে।
তখন তাকে বিষণ্ণতার কী কারণ বলবে সে!

১৬

: 'বেটা! চেহারা এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? কোনো দুশ্চিন্তা?
তোমার সাথে ঝগড়া করে যায়নি তো সালার?' সায়েদা আন্মা
তার দিকে প্রথম দৃষ্টি ফেলেই প্রশ্ন করে করে তাকে অস্থির
করে ফেললেন।

: 'না, না, কিছুই হয়নি। ব্যস এমনিই বাসায় একা ছিলাম, তাই হয়তো।' সে মুখে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে উনাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি নিশ্চিত হলেন না।

ইমামা রুমে কাপড়চোপড়ের ব্যাগ রেখেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকাল। তাকে সত্যিই অনেক চিন্তিত দেখাচ্ছে। যে-কেউ তার চেহারা খুব সহজেই পড়তে পারবে। পরবর্তী দশ মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরচেহারা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগল। মুচকি হেসে, দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, চেহারার প্রতিক্রিয়া কোমল রেখে। কিন্তু অবশেষে বিরক্ত হয়ে সে হার মেনে নিল। 'জাহান্নামে যাক! চিন্তিত দেখাচ্ছে তো এখন আমি কী করব? আর কত হাসার চেষ্টা করব?' বলে ই সে বাইরে বেরিয়ে এলো। এখানে এসেও ঘুমানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিষণ্ণতা এখানেও আগের মতোই রয়ে গেছে।

: 'এমন চুপচাপ তো তুমি আগে কখনো থাকোনি, বেটা! এখন কী হলো তোমার?' সায়েদা আন্মা পুরোপুরি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি আজ ভোরে সালারের সাথে তার কথাও হয়েছে।

: 'সালারের সাথে তুমি ভালো আছ তো?' তিনি উদবিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ইমামা উনার মুখ দেখতে লাগল। বিষণ্ণতা প্রচণ্ড জেঁকে বসেছে। বিষয় ভালো থাকার নয়। বিষয় এটাও নয় যে, সে তার সাথে ভালো আছে কি নেই। বিষয়টি কেবল তার সঙ্গে থাকার। ভালো কিংবা বিষণ্ণ যেমনই হোক, কিন্তু তার সঙ্গে যেন হয়। সায়েদা আন্মাকে সে উত্তর করার পরিবর্তে প্রসঙ্গ পালটে ফেলল। এখানে দুদিন থেকে পুনরায় সে অস্থিরতা নিয়েই বাসায় ফিরে গেল।

: 'কিন্তু তুমি তো আমাকে বলেছিলে, আমার ফিরে আসা অবধি তুমি সায়েদা আন্মার ওখানেই থাকবো।' সে ফিরে আসাতে সালার অবাক হলো।

: 'আমার ইচ্ছা' সে অন্য কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু জানে না এটা কেন বলল।

: 'ওকে' উত্তর শুনে সালার অবাক হলো। 'নিউইয়র্কে ওয়ার্কশপ শেষ করে দুই সপ্তাহের জন্য আমাকে ক্যানাডা যেতে হবে।' সালার তাকে পরবর্তী সংবাদ শোনালা।

: মানে কী?

: যে সহকর্মীর মন্ট্রিয়াল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল, তার হঠাৎ ম্যাডিকেল ইমারজেন্সি হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ করেই আমাকে কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কারণ, আমার কাছে ভিসাও রয়েছে। আমি কাছেও আছি।

ইমামা যন্ত্রণায় বলতেও পারল না। আরও দুই সপ্তাহ বাইরে থাকার মানে হলো, ঈদের এক সপ্তাহ পর সে পাকিস্তান ফিরবে।

: 'হ্যালো!' তার দীর্ঘ নীরবতায় সালার লাইন চেক করল।

: 'তার মানে ঈদের পর আসবে তুমি?' নিজের গলা স্বাভাবিক রেখে সালারকে মনে করানোর চেষ্টা করল, ঈদ খুব কাছেই।

: 'হ্যাঁ।' এক শব্দের উত্তর এলো। নিঃসন্দেহে আগে থেকেই তারও খেয়াল আছে।

: 'আর আমি ঈদে কী করব?' তার বুঝে আসছে না, সালারের সাথে সে কী কথা বলবে। হতাশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে সে। এক সপ্তাহের অপেক্ষা, তিনসপ্তাহে বদলে গিয়েছে। আরও তিন সপ্তাহ তাকে এই বাসায় একা থাকতে হবে। সালারের প্রতি তার রাগ হতে লাগল।

: 'ঈদে তুমি ইসলামাবাদ চলে যেও।' সালার বলল।

: 'না, আমি এখানেই থাকব।' সে অনর্থক জেদ করল।

: 'ঠিক আছে, এখানেই থেকো।' সালার খুব সহজেই হার মেনে নিল।

: 'তোমাকে কেন পাঠাচ্ছে? পাঠাবে তো আগেই বলা উচিত ছিল না?' ইমামার এখন অফিসের প্রতি রাগ হচ্ছে।

: 'কখনো কখনো এমন ইমার্জেন্সি হয়ে যায়। এত অল্প সময়ের ভেতর তারা অন্য কাউকে পাকিস্তান থেকে পাঠাতে পারবে না। আর নয়তো আমাকে কী আর পাঠাত!' সালার ব্যাখ্যা করল।

: তবুও, তুমি তাদের বলে দিতে, আমি ব্যস্ত। পাকিস্তানে এখন তোমার অন্য কাজ আছে।

সালার হাসতে লাগল।

: কিন্তু আমার তো কোনো কাজ নেই। আমি কি মিথ্যা বলতাম?

ইমামার রাগ হলো।

: জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি?

: 'নেভার। অফিসের কাজে কখনো বলিনি। প্রয়োজনই পড়েনি।' সে শান্তভাবে বলল। ইমামা কিছুই বলতে পারল না। 'এক কাজ করো তুমি, ডাক্তার সাহেবের বাসায় চলে যাও। এতদিন একা থাকলে বিরক্ত হয়ে যাবে।'

: 'না, আমি বিরক্ত হব না। আমার এখানে অনেক বড় কাজ আছে।' সালারের কথায় সে খানিক তেতে উঠল। তার কথার স্বর সালারকে চিন্তিত করে তুলল। সে এভাবে কখনোই কথা

বলেনি। তাছাড়া একটু আগেই তো সে অনেক উচ্ছ্বাসী ও চাঞ্চল্যকর হয়ে কথা বলল। এখন হুট করে কী হয়ে গেল! ইমামাকে সে জিজ্ঞেস করতে চাইল। কিন্তু আপাতত প্রসঙ্গ পালটানো উত্তম মনে করল।

যে অনুভূতি এখন সে অনুভব করছে, এই অবস্থা বোঝানোর জন্য 'হতাশা' একটি অত্যন্ত তুচ্ছ শব্দ। সে অসম্ভব চিন্তিত ও ক্রোধিত হয়ে আছে। যাইহোক, চার সপ্তাহের কথা বলে তো সে বাইরে যায়নি। ইমামা আগামী ত্রিশ দিনের প্রতিটি ঘন্টা গুনতে লাগল। 'আমিও এখন থেকে আর ইমেইল করব না, আর না কল করব। নাই-বা প্রশ্ন করব, সে কবে আসবে আর কবে না। এলে আসুক, না এলে নাই। জাহান্নামে যাক। দোষ আমারই। বারবার তাকে আসার কথা না বললে সে এমন করত না।' রাতেবিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রচণ্ড মনঃকষ্ট নিয়ে এই সমস্ত বিষয়ের তালিকা তৈরি করতে লাগল। তালিকা করতে লাগল, এখন থেকে কোন কোন বিষয়ে সালারের অবাধ্যতা করবে সে।

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এখন তার তালিকা ২৫৫ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। হঠাৎ সে একদম বিছানা বরাবর ছাদে টিকটিকি দেখতে পেল। সে উঠে বসে পড়ল। একাকী বাসায়, তার ওপর টিকটিকি। আপাতত এই পরিস্থিতি তার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। টিকটিকি দেখতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে সোফায় চলে গেল। পুনরায় তার সালারের প্রতি রাগ হতে লাগল। দুই সপ্তাহ আগে ছোট্ট একটি টিকটিকি দেখা গিয়েছিল। সে তখন বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে উপন্যাস পড়ছিল। উপন্যাসটি তখন অসম্ভব উত্তেজনাময় পর্যায়ে। তখন সে আধশোয়া হয়ে পা গুটিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি ছাদে দৌড়াতে থাকা টিকটিকির ওপর গিয়ে পড়ে। সালার পানের বিছানায় গভীর ঘুমে মগ্ন। সাধারণত ইমামা তাকে কখনো জাগায় না। কিন্তু এটি তার কাছে সাধারণ কোনো অবস্থা নয়। সে উপুড় হয়ে শুয়ে সালারের কাঁধে নাড়া দিল।

: সালার, সালার!



সালার ঘুমের মধ্যে তার ডাক শুনে হতচকিত হয়ে গেল।

: কী হয়েছে?

: ওই উপরে দেখো। আমার বিছানার উপর ছাদে টিকটিকি।

ইমামা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকে বলল। সালার মুদে থাকা চোখ কচলে শুয়ে শুয়ে এক পলক ছাদের দিকে তাকাল। তারপর তাকাল ইমামার দিকে। তারপর আবারও উলটো হয়ে শুয়ে পড়ল।

: 'সালার!' ইমামা পুনরায় তার কাঁধে ঝাঁকি দিল। সে ভেবেছিল সালার হয়তো ঘুমের ঘোরে টিকটিকি দেখতে পায়নি।

: 'দেখেছি আমি ইমামা, ঘুমাতে দাও।' সে শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করল।

: 'দেখেছ তো, এর কিছু করো এখন।' তার উদাসীনতায় ইমামার রাগ হলো।

: 'নিজেই চলে যাবো। তুমি লাইট অফ করে ঘুমিয়ে পড়ো।' সে পুনরায় বিড়বিড় করল।

: 'আমি কীভাবে ঘুমাব? ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।' ইমামার অস্বস্তি বেড়ে গেল।

: লাইট অফ করে দাও। না সে তোমাকে দেখতে পাবে, আর না তুমি তাকে।

তার পরামর্শের চেয়ে তার অবজ্ঞার প্রতি ইমামার বেশি রাগ হলো। আমার জন্য তুমি একটা টিকটিকি মারতে পারবে না?

: রাতের আড়াইটা বাজে, আমি এখন টিকটিকি মারতে পারব না। এর কথা ভুলে

যাও।

: 'আমি ভুলতে পারব না। এটা যদি পড়ে তাহলে সোজা আমার পায়ের উপর এসে পড়বো।' ইমামা ছাদের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বলল।

: 'ইয়ার! আমি তোমার বিছানায় চলে আসি, তুমি আমার বিছানায় এসে পড়ো।' সালার পাশ বদল করে বলতে বলতে তার পাশে চলে এলো। ইমামা তার আত্মত্যাগের চেয়ে তার সাহসিকতায় বেশি মুগ্ধ হলো। রুমের লাইট বন্ধ করে উপন্যাস হাতে নিয়ে সালারের বিছানার পাশের বাতি জ্বালিয়ে সেখানে বসে পড়ল। সালার ততক্ষণে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ইমামার পাশের বাতি অফ করে দিল।

নিজেকে খানিক নিরাপদ পেয়ে নিশ্চিত মনে সে উপন্যাসের কয়েক লাইন পড়ে পুনরায় টিকটিকির দিকে তাকাল। সেটি যেন ওখানেই একদম গেঁথে বসে আছে। ইমামা সালারের দিকে তাকাল। সে টিকটিকি বরাবর পুরোপুরি নিশ্চিত শুয়ে আছে।

: 'সালার, তোমরা পুরুষেরা কত সাহসী!' ইমামা পুরুষদের প্রশংসা করা আবশ্যিক মনে করল।

: 'সেইসাথে বুদ্ধিমানও।' প্রত্যুত্তরে সে সালারকে বিড়বিড় করতে শুনল।

: 'বুদ্ধিমান কীভাবে?' ইমামা পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে চমকাল।

: 'টিকটিকি পড়ত তোমার বিছানায়, কিন্তু দৌড়ে আসত আমার বিছানায়। ওর মুখ আমার বিছানার দিকে।' হাই তুলতে তুলতে ওভাবেই চোখ বন্ধ করে সোজা হতে হতে সালার বলল।

ইমামা মাথা তুলে ছাদের দিকে তাকিয়েই, এক দৌড়ে বিছানার বাইরে চলে গেল। টিকটিকির মুখ সত্যি সালারের বিছানার দিকেই।

: 'তোমরা সব পুরুষই স্বার্থপর আর এক রকম।' ইমামা বেডরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে যত উঁচু গলায় বলা সম্ভব, বলে চলে গেল। সালার অবশেষে চোখ খুলল। সে তাকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু সে এখন বুঝতে পারল যে, বিরক্ত করার জন্য এটি হয়তো উপযুক্ত সময় ছিল না।

দশ মিনিট পর টিকটিকি মেরে ফেলার সংবাদ শুনিয়ে, তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে লাউগু থেকে পুনরায় বেডরুমে নিয়ে এলো। এরপর কয়েক দিন এই টিকটিকি ইমামার সামনে পড়েনি। আর আজ এটি আবারও চলে এসেছে। নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলেছিল। টিকটিকিটি সে মারেনি। এই অযৌক্তিক বিষয়টি এখন ইমামার কাছে রাগ করার আরও একটি কারণ হয়ে দাঁড়াল।

পরদিন সালারকে ফোনে সে এই টিকটিকির ফিরে আসার কথা বলল। "তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি ওটা মেরে ফেলেছ।" সুযোগ পেতেই সে সালারকে বলল।

: 'আমি সত্যিই ওটা মেরে ফেলেছিলাম। এটি হয়তো অন্য কোনো টিকটিকি হবে।' সালার উদাসীনভাবে বলল।

: 'না, এটা সেই টিকটিকি। ওটা তুমি মেরে ফেললে, তখন তুমি আমাকে দেখাতে।' ইমামা নিজের কথায় অটল। সালারের মাথা ঘুরতে লাগল। ইমামার কাছ থেকে সে এমন নিবুন্ধিতামূলক কথাই প্রত্যাশা করেছিল।

: 'তুমি যদি বলতে তাহলে আমি তোমাকে সেই মরা টিকটিকিও দেখাতাম।' সালার ধৈর্য দেখানোর চেষ্টা করল।

: না, এটা সেটাই, আমি একে চিনি।

: 'এটা সেটাই হলে, এতদিন এটা কোথায় ছিল?' সালার একটি অযৌক্তিক বিষয়ে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করল।

: যেখানেই থাকুক, আমি জানি না। কিন্তু তুমি তো এটাই চাইতে, আমি চিন্তিত

সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই অপবাদের উত্তরে সে কী বলবে। ইমামার কিছু হয়েছে, কিন্তু কী হয়েছে, এটা সে বুঝতে পারছে না।

: 'তুমি জানো যে, টিকটিকি দেখে আমি ভয় পাই। তবু তুমি একে এখানে ছেড়ে গিয়েছ। কারণ, আমার প্রতি কোনো মায়া নেই তোমার। আমাকে অস্ত্রির দেখে তুমি খুশি হও। সবকিছুই তোমার কাছে দুষ্টুমি মনে হয়।' তার কোনো কথার কোনো আগামাথা নেই। সালার তার কথা শুনতে থাকল।

'তুমি সবসময় আমার সাথে এমনটা করো। আর আমি জানি, সারা জীবন তুমি এমনটাই করবে। কারণ, তোমার কাছে শুধু

তোমার নিজের গুরুত্ব আছে। আর আমি তোমার ঘরের চাকরানি। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি ঘুরে বেড়াও, আর আমি সবসময় কেনা গোলামের মতো বাসায় পড়ে থাকি। আমি সারা দিন কাজ করব, আর তুমি আমার জন্য একটা টিকটিকি মারতে পারবে না।" এসব এলোমেলো কথা বলে ইমামা হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল।

পুরো আলোচনার বিষয়বস্তু কী ছিল? টিকটিকি না-মারা, তার স্বার্থপরতা, বাসায় তার অনুপস্থিতি অথবা বাসার সকল কাজ ইমামাকে একাই করতে হয়, মূল বিষয় ঠিক কোনটি, সালার বুঝতে পারল না। পাঁচ মিনিট ধরে সে ধৈর্যসহকারে তার কান্না থামার অপেক্ষা করছে। অবশেষে তুফান থামতেই সে বলল, 'আই অ্যাম সরি। আমার ভুল হয়েছে। আমি ফোরকানকে বলে দিচ্ছি পরিচারিকাকে পাঠাতে, সে এসে টিকটিকিমেরে যাবে।' আপাতত ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার অন্য কোনো পথ সে খুঁজে পেল না।

: 'না, এখন আমি টিকটিকির সাথে থাকব, যাতে তুমি বুঝতে পারো কেমন লাগে!' সে নাক ঘষতে ঘষতে তাকে বলল। সালারের অনাকাঙ্ক্ষিত হাসি পেল। কাশি দিয়ে সে ওটা আড়াল করল। হেসে, জ্বলন্ত আগুনে সে কেরোসিন ঢালতে চাচ্ছে না। ইমামার সমস্যা কী, এটা সে বুঝতে পারছে না।

ফোরকানের পরিচারক পরদিন এসে টিকটিকি মেরে দিয়ে গেল। কিন্তু তারপরও ইমামার মনে কোনো অপরাধবোধ জাগ্রত হয়নি। তার পরের দিন রান্না করতে গিয়ে ছুরিতে তার হাত কেটে গেল। সিল্কে ট্যাপের নিচে আঙুল ধরে তার সালারের কথা মনে পড়তে লাগল।

: এটা কী হয়েছে?

সালার সেদিন অফিস থেকে ফিরে লাউঞ্জে পায়চারি করতে করতে ফোনে কথা বলছিল। ইমামা ডিনারের জন্য টেবিল সাজাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে কিচেন কাউন্টার থেকে বিনস

খাচ্ছিল সে। ইমামা তখন ওখান থেকে ভাতের বাটি নিচ্ছিল।
সালার তার হাত ফোলা দেখে, ফোনে কথা শুনতে শুনতে
অবচেতনেই বলে উঠেছিল, 'কী হয়েছে?'

: 'এটা?' ইমামা চমকে তার দৃষ্টির অনুসরণ করে নিজের হাতের
দিকে তাকায়। 'কিছু না। রান্না করার সময় তেলের ছিটা
পড়েছিল।' ইমামা উদাসীনভাবে বলল। সালার ওভাবেই ফোনে
কথা শুনতে শুনতে তার হাত ধরে দেখতে থাকল। তারপর
তার হাত ছেড়ে ওভাবেই ফোনে কথা বলতে বলতে লাউঞ্জ
থেকে গায়েব হয়ে গেল। সালার যখন পুনরায় আসে, ইমামা
তখন ফ্রিজ থেকে পানি বের করছে। ফোনে সে স্টক
মার্কেটের কোনো একটি সমস্যা নিয়ে কথা বলতে বলতে,
ইমামার হাত ধরে কয়েক মুহূর্তেই তাতে মলম লাগিয়ে দেয়।
তারপর ওভাবেই পুনরায় চলে যায়। ইমামা নড়তে পারে না।
এত বছরের মধ্যে তার কোনো ক্ষতে লাগানো, এটাই ছিল
প্রথম মলম।

খাবার খেতে খেতে সালারের দৃষ্টি পুনরায় তার হাতের দিকে পড়ে। সে খানিক অভিমান-ভরে বলে, 'তখনই কিছু লাগিয়ে নিলে, এখন এমন ফুলে যেত না।'

: এতে কোনো ব্যথা লাগেনি আমার।

: কিন্তু আমার লাগছে, সুইটহাট!

ইমামা তার চোখে চোখ রেখে কোনো উত্তর করতে পারল না। সালারের বিশ্বাস, সে ব্যথা পেয়েছিল। আর এই মলমের চেয়ে বেশি শীতলতা সে অনুভব করেছে তার বলা এই বাক্যটি শোনে। তার মানে ইমামার এখন এমন কেউ আছে, তার হাতেপাওয়া সামান্য ক্ষতও যাকে কষ্ট দেয়। সে ব্যথার অনুভূতির সাথে যেন পুনরায় পরিচিত হচ্ছে। এতগুলো মাস পর আজ আবার হাত কাটল, কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করার মতো পাশে কেউ নেই। সেই জিজ্ঞেস করার মানুষটির কথা এখন তার পুনরায় মনে পড়তে লাগল।

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হতে হতে ইমামা ছোটখাটো কথায় প্রচণ্ড
রেগে যেতে থাকে। পরিচারিকার সাথে, মালির সাথে, তার
বাসায় আগত ফোরকানের বাচ্চাদের সাথে এবং স্বয়ং সালারের
সাথেও।

: 'ইমামা, কী হচ্ছে তোমার? সবকিছু ঠিক আছে তো?'
অবশেষে সালারকে সরাসরি প্রশ্ন করতে হলো।

: 'কী হবে আমার?' তার প্রশ্নে সে প্রচণ্ড তেতে উঠল।

: 'সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি!' সালার অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে
বলল।

: কিছুই হচ্ছে না আমার।

: 'তাহলে তুমি...' কথা বলতে বলতে সালার খেমে গেল। এটা
বলা কঠিন যে,

সে তার সাথে কর্কশ ব্যবহার করছে।

: 'তাহলে আমি কী?' সে চুপ হতেই ইমামা প্রশ্ন করল।

: কিছু না। আমি এখন দু-তিন দিন তোমাকে ফোন করতে পারব
না।

: 'কেন?' সে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'এত কী কাজ যে,
তুমি কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে কলও করতে পারবে না?'

: 'আমি তোমাকে ইমেইল করব। সময় পেলে কলও করব।'
সালার তাকে ধৈর্য ধরে বোঝাতে লাগল।

: 'তাহলে ইমেইলও করো না। এতে তোমার আরও সময় বাঁচবে।' ইমামা প্রচণ্ড অস্থির হয়ে কল কেটে দিল। সালারের প্রতি তার অনেক রাগ হচ্ছে। কয়েক মিনিট পর পুনরায় কল বাজতে লাগল। সে কল রিসিভ করতে চাচ্ছিল না, কিন্তু তাকে রিসিভ করতে হলো।

: 'তুমি কল কেটে দিয়েছিলে?' সালার হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: হ্যাঁ।

: কেন?

: 'যাতে তোমার সময় নষ্ট না হয়। আমি গতকাল একটি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, যেসব পুরুষ হীনম্মন্যতায় ভোগে, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে মিথ্যা ব্যস্ততার গল্প শোনাতে থাকে।' সালার হতভম্ব হয়ে তার কথাটি শুনল। 'যাতে করে তার স্ত্রী

মনেকরে, আমার স্বামী কতটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এই দুনিয়া তাকে ছাড়া চলবে না।" সালার সেই হতভম্বতায় বাক্যের পরের অংশটুকুও শুনল। 'এর ফলে তার আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।' শেষ বাক্যটি বলে সে সালারের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সালার চুপ করে রইল।

: 'হ্যালো!' ইমামার আশঙ্কা হলো, কল হয়তো কেটে গিয়েছে।

: 'আমি শুনছি। ওই ম্যাগাজিনে শুধু এতটুকুই লেখা ছিল?' সালারকে গম্ভীর মনে হচ্ছিল, কিন্তু বিষয়টি গম্ভীর নয়।

: হ্যাঁ।

: 'গুড। ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছিলে তুমি?' সালার প্রসঙ্গ পালটাল। ইমামার বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। সে এমনটা চাচ্ছে না, সে তর্ক করতে চাচ্ছে।

দুই ঘণ্টা পর সালার আগামী দুই সপ্তাহের প্রোগ্রাম তালিকা তাকে মেইল করে দিল। সেটি পড়তে ইমামার পনেরো মিনিট লাগল। এই ইমেইল তাকে কোন কথার প্রেক্ষিতে পাঠানো হয়েছে, সে বুঝতে পারছে। তা সত্ত্বেও ইমামা কোনো দুঃখ প্রকাশ করল না।

: 'তুমি ফোরকানের বাসায় ডিনারে যাওয়া বাদ দিয়ে দিয়েছ কেন?' পরদিন ফোন করে সালার তাকে বলল।

: 'আমার ইচ্ছা।' সে বলতে চাচ্ছিল, ডিনার টেবিলে ফোরকান ও তার মেয়েকে দেখে তার কথা মনে পড়ে। এভাবে প্রতিদিন ডিনারের পর তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। কিন্তু এসব সে বলতে পারল না।

: আমি জানি, তুমি অনেক সাহসী। একাই থাকতে পারবে। ডিনার তো তোমার বাম হাতের খেলা। তবু তাদের বাসায় গেলে, উপন্যাস পড়া ছাড়া এটিও তোমার একটি কাজ হতো।

: 'তাতে তোমার কী?' সালারের কথা শুনে সে বিরক্ত হয়ে বলল।

: 'এই আধখ্যাঁচড়া মসজিদ বানিয়ে বসে থাকা বন্ধ করো।' সালাার গম্ভীর হলো।

: 'তুমি আমাকে নসিহত করার জন্য ফোন করেছ?' সে বিরক্ত হলো।

: হ্যাঁ।

: তাহলে করতে থাকো।

: এতে তোমার ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না, এটাই বলতে চাচ্ছ তুমি?

: বাইরে গিয়ে তুমি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেছ।

: 'কী?' সালারের মনে হলো, সে হয়তো শুনতে ভুল করেছে।

: 'আমি এক কথা বারবার বলতে পারব না।' সে ঠান্ডা গলায় বলল।

: 'আমি দুর্ব্যবহার করছি তোমার সাথে?' সালার অবিশ্বাস্যভাবে জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ।' উত্তর একদম নির্দিধায় এলো। সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘশ্বাস

ফেলল।

: আমি যদি তোমাকে কোনো যুক্তির কথা বলে থাকি, এটা কি দুর্ব্যবহার হলো?

: এখন তুমি এটা বলতে চাচ্ছ যে, আমি নির্বোধ?

সালারের মাথা ঘুরে গেল।

: আমি কখন বললাম, তুমি নির্বোধ?

: তার মানে আমি মিথ্যা বলছি? আমি মিথ্যাবাদী?

সালার অসহায়ভাবে হাসতে লাগল।

: কী হয়েছে তোমার, ইমামা?

: এখন বলো যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

: পানি পান করো।

: কেন পান করব?

: 'আচ্ছা পান করো না। বসন্ত ঋতু কেমন লাগছে?' সে এখন প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু ইমামার প্রতিক্রিয়ায় সে প্রচণ্ড হতভম্ব।

গতকাল সালারের কথামতো সে নওশীনের সাথে ফোটেসে ঘুরতে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে নওশীন হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ইমামা, কোনো সমস্যা হয়েছে তোমার?' ইমামা প্রচণ্ড চমকে যায়। তারপর মুচকি হাসার চেষ্টা করে।

: না, না তো। কেন?

: তাহলে এমন চুপচাপ কেন?

: না আমি, আমি কিছু ভাবছিলাম।

: সালারের সাথে কথা হয় তো তোমার? কোনো ঝগড়া তো হয়নি?

: 'না তো। প্রতিদিন কথা হয়।' সে কষ্ট করে মুচকি হাসার চেষ্টা করে, ডিসপ্লেতে ঝোলানো একটি স্যুটের প্রতি নওশীনকে মনোযোগী করে। তাকে সে কীভাবে বলবে

যে, এখানে ঘুরতে ঘুরতে সালারের কথা তার প্রচণ্ড মনে পড়ছে! খারা তাদের স্ত্রীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে?" পরদিন ফোনে কথা বলতে বলতে : 'ম্যাগাজিনে হীনম্মন্যতার ভুক্তভোগী পুরুষদের ব্যাপারে কিছুই পড়েনি আজ? সালার তাকে উত্ত্যক্ত করল। ইমামার মন খারাপ হয়ে গেল।

: তুমি কি বলতে চাও যে, এমন পুরুষ নেই? আমি অনর্থক কথা বলছি?

: 'আমি দুষ্টুমি করছি ইমামা!' সে খানিক সতর্ক হলো।

: একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুমি দুট্টুমি মনে করছ।

: 'কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? ইমামা, ইদানীং তুমি কোন ম্যাগাজিন পড়ছ?' সালার না বলে থাকতে পারল না।

: 'তা দিয়ে তুমি কী করবে?' সে আরও উত্তেজিত হলো।

: 'তুমি আমাকে এসব ভুলভাল উদ্ধৃতি শোনাতে তো আমি জিজ্ঞেস করবই, তাই না?' সালার না চাইতেও তার সাথে বিতর্ক করতে লাগল। এখন প্রায় প্রতিদিন এসবই হচ্ছে। গত চার দিন ধরে ফোনে কথা বলার শেষ প্রান্তে এসে ক্ষমা চেয়ে ফোন রাখতে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না, ইমামার কী হয়েছে। আগেও সে রাগ করত, কিন্তু এমন কথায় নয়। সালার যেহেতু তাকে বুঝতে পারছে না, তাহলে সে নিজেও হয়তো নিজেকে বুঝতে পারছে না।

সে সারা দিন সালারের কথা ভেবে ভেবে বিষণ্ণ হয়ে থাকে। আর ফোনে কথা বলতে গিয়ে অকারণেই ঝগড়া করে। তার সাথে কথা বলতে গেলেই ইমামার প্রচণ্ড রাগ ওঠে। কিন্তু কেন ওঠে, এটা তার বোধগম্যের বাইরে। সে সারা দিন টিভি অন করে তার কলের অপেক্ষায় বসে থাকে। কিংবা পুরোনো ইমেইল পড়তে পড়তে নতুন ই-মেইলের প্রতীক্ষা করতে থাকে। কয়েক লাইনের ছোট ছোট ইমেইল, যেগুলোতে সালার তার অবস্থা জিজ্ঞেস করে, সেগুলো অসংখ্যবার পড়ে। তারপর একটি দীর্ঘ উত্তর লিখে, তার মেইলের অপেক্ষায় সারা রাত জেগে জেগে, তার জিনিসপত্র পরীক্ষার করে গোছাতে থাকে। তারপর সালারের সংগ্রহ থেকে চার্লিজ থেরনের মুভি দেখতে থাকে। সত্যিই এটি অসহায়ত্বের চূড়ান্ত রূপ। আগে যাকে সে সালারের সামনে ও দেখতে পারত না, তার কাছে এখন এই অভিনেত্রীকেও খারাপ লাগা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন খাওয়ার টেবিলে সে সালারের জন্যও প্লেট সাজিয়ে রাখে। এটা যেন খাবার টেবিলে নিজের একাকিত্ব দূর করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ঈদ উপলক্ষ্যে ইসলামাবাদ যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই

নীরবতা ও একাকিত্ব তাকে পরিপূর্ণভাবে অনুভূতিশূন্য করে দিল।



ইসলামাবাদ থেকে ফিরে আসার পরও তার অস্বস্তি কাটল না। সালারের পুরো পরিবারের মধ্যে কেবল আন্নার ও ইউসরা ঈদ উদ্‌যাপন করতে সেখানে এসেছিল। সালার তাইয়েবাকে ইমামার শপিং করিয়ে দেবার জন্য বলেছিল। ইমামা অত্যন্ত বিষন্ন মনে উনার সাথে চলে গিয়েছিল। ইসলামাবাদ গিয়ে এই প্রথম সে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তার পরিবারের সদস্যদের দেখার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। ঈদের দিন আগের মতোই সালারের কলে তার ঘুম ভাঙে। সালার তখন মন্ট্রিয়ালে শপিং শেষ করে হোটেলে ফিরেছে।

: 'আজ কোন পোশাক পরছ?' মুবারকবাদ জানিয়ে সালার তাকে প্রশ্ন করল।



: 'তোমাকে বলে লাভ?' ইমামা বিছানার ক্রাউনের সাথে
হেলান দিতে দিতে বলল।

: আমি কল্পনা করতে চাচ্ছি, তোমাকে দেখতে কেমন লাগছে।

: আমার সামনে কখনো তো তুমি আমার পোশাকের দিকে
ভালো করে খেয়াল করেনি। এখন ওখানে বসে কী কল্পনা
করবে?

: 'ইমামা, আজকের দিনটা অন্তত আমরা কোনো বিতর্ক করব
না।' সালার যেন হস্তক্ষেপ করে আগত যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা করে
দিল। 'আজ কী চাও তুমি? ফুল ও কেকের কথা তো আমি
মান্নিকে বলে দিয়েছি। আর কিছু লাগবে তোমার?'

: 'না।' সে অসম্ভব হতাশ হয়ে আছে।

: 'আমাকে তো মিস করছ না তুমি।' সালার দুষ্টুমি করল। কিন্তু সে যেন ইমামার ব্যথার রঙে চিমটি কেটে ফেলল। তার চোখে অশ্রুর স্রোত বয়ে যেতে লাগল। জামার আঙিনে চোখ কচলে কচলে মোছার চেষ্টা করল। সালার তার নীরবতার প্রতি লক্ষ্য না করে কথা বলতে থাকল। কানাডায় একদিন আগেই ঈদ হয়ে গিয়েছে। সালারকে ঈদের দিনেও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

: 'তোমার ফ্লাইট কবে?' সে চেষ্টা করল কথা বলতে বলতে যেন তার গলা ধরে না আসে। তাহলে খুব লজ্জা পেয়ে যাবে, যদি সালার বুঝে যায় যে...। সালার এখন তাকে ফ্লাইটের তারিখ বলছে।

: 'তুমি আমাকে জামার কালার বলোনি।' কথা বলতে বলতে সালারের মনে পড়ল। 'তুমি মান্নির সাথে গিয়ে জামা কিনেছিলে?'

: হ্যাঁ, উনার সাথে গিয়ে। আজ যেটা পরব, ওটা হেজেল গ্রিন।

: 'হেজেল গ্রিন?' সে আচমকা আটকাল। 'এমন তো চোখ হয়।'

১৩

: 'চোখের কালার হয়।' সব সময়ের মতো ইমামা তার সংশোধন করল। 'তাকাবা।' সালার তার -ওই, আজ আমি জেনিফারের চোখের দিকে খেয়াল করে তার কোনো সহকর্মীর নাম উল্লেখ করল।

'তার চোখে আমি আমার স্ত্রীর আমার বং দেখতে পাব।' সালার গম্ভীর। ইনামা অনাকাঙ্ক্ষিত হাসতে লাগল। 'ইমামা, এখানে আসার পর আজ তুমি প্রথম হাসলে।' সালার তার হাসি লক্ষ্য করল।

আর বিয়ের পর এত মাসের মধ্যে আজ প্রথমবার তুমি কালার শনাক্ত করতে গেরেছ। আর সেটাও কোনো নারীর চোখে।

: 'তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?' সালার হাসতে লাগল।

- 'হ্যাঁ, এখন তো আমার করার মতো এই একটি কাজই বাকি আছে।' ইমামা

হাস্যরসের ভঙ্গিতে বলল।

- "তার মানে হচ্ছে না? নাকি হতে পারে না?" সালার ভাবতে লাগল। আর ইমামা কোনো উত্তর দিতে পারল না। তার নীরবতায় সালার হাসল।

'এখানে হাসার কী হলো?' ইমামা বিরক্ত হলো।

'এমনি, তোমার সুধারণা দেখে হাসছি। অন্তত তুমি আমাকে নিয়ে কোনো নারীর প্রতি ঈর্ষা করো না।' সালার তাকে বিরক্ত করছিল। ইমামাও জানে, তার ইশারা রিমশার প্রতি।

2

'তুমি আমাকে বলো কবে আসছ?' ইমামা প্রসঙ্গ পালটানো উত্তম মনে করল।

◇ ◇ ◇

3

তারপর ঈদের দ্বিতীয় দিন রাতের ফ্লাইটে ইমামা লাহোর ফিরে এলো। কারণ, পরদিন রাত আটটার ফ্লাইটে সালার দেশে আসছে। যে স্পর্শকাতরতা ও সংবেদনশীলতা বিগত চার সপ্তাহ ধরে তাকে অসন্তুষ্ট করে রেখেছিল, তা একদম উধাও হয়ে

গেল। অবশেষে চার সপ্তাহ পর সে সালারের আধখাওয়া কেক ও ক্যানটি ফেলে দিল। ফোরকান যদি হাসপাতাল থেকে সরাসরি এয়ারপোর্টে না যেত, তাহলে সেও উনার সাথে তাকে রিসিভ করতে যেত। এতটা উত্তেজিত হয়ে আছে সে।

নয়টা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অবশেষে কলিং বেল বাজল। এক সেকেন্ডেই দরজার কাছে চলে গেল সে। হে আল্লাহ! একেই কি সুখ বলে? এই মানুষটির চেহারায় প্রথম নজর ফেলে যা অনুভব করেছি আমি? সে দরজা খুলে, দরজার হ্যান্ডেলেকম্পনরত হাত ধরে সালারকে দেখে আচমকাই ভাব ফোরকানের সাথে কথা বলতে বলতে দরজা খোলার শব্দে সালার সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, তাদের চোখাচোখি হলো। সেই একই উষ্ণ অভ্যর্থনাময় মুচকি হাসি, যা সবসময় মুখে লেগে থাকে। তাকে দেখতেই ইমামা এক মুহূর্তের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

: 'ইমামা, তোমার জিনিস ডেলিভারি দিতে এসেছি, চেক করে নাও, কোনো ভাঙন কিংবা ফাটল তো নেই আবার?' ফোরকান একটি সুটকেস টেনে ভেতরে আনতে আনতে তাকে জ্বালাতন করল। সালার মুচকি হাসল।

ইমামা সালামের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার গলায় যেন কোনো গিট পাকিয়ে গিয়েছে। বিষয় এ পর্যন্ত হলেই ঠিক ছিল, কিন্তু চোখে পানি কীভাবে এবং কেন এসে পড়ল! সালার এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। যেমনটা সে অফিস থেকে ফিরে ধরত। না চাইতেও অশ্রুর আরেকটি ঢল বইতে লাগল। এটাই তো সে খুঁজে ফিরছিল। এই মানুষটিকে, এই নরম ছোঁয়া এবং নিজের সত্তার চারপাশে এই বাহুর

বন্ধন।

: 'কেমন আছ তুমি?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করছিল। গলার গিঁট আরও বেড়ে গেল। সালার এখন তাকে বুক থেকে সরিয়ে,

তার মুখ ও অশ্রুর দিকে তাকিয়ে রইল। 'কী হয়েছে?' সালার থমকাল। সুটকেস ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে ফোরকান পেছন ফিরে তাকাল।

: 'আমি এখন, এখন সালাদের জন্য পেঁয়াজ কাটছিলাম।' ইমামা খানিক ঘাবড়ে মুচকি হাসার চেষ্টা করে, ধরা গলায় বলল। তারপর নিজের কাছেই হয়তো এই বাহানা দুর্বল মনে হলো। 'মাথায় একটু ব্যথা করছে। হালকা সর্দিও হয়েছে।' ফোরকানের মুচকি হাসির দৃষ্টিতে সে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কিন্তু সালার ফোরকানকে উপেক্ষা করে, তাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাহলে কোনো ওষুধ খেয়ে নিতে!'

: 'চুলায় কিছু একটা রেখে এসেছি।' ইমামা না দাঁড়িয়ে দ্রুত রান্নাঘরে চলে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে, তার চোখে চোখ রেখে মুখে বলা কঠিন হয়ে পড়ছিল। সিন্ধের কাছে ঝুঁকে চেহারায় পানি ছিটিয়ে, সে একটু পানি পান করল। গলার কম্পন কেবল এতেই কমতে পারে।

: 'বসো, খাবার খেয়ে যাও।' ইমামা লাউঞ্জে এসে শুনল, সালার ফোরকানকে

বলছে।

: 'না, এখন না। বাচ্চারা হয়তো খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুদিন পর তবে কোথাও ডিনারের জন্য যাওয়া যায়।' ফোরকান বেরোবার দরজার দিকে যেতে যেতে বলল। সালার দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে গেল। রান্নাঘরে এসে খাবার ও প্লেট সাজাতে লাগল ইমামা। সালার দরজা থেকে ফিরে ফোনে কথা বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এলো। ওপাশে সিকান্দার উসমান কথা বলছিলেন। ইমামা দেখল, সালার কিচেন কাউন্টার থেকে পানির বোতল নিয়ে সেটি খুলছে। ফোন কাঁধ ও কানের মাঝে চেপে ধরে অবশেষে বোতলের ছিপি খুলল। ইমামা তার গ্লাসের দিকে যাওয়ার আগেই, অন্য একটি গ্লাস এনে তার সামনে কাউন্টারে রাখল। সালারের কাছ

থেকে বোতল নিয়ে নিজেই গ্লাসে পানি ঢালতে লাগল। সালার সিকান্দারের সাথে কথা বলতে বলতে মাথার ইশারায় তাকে শুকরিয়া জানাল। তারপর পানির ঢোক নিতে নিতে বলল, 'পাপা তোমার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করছেন।'

ফ্রিজের দরজা খুলতে খুলতে ইমামা মুচকি হাসল।

: আমি এখন ঠিক আছি।

সালার তার কথার গভীরে না ঢুকে সিকান্দার উসমানকে হুবহু জানিয়ে দিল। কাউন্টার থেকে আপেলের একটি টুকরো মুখে পুরে ওভাবেই সিকান্দারের সাথে কথা বলতে বলতে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইমামা দূর থেকে দেখল, সালার বারান্দার দরজা খুলে গাছগুলো দেখছে। টেবিলে প্লেট রাখতে রাখতে আবারও তার চোখ ভিজতে শুরু করল। এক মাস পর এই জায়গাটি তার কাছে ঘর মনে হচ্ছে। বিষয়টি মহব্বতের নয়; অভ্যাসের। আর সে সালারের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

কখনো কখনো অভ্যাস মহব্বতের চেয়েও অধিক প্রাণঘাতী
সাব্যস্ত হয়।

তার হঠাৎ খেয়াল এলো, সালার খাওয়ার আগে কাপড়
পালটাবো। তাই বেডরুমে গিয়ে তার জন্য কাপড় বের করে
ওয়াশরুমে ঝুলিয়ে রাখল। ওখান থেকে বের হচ্ছিল, এমন
সময় সালার বেডরুমে এলো।

: 'আমি গোসল করে খাবার খাব।' সালার যেন ঘোষণা করল।

: 'আমি তোমার কাপড় ও তোয়ালে রেখে এসেছি। আর
তোমার জন্য আমি এই নতুন স্লিপার জোড়া এনেছি।' সে বক্স
থেকে শব্দ করে স্লিপার বের করতে করতে বলল।

: 'থাকুক ইমামা, আমিই বের করে নেব।' রেস্ট ওয়াচ খুলতে
খুলতে সে ইমামাকে নিষেধ করল। সালার কখনো তার জুতা

অন্য কেউ তুলুক, তা পছন্দ করে না। কিন্তু তাকে নিষেধ করা
সত্ত্বেও সে স্লিপার বের করে নিয়ে এলো।

: 'কিছু হবে না।' ইমামা স্লিপার তার কাছে এনে রেখে দিল।
সালার এখন বিছানায় বসে জুতা ও মোজা খুলছে। ইমামা
উদ্দেশ্যহীনভাবে তার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকল।
সালার খানিক অবাক হয়ে তা লক্ষ করল।

: 'এই হলুদ কাপড় কি তুমি আমার অপেক্ষায় পরেছ?' সালার
মোজা খুলতে খুলতে ইমামাকে উত্ত্যক্ত করল। ইমামা অকারণ
হাসল। সালার মাস্টার্ড পেস্ট কালারকে হলুদ বলছে। কিন্তু
ইমামা আজ সংশোধন করল না। 'সুন্দর স্লিপার!' সে স্লিপার
পরে ইমামাকে বলল।

: 'আমি রেখে দিচ্ছি।' বলতে বলতে ইমামা তার থেকে জুতা ও
মোজা নেওয়ার

চেষ্টা করল।

: 'কেন ইয়ার, আগে কে রাখত?' সালার খানিক অবাক হয়ে তাকে বাধা দিল। ইমামা থেমে গেল। ইমামা বেডসাইড টেবিলে তার রেস্ট ওয়াচ এবং সেলফোনটির দিকে তাকাল। প্রতিটি শূন্য জায়গা আবারও পূর্ণ হতে শুরু করেছে।

সালার গোসল সেরে আসতে আসতে ইমামা খাবার সাজিয়ে ফেলল। সে ডাইনিং টেবিলে চোখ বোলাতেই, অজান্তেই বলে উঠল, 'ইমামা, কী কী রান্না করে রেখেছ আজ!'

: 'যা যা তোমার ভালো লাগে।' ইমামা সরলভাবে বলল।

: 'আমার?' সালার চেয়ার টেনে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে যেন চিন্তায় পড়ে গেল। 'শুধু শুধু তুমি সময় নষ্ট করেছ।'

অন্য কোনো সময় হলে সারা দিন পরিশ্রম করে রান্না সম্পর্কে এমন কথা শুনে সে প্রচণ্ড রেগে যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কিছুই খারাপ লাগছে না। সে এতটাই নিবিষ্ট ও অভিভূত হয়ে আছে।

: 'আমি আমার সময় তোমার জন্য ব্যয় করেছি।' মৃদুস্বরে সে সালারকে সংশোধন করল।

: কিন্তু তুমি হয়তো ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ।

: 'না, কেন ক্লান্ত হব আমি?' সে ভাতের ডিশ সালারের দিকে বাড়িয়ে দিল। সালার সব সময়ের মতো প্রথমে ভাত নিল। প্লেটের কোণের ভাতগুলো দেখে সালারের মন ভারী হয়ে এলো। দীর্ঘ এক মাস পর ইমামা তার এত কাছে বসে আছে। খাবার পরিবেশনরত সালারের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সাদা শাটের হাতা গোটানো এই হাতটি তাকে সবসময় মোহিত করে।

: 'তোমার পেইন্টিং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে?' খাবার শুরু করতে করতে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'কোন পেইন্টিং?' ইমামা আনমনা হয়ে বলল। সালার থমকাল।

: 'তুমি না কী বানাচ্ছিলে?' সালার তাকে মনে করিয়ে দিল।

: 'এটাও নাও।' ইমামা উত্তর করার পরিবর্তে আরও একটি ডিশ তার দিকে বাড়িয়ে দিল। এখানে একা থাকতে তোমার ভয় লাগেনি তো?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'খাবার ভালো হয়েছে?' ইমামা আবারও উত্তর এড়িয়ে গেল।

: 'সবসময় ভালো হয়।' সালার মুচকি হাসল।

: 'কতগুলো উপন্যাস পড়েছ তুমি?' সালার এখন উপন্যাস নিয়ে বলছে।

: 'এই যে চাপও করেছি।' ইমামা আরও একটি ডিশ এগিয়ে দিল। 'তোমার ফ্লাইট ঠিক ছিল তো?'

: হ্যাঁ, সব মিলিয়ে ভালোই ছিল।

: আর কনফারেন্স কেমন হলো?

: 'চমৎকার!' সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বলল।

: সারা দিন কী কী করতে?

ইমামা এখনো তাকে ওই প্রসঙ্গ থেকে সরাতে পারছে না।

: 'কী কী করেছি?' ইমামা চিন্তায় পড়ে গেল।

: 'হ্যাঁ, কী কী করতে সারা দিন?' সালার এখন চাপাতির টুকরো ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞেস করছে।

: 'আগে যা করতাম, তা-ই।' ইমামা দৃষ্টি লুকিয়ে আরও একটি ডিশ তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

: কিন্তু এখন তো তোমার কাছে অনেক সময় ছিল হয়তো।

: হ্যাঁ, একদম। সারা সন্ধ্যা, সারা রাত।

: 'তাহলে তো খুব আরামে কাটিয়েছ তুমি?' প্লেটে কোরমা নিতে নিতে সালার মৃদু হেসে বলল। ইমামা উত্তর করার পরিবর্তে নিজের প্লেটের দিকে তাকাল। প্লেটে খাবারের আইটেম ওভাবেই সব ভূপাকারে পড়ে আছে। সে কিছুই খেতে পারছে না।

: 'তুমি সায়েদা আম্মাকে এখানে নিয়ে আসতে?' সালার হঠাৎ তাকে বলল। কী জানি তার কী মনে হলো।

: 'আমি বলেছিলাম উনাকে। কিন্তু তুমি তো জানোই, এতদিনের জন্য তিনি বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকতে পারবেন না' সে উত্তর করল।

: 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।' সালার খাবার খেতে খেতে হঠাৎ একটি লোকমা তার দিকে বাড়িয়ে দিল। শেষ লোকমাটি সে সবসময় তাকে খাওয়াত। এক মুহূর্তের জন্য ইমামা থমকাল। তারপর তা মুখে নিয়ে নিল। কিন্তু তা চিবাতে পারল না। এই লোকমাটি যেন মুক্তির সর্বশেষ সীমা সাব্যস্ত হলো। ইমামা অজান্তেই কাঁদতে শুরু করল। সালার পানি পান করতে করতে একদম থেমে গেল।

: 'কী হয়েছে?' সালার একেবারে হতভম্ব হলো। ঠোঁটে হাত চেপে ইমামা একদম বাচ্চাদের মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে

লাগল। 'কী হয়েছে ইমামা?' সালার ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ল।
অন্তত এই মুহূর্তে এমন কথাবার্তার সময় অশ্রু? এর কারণ সে
খুঁজে পেল না। একবার অশ্রু বিসর্জনের পর সবকিছু সহজ হয়ে
গেল।

: 'উফফ, সত্যিই তুমি আমাকে পাগল করে দেবো। কী হয়েছে?
আমি যাওয়ার পর সবকিছু ঠিক ছিল তো? কেউ তোমাকে
বিরক্ত তো করেনি?' সালার এখন একেবারে হতবিহ্বল হয়ে
পড়ল। টিস্যু দিয়ে চোখ কচলে অশ্রু সংবরণ করতে করতে
ইমামা মাথা নাড়ল।

: 'তাহলে কেন কাঁদছ?' সালার নিশ্চিত হলো না।

: 'ব্যস, এমনিই। তোমাকে অনেক মিস করেছি, তাই।' বলতে
বলতে সে আবারও কাঁদতে লাগল। সালারের মনে হলো, সে
হয়তো শুনতে ভুল করেছে।

: কাকে মিস করেছ?

: 'তোমাকে।' সে মাথা ঝুঁকিয়ে কান্না করতে করতে বলল।
সালার কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল।

: 'আমাকে কেন?' এটি ছিল অবিশ্বাস্যতার চূড়ান্ত সীমা। ইমামা
কাঁদতে কাঁদতে থমকাল। সে মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে,
প্রচণ্ড অভিমানে টেবিল থেকে তার প্লেট তুলে রান্নাঘরে চলে
গেল।

: আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই।

উত্তরে সালার কিছুই বলতে পারল না। ইমামা এখন প্লেট তুলে
নিয়ে যাচ্ছে। আর সালার বোকার মতো পানির গ্লাস হাতে নিয়ে
তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার কান্না দেখে সালার কখনো
এতটা স্তব্ধ হয়নি। যতটা এই ছোট্ট একটি স্বীকারোক্তি শুনে
হয়েছে।

সে চার সপ্তাহ বাইরে থেকে ইমামার যে আচরণ বুঝে উঠতে পারেনি, তা এখন বুঝতে পারছে। এটা তার জন্য অবিশ্বাসযোগ্য যে, ইমামা তাকে....। সালার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। সে এখন রান্নাঘরের এদিক-সেদিক যেতে যেতে, চোখ কচলাতে কচলাতে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। সালার গ্লাস টেবিলে রেখে রান্নাঘরে চলে এলো। ইমামা ফ্রিজ থেকে মিষ্টির ডিশ বের করছিল। সালার তার হাত থেকে বক্স নিয়ে কাউন্টারে রেখে দিল। অতঃপর কিছুই না বলে চুপচাপ তাকে জড়িয়ে ধরল। অত্যন্ত কোমলভাবে। যেন অপূর্ণতা পূরণ করছে। ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। ইমামা অভিমানে ছাড়িয়ে নিতে চাইল, তার হাত ঝাড়া দিতে চাইল, কিন্তু সে নিরুপায়। পুনরায় অশ্রু বর্ষণ হতে লাগল। সালার তার অভ্যাস খারাপ করে তুলছে। তাদের মধ্যে একটি শব্দও বিনিময় হলো না। বর্ষণ থামতে শুরু করেছে। ইমামা হাত চেপে গাল ও চোখ মুছে তার থেকে পৃথক হয়ে গেল। আসলে আমি বাসায় একা ছিলাম, তাই মিস করেছি। 'অস্বীকার,

স্বীকার, স্বীকারোক্তি, পুনরায় অস্বীকার'-এটি প্রাচ্যের নারীদের জীবনের পরিচক্র। আর সেও এই পরিচক্রে ঘুরতে শুরু করেছে।

: 'হ্যাঁ, একা থাকলে এমন হয়।' সালার তার মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করতে তাকে সাহায্য করল। ইমামার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

: 'দাঁতে ব্যথা করছিল, তাই, তাই আমার কান্না চলে এসেছে।' ইমামা আটকাতে আটকাতে বলল।

: 'হ্যাঁ, আমিও জানি দাঁতের ব্যথা অনেক প্রচণ্ড হয়। আমারও একবার হয়েছিল। আমি জানি, কী অবস্থা হয়।' সালার চোখ লুকিয়ে মিথ্যা বলে চলল।

: 'আ...আ...।' ইমামা আটকাল। তৃতীয় মিথ্যাটি তার মাথায় আসছে না আর। যে প্রশ্ন মাথায় এলো, তা-ই সে করে বসল, 'তুমি আমাকে মিস করেনি?'

: 'প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি সেকেন্ডা' সে তার চোখে চোখ রেখে বলে চলল। ইমামার চোখে যেন তারা চমকাতে লাগল। 'চার সপ্তাহ তোমার পাশে ছিলাম না। যদি তোমার ভাবনা আমার সঙ্গী না হতো, তাহলে আমি মরেই যেতাম।'

: 'তুমি মিথ্যুক।' ইমামা ধরা গলায় হাসল।

: 'তুমিও।' সালার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলল। ইমামা কাঁদতে কাঁদতে হাসতে লাগল। এই চার মাসের মধ্যে এই প্রথম সালারের কাছে তার এই কান্না আপত্তিকর মনে হলো না।

রাতে সে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে, বালিশে কনুই ঠেকিয়ে সালারের সাথে কথা বলতে লাগল। এক মাসে সঞ্চিত সমস্ত কথা। তার খেয়াল হলো না, সে একাই বলে যাচ্ছে। সালার একদম চুপচাপ কাত হয়ে শুয়ে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনে যাচ্ছে। এই নীরব শ্রোতা অপলক দৃষ্টে কেবল

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের ভাষা, মুখে ঝলকানো আবেগের আভা, কথা বলতে বলতে তার হাসির খিলখিল, সালার যেন সিনেমার সামনের সারিতে উপবিষ্ট মন্ত্রমুগ্ধ এক দর্শক। কনুইয়ে ভর করে আধশোয়া ভাব, ক্লান্ত হয়ে তার কাঁধে মাথা রেখে গতিশীল গল্প। 'আচ্ছা চলো এখন ঘুমিয়ে পড়ি।' এই বাক্যটি ইমামা অন্তত পাঁচশবার বলে ফেলেছে। তার কাঁধে মাথা রেখে তার পুনরায় কিছু মনে পড়ে গেলে, সে একেবারে মাথা তুলে সালারের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমি কি তোমাকে এটা বলেছি যে...?'

সালার না-বোধকে মাথা নাড়াতেই, পুনরায় ওখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। নীরব শ্রোতা পুনরায় ওই সিনেমাই দেখতে শুরু করে।

: 'এটা কীসের আজান হচ্ছে?' ইমামা কথা বলতে বলতে চমকে উঠল। দূরের

কোথা থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে।

: 'ফজরের।' সালার নিশ্চিত মনে বলল। ইমামা প্রচণ্ড অস্থির হয়ে পড়ল।

: 'ও মাই গড! ফজর হয়ে গেছে! আর আমি...। তোমার তো ঘুমানো দরকার। তুমি তো অনেক ক্লান্ত। আমি বুঝতেই পারিনি। তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিতে।' ইমামা এখন প্রচণ্ড অনুতপ্ত হচ্ছে। 'আমাকে বলা উচিত ছিল তোমার। কেন বলোনি?'

: 'কী বলতাম?' সালার এখন অত্যন্ত প্রশান্ত।

: এই যে, তুমি ঘুমাতে চাচ্ছ।

: কিন্তু আমি তো ঘুমাতে চাইনি।

: 'কিন্তু আমি তো সময় টেরও পাইনি। আমাকে অন্তত বলা উচিত ছিল।' সে সত্যি লজ্জিত বোধ করছে। 'তোমার কি মনে হয়, সত্যিই আমার সময়ের খেয়াল ছিল? তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আই অ্যাম সরি। কত অনর্থক কথা বললাম আমি। তুমিও কী না কী ভাবছ!'

: আমি তো নামাজ পড়েই ঘুমাব। তাছাড়া আমি কেবল এটাই ভাবছিলাম যে, আজ তুমি আমার সাথে এত কথা কীভাবে বললে!

: 'তুমি তো মনোযোগ দিয়ে শোনোনি হয়তো।' সে লজ্জায় হেসে ফেলল।

: 'প্রতিটি কথা শুনেছি। চাইলে পুনরাবৃত্তিও করতে পারি। আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে যখন যা কিছু বলেছ, সব আমার মনে



আছে। আর সবসময় মনে থাকবো।' তার কথাগুলো সাবলীল। কিন্তু চোখে এক অদ্ভুত ভাষা। যে ভাষা ইমামাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য বেঁধে নিল। 'এভাবে কথা বললে, তোমার জন্য প্রতিরাত জাগতে পারি।' ইমামা দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলল। তার থেকে খানিক দূরে সরে বালিশে মাথা রাখল সালার। ইমামা এখন সোজা হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ফোনের অ্যালার্ম বন্ধ করতে করতে সালার তার দিকে পাশ ফিরল। কনুইয়ে ভর করে, আধশোয়া হয়ে সে ইমামাকে বলল, 'আরও কিছু বলতে চাও?' ইমামা তার মুখের দিকে তাকাল। সালার গম্ভীর হয়ে আছে।

: 'না।' সে মৃদুস্বরে বলল 'আই লাভ ইউ।' প্রত্যুত্তরে সালারের বলা এই বাক্যটি তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ করে দিল। সালার তার পাশে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে, যেন তার থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা করছে।

: থ্যাঙ্ক ইউ।



সালার না চাইতেও হেসে ফেলল। একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে, এক মুহূর্ত চোখ মুদে, সালার যেন পরাজয় স্বীকার করে নিল। এখানে তার পাশে অন্য কোনো নারী হলে, প্রত্যুত্তরে তার প্রতিও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই করত। কিন্তু এটি ইমামা হাশেম। তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট! অদ্ভুত উত্তর!

: আই লাভ ইউ।

: থ্যাংক ইউ।

১৭

: 'এটি আমি তোমার জন্য এনেছি।' দশটার দিকে সালার তার সঙ্গে নাশতা করে বেডরুমে গেল। ইমামা টেবিল পরিষ্কার করছিল। তখন সে বেডরুম থেকে ফিরে প্যাকিং করা সুন্দর একটি বক্স নিয়ে এসে তাকে বলল।

: 'এটি কী?' ইমামা টেবিল পরিষ্কার করতে করতে থেমে গেল।

: 'খুলে দেখো।' সালার বক্স তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

: 'অলংকার?' বক্সের ডিজাইন দেখে ইমামা অনেকটা বুঝে গিয়েছে। সালার কোনো উত্তর না করে কাঁধ কুঁচকে চুপ করে রইল। ইমামা প্রচণ্ড আগ্রহভরে, সতর্কতার সঙ্গে এই সূক্ষ্ম-সুন্দর বক্সের প্যাকিং ছাড়িয়ে তা খুলে ফেলল। লাল মখমলের মতো নিদারুণ ঝলমলে কাপড়ের ভাঁজে দেখতে পেল একটি স্ফটিক-রঙা কেস। সেই কেসের ভেতর থেকে দৃশ্যমান রং তাকে ক্ষণিকের জন্যে ঝুঁক করে দিল। বর্গাকৃতির হীরার ব্যান্ডের উপর বসানো রয়েছে একটি অসাধারণ প্লাটিনাম ডায়মন্ড রিং। চৌদ্দ ক্যারেটের এই ডায়মন্ডের চারপাশ জুড়ে রয়েছে, নীলাভ নীলামণির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নখণ্ড-তা মিলে গঠন করেছে এক নিখুঁত গোলাকৃতি বৃত্ত। দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো আংটিটির দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার প্রথম

প্রতিক্রিয়া জানাল। নিছক আংটিটির হীরাই তাকে মুগ্ধ করেছে না। তাকে মুগ্ধ করেছে এর সূক্ষ্ম-জটিল নকশাটিও। যেখানে রত্নখণ্ডগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জড়ানো হয়েছে'এটি অনেক সুন্দর! সে অনেক কষ্টে বলল। হাত বাড়িয়ে সালার স্ফটিকের আংটিটি তার আঙুলে পরিয়ে দিল।

: 'হ্যাঁ' এটি এখন সুন্দর লাগছে।

: 'আর দেখেছ কা অদ্ভুত! এটি একদম আমার আঙুলের মাপমতো!' ইমামা যেন আরও খানিক উত্তেজিত হলো।

: 'তোমার আঙুলের মাপ অনুযায়ীই বানানো হয়েছে। তোমার একটি আংটি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি।' সালার তার আংটি পরা হাতে চুমু খেতে খেতে বলল। 'এটি তোমার বিয়ের উপহার।' সালার তার হাত ছাড়তে ছাড়তে বলল। সে খানিক হতভম্ব হয়ে সালারের দিকে তাকাল।

: বিয়ের উপহার? চার মাস হয়ে গিয়েছে বিয়ের!

: 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়েতে কোনো উপহার দেইনি। প্রথমে মনে ছিল না, তারপর টাকা ছিল না।' সালার হেসে বলল।

: আর এখন কোথেকে এলো টাকা?

: 'এসে পড়েছে কোথাও থেকে।' সে এড়িয়ে গেল। ইমামা চোখ তুলে তার দিকে

তাকাল। 'কোনো অসৎকাজ করিনি আমি।'

ইমামা মনে মনে লজ্জিত হলো।

আমি কখন বললাম যে...।

: 'চলো ডাক্তার সাহেবের বাসায় যাই। আর সায়েদা আম্মার সাথেও দেখা করে আসি। তাদের জন্য আমার ব্যাগে কিছু উপহার আছে, সেগুলো বের করে নাও।' সালার তাকে কথা পূর্ণ করতে দিল না।

: থ্যাংক ইউ সালার!

সালার যেতে যেতে থমকাল।

: কী জন্য?

: সবকিছুর জন্য।

: এই সবকিছু তোমারই।

ইমামা দৃষ্টি লুকাল।

: 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার হয়তো মনে নেই, বিয়েতে তুমি আমাকে কোনো উপহার দাওনি।' হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বারবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।

: না, ভুলিনি।

ইমামার মনে হলো, সালার আরও কিছু বলতে চাচ্ছে। সে কথা অপূর্ণ রেখে দিয়েছে, নাকি প্রসঙ্গ বদলে ফেলেছে, তা সে বুঝতে পারছে না।

১৮

: 'মাই গড! দেখো।' ইমামা ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে থমকে গেল। সালার তার দৃষ্টির অনুসরণ করল। তারা রেসকোর্সে আয়োজিত মেলা দেখতে এসেছে। এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে মেলা থেকে খানিক দূরে হাঁটাহাঁটি করছে। ইমামা ফুটপাতের ডানদিকে গাছপালার চারপাশে পানিতে ডুবন্ত ঘাসের প্রতিচ্ছবি দেখে থমকে গেল। এই প্রতিচ্ছবিগুলো দেখে সালারও

কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে তারা রঙিন আলোয় ভরা কোনো উপত্যকার কিনারে দাঁড়িয়ে হীরে-জহরতের ঝলমলে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। কিংবা আলিফ লায়লার কোনো দৃশ্য দেখছে। যেন জান্নাতে রাত নেমে এসেছে। দীর্ঘ নীরবতার পর সে ইমামার গলা শুনল। সে ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

: 'জান্নাত কি এমনই?' সালার তাকে বলতে শুনল। সে কিছু না বলে পুনরায় পানির দিকে দেখতে লাগল। 'জান্নাতে নক্ষত্র থাকবে?' ইমামা জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, অনেক।' সালার অনুমান করল।

: এত এত রঙের?

: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান সমস্ত রঙের।

ইমামা প্রফুল্ল চিত্তে হাসল। তার উত্তর ভালো লেগেছে।

: 'রাত এমন আলোকিত হবে।' প্রতিচ্ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ইমামা যেন নিজেই নিজেকে বলল।

: 'এর চেয়ে অধিক আলোকিত, অধিক রঙিন হবে।' সালারও অবচেতনেই উত্তর করল। ইমামা হাত বাড়িয়ে আঙুলের ডগায় প্রতিচ্ছবি ছুঁতে চেষ্টা করল। সালার সময়মতো তাকে ধরে ফেলল।

: 'গাছের বাতিগুলো জ্বলছে। পানিতে কারেন্টও থাকতে পারে।' সালার রেগে গেল।

: আমি একে স্পর্শ করতে চাচ্ছিলাম।

: এটা প্রতিচ্ছবি। জান্নাত নয়হায়াত

: জান্নাতে আর কী থাকবে?

: 'তুমি' সালার ঘাড় ফিরিয়ে পানির দিকে তাকাল, সেখানে ইমামার প্রতিচ্ছবি

দেখতে পেল।

: শুধুই আমি? তুমি থাকবে না?

: 'জানি না' সালার পুনরায় ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত হাসি টেনে তাকে দেখল।

: 'তাহলে তুমি কীভাবে জানো যে, আমি ওখানে থাকব?' ইমামা তাকে খানিক বিরক্ত করতে চাইল।

: 'জান্নাত ব্যতীত অন্য কোথাও কি রাখা যেতে পারে তোমাকে?' সালার প্রত্যাশায় প্রশ্ন করল। ইমামা হাসতে লাগল।

: 'এত সহজেই পাওয়া যায় জান্নাত?' সে সালারকে বলল।

: 'আমি সহজেই পাব না। কিন্তু তুমি সহজেই পেয়ে যাবে।'
সালারের স্বর পুনরায় অদ্ভুত হয়ে গেল।

: 'কেন?' ইমামা অস্থির হলো।

: 'তুমি যেভাবে প্রতিটি জিনিসে জান্নাত খুঁজে পাও, আমি আজ পর্যন্ত তা খুঁজে পাইনি। এজন্যই বলছি।' সালার ঠিকই বলছিল।

দুদিন আগে বাসার জন্য সে একটি ল্যাম্প কিনতে গিয়েছিল। ইমামা রাতে উপন্যাস পড়তে পড়তে হঠাৎ ল্যাম্পশেডের দিকে তাকিয়ে রইল। সালার তার মেইল চেক করে ল্যাপটপ বন্ধ করছিল। তখন সে ইমামাকে তাকিয়ে থাকতে দেখল।

: 'কী দেখছ তুমি?' সালার অবাক হলো।

: 'বিউটিফুল!' সে ল্যাম্পশেডের দিকে তাকিয়ে
স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল।

: 'হ্যাঁ, সুন্দর।' সালার স্বাভাবিকভাবে উত্তর করল।

: এটা কী ফুল?

: 'ফুল?' সালার হতবাক হয়ে ল্যাম্পশেডের দিকে তাকাল। এই
প্রথম সে পার্ল কালারের আবরণে নির্মিত নকশাটি দেখতে
পেল। সোনালি আভাযুক্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ফুলের একটি
নিখুঁত নকশা।

: 'এটা গোলাপও না, টিউলিপও না।' ইমামা যেন ফুলগুলো
চেনার চেষ্টা করছে। তারপর যেন পরাজয় মেনে নিল। 'এমন
ফুল জানাতে থাকবে?' সালার হাসতে লাগল।

: আচ্ছাদেখো এই ফুল রং বদলাচ্ছে। কিন্তু এটা তো রং বদলাচ্ছে না, বরং পাপড়ি মেলে

ফুটছে।

সালার যেন কোনো জাদুর ঘোরে ঢলে পড়ল। এই ফুল সত্যিই ফুটছে।

: 'LOVELY. মনোমুগ্ধকর।' সালার প্রশংসা না করে থাকতে পারল না। সে এখন বুঝতে পারছে, এই ল্যাম্প এত দামি কেন!

তারও এক সপ্তাহ আগে ইমামা তার ড্রয়ার পরিষ্কার করতে গিয়ে, তার ওয়েস্ট পেপার ঝুড়ি থেকে একটি পোস্টকার্ড তুলে তার কাছে নিয়ে এসেছিল।

: 'হ্যাঁ, এটা ফেলে দিয়েছি আমি। অকেজো।' ইমামার হাতে ওই কার্ডটি দেখে সে বলেছিল। কিন্তু ইমামা সেটি নিয়ে তার পাশে এসে বসে পড়ল।

: সালার, দেখো কত সুন্দর হ্রদ! আর দেখো, কী শান্ত এই জায়গাটি!

সালার তার হাত থেকে কার্ডটি নিয়ে তাতে এক পলক তাকায়। ওটা ছিল কোনো চিত্রকর্মের একটি পোস্টকার্ড। কোনো চিত্রশিল্পীর আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। খুব ছোট্ট, অগভীর পাড়ের নিবিড় একটি হ্রদ। তার চারপাশ বনফুলে ঢাকা। সেই ফুলগুলোর প্রতিবিম্ব এসে পড়ছে স্বচ্ছ জলের ওপর। কিছু ফুল খসে পড়ে জলের গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কিনারে বাঁধা একটি ছোট্ট নৌকা। তাতে একটি বইঠা পড়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, নৌকাটি কেবল দুজন মানুষ আরোহণ উপযোগী। হ্রদের ছাদজুড়ে কিছু জলচর পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে।

: 'এটি চন্দন কাঠের তৈরি। এই নৌকাটির রং দেখো, এটি চন্দনের রং।' ইমামা পোস্টকার্ডে আঙুল ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখাতে লাগল। 'মনে হচ্ছে, এতে চড়ে সাতসকালে কেউ কোথাও যায়। একটি সুবাসিত, সুরভিত, ভেজা নৌকায় চড়ে। সেইসঙ্গে শীতল বাতাস বইছে। হৃদের গায়ে এই নৌকায় চড়ে সুবাসিত বাতাসের দমকা হাওয়ায়! একটু কল্পনা করো।'

সালার অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এমন যেন ইমামা নিজের আঁকা ছবি দেখে নিজেই প্রফুল্ল হচ্ছে।

: কী সৌম্য-শান্ত-নীরবতা এই দৃশ্যে! এমন যেন এটি জান্নাত। আমি না বললে তো তুমি এটি ফেলে দিচ্ছিলে!

সালার অবচেতনেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে সত্যিই তার জীবনে না এলে, সে জান্নাতকে....।

'সেলফোন দিয়ে এর একটি ছবি তুলে নাও।' ইমামার ডাকে সে চমকে উঠল। সে এখনো এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে। সালার সেলফোন বের করে কয়েকটি ছবি তুলে, ফোন তার হাতে ধরিয়ে দিল। ইমামা একে একে সবগুলো ছবি দেখে, প্রশান্ত হয়ে গেল।

: 'চলো।' সালার তাকে বলল।

: 'হ্যাঁ।' দুজনেই শেষ একনজর ছবিটির দিকে তাকিয়ে, যেতে লাগল। সালার হাঁটতে হাঁটতে তার হাত ধরে নিল।

: 'চুপ হয়ে গেলে কেন? কিছু বলো।' কয়েক কদম হেঁটে ইমামা বলল।

তুমি বলো, আমি শুনছি।

: 'হতে পারে তুমি আমার আগেই জান্নাত পেয়ে যাবে।' ইমামা কথাটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করেই বলে ফেলল। সালার হাসতে লাগল।

: 'আমিও তো এটাই চাই।' সে বিড়বিড়াল। 'তোমার আগে মরতে চাই আমি।'

হাঁটতে হাঁটতে ইমামা হোঁচট খেল। কিছু একটা যেন তার সত্তা কাঁপিয়ে, দেহের এপাশ থেকে ওপাশে অতিক্রম করে গেল। সে জান্নাত খুঁজতে গিয়ে, তার সামনে দাঁড়ানো মানুষটির কথা ভুলে গিয়েছে।

: 'তুমি এভাবে কেন বলছ?' ইমামা থেমে পড়ে হাত ছাড়িয়ে নিল।

: তুমি তো বললে যে, আমি হয়তো তোমার আগেই জান্নাত পেয়ে যাব।

: কিন্তু আমি তো মৃত্যুর কথা বলিনি।

: মৃত্যু ছাড়া কি জান্নাত পাওয়া যায়?

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। তারা একে অপরের মুখ দেখতে থাকল। অতঃপর সালার তার চোখে অশ্রু গড়াতে দেখল।

: 'ঠিক আছে, যা ইচ্ছা বলো।' ইমামার গলায় অভিমান ভর করেছে। সালার তার হাত ধরে ক্ষমাপ্রার্থনা-সুলভ ভঙ্গিতে আলতো চাপ দিল।

: আমি তো কেবল তোমার কথা পুনরাবৃত্তি করেছি।

: আর আমার উদ্দেশ্য ওটা ছিল না, যেটা তুমি বের করেছ।

: আমি জানি।

তারা উভয়ে পুনরায় হাঁটতে লাগল।

: তুমি কি আমাকে জানাতে তোমার সঙ্গী বানাবে?

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। সালার হাসতে লাগল।

: তার মানে, না? আমি কখন এটা বললাম!' ইমামা থেমে গেল।

: কিন্তু তুমি তো কিছুই বলোনি।

: আমি ভাবছিলাম।

: ভেবে নিয়েছ, তাহলে এখন বলো।

ইমামা হাসল।

: তোমার কী হলো?

: 'জান্নাতের কথা তুমি শুরু করেছ।' সালার বলল। ইমামা তার মুখের দিকে

তাকাল।

: হয়তো।

সালার চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকল।

: 'তোমার বিশ্বাস হয় না?' সালার হেসে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি।

: 'তুমি যদি জান্নাতে যাও, তাহলে তোমার আমাকেই বেছে নিতে হবে।' সালার দুষ্টুমি করে বলল।

: আর যদি অন্য কেউ সেখানে পৌঁছে যায়?

ইমামার প্রশ্ন শুনে তার মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল। উভয়ের মাঝে নীরবতার একটি দীর্ঘ বিরতি নেমে এলো। সেই 'অন্য কেউ' এর পরিচয় না ইমামা চেয়েছে, আর না সালার বলেছে। কিন্তু এই 'অন্য কেউ' তাকে সালারের থেকে দৃষ্টি লুকাতে বাধ্য করে দিয়েছে। ইমামা তাকে বলতে পারল না, বিষয়টি তার নির্বাচনে কখনোই ছিল না। বিষয়টি ছিল জালালের নির্বাচনে। জালালের নির্বাচন হয়তো জান্নাতেও সে হতো না। কিন্তু এই কথা স্বীকার করা ইমামার কাছে যেন চাবুক খাওয়ার মতো অসম্মানের বিষয়। তাই নীরবতাই ছিল সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি, তার নীরবতা এই মুহূর্তে সালারকে চাবুকের মতো আঘাত করেছে।



কয়েক মুহূর্তের জন্য সিকান্দার উসমান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

: 'আপনার হয়তো কোনো ভুল হচ্ছে। ওই ফ্ল্যাট তো বিক্রি হতেই পারে না। ওটা তো সালারের নামে।' সিকান্দার উসমান ইহতিশাম উদ্দিনকে বললেন। তিনি তার একজন ব্যবসায়িক বন্ধু। কয়েক মিনিট আগেই তিনি সিকান্দারকে ফোন করে একটি ফ্ল্যাট বিক্রির ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, যেটি সিকান্দার উসমানের। এক-দেড় বছর আগে ইহতিশাম এটি কেনার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সিকান্দার তাকে বলেছিলেন, উত্তরাধিকার বন্টনের ভিত্তিতে এটি তিনি সালারের নামে লিখে দিয়েছেন। তখন তিনি কথা দিয়েছিলেন, যদি কখনো এটি বিক্রির প্রয়োজন হয়, ইহতিশামই এর প্রথম বিবেচ্য ব্যক্তি।

: আমার উকিলের মাধ্যমেই সমস্ত কাগজপত্র সম্পন্ন হয়েছে। আপনি চাইলে পত্রিকায় প্রকাশিত প্লট হস্তান্তরের বিজ্ঞাপনটিও আপনাকে পাঠাতে পারি। আপনার ছেলে এটি দেড় কোটিতে

বিক্রি করেছে। আমার তো আফসোস হচ্ছে, বিক্রির পর আমার উকিল আমাকে জানিয়েছে।

সিকান্দার উসমানের মাথা ঘুরতে লাগল।

: 'আমি এখনই সালারের সাথে কথা বলে, আপনাকে জানাচ্ছি।' সিকান্দার উসমান হুট করে বললেন। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তাকে না জানিয়েই সালার ফ্ল্যাট কীভাবে বিক্রি করতে পারে!

সালার আজ ইসলামাবাদে এসেছে। কোনো একটা কাজে সে মার্কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় সিকান্দার উসমানের কল পেল।

: 'সালার! তুমি তোমার ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছ?' সে হ্যালো বলতেই, সিকান্দার অপর পাশ থেকে বললেন। কয়েক মুহূর্ত সালার কিছুই বলতে পারল না। ফ্ল্যাট বিক্রির কথা এত তাড়াতাড়ি সিকান্দারের কানে পৌঁছে যাবে, এটা সে ভাবতেও

পারেনি। 'তুমি আমার অফিসে আসো।' তিনি শীতল গলায় কল কাটতে কাটতে বলেন।

: 'কবে বিক্রি করেছ ফ্ল্যাট?' তার অফিসে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: 'গত মাসে।' সে তার স্বর কোমল রাখার চেষ্টা করল।

: কেন?

: আমার কিছু টাকার দরকার ছিল। কীসের জন্য?

সালার এবার উত্তর দিতে গিয়ে ইতস্তত করল।

: কেন টাকার দরকার ছিল?

: ইমামার জন্য একটি আংটি কেনার ছিল।

সিকান্দারের মনে হলো, তিনি হয়তো শুনতে ভুল করেছেন।

: কীইই?

: 'ইমামার জন্য আংটি কেনার ছিল।' সে তার উত্তরটি পুনরাবৃত্তি করল।

: এক-দুই লাখের আংটির জন্য তুমি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছ! ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে, ব্যাংক থেকে লোন নিতে কিংবা আমাকে বলতে!

: 'আমি লোন নিয়ে তাকে গিফট করতে চাচ্ছিলাম না। আর সেটা এক-দুই লাখের আংটি নয়। একটু বেশি দামি ছিল। এত টাকা আপনি আমাকে কখনোই দিতেন না।' সে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলে চলল।

: 'কত দাম হতো? চার-পাঁচ লাখ হতো? বলো, দশ লাখ হতো! আমি দিয়ে দিতাম।' সিকান্দার প্রচণ্ড মনঃক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। ওই ফ্ল্যাটটি পৌনে দুই কোটি টাকা মূল্যের। যেটা সে দেড় কোটিতে বিক্রি করে দিয়েছে।

: 'দশ লাখের ব্যাপার ছিল না।' সিকান্দার তাকে বলতে শুনলেন।

: 'তাহলে!' সিকান্দারের কপালে ভাঁজ দেখা দিল। সালার তার গলা পরিষ্কার

করল।

: '১৩.৭।' এটাই ছিল একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে সে এটির মূল্য তিন অঙ্কে প্রকাশ করতে পারছে।

: 'কী!' সিকান্দারের কিছুই বুঝে এলো না।

: '১৩.৭।' সালার পুনরায় গলা পরিষ্কার করে পূর্বের শব্দটিই বলল। সিকান্দার কয়েক মুহূর্ত শ্বাস নিতে পারলেন না। এই প্রথম তিনি তার কথা বুঝতে পারলেন।

: '১৩.৭ মিলিয়নের আংটি দিয়েছ তুমি তাকে?' তার মাথা যেন কাজ করা বন্ধ করে দিল। সালার টেবিলের উপরে পেপার-ওয়েটে আঙুল বোলাচ্ছে। 'সালার, তুমি তাকে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকার আংটি দিয়েছ?'

: 'জি।' সালার এবার চোখ তুলে সিকান্দারের দিকে তাকাল। সিকান্দার অবিশ্বাস্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সালার চোখ সরিয়ে ফেলল। সে এখন উনার পেছনে সাঁটানো পেইন্টিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রিভলভিং চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন সিকান্দার। এই মুহূর্তে সালারকে যদি কেউ 'বলদ' বলে, তাহলে ঠিকই বলবে।

: 'কোথেকে কিনেছ আংটি?' অবশেষে তিনি দীর্ঘ নীরবতা
ভাঙলেন।

: Tiffany. টিফ্যানি থেকে।

তিনি এমন কোনো ব্র্যান্ডের নামেরই প্রত্যাশা করছিলেন।

: ডিজাইন কেমন? এই দামের আংটি তো বিরল!

: 'জি jewellery statment.' সে টিফ্যানির সবচেয়ে দামি
রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত

জুয়েলারি কালেকশনের নাম বলল।

: 'তো এর চেয়ে দামি আংটি ছিল না আর? এখনো তো
আরেকটি ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। আরও চারটি হীরা বসিয়ে দিতে

ওতে।' সিকান্দার টেবিলের উপরের সিগার কেস থেকে সিগার
বের করতে করতে, অসম্ভব গম্ভীরভাবে তাকে বললেন।
সালারের ডান গালে টুল পড়ল। তার মানে, সে নিশ্চয় তার
হাসি চেপে রেখেছে। সিকান্দারের ধারণা তার এই হাসি
লজ্জাবোধ থেকে। উনার পায়ের নিচ থেকে নিশ্চিত মাটি সরে
যেত, যদি তিনি জানতে পারতেন যে, সে আগের দুটো ফ্ল্যাট
বিক্রি করে ইমামাকে একটি নেকলেস দেবার কথা ভেবেছিল।
কিন্তু তারপর তার আংটির খেয়াল এলো। যেটি ইমামা সবসময়
পরতে পারবে। তাই নেকলেসের প্ল্যানিং বাদ দিয়ে দেয়।

: আমি বইপত্রে যখন রাজা, ফরহাদ, রোমিও, মজনুদের
সম্পর্কে পড়ি, তখন মনে হয় এসব শুধু লোককথা। কোনো
পুরুষ এমন নির্বোধ হতে পারে না। কিন্তু তুমি তো আমাকে এটা
প্রমাণ করে দিলে, এটা সম্ভব। প্রতিটি যুগে, কোনো না কোনো
পুরুষ, কোনো না কোনো নারীর জন্য জ্ঞানশূন্য, নির্বোধ হয়ে
যেতে পারে।



সালার এই বেইজ্জতিকে মাথা নত করে মধুর ঢোকের মতো পান করে নিল। তাকে এতটুকু বেইজ্জতি করা তো সিকান্দারের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

: 'স্ত্রীর জন্য তো কেবল এক শাহজাহান অর্থ উড়িয়েছিলেন। আর সেটাও স্ত্রীর মৃত্যুর পর। কিন্তু তোমার কী হয়েছে?' সিকান্দার যেন তাকে লজ্জা দিলেন।

: 'আমি আসলে বিয়ের পর ইমামাকে কোনো উপহার দেইনি।' তার স্বরে ঈর্ষণীয় নিশ্চিন্ততা। সিকান্দার এই প্রথম তার নির্লজ্জ সাহসিকতায় মুগ্ধ হলেন।

: 'তাহলে নিজের টাকায় উপহার দিতে।' তিনি বিদ্রূপ করে বললেন।

: 'সেটাও দিয়ে দিয়েছি তাকে।' সে বিদ্রূপের জবাব গম্ভীরভাবে দিয়ে উনাকে হতভম্ব করে দিল। সিকান্দার এই বাদশাহর

মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেলেন, যে তার স্ত্রীর জন্য নিজের সাম্রাজ্য উজাড় করার শপথ নিয়ে বসে আছে। সিগার অ্যাশট্রেতে রাখতে রাখতে খানিক সামনে ঝুঁকে বন্ধুর মতো বললেন, 'সালার, এমনকী আছে ইমামার মধ্যে, যার জন্য তুমি এমন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললে?' এটা বিদ্রূপ নয়। তিনি সত্যিই জানতে চাচ্ছেন। সালার কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'ব্যস। তাকে ভালো লাগে আমার।'

এই মুহূর্তে সিকান্দারের কাছে সালারকে ত্রিশ বছরের যুবক নয়; বরং তিন বছরের অবুঝ বাচ্চা মনে হচ্ছে। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

: সে কি জানে এই আংটির মূল্য?

: না।

সিকান্দার খানিক অবাক হলেন। তাহলে এর পেছনে নিজের প্রিয়তমাকে প্রভাবিত কিংবা মুগ্ধ করারও কোনো আবেগ নেই।

: 'আপনিও মাস্মি অথবা অন্য কাউকে বলবেন না। আমি চাই না যে, ইমামা তা জানুক।' সে এখন উনাকে বলতেও নিষেধ করে দিচ্ছে।

: 'বাকি তেরো লাখ কী করেছ?' তিনি এখন আরও কিছু কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন।

: 'সাত লাখ ইমামার মোহর দিয়েছি। ওটা বাকি ছিল।' সে মোট মোহরের কথা গোপন রেখে বলল। 'বাকি ছয় লাখ আমি কিছু দাতব্য সংস্থায় দিয়ে দিয়েছি।'

সিকান্দারের রাগ ধোঁয়ার মতো উবে যেতে লাগল। রাগ করেও কোনো লাভ ছিল না। সালার তার পিতার ঠোঁটে একটি

স্নেহবৎসল, কিন্তু প্রচণ্ড অর্থময় মুচকি হাসি ফুটে উঠতে দেখল।

: 'আর মোহর তো শুধু সাত লাখ নয়, তাই না সালার? সেটাকত মিলিয়ন দিয়েছ?' তিনি অসম্ভব মমতামাখা গলায় বললেন। সালার অনাকাঙ্ক্ষিত হাসল।

: বাদ দিন পাপা!

: 'তার মানে মিলিয়ন?' উনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

: 'এখন আমি যাব?' সালার উত্তর না করে জিজ্ঞেস করল। সিকান্দার মাথা নাড়লেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে তার কাছে এলেন। সে ঝুঁকে সিকান্দারকে জড়িয়ে ধরল। তারপর সোজা হয়ে গেল।

: 'সালার, অপর ফ্ল্যাটের কাগজপত্র লাহোর পৌঁছে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।' সিকান্দার বললেন।

: 'পাপা! ট্রাস্ট মি।' সে বলল।

: শাটাপ!

: 'ওকে।' সে হাসতে লাগল। ২০

: 'Oh tiffany statement. ওহ টিফ্যানি স্টেটমেন্ট।'

ইমামা রাতে এক ডিনার অনুষ্ঠানে এলো। মিসেস জেভিয়ার তার আংটির দিকে খেয়াল করলেন। এই শব্দটি বিখ্যাত একটি ব্র্যান্ডের নাম। এটি তাদের পোশাক ও অলংকার কালেকশনের জন্য বিখ্যাত।

: 'আমার বিয়ের রিং।' ইমামা মুচকি হেসে বলল। তিনি ইমামার হাত ধরে মুন্কের মতো বলছিলেন। তার এমন ভঙ্গি টেবিলে উপবিষ্ট সমস্ত নারীকে এই রিংয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলল।

: The most beautiful and expensive picec of jewellery under this roof tonight. আজ রাতে এখানকার সবচেয়ে সুন্দর এবং মূল্যবান অলংকার এটি। লাকি উমেন! তোমার স্বামীর রুচি অনেক উন্নত।

এই প্রশংসামূলক বাক্যে ইমামা গর্বভরে মুচকি হাসল।

: 'এর মূল্য কেমন?' বাম পাশে বসা মিসেস জুবাইরও প্রশংসার ভঙ্গিতে বললেন।

: 'সঠিক বলতে পারছি না। হয়তো চার-পাঁচ লাখ।' ইমামা গ্লাস তুলে মুখে পানি নিতে নিতে অনুমান করল। মুহূর্তের জন্য সে

চারপাশে নীরবতা ছেয়ে যেতে দেখল। তারপর দেখল, তার ওপর নিবদ্ধ সকলের দৃষ্টি।

: ডলার নাকি পাউন্ড?

ইমামা অবাক হয়ে মিসেস জেভিয়ারের মুখের দিকে তাকাল। তারপর হাসতে লাগল। একে সে দুষ্টুমি মনে করল।

: 'আমার স্বামী এতটা নির্বোধ নয়।' ইমামা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল। মিসেস জেভিয়ার পুনরায় আর জিজ্ঞেস করলেন না। তিনি বুঝে নিলেন, ইমামা মূল্য বলতে চাচ্ছে না।

◇◇◇

: 'সালার, এই আংটির মূল্য কত?' রাতে বিছানায় বসে উপন্যাস পড়তে পড়তে ইমামার হঠাৎ মিসেস জেভিয়ারের প্রশ্নটি মনে পড়ল।

: 'কেন?' সেও অন্য একটি বই পড়তে পড়তে চমকাল। সবাই অনেক প্রশংসা করেছে।' ইমামা অসম্ভব গর্বভরে বলল।

: 'দ্যাটস গুড!' সালার মুচকি হেসে পুনরায় বইয়ের দিকে মনোযোগী হলো।

: মিসেস জেভিয়ার মূল্য জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি, চার-পাঁচ লাখ হবে। তিনি বললেন, ডলার নাকি পাউন্ড? আমি, আমি বলেছি, আমার স্বামী এতটা বোকা নয়।

সালার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হাসতে লাগল।

: 'কী হলো?' ইমামা চমকাল।

: 'কিছু না। কিছু একটা পড়ছিলাম।' সালার সাথে সাথে বলল।

: 'তাহলে এর দাম কত?' ইমামা পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

: 'এটা অমূল্য।' সালার তার হাত ধরে বলল। 'যা কিছু তোমার হাতে থাকবে, তা-

ই অমূল্য।'

: 'তবু!' ইমামা পীড়াপীড়ি করল।

: 'টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স।' সালার সাথে ডলার উল্লেখ করল না।

: 'ও আচ্ছা, আমি আরও দামি মনে করেছিলাম।' সে খানিক নিশ্চিত হয়ে, পুনরায় উপন্যাস পড়তে লাগল। সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে ধোঁকা দেওয়া, সাত্বনা দেওয়া অনেক সহজ। ইমামা কয়েক মুহূর্ত পর তার চেহারায়ে সালারের দৃষ্টি অনুভব করল।

: 'কী হলো?' ইমামা হেসে ফেলল। সে এই দৃষ্টিতে অভ্যস্ত।

: তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম।

: কী?

: You are the best thing ever happened to me. তুমি আমার জীবনের সেরা উপহার।

ইমামা মুহূর্তের জন্য অবাক হলো। তারপর হাসতে লাগল।
'আই লাভ ইউ।'

ইমামা আবারও হেসে উঠল এবং লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ!' উত্তর সেটাই এলো, যেটা সবসময় আসে। এবার সালার হাসতে

লাগল।

২১

: 'ইমামা!'

গাড়ির দরজা বন্ধ করতে করতে চমকে পেছনে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে জালাল। পার্কিং এরিয়ায় ইমামাকে বের হতে দেখে সেও থমকে গিয়েছিল।

: 'ও মাই গড! আমি ভাবতেও পারিনি, আজ তোমার সাথে এখানে দেখা হয়ে যাবে। হাউ আর ইউ?' জালাল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। ইমামা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকল। কিছু জিনিস বিপদের মতো মানুষের পিছু নিতে থাকে। যেখানেই পায়, মানুষের রক্ত শুষে নেয়। মুঠোতে গাড়ির চাবি চেপে ধরে, ইমামাও হলুদাভ চেহারা় তার দিকে তাকিয়ে রইল। জালাল জানে না, সে

এখনো তার রক্ত চুষে নেওয়ার সক্ষমতা রাখে। 'দেখা হয়নি তো বহু বছর হয়নি। আর এখন হচ্ছে তো, একই বছরে দুবার হয়ে গেল।' ইমামা মনে মনে ভাবল।

জালাল তার স্তম্ভিত চেহারার দিকে না তাকিয়ে, আন্তরিক বন্ধুর মতো কথা বলতে লাগল। ইমামা অবশেষে মুচকি হাসার চেষ্টা করল। এটা প্রয়োজন ছিল, অত্যন্ত প্রয়োজন। জালালের চেয়ে বেশি নিজের জন্য। সে তাকে না পুরোনো বন্ধু মনে করতে পারে, আর না তার সাথে আন্তরিক হতে পারে। তাকে দেখতেই তার মনে কেবল একটি সমন্ধ ও সম্পর্কের কথাই মনে পড়ল। সেই একটি কথাই মনে আসতে পারে।

: 'আমি ঠিক আছি। আপনি কেমন আছেন?' ইমামা মুচকি হাসার চেষ্টা করল। দৃষ্টি তো সে এখনো তার সাথে মেলাতে পারবে না। জালাল অমনই আছে, যেমন শেষবার ক্লিনিকে দেখেছিল। ওজন একটু বেড়ে গিয়েছে, হেয়ার লাইন একটু পেছনে চলে গিয়েছে। কিন্তু চলমান জীবনে যে ভাবমূর্তি ও

পদমর্যাদা বহন করে চলছে, তাতে এ দুটো জিনিসে তার কিছু যায়-আসে না।

: আমি তো একদম ঠিক আছি। আমি কয়েক মাস আগে বিয়ে করে নিয়েছি।' জালাল বুঝতে পারল না, তাকে এই সংবাদ দেওয়া এত জরুরি মনে করল কেন। এর সাথে কি ইমামার কোনো সম্পর্ক আছে? নাকি তার সাথে গভীর আলোচনায় যাওয়ার আগেই তাকে এটা জানিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, সে এখন অ্যাভেইলেবল নেই।

ওই শেষ দেখায় ইমামাকে সে যা বলেছিল, তারপর সে অ্যাভেইলেবল হলেও তার অন্তত এতটুকু আত্মমর্যাদা তো আছে। নাকি জালাল নিজেকে তার কাছে প্রয়োজনীয় হিসেবে তুলে ধরতে চাচ্ছে? আর যদি চেয়েও থাকে, তাহলে ভুল কী! ভুল তো তারই। নয়তো এভাবে জালালের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মতো করে, অনুনয়-বিনয় করতে না গেলে, আজ তার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত। ইমামানিজেকে

তিরস্কার করতে লাগল। তার নীরবতা জালালকে আরও কিছুটা সতর্ক করে দিল।

: 'অনেক ভালো আমার স্ত্রী। সেও ডাক্তার। সে ব্রিটিশ নাগরিক। স্পেশালাইজেশনও সেখান থেকেই করেছে। অসাধারণ অবস্থান!' সে চার বাক্যে তার স্ত্রীর অবস্থান স্পষ্ট করে দিল। এক মুহূর্তের জন্য ইমামা ভুলে গেল, সেও কারও স্ত্রী। তারও পায়ের নিচে মাটি আছে। জালালের মুখে অন্য কোনো নারীর ব্যাপারে 'আমার স্ত্রী' শব্দের ব্যবহার কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে বিদীর্ণ করে ফেলল।

: 'শুভকামনা রইল।' ইমামা অবশেষে সেই শব্দ বলল, এই মুহূর্তে যা তার বলা উচিত।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার কাছে তোমার যোগাযোগ নম্বর থাকলে, অবশ্যই তোমাকে আমন্ত্রণ করতাম। প্রথমবার তো জানাতে পারিনি। কিন্তু পরেরবার তো জানাতে পারতাম।' কথা বলতে

বলতে জালাল যেন ঠাট্টা করল। ইমামা এবার মুচকি হাসতেও পারল না। সে কখনো তার এই ঠাট্টায় হাসতে পারে না। 'তারপর তো তুমি আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করোনি। কোনো ফোনকল, কোনো দেখাসাক্ষাৎ, কিছুই না। আমি তো শুধু অপেক্ষাই করতে থাকলাম।' সে এখন তাকে নিয়ে মন্তব্য করছে। এতে জালাল তার মধ্যকার সংঘটিত পরিবর্তনও উপলব্ধি করছে।

এই ইমামা সাত-আট মাস আগের ইমামা থেকে অনেক আলাদা। সে এখনো আগের মতোই একটি চাদর আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু তার চাদর ও পোশাক এখন অসম্ভব নিখুঁত ও মূল্যবান। যদিও সে আগের মতোই সাধারণ পোশাকেই রয়েছে। তার হাত ও কানে পরিহিত অলংকার জালালকে এক মুহূর্তের জন্য চমকে দিল। তার ওয়েডিং ফিঙ্গারে একটি আংটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এটি তার কাছে মিথ্যা ভ্রম মনে হচ্ছে। এর সত্যতা সে জানতে চাচ্ছে না। কিন্তু কেন? জানা নেই কেন। এটি সেই চেহারা নয়; যা সে তার ক্লিনিকে শেষবার দেখেছিল।

সেদিন মেকআপহীন চেহারা় ইমামাকে বেশ ভীত, আতঙ্কিত, দ্বিধাশ্রিত এবং মর্মান্বিত লাগছিল। এখন সামনে দাঁড়ানো ইমামার চেহারা়ও মেকআপ নেই। আর তার চুলগুলোও সাধারণভাবে আলাগা করে পিঠের নিচের দিকে বেঁধে রেখেছে। গলার পেছনের অংশে তা দেখা যাচ্ছে। এমন যেন ছুট করে সে কোনো কাজে বাসা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চেহারা ও চোখে একটি চমক খেলা করছে। তার ভঙ্গিমা দশ-বারো বছর পূর্বের ইমামার মতোই। সেই ইমামার মতোই, প্রথম দেখায় যার প্রতি সে আকর্ষিত হয়েছিল। উদাসীন, অমুখাপেক্ষী; কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্ত। এক পলকেই জালালের উপলব্ধি হয়ে গেল, ইমামা হাশেম অনেক বদলে গিয়েছে। কীভাবে এবং কেন? ভেবে ভেবে সে খানিক অস্থির হলো। তার পেছনে দাঁড়ানো মূল্যবান গাড়িটির দিকে তাকিয়ে, জালাল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখনো সেই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি করো?' জালালের মনে আকাজক্ষা জাগল, হায়! তার মধ্যকার আগত পরিবর্তনগুলো যদি কোনো বোনাস, কোনো মোটা বেতনের বদৌলতে হতো!

নীচ আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু জালালুন নসরের এই মুহূর্তে এই আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে। পুরুষ তার ত্যাগকৃত নারীর উন্নতি দেখে অপমানিত বোধ করে। আর জালাল সেই বোধ থেকে বাঁচতে চাচ্ছে।

: 'না, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।' সে মৃদুস্বরে বলল।

নিই। স

উপায়

: 'ও আচ্ছা!' জালাল বিড়বিড় করল।

: তাহলে তুমি আজকাল কিছুই করছ না?

ইমামা কয়েক মুহূর্ত চুপ রইল। পরবর্তী বাক্যটি বলা অনেক কঠিন; কিন্তু অত্যন্ত জরুরি।

: 'আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।' সে এখনো এটা বলতে পারেনি যে, আমি বিয়ে করে নিয়েছি। মুহূর্তের জন্য জালালের চেহারা থেকে মুচকি হাসি উধাও হয়ে গেল।

তা

: 'ওহ আচ্ছা! কনগ্রাচুলেশন!' সে সময়মতো নিজেকে সামলে নিল। ইমামা তার গলার দোদুল্যমানতা লক্ষ করল না।

: তুমি বললেও না, দাওয়াতও দিলে না। কী করে সে?

: 'আপনি তাকে চেনেন। সালার সিকান্দার।' ইমামা গলা পরিষ্কার করে বলল।

: 'ওহ!' এক মুহূর্তের জন্য জালালের কাছে বলার মতো কিছু রইল না।

: 'সে একজন ব্যাংকার। আমি তাকে চিনি।' জালাল তার কথা
থামিয়ে, তাকে সালারের ব্যাংক এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে
বলতে লাগল।

: 'আপনি কীভাবে চেনেন?' ইমামা অস্থির হলো।

: 'অর্ধেক শহর তোমার স্বামীকে চেনে। বিজনেস কমিউনিটির
সাথে আমার যথেষ্ট ওঠাবসা আছে। সে হিসেবে তার সম্পর্কে
আলোচনা কানে আসে। দু-চারবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও দেখেছি
তাকে। কিন্তু কথা হয়নি।' জালাল এখন স্বাভাবিক হচ্ছে। এছাড়া
আর কোনো উপায়ও নেই। 'চলো, লাঞ্চ করি। গল্পস্বল্প করব।
এতদিন পর দেখা। অনেক কথা বলার আছে।' জালাল উচ্ছ্বসিত
ও অন্তরঙ্গ হয়ে বলল।

সে শহরের ব্যস্ত এবং দামি ডাক্তারদের একজন। পুরোনো
প্রেমিকার জন্য সময় বের করা তার কাছে অনেক জটিল! কিন্তু

শহরের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যাংকারের স্ত্রীর জন্য সময় বের করা কঠিন কিছু নয়। ইমামা হাশেম যেন তার সামাজিক অবস্থান উন্নত করার জন্য একটি সুদৃঢ় ও আকাঙ্ক্ষিত মাধ্যম হিসেবে সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

: 'না, আমি বাজার-সদাইয়ের জন্য এসেছি। রাতের খাবারের জন্য কিছু জিনিস কিনতে হবে।' ইমামা তাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তার বিশ্বাস ছিল, জালাল তাকে পীড়াপীড়ি করবে না। জালালের ব্যাপারে তার ধারণা আজও ভুল প্রমাণিত হলো।

: 'ইয়ার! বাজারও হয়ে যাবে। আমি নিজেই করিয়ে দেব। কিন্তু আগে লাঞ্চ করে নিই। সামনে রেস্টুরেন্ট, এক ঘন্টার ভেতরে লাঞ্চ শেষ হয়ে যাবে।' জালাল তাকে কথা পূর্ণ করতে দিল না।

: 'আমি....।' ইমামা কিছু বলতে চাইল। কিন্তু জালাল কিছু শোনার অবস্থায় নেই। উপায়ান্তর না দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার সাথে রেস্টুরেন্টে চলে এলো।

: 'তো স্বামীর সাথে জীবন কেমন কাটছে?' মেন্যু অর্ডার করতেই জালাল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে জিজ্ঞেস করল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকাল। এটা কেবল প্রশ্নই নয়, তাকে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে সে, ভালো থাকতে পারে কি না, সেই জিজ্ঞাসাও।

: অনেক ভালো কাটছে। সালারের সাথে আমি অনেক সুখী।

জালালের অবাক লাগল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কতটা সহজ করে দিয়েছে সালার! কিছু খোঁজা, হাতড়ানো কিংবা গোপন করার প্রয়োজন হয়নি। সে তার সাথে 'সুখী' আছে।

: গুড! অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ তো হয়নি হয়তো? সালার আর তুমি নিজেদের ইচ্ছাতেই করেছ হয়তো।

সে জালালের চেহারা পড়তে চেষ্টা করল। এই প্রশ্ন করে সে কী জানতে চায়?

: 'হ্যাঁ, সালার নিজ ইচ্ছাতেই আমাকে বিয়ে করেছে। তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করেনি। তবে জানিয়েছিল। সালারের চিন্তা-দর্শন হলো, বিয়ের সময় পুরুষের নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, পরিবারের নয়।'

এতে জালালের চেহারার রং উবে গেল। ইমামা নিজেও কয়েক মুহূর্তের জন্য পরবর্তী বাক্য বলতে পারল না। সে এই শেষ বাক্যটি কোন সূত্রে এবং কেন বলেছে, এর কারণ এই মুহূর্তে সে নিজেও বুঝতে পারছে না। সে এখানে তাকে তাচ্ছিল্য করতেও আসেনি, আর না কোনো অভিযোগ করতে। তবু কেন এমন কথা!

: 'অনেক উদার চেতনার অধিকারী সে।' কয়েক মুহূর্ত পর জালালকে সে যেন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল। ব্যাখ্যা আগের বাক্যের চেয়ে জালালকে অধিক বিদ্ধ করল।

: 'বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনকারী স্বামীর প্রশংসা করবে স্ত্রী, এটাই স্বাভাবিক।' এবার জালালের হেসে হেসে বলা কথাটি ইমামাকে বিদ্ধ করল।

ওপর ফরজ। : লক্ষ লক্ষ টাকার কথা তো আমি জানি না। তবে ভালো স্বামীর প্রশংসা করা স্ত্রীর

জালাল তার কথা উপেক্ষা করে হেসে বলল, 'তাহলে তার লক্ষ টাকার খোঁজ শুরু করো এখন থেকে। কেমন স্ত্রী তুমি? দেড়-দুই কোটি টাকা তো বছরে আয়ই করে। অনেক বড় বড় কোম্পানিকে নিয়ে কাজ করছে সে। তোমাকে বলে না?'

: 'না, আমরা অন্যান্য বিষয়ে কথা বলি। বিভিন্ন জরুরি বিষয়ে। একেবারে স্বাভাবিক স্বরে বলল ইমামা। কিন্তু জালালের পেটে যেন গিঁট পড়ল। সে জোরে হাসতে লাগল। কখনো কখনো হাসি প্রচণ্ড দরকারি হয়ে ওঠে।

: 'চালাক পুরুষের জন্য এমন স্ত্রীরই দরকার। তোমরা থাকছ কোথায়?' সে ঘাতক হয়ে জুতা মেরে, অবুঝ হয়ে প্রশ্ন করল। ইমামা তার মন্তব্যের জবাবে কিছুই না বলে, তার ঠিকানা বলল। তার সাথে সে সালারের ব্যাপারে আর কথা বলতে চাচ্ছে না।

: 'ওহ, অ্যাপার্টমেন্ট! আর সেটাও ভাড়ায়! কোথাও বাড়ি করা দরকার ছিল তোমাদের। তোমরা আগ্রহী হলে আমার দু-তিনটি বাড়ি আছে, ভালো অভিজাত এলাকায়। তোমরা ভাড়া নিতে পারো।' জালাল উদার প্রস্তাব জানাল।

: 'না, না, দরকার নেই। আমরা ওখানেই ভালো আছি।' ইমামা বলল। জালাল এখন তার বাড়ির বর্ণনা দিতে লাগল। আয়তন,

তার নকশা এবং দুনিয়ার বিবিধ প্রান্ত থেকে সংগৃহীত সমস্ত জিনিস দিয়ে বাসা কীভাবে সাজিয়েছে, তার বিস্তারিত বয়ান।

: 'তুমি সালারকে নিয়ে একদিন আমাদের বাসায় বেড়াতে এসো না!' কথা বলতে বলতে সে এমনভাবে বলল, যেন তারা সত্যিই কেবল বন্ধু, আর বন্ধু হিসেবেই থাকবে। ইমামা কিছুই বলতে পারল না। যদি সে অনুভূতিহীন হয়ে থাকে, তাহলে তা মাত্রাতিরিক্ত। আর যদি নিষ্ঠুর হয়ে থাকে, তাহলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ের!

: 'ওহ, জালাল সাহেব, দেখুন! কোথায় এসে আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল।' একজন অর্ধবয়সি লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জালালকে দেখে তার সাথে কথা বলতে লাগল। ইমামা চমকে ওই লোকটির দিকে তাকাল।

: 'ইনি কি ভাবি?' লোকটি তারপর জালালকে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, এ আমার এক পুরোনো বন্ধু।' জালাল তাৎক্ষণিক আগে আগেই বলে ফেলল। ইমামা ওই লোকটির চোখে তার প্রতি সম্মানের একটি ঝলক এসে, জালালের মুখে তার পরিচিতি শোনার পর পুনরায় তা মিলিয়ে যেতে দেখল। তাকে হ্যালো বলে লোকটি পুনরায় জালালের সাথে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে এবং তার স্ত্রী ইমামার প্রতি দ্বিতীয়বার আর তাকাল না। ইমামার অস্থিরতা হতে লাগল। সে বুঝতে পারছে, জালালের এমন অসম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে লোকটি তার ব্যাপারে কী ভাবছে। জালালের কোনো গার্লফ্রেন্ড, কোনো টাইম পাস, কোনো ডেট গার্ল, কিংবা তার হাসপাতালে কর্মরত কোনো ডাক্তার অথবা নার্স-সময় কাটানোর জন্য জালাল যাকে লাঞ্চে নিয়ে এসেছে।

: 'জালাল, এখন আমি যাই। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।' ইমামা বুঝতে পারছে না, তার হঠাৎ কী হচ্ছে। সে তার ব্যাগ উঠিয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। জালালের সাথে বসা ওই দম্পতিও চমকাল।



: 'না, খাবার প্রায় এসেই পড়ছে। খেয়ে বের হই।' জালাল বলল।

: না, বাজার করে আমাকে রান্নাও করতে হবে। তাছাড়া আমার স্বামী বাসায় পৌঁছার আগেই তো তার খাবার রেডি করতে হবে। এমনিতে সে আজ বিশেষ কিছু আইটেম রান্না করতে বলেছে।

ইমামার কথা শুনে মিস্টার ও মিসেস ফারুক এবার মুচকি হেসে তার দিকে তাকাল। ইমামাও প্রত্যুত্তরে মুচকি হাসল। সে 'স্বামী' শব্দটি কেন ব্যবহার করল? তা সে জানে না। হয়তো এই দম্পতির চোখে সম্মানের এই ঝলক পুনরায় দেখার জন্য। যে সম্মান একটু আগে জালালের স্ত্রী ভেবে তাদের চোখে ঝলকে উঠেছিল। ইমামার ভঙ্গি এবার এতটাই চূড়ান্ত যে, জালাল আর পীড়াপীড়ি করতে পারল না।

: 'আচ্ছা, সালারের কোনো ভিজিটিং কার্ড আর তোমার কন্ট্রাক্ট নম্বর তো দিয়ে যাও।' সে ইমামাকে বলল। তার ব্যাগে সালারের

কিছু কার্ড ছিল। একটি কার্ড বের করে জালালের সামনে টেবিলে রাখল। 'তোমার ফোন নম্বরও লিখে দাও।'

ইমামা এক মুহূর্ত উশখুশ করল। তারপর ওই কার্ডের পেছনেই ফোন নম্বর লিখে দিল। জালালের পাশে দাঁড়ানো লোকটি ততক্ষণে কার্ডে সালারের নাম পড়ে ফেলেছে।

: ওহ, আপনি সালার সিকান্দারের স্ত্রী?

লোকটির প্রশ্নে সে প্রচণ্ড চমকে উঠল।

: 'ফারুক সাহেবও ব্যাংকার। সালারকে চেনেন হয়তো।'
জালাল দেরি না করে সাথে সাথে বলল।

: 'অনেক ভালো করে।' লোকটির ভঙ্গি এখন পরিপূর্ণ বদলে গেল। সে একটি স্থানীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ

হিসেবে আছে। লোকটি এখন ইমামাকে তার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করাল। 'আপনার স্বামী অনেক ব্রিলিয়ান্ট ব্যাংকার।'

ইমামা মিসেস ফারুকের সাথে হাত মেলাচ্ছে, সেই মুহূর্তে মিস্টার ফারুক সালারের ব্যাপারে প্রশংসামূলক বাক্যটি উপস্থাপন করল। 'তিনি কয়েক মাস আগে আমাদেরকে তার বিয়ের 'ওয়েডিং রিসেপশন' ফারুক এখন অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলছে। এদিকে ইমামার প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত। সে বুঝে উঠতে পারছে না, তারা সালারের কতটা কাছের লোক। নাকি কেবল সামাজিক পরিমণ্ডলের অংশবিশেষ। যাইহোক, ওখানে জালালের পাশে বসে স্বামীর কোনো পরিচিত মানুষের সাথে দেখা করা, তার জীবনের সব থেকে অস্বস্তিকর মুহূর্তের একটি।

সম্পর্ক। ব্যস, মাঝখানে কিছুদিন আমরা যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিলাম। দশ-বারো বছর : ইমামা ও সালারের সাথে আমার অনেক গভীর বন্ধুত্ব। বরং পারিবারিক তো হয়ে গেছে আমাদের বন্ধুত্বের। তাই না ইমামা?



ইমামার বুঝে এলো না, সে কী বলে চলছে। সে খানিক অস্থির হয়ে জালালের দিকে তাকাল।

: 'ভেরি নাইস! আপনি কোনোদিন সালারকে নিয়ে আমাদের দিকে আসুন।' ফারুক মুচকি হেসে বলল।

: 'অবশ্যই। তবে সালার ইদানীং একটু ব্যস্ত।' ইমামা খানিক ইতস্তত করে মুচকি হেসে বলল। কিছুক্ষণ আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা শেষে, তাদের খোদা হাফেজ বলে ইমামা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু তার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে রইল। সময় আরও একবার এগারো বছর পেছনে চলে গেল। সেই মেডিকেল কলেজে। তারপর, বহু বছর বছর পর জালালের সাথে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎ। আর আজ পুনরায় তার মুখোমুখি।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কী কিনতে এসেছে সে, তা ভুলে গেল। ট্রলি নিয়ে সে এক শেলফ থেকে আরেক শেলফের দিকে

যেতে থাকল। হঠাৎ খালি ট্রলিতে চোখ যেতেই সে হড়বড় করে ভাবতে লাগল, সে কী কিনতে এসেছে। কিন্তু মস্তিষ্কের আয়নায় কিছুই উদয় হলো না। উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু জিনিস নিয়ে বাইরে চলে এলো। জালালের গাড়ি এখন ওখানে নেই। তার গাড়ির সামনের জায়গাটা ফাঁকা। জানা নেই, তার কেন এ প্রত্যাশা ছিল যে, রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে জালাল তার জন্য এখানে অপেক্ষা করবে। অন্তত এতটুকু অপেক্ষা তো করত, সে নিজে তাকে বিদায় জানাতে আসত। জালালের প্রতি তার সুধারণা হচ্ছে না। তারপরও এতটুকু ভদ্রতা তো তার কাছে প্রত্যাশা করতেই পারে।

পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে, তার হঠাৎ উপলব্ধি হলো, তার মন বাসায় ফিরতে চাচ্ছে না। তারপর তার হঠাৎ কিনতে আসা জিনিসগুলোর নাম মনে পড়তে লাগল। কিন্তু পুনরায় সে কোনো গ্রোসারি শপে যাওয়ার মানসিকতায় নেই। ভর দুপুরে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে, সে নিজেও বুঝতে পারছে না, কোথায় যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, সে ভুল টার্ন

নিয়েছে। আর রাস্তা ভুলে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পর তার উপলব্ধি হলো, সে অনুভূতিশূন্যভাবে সালারের অফিসের দিকে ছুটে চলছে। এটা ছিল অত্যন্ত বোকামিপূর্ণ কাণ্ড। সে এখন মল রোডে রয়েছে। অন-ওয়ের কারণে পেছনেও যেতে পারবে না। ইউটার্ন নিতে গেলে তার অফিস অতিক্রম করেই নিতে হবে। এক সিগন্যালে একটি বড়োসড়ো জ্যামে আটকাল সে। তার কাছে এখন এই পথ ও নিজের জীবন; দুটোই সুদীর্ঘ মনে হচ্ছে। দেড় ঘণ্টা আগেও সে সালারের সাথে ভালো ছিল। কিন্তু এখন সে ভালো নেই।

এসি ঠান্ডা হতে সমস্যা করতে লাগল। সে এসি বন্ধ করে দিল। জীবনে কিছুক্ষণ সে 'উত্তপ্ততা'ই চাচ্ছে। জালালুন নসর যেন তার জীবনের একটি ক্ষত। যেখানে প্রতিবার টোকা লাগতেই রক্ত ঝরতে শুরু করে। আর প্রতিবারই তার এই ভুল ভাঙে যে, এ জখম এখনো সারেনি।

গাড়ি বন্ধ হয়ে পড়েছে, অথচ সিগন্যাল খুলে গিয়েছে। অসংখ্য হর্নের শব্দে সে চমকে গাড়ি স্টার্ট করার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হলো। সেইসাথে প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ল। চেষ্টা সত্ত্বেও গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। সে দক্ষ ড্রাইভার নয়। তাছাড়া পেছনে একসাথে এতগুলো গাড়ির হর্ন যেকোনো দক্ষ ড্রাইভারকেও জ্ঞানশূন্য করে দিবে। একজন ট্রাফিক পুলিশ তার কাছে এলো।

: 'গাড়ি সমস্যা করছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।' ইমামা তাকে বলল।

: 'তাহলে তো এটা লিফটার দিয়ে সরাতে হবে। আর নয়তো জ্যাম বেঁধে যাবো।' ট্রাফিক পুলিশ তাকে বলল। সিগন্যাল ততক্ষণে পুনরায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ ওয়্যারলেসে লিফটার নিয়ে আসতে বলল। এদিকে ইমামা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে বারবার স্টার্ট করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ব্যর্থ হলো।

লিফটর আসতেই সে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। লিফটারে বসা লোকটি কার গাড়ি নিকটবর্তী পার্কিংয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে, কোনো রিকশা বা টেক্সি ধরে তাকে ওখানে যেতে বলে উধাও হয়ে গেল। মল রোডে এই জ্যামের মধ্যে কোনো রিকশা বা টেক্সি পাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, একমাত্র কাজ, যা সে করতে পারে, তা হলো-সে রাস্তা পার হয়ে একটু দূরে সালারের অফিস পর্যন্ত যেতে পারে। অনুভূতি শূন্যভাবে সে মল রোড পার হয়ে সালারকে কল করতে লাগল। সালারের ফোন বন্ধ। তার মানে এখন তাকে তার অফিসে যেতে হবে। আরও কয়েক মিনিট হাঁটার পর তার জুতার বেল্ট ছিঁড়ে গেল। আজকের দিনটা শুধু খারাপ নয়, সবচেয়ে খারাপ। ঘামে ভেজা শরীর ও ছেঁড়া জুতা হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুনরায় কোনো রিকশা বা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। এই ছেঁড়া জুতা নিয়ে সে তার অফিসে যেতে চাচ্ছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা ছাড়া তার কাছে আর কোনো উপায়ও নেই। নিজের অবস্থা দেখে তার কান্না পাচ্ছে কিন্তু এই কান্নার কারণ, তার বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে ভেতরগত মানসিক অবস্থাই বেশি। এই মুহূর্তে সে এতটাই মনঃক্ষুণ্ণ।

তার ব্যাংকের জাকজমকপূর্ণ এই ভবনের সামনে জুতা হেচড়ে যেতে, এক মুহূর্তের জন্য সংকোচবোধ করল। কিন্তু তারপর তার মাথায় এলো, সে সোজা তার অফিসে চলে যাবে।

অফিসে পৌঁছে দারোয়ানের কাছে নিজের পরিচয় দিতেই, দারোয়ানের চোখের হতভম্বতা ও অবিশ্বাস্যতা তার আত্মসম্মানে আরও কিছুটা আঘাত করল। কিন্তু মৃদ রিসেপশনে পৌঁছাতেই তার আত্মসম্মান পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল। জাকজমকপূর্ণ অভ্যন্তর-সজ্জা-সম্পন্ন বিশাল ও বিস্তৃত মার্বেল পাথর-নির্মিত হল এই মুহূর্তে স্যুটেড, বুটেড কর্পোরেট গ্রাহকে ভরপুর। অফিসের এই চিত্র আগে তার মাথায় এলে, সে কখনো এখানে আসত না। কিন্তু এখন তো এসে পড়েছে। ছেঁড়া জুতা ফ্লোরে ঘষতে ঘষতে নিজেকে নিজের কাছে প্রচণ্ড অসহায় মনে হচ্ছে তার। রিসেপশন কাউন্টারে সে সালার সিকান্দারের সাথে তার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করার মতো বোকামি করল না।

: 'আমি সালার সিকান্দারের সঙ্গে দেখা করতে চাই'
রিসেপশনিস্ট তাকে জিজ্ঞেস করতেই, সে বলল। আগে যদিও
রোদের কারণে উত্তপ্ত ঘামছিল, এখন ঘামছে এই পরিবেশের
কারণে এবং এটি শীতল ঘাম।

: 'আপনি কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন, ম্যাডাম!'
রিসেপশনিস্ট অত্যন্ত পেশাদার ভঙ্গিতে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস
করল। তার মস্তিষ্ক এক মুহূর্তের জন্য শূন্য হয়ে গেল।

: 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট!' সে অস্থির হলো। উত্তরের পরিবর্তে সে
হাতের ফোন নিয়ে আরেকবার তাকে কল করার চেষ্টা করল।
এবার কল কানেক্ট হলো, কিন্তু রিসিভহলো না।

: 'আমি তার বন্ধু।' সে কল কাটতেই এলোমেলোভাবে বলল।

: 'এখন তিনি একটি মিটিংয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনাকে জানাচ্ছি। আপনার নাম?' রিসেপশনিস্ট বলল।

: 'ইমামা।' সে তার নাম বলে হলের একপাশে সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। তাকে প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। হাতে হাত বেঁধে বসে বসে মানুষের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে এই মুহূর্তটি তার কাছে অনেক দীর্ঘ মনে হলো।

পনেরো মিনিট পর সে কয়েকজন লোকের সাথে কথা বলতে বলতে সালারকে রিসেপশনে উদয় হতে দেখল। ইমামা তার থেকে অনেকটা দূরে বসে আছে। সালার আশেপাশে না তাকিয়ে ওই লোকগুলোর সাথে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত গেল। মুহূর্তের জন্য ইমামার ভয় হতে লাগল, সালার আবার ওদের সাথে বাইরে না চলে যায়! দরজার একটু আগেই সে তাদের সাথে হাত মেলাতে লাগল। তাদেরকে এগিয়ে দিতে এখানে এসেছে সে।

দরজায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট তাদের সাথে কথা বলে, এদিক-সেদিক না তাকিয়ে, বড় বড় কদম ফেলে পুনরায় ফিরে যেতে লাগল। রিসেপশনিস্ট তাকে থামাল। সে হয়তো দূরের সোফায় বসে থাকা ইমামাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। আর নয়তো সে সালারকে ওখানে থামিয়ে তার কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ব্যাপারে সংবাদ দিত না। ইমামা সালারকে রিসেপশনিস্টের কথা শুনে থমকে যেতে দেখল। সাথে সাথে বেঁকে পেছন ফিরে তাকাল। ইমামা অনেকটা দূরে। কিন্তু এতটা দূরে নয় যে, সে তাকে দেখতে বা দেখে চিনতে পারবে না। এতদূর থেকেও সে সালারের চেহারা অস্থিরতা দেখতে পেল। তারপর মুচকি হাসল। সোজা হয়ে সে রিসেপশনিস্টের কাছে নিশ্চয় তার পরিচয় দিয়েছে। তারপর ওখানে না দাঁড়িয়ে সোজা তার কাছে এগিয়ে এলো। সে যদি বাসায় তার মুখোমুখি হতো, তাহলে সালারকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চাদের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ত- এখন এমনই এক মানসিক অবস্থায় আছে। কিন্তু সে এখানে এমন করতে পারছে না।

'What a pleasant surprise. বাহ কী চমক!' সালার কাছে আসতে আসতে বলল। সে অত্যন্ত প্রফুল্ল মুড়ে আছে।

: 'আমার জুতা ছিঁড়ে গেছে।' সে এলোমেলো উত্তর করল। সালারের চোখাচোখি না হয়ে মাথা নত করে বলল। সে চাচ্ছে না যে, সালার তার চোখ পড়ুক। কারণ সে জানে, সালার তার চোখ খোলা কিতাবের মতো পড়তে পারে। 'সামনের সিগন্যালে আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। লিফটর এসে তা কোথাও নিয়ে গিয়েছে। এখানে তোমার অফিস ছিল বলে, চলে এসেছি। কিন্তু হয়তো না আসাই উচিত ছিল। কারণ, তুমি ব্যস্ত। এখন ব্যস্ত তুমি, আমাকে একটু বাসায় পাঠিয়ে দাও।' প্রত্যুত্তরে সে একের পর এক সমস্যা জানাতে জানাতে, তাকে অগোছালো ভঙ্গিতে বলে চলল।

: 'নো প্রবলেম।' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তাকে সান্ত্বনা দিল।

: 'সরি ম্যাম! আপনি আপনার পরিচয় দিলে, আপনাকে অফিসে বসিয়ে দিতাম।' ডেস্কে বসা মেয়েটি তার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করল।

: 'ইটস ওকে। কাউকে পাঠিয়ে কাছের কোনো সু-স্টোর থেকে এই সাইজের জুতা আনতে বলো।' সালার মেয়েটিকে বলল। তারপর পরবর্তী বাক্যটি বলল ইমামাকে। 'ইমামা, এ ছেঁড়া জুতা খুলে ফেলো।'

: 'খুলে ফেলব?' সে ইতস্তত করল। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই। আমার বাথরুমে অজুর স্লিপার আছে। ওগুলো পরেই পা ধুয়ে নিয়ো। ততক্ষণে নতুন জুতা চলে আসবে। আর কোন সিগন্যাল থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছে?'

ইমামা তাকে অনুমানে বলল। সালার ডেস্ক থেকে আগত মেয়েটিকে গাড়ির নম্বর বলে, কিছু নির্দেশনা দিল। ইমামা ততক্ষণে ছেঁড়া জুতা পা থেকে খুলে ফেলেছে। তার হাত

মুঠোয় পুরে ধরে, তাকে ওখান থেকে নিয়ে এলো। তার হাতের ছোঁয়ায় ইমামার উপলব্ধি হলো, এই মুহূর্তে তার এই আশ্রয়েরই প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল। এক পায়ে জুতা না থাকা সত্ত্বেও, সে অত্যন্ত সাবলীলভাবে হাঁটতে হাঁটতে তার অফিস রুমে চলে এলো।

অফিসে যেতে যেতে সালার মুখোমুখি হওয়া সব কর্মীর সঙ্গে অত্যন্ত শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে, করিডোর অতিক্রম করে অফিস রুমে চলে এলো।

: 'তাছাড়া তুমি এদিকে এলে কীভাবে?' অফিস রুমের দরজা বন্ধ করতে করতে ইমামাকে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি...' সে কোনো বাহানা মনে করতে পারল না। তার মস্তিষ্ক এখন এতটাই শূন্য হয়ে আছে। সালার কয়েক মুহূর্ত উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর প্রসঙ্গ বদলে দিল।

'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসে পড়ো।' টেবিলের দিকে গিয়ে ইন্টারকমের রিসিভার ওঠাতে ওঠাতে বলল।

ইমামা রুমের কোণে একটি সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। সালার ইন্টারকমে কোনো জুস আনতে বলল। তখন তার ফোন বাজতে লাগল। সেলফোন তুলে সে কল রিসিভ করল। কয়েক মুহূর্ত ফোনে কথা বলে সে ইমামাকে বলল, 'ইমামা, তোমার ক্রেডিট কার্ড কোথায়?' তার প্রশ্ন শুনে ইমামা চমকে উঠল। তার কাছে একটি সাল্পিমেন্টারি কার্ড ছিল।

: ওটা আমার ব্যাগে।

: একটু দেখো তো।

ইমামা ব্যাগ থেকে ওয়ালেট বের করে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কার্ড খুঁজে পেল না। তার হাতের তোতা পাখি যেন উড়ে গিয়েছে।



: 'ওয়ালেটে নেই।' সে ধূসর চেহারায় সালারকে বলল। সালার উত্তর না করে ফোনে বলল, 'বিলকুল! আমার স্ত্রী ফেলে এসেছে ওখানে। আমি আনিয়ে নিচ্ছি। থ্যাঙ্ক ইউ।' সে কল কেটে দিল। ইমামার ধরে যেন প্রাণ ফিরে এলো।

: 'কোথায় কার্ড?' ইমামা জিজ্ঞেস করল। কোথায় শপিং করেছ তুমি?' সালার তার দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কথা তার মনে পড়ল। 'ওখানে ফেলে এসেছি আমি?' তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

: হ্যাঁ, দোকানের ম্যানেজার হেল্প লাইনে জানিয়েছে। তারা তোমার নম্বরে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তুমি কল রিসিভ করেনি। এখন তারা আমাকে কল করেছে।

ইমামা ব্যাগ থেকে ফোন বের করে দেখতে লাগল। তাতে সত্যিই অনেকগুলো মিসড কল ভেসে আছে। কিন্তু এগুলো

কখন এসেছে? হয়তো রিসেপশনে বসে যখন চিন্তায় ডুবে ছিল।

এক লোক ট্রেতে করে পানি ও জুসের গ্লাস নিয়ে এলো। এই মুহূর্তে তার পানীয়ের প্রচণ্ড প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। পিপাসা নিবারণের জন্য নয়; লজ্জা ঢাকার জন্য। সালার তারপর সোফায় এসে বসে পড়ল। এরই মধ্যে পুনরায় ইন্টারকম বাজতে লাগল। সে উঠে গিয়ে রিসিভ করল। গাড়ির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

: 'ইমামা, গাড়ির কাগজপত্র কোথায়?' সে আবারও ফোন হোল্ডে রেখে তাকে

প্রস

জিজ্ঞেস করল। ইমামার এখন তার পরবর্তী বোকামি মনে পড়ল। কাগজপত্র গাড়িতেই। কাগজপত্র ও লাইসেন্স দুটোই সে গাড়িতে ফেলে এসেছে। এই ব্র্যান্ডিং গাড়িটা যদি কেউ



সরিয়ে ফেলে, তাহলে সে সৌভাগ্যবান। কারণ, গাড়ির সাথে সাথে এই দুটো জিনিসও বোনাস হিসেবে পেয়ে যাবে। কেননা, লিফটার তার কাঙ্ক্ষিত পার্কিংয়ে রেখে সেখান থেকে চলে গিয়েছে। এতে স্টিকার লাগানো থাকলে, তাহলে সে হয়তো এটা অন্য কোথাও নিয়ে যেত। কিন্তু এখন সে ওটা নিকটবর্তী পার্কিংয়ে ছেড়ে গিয়েছে। কারণ, সে ভেবেছে মালিক গাড়ির পেছনেই আসছে। জুস যেন তার গলায় আটকে যাচ্ছে।

কানে

: 'গাড়িতে' সে দৃষ্টি আড়াল করে বলল। প্রত্যুত্তরে তাকে তিরস্কার করা হলো না। যার ভয় সে করছিল।

: 'আইডি কার্ডের কপি আছে?' সালার কাউকে গাড়ি আনতে পাঠাতে চাচ্ছে। পূর্বোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আইডি কার্ড বা গাড়ির কাগজপত্র সাথে দিয়ে দিতে চাচ্ছিল। কারণ, পার্কিংয়ে চেক করলে যাতে গাড়ি নিয়ে আসতে দেরি না হয়।

ইমামা পুনরায় গ্লাস রেখে তার ব্যাগে আইডি কার্ড খুঁজতে লাগল। তাতে এরও কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। তার মনে পড়ল, ওটা অন্য ব্যাগে রেখেছিল। ইমামার ইচ্ছা করল ওখান থেকে পালিয়ে যেতে। তার নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। সালার এবার তার উত্তরের অপেক্ষা করল না। 'আমার কাগজপত্রের মধ্যে দেখো। ওখানে আমার স্ত্রীর আইডি কার্ডের কপি থেকে থাকবে। ওটা ড্রাইভারকে দিয়ে দাও। আর গাড়ির চাবিও পাঠিয়ে দিচ্ছি।' সে ফোনে বলল।

: তুমি ফ্রেশ হতে চাইলে আমার স্লিপারস এখানে আছে।

এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়মতো এসেছে। ইমামা সত্যিই এই মুহূর্তে এমন একটি জায়গা খুঁজছে, যেখানে সে তার চেহারা আড়াল করতে পারে। জীবনে সে কখনো নিজেকে এতটা নিকান্মা ও নির্বোধ উপলব্ধি করেনি, যতটা করছে এখন। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, মুখে পানির ছিটা দিতে লাগল।

কিন্তু পানি কিছুই ভাসিয়ে নিতে পারছে না-না তার লজ্জা, না
অপদস্থতা, আর না মনঃকষ্ট।

: শুনলাম তোমার কোনো গার্লফ্রেন্ড এসেছে?

ইমামা ভেতর থেকে রিমশার গলা শুনল। সালারকে সে
উত্ত্যক্ত করছে। প্রত্যুত্তরে সালার হাসল।

: হ্যাঁ, আজ ডিজ্যাস্ট্রাস মিটিংয়ের পর। ওই মুহূর্তে কোনো
গার্লফ্রেন্ডের দর্শন তো ডিজার্ব করি আমি।

ইমামা ভেতরে আয়নায় চেহারা দেখতে দেখতে তাদের কথা
শুনতে লাগল। তারা এখন কোনো ক্লায়েন্ট এবং মিটিং নিয়ে
আলোচনা করছে। ইমামার এখান থেকে আবারও বাইরে
আসতে ইচ্ছা করছে না। এই দৃশ্য থেকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে
চাচ্ছে। বাথরুমে দরজা খুলতেই রিমশা অভ্যর্থনা জানানোর
ভঙ্গিতে তার দিকে এলো।

: 'যাইহোক, কোনো একটা বাহানায় তো তোমার বেগম এখানে এলো।' রিমশা তার সামনে আসতে আসতে বলল। সালার উত্তর করার পরিবর্তে কেবল মুচকি হাসল। কয়েক মিনিট তারা দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকল। তারপর রিমশা বলল, 'এখন পরবর্তী মিটিং, তো তুমি কি আসছ?'

: 'হ্যাঁ, আমি আসছি। তুমি শুরু করো মিটিং। আমি দশ-পনেরো মিনিটের ভেতর এসে যাব।' সালার জানাল। রিমশা ইমামাকে খোদা হাফেজ বলে চলে গেল।

: 'তুমি মিটিংয়ে চলে যাও। গাড়ি এলে আমি বাসায় চলে যাব।' ইমামা জুতার বক্স থেকে নতুন জুতা বের করতে করতে সালারকে বলল। তার মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে সে এখানে বাড়তি ঝামেলা হয়ে ঢুকে পড়েছে।

: 'তুমি স্যান্ডউইচ খাও। এটা তুমিই সকালে বানিয়ে দিয়েছিলে। আজ আমি ক্লায়েন্টের সাথে দুপুরে খেয়েছি। এটা খেতে পারিনি।' সালার টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো স্যান্ডউইচ খেতে খেতে বলল।

: 'আমার ক্ষুধা নেই।' এই মুহূর্তে গলা দিয়ে কিছু নামানো অনেক কষ্টকর মনে হচ্ছে তারাকেন ক্ষুধা নেই? দুপুরে খেয়েছ তুমি?

: না। কিন্তু ক্ষুধা নেই।

: 'তাহলে খাও। শুধু একটা খাও।' সালার তাকে মানানোর চেষ্টা করছে। ইমামার কোনো সমস্যা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে তা জিজ্ঞেস করা অনর্থক। যখনই সে দুশ্চিন্তায় পড়ে, তখন এ সবই বলে। আর এই কয়েক মাসে সালার এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সে জানে, ইমামা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবেন। এটা তার কাছে এখন কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

ইমামা এখন মাথা নিচু করে স্যান্ডউইচ খেতে শুরু করেছে। সে ভেবেছে, সালার এখন তার এসব কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা করবে। কিন্তু সে তার সাথে এদিক-সেদিকের গল্প করতে থাকল। স্যান্ডউইচ শেষ হতেই সে ইমামাকে চায়ের কথা জিজ্ঞেস করল। ইমামা অসম্মতি প্রকাশ করল। সালার ইন্টারকমে কল করে ৪. ডাইভারকে গাড়ি বের করতে বলল।

: আমি তোমাকে আমার গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার গাড়ি ঠিক হয়ে এলে, পাঠিয়ে দেব।

: 'আমি নিজেই চালিয়ে বাসায় চলে যাই।' ইমামা বলল।

: না, ড্রাইভার তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। তুমি এখন চিন্তিত। আমি চাচ্ছি না এই অবস্থায় তুমি গাড়ি চালাও।

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। এখন সে ডিপ্রেসনে আছে, তা সালার বুঝে গিয়েছে, এটা জানার পরও সে বলল, 'আমি একাই চলে যাই।' এখন তারা ব্যাংকের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে।

: 'ইয়ার! গ্রাহকদেরও এ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসি, আর তুমি তো আমার স্ত্রী।' সালার মৃদু হেসে বলল। ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি পার্কিং থেকে দরজার সামনে নিয়ে এসেছে। সে গাড়ির দরজা খোলার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু তার আগেই সালার নিজেই ইমামার জন্য গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরল। ইমামা গাড়িতে না উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে সালারকে শুকরিয়া জানাতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার গলায় পুনরায় গিঁট বাঁধতে শুরু করেছিল।

: 'Anything else ma'am? আরও কিছু লাগবে ম্যাম?' সালার মুচকি হেসে বলল। সে বুঝতে পারছিল, ইমামা তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ।' অবশেষে ইমামা বলল।

: 'Always at your disposal ma'am. সর্বদা আপনার সেবায় প্রস্তুত ম্যাম!' সালার তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে করতে, তাকে গাড়িতে বসতে ইশারা করল। সে গাড়িতে বসে পড়ল। সালার দরজা লাগিয়ে দিল। চলতি গাড়ি থেকে ইমামা এক মুহূর্ত পাশ ফিরে তাকাল। দেখল, সালার এখনো ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো গাড়ি মেইন রোডে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। ইমামা তার চেহারা দু-হাতে চেপে নিল।

যার দায়িত্ব ছিল, সে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। জালালের দায়িত্ব ছিল না, তাহলে কেন সে তাকে এতটা ভদ্রতা দেখাবে! ড্রাইভারের সাথে পাঠিয়ে, সালার ঠিকই করেছে। সে প্রকৃতপক্ষেই এই মুহূর্তে গাড়ি চালানোর অবস্থায় নেই। সে এখন তার গাড়িতে হলে, গাড়ি সাইডে দাঁড় করিয়ে, ভেতরে বসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদত। সে এতটা মূল্যহীন নয়, যতটা প্রতিবার জালালের সামনে গিয়ে হয়ে যায়। আর না সে এতটাও

মূল্যবান, যতটা সালার তাকে মনে করে। একজন তাকে কয়লা মনে করে, আর অন্যজন কোহিনুর। ওই অবমূল্যায়ন তার কাছে কাচের মতো লাগে। আর এই মূল্যায়ন তার কাছে খঞ্জরের মতো। কিন্তু দুটোই তাকে ক্ষত করে।

বলে দিতে। মতো কিছু তাহলে বা জানি

বাসায় ফিরেও সে উদ্দেশ্যহীন লাউঞ্জে অনেকক্ষণ বসে রইল। আজকের দিন অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিছুই তাকে প্রশান্ত করতে পারছে না। জীবনে যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির একটি ধারাবাহিকতা ছিল, যা শেষ হওয়ার নামই নিচ্ছে না।

◇◇◇

: 'কী হয়েছে তোমার?' রাতে খেতে বসে সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'কিছু না।' উত্তর প্রত্যাশা মাফিক ছিল। সালার খাবার খেতে খেতে হাত থামিয়ে তাকে দেখল। 'কোনো দুশ্চিন্তা নেই। পরিবারকে মিস করছিলাম, ব্যসা।' সে মিথ্যা বলল। এটি একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে সে প্রসঙ্গ নিজের থেকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে। সালার তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করল না। ইমামা মাঝে মাঝেই এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর সালার তাকে মানানোর চেষ্টা করে। আজও সে তা-ই করল। রাতের খাবার খেয়ে সালার কাজ করতে স্টাডি রুমে চলে গেল। ইমামা ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমাতে পারল না। আবারও সবকিছু সিনেমার মতো তার চোখের পর্দায় ভাসতে লাগল।

অনেকক্ষণ সে অন্ধকারে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে, ছাদের দিকে এলোপাতাড়ি দৃষ্টি ফেলে ফেলে কাটাল। কত সময় কেটেছে, বুঝতেই পারছে না। তার চিন্তার ধারাবাহিকতা ভাঙল দরজা খোলার শব্দে। সালার ঘুমানোর জন্য সর্বোচ্চ নীরবতায় দরজা খুলে ভেতরে এসেছিল। তারপর দরজা বন্ধ করে, লাইট না জ্বালিয়ে ওভাবেই সতর্ক পায়ে ওয়াশরুমের দিকে চলে

গেল। ইমামা চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঘুম এখনো চোখ থেকে
সহস্র মাইল দূরে। সালার কাপড় পালটে ঘুমানোর জন্য
বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ইমামার দিকে পাশ ফিরে বলল,
'তুমি এখনো জেগে আছ?' সে তার কোমরের চারপাশে
সালারের বাহুবন্ধন টের পেল।

: 'তুমি কীভাবে বুঝে যাও?' সে খানিক বিরক্ত হয়ে উঠল।

: জানি না কীভাবে। ব্যস, বুঝেই যাই। সমস্যা কী?

এক মুহূর্তের জন্য তার মনে চাইল, জালালের সাথে তার দেখা
হওয়ার কথা তাকে বলে দিতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তা মাথা
থেকে ঝেড়ে ফেলল। এই সমস্ত ঘটনায় বলার মতো কিছু নেই।
এমন কিছু, যা সবার কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে। সে
সালারকেও বোঝাতে পারবে না যে, জালালের কোন কোন
কথায় সে কষ্ট পেয়েছে। তাহলে বলেই কী লাভ!

: কিছু না। ব্যস! আমি একটু ডিপ্রেসড।

: 'এজন্যই তো বলেছিলাম, বাইরে চলো।' সালার এখন তার বাহুতে ঘুম পাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত বোলাচ্ছে।

: 'আমি ঠিক আছি এখন।' ইমামা ছোট বাচ্চার মতো তার বুকে মুখ গুঁজে বলল। সালার তার মাথায় চুমু এঁকে পিঠে আদুরে চাপড় দিতে লাগল। ইমামার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তার জীবনে যদি জালালুন নসর নামের কোনো অধ্যায় না আসত, তাহলে কতই না ভালো হতো! সে এই মানুষটির সাথে অনেক ভালো থাকতে পারত-এই মুহূর্তে যে মানুষটির বুকে মুখ গুঁজে সে অতীত খুঁজতে ব্যস্ত। জীবনের গতিপথে ওসব লোক কেন আসে, যারা আমাদের ভাগ্যে নেই? কপালে না থাকলে, তারা পায়ের কাঁটা হয়ে যায় কেন?

জালালের সাথে হওয়া ওই সাক্ষাৎ নিছক একটি ঘটনাচক্র ছিল। এমন এক ঘটনাচক্র, যার পুনরাবৃত্তি সে চায় না। সে ভাবতেও পারে নি, ওই ঘটনাচক্রের সাক্ষাৎ তার জীবনে ভয়ংকর প্রভাব নিয়ে ধেয়ে আসছে। মাস কিংবা বছর পর নয়; বরং অল্প কিছুদিন পরই।

দুদিন পরের কথা। তারা একটি ডিনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আজ এখানে এসেছে। সালার এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সাথে কথা বলছে। ছুট করে পেছন থেকে পরিচিত গলার 'হ্যালো' শব্দটি শুনতে পেল। ইমামা ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গে সালারের সাথে কথা বলতে লাগলেন। তাকাল। তারপর আর নড়তে পারল না। ইনি মিস্টার ফারুক, তিনি উষ্ণ আন্তরিকতার

: 'আমার স্ত্রী।' সালার এখন তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

: 'পরিচয় করানোর প্রয়োজন নেই। আগেও উনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।' ফারুক অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন। সালার খানিক হতভম্ব হয়ে ফারুকের দিকে তাকাল।

: আপনার আগেও সাক্ষাৎ হয়েছে ইমামার সাথে?

: 'বিলকুল! এই তো পরশুই তো দেখা হলো উনার সাথে। ডাক্তার জালালুন নসরের সাথে তিনি লাঞ্চ করছিলেন। মূলত জালাল আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার। তিনি বললেন, উনি তার পুরোনো ক্লাসমেট। আর তিনি যখন আপনার ভিজিটিং কার্ড জালালকে দিলেন, তখন বুঝতে পেরেছি উনি আপনার স্ত্রী।' মিস্টার ফারুক অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে বলে চললেন। 'আমি ও আমার মিসেস তো আপনাকে দাওয়াত করেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন, ইদানীং আপনি খুব ব্যস্ত।' মিস্টার ফারুক না ইমামার ধূসর চেহারার দিকে খেয়াল করলেন, আর না সালারের প্রতিক্রিয়াহীন চেহারার দিকে। তিনি যা বলছেন, সালারের যেন তা বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্বাস না করার জন্য তার কাছে

কোনো কারণ নেই। তার কান যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সে ঘাড় ফিরিয়ে বাম পাশে দাঁড়ানো ইমামার দিকে তাকানোর কষ্টটুকুও করল না। আপাতত সে তাকে দেখতে চাচ্ছে না। সে জালালুন নসরের সাথে দেখা করেছে! আর কবে থেকে?

মিস্টার ফারুকের কথা শুনতে শুনতে ইমামা শুষ্ক গলায় সালারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। দেখল, উদাসীনভাবে সে ফারুকের কথা শুনছে। তার চেহারা প্রতিক্রিয়াহীন। ইমামা তার প্রতিক্রিয়াহীন চেহারা দেখে ভুল অনুমান করল। 'আমি তাকে সবকিছু বলে দেব। সে আমার কথা বুঝবে।' তার প্রতিক্রিয়াহীন চেহারা ইমামাকে অদ্ভুত এক সুধারণার বশীভূত করে দিল। সে প্রাথমিক সন্দেহ থেকে বেরোতে লাগল। 'পরশুই তাকে বলে দেওয়া উচিত ছিল আমার। তাহলে সে এখন এই লজ্জা পেত না।' তার খানিক আফসোস অনুভূত হলো। ওখানে দাঁড়িয়ে মিস্টার ফারুকের কথা শুনতে শুনতে, সালারের প্রতিক্রিয়াহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, সে ভুল অর্থ বের করেছে। আর কেনইবা এমন না ভাববে। কেননা, বিয়ের পর সে এত মাস ধরে যে

মানুষটির সাথে থাকছে, সে মানুষটি তার কোনো আবদার-
বায়না পূরণ না করে থাকেনি। সে কখনো তাকে এটা বুঝতে
দেয়নি যে, তার ওপর অসন্তুষ্ট, কিংবা তার কোনো ভুল সে
ক্ষমা করতে পারবে না।

: 'জহির সাহেবের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?' সালার
হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটাল।

: এখানে এসেছে কি? হ্যাঁ, একটু আগেই আমরা আপনার কথাই
বলছিলাম। আসুন আমি আপনাকে দেখা করিয়ে দেই।' সালার
ফারুককে নিয়ে একদিকে চলে গেল। ইমামা বুঝতে পারল না,
সালার প্রসঙ্গ পালটাল, নাকি সত্যিই কোনো জহির সাহেবের
সাথে দেখা করতে নিয়ে গেল? সালার ফিরে আর পুনরায় তার
কাছে এলো না। ডিনার চলাকালীনও সে পুরুষদের একটি
দলের পাশে দাঁড়িয়ে বইল। ইমামা নিজেও পরিচিত কিছু
মহিলাদের সাথে দাঁড়িয়ে রইল। এমনটা এই প্রথম হচ্ছে,
কোনো পার্টিতে এসে সে ইমামার কাছে একবারও আসেনি।

তার চিন্তা হতে লাগল। কিন্তু তার এখনো বিশ্বাস, ব্যাপারটিকে সালার অত বড় করে দেখবে না।

পাটি শেষ করে আমন্ত্রণকারীদের থেকে বিদায় নিয়ে, তারা হোটেলের লবিতে তাদের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ইমামা পুনরায় তার চেহারা পড়ার চেষ্টা করল। তার চেহারা আগের মতোই প্রতিক্রিয়াহীন। কিন্তু এই নীরবতা ও গম্ভীরতা প্রচণ্ড অর্থবহ। ইমামা কথা শুরু করার কথা ভাবল। আর তখনই হোটেলের একজন পরিচারক তাদের গাড়ি প্রবেশপথে নিয়ে এলো। সালার ইমামাকে না ডেকেই গাড়ির দিকে চলে গেল। এ নিয়ে এখন আর তার কোনো সন্দেহ রইল না, তার এই নীরবতা ও অবহেলার কারণ কী।

গাড়িতে বসেও তার নীরবতা ওরকমই রইল। মেইন রোডে গাড়ি আসার কয়েক মিনিট পর ইমামা এই দীর্ঘ নীরবতা ভাঙার চেষ্টা করল।

তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট?

: 'will you please shut up. দয়া করে চুপ থাকবে?' ইমামা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 'এই মুহূর্তে আমি গাড়ি চালাতে চাই। তোমার বাজে কথা শুনতে চাই না।' তার ওপর সে চ্যাঁচাল না। কিন্তু তার দৃষ্টি ও শীতল স্বরে যা ছিল, তা ইমামাকে খুন করতে যথেষ্ট। এই প্রথম সে উপলব্ধি করল, বিষয় এতটা সাধারণ নয়, যতটা সে মনে করেছে। সে পুনরায় তাকে কিছু বলার সাহস করতে পারল না। এতগুলো মাসে এই প্রথম সে তাকে এলোপাতাড়ি গাড়ি চালাতে দেখল।

অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে জ্যাকেটটা সে সোফার উপর ছুড়ে ফেলে, সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। ইমামার বুঝে এলো না, সেও রান্নাঘরে যাবে, নাকি বেডরুমে তার আসার অপেক্ষা করবে। চাদর খুলতে খুলতে কতক্ষণ সে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল। তার মস্তিষ্ক এখন

অবশ হতে লাগল। এত মাস ধরে সে একজন 'প্রেমিক' ও 'বন্ধু'র
সাথে থেকেছে। আজ প্রথম একজন 'স্বামী'র

সম্মুখীন হয়েছে।

করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জুতা খুলল। সালার তখন
রান্নাঘর থেকে পানির গ্লাস নিয়ে, ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে
এসে বসল। এখন তার পিঠ ইমামার দিকে। পানির গ্লাস খালি
করে টেবিলে রেখে, সে এখন তার গলা থেকে টাই খুলছে।
ইমামা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকল। তারপর এগিয়ে
এসে তার পাশে বসতেই যাচ্ছিল, এমন সময় সালার তার
চেয়ার ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

: সালার, আমার কথা তো শোনো!

: এখনো কি শোনার মতো কিছু বাকি আছে?



তার প্রতি সালারের চোখে সে কখনো তুচ্ছতা দেখেনি। কিন্তু আজ দেখছে।

: আমাকে কথা বলার সুযোগ তো দাও।

: 'কথা? কীসের কথা? তুমি কি আমাকে এটা বলতে চাও যে, তুমি তোমার এক্স বয়ফ্রেন্ডের জন্য নিজের স্বামীকে ধোঁকা দেওয়া কেন আবশ্যিক মনে করেছ?' ইমামার চোখে অশ্রু আসতে লাগল। 'নাকি তুমি আমাকে বলবে যে, তোমার এক্স বয়ফ্রেন্ডের কোন বৈশিষ্ট্যটি তোমার স্বামীর মধ্যে নেই?' সালার কথার আঘাতে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করছে। 'তার চেয়ে ভালো এটাই, তুমি আমাকে বলে দাও, কবে থেকে তার সাথে দেখা করছ?'

: 'ঘটনাক্রমে তার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কেবল একবার।' সে ভারী গলায় কিছু বলার চেষ্টা করল। সালার ডাইনিং টেবিলে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করল।



: 'Stop be fooling me, women! আমাকে বোকা বানানো বন্ধ করো, মহিলা!' সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করল সে। ইমামার কথা বন্ধ হয়ে গেল। তার হাত কাঁপতে লাগল। তার ইউটোপিয়া (স্বপ্নের জগৎ) যেন ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। 'তুমি কি মনে করো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব? আমার চোখে তুমি আজ তোমার সম্মান শেষ করে ফেলেছ। You are nothing but a bloody cheater. একজন জঘন্য প্রতারক ছাড়া তুমি আর কিছুই নও।' বলতে বলতে সে ওখানে আর দাঁড়াল না। বেডরুমে না গিয়ে, সোজা স্টাডি রুমে চলে গেল। ইমামা যেন মুঠ করে তার হাতের কম্পন থামানোর চেষ্টা করল। সালারের কথাগুলো তার কানে বারবার গুঞ্জনিত হতে লাগল। এটি প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু এর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ছিল তার বিদ্ধকারী দৃষ্টি।

বিষয়টি এত বড় নয়, যতটা সালার বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বিষয়টি এত ছোটও নয়, যতটা সে মনে করেছিল। সালার, তার



ও জালালের অতীত সম্পর্কে না জেনে থাকলে কখনোই কোনো ক্লাসমেটের সঙ্গে লাঞ্ছ করার কারণে এত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত না। কেননা, সে গোঁড়া-রক্ষণশীল নয়।

নিজেই জালালের সাথে সাক্ষাতের কথা বলে দেওয়া উচিত ছিল তার। এখানে বসে, পড়ন্ত অশ্রুসমেত নিজেকে তিরস্কার করছে ইমামা। তারপর উঠে বেডরুমে চলে এলো। ঘুমানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। বিবশ মস্তিষ্ক ও জ্ঞানশূন্য চেতনোসালারের কথাগুলো মাথা থেকে বের করার চেষ্টা করছে। প্রশ্ন এ নয় যে, সে তাকে ভুল বুঝছে। প্রশ্ন হলো, এমনটা কেন হলো? সালারও কি তাকে এমন অবিষ্মস্ত ভাবে? যেমনটা সে সালারের ব্যাপারে ভাবে? ইমামা সারা রাত জেগে রইল। কিন্তু সালার বেডরুমে এলো না। তার বিশ্বাস ছিল, সকাল পর্যন্ত তার রাগ শেষ না হলেও, কমে যাবে অন্তত! আর তখনই হমামা তার সঙ্গে পুনরায় কথা বলতে চাচ্ছে।

সালার ফজরের সময় রুমে এলো। তার দিকে এক পলকও তাকাল না। কাপড় পালটে নামাজের জন্য বেরিয়ে গেল। সেখান থেকে সব সময়ের মতো জিম ও জগিংয়ের পর, অফিসে যাওয়ার একটু আগে বাসায় ফিরল। ইমামাকে তখনো ডাকল না। ইমামার বের করা কাপড় না নিয়ে, নিজে কাপড় বের করে নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল। ইমামা খানিক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রান্নাঘরে নাশতা তৈরি করতে লাগল। সালার রেডি হয়ে লাউঞ্জে এলো। কিন্তু নাশতার টেবিলে না গিয়ে, স্টাডি রুমে চলে গেল। ইমামা জানে, সে এখন তার ল্যাপটপ নিতে ওখানে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো সে নাশতার পর করে। আজ আগেই নেওয়ার অর্থ হলো...।

: 'সালার, নাশতা রেডি করে রেখেছি আমি!' স্টাডি রুম থেকে বের হতেই, ইমামা তাকে বলল।

: 'তাহলে জালালকে ডাকো।' সে কথা বলল না, বরং তাকে চাবুক মারল। লজ্জায় তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সালার

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ইমামা বুঝতে পারল না, কতক্ষণ সে ডাইনিং টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সালারের কথাটি তার অস্তিত্বের চারপাশে কাঁটা তারের মতো বেঁটন করে রইল। সারা দিন সে কিছু খেতে পারল না। পুনরায় সালারকে কল করল। কিন্তু কল রিসিভ হলো না। এটাই ভয় ছিল তার। মেসেজ করে তার কাছে ক্ষমা চাইল। সে মেসেজেরও কোনো উত্তর করল না।

সালার প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় বাসায় চলে আসে। যদি কখনো দেরিতে ফিরতে হয়, তাহলে সে তাকে তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আজ সে রাত প্রায় দশটায় ফিরল।

: 'আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে?' দরজা খুলে ইমামা জিজ্ঞেস করল। সালার কোনো উত্তর করল না। ইমামা দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকল। লাউঞ্জে রিমোট চেপে টিভি অন করে সে বেডরুমে চলে গেল। এ যেন ইঙ্গিত দিয়ে গেল, আবারও

সে টিভি দেখতে এখানে আসবে। ইমামার বিশ্বাস ছিল, সে খাবার খাবে না। তবু বিষণ্ণ মনে সে খাবার সাজাতে শুরু করল।

সালার দশ-পনেরো মিনিট পর কাপড় পালটে লাউঞ্জে চলে এলো। ফ্রিজ থেকে একটি এনার্জি ড্রিংক বের করে সোফায় বসে চ্যানেল পালটাতে লাগল।

: 'খাবার রেডি।' ইমামা তাকে সংবাদ দিল। সে টিভি দেখতে থাকল। তুমি খাবার কেন খাচ্ছ না?' ইমামা সামনে এগোল। সালার টিভি থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'এটা আমার ঘর। এখানকার সব জিনিস আমার। খাবার খাওয়া, না-খাওয়া এটা আমার ব্যাপার; তোমার নয়।' তার চোখ থেকে কেবল উপেক্ষাই ঝরে পড়ছে।

: 'তোমার অপেক্ষায় আমি এখনো খাবার খাইনি।' সে কখনো এই মানুষটির সামনে এমনভাবে মোমের মতো কথা বলার কথা

চিন্তাও করেনি। ভালোবাসা নয়, বরং 'সম্পর্ক' তাকে দুর্বল করে রেখেছে।

: Stop this bullshit. এসব বাজে প্রলাপ বন্ধ করো।' সালার চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। 'আমি তোমার কাছে নির্বোধ। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি নির্বোধ নই।'

: 'সালার! তুমি যা ভাবছ, এমন কিছুই নয়।' ইমামা তার সামনের সোফায় বসে পড়ল।

: ঠিক বলেছ তুমি, আমি তোমাকে যা মনে করেছি, তা সত্যিই ভুল।

ইমামার গলায় পুনরায় গিঁট পড়তে শুরু করল।

: 'আমার কথাগুলো তো একটু শোনো?' সে ধরা গলায় বলল।

: 'ইমামা! আজ আমার সামনে কান্নাকাটি করো না। তুমি আমাকে ব্যবহার করছ। আমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছ। নাও, কিন্তু ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল আমাকে করো না।' সালার তার চোখে অশ্রু দেখে প্রচণ্ড জ্বলে উঠল।

: 'ঠিক আছে, তুমি কথা শুনতে চাচ্ছ না, শোনো না। কিন্তু মাফ করে দাও আমাকে। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার ভুল হয়েছে। তার সাথে আমার দেখা করা উচিত হয়নি।' ইমামা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল কাজ হলো, না করা অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। ইমামার এখন তা উপলব্ধি হচ্ছে।

: 'এভাবে দেখা না করে, তাকে বিয়ে করে নিলেই পারতো।' সালার তার কথা থামিয়ে বলল।

: 'সালার! সে বিবাহিত।' ইমামা কথা সম্পূর্ণ করতে পারল না। তার অশ্রু ঝরতে লাগল। তার অসম্পূর্ণ কথায় সালার আরও জ্বলে উঠল।

: সে বিবাহিত বলে তোমার অনেক দুঃখ, তাই না? তাহলে তাকে বলো, তোমাকে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিক। অথবা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলুক। কিন্তু তার এমন করার কী দরকার! সে তো তোমাকে এমনিই পাচ্ছে!

ইমামা নিশ্বাস নিতে পারল না। তার মুখ থেকে অন্তত এ কথা শোনার প্রত্যাশা ছিল নাকী উদ্দেশ্য তোমার?' ইমামা অবিশ্বাস্যভাবে বলল।

: 'তুমি যে উদ্দেশ্য বের করতে চাও, করে নাও।' সালার সামনের টেবিলে এনার্জি ড্রিংকের বোতল ও রিমোট; দুটোই রাখতে রাখতে বলল।

: 'আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলছ তুমি?' ইমামার চেহারা লাল হতে লাগল।

: 'চরিত্র আছে তোমার?' সে তার চোখে চোখ রেখে বলল।

: 'চরিত্র ছিল বলেই তো আমাকে বিয়ে করেছ।' তার কান্নাভেজা গলার কারণে নিজেরই বিরক্ত লাগছে।

: বিয়ে নয়, ভুল করেছি। And I regret it. তাই আমি আফসোসও করছি।

ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল। নীরবতার এক দীর্ঘ বিরতি এলো।

তারপর সে গলার জমাট কান্না গিলতে গিলতে বলল, 'আমার পরিবার থাকলে, আমি তোমার থেকে আর এমন একটি কথাও

শুনতাম না। কিন্তু এখন আর কিছু বলো না। নয়তো আমি তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাব।

প্রত্যুত্তরে সালার টেবিল থেকে ফোন উঠিয়ে ফোরকানকে কল করল।

: তোমার ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

: 'না'। অপর পাশ থেকে ফোরকান বলল।

: তোমার প্রয়োজন?

: হ্যাঁ।

: আচ্ছা, আমি তাকে বলছি।

সালার কল কেটে দিল। 'ড্রাইভার তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। তুমি প্যাকিং করে যেতে পারো। কিন্তু আমাকে কখনো এই ধমকি দিয়ো না, তুমি ঘর ছেড়ে চলে যাবে। আমার ঘরে বসে যা করছ তুমি, তার চেয়ে ভালো তুমি এখান থেকে চলে যাও।' বলেই সে উঠে বেডরুমে চলে গেল। ইমামা মূর্তির মতো সেখানেই বসে রইল। সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করেনি। কিন্তু ইমামা এমনটাই অনুভব করছে। কয়েক মিনিট সে ওখানেই বসে রইল। তারপর হট করে উঠে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে চলে এলো। লিফটে চড়ে ওড়নার আঁচলে চোখ ও মুখ মোছার চেষ্টা করল। সে এখন ভেজা চোখ মুছে ড্রাইভারের প্রশ্ন থেকে বাঁচতে চাচ্ছে।

: 'আমাকে সায়েদা আম্মার ওখানে নিয়ে যাও।' ইমামা নিচে যেতে যেতে ড্রাইভার গাড়ি বের করে ফেলেছে। সে গাড়ির পেছনের সিটে বসতে বসতে ড্রাইভারকে বলল। রাতের সোয়া এগারোটায় গাড়ির পেছনের সিটে বসে সে পুরো রাস্তাজুড়েঝরতে থাকল। জীবনে কখনো এমন অপমান বোধ

করেনি সে। আর এখন আবারও বাবা-মায়ের কথা প্রচণ্ড মনে পড়তে লাগল।



তার

সায়েদা আন্মা ঘুম থেকে উঠে দরজা খুললেন। ইমামাকে দেখেই তিনি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হলেন, ভেতরে গিয়ে ইমামার হাউমাউ কান্না দেখে।

আ

: 'সালার ঘর থেকে বের করে দিয়েছে?' সায়েদা আন্মা শুনে চেতনাশূন্য হয়ে গেলেন। এর কারণ কী। এর কারণ তো সে সায়েদা আন্মাকে কী, কাউকেই বলতে পারবে না।

: 'ভাইজানকে কল দাও। আমি উনার সাথে কথা বলছি। এভাবে কীভাবে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে সে!' সায়েদা আম্মার রাগ হতে লাগল। উনার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে এত রাতে ডাক্তার সিবতে আলিকে কল করল না। এই বিপদ তার। সে তার জন্য সবার ঘুম নষ্ট করতে চাচ্ছে না। সে নিজেও গত রাতে ঘুমায়নি। আর এখন এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তার মাথা, ব্যথায় চিনচিন করছে। আজও এমনই হলো। অবশেষে ফজরের পর সে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ল। বহু কষ্টে ঘুম এলো। কিন্তু এলো।

পুনরায় যখন তার চোখ খুলল, তখন ঠিক দুপুর। চোখ খুলতেই এই সবকিছু তার কাছে ভয়ংকর স্বপ্নের মতো মনে হলো।

: 'সালার কোনো কল তো করেনি?' সে সায়েদা আম্মার রুমে এসে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, তুমি গোসল করে আসো, আমি খাবার রেডি করছি। তারপর ভাই সাহেবের কাছে যাব।' সায়েদা আন্মা বলেই রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানা নেই ইমামার কেন যেন মনে হচ্ছে, সালার এখন হয়তো আফসোস করছে। হয়তো সে চলে আসার পর তার উপলব্ধি হয়েছে, সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। রাগ থামার জন্য বারো ঘণ্টাই যথেষ্ট। যদি সে এসব রাগের বসে করে থাকে, তাহলে! আর জেদের বশে করে থাকলে...

বিষন্ন মনে সে গোসল করল। গোসল করে সায়েদা আন্মার বাড়িতে তার পুরোনো কাপড় থেকে এক জোড়া কাপড় বের করে পরে নিল। গত কয়েক মাস ধরে সে এত মূল্যবান কাপড় পরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, নিজের গায়ে এই কাপড়টি দেখেতার নিজেরই অদ্ভুত লাগছে। এদিকে প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তার। কিন্তু দুই লোকমা খেতেই তার ক্ষুধা মরে গেল। সায়েদা আন্মা জোর করে তাকে খাওয়ালেন। তারা খাওয়া শেষ করেই ডাক্তার সিবতে আলির ওখানে যেতে চাচ্ছেন।

কিন্তু ইমামা ডাক্তার সিবতে আলির অফিসের ফোনে এসব কথা বলে উনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাচ্ছে না।

সালার সপ্তাহে দুদিন রাতে ডাক্তার সিবতে আলির ওখানে যায়। আর আজকেও তার যাওয়ার তারিখ। ইমামা চাচ্ছে, উনাকে যা কিছু বলার এবার সালারই বলবে। শুধু শুধু সে বলে লজ্জায় পড়তে চাচ্ছে না। কিন্তু সায়েদা আন্মা এতে সম্মত হলেন না। তিনি জোরাজুরি করে ইমামাকে নিয়ে, ডাক্তার সাহেবের বাসায় চলে এলেন। কুলসুম আন্টি সবকিছু শুনে সায়েদা আন্মার মতো অনুভূতিশূন্য হয়ে গেলেন। ডাক্তার সাহেব এখনো অফিস থেকে ফেরেননি।

: কিন্তু বেটা! ঝগড়া কী নিয়ে হয়েছে?

ইমামার কাছে এই একটি প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সায়েদা আন্মা ও কুলসুম আন্টি বহুবার জিজ্ঞেস করেও কিছু বের করতে পারলেন না। ইমামার মনে হলো, তার নিয়ত স্বচ্ছ হওয়া

সত্বেও এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায়, তাকে অপরাধী করে তুলছে। সে যদি সায়েদা আন্মা ও কুলসুম আন্টিকে বলে দেয় যে, সে তার এক পুরোনো বন্ধুর সাথে লাঞ্চে গিয়েছিল, কিংবা কোনো পুরোনো ক্লাসমেটের সঙ্গে ছিল; তাহলে এ কোনোটিকেই তারা ভালো চোখে দেখবেন না। এসব কিছু সে ডাক্তার সাহেবকেও বলতে পারবে না। অবশেষে ডাক্তার সাহেব বাসায় ফিরে ইমামাকে এভাবে দেখেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

: 'আমার চরিত্র নিয়ে তার সন্দেহ।' ডাক্তার সাহেবের বারবার প্রশ্ন করায় মাথা নিচু করে সে এতটুকু বলল। উনি যেন একটা ধাক্কা খেলেন। সায়েদা আন্মা এবং কুলসুম আন্টিও কিছু বলতে পারলেন না। তারপর ডাক্তার সাহেব আর তাকে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

: 'সে রাতে এলে, তার সাথে আমি কথা বলব। চিন্তার কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাব সবকিছু।' তিনি ইমামাকে সান্ত্বনা দিলেন।

: আমি তার সাথে থাকতে চাই না। প্রয়োজনে চাকরি নেব। তবু আমি এখন আর তার ঘরে যাব না।

ডাক্তার সিবতে আলি তার কথার উত্তরে কিছু বললেন না। তিনি যেন এখনো হতভম্ব হয়ে আছেন। সালার সিকান্দার সম্পর্কে উনার ধারণা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তিনি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, এসব হয়তো ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়েছে। আর নয়তো সালার এই মেয়েকে মাঝরাতে, এমন অপবাদএভাবে খালি হাতে বের করে দিত না। যে মেয়েটিকে তিনি নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দেন, তাকে।

সাহেব ফোরকানকে ডেকে নিলেন। সালারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই সে আজ রাতে ফোরকান একা এলো। সালার এলো না। আলোচনার পর ডাক্তার নিশ্চিতভাবে বলল, 'সে একটু ব্যস্ত, তাই আসতে পারেনি।'

: সে কি আপনাকে বলেছে যে, ইমামাকে সে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে?

ফোরকান কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না।

: 'ইমামাকে?' সে অবিশ্বাস্যভাবে বলল।

: আপনার ড্রাইভারের মাধ্যমেই সায়েদা আম্মার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ফোরকানের এখন গত রাতে সালারের কলের কথা মনে পড়ল।

: 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কীভাবে? মানে...' ফোরকানের মাথা সত্যিই ঘূরে গিয়েছে। সালার ইমামার জন্য যেভাবে জান হাতে নিয়ে ঘোরে, অন্তত তার জন্য এ কথা মানা অসম্ভব যে, সে তাকে ঘর থেকে বের করে দিবে! আর সেটাও এভাবে মাঝরাতে! গতকাল জিমে সালারকে তার অনেক চুপচাপ মনে

হয়েছিল। আর আজ জিমে আসেইনি। কিন্তু তার জল্পনা-কল্পনাতেও ছিল না, ওই নীরবতার কোনো সম্পর্ক ইমামার সাথে হতে পারে!

: 'আমি তাকে এখনই ফোন করছি। আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না।' ফোরকান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সালারকে কল করল। সালারের ফোন বন্ধ। সে পুনরায় তার বাসার নম্বরে চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ ফোন তুলল না। সে খানিক অস্থির হয়ে ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকাল।

: 'ফোন রিসিভ করছে না। সেলফোন বন্ধ। আমি বাসায় গিয়ে তার সাথে কথা বলছি। ইমামাকে আপনি আমার সাথে পাঠিয়ে দিন।' ফোরকান সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

: 'না, ইমামা আপনার সাথে যাবে না। সে বের করে দিয়েছে, ক্ষমা চেয়ে সে-ই এসে নিয়ে যাবো।' ডাক্তার সিবতে আলি

প্রচণ্ড অকুণ্ঠ গলায় বললেন। 'আপনি গিয়ে তাকে আমার সংবাদ পৌঁছে দিন।'

ফোরকান ইতিপূর্বে ডাক্তার সিবতে আলিকে কখনো এতটা গম্ভীর দেখেননি। থাকবে। এদিকে ফোরকান, ডাক্তার সিবতে আলি ও সালারের অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে পড়ে একদম হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। সে প্রতিদিন ডাক্তার সাহেবের কাছে আসে। এটা যেন সালারের পক্ষ থেকে তার লজ্জা প্রকাশের একটি চেষ্টা।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে ইমামার। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, তার প্রতি সালার এমন ব্যবহার করতে পারে! বাসায় সে ডাক্তার সাহেব ও কুলসুম আন্টির দুশ্চিন্তা দেখে নিজেকে আরও বেশি অপরাধী অনুভব করছে। ফলে এই মানসিক টানাপোড়েনে সে জ্বরে ভুগতে লাগল।



সালারের সাথে অনেক্ষণ কথা বলল।

তারপর যেন অঙ্গসমর্পণ করতে করতে বলল, 'ঠিক আছে, যা হয়েছে, হয়েছে। এখন তুমি তাকে গিয়ে নিয়ে আসো।

: 'এটা আমি করব না। আমি তাকে বের করিনি, তাই নিয়েও আসতে পারব না। সে নিজে আসতে চাইলে, আসুক।' সালার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল।

: 'আর ডাক্তার সাহেব এসব হতে দেবেন না। সে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছে, নাকি তুমি বের করে দিয়েছ, এসব তিনি শুনবেন না। ডাক্তার সাহেবের পয়গাম এটাই যে, তুমি গিয়ে মাফ চেয়ে তাকে নিয়ে আসো।' সালার চুপ রইল। 'আমার সাথে চলো, এখনই তাকে নিয়ে আসবো।'

: আমি যাব না। ডাক্তার সাহেবের সাথে আমি নিজেই কথা বলে
নিব।

: এখনই কথা বলো।

: আমি এখন কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি সে ওখানে
কিছুদিন থাকুক। এটা তার জন্য ভালো হবে।

ফোরকান পরবর্তী দুই ঘণ্টা ওখানে বসে বসে তাকে বোঝাতে
থাকল। কিন্তু সে তার অস্বীকারকে স্বীকারে পরিণত করতে
পারল না। অবশেষে ফোরকান প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে
অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। ফোরকানের অসন্তুষ্ট
সালারের দুশ্চিন্তায় নতুন সংযুক্তি ঘটাল।

ফোরকানকে সে ভুল কিছু বলেনি। সত্যিই ইমামাকে ঘর থেকে
বের করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না, আর না আছে।
ইমামা তাকে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সালারের

কল্পনাতেও ছিল না ইমামা সত্যিই উঠে চলে যাবো। তার এভাবে চলে যাওয়ায়, সালারের ক্রোধে সংযুক্তি ঘটেছে। বিয়ের পর এই প্রথম সে জেদ করেছে। এই জেদ ঠিক ছিল, নাকি ভুল? একজন পুরুষ হিসেবে এ নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। সে অনেক হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এখনই হার মানতে প্রস্তুত নয়।

২৪

ডাক্তার সিবতে আলি চার দিন ধরে তার অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সে গেল না। আর না কোনো ফোন করল। উনি নিজে তাকে ফোন করলে, এটা লজ্জাকর দেখায়। তবে উনি প্রত্যাশা করছিলেন, সালার তাকে অন্তত এতটুকু সম্মান অবশ্যই করে যে, তার পয়গাম পেয়ে নিশ্চয়ই সে আসবে। কিন্তু তার পরিপূর্ণ নীরবতা যেন উনাকে মানসিক বিপর্যয়ে ফেলে দিল। সেদিন থেকে ইমামা উনার বাসাতেই থাকছে। উনি এটাই ভালো মনে

করলেন যে, এই সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ইমামা এখানে থাকুক।

চতুর্থ দিন ডাক্তার সাহেব সালারকে কল করলেন। তখন সে অফিসে। ডাক্তার সাহেবের নম্বর দেখে সে কিছুক্ষণ নড়তে পারল না। এটা এমন এক কল, যা থেকে সে মুক্তি পেতে চাচ্ছে, আবার যেটা উপেক্ষা করার সাহস তার নেই। সালাম-কালামের পর ডাক্তার সিবতে আলি কোনো ভূমিকা ছাড়াই তাকে বললেন, 'আপনি যদি সন্ধ্যায় আমার এদিকে আসতে পারেন, তাহলে ঠিক আছে। আর নয়তো আমিই চলে আসব। বিষয়টি যদি সমাধান করা যায়, তাহলে করে নেব। আর নয়তো শেষ করে দেব।' উনার কথায় কোনো অস্পষ্টতা রইল না তার।

: আমি চলে আসব।

: 'মেহেরবানি হবে আপনার।' উনি অতিরিক্ত কোনো কথা না বলে, সালাম দিয়ে ফোন রেখে দিলেন। সালার ফোন হাতে

নিয়ে বসে রইল। ডাক্তার সিবতে আলির এই ভঙ্গিমা তার কাছে নতুন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। অপ্রত্যাশিত ছিল সে বাক্যটি, যেটি তিনি শেষে বলেছেন। বিষয় শেষ করার উপলক্ষ্য পর্যন্ত কীভাবে চলে গেল? তার কাছে এটি নিছক একটি ঝগড়া। এই প্রথম সালারের পেটে মোচড় পড়ল।



সন্ধ্যায় সালার উনার বাসায় এলো। কিন্তু সব সময়ের মতো উনি তাকে দরজায় এসে অভ্যর্থনা জানালেন না। আর না তার সাথে মুসাফাহা করলেন। এমনকি তার জন্য উঠে দাঁড়ালেনও না। সালার পরিচারকের সাথে ভেতরে এলো। ডাক্তার সিবতে আলি লাউঞ্জে বসে কোনো বই পড়ছিলেন। সে আসতেই বই বন্ধ করে একপাশে রেখে দিলেন। সালার সালাম দিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়ল।

: আমি তোমার সাথে খুব লম্বা চওড়া কথা বলব না, সালার! কারণ জানতে পারেনি।

পরিবর্তে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলতে শুনল। আর সেটাও তাকে বলছেন। অন্যথায় সালার মাথা তুলে উনার দিকে তাকাল। এই প্রথম সে উনার মুখে 'আপনি'র তিনি পরিচারকদেরকেও আপনি বলে সম্বোধন করেন।

: 'ইমামাকে তোমার সাথে কেন বিয়ে দিলাম, এ নিয়ে গত চার দিন ধরে আমি লজ্জিত। এর যোগ্য নও তুমি। ভালোবাসার দাবি করা এক বিষয়, কিন্তু কোনো নারীকে নিজের ঘরে সম্মানের সাথে রাখা, একদম ভিন্ন আরেকটি বিষয়। তুমি শুধু প্রথম কাজটি করতে পারো।'

লাউঞ্জ সংলগ্ন কক্ষ থেকে ইমামা তাদের দুজনের কথাই চুপচাপ শুনছে।

'নিজের স্ত্রীকে এভাবে ঘর থেকে বের করে দেওয়া পুরুষকে আমি, পুরুষ তো দূরের কথা, মানুষই মনে করি না। সে তোমার স্ত্রী, এ কথার মান যদি রাখতে না পারো, তাহলে অন্তত এ কথার মান তো রাখতে পারতে যে, সে আমার মেয়ে। আমার মেয়েকে তুমি এভাবে মাঝরাতে খালি হাতে ঘর থেকে বের করে দিয়েছ।'

: 'আমি তাকে ঘর থেকে বের করিনি। সে নিজেই...'। সালার কিছু বলার চেষ্টা করল। ডাক্তার সাহেব তার কথা থামিয়ে দিলেন।

: 'তুমি গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলো।' ভেতরে বসে ইমামা কাঁপতে শুরু করল। সে কখনো ডাক্তার সিবতে আলিকে এত উচ্চঃস্বরে কথা বলতে শোনেনি। 'তোমার সাহস কীভাবে হলো তুমি তার চরিত্র নিয়ে কথা বলো?' সালার চোখ তুলে উনাকে দেখল। উনার চোখ ক্রমশ লাল হয়ে যাচ্ছে।

: আপনি কি তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, এ কথা আমি তাকে কেন বলেছি?

ভেতরে বসা ইমামার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কেবল এই একটি বিষয় বাকি রয়ে গেছে, যেটা সে কারও কাছে বলেনি।

: আমি তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করব না। আমি তোমার চরিত্র সম্পর্কে জানি না। কিন্তু সে নয় বছর ধরে আমার কাছে আছে। সে এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যার ফলে তুমি তার চরিত্রের ওপর আঙুল তুলবো।

ইমামা নিশ্চিত যে, সালার এখন জালালের নাম বলবো। এখন বলবেই। তার শরীর এখন ঠান্ডা হতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ.... তার হৃদপিণ্ড সেকেন্ডের চেয়েও বেশি দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। সালারের একটি বাক্যই ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টিতে তাকে সারা জীবনের জন্য নিচু করে দিতে সক্ষম। কিন্তু ওপাশে নীরবতা বিরাজ করছে। তারপর ইমামা সালারের গলা

শুনল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, তার হৃৎস্পন্দন
থেমে যাবে।

: আই অ্যাম সরি।

ইমামার বিশ্বাস হচ্ছে না, এটি সেহ বাক্য নয়, যা শোনার
প্রত্যাশা করছিল সে। সালারের ক্ষমাপ্রার্থনা তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা
দিল। এতে ডাক্তার সাহেব আরও রেগে গেলেন।

: 'একটা কথা তুমি মনে রেখো, সালার! জীবনে তুমি যা কিছু
পাবে, এই নারীর তাকদিরের ফলেই পাবে। এ যদি তোমার
জীবন থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে অপদস্থতা ছাড়া আর কিছুই
তোমার ভাগ্যে জুটবে না। শূন্য হাতে থাকবে সারা জীবন।
তোমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তোমাকে ইমামার দায়িত্বশীল
বানিয়েছেন। তুমি দায়িত্বশীল হয়েই থাকো। কখনো
রিজিকদাতা হওয়ার চেষ্টা করো না। তুমি তার রিজিকদাতা নও।
আর নয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে তোমার চেয়ে উত্তম

দায়িত্বশীল দান করবেন। তোমার চেয়ে অধিক দয়ালু, তোমার চেয়ে অধিক যত্নশীল!"

এই মুহূর্তের সালার 'হৃদয়ে রক্তক্ষরণ, মুখে হাসি'র জ্বলন্ত প্রমাণ। ডাক্তার সিবতে আলি কখনো এভাবে কথা বলেননি। কখনোই না। সে যেন লজ্জায় ডুবে যাচ্ছে। ভেতরে বসে ইমামাও অনুতাপের এমনই এক সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

'তাকে ঘরে রাখতে চাইলে, সম্মানের সাথে রাখো। আর নয়তো তাকে এখনই, এই মুহূর্তেই ছেড়ে দাও। তোমার চেয়ে কয়েক গুণ ভালো মানুষের সাথে তাকে বিয়ে দেব। যে তাকে তোমার চেয়ে ভালোভাবে ঘরের সম্মান করে রাখবে।'

: 'আমি আপনার প্রতি এবং তার প্রতি খুবই লজ্জিত। আপনি তাকে ডাকুন। তার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তার পরাজয় স্বীকার করতে বেশিক্ষণ লাগল না। ভেতরে ইমামা যেন জমিনে নুয়ে পড়েছে। এটিই সর্বশেষ জিনিস, যার প্রত্যাশা সে সালারের

কাছে করেছিল। কুলসুম আন্টি তাকে ডাকতে এলেন। তার ইচ্ছা করল কোথাও পালিয়ে যেতে। জীবনে নিজের স্বামীর মাথানত দৃশ্য দেখার চেয়ে বড় লজ্জার সম্মুখীন সে কখনো হয়নি। কী গভীর সেসব তিরস্কার! লাউঞ্জে বসে বসে নিজেকে নিজেই করা সেসব মালামাত! সবকিছু তার ভুলের জন্যই হয়েছে।

: 'যা হয়েছে, সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত। এমনটা হওয়া উচিত হয়নি। যা করেছি, ভুল করেছি আমি। এমনটা করা ঠিক হয়নি আমার।' ইমামা সামনে গিয়ে বসতেই সালার মাথা ও দৃষ্টি নত করে বলল। ইমামার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পেল। আজ সালারের সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। আর এর জন্য সে নিজেই নিজেকে দায়ী করছে।

: 'বেটা! এখন আপনি যেতে চাইলে চলে যান। আর না যেতে চাইলে...' ডাক্তার সাহেব ইমামাকে বললেন।

: 'না, আমি যেতে চাই।' ইমামা তার চোখ কচলাতে কচলাতে বলল।

: 'ঠিক আছে, তাহলে আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।' ডাক্তার সাহেব তাকে বললেন। ইমামা উঠে রুমে চলে এলো। দুদিন আগে কুলসুম আন্টি তাকে কিছু কাপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিয়েছিলেন। ইমামা সেগুলো একটি ব্যাগে ভরে নিল। ইমামা ভেতরে যেতেই, ডাক্তার সাহেব উঠে স্টাডি রুমে চলে গেলেন। আর সালার ওখানে ওভাবেই মাথা নত করে বসে রইল।

: 'বাবা! খাবার সাজাব?' কুলসুম আন্টি যেন পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা

করলেন।

: 'না, আমি খাবার খেয়েই এসেছি।' সালার এখনো দৃষ্টি তোলেনি। দৃষ্টি তোলার যোগ্যতাই তার হারিয়ে গেছে। পরিচারক কোমল পানীয়ের একটি গ্লাস দিয়ে গেল। সালার চুপচাপ গ্লাস উঠিয়ে কয়েক ঢোক পান করে রেখে দিল। ইমামা জিনিসপত্র গুছিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতর বাইরে চলে এলো। সালার উঠে দাড়িয়ে চুপচাপ তার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে নিল। ডাক্তার সাহেবও ততক্ষণে স্টাডি রুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি তাদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কিন্তু সব সময়ের মতো তিনি সালারকে বগলদাবা করলেন না। গাড়িতে করে মূল সড়কে আসা পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। অবশেষে সালার বলল, 'আমি তোমার প্রতি খুবই লজ্জিত। I misbehaved with you. আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি।'

ইমামা পুনরায় তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার প্রত্যাশা করেনি।



: সালার, আমি তোমার কাছে খুবই লজ্জিত। আমি জানতাম না, আব্বু এতটা রেগে যাবেন। তিনি তোমার সাথে...

সালার তার কথা থামিয়ে দিল। 'না, ঠিক করেছেন তিনি। যা বলেছেন, ভুল তো কিছু বলেননি। কিন্তু আমি তোমার চরিত্র নিয়ে কিছু বলিনি।'

: 'তার মানে তুমি আমাকে এসব বলবে আর আমি এটা মনে করব না যে, তুমি আমার চরিত্রের ওপর আঙুল তুলছ?' সালার চুপ করে রইল। 'ঘটনাক্রমে সেদিন তার সাথে পার্কিংয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে ইমামা বলতে শুরু করল। সালার এবার তাকে বাধা দিল না। 'কয়েক মাস আগেই সে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। লাঞ্ছের জন্য সে পীড়াপীড়ি করছিল। আমার মনেও আসেনি যে, তোমার খারাপ লাগতে পারে। তাছাড়া আমি লাঞ্ছও করিনি। রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ বসতেই, ওই লোক আর তার স্ত্রী চলে এসেছিল। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি বাসায় চলে আসি। ব্যস, এতটুকুই। আমার

ভুল শুধু এটাই যে, তার সাথে দেখা হয়েছিল, তা আমি তোমাকে বলিনি।

: 'আর আমার ভুল ছিল, আমি তোমার কথা শুনিনি। শোনা উচিত ছিল। আই ওভার রিয়েক্টেড।' সালার এখন মৃদুস্বরে স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল। 'নিজেকে অপমানিত করতে চাচ্ছিলাম তাই শুনিনি।' সে বিড়বিড় করে বলল। ইমামা তাকে বলতে চাচ্ছিল, ওই মুহূর্তে সে তার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ চিত্ত হচ্ছিল। কিন্তু সে বলতে সালারের এক মুহূর্তের নীরবতা তার সম্মান রক্ষা করেছিল। সেইসাথে সালারের বিগত দিনগুলোর ব্যবহারের কাফফারা আদায় করে দিয়েছিল। ওই মুহূর্তে ইমামা এই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করেনি। লজ্জাবোধ ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়া তার আর কিছু করারও ছিল না। গাড়িতে ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এলো।

'আমি জানতাম না, কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা করায় তোমার এতটা খারাপ লাগবে। অন্যথায় আমি তো কখনো...' কিছুক্ষণ পর ইমামা বলল। সালার তার কথা থামিয়ে দিল।

: ওটা 'কোনো মানুষ' নয় ইমামা!

: সে এখন আমার কাছে 'কোনো মানুষ'ই।

সালার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল। ইমামা নাক ঘষে আবারও চোখ মোছার চেষ্টা

করল।

: শরীর ঠিক আছে তোমার?

: হ্যাঁ ঠিক আছে।

সে ইমামার কপালে হাত রেখে তাপমাত্রা পরিমাপ করার চেষ্টা করল।

: জ্বর?

: একটু।

: ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

: না ওষুধ খাচ্ছি। ব্যাগেও আছে।

সালার চুপ হয়ে গেল। তারা এমন নীরবতায় কখনো পথ চলেনি। এই একটি ঘটনা গত কয়েক মাসে গড়ে ওঠা তাদের মধ্যকার বিশ্বাসের পথে কিছু ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে এত রেগে গিয়েছিল কেন? আর এমন রাগ! সে নিজেও তা বুঝতে পারছে না। সে তো খিটখিটে স্বভাবের নয়। অন্তত বিগত দশ বছরে এমন দীর্ঘ রাগের পরিস্থিতি খুব কমই এসেছে, যেমনটা

ইমামার সাথে এখন হয়েছে। জালালের প্রতি সে ঈর্ষান্বিত নয়। তবে তার ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। জালাল ইমামার ব্যাপারে কতটা উদাসীন, তা সে দশ বছর আগেই দেখেছিল। তার জীবন-পর্দায় জালালের এমন প্রত্যাবর্তন, সালারের কাছে একজন পুরুষ হিসেবে অসম্মানের।

২৫

: 'আচ্ছা। 'আপা, আপনি কোথায় ছিলেন?' পরদিন সকালে পরিচারিকার বেলের শব্দে তার ঘুম ভাঙল। দরজা খুলতেই পরিচারিকা তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'কয়েক দিন আগে আমি বাবার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।' সে ভুলভাল বোঝানোর মতো করে বলল।

: 'আপনার শরীর ঠিক আছে?' পরিচারিকা তার দিকে গভীরভাবে লক্ষ করে বলল।

: 'হ্যাঁ...না... ব্যস একটু জ্বর। আর কিছু না।' ইমামা মৃদু হাসার চেষ্টা করল।

: কোনো সুখবর তো নাই আবার আপা?

বেডরুমের দিকে যেতে যেতে পরিচারিকার কথয় সে থমকাল। তারপর প্রচণ্ড লজ্জা অনুভব করল।

: এমন কিছু না; তুমি পরীক্ষার করো।

ইমামা রান্নাঘরে নিজের জন্য নাশতা তৈরি করছিল। এমন সময় কলের শব্দে বেরিয়ে এলো। সালারই সাধারণত এই সময়ে কল করে। এতদিন বিরতির পর ফোনের শব্দ তার কাছে অদ্ভুত লাগল।

: 'তোমার শরীর কেমন?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি ঠিক আছি।' ইমামা বলল। 'নাশতা করে গিয়েছিলে অফিসে?' রান্নাঘরে সে কোনো ব্যবহৃত প্লেট দেখতে পেল না।

: না দেরি হয়ে গিয়েছিল। নাশতা করার সময় পাইনি।

: 'আমাকে জাগিয়ে দিতে, আমি বানিয়ে দিতাম।' ইমামা বলল।

: না, আমার ক্ষুধাও ছিল না।

স্বাভাবিক কথাবার্তার পর তাদের সামনে যেন খাদ চলে এলো। যে খাদ থেকে তারা দুজনেই বাঁচতে চাচ্ছে। কিন্তু বাঁচতে পারছে না। একে অপরকে বলার জন্য তারা কেউই কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না।

: 'আর?' সে নিজে কোনো কথা না খুঁজে পেয়ে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'কিছু না।' ইমামাও ততটাই শব্দশূন্য।

: 'রাতে কোথাও খেতে চলি?' সালার বলল। 'আচ্ছা' কথোপকথন পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে এলো। সালার খোদা হাফেজ বলে কল কেটে দিল। ইমামা অনেকক্ষণ রিসিভার কানে চেপে বসে রইল। এক সপ্তাহ আগের কথোপকথন, আর আজকের কথোপকথনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ফাটল জোড়া লাগানো অনেক কঠিন! জোড়া লাগলেও দাগ মুছে না। ইমামাও এখন এটি অনুভব করছে।

এই এক সপ্তাহে জীবনে সে যা কিছু শিখেছে, তা বিয়ের এত মাসে শিখতে পারেনি। মানুষ কখনো কাউকে নিঃশর্ত ভালোবাসতে পারে না। বিশেষ করে তখন, যখন কোনো ভালোবাসা বিয়ে নামক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। সালারের ভালোবাসাও এমনই। একটি অপ্রীতিকর ঘটনা তাকে আসমান থেকে জমিনে নিয়ে এসেছে। এই বাস্তবতাগুলো এই প্রথম

তার চোখে পড়েছে; যা এতদিন তার দৃষ্টিসীমার বাইরে ছিল। সে এখন কেবল প্রিয়তমা নয়; স্ত্রীও। এখন সে একজন পুরুষের জীবন। ফলে কাউকে মন ও মগজ থেকে জেনে ফেলা অনেক সহজ, কিন্তু দায়িত্ববোধ থেকে নয়। সালার অন্যের চোখে তার সম্মান ঠিকই বজায় রেখেছে। কিন্তু তাকে তার নিজের চোখে অত্যন্ত তুচ্ছ করে দিয়েছে। সুধারণা ও প্রত্যাশার পাহাড় এখন ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হতে শুরু করেছে।

সালার সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলো। ইমামা জানে, সে ইচ্ছা করেই তাড়াতাড়ি এসেছে। দরজা খুলতেই সব সময়ের মতো আজ তাকে জড়িয়ে ধরল না। তার চোখে চোখ রাখা, তাকিয়ে মুচকি হাসা আর কাছে আসা তার কাছেও হয়তো অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। আগে সবকিছু আপনা-আপনিই হয়ে যেত। আর এখন চেষ্টা সত্ত্বেও হতে পারছে না।

ডিনারের জন্য বাইরে যেতে যেতেও গাড়িতে ওরকমই নীরবতা বহাল রইল। দুজনেই, মাঝে মাঝে একে অপরকে কিছু

জিঙেস করে, তারপর এক শব্দের উত্তর পেয়ে পুনরায় চুপ হয়ে যায়। এটি আজ প্রথম ডিনার, যেখানে তারা একে অপরের মুখের দিকে না তাকিয়ে, কেবল প্লেটের দিকে তাকিয়েই সম্পন্ন করছে। দুজনেই কোনো আগ্রহবোধ ছাড়াই খাবার খাচ্ছে। ডিনার শেষে ওরকম নীরবতার গায়ে ভর করে ফিরে আসা হলো। আবারও তারা ঘুমাতে একজন বেডরুমে আর অন্যজন স্টাডি রুমে চলে গেল।

২৬

পরের দিন তারা প্রায় এক সপ্তাহ পর নাশতার টেবিলে মুখোমুখি হলো। কথা বলা, দৃষ্টি মেলানোর চেয়ে অধিক সহজ মনে হলো। তারা কথা বলতে চেষ্টা করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে। তারা যেন বিনা দাওয়াতে আগত মেহমানের মতো চুপ করল। দুজনে নিজস্ব অবস্থান থেকে লজ্জাবোধ ও যন্ত্রণাময় অনুভূতিগুলো নিঃশেষ করে আছে। কিন্তু এই মেহমানদ্বয় যেন টেবিল ছেড়ে যেতেও রাজি নন।



এভাবে এক সপ্তাহ পরই সালার আজ বাসায় বানানো লাঞ্চ অফিসে নিয়ে যাচ্ছে। সে ইমামাকে বলতে পারল না যে, এক সপ্তাহ যাবৎ সে বাসায় খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। এই বাসা এতদিন তার কাছে ভূতের বাংলো হয়ে ছিল। বাসা থেকে বের হতে হতে সে ইমামাকে বলল, 'আমার ড্রয়ারে তোমার আংটি রাখা, ওটা পরে নিয়ো।'

ইমামা যেন বিদ্যুত্যাড়িত হয়ে হাতের দিকে তাকাল।

: 'আমার আংটি?' আংটির কথা তার এই প্রথম মনে পড়ল। 'ওটা আমি কোথায় ফেলে রেখেছিলাম?'

: 'আমার অফিসের ওয়াশরুমো।' সালার বের হতে হতে প্রতিক্রিয়াহীন চেহারায় বলল। আর ইমামা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঠাঁয়।

অনেক দিন পর সালার আজ রাতে আগ্রহভরে খাবার খেল। সে সাধারণত একটি রুটির বেশি খায় না। কিন্তু আজ সে দুটো রুটি খেল।

: 'আরও বানিয়ে দেব?' ইমামা তাকে দ্বিতীয় রুটি নিতে দেখে বলল। ইমামা নিজে ভাত খাচ্ছে।

: 'না, আমি আগে থেকেই বেশি খেয়ে ফেলেছি।' সালার না করে দিল। ইমামা তার প্লেটে খানিক সবজি দেওয়ার চেষ্টা করল। সালার তাকে থামিয়ে দিল।

: আমি সবজি ছাড়া এমনিই খেতে চাচ্ছি।

ইমামা খানিক অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। সালার গভীর চিন্তায় ডুবে এই রুটির টুকরোটি মুখে পুরছে। ইমামা

জানে, তার হাতের রুটি তার খুব পছন্দ। কিন্তু ইমামা তাকে আজ প্রথম শুধু রুটি খেতে দেখছে। আর আজই প্রথম, সে তাকে লোকমাটি খাইয়ে দিল না। খাবার খেয়ে সালার টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। ইমামা প্লেট গোছাতে লাগল। এমন সময় সালার কিছু কাগজ নিয়ে এলো।

: 'এটা কী?' ইমামা তার দিকে বাড়ানো কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: 'বসে দেখে নাও।' বলেই সালার নিজেও চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ইমামা কিছুটা অস্থির হয়ে কাগজগুলো নিয়ে বসে পড়ল। সেগুলোর দিকে তাকাতেই তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

: 'তালাকের কাগজপত্র?' অনেক কষ্টে ইমামা বলল।

: 'না, আমি আমার উকিলের মাধ্যমে একটি তালাকনামা তৈরি করেছি। আল্লাহ না করুক, যদি কখনো এমন পরিস্থিতি আসে, আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হয়, তাহলে তখন যেন সবকিছু সৌহার্দপূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারে, তারই প্রচেষ্টামাত্র।

: 'তোমার কথা আমার বুঝে আসছে না।' ইমামা এখনো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে।

: 'ভয় পেয়ো না, এটা কোনো হুমকি নয়। এই কাগজগুলো আমি তোমার নিরাপত্তার জন্য তৈরি করেছি।' বলতে বলতে সালার তার কম্পনরত হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নিল।

: 'কেমন নিরাপত্তা?' তার এখন শীতল ঘাম বেরোচ্ছে।

: যদি কখনো আমরা আলাদা হয়ে যাই, তখন আর্থিক নিরাপত্তা ও সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার কাছে দিয়েছি।

: 'কিন্তু আমি তো তালাক চাচ্ছি না।' তার সমস্ত কথা ইমামার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে।

: 'আমিও তোমাকে তালাক দিচ্ছি না। কেবল আইনের আওতায় নিজেকে আবদ্ধ করছি। যাতে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হলে আমাদের আদালতের শরণাপন্ন হতে না হয়। পরিবারের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করব। আর যদি সমাধান না হয়, তাহলে আমি তোমাকে বিচ্ছেদের অধিকার দিয়ে দেব। এমতাবস্থায় যদি আমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের হেফাজতের দায়িত্ব তোমার কাছে হস্তান্তর করব। একটি বাড়ি এবং কিছু অর্থও তোমার হাতে তুলে দেব। বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত তোমাকে মোহরানা, উপহার, অলংকার বা টাকা এবং সম্পত্তি হিসেবে যা কিছু দেব, সেগুলো খুলা বা তালাকের পরও তোমার মালিকানাতেই থাকবে। সেগুলোর দাবি আমি করব না।

: 'এসব তুমি কেন করছ?' ইমামা প্রচণ্ড ভীত-সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তাকে থামাল। আমি নিজেই নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি,

তাই।' সালার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছে। 'আমি কখনো ভাবিনি যে, তোমার ওপর এতটা রেগে যেতে পারি। আমি তোমাকে ঘর থেকে বের করিনি। কিন্তু আমি সেদিন এটাও পরোয়া করিনি যে, বাসা ছেড়ে তুমি যাচ্ছ তো, কেন যাচ্ছ এবং কোথায় যাচ্ছ? আমি এতটাই রাগান্বিত ছিলাম যে, আমার কোনো ভ্রক্ষেপ ছিল না, নিরাপদে তাম ওখানে পৌঁছেছ কি না।' সালার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে চলল। 'তাছাড়া এতদিন আমি ডাক্তার সাহেবের কথাও শুনিনি। I just wanted to punish you. আমি কেবল তোমাকে শাস্তি দেবার কথাই ভেবেছি।' সে এক মুহূর্তের জন্য থামল। 'আর এই সবকিছু আমাকে ভীত করে দিয়েছে। আমার রাগ শেষ হওয়ার পর, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, আমি এতটা নিচে নামতে পারি! আমি তোমার সাথে এমন দুর্য্যবহার করতে পারি! কিন্তু তা আমি করেছি। সবশেষে আমি মানুষই। তোমাকে জীবনসঙ্গী না ভেবে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলে হয়তো ভবিষ্যতে এমনটাই করব। এখন বিয়ের অল্প কিছুদিন হয়েছে। তোমার প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা এখন। আনন্দের সঙ্গেই এসব প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। সবকিছু উৎসর্গ



করতে পারি তোমার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পর এমন কোনো পরিস্থিতি এলে, জানি না তখন আমাদের মাঝে কতটা তিক্ততা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমি এতটা উদার ও দানশীল থাকব না। একজন সাধারণ পুরুষের মতোই স্বার্থপর হয়ে তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলব। তাই এখনই আমার মন উদার থাকতেই এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে চাচ্ছি। এ নিয়ে কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেব না। আমার পক্ষ থেকে আমার বাবার স্বাক্ষরও রয়েছে এতে। তুমি ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকেও এতে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ো। ডাক্তার সাহেব ইচ্ছা করলে এই কাগজগুলো নিজের কাছেই রাখতে পারেন। অন্যথায় তুমি আমাকে এনে দিয়ো, আমি রেখে দেব।"

ইমামা অশ্রুসিক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'আমি তোমার কাছে কোনো নিরাপত্তা দাবি করিনি।' ইমামার গলা প্রচণ্ড ধরে

এলো।

: 'কিন্তু আমার তো দিয়ে দেওয়া উচিত। আমি এসব কাগজ আবেগের বশীভূত হয়ে দিচ্ছি না। এগুলো অনেক ভেবে-চিন্তে করছি। তোমার ব্যাপারে আমি অনেক অধিকারপরায়ণ ও নিরাপত্তা-শঙ্কিত, ইমামা!' সালার এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে থামল। 'আর যদি কখনো এমন হয় যে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও, কিন্তু আমি চাই না; এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কতটা অতিষ্ঠ করে তুলতে পারি, তা ভাবতেও পারবে না তুমি। কিন্তু তা আমি বুঝে গিয়েছি। তাই এসব করছি।' সালার পুনরায় থেমে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। 'তুমি আমার এমন একমাত্র সম্পত্তি, যাকে আমার অধিকারে রাখার জন্য যেকোনো অন্যায় ও অবিচার করতে দ্বিধাবোধ করব না। আর এই অনুভূতিটি আমার জন্য অনেক ভীতিকর। কিন্তু আমি তোমাকে কোনোনা. আর না তোমার অধিকার হরণ করতে চাই। যতদিন আমরা একসাথে থাকব, অনেক সুন্দরভাবে থাকব। আর যদি কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তাহলে আমি চাই একে অপরকে কোনো

কষ্ট না দিয়ে যেন তা হই।' সালার তার হাতে আলতো চাপড় দিতে দিতে উঠে চলে গেল। ইমামা কাগজগুলো হাতে নিয়ে ওভাবেই বসে রইল।

২৮

: 'গাছগুলোতে পানি দাও না কবে থেকে?' পরদিন সকালে ইমামা নাশতা করতে বসে সালারকে জিজ্ঞেস করল।

: 'গাছগুলোতে?' সালার চমকাল। 'জানি না, হয়তো অনেকদিন হয়ে গিয়েছে।' সে বিড়বিড়াল।

: 'সব গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।' ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হচ্ছে। সে জিম থেকে ফিরে সবসময় গাছগুলোতে পানি দেয়। ইতিপূর্বে ইমামা কখনো তাকে এই রুটিন ভুলতে দেখেনি। সালার এক টুকরো পাউরুটি খেতে খেতে হুট করে

উঠে সোজা ব্যালকনির দরজা খুলে, বাইরে চলে গেল। কয়েক মিনিট পর খানিক অস্থির হয়ে ফিরে এলো।

: 'হ্যাঁ, আমার মনেই ছিল না।' আজ নাশতা শেষ করে সে ওগুলোতে পানি দিল।

: 'তোমার গাড়ি আপাতত আমি ব্যবহার করছি। দুচারদিনের মধ্যে আমার গাড়ি চলে আসবে, তখন তোমারটা রেখে দেব।' সালার পুনরায় চেয়ারে বসতে বসতে ইমামাকে বলল।

: তোমার গাড়ি কোথায়?

: 'ওয়ার্কশপে রেখে এসেছি, ধাক্কা লেগেছিল।' সালার স্বাভাবিকভাবে তাকে বলল। ইমামা চমকে উঠল।

: কীভাবে ধাক্কা লাগল?

: 'জানি না কীভাবে লেগেছে। কারও গাড়ির পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম।' সালার খানিক দুঃখ প্রকাশক ভঙ্গিতে তাকে বলল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সালার পাউরুটিতে মাখন লাগাতে লাগল। সালার অত্যন্ত দক্ষ ড্রাইভার, এটা অসম্ভব যে, সে পেছন থেকে কোনো গাড়িকে ধাক্কা মারবে!

সংসারে আগত ফাটলের প্রতিক্রিয়া নারী ও পুরুষের মাঝে বিভিন্নভাবে বহিঃপ্রকাশ হয়। নারীর অস্থিরতা অশ্রু ঝরানোতে, খাবার না খেয়ে অসুস্থতা অবধি হয়। পুরুষ এগুলোর কোনোটিই করে না। তার প্রতিটি প্রতিক্রিয়া তার চারপাশের জগতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু সেই সম্পর্কটি তাদের দুজনের মাঝে একটি প্রতিচ্ছবি ভাঙনের মুখোমুখি হলেও সেই প্রতিচ্ছবি তার রেশ রেখে যায়। ইমামা তার মুখ থেকে রেখে যায়। সম্পর্কটি পোক্ত কিংবা দুর্বল হলেও। কিংবা দুজনের সম্মতিতে সম্পর্কটি চোখ সরিয়ে নিল।

আজ রাতে সালার ওই ঘটনার পর এই প্রথম ডাক্তার সাহেবের বাসায় উনার আলোচনা শুনতে এলো। সব সময়ের মতো ইমামা আজও তার সাথেই এসেছে। সাধারণত সে এখানে আসার সময় ইমামাকে সাথে নিয়ে আসে। কিংবা সায়েদা আন্নার বাড়িতে রেখে আসে। উনার বাড়ি এখান থেকে মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের পথ। সালার যতক্ষণ আলোচনা শোনে, ইমামা তখন সায়েদা আন্না কিংবা কুলসুম আন্টির সাথে বসে থাকে। তারপর সে ওখান থেকে খাবার খেয়ে ফিরে আসে।

ডাক্তার সাহেব আজও উষ্ণ অভ্যর্থনার পরিবর্তে, কেবল মুসাফাহা করেই তার সাথে দেখা করলেন। আলোচনার পর খেতে বসেও তিনি সালারের প্রতি আগের মতো গুরুত্ব দেখালেন না। খাবারে ফোরকানও রয়েছে। ডাক্তার সাহেব পুরো সময় ফোরকানের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত রইলেন। সালারের সাথে কেবল আন্টি অল্প কিছু কথা বললেন। ডাক্তার

সাহেবের এই আচরণ সালারের চেয়ে বেশি ইমামাই উপলব্ধি করল। সে ডাক্তার সাহেবের মাঝে এমন আচরণ এই প্রথম দেখেছে। এই আচরণ এবং মনঃক্ষুণ্ণতা কেবল তার জন্যই। এর কারণ সে নিজেই, ইমামা তা স্বীকার করল। তা সত্ত্বেও উনার আচরণ বা সালারকে উপেক্ষা করাটা তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিল। এসব ভেবে ফেরার পথে গাড়িতে বসে বসেও ইমামা অনেক অস্থির হয়ে রইল।

৩০

: 'আবু, আপনি সালারের সাথে ভালোভাবে কথা বলেন না কেন?' ইমামা পরদিন দুপুরে ডাক্তার সিবতে আলির বাসায় গেল। তখন অফিস থেকে ফেরার পর উনাকে বলল।

: 'কীভাবে কথা বলা উচিত?' তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন।

‘যেভাবে আগে বলতেন।’



‘আগে সালার এসব করেনি। তার প্রতি আমার অনেক সুধারণা ছিল।’ তিনি শান্তভাবে বললেন।

: ‘আব্বু, সে খারাপ নয়। সে অনেক ভালো। আমার ভুল ছিল, আর নয়তো বিষয়টা এতদূর গড়াত না। সে আমাকে অনেক সম্মান করে। অনেক খেয়াল রাখে আমার। কিন্তু এই ঘটনার পর সে খুবই চিন্তিত।’ ইমামা মাথা নিচু করে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ‘আপনি তাকে এমন উপেক্ষা করলে আমার খুব খারাপ লাগে। নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। এই আচরণ তো তার প্রাপ্য নয়। ফোরকান ভাইয়ের সামনে কতটা অসম্মানবোধ হয়ে থাকবে তার!’ ইমামা প্রচণ্ড মনঃক্ষুব্ধ হয়ে আছে। ডাক্তার সিবতে আলি সহসাই হেসে উঠলেন। ইমামা চোখ তুলে তাকাল।

: ‘আমি জানি সালার খারাপ মানুষ নয়। সে চিন্তিত ও লজ্জিত। আমি এও জানি যে, তার ভুল খুব বেশি নয়। তার সাথে আমার এই আচরণ আপনার খারাপ লাগে, সেটাও আমি জানি।’ ইমামা

অবাক চোখে ডাক্তার সিবতে আলির মুখ দেখতে লাগল। 'বেটি, আমি তোমাকে কেবল এই কথাটিই বোঝাতে চাচ্ছিলাম, পুরুষ যখন রেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সে যেভাবে যায়, ওভাবেই ফিরে আসে। তার ঘর ছাড়ার ফলে, না তার নিজের আত্মসম্মানে কোনো ঘাটতি হয়, আর না তার স্ত্রীর সম্মানে কোনো ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু নারী যখন রেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন নিজের এবং স্বামীর, দুজনের সম্মান নিয়েই বেরিয়ে যায়। সে ফিরে এলেও, স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্মানেই ব্যাঘাত ঘটে। ঝগড়া হয়েছে, কোনো বিষয় না। রেগে সে ভালো-মন্দ বলেছে। চলে যেতে বলেছে। আপনি বাসার অন্য কোনো রুমে চলে যেতেন। সে তো হাত ধরে বের করে দিচ্ছিল না। সকাল হতে হতে তার রাগ পড়ে যেত। দুয়েক দিনেই বিষয়টি সমাধা হয়ে যেত। এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াত না!' তিনি সাবলীলভাবে তাকে বোঝাতে লাগলেন। 'পুরুষের হৃদয়ে ওই নারীর প্রতি কখনো সম্মান জাগে না, ছোটখাটো কথায় যে নারী ঘরের সীমানা পেরোতে অভ্যস্ত। আর আপনার সাথে এটি দ্বিতীয়বার হয়েছে।'

ইমামা চমকে ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকাল। তিনি মুচকি হাসলেন। 'আপনার মনে আছে? বিয়ের পরের দিনই আপনি রাগ করে সায়েদা আম্মার কাছে চলে গিয়েছিলেন।' ইমামা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। এ ঘটনাটি তার মনে ছিল না। 'পুরুষের সাথে আমিত্বের প্রতিযোগিতাকারিণী নারী নির্বোধ। সে পুরুষকে তার শত্রু বানিয়ে ফেলে। উগ্রতা দেখিয়ে, জেদ করে পুরুষকে কোনো বিষয় মানানো যায়; কিন্তু তার মনে নিজের ভালোবাসা ও সম্মান বাড়ানো যায় না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক মহব্বতকারী এবং বহুল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী স্বামী দিয়েছেন। সে আপনার দোষ খোঁজেনি। বরং ক্ষমা চেয়ে আপনাকে সাথে নিয়ে গিয়েছে। অনেক কম পুরুষের মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তাই তার দ্বারা কখনো যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, কিংবা আপনার মনে যদি কোনো অভিযোগ জাগে, তাহলে তার অনুগ্রহগুলো মনে করার চেষ্টা করবেন।' ইমামা মাথা নত করে উনার কথা শুনতে থাকল।

'আপনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন যদি আমি আপনাকে এসব বলতাম, তাহলে কখনোই আপনি তখন আমার কথা বুঝতেন না। আপনার তখন মনে হতো, আপনার নিজের মা-বাবা থাকলে তারা এমন পরিস্থিতিতে উলটো আপনাকে বোঝাত না। কেবল সমর্থন করত। এজন্যই আমি এসব আপনাকে তখন বোঝাইনি।'

তিনি ঠিকই বলছেন। ওই মহর্তে তিনি এসব বললে, সে প্রচণ্ড মনঃক্ষুব্ধ হতো। ইমামা কিছুই না বলে চুপচাপ, সালারের দেওয়া কাগজগুলো বের করে উনার হাতে তুলে দিল। 'এগুলো আমাকে সালার দিয়েছে। কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন নেই আমার। আপনি তাকে জানিয়ে দিয়েন।'

হাসতে লাগলেন। ডাক্তার সিঁতে আলি গভীর মচকি হেসে কাগজগুলো পড়তে থাকলেন। তারপর

: 'সে এটি অনেক যুক্তিযুক্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ করেছে। আমার কাছে আগত বেশিরভাগ পুরুষকে আমি এসব বিষয়ে এমন নিষ্পত্তির কথা বলি। অনেক পুরুষ করেছেও। সালারের মাথায়ও এই বিষয়টি রয়েছে। কিন্তু সে আপনার জন্য একটু বেশিই করে ফেলেছে।' তিনি কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগলেন।

: 'কিন্তু আমি...।' ইমামা কিছু বলতে চাইল। তখনই ডাক্তার সাহেব তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনিও তার একটু বেশি খেয়াল রাখবেন।' বলতে বলতে তিনি এখন তার কাগজগুলো ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। এ যেন আলোচনা শেষ করার ইঙ্গিত!

৩১

পুরো রাত্তা সে ডাক্তার সাহেবের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে থাকল। ইতিপূর্বে তিনি কখনো তাকে কোনো নসিহত করেননি।



এটাই প্রথম ক্ষেত্র, যেখানে তাকে নসিহত করলেন। ইমামার কোনো না কোনো ভুল তার চোখে অবশ্যই পড়েছে, যার জন্য তাকে এভাবে নসিহত করেছেন। রান্না করতে করতেও সে তার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে থাকল।

: 'তুমি ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়েছিলে?' সালার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেই তাকে প্রশ্ন করল।

: 'হ্যাঁ, তুমি কীভাবে জানলে?' ইমামা এখন টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে। 'তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন।' সালার গলা থেকে টাই খুলতে খুলতে বলল।

: 'ওহ, কিছু বলেছেন তোমাকে?' সে সালারের মুখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

: না, এমনিই কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন।

ইমামার মনে হলো সালার তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।
অভ্যাসমতো কাপড় পালটাতে বেডরুমে না গিয়ে টাই খুলে
উদ্দেশ্যহীন কিচেন কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ডিশ
থেকে সালাদ খেতে লাগল।

: 'আজ খাবারে কী কী করেছ?' বিয়ের এত মাস পর আজ প্রথম
সালার এই প্রশ্ন করল। ইমামা তাকে খাবারের আইটেমগুলোর
নাম বলল, কিন্তু সে মনে মনে তার এই প্রশ্নে অবাক হলো।
'আর মিষ্টি?' এই প্রশ্নটি যেন আগের চেয়ে বেশি অবাক করল।
ও মিষ্টি পাগল নয়। 'আগামীকাল চাইনিজ বানিয়ে।'

ইমামা তার মুখে চাইনিজের কথা শুনে আরও একবার নির্বাক
হয়ে রইল। কবে সে খাওয়ার জন্য এমন ফরমায়েশ করেছে!

: 'গতকালও চাইনিজ ছিল।' ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের
করতে করতে ইমামা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। সে অপ্রস্তুত
হয়ে পড়ল।

: হ্যাঁ, গতকাল চাইনিজ ছিল, আগামীকালও থাকুক। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, এতে কোনো সমস্যা নেই।

ইমামা কেবল মাথা নাড়ল। সে এখন রুটি বানানোর জন্য ফ্রিজ থেকে আটা বের করছে।

: অ্যাকুয়া ক্লু কালারে তোমাকে সুন্দর লাগছে।

ইমামা ফ্রিজের দরজা খুলতে খুলতে যেন তড়িতাহত হয়ে পেছন ফিরে হতভম্ব হয়ে সালারের দিকে তাকাল। 'আ...আ... অ্যাকুয়া ক্লু নয় এটা?' ইমামার চোখের অভিব্যক্তি তাকে অপ্রস্তুত করে দিল।

: 'সালার! তোমার সমস্যা কী?' ইমামা বলল।

: 'কেন, কী হয়েছে? আমার মনে হলো এটা অ্যাকুয়া ক্লু।

: এটা তো অ্যাকুয়া ব্লু-ই। এজন্যই তো জিজ্ঞেস করছি, সমস্যা কী?

তার কথা শুনে সালার অনাকাঙ্ক্ষিত হাসতে লাগল। তারপর চুপচাপ সামনে এগিয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরল। "Just wanted to thank you. কেবল তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছিলাম।" ইমামা তাকে বলতে শুনল। ইমামা জানে, কী জন্য তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। "and I am really really sorry.... I meant it. আর আমি সত্যিই দুঃখিত, আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল এটা।" সালার এখন পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করছে।

: 'I know. আমি জানি।' ইমামা মৃদুস্বরে বলল।

: 'I love you. ইমামার মন ভরে গেল। তাদের বিবাহিত জীবনের কেবল গত দশটি দিন, যেখানে সে একবারও সালারকে এই বাক্যটি বলতে শোনেনি। প্রথমদিকে ইমামা



ডাক্তার সাহেবের বাসায় থাকার ফলে উভয়ের মাঝে যোগাযোগ হতে পারেনি। আর পরবর্তী সময়ে সালার হয়তো তাকে এটি বলার সাহস করতে পেরে ওঠেনি। সে তাকে ফোনে এটা বলতে না পারলেও, মেসেজে কিছু না কিছু লিখে পাঠাত। 'ওয়াইফ, ওম্যান, সুইটহার্ট, ডার্লিং, হানি, ডিয়ার, মাইন, ইউরস, ইউ, বেস্ট, ওয়াইটিং, মিসিং, ব্যাটার হাফ, হোপিং, থিঙ্কিং, মিসেস, পার্টনার, ফ্রেন্ড, বিউটি।

: 'শুধু 'লাভ' কেন লেখো না তুমি? এটা পুরো কেন লেখো?'
ইমামা বিষয়টি

লক্ষ করল।

: 'কখনো বলব তোমাকে।' সালার তাকে বুঝিয়ে নিল। সে তাকে বলতে পারল না যে, 'লাভ' শব্দটি নিয়ে সে ভীত ছিল। তার স্মৃতিতে যদি ইমামার ছবি ভাসে, তাহলে ইমামার স্মৃতিতে কার ছবি ভাসে? আর এখন সেই এক শব্দের ধাঁধা অদৃশ্য হয়ে

যেতেই, তার মূল্য ও গুরুত্বের উপলব্ধি হচ্ছে। অবচেতনেই ইমামা তার কাছে সেই প্রশংসা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের প্রত্যাশা করতে শুরু করেছে। আর যখনই এসব অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন ওসব মজার আর ঠাট্টাচ্ছলে বলা সাধারণ কথাও তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে সালার তার বাহু থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

: 'তুমি কীভাবে বুঝলে যে এটা অ্যাকুয়া ক্ল?' আঙুলের ডগা ছুঁয়ে চোখ মুছতে মুছতে ইমামা প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করল।

: 'তুমি সবসময় রঙের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম বলো। তাই এবার ক্লর কথা ভাবতেই, অ্যাকুয়া ক্লর কথা মনে এসে গেল।' সালার সহজ স্বরে বলল। ইমামা খিলখিল করে হাসতে লাগল। ইমামা এখন বুঝতে পারল, সালার সত্যি কালার ব্লাইন্ড বা রঙান্ধ।

: 'ভেরি স্মার্ট!' ইমামা যেন তাকে বাহবা দিল।

: তুমি কি তা-ই মনে করো?

: হ্যাঁ।* 'তাহলে ধন্যবাদ।' বলতে বলতে সালার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামা তাকে চলে যেতে দেখাচ্ছে।
বিয়ে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত সম্পর্ক। দূরে গেলে বাধার
প্রাচীর তৈরি হয়ে যায়, আর কাছে এলে কাগজের ফিনফিনে
দেওয়ালও অদৃশ্য হয়ে যায়। অসন্তুষ্ট হলে অভিমান ভাঙতে
সমুদ্রও কম হয়ে যায়। আর ভালোবাসা জাগলে সেই
অভিমানগুলোই মৃত মরুভূমিতে জল হয়ে যায়। রাগ হলে
একে অপরের চেহারা দেখতেও চায় না। আর রাগ পড়ে গেলে
একে অপরকে ছাড়া স্বস্তি পায় না। তারাও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে
আবদ্ধ হওয়ার পর, এই সম্পর্কের সমস্ত উত্থান-পতন পার
করছে। আর বিগত দশ দিন ছিল তাদের জীবনের প্রথম পতন।



: 'কী নিবে তুমি?' সালার মেন্যু কার্ডের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল।

: 'আমি তো চিংড়ি মাছের কোনো একটি আইটেম ট্রাই করব। তুমি দেখো, তুমি কী নেবো।' ইসলামাবাদে এসে দ্বিতীয়বার বাইরে খাবার খেতে বের হয়েছে তারা। আজ সতর্কতামূলক নতুন একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট নির্বাচন করেছে। তাদের ধারণা ছিল না, তাদের সমস্ত সতর্কতা আজ কোনো কাজে আসবে না।

পনেরো মিনিট পর খাবার পরিবেশন করা হলো। তারা খাবার খেতে লাগল। খাওয়ার মাঝখানে ওয়েটার একটি চিরকুট এনে সালারের হাতে দিল। সে খানিক হতভম্ব হয়ে চিরকুটটির দিকে তাকিয়ে, তা পড়তে লাগল।

: আপনারা দ্রুত এখান থেকে সরে পড়ুন!



সালার খানিক অস্থির হয়ে মাথা তুলে ওয়েটারের দিকে তাকাল। তার কিছুই বুঝে এলো না।

: 'এটা কী?' ওয়েটারকে সে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু তার উত্তর দেওয়ার আগেই কিছু একটা বিদ্যুতের মতো তাকে ছুঁয়ে গেল। সে বুঝে গেল এর মানে কী। প্রচণ্ড তাড়াহুড়োয় ওয়ালেট থেকে কিছু কারেন্সি নোট বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে, ওয়েটারকে সে বিল বুঝে নিতে বলল। ইমামা অস্থির হয়ে তার মুখের দিকে তাকে দেখতে থাকল।

: 'খাবার রাখো! আমাদের এখনই উঠতে হবে।' সালার দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

: 'কিন্তু কেন?' ইমামা কিছুই বুঝতে পারছে না। কেননা, তারা মাত্রই খেতে শুরু করেছে। এটা তোমাকে বাইরে গিয়ে বলছি ইমামা! জলদি তোমার ব্যাগ নাও।' সালার চেয়ার ধাক্কা দিয়ে

পেছন ফিরে তাকাল, আর ঝুন্ধ হয়ে গেল। তাদের বের হতে হতে একটু দেরি হয়েই গেল। সালার একটু সামনেই হাশেম মুবিনের সাথে ওয়াসিম এবং তার বড় ভাইকে দেখতে পেল। তারা এদিকেই আসছে!

সে দ্রুত ইমামার চেয়ারের দিকে এলো। ইমামা টেবিলের নিচে পায়ের কাছ থেকে ব্যাগ ওঠাচ্ছে। সে এখনো তাদের আসতে দেখেনি। তার কাছে সালার আসতেই, ব্যাগ তুলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই সেও তার পরিবারের সদস্যদের তাদের দিকে আসতে দেখল। মুহূর্তেই তার রক্ত শুকিয়ে গেল। সালার চুপচাপ তাকে নিজের আড়ালে নিয়ে নিল। তাদের টেবিলটি জানালার পাশে। ইমামার পেছনেই সেই জানালা।

: 'সামনে থেকে সরো!' কাছে আসতেই হাশেম মুবিন বজ্রকণ্ঠে বললেন। আশেপাশে উপবিষ্ট লোকেরা একেবারে তাদের দিকে মনোযোগী হয়ে গেল। শুধু কাস্টমাররাই নয়, বরং অন্যান্য টেবিলে পরিবেশনরত ওয়েটারদের চোখও চাতক

হয়ে গেল। এখানে সর্বশেষ যে বিষয়টি ঘটার সালার আশঙ্কা করেছিল, এখন ঠিক সেটিই হচ্ছে।

: 'আপনি আমাদের সঙ্গে বাসায় চলুন। ওখানে বসে কথা বলি।' সালার অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে হাশেম মুবিনকে বলল। প্রত্যুত্তরে তিনি একটি গালি দিয়ে তার কলার চেপে ধরলেন। তারপর টেনে একপাশে সরানোর চেষ্টা করলেন। হাঁক ছেড়ে ডাক দিয়ে তিনি ইমামাকে নিয়ে যেতে ওয়াসিম ও আজিমকে বললেন। হাশেম মুবিনের বিপরীতে, ওয়াসিম ও আজিম কোনো ভাবনায় যেন স্থির হয়ে আছে। তারা জানে, এভাবে কাউকে জোর করে রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, সিকিউরিটির মুখোমুখি না হয়ে নিরাপদে সেখান থেকে বের হওয়া কঠিন।

ইমামা সালারের পেছনে সালারের শার্ট ধরে কাঁপতে কাঁপতে যেন তার সঙ্গে মিশে আছে। হাশেম মুবিন সালারের কলার চেপে তাকে ধাক্কা দিতেই, সালারও প্রতিরোধ করতে গিয়ে

উলটো তাকে পেছন দিকে ধাক্কা দিল। এই ধাক্কাই যথেষ্ট প্রমাণিত হলো। হাশেম মুবিন এতে পা পিছলে নিচে পড়ে গেলেন। রিসেপশন থেকে ততক্ষণে বাইরের গার্ডদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য টেবিলে উপবিষ্ট লোকেরা কিছুটা হিংস্র ভঙ্গিতে এসব দেখতে লাগল। ওয়েটাররা তখন তাদের দিকে দ্রুত বেগে আসতে লাগল। সালারের ধাক্কাটি আজিমকেও উত্তেজিত করে দিল। সেও সালারকে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে, উন্মাতাল হয়ে সামনে এগিয়ে এলো। সে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে সালারের চোয়ালে ঘুসি বসিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সালারের চোখের সামনে বাস্তবিকই অন্ধকার ছেয়ে গেল। সালার এই ঘুসির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সালার খানিক একপাশে সরতেই আজিম তার পেছনে ইমামার কাছে পৌঁছে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে সালারের পেছনে লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আজিম তাকে বাহু দিয়ে চেপে ধরে, সালারের থেকে আলাদা করতে করতে, ইমামার গালে কষিয়ে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল। সালার ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে ছাড়ানোর জন্য পেছন ফিরল। আর তখনই

তার বাম কাঁধের পেছনে ব্যথার তীব্র একটি স্রোত গর্জে উঠল। সে ঠোঁট চেপে চিৎকার গিলে ফেলল। এটি হাশেম মুবিনের কাজ। তিনি টেবিলের উপর থেকে একটি ছুরি নিয়ে সালারের পিঠে আঘাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরে পড়ায় সেটি তার বাম কাঁধে গিয়ে লেগেছে।

সিকিউরিটি ও অন্যান্য ওয়েটার ততক্ষণে তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। সালার তার কাঁধের পেছন থেকে ছুরিটি বের করে নিল। গার্ডরা এখন তাদের তিনজনকেই ধরে ফেলেছে। ছুরিটি ধারালো হলে, ক্ষত অত্যন্ত ভয়াবহ হতো। কিন্তু এখনো ওই ছুরির অপরাপ্ত তার কাঁধে ঢুকে আছে। ইমামা না হাশেম মুবিনকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে দেখেছে, আর না সালারকে সে ওই ছুরি বের করতে। গার্ডরা সালারকে আজিমের কাছ থেকে ছাড়িয়ে, আজিমকে তাদের আয়ত্তে নিয়ে নিল। ততক্ষণে সালার তার জিপ্সের পকেট থেকে ফোন বের করে সিকান্দার উসমানকে সেখানে আসতে বলে দিল। সালারের চেহারা যন্ত্রণার প্রভাব পরিদৃশ্যমান। তা সত্ত্বেও সে তার গলা

সর্বোচ্চ স্বাভাবিক রেখে সিকান্দারের সাথে কথা বলল। অপর হাতে সে তার ক্ষতস্থান চেপে ধরে রেখেছে। চেপে ধরা সত্ত্বেও তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। সেইসাথে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত রক্তের সিক্ততা অনুভব করতে লাগল। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, কী পরিমাণ রক্ত ঝরছে।

ফোনে সালারের কথাবলাকালীন গার্ডরা হাশেম মুবিন, ওয়াসিম এবং আজিমকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। রেস্টুরেন্টের পুরো হলে প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছে। কিছু লোক ওখান থেকে উঠে চলে গিয়েছে। আর যারা ওখানে বাকি ছিল, তারা এখন তাদের দুজনকে দেখছে।

: 'আপনার এখন প্রাথমিক চিকিৎসা দরকার। আপনি চলে আসুন।' ম্যানেজার তার পিঠে প্রবহমান রক্ত দেখে খানিক চিন্তিত হয়ে বললেন। তিনি নিশ্চয় ভাবছেন, তারা এখানে থাকলে রেস্টুরেন্টের চিত্র স্বাভাবিক হবে না। ম্যানেজারের এই কথায় ইমামা খানিক অস্থির হয়ে সালারের দিকে তাকাল।

সালার এখন ফোনে কথা শেষ করছিল। ইমামা এই প্রথম তার অপর হাতের দিকে লক্ষ করল। যে হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে আছে।

: 'কী হয়েছে?' ইমামা খানিক আতঙ্কিত হয়ে বলল।

: 'কিছু না।' সালার তার বাহু সোজা করল। ইমামা তার রক্তে রঞ্জিত আঙুলগুলো দেখল। সে ভাবল, তার হাত হয়তো কেটে গিয়েছে। 'পাপা আমার সাথেই।' সালার ইমামার শব্দ চয়নের দিকে লক্ষ না করেই বলল।

'আমি আমার আববুর কথা বলছি।' ইমামা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল। সালার কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না। সালার না চাইতেও এই মুহূর্তে হাশেম মুবিনের ব্যাপারে তার দুশ্চিন্তার বিষয়টি খারাপ লাগল।

: তারা তিনজনেই এখন পুলিশ হেফাজতে আছে। এখানকার কাজ সেরে আমরা ওখানেই যাব।

ইমামার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বাপ-ভাইদের জেলখানায় থাকার কল্পনাটি তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সালারের আঘাতের ব্যাপারে উদাসীন করে দিল।

: সালার, প্লিজ তাদের মাফ করে দাও। তাদের ছাড়িয়ে দাও।

সিকান্দার তখন সালারের পাশেই। তাই ইমামাকে সে কিছুই বলতে পারল না। কিন্তু সে মনঃক্ষুণ্ণ হলো। কেননা, ইমামা তার চেয়ে বেশি তার পরিবার নিয়ে ভাবছে। সে নিজে আহত। অথচ সে এতটুকু জিজ্ঞেস করার কষ্টটুকু করল না, সে এখন কেমন আছে। তার ব্যান্ডেজ হয়ে গিয়েছে কি না, কিংবা ক্ষত গভীর কি না।

: 'আমি তোমার সাথে পরে কথা বলব।' সালার কোনো উত্তর না করে কল কেটে দিল। চেকআপ ও ব্যাণ্ডেজে তাদের এক ঘন্টা লেগে গেল। সৌভাগ্যক্রমে তার কোনো রগ কিংবা শিরা কাটেনি। ক্লিনিকেই সিকান্দারের পরিবার আসতে শুরু করেছে। এদিকে সিকান্দারের উত্তেজনা দেখে সালার বুঝে গেল, বিষয়টি ইতিমধ্যে অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে। সে নিজেও প্রচণ্ড রেগে থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করতে চাচ্ছে। কিন্তু সিকান্দার নয়।

আধা ঘন্টা পরেই শাহ নেওয়াজের স্ত্রী এবং দুই পুত্রবধূ বাসায় ফিরে এলো। ততক্ষণে তাইয়েব্বাও এখানে চলে এসেছেন। সিকান্দার আপাতত নিজের বাসায় না থাকা উত্তম মনে করলেন। শাহ নেওয়াজের স্ত্রী ও পুত্রবধূরা যদিও ইমামার সাথে এ বিষয়ে বেশি কোনো কথা বলেনি, কিন্তু লাউঞ্জে তাইয়েব্বা এবং তাদের মধ্যকার উচ্চৈঃস্বরে চলমান কথাবার্তা শুনতে থাকল। তাইয়েব্বা প্রচণ্ড রেগে আছেন। তাই শাহ নেওয়াজের বাসায় এসেও তিনি ইমামার কাছে এলেন না। ইমামা নিজেও

বাইরে এসে উনার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করতে পারল না। তিনি প্রচণ্ড রাগে হাশেম মুবিন ও তার ছেলেদের ভালো-মন্দ বলতে থাকলেন। আর ইমামা গেস্টরুমে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসব শুনতে থাকল।

এটি তাইয়েবার তিক্ত-কঠোর কথাবার্তা কিংবা নিজের পরিবারের ভবিষ্যৎ অপদস্থতা নয়; বরং জেলখানায় তার বাবা ও ভাইয়েরা কী অবস্থায় আছে, তাদের সাথে না জানি কেমন আচরণ করা হচ্ছে—এসব ভেবেই। সে জানে, তার পরিবার একটি উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী পরিবার। জেলখানায় তাদের সাথে কেউ সাধারণবন্দিদের মতো ব্যবহার করবে না। সে এও জানে, তার পরিবার জেলখানায় থাকা মানে প্রচণ্ড অসম্মানি। সে পুনরায় সালারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। প্রথমবার সালার তার কল রিসিভ করল না। পরেরবার সে ফোন বন্ধ পেল। ইমামা বুঝতে পারল, তার কল এডিয়ে যেতেই সালার ফোন বন্ধ করে ফেলেছে। তার কলের কারণে সালার ফোন বন্ধ করে রেখেছে, আজসহ এমনটি মোট দ্বিতীয়বার হলো।

: 'কেন তাদের ছেড়ে দেব? যাতে তারা পরেবার তোমাকে গুলি করে দেয়, এজন্য?' সালার হাসপাতাল থেকে পুলিশ স্টেশনে যেতে যেতে গাড়িতে বসে, সিকান্দার তাকে বললেন।

: আমি বিষয়টি বড় করতে চাচ্ছি না।

: 'বিষয়টি ইতোমধ্যে বড় হয়ে গেছে। আর এর শুরুটা করেছে তারাই।' সিকান্দার প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছেন।

: 'পাপা, তারা ইমামার পরিবার।' সালার অবশেষে বলল।

: 'না। তারা ইমামার পরিবার ছিল, এখন নেই। ইমামার প্রতি তাদের কোনো গুরুত্ব থাকলে তারা কখনো তার স্বামীর গায়ে হাত তুলত না। এখন যেহেতু তাদের কাছে ইমামার কোনো মূল্য নেই, তাই ইমামারও উচিত তাদের কথা না ভাবা।' তিনি

দুর্বোধ্য বাক্যে যা বললেন, সালারের তা বুঝতে কোনো সমস্যা হলো না। 'এটি একটি সীমা ছিল, আমি চেয়েছিলাম তারা এটি কখনো অতিক্রম না করুক। কিন্তু তারা এই সীমাটিও অতিক্রম করে ফেলেছে। আমার পরিবারের কারও কোনো ক্ষতি হলে আমি তার পরিবারকে কোনো শান্তির স্বর্গে থাকতে দেব না। I will pay them in the same coin. ইটের জবাব ইটেই দেব। এই কথাটি তুমি তোমার স্ত্রীকে বলেও দাও, বুঝিয়েও দাও।

: 'পাপা প্লিজ! বিষয়টির মীমাংসা হওয়া উচিত।' সালার সিকান্দারকে বলল। কেননা, সিকান্দারের উত্তেজিত আচরণ তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলছে। তিনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ধৈর্যশীল। কিন্তু সালার আজ তার নতুন একটি রূপ পর্যবেক্ষণ করছে।

: এই আকাঙ্ক্ষা তাদের করা উচিত। তাহলেই বিষয়টি সমাধা হতে পারে। How dare he touch my son. আমার ছেলের গায়ে হাত তোলার সাহস কোথায় পেল! সে কি ভেবেছে এসব



গুণ্ণামি আমি মুখ বুজে মেনে নেব? এখন পারলে হাজত থেকে বের হয়ে দেখাক!

উনাকে শান্ত করার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। বিষয়টি কতদূর আগাবে, সালার তা বুঝতে পারছে না। পরবর্তী দুই ঘণ্টার ভিতরে সিকান্দার উসমানের পরিবার পুলিশ স্টেশনে জড়ো হয়ে গেল। এদিকে হাশেম মুবিনের পরিবারও এসে ভিড় করেছে। এটি কেবল দুটি প্রভাবশালী পরিবারের সমস্যাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। ইসলামাবাদ পুলিশস্টেশনের সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসারগণ বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন।

হাশেম মুবিনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাপকদের জন্য; যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে। এটি অন্য কোথাও হলে, তিনি সালার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তরে দশ-বারোটি এফআইআর করতে পারতেন। কিন্তু রেস্টুরেন্টের সিকিউরিটি ক্যামেরা হাশেম মুবিনকে একটি দীর্ঘ

সময়ের জন্য হাজতে রাখতে যথেষ্ট। প্রাথমিক রাগ ও উত্তেজনার পর অবশেষে হাশেম পরিবার পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সিকান্দার পরিবার কোনো প্রকার নমনীয়তা দেখাতে প্রস্তুত নয়।

ফজর পর্যন্ত ওখানে বসে থেকেও সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। তারা অবশেষে বাসায় ফিরে এলো। বাসায় ফিরে সবাই সিকান্দারকে কেস তুলে নিতে বোঝাতে লাগল। কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হলো। সিকান্দার এখন এ বিষয়ে তার ভাইদেরকেও জড়ানোর পর এসব এত সহজে শেষ করতে সম্মত নন।

ইমামা শাহ নেওয়াজের বাসায় আসার আগে, সিকান্দারের বাসা থেকে তার প্রয়োজনীয় কাপড় নিয়ে এসেছিল। সালার তার কাছে আসতেই ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আবু ও ভাইয়েরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছে?'

সালারের মাথা যেন ঘুরে গেল। তার মানে সে একমাত্র তার বাপ-ভাইয়ের মুক্তি নিয়েই চিন্তিত। তার ক্ষত কেমন, তার শরীরের কী অবস্থা, এ ব্যাপারে তার যেন কোনো আগ্রহই নেই।

: 'না, আর হবেও না।' সালার প্রচণ্ড অভিমানে বলতে বলতে কাপড় পালটানোর জন্য ওয়াশরুমে চলে গেল। ব্যথানাশক পেইনকিলার ট্যাবলেট খাওয়া সত্ত্বেও সারা রাত সজাগ থাকার ফলে তার অবস্থা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। আর বাকি অবস্থা ইমামার এমন উদাসীনতা পূর্ণ করে দিয়েছে।

: 'তারা এখন পুলিশ হেফাজতে?' সালার ওয়াশরুম থেকে বের হতেই ফুলে ওঠা লাল চোখে তাকে জিজ্ঞেস করল। সালার কোনো উত্তর না করে বিছানায় শুয়ে, চোখ বন্ধ করে ফেলল। ইমামা উঠে তার পাশে এসে বসল।

: 'কেস তুলে নাও সালার! তাদের মাফ করে দাও।' তার বাহুতে হাত রাখতে রাখতে অনুনয় করে বলল। সালার চোখ খুলল।

: ইমামা, এখন আমি ঘুমাতে চাই। তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না।

: 'শহরে আমার আব্বুর কত সম্মান! ওখানে তিনি এখন কেমন আছেন, কীভাবে এসব সহ্য করছেন...'।' সে কাঁদতে লাগল।

কি কোনো সম্মান নেই?' সালার বলতে থাকল। ইমামা মাথা নিচু করে ঠোঁট কামড়াতে : 'সম্মান শুধু তোমার আব্বুরই আছে? আমার, আমার বাবার, আমার পরিবারের কামড়াতে কাঁদতে লাগল।

: এসব আমার ভুল। আমার জন্য হয়েছে এসব। তোমাকে আমার বিয়ে করাই উচিত হয়নি।

: 'তোমার কাছে সব জিনিসের জন্যই দায়ী বিয়ে। আমাকে বিয়ে করে যেন তুমি জাহান্নামে চলে এসেছ। বিয়ে না হলে এখন জান্নাতে থাকতে তুমি, তাই না?' সালার প্রচণ্ড রেগে গেল।

বলতে চাইল। : 'আমি তো তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি তো...।' ইমামা ভয়ে ভয়ে কিছু

: show me some loyalty imama! আমার প্রতিও খানিক আনুগত্য দেখাও, ইমামা! বাপ-ভাইয়ের জন্য যেমন আনুগত্য দেখাচ্ছ।

ইমামা কিছুই বলতে পারল না। সালার যেন তাকে জুতা ছুড়ে মেরেছে। তার চেহারা লাল হয়ে গেল। সে ভাবতেও পারেনি, সালার তাকে কখনো এতটা আঘাত করে কথা বলতে পারে! কিন্তু সে তাকে বলছে। ইমামা আর কোনো কথা না বলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সালার তাকে না থামিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

পুনরায় যখন তার চোখ খুলল, তখন দুপুর সাড়ে বারোটো। কাঁধের যন্ত্রণায় সে জেগে উঠেছে। গায়ে তাপমাত্রাও বেড়েছে। কাঁধ নাড়ানো কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিছানা থেকে উঠতেই তার চোখ পড়ল ইমামার ওপর। সে সোফায় বসে আছে। সালার সোজা ওয়াশরুমে চলে গেল। গোসল সেরে সে বাইরে বেরিয়ে, ইমামের সাথে কোনো কথা না বলে বেডরুমে চলে গেল। সালারের এখানে নিজেকে নিজের কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। তাকে সমর্থন করার একমাত্র মানুষটিও এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

: 'আমি কেইস তুলে নিচ্ছি।' লাঞ্চ খেতে বসে সালার বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল। পুরো টেবিলে মুহূর্তের জন্য নীরবতা ছেয়ে গেল। এখানে সিকান্দারের পাশাপাশি শাহ নেওয়াজ এবং তার পরিবারও উপস্থিত রয়েছে। 'আমি এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে ভেবেছি, আর...।'

তাইয়েবা অসম্ভব রুক্ষভাবে তার কথা থামিয়ে দিল।

: তুমি তো চিন্তাভাবনা করা কবেই ছেড়ে দিয়েছ! এটা তো তোমার বউয়ের মুখস্থ করানো বুলি বলছ।

: মান্নি, ইমামাকে এই পুরো সমীকরণ থেকে বাইরে রাখুন। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে শাহ নেওয়াজের চোখে কেবল তার প্রতিই নয়, বরং সালারের প্রতিও শীতল অসন্তুষ্টি ভাব লক্ষ করল সে।

গেটে এসে তারা গাড়িতে উঠল। আজ ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। সিকান্দার ও তাইয়েবা অপর গাড়িতে আসছেন। সালার পুরো রাস্তা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। ইমামা একটু পরপর তার দিকে তাকানো সত্ত্বেও, তাকে কিছু বলার সাহস করতে পারল না। বাসায় পৌঁছেও সবার নীরবতা ও শীতলতা একই রইল। সালার, সিকান্দার ও তাইয়েবার সাথে বাইরে লাউঞ্জে বসে পড়ল। আর ইমামা রুমে

চলে এলো। আধা ঘণ্টা পর পরিচারক তাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এলো।

: 'তুমি এখানে আমার খাবার দিয়ে দাও।' ক্ষুধা এত প্রচণ্ড ছিল যে, এবার সে খাবারের ব্যাপারে না করতে পারল না। দু-মিনিট পরেই পরিচারক ফিরে এলো।

: সালার সাহেব বলছিলেন যে, আপনি বাইরে এসে সবার সাথে খাবেন।

ইমামা কিছুক্ষণ বসে রইল। এই আমন্ত্রণ কিছুটা অপ্রত্যাশিত। খাবার টেবিলে সিকান্দার, তাইয়েবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে বসে খাবার খাওয়া তার জন্য অনেক কঠিন। তখন খাবার ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য না বলে থাকলে, এখন ক্ষুধা নেই বলে, নিচে আসতে না করে দিত। কিন্তু এখন এটা বলা কিছুটা জটিল হয়ে পড়েছে। হিম্মত করে সে অবশেষে ডাইনিং টেবিলে এসে গেল। দেখল, সবাই খাবার খাচ্ছে।

কামরানের স্ত্রী যুবা তাইয়েবার সাথে কী নিয়ে যেন কথা বলছে। তার আগমনে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। কেবল সালার খালি প্লেটে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সে বসতেই সালার তার দিকে ভাতের ডিশ বাড়িয়ে দিল। তারপর খাওয়ার সময়টুকুতে তাকে কিছু না বলেই চুপচাপ তার দিকে এটা-ওটা বাড়িয়ে দিতে থাকল। ইমামা সবার আলোচনা চুপচাপ শুনতে থাকল। আর শুকরিয়া আদায় করতে লাগল, তাকে নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না। সে বুঝতে পারল, এই সমস্যা নিয়ে তাদের আর বিতর্ক করার কিছু নেই। কারণ, এ বিষয়ে আগেই সে তাদের অভিশাপ, নিন্দামন্দ যা পাওয়ার পেয়ে গেছে।

পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে লাগল। ঝড় শেষে তার প্রভাবও মুছে যেতে শুরু করেছে। খাওয়ার পর বেডরুমে সে সালারের সাথেই এলো। সালার পুনরায় কোনো কথাবার্তা না বলে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ল। ইমামা অন্ধকারে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল। তারপর সে যেন সংশোধনের প্রথম চেষ্টা চালাল।

: সালার।

চোখ বন্ধ করে সালার ভাবতে লাগল, তার কথার জবাব দিবে কি দিবে না।

: 'সালার!' ইমামা পুনরায় সম্বোধন করল।

: 'বলো।' সালার অবশেষে উত্তর করল। ক্ষত বেশি গভীর না তো?' কোমল গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

: 'কোন ক্ষত?' শান্ত স্বরে বলা এই প্রশ্নটি তাকে একদম নির্বাক করে দিল।

: 'তোমার ব্যথা তো হচ্ছে না?' তার কাঁধে হাত রেখে ইমামা তার প্রশ্ন পরিবর্তন করল।

: হলেও তাতে কী আসে যায়! ক্ষত আমার, ব্যথা আমার।

এবার উত্তর তাকে নিরুত্তর করে দিল।

: 'তোমার কি জ্বর উঠছে?' ইমামার হাত তার কাঁধ থেকে সরে কপালে গেল। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য সে আর কী করবে! সালার তার হাত সরিয়ে দিয়ে সাইড টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিল।

: 'ইমামা! তুমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ, সেটা সরাসরি বলে ফেললেই তো হয়।' তার চোখে চোখ রেখে সালার বলল। ইমামা কয়েক মুহূর্ত অসহায়ভাবে তাকে দেখতে থাকল। তারপর যেন পরাজয় মেনে নিয়ে বলল, 'আববুর সাথে কী কথা হয়েছে তোমার?'

: 'আমি উনাকে যেটা বলেছি সেটা বলব? নাকি তিনি আমাকে যেটা বলেছেন সেটা বলব?' কথার স্বর এখনো তীক্ষ্ণ।

: তিনি তোমাকে কী বলেছেন?

প্রত্যুত্তরের সালার হাশেম মুবিনের দেওয়া গালিগুলো সোজাসাপটা ইংরেজিতে রূপান্তর করে বলল। ইমামার চোখে অশ্রু চলে এলো।

: 'আমি গালির কথা বলছি না। এমনিতে আর কী বলেছেন তিনি?' ইমামা খানিক লজ্জাতুর চেহারা ও মনঃক্ষুব্ধভাবে তার কথা থামিয়ে দিল।

: ওহ, সরি! উনার কথাবার্তায় ৭০% গালিই ছিল। সেগুলো যদি সংক্ষিপ্তও করি, তবু আর কতটুকু কাটছাঁট করতে পারব! যাইহোক, বাকি বাক্যগুলোতে আমাকে তিনি বলেছেন, আমি শূকর, কিন্তু মরব কুকুরের মতো। আর তার মেয়ের সাথে আমি যা করেছি, তা যেন আমার মেয়ে ও বোনের সাথেও হয়। এজন্য তিনি বিশেষভাবে দোয়া কিংবা বদদোয়া নিবেদন করিয়া

গিয়াছেন। তোমার জন্যও উনার পক্ষ থেকে কিছু সংবাদ রয়েছে। কিন্তু সেগুলো তোমার সামনে উপস্থাপন করার যোগ্য নয়। এটাই ছিল উনার কথাবার্তা।

ইমামা সিন্ত চোখে বোবার মতো বসে তার মুখ দেখতে থাকল।

সালার মনঃক্ষুণ্ণ, এটি বোঝা সহজ। কিন্তু সে কতটা আঘাত পেয়েছে, তা বোঝা কঠিন! উনি তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেননি?' ধরা গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, করেছিলেন। অনেক আফসোস করেছিলেন, ওই মুহর্তে উনার কাছে পিস্তল কেন ছিল না, সেজন্য। কিংবা ভালো কোনো ছুরি। কারণ, তিনি আমাকে একদম সুস্থ-স্বাভাবিক দেখে অত্যন্ত অখুশি।' সালারের কথায় বিদ্রপাত্মক সুর।

: তাহলে তুমি কেইস তুলে নিলে কেন?

: 'তোমার জন্য।' সালার মুখের ওপর বলল। ইমামা মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল।

: আমি তোমার প্রতি, তোমার পরিবারের প্রতি কতটা লজ্জিত, তা বলে বোঝাতে পারব না। এর চেয়ে ভালো ছিল, তিনি আমাকে মেরেই ফেলতেন।

: 'আমি কি তোমার প্রতি কোনো অভিযোগ করেছি?' সালার গম্ভীর হয়ে আছে।

: না, কিন্তু তুমি আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলছ না। এমনকি কেউই বলছে না।

: 'আমি গত রাত থেকে লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুশ্চিন্তায় আছি। আমার কথা বাদ দাও। এ ব্যাপারে তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আর যতদূর আমার পরিবারের আচরণ, তাহলে একটু-আধটু এমন তো করবেই তারা। That's

but natural. এটা স্বাভাবিক। দু-চার সপ্তাহ গেলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" সালার সাবলীলভাবে বলল। ইমামা ভেজা চোখে তার দিকে তাকাল। সালার তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

: আমাকে কেউ সম্মান দিচ্ছে না।

সালার তার কথা রুখে দিল, 'এটা তুমি কীভাবে বলছ? কেউ তোমাকে কি কিছু বলেছে? পাপা? মান্নি অথবা অন্য কেউ?

: কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু...।

সালার পুনরায় তার কথা রুখে দিল, 'আর কেউ কিছু বলবেও না তোমাকে। যেদিন তোমাকে কেউ কিছু বলবে, সেদিন বলো যে, কেউ তোমাকে সম্মান দেয় না।' সালার প্রয়োজনাতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে। 'আমার যদি মনে হতো এখানে তোমাকে কেউ সম্মান করবে না, তাহলে আমি তোমাকে এখানেও কখনো নিয়ে আসতাম না। যেভাবেই তোমার সাথে বিয়েটা

হোক, তুমি আমার স্ত্রী। আর আমাদের পরিমণ্ডলের এমন কেউ নেই যে, এটি জানে না। এখন এসব কান্নাকাটি বন্ধ করো।" সালার খানিক ধমকির সুরে তাকে বলল। '৬:৩০ এ ফ্লাইট। শুয়ে পড়ো এখন।' বলতে বলতে সালার চোখ বন্ধ করে ফেলল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বলতে পারছিল না যে, এই দেড় দিনে সে বুঝে গিয়েছে, এই পৃথিবীতে সে কতটানিরাপদ আর অনিরাপদ। তার পায়ের নিচে জমিন সালারের কারণেই টিকে আছে। তার মাথায় ছায়া-দানকারী আসমানও তার কারণেই। সালারের নাম তার নামের পাশ থেকে সরে গেলে, পৃথিবীতে আর কেউ তার জন্য বুক টান করে সামনে দাঁড়াবে না।

সালারের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকাকালীনও সালার সবসময় তার সাহায্য করেছে। আর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেই সাহায্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমামা চুপচাপ তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এদিকেও খেয়াল করল না, তার মাথা রাখার ফলে সালার কাঁধে ব্যথা পেতে পারে। সে

জানে, সালার তাকে কখনো সরিয়ে দিবে না। আর সালার তাকে সরালও না। ইমামা একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, অপর হাতে লাইট অফ করে দিল।

: 'মান্নি ঠিকই বলেন।' ইমামা তার বুকে মাথা রাখতেই সালার বিড়বিড়াল।

: 'কী?' ইমামা চমকাল।

: তুমি আমাকে জাদু করে ফেলেছ।

ইমামা হাসতে লাগল।

৩৩

এই ঘটনার পর পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ তারা লাহোরেও কিছুটা সতর্ক হয়ে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে যেন সমস্ত ডর-ভয়

নিঃশেষ হতে লাগল। ইমামার পরিবারের পক্ষ থেকে এবার অমন কোনো হুমকিও এলো না। যেমন হুমকি ইমামা ঘর ছেড়ে পালানোর পর সিকান্দারকে দেওয়া হতো। তাৎক্ষণিক উত্তেজনাবশত হাশেম মুবিন ও তার ছেলেরা তো হামলা করার ভুল করে বসেছে। কিন্তু খুব দ্রুতই তারা বুঝে গেল, জোর করে ইমামাকে ফিরিয়ে নেওয়া, তাদের সমস্যা আরও বাড়াবে; কমাতে না। ইমামার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার সয়লাব তারা ছড়িয়ে রেখেছে, তার মুখোশ খুলে গেলে তারা লাঞ্ছনা ও উপহাস ব্যতীত আর কিছুই পাবে না। বিষয়টি এতদিন ধরে ঢেকে আছে, তা ঢেকে রাখাই এখন অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সিকান্দার উসমানের মতো এত প্রভাবশালী মানুষের সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয়ে, সাধারণ কোনো মানুষের সাথে হলে, তারা নিজের আমিত্বকেই প্রাধান্য দিত। এভাবে অপারগ হয়ে, নীরব হয়ে যেত না।

পুলিশ স্টেশনে বয়ান নেওয়ার সময় সিকান্দার উসমান হাশেম মুবিনকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, সালার ও ইমামার যদি

কোনো প্রকার ক্ষতি হয়, তাহলে এর জন্যদায়ী থাকবে একমাত্র হাশেম পরিবার। বিষয়টি সাধারণ হলে, হাশেম মুবিন এটি শুনে বেরোতে না পারায় তার জোশ ও উচ্ছ্বাসে পরিবর্তন চলে এলো। আর সালার ও উত্তেজিত হয়ে যেতেন। কিন্তু নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যবহার করেও জেল থেকে ইমামার জন্য এই বিষয়টি blessing in disguise বা দুখের চাদরে সুখের বার্তা প্রমাণিত হলো। ইসলামাবাদ এলেই তারা যে ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে কাটাত, তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে লাগল। এটি বিশেষ করে ইমামার জন্য অলৌকিক মুজিজার ত কম কিছু নয়! সে কখনো কল্পনাও করেন, এতটা স্বাধীনভাবে সে বাঁচতে পারবে। সালার ঠিকই বলেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার পরিবারের আচরণ আগের মতোই হয়ে গেল। এমনকি তাইয়েবার কঠোর ভাবও বদলে গেল। এতে বেশি অবদান ইমামারই। স্বভাবগতভাবে সে সন্ধিকামী এবং আনুগত্যশীল। তার এই বৈশিষ্ট্য বাকি ত্রুটিগুলো পূরণ করে দিয়েছে। পেছনে বাবার বাড়ির আশ্রয় থাকলে সেও হয়তো সিকান্দারের অন্যান্য পুত্রবধূর মতো মাঝে মাঝে এমন করত। কিন্তু তার পেছনে

লাগেজ ব্যতীত আর কিছুই নেই। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করার জন্য তার এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাকে এমন একটি পরিবারের সদস্য বানিয়েছেন, যারা তাকে মাথায় তুলে রাখে।

৩৪

'ওয়াসিম হাশেম নামক কেউ একজন আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।' অফিসের চেয়ারে দুলভ সালার ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল।

: 'কোথেকে এসেছে?' সালার এক মুহূর্তে তার কন্টাক্ট লিস্ট অনুসন্ধান করে একজন ওয়াসিমের নাম খুঁজে পেল।

: 'ইসলামাবাদ থেকে। বলছে যে, আপনার বন্ধু।' রিসেপশনিস্ট বাড়তি তথ্য দিল।

: 'পাঠিয়ে দাও।' সালার ইন্টারকম রেখে সোজা হয়ে বসে গেল। আজ অন্তত এমন কোনো সাক্ষাতের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ওয়াসিমের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী। দুই পরিবারের মধ্যকার ঝগড়ার কয়েক সপ্তাহ কেটেছেমাত্র। সালার কিছুক্ষণ ভাবতে থাকল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগোল। আর তখনই ওয়াসিম দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। এক মুহূর্তের জন্য দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর সালার হাত বাড়িয়ে দিল। ওয়াসিমও হাত বাড়াল। একটি দীর্ঘ সময় পর তাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

: 'কী নিবে? চা, কফি?' সালার বসতে বসতে বলল। 'কিছু না। আমি কেবল কয়েক মিনিটের জন্য এসেছি।' ওয়াসিম প্রত্যুত্তরে বলল। একটা সময় তারা খুব ভালো বন্ধু ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের মধ্যকার এই আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের দেওয়াল ভাঙা অনেক কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। সালার পুনরায় আর জিজ্ঞেস না করে ইন্টারকম তুলে চায়ের অর্ডার দিল।

: 'ইমামা কেমন আছে?' সে রিসিভার রাখতেই ওয়াসিম জিঙেস করল।

: 'সি ইজ ফাইন।' সালার স্বাভাবিকভাবে উত্তর করল।

: 'আমি তার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলাম। তোমার বাসার ঠিকানা আমার কাছে ছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম, আগে তোমাকে জিঙেস করে নিই।' ওয়াসিম নিজেকে জাহির করার ভঙ্গিতে বলল।

: 'স্বাভাবিক, তুমি জানতেই পারো আমি কোথায় চাকরি করি। সুতরাং বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করাও খুব কঠিন কিছু নয়।' সালার অত্যন্ত সাধারণ স্বরে তাকে বলল।

'আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।' ওয়াসিম বলল।

: 'জিঙ্গেস করা তো ঠিক হবে না, তারপরও তোমাকে জিঙ্গেস করতে চাই, কেন?' প্রত্যুত্তরে সালার অত্যন্ত স্পষ্টভাষীর মতো বলল।

: 'আমার কাছে কোনো কারণ নেই।' ওয়াসিম উত্তরে বলল।
'সেদিন রেস্টুরেন্টে যে চিরকুট...।'

: 'সেটা তুমি পাঠিয়েছিলে। আমি জানি।' সালার তার কথা খামিয়ে দিল। ওয়াসিম এক মুহূর্তের জন্য কিছুই বলতে পারল না। তারপর সময় নিয়ে বলল, 'তুমি ও ইমামা যা করেছ, তা অনেক ভুল করেছ।' কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর ওয়াসিম বলতে লাগল। সালার তার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করল না। 'কিন্তু এখন যা হওয়ার হয়েছে। আমি ইমামার সাথে দেখা করতে চাই।'

: 'তোমার পরিবার এটি জানে?' সালার জিঙ্গেস করল।

: 'না, তারা জানতে পারলে আমাকেও ঘর থেকে বের করে দেবে।' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সত্য-মিথ্যা সে যাচাই করতে পারছে না। তার উদ্দেশ্য কী, তাও সে ধারণা করতে পারল না। কিন্তু সে ও ইমামা একে অপরের অনেক কাছের ছিল। সালার এটি অবশ্যই জানে। হয়তো এজন্যই ওই রাতে ওয়াসিম, তাকে ইমামার সাথে দেখে হাশেম মুবিনের ওখানে যাওয়ার আগেই সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপরও ইমামার সাথে দেখা করতে অনুমতি দেওয়া তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এই মেলামেশার সংবাদ জানতে পারলে তার ক্ষতি করা ইমামার পরিবারের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। সে যদি ইমামার অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তাহলে তাকে ওখান থেকে অন্য কোথাও অনায়াসেই নিয়ে যেতেপারে। সালার বিশ্বাস করতে চাচ্ছে, ওয়াসিম কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে তার কাছে আসেনি। কিন্তু তারপরও সে ঝুঁকি নিতে পারে না।

: 'ওয়াসিম, আমার মনে হয় না এতে কোনো লাভ হবে।' সে অবশেষে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলল। 'ইমামা আমার সাথে ভালো আছে। তার জীবন গুছিয়ে নিয়েছে। আমি চাই না সে চিন্তিত হোক। কিংবা তার কোনো ক্ষতি হোক।'

: 'আমি না তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাই। আর না তার কোনো ক্ষতি করতে চাই।' ওয়াসিম তার কথা খণ্ডন করে কিছুটা অস্থির হয়ে বলল।

: 'আমি এ ব্যাপারে ভাবব ওয়াসিম। কিন্তু এটি অনেক জটিল। আমি চাই না, তোমাকে ব্যবহার করে কেউ...' ওয়াসিম তার কথা থামিয়ে দিল।

: আমিও চাই না, তার কোনো ক্ষতি হোক। এমন কোনো ইচ্ছা থাকলে এত বছরে তোমার সাথে আগেই যোগাযোগ করতাম। আমি জানতাম, তোমাকে বিয়ে করে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল।

পুরো ব্যাপারটিতে তুমি জড়িত ছিলে। কিন্তু আমি আমার পরিবারকে কখনো এটি জানাইনি।

সালার এক মুহূর্তের জন্য থমকাল। তারপর বলল, 'এত বছর সে আমার সাথে ছিল না।'

: 'না থাকতে পারে। কিন্তু সে তোমাকে বিয়ে করেই গিয়েছিল, এটা আমি জানতাম।' ওয়াসিমের ভঙ্গি চূড়ান্ত। সালার তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল। তাদের বন্ধুবান্ধবের পরিমণ্ডল একই ছিল। সেখান থেকে কেউ যদি তার ও ইমামার বিয়ের ব্যাপারে বলে দিয়ে থাকে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

: 'এ নিয়ে আমি ভাবব ওয়াসিম!' সালার বিতর্ক না করে পুনরায় একই বাক্য উচ্চারণ করল। ওয়াসিম হতাশ হলো।

: 'আমি দুদিনের জন্য লাহোরে এসেছি। আর এটা আমার কার্ড। আমি সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' ওয়াসিম অতিরিক্ত

কিছু না বলে পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে তার সামনে রাখল।

বাসায় ফিরে আজ রাতে সে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অনেক চুপচাপ হয়ে আছে। বিষয়টি ইমামা লক্ষ করল। কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারল না। ইমামা মনে মনে এর জন্য অফিসের কাজের চাপকেই দায়ী করল। খাওয়ার পর সব সময়ের মতো কাজ করতে স্টাডি রুমে যাওয়ার পরিবর্তে, তার পাশে লাউঞ্জে সোফায় এসে বসে পড়ল। ইমামা টিভি দেখছিল। উভয়ের মাঝে মুচকি হাসির বিনিময় হলো। তারপর সালারও টিভি দেখতে লাগল। পাঁচ-দশ মিনিটের নীরবতার পর, ইমামা অবশেষে একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে তাকে বলতে শুনল, 'ইমামা! তুমি যদি কথা দাও যে, তুমিতোমাকে কিছু বলতে চাই।'

চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনবে, কোনো কান্নাকাটি করবে না, তাহলে আমি



ইমামা চমকে তার দিকে মনোযোগী হলো।

: 'কী বলতে চাও?' সে খানিক অস্থির হলো।

: 'ওয়াসিম তোমার সাথে দেখা করতে চায়।' সালার ভূমিকা ছাড়াই বলল। ইমানা নড়তে পারল না।

: 'ওয়াসিম... আমার ভাই?' ইমামা অবশেষে বলল। তার স্বরে অবিশ্বাস্যতা। সালার মাথা দোলল। তারপর সে তার ও ওয়াসিমের মধ্যকার সাক্ষাতের ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে লাগল। কথাগুলো শুনতে শুনতে ইমামার অশ্রুবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সালার প্রচণ্ড ধৈর্য প্রদর্শন করল। ধৈর্য ব্যতীত আর কী-বা করতে পারে সে।

: 'তুমি তাকে এখানে কেন আসতে দিলে না? তুমি তাকে সাথে নিয়ে আসতে।' ইমামা হেঁচকি তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কথার মাঝখানেই বলে ফেলল। 'আমি জানতাম,

ওয়াসিম আমাকে ক্ষমা করে দেবে। সেও আমাকে ততটাই মিস করেছে হয়তো, যতটা আমি তাকে করতাম। আমি তোমাকে বলতাম না যে..."।

সালার তার কথা থামিয়ে দিল, 'অতি আবেগী হওয়ার প্রয়োজন নেই ইমামা! আমি জানি না, সে কেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করার ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকরও হতে পারে।' সালার তার অশ্রুতে প্রভাবিত না হয়ে বলল। সে প্রকৃতপক্ষেই ওয়াসিমের ব্যাপারে খানিক আশঙ্কার ভয় করছে।

: কিছু হবে না। আমি জানি, কিছুই হবে না। সে অনেক ভালো। তাকে কল করে এখনই আসতে বলো।

: 'আমি কাল তাকে আসতে বলব। কিন্তু সে যদি কখনো আমি ছাড়া এখানে একা আসে, কিংবা কখনো তোমাকে অন্য কোথাও যেতে বলে, তাহলে তুমি যাবে না।' সালার তার কথা

থামিয়ে দিয়ে বলল। 'আমি আবারও বলছি, সে না এখানে একা আসবে, আর না তুমি কোথাও যাবে।' সালার অত্যন্ত কঠোরভাবে তাকে গুরুত্বারোপ করল।

: 'সে ডাকলে আমি কোথাও যাব না। কিন্তু সে এখানে এলে তোমার আপত্তি কীসের?' ইমামা বিরোধিতা করল।

: আমি বাসায় থাকাকালীন সে আসতে পারে, তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সে একা কখনো এখানে আসতে পারবে না। তাছাড়া আমি নিচে সিকিউরিটি গার্ডদেরও বলে দেব।

: 'সালার! সে আমার ভাই।' ইমামার অসম্মান অনুভূত হলো। ৩৫

ওয়াসিম পরের দিন দুইটা বাজে এলো। আর দুইটা পর্যন্ত বাসায় কোনো পুরুষের উপস্থিতির অনুভূতি ইমামার ছিল না। পরিচারিকাকে সঙ্গে করে খাবার রান্না করতে করতে তার সাথে

নিজের পরিবারের গল্পে ব্যস্ত হয়ে রইল। পাশাপাশি গত রাতে ওয়াসিমের কাছ থেকে শোনা নতুন নতুন সংবাদগুলোও পরিবেশন করল। এই প্রথম সালার, পরিচারিকার সাথে এতটা উচ্ছ্বাস ও আবেগ নিয়ে কথা বলতে দেখছে ইমামাকে। আর হতভম্ব হচ্ছে। তার হতভম্বতাও এই অবস্থাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছে না।

ওয়াসিম দরজায় কলিং বেল চাপতেই ইমামা সবার আগে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। ভাই-বোনের মাঝে একটি আবেগী দৃশ্যের অবতারণা হলো। সালার তাতে উভয়কে কিছু সান্ত্বনামূলক কথা বলে খানিক ভূমিকা রাখল। তারপর সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত ওয়াসিম যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ সালার কেবল একজন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। খাবারের টেবিলে সে উপস্থিত ঠিকই ছিল, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, তার ওখানে থাকা, না-থাকা দুটোই সমান। ভাই ছাড়া ইমামার চোখে আর কিছু পড়ছে না। আর না কারও প্রতি কোনো খেয়াল আছে। সে পারছে না কেবল টেবিলে বিদ্যমান সবগুলো

আইটেম নিজ হাতে ওয়াসিমকে খাওয়াতে! বিয়ের পর আজ প্রথম ইমামা খেতে বসে তাকে কিছু পরিবেশন করছে না। ওয়াসিম তার শৈশবের বন্ধু। তা সত্ত্বেও এই শৈশবের বন্ধুর সঙ্গে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কথা ছাড়া বেশি কোনো কথাও হলো না।

৩৬

: 'ইমামা, এই ওয়াসিম-নামা কি এখন বন্ধ হতে পারে?' আজ তৃতীয় দিন। ওয়াসিমের গল্প শুনতে শুনতে খেতে বসে সালারের ধৈর্যশক্তি এখন মুখ ফুটে বলে উঠল। তিন দিন ধরে সে নাশতার সময়, রাতের খাবার এবং ঘুমের আগে কেবল ওয়াসিমের কথাই বলে চলছে। ইমামা ওয়াসিমের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ! সালার ভেবেছিল, ওয়াসিমের সাথে দেখা হলে ইমামা অনেক খুশি হবে। কিন্তু সে এটা ভাবেনি, তার এই খুশি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে যে, এটিই স্বয়ং একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

: এর মানে কী?

ইমামা অবাক হলো।

: 'মানে হলো, দুনিয়াতে ওয়াসিম ছাড়াও আরও অনেক মানুষ আছে, যাদের প্রতিও তোমার লক্ষ রাখা উচিত।' সালার তাকে পরোক্ষভাবে বলল।

: 'ওয়াসিমকে নিয়ে কথা বলা তোমার ভালো লাগে না?' ইমামা ছুট করে যেন অনুমান করল। তার চোখে এতটা অবিশ্বাস্যতা যে, সালার 'হ্যাঁ' বলতে পারল না।

: 'আমি কখন বললাম যে আমার খারাপ লাগে! এমনিই বলছি তোমাকে।' সালার অবচেতনে বলে উঠল।

: 'হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম, এটা তুমি কীভাবে বলতে পারো! সে তোমার বেস্টস্ট ফ্রেন্ড।' ইমামা পরোপরি নিশ্চিত হলো।

কিন্তু সালার তাকে বলতে পারল না, সে তার বেস্ট ফ্রেন্ড নয়।
এক সময় ছিল। 'তোমার ব্যাপারে অনেক কিছু বলত সে'
সালার খাবার খেতে খেতে খেমে গেল।

: আমার ব্যাপারে কী?

'সবকিছু।' ইমামাও একই দ্রুততায় বলল।

: মানে যা কিছু তুমি করতে।

সালারের ক্ষুধা উবে গেল।

: 'যেমন?' জানা নেই সালার তার কোন আশঙ্কার ব্যাপারে
নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। ইমামা ভাবনায় পড়ে গেল।

: যেমন তুমি যাদের থেকে ড্রিংকস নিতে, তাদের ব্যাপারে।
আর তুমি তোমার কিছু বন্ধুর সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লিতে গিয়েছিলে,
সেসব।

গেল। ইমামা কথা পূর্ণ করতে পারল না। পানি পান করতে
করতে সালারের হেঁচকি উঠে

: 'সে তোমাকে এটাও বলেছে যে, আমি...'। সালার নিজেও
তার। আর তাই তোমাকে এসব বলছি। তোমার ব্যাপারে আমি
তোমার ওপর, কিংবা অন্য কারও ওপর ভরসা করতে পারি না।

: কিন্তু...

: 'তুমি আমাকে শুধু বলো, তার সাথে দেখা করবে কি না। তুমি
যদি এ বিষয়ে তর্ক করতে চাও, তাহলে ওয়াসিম আসবেই না।
এটাই উত্তম।' সালার তাকে তার কথা পূর্ণ করতে দিল না।

কচলাতে তৎক্ষণাৎ তার সামনে আত্মসমর্পণ করল। 'তার সাথে আমি কলে কথা : 'ঠিক আছে। আমি তাকে একা এখানে ডাকব না।' ইমামা চোখ কচলাতে বলতে চাই।'

প্রত্যুত্তরে সালার কিছু না বলে, ওয়াসিমের ভিজিটিং কার্ড এনে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, নিজে স্টাডি রুমে চলে গেল।

কয়েকবার রিংটোনের পর ওয়াসিমের আওয়াজ শুনতেই তার গলায় অশ্রু দলা পাকিয়ে গেল।

: হ্যালো! আমি ইমামা।

অপর পাশ থেকে ওয়াসিম কিছু বলতে পারল না। আর যখন বলতে সক্ষম হলো, ততক্ষণে তার গলাও ধরে এলো। তারপর দুই ঘন্টা অবধি তারা কথা বলতে থাকল। নির্বাক্কাট, নিয়মতান্ত্রিকতাহীন, উদ্দেশ্যহীন কথা। দীর্ঘ নীরবতার কথোপকথন। কিন্তু এই কথোপকথনে কোনো মান-অভিমান

হলো না। কোনো তিরস্কার, তুচ্ছতা এলো না। সময় এতটা পার হয়ে গেছে যে, এখন আর এসব বলার কোনো মানে হয় না। ওয়াসিম বিয়ে করে ফেলেছে। তার তিনজন ছেলে-মেয়ে। পরিবারে আরও সদস্যের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অশ্রুসিক্ত চোখে ইমামা তাদের বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে থাকল।

সালার দুই ঘণ্টা পর স্টাডি রুম থেকে বেরোল। ইমামা এখনো লাউঞ্জে বসে ফোন কানে চেপে রক্তিম চোখে ওয়াসিমের সাথে কথা বলে চলছে। সালার তার পাশ অতিক্রম করে বেডরুমে গেল। ইমামা এক পলকের জন্য মাথা তুলে তার দিকে তাকালও না। সালার বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীর্ঘক্ষণ পরেও ব্যাংকের নতুন ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ভাবতে থাকল। বুঝতে পারছে না, এটি কি ঠিক হচ্ছে, না ভুল। ওয়াসিম ছাড়া অন্য কোনো ভাই হলে সালার তাকে তার সাথে কথা বলতে দিত না। কিন্তু ওয়াসিমের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও একটি পর্যায় অবধি সে তার প্রতি উদার। তাদের পরিবারের একজন সদস্যও যদি ইমামার সাথে যোগাযোগ রাখে, তাহলে ইমামার মানসিক

অবস্থা অনেকটা উন্নত থাকবে। বিগত সময়ে পরিবারহীনতার যে হীনম্মন্যতা হৃদয়ে চেপে বসে আছে, এত মাস পর তা সালারের কাছে এখনো গোপন নেই। প্রশ্ন সম্পূর্ণ করতে পারল না।

: যখনই যেতে, আমাকে এসে বলত।

সালারের ঠোঁটে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ওয়াসিমের জন্য গালি বেরিয়ে এলো। ইমামা তার ঠোঁটের নড়াচড়া পড়ে ফেলল। সে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়ল।

: 'তুমি তাকে গালি দিলে?' ইমামা যেন অবাক হয়ে সালারকে বলল।

: 'হ্যাঁ, সে সামনে থাকলে তার দু-চারটা হাড়ও ভেঙে দিতাম। সে তার বোনের কাছে গিয়ে এসব কথা বলত! সেটাও আমার কথা! I can't imagine. আমি কল্পনা করতে পারছি না।' সালার

সত্যিই প্রচণ্ড মনঃক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। ইমামার মুখে 'সবকিছু'র দুটি উদাহরণই তার হাতের পোষা তোতা উড়িয়ে দিয়েছে। 'আমার ভাইকে তুমি আর গালি দিয়ো না।' ইমামার মন খারাপ হয়ে গেল। সে এঁটো বাসন গোছাতে লাগল। প্রত্যুত্তরে সালার কিছু না বলে প্রচণ্ড অভিমানে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।

দুই ঘণ্টা পর সে বেডরুমে এলো। সালার ততক্ষণে অভ্যাস অনুযায়ী ইমেইল চেক করতে ব্যস্ত। ইমামা চুপচাপ কম্বল টেনে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সালার ইমেইল চেক করতে করতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল। ইমামা মনে মনে এটাই চাচ্ছিল। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে সে কোনো উপন্যাস কিংবা অন্য কোনো বই পড়ে। পড়তে পড়তে সে সালারের সাথে কথাও বলে। কিন্তু যেদিন অভিমান হয়, সেদিন আর কোনো কথা বলে না। সালার তার বিছানার পাশের বাতি বন্ধ করে দিল।

: 'আমি ওয়াসিমকে এমন কিছু বলিনি যে, তাতে তুমি এমন রাগ করে থাকবো।' সালার সমঝোতা করার চেষ্টা করল। ইমামা

ওভাবেই অপরদিকে পাশ বদলে অবচেতন ও নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল।

: 'ইমামা, তোমার সাথে কথা বলছি আমি!' সালার তার কন্মল টান দিল।

: 'তুমি তোমার ছোট ভাই আম্মারকেও একই গালি দিয়ে দেখাও।' সালার তৃতীয়বার কন্মল টানতেই ইমামা প্রচণ্ড অভিমানে তার দিকে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল। সালার এক মুহূর্ত দেরি না করে একই গালি আম্মারকেও দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইমামার বুঝে এলো না, সে তাকে কী বলবে। দুনিয়াতে যদি নির্লজ্জের কোনো চূড়া থাকে, তবে সেটা সালারই।

: 'এ কথা আমি পাপাকে বলে দেব।' অবশেষে ইমামা রক্তিম চেহায়ায়, ভরা গলায় বলল।

: তুমি বলেছ আম্মারকে গালি দিতে।' সালার একই নিশ্চিত্ততায় বলল। 'তাছাড়া তোমার ভাইকে আমি এর চেয়ে খারাপ গালিও তার মুখের ওপর দিয়েছি। সে কখনো কিছু মনে করেনি। আর যদি তুমি চাও, তাহলে পরেরবার সে এখানে এলে দিয়ে দেখিয়ে দেব।

ইমামা যেন বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠে বসল।

: 'ওয়াসিমকে তুমি আমার সামনে এখানে গালি দিবে?' তার অনেক কষ্ট অনুভূত হলো।

: 'যা সে করেছে, আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও, তাকে গালিই দিত। এবং এর চেয়ে বেশি জঘন্য গালি।' সালার রাখটাক না করেই বলল। 'কিন্তু চলো, আই এম সরি।' ইমামা এবারও তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল। ৩৭

ইমামা ঘুমের মধ্যে ফোনের শব্দে ঘাবড়ে গেল। সালারের ফোন বাজছে।

: 'হ্যালো!' সালার ঘুমের মধ্যে পাশ বদলে সাইট টেবিল থেকে ফোন তুলে কল রিসিভ করল। ইমামা পুনরায় চোখ বন্ধ করে ফেলল।

: 'হ্যাঁ, কথা বলছি।' সালারকে সে বলতে শুনল। তারপর সে উপলব্ধি করল, সালার একদম বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ইমামা চোখ খুলে আধো অন্ধকারে তাকে দেখার চেষ্টা করল। সালার লাইট না জ্বালিয়ে অন্ধকারেই লাউঞ্জে চলে গিয়েছে।

ইমামা খানিক অস্থির হলো, এটা কার কল হতে পারে! যার জন্য এত রাতে সে এভাবে উঠে চলে গেল। চোখ বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার আসতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে, সেও উঠে লাউঞ্জে চলে গেল। দেখল, সালার সোফায় বসে ফোনে কথা

বলছে। ইমামাকে দেখে সে কথা বলতে বলতে হুট করে থেমে গেল।

: একটি জিন্স ও শাট প্যাক করে দাও। আমাকে এখনই ইসলামাবাদের উদ্দেশে

বের হতে হবে।

: 'কেন? সবকিছু ঠিক আছে তো?' ইমামা অস্থির হলো।

: স্কুলে আগুন লেগে গিয়েছে।

ইমামার ঘুম মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। সালার এখন পুনরায় ফোনে কথা বলছে। প্রচণ্ড অস্থির মনে রুমে এসে সে ব্যাগ গুছিয়ে ফেলল। সালার ততক্ষণে রুমে ফিরে

এসেছে।

: আগুন কীভাবে লাগল?

: 'এটা ওখানে গিয়েই জানা যাবে' সালার প্রচণ্ড তাড়াহুড়োয় কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল। ইমামা বসেই রইল। সালারের দুশ্চিন্তার বিষয়টি সে উপলব্ধি করতে পারছে। বিয়ের শুরুর কয়েক মাস ছাড়া, তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলার মতো এমন কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে চলছে।

দশ মিনিটে তৈরি হয়ে সালার বেরিয়ে গেল। কিন্তু ইমামা পুনরায় আর বিছানায় যেতে পারল না। বাকি রাত সে দুশ্চিন্তা আর দোয়া করতে করতে কাটাল। সালারের সাথে দুয়েকবার কয়েক মিনিটের জন্য কথা হলো। তারপর থেকে তাকে ফোনে ধারাবাহিক ব্যস্ত পাওয়া গেল। ইমামাও তাকে আর ডিস্টার্ব করল না।

সালার গ্রামে পৌঁছার পরও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না। এর কারণ, সময়মতো ফায়ার সার্ভিস ওখানে পৌঁছাতে পারেনি। আর এত ঘন্টা আগুন না নেভারফলে পরিস্থিতি কী, তা ইমামা খুব ভালো করে বুঝতে পারছে। সারা দিন সে পোড়া বেড়ালের মতো বাসায় ঘুরঘুর করতে থাকল। অবশেষে সালার তাকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সংবাদ জানাল। সাথে এটাও বলল যে, সে তাকে আবার রাতে কল করবে। আর সালার আজ রাত ইসলামাবাদেই থাকবে।

ইমামা সারা দিন কিছুই খেতে পারল না। ভবনের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা সে জানে না। কিন্তু কয়েক ঘন্টা যাবৎ জ্বলন্ত আগুন কতটুকু ক্ষতিসাধন করতে পারে, এর উপলব্ধি তার আছে। অবশেষে মাঝরাতে সালারের সাথে তার কথা হলো। তার গলা শুনে তাকে প্রচণ্ড ক্লান্ত মনে হলো। ইমামা তাই তাকে ঘুমানোর কথা বলে ফোন রেখে দিল। কিন্তু সে নিজে সারা রাত ঘুমাতে পারল না। ভবনে আগুন লাগানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ওখানে এমন সাক্ষী পেয়েছে।

আর এই সামান্য সংবাদ ইমামার ঘুম ও জ্ঞান দুটোই অদৃশ্য করে দিল। এটি কেবল সালারের স্কুল নয়; এই পুরো প্রকল্পটি এখন একটি দাতব্য সংস্থার অধীনে চলছে। এর মূল অনুদান-দাতা সালারের পরিবার। তাছাড়া এই প্রকল্পের এমন ক্ষতি কে করতে পারে? এই প্রশ্নটিই তাকে অস্থির করে দিচ্ছে। সবকিছু যেন পুনরায় কয়েক সপ্তাহ আগের পর্যায়ে চলে গেল।

সালার পরের দিন রাতে বাসায় পৌঁছাল। ক্লান্তি ব্যতীত তার চেহারায় অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এ ছাড়া ইমামা তার চেহারায় অন্য কিছু দেখতে চেয়েও হতাশ হলো। সে স্বাভাবিক। এতে ইমামা যেন সাহস ফিরে পেল।

: 'ভবনের স্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে কোম্পানি ভবন নির্মাণ করেছিল, তারা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। এখন দেখা যাক কী হয়। হয়তো ভবন ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করতে হবে।' খাবার টেবিলে বসে ইমামার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সালার বলল।

: 'অনেক ক্ষতি হয়ে থাকবে হয়তো?' এটি বোকার মতো প্রশ্ন।
কিন্তু ইমামা এই মুহূর্তে চেতনাশূন্য।

: 'হ্যাঁ।' উত্তর সংক্ষিপ্ত এলো।

: 'স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে?' এটি আরও একটি বোকামিপূর্ণ প্রশ্ন।

: 'না, গ্রামের কয়েকটি বাড়ি তৎক্ষণাৎ খালি করে, তা ভাড়ায় নিয়ে সেখানে স্কুলের বিভিন্ন বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরেই গ্রীষ্মের ছুটি চলে আসবে, সুতরাং বাচ্চাদের খুব বেশি ক্ষতি হবে না।' সালার খাবার খেতে খেতে বলতে থাকল।

: 'আর পুলিশ কী বলেছে?' এদিক-সেদিকের কথা বলে অবশেষে সে তার দুশ্চিন্তাময় প্রশ্নটি করল। 'কেবল তো তদন্ত শুরু হয়েছে, দেখা যাক কী হয়।' সালার ধোঁয়াশা রেখে উত্তর

অগ্নিকাণ্ডের পেছনে ইমামার পরিবারের হাত রয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করল। তাকে এটা বলল না যে, গত দুদিন ধরে তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য এই করছে। তাদেরকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় দিতে চাচ্ছে। এসব সামলানো অনেক জটিল একটি পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার জন্য। কেননা, এই প্রকল্পের পেছনে অনেক মানুষের অনুদান রয়েছে। তাছাড়া এই প্রকল্পের ক্ষয়ক্ষতির ফলে অসংখ্য জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বহু বছর ধরে চলমান এই স্কুলের কোনো শত্রু ছিল না এতদিন। আর এখন...। ইমামার চেয়ে বেশি সালারই এই দোয়া করছিল যে, এটি যেন দুর্ঘটনাময় অগ্নিকাণ্ড হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আগুনের পরিমাণ ও পরিস্থিতি দেখে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এটি একটি পরিকল্পিত অগ্নিকাণ্ড। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার ভেতরে কিছু সাক্ষীও উপস্থিত হয়ে যায়। ইমামার কাছে এসব বলা, নিরেট নিবুদ্ধিতা। বিগত ঘটনার অভিজ্ঞতার পর ইমামাকে সে নতুন কোনো দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাচ্ছে না।

: 'এখন কী হবে?' তৃতীয় নিবুদ্ধিতামূলক প্রশ্ন।

: 'সবকিছু পুনরায় বানাতে হবে। ব্যস!' উত্তর ততটাই স্বাভাবিক এলো।

: 'আর টাকা? তা কোথেকে আসবে?' এটি প্রথম বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন।

: স্কুলের স্থায়ী অনুদান তহবিল থেকে। তা থেকে ব্যবহার করব। কিছু ইনভেস্টমেন্ট করেছি আমি। সেখান থেকে অর্থ নেব। ইসলামাবাদের ওই প্লটটি বিক্রি করে দেব। তাৎক্ষণিকভাবে তো অল্পবিস্তর কিছু একটা ব্যবস্থা করেই ফেলব। যাতে স্কুলের ভবন পুনরায় দাঁড় করানো যায়।

: 'প্লট কেন?' সে প্রচণ্ড চমকে গেল। ইমামা খেয়াল করল না যে, সালার ফ্ল্যাট নয়, প্লট বলেছে।

: এতে খুব দ্রুত টাকা পেয়ে যাব হাতে। পরে কিনে নেব। এখন তো আমার দ্রুত এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়াই কথা।

: 'ওই মোহরের টাকাটা তুমি নিয়ে নাও। বিয়েতে পাওয়া উপহারগুলোও আট-দশ লাখ টাকা হয়ে যাবে। আর এই পরিমাণ টাকা আমার অ্যাকাউন্টেও আগে থেকেই আছে। এখানে তো পঞ্চাশ-ষাট লাখ হয়ে যাবে। আর...' সালার তার কথা থামিয়ে দিল।

: আমি কখনো এটা করব না।

: আমার থেকে ধার হিসেবে নাও। পরে দিয়ে দিয়ো।

: 'নো।' সালারের ভঙ্গি চূড়ান্ত। আমার কাছে শুধু শুধু পড়ে আছে। তোমার কোনো কাজে এলে...।

সে পুনরায় তার কথা থামিয়ে দিল।

: 'I said no. আমি বললাম না, না!' সালার এবার খানিক কঠোরভাবে বলল।

: আমার টাকা আর তোমার টাকার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে?

'হ্যাঁ, আছে।' সালার একই ভঙ্গিতে বলল।

: ওগুলো মোহরানা ও বিয়েতে পাওয়া উপহারের টাকা। ওগুলো আমি কীভাবে নেব? আমি নির্লজ্জ হতে পারি, কিন্তু আত্মমর্যাদাহীন নই।

: এখন তুমি শুধু শুধুই আবেগী হয়ে যাচ্ছ। আর...

সালার এবারও তার কথা থামিয়ে দিল, 'কে আবেগী হচ্ছে?
আমি তো অন্তত

হচ্ছি না।'

ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

: আমি তোমাকে ধার দিচ্ছি, সালার!

: Thank you very much. But I don't need. তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই। আমার ধার করার প্রয়োজন হলে, বন্ধুদের থেকে নেব। বড় বড় বন্ধু আছে আমার।

: বন্ধুদের থেকে ধার নেবে, আর স্ত্রীর থেকে না?

: না।

: আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই, সালার!

: মানসিকভাবে করো, আর্থিকভাবে নয়।

ইমামা তার দিকে তাকিয়েই রইল। তার বুঝে এলো না, তাকে সে কীভাবে বোঝাবে।

: 'আর যদি এই টাকা আমি দান করতে চাই?' ইমামার অবশেষে একটি খেয়াল এলো।

: 'অবশ্যই করো। এই দেশে অসংখ্য দাতব্য সংস্থা রয়েছে। তোমার টাকা, তুমি চাইলে পুড়িয়েও ফেলতে পারো। কিন্তু আমি কিংবা আমার সংস্থা এটা নিতে পারব না।' সালার স্পষ্টাক্ষরে চূড়ান্ত ভঙ্গিতে বলল।

: তুমি আমাকে কখনো কিছু অনুদান দিতে দিবে না?

: 'অবশ্যই করবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার এর প্রয়োজন নেই।'
বলেই সে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল, ইমামা প্রচণ্ড হতাশ চোখে
তার যাওয়ার দিকে তাকিয়েই রইল।

নিঃশেষের চেষ্টা করতে; যে ধোঁয়াশা আমার চোখে
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু আমি অনেক স্বার্থপর।
তোমার মতো সবকিছু ছেড়েছুড়ে আসতে পারিনি।

: 'এখন চলে আসো।' ইমামা নিজেও বুঝতে পারছে না, এ
কথাটি সে তাকে কেন বলল। কিংবা বলা উচিত হলো কি না।
ওয়াসিম তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। কেবল মাথা
দুলিয়ে বলল, 'এটি এখন আরও অনেক কঠিন। যখন একা
ছিলাম, তখন এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এখন তো স্ত্রী-
সন্তান আছে।'

: 'আমরা তোমাকে সাহায্য করব। আমি আর সালার আছি
তোমার পাশে। কিছুই হবে না তোমার এবং তোমার স্ত্রী-

সন্তানের। একবার চেষ্টা করে তো দেখো।" ইমামা যেন ভুলে গেছে, ওয়াসিমকে সে কীসের কথা বলতে ডেকে এনে, কী নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে।

: মানুষ অনেক স্বার্থপর এবং নির্লজ্জ, ইমামা! প্রয়োজন মানুষের শুদ্ধাশুদ্ধি জ্ঞান নিঃশেষ করে দেয়। হায়! ধর্মকে যদি আমি জীবনের প্রথম স্থান দিতে পারতাম। কিন্তু আমার কাছে ধর্ম প্রাধান্য পায়নি।" ওয়াসিম একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। তাতে যেন দুঃখ ঝরে পড়ল। সেই দীর্ঘশ্বাস যেন তাকে ঘূর্ণিঝড় হয়ে বেঁটন করে নিল। 'আমি তোমার মতো ধর্মের জন্য পরিবার ছাড়তে পারব না। তুমি অনেক বড় কুরবানি দিয়েছ!'

: 'তুমি জেনেশুনে জাহান্নামকে বেছে নিচ্ছ কেবল দুনিয়ার জন্য? তোমার স্ত্রী-সন্তানকেও সে পথে নিয়ে যাচ্ছ। কারণ, তোমার মধ্যে কেবল দুঃসাহস নেই। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মতো হিন্মত নেই।' ইমামা এখন তার

ভাইকে চ্যালেঞ্জ করছে। ওয়াসিম অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন ছটফট করছে সে।

: তুমি কি আমাকে অনেক বড় বিপদে ফেলতে চাচ্ছ?

: না, তোমাকে বড় বিপদ থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। বিপদ তো সেটি, যাতে তুমি এখন নিজেকে জড়িয়ে রেখেছ।

: 'এজন্যই আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই না।' ওয়াসিম গাড়ির চাবি হাতে নিতে নিতে বলল।

৩৯

'ওয়াসিম আমার ফোন রিসিভ করছে না।' রাতে খেতে বসে ইমামা সালারকে বলল। সালারকে অনেক চিন্তিত দেখাচ্ছে।

: 'হতে পারে সে ব্যস্ত।' সালার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল।

: না, সে রেগে আছে।

: 'রেগে থাকবে কেন?' সালার এবার চমকাল। ইমামা তাকে তাদের মধ্যকার কথোপকথন শোনালা। সালার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তার সাথে এভাবে এ বিষয়ে কথা বলার কী দরকার ছিল তোমার? প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সে, বিজনেস করছে, স্ত্রী-সন্তান আছে, সে ভালো করেই জানে কী করা উচিত তার। কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক। তোমরা যদি একে অপরের সাথে দেখা করতে চাও, তাহলে ধর্মকে মাঝখানে এনো না।' সালার অত্যন্ত জোর দিয়ে তাকে বোঝাল।

: 'কথা সে তুলেছিল, সে না তুললে তো আমিও বলতাম না।' ইমামা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল।

: 'সে নিজেই যদি কথা তুলে থাকে, আর এখন সে-ই ফোন রিসিভ করছে না, তাহলে আর কী করার, তাহলে তুমি এখন নিশ্চিন্তে তার ফোনের অপেক্ষা করো। তার রাগ কমে গেলেই

সে তোমাকে কল করবে।" বলতে বলতে সালার পুনরায় খাবার খেতে লাগল। ইমামা ওভাবেই বসে রইল।

: 'এখন কী হবে?' সালার সালাদের এক টুকরো ওঠাতে ওঠাতে তার নীরবতা লক্ষ্য করল।

: আমার ইচ্ছা, সেও মুসলমান হয়ে যাক। ওই গোমরাহির চোরাবালি থেকে উঠে আসুক।

সালার এক মুহূর্ত খেমে তাকে দেখল। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার ইচ্ছাতে কিছুই হবে না। এটা তার জীবন, সিদ্ধান্তও তার। তুমি তোমার ইচ্ছা তার ওপর প্রয়োগ করতে পারবে না।'

: 'প্রয়োগ তো করছিও না।' ইমামা প্লেটে উদ্দেশ্যহীন চামচ নাড়াতে নাড়াতে ভারাক্রান্ত মনে বলল।



: 'কখনো কখনো মানুষের ইচ্ছা করে, জাদুর মতো সবকিছু ঠিক করে ফেলতে।' সালার তার বিষণ্ণতা উপলব্ধি করে বলল। তারপর তাকে যেন আশ্বাস দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু জীবনে জাদুর কোনো জায়গা নেই। বিবেক কিংবা ভাগ্য, এ দুটোই সব। তার বিবেক যদি সায় দেয় এবং ভাগ্যে লেখা থাকে, তাহলে সে নিজের জন্য কোনোএই দুটো প্লট তার কাছে তার বাড়ির প্রথম দুটো ইট। আর এই ইট দুটো সে এখন এভাবে হারাতে বসেছে। বিষয়টি তার জন্য কষ্টকর। ইমামার এই কষ্টের আরেকটি কারণ তার মধ্যকার অপরাধবোধ। যে অপরাধ তার পরিবার এই আগ্নিকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে করেছে। সে মনে মনে এই অর্থের মাধ্যমে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করার চেষ্টা করছিল। সে ভাবতে পারেনি, সালার তার এই ভাবনাকে তার আগেই বুঝে ফেলেছে। সালার বুঝতে পেরেছে, ইমামা কী করতে চাচ্ছে!

পরবর্তী দিনগুলোতেও সালারকে সে টাকা দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকে। এদিকে সে একবারও পুলিশের তদন্তের

ব্যাপারে সাধারণকে জিজ্ঞেস করার সাহস পর্যন্ত করতে পারল না। তারা দুজনেই ইচ্ছা করে এই স্পর্শকাতর আলোচনা থেকে দূরে রইল। আর এটি ইমামার জন্য বরকতময় নিয়ামতের চেয়ে কম কিছু নয়!

৩৮

: 'যা হয়েছে, এতে আমার কোনো অপরাধ নেই। আর না কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে।' ইমামার সামনে বসে ওয়াসিম অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে। 'তাছাড়া আমি এটাও বলতে পারছি না যে, এসব আবু করতে পারেন! হতে পারে তিনি এমন কিছু করেননি। বাসায় আমি এমন কিছু শুনিনি।' ওয়াসিম হাশেম মুবিনকেও বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ইমামা এতে প্রভাবিত হলো না। সে সাধারণের সামনে তার পরিবারের পক্ষ নিতে পারে, কিন্তু ওয়াসিমের সামনে নয়। তার বিশ্বাস, যা কিছু হয়েছে, তাতে তার বাবারই হাত রয়েছে।

: 'আব্বুকে বলে দিয়ো, এসব করে কোনো লাভ হবে না। সালারের কীই-বা ক্ষতি হবে? আর আমারই-বা কী হবে? একটা স্কুলই তো জ্বালিয়েছে, আবার হয়ে যাবে। উনাকে বলে দিয়ো, তিনি যত যা-ই করুক, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।' ওয়াসিম তার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনতে থাকল। তারপর সে ইমামাকে মৃদু স্বরে বলল, 'আব্বুকে আমি এসব বলতে পারব না। আমি অনেক স্বার্থপর। তোমার মতো সাহসী নই।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। নতুন করে তাদের দেখা হওয়ার পর আজ প্রথম ওয়াসিম অস্পষ্ট শব্দে তার প্রশংসা করল। কিংবা তার সাহসিকতার স্বীকারোক্তি দিল।

'তুমি যাওয়ার পর এত বছরে আমি অনেকবার ভেঙে পড়েছি। অনেকবার আমি বিপর্যয় ও সন্দেহের শিকার হয়েছি। বহুবার আমিও চেয়েছি জীবনের এই ধোঁয়াশাকে

সালার তাকে শান্তভাবে বোঝাচ্ছে। 'আর ভবিষ্যতে তুমি কখনো তার সাথে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে। অন্যথায় আমি কিংবা তুমি কেউই তার জন্য কিছুই করতে পারব না।' কথা বলবে না। আর না স্কুলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নিয়ে তাকে ডাকতে যাবে। আমার সমস্যা আমি সমাধান করতে পারব, ওয়াসিম এতে কিছুই করতে পারবে না।' বলতে বলতে সালার খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। ইমামা ওভাবেই ফাঁকা প্লেট নিয়ে বসে রইল। জানি না হুট করে জীবনে এত অশান্তি কোথেকে চলে এলো! যে রূপকথার গল্প কয়েক মাস আগে সালারের সাথে শুরু হয়েছিল, যে সুখে সে ভাসছিল, সেই রূপকথার গল্প এখন কেন নেই? তাতে দুশ্চিন্তার জঞ্জাল কীভাবে জন্মাল? কিংবা এটি তার তাকদিরের নক্ষত্র, যা ঘুরেফিরে পুনরায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে।

সত্যিই স্কুলের ভবনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সবকিছু যেন আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। এটি সালারের চলমান জীবনের প্রথম বড় একটি আর্থিক ক্ষতি। কয়েক ঘন্টায় সবকিছু ছাই হয়ে

যাওয়ার অর্থ, সে এই প্রথম বুঝতে পারছে। আর এতে সবচেয়ে জঘন্য বিষয় হলো, এই পুরো ব্যাপারটিতে তার স্বশুরবাড়ির লোকেরা জড়িত। এ বিষয়ে অন্তত তার পরিবারের কারও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি প্রমাণ করা কেবল জটিলই নয়, বরং অসম্ভব। গ্রামের কোনো লোক জড়িত থাকলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পরই কাউকে না কাউকে ধরে ফেলত। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে ওখানকার কোনো লোকের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া যতটা নিখুঁতভাবে একই সময়ে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ভবনের বিভিন্ন অংশে ওই আগুন লাগানো হয়েছিল, এটি কোনো সাধারণ চোর-চামচারের কাজ নয়। এর উদ্দেশ্য যদি তার ক্ষতি করা হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আর যদি তাকে আঘাত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এটি তার পেটে আঘাত করার মতোই। সে ক্ষত হয়েছে, কিন্তু মুখ খুবড়ে পড়েনি।



: 'তাকে ছেড়ে দাও সালার!' পরের সপ্তাহে তারা পুনরায় ইসলামাবাদে এলো। তাইয়েবা এবার যেন অনুনয়-বিনয় করছেন। এবার তিনি এসব নিয়ে খুবই ভীত হয়ে পড়েছেন। তোমার বিয়ের ইচ্ছা ছিল, করেছে। এখন তা পূর্ণ হয়েছে। এবার তাকে ছেড়ে

: 'আপনি বুঝতে পারেন, এ ধরনের কথা বলে আপনি আমাকে কতটা কষ্ট দেন?' সালার উনার কথা পূর্ণ করতে দিল না।

: তুমি দেখোনি তারা কী কী করেছে?

: 'এখনো কিছুই প্রমাণিত হয়নি।' সালার পুনরায় মায়ের কথা রুখে দিল।

: 'তুমি নিরোধ হতে পারো, আমরা নই। ইমামার পরিবার ছাড়া তোমার শত্রু আর কে আছে?' তাইয়েবা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

: এতে ইমামার দোষ কোথায়?

: এসব তার জন্যই হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ না কেন!

: বুঝতে পারছি না, আর বুঝবও না। আমি কালও আপনাকে বলেছি, আজও বলছি, আর ভবিষ্যতেও এটাই বলব-আমি ইমামাকে ডিভোর্স দেব না। তার পরিবার আমার ক্ষতি করবে, অন্তত এ ভয়ে তো না-ই। আপনার অন্য কোনো কথা থাকলে আমি বসি। এ ব্যাপারে আমি আজ কিংবা ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো কথা বলতে চাই না।

তাইয়েবা কিছুই বলতে পারলেন না। সালার তা-ই বলছে, যা সিকান্দার উসমানের কাছে তিনি শুনেছেন। তবু উনার সুধারণা ছিল, এবার তিনি সালারকে এ বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে রাজি করিয়ে ফেলবেন। এ ব্যাপারে সিকান্দারের অবশ্য কোনো আশা ছিল না। এই মুহূর্তে সিকান্দার এখানে নেই।

আধা ঘন্টা তাইয়েবার সাথে কথা বলে সালার তার বেডরুমে এলো। এসে দেখল ইমামা টিভি দেখছে। সালার তাকে গ্রামে নিয়ে যায়নি। কিন্তু ইসলামাবাদে সপ্তাহান্তে আগামী দুদিন এখানে কনফারেন্স থাকায় তাকে সাথে নিয়ে এসেছে। সালার তার ল্যাপটপ বের করে কাজ করতে লাগল। তার তখন অদ্ভুত উপলব্ধি হলো, ইমামা যে চ্যানেল দেখছে তাতে খানিক পরপর বিজ্ঞাপন আসছে। আর সে সোফায় বসে অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে সেগুলো দেখছে। ইমামা সাধারণত একটার পর একটা চ্যানেল পরিবর্তন করে, সেখানে বিজ্ঞাপন দেখা তো আশ্চর্যের কথা। সালার ফাঁকে ফাঁকে দু-তিনবার তার ও টিভির দিকে তাকাতে থাকল। দীর্ঘ দশ মিনিটে একবারও ইমামা সামনের টেবিল থেকে চায়ের কাপ ওঠাল না। চা এখন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।

সালার ল্যাপটপ বন্ধ করে তার কাছে সোফায় এসে বসল।
তাকে দেখে ইমামা মুচকি হাসার চেষ্টা করল। সালার তার হাত
থেকে রিমোট নিয়ে টিভি অফ করে দিল।

: তুমি আমার ও মান্নির কথা শুনেছ? ইমামা ক্ষণিকের জন্য
নিশ্চুপ হয়ে গেল। সালার জিন কিংবা জাদুকর নয়, শয়তান।
শুধু শয়তানই নয়; শয়তানের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই। তার চোখের
দিকে তাকিয়ে মিথ্যা বলা অনর্থক। ইমামা তাই ঘাড় সোজা
করে বসল।

: 'হ্যাঁ, কিচেনে চা বানাতে গিয়েছিলাম আমি। তুমি আর মান্নি
তখন লাউঞ্জে কথা বলছিলেন। ওখান থেকে সব শুনেছি আমি।'
ইমামা মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল। সে তাকে এটা বলতে
পারল না যে, তাইয়েবার ওই আবেদন তার পায়ের নিচ থেকে
মাটি সরিয়ে ফেলেছিল। সর্বশেষ যে ভয়টি সে করছিল, তা ছিল
এটিই। আর সেটাও এতটা স্পষ্ট শব্দে, এতটা অসম্মানজনক
ভঙ্গিতে! 'তুমি যখনই এখানে আসো, তিনি কি এসব বলেন

তোমাকে?' দীর্ঘ নীরবতার পর ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল।
সালার তাকে সান্ত্বনা দিতে কথা খুঁজতে লাগল।

সালার সহমর্মিতার সুরে বলল। : না, সবসময় বলেন না। কখনো
কখনো তিনি একটু বেশিই বলে ফেলেন।"

উঠল। : 'এখন থেকে আমি আর কখনো ইসলামাবাদ আসব
না।' ইমামা হুট করে বলে

: 'কিন্তু আমি তো আসব। আর আমার সাথে তোমাকেও
আসতে হবে।' কথাগুলো সহজ, কিন্তু ভঙ্গিমা নয়। ইমামা
সালারের মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

: তুমি তোমার মান্নির পক্ষ নিচ্ছ?

: হ্যাঁ, যেমনটা আমি উনার সামনে তোমার পক্ষ নিয়েছি।

তার উত্তরে ইমাম কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না। সালার ঠিকই বলছে। নীরবতার আরও একটি দীর্ঘ বিরতি এলো। তারপর সালার বলল, 'জীবনে যদি কখনো তোমার-আমার মাঝে বিচ্ছেদের মতো কোনো জিনিস আসে, তাহলে তার কারণ আমার পিতা-মাতা কিংবা পরিবার হবে না। এই নিশ্চিত্ততা অন্তত আমি তোমাকে দিচ্ছি।' ইমামা তবু চুপ রইল। 'কিছু বলো।'

: কী বলব?

: তুমি চুপ থাকলে আমার খুব ভয় লাগে?

ইমামা অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। সালার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছে। 'আমার মনে হয়, কোনো একদিন এ কথাটিই তুমি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবো।'

ইমামা তাকে দেখতে থাকল, কিন্তু কিছুই বলল না। সালার তার হাত আপন হাতের মুঠোয় পুরে নিল। 'তুমি আমার স্ত্রী ইমামা! আর তিনি আমার মা। আমি তোমাকে শাটাপ বলতে পারি, কিন্তু উনাকে না। তিনি একজন মায়ের মতো ভাবছেন এবং একজন মায়ের মতোই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। তুমি যখন মা হবে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। তিনি তোমাকে কিছু বলেননি, আমাকে বলেছেন। আমি তা উপেক্ষা করেছি। যে বিষয়টি আমি উপেক্ষা করেছি, তা যদি তুমি সিরিয়াসভাবে নাও, তাহলে এটি হবে তোমার নির্বন্ধিতা।' সালার তাকে বোঝাচ্ছে। সে শুনে যাচ্ছে। সে নীরব হতেই ইমামা মৃদু স্বরে বলল, 'আমার কোনো কিছুই কখনো ঠিক হবে না। যখন থেকে বিয়ে হয়েছে, এসবই হচ্ছে। তোমার ওপর একের

পর এক বিপদ চলে আসছে। আমাকে বিয়ে করা তোমার জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়নি। এখনই এত সমস্যা হচ্ছে, তাহলে ভবিষ্যতে না জানি...'। সালার তার কথা খামিয়ে দিল।

: বিয়ে একে অপরের ভাগ্যকে করা হয় না। একে অপরের সত্তাকে করা হয়। ভালো দিনের জন্য মানুষ বন্ধুত্ব করে, বিয়ে নয়। আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যা-ই আছে, যেমনই আছে, একসাথেই আছে। আর যদি তোমার মনে হয় আমি এটা প্রত্যাশা করছি যে, বিয়ের পর আমি লটারি জিতে যাব, তারপর কোনো বোনাস পাব, তারপর আমার প্রমোশন হবে, তারপর আমি আনন্দ করে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলব যে, বিবাহিত জীবন আমার জন্য অনেক সৌভাগ্যময়, তাহলে সরি; আমার এমন কোনো প্রত্যাশা নেই। যা কিছু হচ্ছে তা হয়তো এই মুহূর্তে আমার জন্য অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর। কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। তোমার জন্য আমি কতটা করতে পারি, কতটা একনিষ্ঠ, তা সময়ই বলবে। তাই চুপচাপ সবকিছু সময়ের ওপর ছেড়ে দাও।

এই চা তো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, যাও, আবার বানিয়ে নিয়ে আসো।



ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু একটা তার চোখ উপচে পড়তে লাগল। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জীবনে কতভাবে যে নিরাপত্তা দেন! কতভাবে যে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে তাকে রক্ষা করেন! ইমামা ডাক্তার সিবতে আলির ওখানে থাকাকালীন ভেবেছিল, এর চেয়ে বেশি সম্মান, বেশি নিরাপত্তা আর কেউ তাকে দিতে পারবে না। অন্তত বিয়ের মতো একটি বন্ধনের কাছে সে দায়িত্বশীলতা ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যাশা করেনি। আর এখন এই মানুষটির সাথে জড়িত হয়ে সে নিরাপত্তার নতুন মর্ম সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। 'এসবের কোনো দরকার নেই, ইমামা!' সালার তার গালে প্রবাহিত অশ্রু দেখে তাকে কোমলভাবে বলল। ইমামা মাথা নেড়ে, নাক ঘষতে ঘষতে উঠে পড়ল। এই কান্নাকাটির সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই।



সালার এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করেছিল, তা ইমামা জানে না। স্কুলের নির্মাণকাজ পুনরায় কীভাবে শুরু হলো, এটিও তার জানা নেই। কিন্তু স্কুল পুনরায় নির্মিত হচ্ছে। সালার এখন আগের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এভাবেই তার জীবনের আরও একটি ঝড় কোনো ধবংস ছাড়াই অতিক্রম করে গেল।

: 'হাত দেখানোর প্রতি কোনো আগ্রহ নেই আমার।' সালার সরাসরি অস্বীকার

করে বলল।

: 'কিন্তু আমার আছে।' ইমামা তাকে পীড়াপীড়ি করল।

: 'এসব মিথ্যা।' সালার বাচ্চাদের মতো তাকে মানানোর চেষ্টা করছে।

এলো না।

: 'কোনো সমস্যা নেই, দেখাতে ক্ষতি কী!' ইমামার কথায়
কোনো পরিবর্তন

: 'ভবিষ্যতের ব্যাপারে কী জানতে চাও তুমি? আমাকে
জিজ্ঞেস করো।' সালার তাকে ওই পামিস্টের (হস্তরেখাবিদ)
কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছে না। লোকটি ফাইভ-স্টার হোটেলের
লবিতে বসে আছে। একটু আগেই সালাররা এখানে খাবার
খেতে এসেছে। খাওয়ার পর না জানি হুট করে ইমামার
কীভাবে পামিস্টের খেয়াল এলো।

: 'খুবই হাস্যকর!' ইমামা তাকে উপহাস করল। 'তোমার
নিজের ভবিষ্যৎই তো তুমি জানো না, আমারটা জানবে
কীভাবে?'

: 'কেন? তোমার আর আমার ভবিষ্যৎ কি একই নয়?' সালার মুচকি হেসে জয়ের ভঙ্গিতে বলল।

: 'এজন্যই তো বলছি, পামিস্টের কাছে চলো। তার কাছে জিজ্ঞেস করি।' ইমামার পীড়াপীড়ি বেড়ে চলল।

: 'দেখো আমাদের 'আজ' ভালো আছে, 'কাল' কী হবে, সেটা নিয়ে তুমি ভাবছ কেন?' সালার এখনো রাজি হচ্ছে না।

: 'কাল নিয়ে ভাবনা আমার আছে।' ইমামা খানিক উত্তেজিত হয়ে বলল। সে হয়তো প্রত্যাশা করেনি তার কথায় সালার এমন আপত্তি করবে। 'কত কত মানুষ তাকে হাত দেখায়! তুমি জানো, আমার সহকর্মীকে সে কতকিছু ঠিক ঠিক বলেছে! ভাবিরও অনেক কাজিন এসেছিল, তাদের ব্যাপারেও...'। ইমামা তাকে প্রভাবিত করার জন্য এখন উদাহরণ টানছে।

: 'ভাবি এসেছিল এর কাছে?' সালার চমকে জিজ্ঞেস করল।
'না।' ইমামা খতমত করল।

: তাহলে?

: তার মানে উনার হয়তো আগ্রহ নেই। আমার তো আছে।
এখন তুমি নিয়ে না গেলে আমি একাই চলে যাব।' ইমামা
একদম গম্ভীর হয়ে গেল।

: কবে?

* 'এখনই।' ইমামা অনাকাঙ্ক্ষিত হেসে ফেলল। আর সালার
যেন আত্মসমর্পণ করে বলল, 'পামিস্টকে হাত দেখানো
দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিবুদ্ধিতা। আর আমি তোমার কাছে এমন
কোনো নিবুদ্ধিতার প্রত্যাশা করিনি। এখন তুমি যেহেতু জেদ
করছ, তাহলে ঠিক আছে, তুমি দেখাও হাত।'

: 'তুমি দেখাবে না?' পাশাপাশি লবির দিকে যেতে যেতে ইমামা তাকে জিজ্ঞেস

করল।

: 'না' সালার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল।

: 'ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। নিজেই তো বলছ যে, তোমার আর আমার ভবিষ্যৎ একই। তাহলে যা কিছু আমার ব্যাপারে বলবে, সেসব তোমার ব্যাপারেও তো হবে।' ইমামা এখন তাকে জ্বালাতন করছে।

: 'যেমন?' সালার দ্রুত কুঁচকাতে কুঁচকাতে তাকে প্রশ্ন করল।

: 'বলা আবশ্যিক নয়।' ইমামা তাকে বিরক্ত করছে।

: হতে পারে স্বামী হিসেবে তোমার সাথে আমার জীবন খারাপ কাটবে।

'তাতে আমার কী? আমার তো ভালো কাটবে।' ইমামা কাঁধ কুঁচকে নিজের ভ্রক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করল।

: 'তোমরা নারীরা অনেক স্বার্থপর।' সালার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার ব্যবহারের যেন নিন্দা করল।

: 'তাহলে আমাদের বিয়ে করো না। ভালোবেসো না আমাদের। আমরা কবে মরে যাচ্ছি তোমাদের জন্য?' ইমামা দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল। সালার হাসতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সত্যিই সে নিরুত্তর হয়ে গেল।

: 'হ্যাঁ, আমরাই তোমাদের জন্য মরে যাই। সম্মানের জীবন আমাদের সয় না, হয়তো এজন্যই।' সালার কয়েক মুহূর্ত পর বিড়বিড় করে বলল।

: 'তার মানে বিয়ের আগে তুমি সম্মানের জীবনযাপন করতে?'
ইমামার একদম মন খারাপ হয়ে গেল: 'বিষয়টি নিয়ে আমরা
হয়তো বিবেচনা করছিলাম।' তার পরিবর্তিত চেহারা দেখে
সালার বলল।

: না, তুমি কেবল নিজের কথাই বলো।

: 'তুমি যদি রাগ করো, তাহলে থাক, পামিস্টের কাছে যেতে
হবে না।' সালার অত্যন্ত শান্তভাবে তাকে প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে
দিল।

ঠিক হয়ে গেল। : 'না, আমি কখন রাগ করলাম? এমনিই
বলছিলাম।' এক মুহূর্তেই তার মোড

পালটাল। : 'তাছাড়া পামিস্টের কাছে তুমি কী জিজ্ঞেস করবে?'
সালার প্রসঙ্গ আরও কিছুটা

: 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।' ইমামা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর করল। সালার কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে তারা পামিস্টের কাছে চলে এসেছে।

পাশের একটি চেয়ারে বসে সালার নিরাসক্তভাবে তার স্ত্রী ও পামিস্টের প্রাথমিক কথোপকথন শুনতে লাগল। কিন্তু তার স্ত্রীর আগ্রহ ও গম্ভীরতা দেখে সালার অবাক হচ্ছে। পামিস্ট এখন একটি লেন্সের সাহায্যে তার হাতের রেখা নিরীক্ষা করছে। তারপর সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করল, 'রেখার জ্ঞান চূড়ান্ত নয়; হৃদয়ে জাগরিত খোদাপ্রদত্ত ইলহামও নয়। আমরা কেবল সেটাই বলি, যেটা রেখা আমাদের বলে। সব শেষে তা তাকদিরে পরিণত করা, সাজানো কিংবা ধ্বংস করা আল্লাহ তাআলার কাজ।' লোকটি কথা বলতে বলতে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল। তারপর সে যেন অবাক হয়ে কিছু দেখতে দেখতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ইমামার মুখের দিকে তাকাল। তারপর তাকাল চেয়ারে উপবিষ্ট তার স্বামীর দিকে।

: 'অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়!' লোকটি পুনরায় তার হাত দেখতে দেখতে বলল।

: 'কী?' ইমামা খানিক অস্থির হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল।

: এটা আপনার প্রথম বিয়ে?

ব্লেকবেরিতে মেসেজ চেক করতে করতে সালার চমকে লোকটির দিকে তাকাল। সে ভেবেছিল, প্রশ্নটি তাকে করা হচ্ছে। কিন্তু লোকটির মনোযোগ ইমামার দিকে।

: 'হ্যাঁ।' ইমামা খানিক অস্থির হয়ে প্রথমে লোকটির দিকে, তারপর সালারের দিকে তাকাল।

: 'ও আচ্ছা।' লোকটি পুনরায় কোনো ভাবনায় ডুবে গেল।

: 'আপনার হাতে দ্বিতীয় বিয়ের একটি রেখা রয়েছে। অনেক শক্তিশালী রেখা। আনন্দময়, সফল দ্বিতীয় বিয়ে।' লোকটি তার হাত দেখতে দেখতে যেন চূড়ান্তসিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে বলল। ইমামার চেহারা ধূসর হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে সে সালারের দিকে তাকাল। সে তার মতো একদম নীরব হয়ে আছে।

: 'আপনি নিশ্চিত?' ইমামার মনে হলো পামিস্টের কোথাও হয়তো কোনো ভুল

হয়েছে।

'আমি যতটুকু জানি, সে অনুযায়ী আপনার হাতে বিয়ের দুটি রেখা দেখতে পাচ্ছি। আর দ্বিতীয় রেখাটি প্রথম রেখার তুলনায় অধিক স্পষ্ট।' লোকটি এখনো তার হাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। ইমামা আর কোনো প্রশ্ন করার আগেই সালার তার পকেট থেকে ওয়ালেট এবং ওয়ালেট থেকে কারেন্সি নোট বের করে লোকটির সামনে টেবিলে রেখে দিল।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ। এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, যেতে হবে।' বলে সালার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইমামা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে তার সাথে যেতে লাগল।

: 'আরও অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার বাকি আমার।' ইমামা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সালারের কাছাকাছি এসে বলল।

: 'যেমন?' সালার খানিক রুক্ষভাবে বলল। ইমামা তাৎক্ষণিক তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না।

: 'লোকটি আমাকে আরও বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।' ইমামা তার প্রশ্নের উত্তর করল না, কিন্তু পার্কিংয়ে পৌঁছে গাড়িতে বসেই সালারকে এটি বলল।

: 'It was your choice. তুমিই গিয়েছিলে ওখানে।' সালার খানিক অনীহাভরে বলল। 'সে তোমাকে যেতে বলেনি, তুমি নিজে গিয়েছিলে তার কাছে ভবিষ্যৎ দেখতে।'

: 'সালার, তুমি কি আমাকে ছেড়ে দিবে?' প্রত্যুত্তরে ইমামা হুট করে বলে উঠল।

: 'লোকটির কথা শুনে যদি তুমি এমনটা ভেবে থাকো, তাহলে তোমার প্রতি আমার আফসোস।' সালার এতে রেগে গেল। ইমামা খানিক বিব্রত হয়ে পড়ল।

: এমনিই জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে।

: 'আমাকে নিয়ে তোমার আগে থেকেই কি কম সন্দেহ ছিল? যার জন্য এখন আবার পামিস্টের কাছে যেতে হয়েছে?' সালারের মনঃক্ষুণ্ণতা হ্রাস পেল না। 'দ্বিতীয় বিয়ের কথা তো সেটি তোমার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। একটি সফল ও

সুখময় দাম্পত্যজীবনের। আর তুমি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছ যে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব কি না। এও তো হতে পারে, তুমিই আমাকে ছেড়ে দিবে!" সালার এবার কটাক্ষভরে বলল। তাদের গাড়ি এখন মূল সড়কে চলে এসেছে। "আমি তো তোমাকে কখনোই ছাড়ব না।" ইমামা সালারের দিকে না তাকিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল।

: 'তাহলে হতে পারে আমি মারা যাব, তারপর তোমার দ্বিতীয় বিয়ে হবে।' ছট করে সালারের মাথায় তাকে উত্তপ্ত করার খেয়াল এলো। ইমামা এবার অভিমানী চোখে তার দিকে তাকাল।

: বোকার মতো কথা বলো না।

: তাছাড়া তুমি বিয়ে করে নিয়ো, আমি মরে গেলে একা থেকে না।

এ কথায় ইমামা আরও অসন্তুষ্ট হলো।

: 'আমি একটা বলছি, আর তুমি সেখানে অন্য কথা শুরু করে দিয়েছ। আর আমার প্রতি এত দয়া দেখানোর প্রয়োজন নেই তোমার।' ইমামা মনঃক্ষুব্ধ হয়ে বলল। সালার চুপ রইল। ইমামাও এবার চুপ করে রইল।

: 'তুমি মূলত চাও যে, আমি যেন তোমাকে বলি, যদি আমি মারা যাই তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়ো।' কয়েক মুহূর্ত পর ইমামা একদম বলে উঠল। সালার তার বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

: 'তাহলে কি আমি করব না?' সালার ইচ্ছা করেই তাকে অত্যন্ত শান্তভাবে জ্বালাতে লাগল। ইমামা কোনো উত্তর না করে অস্থির চোখে তার দিকে তাকাল।

: 'পামিস্টের কাছে যাওয়াই উচিত হয়নি আমার।' ইমামা
আফসোস করল।

: 'তুমি আমাকে সুদের ব্যাপারে কথা বলো, আর এদিকে
নিজেই বিশ্বাস করো, আল্লাহ ছাড়া মানুষও মানুষের ভাগ্য
বলতে পারে।' সালার স্পষ্টভাষীর মতো বলল। আর সবসময় সে
এমনই ছিল। কিন্তু তার স্পষ্টবাদিতা ইমামাকে কখনো এমন
লজ্জিত করেনি, যেমন করছে এখন। হাঁটু পানিতে ডুবে মরা
বুঝি একেই বলে।

: 'মানুষ আমি, ফেরেশতা তো নই।' মৃদুস্বরে বলল ইমামা।

: জানি, তাছাড়া তোমাকে কখনো ফেরেশতা মনেও করিনি
আমি। তাই ভুল করার সুযোগ দেই তোমাকে, কিন্তু তুমি
আমাকে দাও না।

সালারের কথায় ইমামা কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই
রইল। সে ঠিকই বলছে। খুব কমই ভুল কথা বলে সে। এটি মেনে
নিতে ইমামার কোনো আপত্তি নেই।

: 'জীবন ও ভাগ্যের খবর যদি জ্যোতিষ চক্র, পাশা খেলা,
রহস্যময় সংখ্যা, হাতের রেখা ও নক্ষত্রের মাধ্যমে জানা যেত,
তাহলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বুদ্ধি দিতেন না। এগুলো
দিয়েই দুনিয়াতে পাঠাতেন।' সালার গাড়ি চালাতে চালাতে
বলতে লাগল। আর ইমামা লজ্জিত চেহারায় শুনতে থাকল।
'ভবিষ্যৎ পরিবর্তন না করাগেলে, সেটি জেনে কী লাভ! তার
চেয়ে উত্তম হলো, অদৃশ্য অদৃশ্যই থাকুক। ভবিষ্যতের খবর
না জানতে চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তার রহম ও করম
প্রার্থনা করা অধিক উত্তম।'

প্রত্যুত্তরে ইমামা কিছুই বলতে পারল না। মাঝে মাঝে সালার
তাকে নির্বাক করে দেয়। কিছু বলার যোগ্য রাখে না। এই বিশ্বাস

ও ভরসাই তো তার পুঁজি। এই পুজি সালার কীভাবে লাভ করল!

রাতে এই প্রথম ইমামার অস্থির লাগতে লাগল। সালার তার সঙ্গী, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হলো। ইমানের পথে সে তার চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে! কিন্তু কীভাবে তাকে পেছনে ফেলে গেল?

৪২

সালারের সাথে সে কাবার চত্বরে বসে আছে। তার ডান পাশে সালার। এখানে আজ তাদের শেষ রাত। গত পনেরো দিন ধরে তারা এখানে আছে। বিয়ের সাত মাস পর তারা এখানে উমরা করতে এসেছে।

ইহরাম পরিহিত সালারের উন্মুক্ত কাঁধের দিকে তাকিয়ে এক দীর্ঘ সময় পর ইমামার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। সালারের

ডান কাঁধে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। কিন্তু তার বাম কাঁধের পেছনে এখন একটি ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। যে ক্ষতটি কিছুদিন আগে হাশেম মুবিন ছুরির আঘাতে করেছিলেন।

: 'তুমি আগে কখনো আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাপারে বলোনি।' ইমামার মুখে স্বপ্নের কথাটি শুনে সালার তাকে বলল। 'কবে দেখেছ তুমি এই স্বপ্ন?'

দিন, তারিখ, মাস, সময় সবকিছু মনে আছে ইমামার। কীভাবে বলতে পারে সে এটি! সেদিন সে জালালের সাথে দেখা করেছিল, এতগুলো বছরের অপূর্ণ অপেক্ষার পর। আর সালার নির্বাক হয়ে আছে, কারণ এটি সেই রাত, যে রাতে একদিন সে এখানে তার জন্য কাকুতিমিনতি করে দোয়া করছিল। মনে আশা ছিল, এই দোয়াটি কবুল হয়ে যাক। যদিও সে জানত না, ইতিমধ্যে তার এই দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন।

: 'সেদিন আমি এখানে ছিলাম।' চোখ কচলাতে কচলাতে সে ইমামাকে বলল। ইমামা এবার ঝুঙ্ক হয়ে গেল।

: উমরা করতে? সালার মাথা দোলাল। তারপর মাথা নত করে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। ইমামা কিছুই বলতে পারল না, কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'সেদিন তুমি এখানে না থাকলে হয়তো...'। একটি দীর্ঘ নীরবতার পর ইমামা কিছু বলতে চাইল। কিন্তু কথা পূর্ণ করতে পারল না।

: 'হয়তো?' সালার মুখ তুলে তার দিকে তাকাল। যেন চাচ্ছে, ইমামা কথাটি পূর্ণ করুক। কিন্তু ইমামা কীভাবে সেটি বলবে! সে কীভাবে বলবে যে, সেদিন তুমি দোয়া না করলে জালাল হয়তো আমার সাথে এমন শীতল, নিশ্চল ও অনীহাভাবে কথা বলত না। তাকে উপেক্ষা করে এমন আচরণ করত না। কিন্তু সালার দোয়ার মাধ্যমে তার ও জালালের মাঝে আল্লাহ

তাআলাকে নিয়ে এসেছিল। আর তাই সালারকে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই বেছে নিয়েছেন। একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ইমামা সেসব যেন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু সালারের কথাগুলো যেন তার কানে গোঁথে গেল।

: 'এত বছরে আমি যখনই এখানে এসেছি, তোমার জন্যও উমরা করেছি।' অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সে তাকে বলে চলল, আর ইমামা কেঁদে যেতে থাকল।

: তোমার পক্ষ থেকে প্রতি ঈদে কুরবানিও করেছি আমি।

: 'কেন?' ইমামা ধরা গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল।

: তুমি আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলে। দূরে ছিলে, কিন্তু আমার জীবনের অংশ হয়ে ছিলে।

ইমামা কেঁদেই চলল। তার জন্য এই লোকটিরই কি সবকিছু করার ছিল? সালার হাফেজে কুরআন, এটিও সে এখন জানতে পারল। জালালের নাত শুনে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত, আর এখন সালারের তিলাওয়াত শুনে নির্বাক হয়ে রইল।

: 'এত সুন্দর তিলাওয়াত কোথায় শিখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না ইমামা।

: 'যখন কুরআন হেফজ করেছি তখন। এখন তো তা অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েছে।' সালার অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলল। ইমামা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

: 'তুমি কুরআন পাক হেফজ করেছ? ডাক্তার সাহেব তো কখনো বলেননি।' ইমামা স্তম্ভিত হয়ে আছে। 'এত মাসে তুমিও তো কখনো বললে না।'

: 'কী জানি, কখনো মনেই আসেনি। ডাক্তার সাহেবের কাছে আগত অধিকাংশ লোকই হাফেজ। আমার হাফেজ হওয়া উনার কাছে কোনো বিরল কিছু নয়।' সালার বলে চলল। 'কিন্তু তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন?' ইমামার চোখে অশ্রুর একটি স্রোত বয়ে চলল। জালালকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করার একটি কারণ ছিল, সে ছিল হাফেজে কুরআন। আর আজ সে যার স্ত্রী, সেও হাফেজে কুরআন। এমন অনেক নিয়ামত আছে, না জানি আল্লাহ তাআলা কোন নেকির বিনিময়ে সেগুলো দান করেন। তা বোধগম্য হয় না। তিনি মানুষের হৃদয়ে কীভাবে অবস্থান করেন, তা সে শুনে আসছে। তিনি হৃদয়ের ভার কীভাবে বুঝে ফেলেন, তা সে দেখে আসছে। ব্যস, সবকিছু কেবল তার 'কুন' শব্দেই হয়ে যায়। ব্যস, এভাবেই, এত সহজ তার কাছে! এক পলকেই, নিশ্বাস নেওয়ার আগেই হয়ে যায়।

এই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা সামনে থাকলে ইমামা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। অঝোরে কান্না করত। জীবনে অনেক কিছুই সে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু এটি তো কেবল চেয়েছিল। তিনি

এতকিছু দান করছেন! তার হৃদয় চাচ্ছে, পুনরায় দৌড়ে হারাম শরিফে পৌঁছে যেতে।

: কান্না করছ কেন?

ইমামা এই কান্নার কারণ জানে না। সে কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল।

: 'অনেক খুশি, তাই। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ সেজন্য। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারছি, তাই।' সে কাঁদছে, হাসছে আর বলে চলছে।

: 'তুমি একটা বোকা তাই।' সালার যেন এর সারমর্ম বলল।

: 'হ্যাঁ, সেটাও।' অশ্রু মুছতে মুছতে সে এই প্রথম সালারের মুখে বোকা উপাধি শুনে মন খারাপি দেখাল না। এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে, পুনরায় চোখ খুলে হারাম শরিফের চত্বরে

খানায়ে কাবার একদম সামনে উপবিষ্ট সালারের দিকে তাকাল। সালার অত্যন্ত মধুর সুরে কুরআন পাক তিলাওয়াত করছে। ফাবি আইয়্যি আলা ই-রবিবকুমা তুকাযযিবান-তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

'যা করছ তুমি, এর জন্য একদিন আফসোস করবে, ইমামা!'' নয় বছর পূর্বে তার গালে থাপ্পড় মেরে হাশেম মুবিন কথাটি বলেছিলেন। 'তোমার মতো মেয়েদের আল্লাহ তাআলা অপমান ও অপদস্থ করেন। কাউকে মুখ দেখানোর যোগ্য রাখেন না।' কথাগুলো ভাবতেই ইমামার চোখ ভিজে উঠল। 'একদিন তুমি আবারও আমাদের কাছে ফিরে আসবে। অনুনয়-বিনয় করবে। হাউমাউ করে কান্না করবে। তখন আমরা তোমাকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেব। তখন তুমি চিৎকার করে করে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে। বলবে, আমি ভুল করেছি।' ইমামা অশ্রুসিক্ত চোখে হাসল। হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে বলল, 'আমার ইচ্ছা হলো বাবা, জীবনে একবার

হলেও আমি আপনার সামনে যাব, আর তখন আপনাকে বলব, দেখুন আমার চেহারায কোনো অপদস্থতা, কোনো অসম্মানের ছোঁয়া নেই। আমার আল্লাহ আমার হেফাজত করেছেন। পৃথিবীর সামনে আমাকে হাসির পাত্র বানাননি। না দুনিয়াতে বানিয়েছেন, আর না আখেরাতে কোনো অপদস্থতার মুখোমুখি করবেন। আজ আমি যদি এখানে উপস্থিত হয়ে থাকি, তাহলে সেটা এজন্য যে, আমি সরল পথে আছি। আর তাই এখানে বসে আমি পুনরায় স্বীকারোক্তি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবি ও রাসূল। তারপর কোনো পয়গম্বর আসেননি, আর আসবেনও না। আমি স্বীকার করছি যে, তিনিই পীরে কামেল। আমি স্বীকার করছি, তাঁর মতো কামালিয়তসম্পন্ন দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই। তাঁর বংশের কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। এমন কেউ আর কখনো আসবেও না। আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমার আগত জীবনে কখনো কাউকে তাঁর সাথে শরিক না করান। আর না কাউকে তাঁর সর্বশেষ পয়গম্বর হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকক্ষ ভাবার

দুঃসাহস দেন। আমি দোয়া করছি যে, সারা জীবন তিনি যেন আমাকে সরল পথে রাখেন। নিঃসন্দেহে আমি তাঁর কোনো নিয়ামত অস্বীকার করতে পারব না।"

সালার এতক্ষণে সুরা রহমান তিলাওয়াত শেষ করে, ক্ষণিকের জন্য থামল। তারপর সিজদায় চলে গেল। সিজদা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে থমকাল। ইমামা দুই হাত ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে দোয়া করছে। সালার তার দোয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ইমামা দোয়া শেষ করল। সালার পুনরায় উঠতে চাইল, কিন্তু উঠতে পারল না। কেননা, ইমামা অত্যন্ত আলতো করে তার ডান হাত চেপে ধরল। সালার অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

: 'লোকেরা যে বলে, যাকে ভালোবাসলাম, তাকে পেলাম না। জানো, এমনটা কেন হয়?' রাতের শেষ প্রহরে আলতো করে তার হাত চেপে ধরে, অশ্রুসিক্ত চোখে, হাস্যরত মুখে ইমামা বলে চলল। 'ভালোবাসায় সততা না থাকলে, তা অর্জিত হয় না।

নয় বছর আগে আমি যখন জালালকে ভালোবেসেছিলাম, তখন তাকে সততার সাথেই ভালোবেসেছিলাম। দোয়া, আমল, অজিফা, অনুনয়-বিনয়, কী নেই যা আমি করিনি! কিন্তু তাকে আমি পাইনি।" ইমামা হাঁটুতে ভর করে বসে আছে। সালারের হাত তার হাতের নরম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, তার হাঁটুর উপর ছড়িয়ে আছে। 'কিন্তু কেন পাইনি জানো? কারণ, তখন তুমিও আমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলে। আর তোমার ভালোবাসায় আমার ভালোবাসার চেয়ে বেশি সততা ছিল।' ইমামার কথা শুনতে শুনতে সালার তার হাতের দিকে তাকাল। ইমামার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু এখন তার হাতে এসে পড়ছে। সালার পুনরায় ইমামার দিকে তাকাল। ইমামা বলে চলল, 'আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলা আমাকে অত্যন্ত ভালোবেসে বানিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন কোনো লোকের হাতে অর্পণ করতে চাননি, যে আমার মূল্যায়ন করবে না। আমাকে অবমূল্যায়ন করবে, আমার মর্যাদা বিনষ্ট করবে। আর জালাল আমার সাথে এমনটাই করত। সে কখনোই আমাকে মূল্যায়ন করত না। নয় বছরে আল্লাহ তাআলা আমাকে

সমস্ত বাস্তবতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের ভেতর ও বাহির দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তারপর তিনি আমাকে সালার সিকান্দারের হাতে অর্পণ করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, তুমি সেই ব্যক্তি, যার ভালোবাসায় সততা রয়েছে। তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে আমাকে এখানে নিয়ে আসবে! তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা ছিল পবিত্র ও নির্মল।"

সালার নিশ্চল ও নীরব হয়ে তাকে দেখতে থাকল। ইমামা তার ভালোবাসার স্বীকারোক্তি প্রকাশের জন্য কী সুন্দর জায়গাটিই না নির্বাচন করেছে। সে এখন সালারের হাতে স্নিগ্ধতা ও শ্রদ্ধায় চুমু খেতে খেতে তার চোখে ছোঁয়াচ্ছে।

'তোমাকে কতটা ভালোবাসতে পারব, তা আমি জানি না। হৃদয়ের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু জীবনের যতটুকু সময় আমি তোমার সঙ্গে কাটাব, তোমার অনুগত ও বাধ্য হয়েই কাটাব। এটি আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রতিটি জটিল

পরিস্থিতি, প্রতিটি পরীক্ষায় আমি তোমার পাশে থাকব। ভালো দিনগুলোতে আমি তোমার জীবনে এসেছি, খারাপ দিনগুলোতেও আমি তোমার সঙ্গে ছাড়ব না।" বলতে বলতে ইমামা যেমন কোমলতায় হাত ধরেছিল, ঠিক তেমন কোমলতায় হাত ছাড়িয়ে নিল। সে এখন মাথা নিচু করে দু-হাতে অশ্রু মুছেছে। সালার নীরবে উঠে দাঁড়াল। উঠে খানায়ে কাবার দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে নিঃসন্দেহে দুনিয়ার নেক ও সর্বোত্তম নারীদের একজনকে অর্পণ করা হয়েছে। সেই নারী, যার জন্য সালার প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি জায়গায় দোয়া করেছে। আরও কোনো নিয়ামতপ্রাপ্তি বাকি আছে কি সালারের? সবকিছুই যেন তাকে দান করা হয়েছে। আর এখন সে নারীটি যখন তার পাশে রয়েছে, এখন তার মনে হচ্ছে, কী এক বিশাল দায়িত্ব সে কাঁধে নিয়ে বসে আছে! আল্লাহ তাআলা তাকে এই নারীটির দায়িত্বশীল বানিয়ে দিয়েছেন। যে নারীটি নেক আমল ও পবিত্রতায় তার চেয়ে অনেক এগিয়ে।

ইমামা উঠে দাঁড়াল। সালার চুপচাপ তার হাত ধরে ওখান থেকে যাওয়ার জন্য সামনে পা বাড়াল। এই নারীটির হেফাজতের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করা হয়েছে। যে নারীটি তার স্বাধীন জীবনকে তার মতো কোনো কলুষতা ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত করেনি। যে তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নিজের আত্মা ও শরীরকে তার মতো প্রবৃত্তির কাছে বলি দেয়নি। তার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে সালারের এই প্রথম পবিত্রতা ও খোদাভীতির মর্ম বুঝে আসছে। সে তার সমস্ত জীবনকে যেন সিনেমার পর্দার মতো ভেসে উঠতে দেখছে। তার প্রচণ্ড ভয় অনুভূত হচ্ছে। 'সালার, তোমার কাছে একটি জিনিস চাইব?' ইমামা যেন তার চিন্তার ধারাবাহিকতায় বাঁধ সাধল। এখন তারা হারামের সীমানা থেকে প্রায় বেরিয়ে পড়ছে।

সালার থেমে তার মুখের দিকে তাকাল। সে জানে ইমামা তার কাছে কী চাইবে। 'একবার তুমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবাটি পড়ো।'

সালার ভাবতেও পারেনি ইমামা তার কাছে এ আবেদন করবে।
সে অবাক হলো।

: 'শেষ খুতবা?' সালার বিড়বিড় করল।

: 'হ্যাঁ, সেই খুতবা, যেটি তিনি জাবালে রহমতের কোলে
দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে আদম ও হাওয়া আলাইহিস
সালাম ৪০ বছর পর মিলিত হয়েছিলেন এবং ক্ষমা লাভ
করেছিলেন। সেই বিদায় হজের ভাষণ; সেই শেষ খুতবা।'
শান্তভাবে বলল ইমামা। এক ঝটকায় সালারের মাথায় এসে
পড়ল, ইমামা তাকে কেন শেষ খুতবাটি পড়তে বলছে।

সালারের কাছে একদিন আগেও সে শেষ খুতবার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। তখন তারা জাবালে রহমতে দাঁড়ানো ছিল।

: 'শেষ খুতবার কথা হঠাৎ তোমার কেন মনে এলো?' সালার খানিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে তারা জাবালে রহমতে নফল পড়ে এখন দাঁড়িয়ে আছে।

: 'এখানে দাঁড়িয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ খুতবা দিয়েছিলেন, তাই না?' ইমামা জাবালে রহমতের চূড়ার পাদদেশে তাকিয়ে বলল।

: 'হ্যাঁ...'। সালার তার দৃষ্টির অনুসরণ করে নিচে উঁকি দিল। তাদের পোশাক এখন বাতাসের ঝাপটায় দুলছে। তখন দুপুরের সময়। তীব্র রোদ ও লু-হাওয়ায় ঝলসানো পরিস্থিতিতে সে তাকে রক্ত হিম করার মতো প্রশ্ন করতে যাচ্ছে।

: 'খুতবাটি তোমার মুখস্থ আছে?' ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'পুরোটা তো নেই।' সালার মনে করার চেষ্টা করতে করতে আটকাল। 'ব্যস, কিছু বিধান মনে আছে হয়তো।'

: 'যেমন?' ইমামা নিচু গলায় হৃদয়বিদারক নির্মমতায় তার চোখে চোখ রেখে বলল। সালার তার চোখ থেকে চোখ সরাতে পারল না। ইমামা অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গায় দাঁড় করিয়ে তাকে তার জীবনের জটিলতম প্রশ্নটি করছে। আর প্রশ্নের উত্তর তাদের মধ্যকার বিরাজমান নীরবতার মাঝেও ছেয়ে আছে। 'পুরোটা মনে আছে আমার। আর এখন এখানে দাঁড়িয়ে আরও বেশি মনে পড়ছে সেটি। আমি ভাবছি, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই খুতবাটি এখানেই দাঁড়িয়ে কেন দিয়েছিলেন! এই পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে, যেখানে হজরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে, হজরত হাওয়া আলাইহিস সালামের ৪০ বছর পর সাক্ষাৎ হয়েছিল। যেই জায়গাতে তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্ষমার চাদরে

জড়িয়ে নিয়েছিলেন।' ইমামা তখন খানিক ভাবুক ভঙ্গিতে বলে চলল।

: 'হয়তো এজন্যই যে, ওই দুই মানুষের মাধ্যমে মানবজগতের সূচনা হয়েছিল এখান থেকেই, আর দীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণাও এই ময়দানেই করা হয়েছে। আর এই ময়দানেই একদিন পৃথিবীর বিলুপ্তি ঘোষণা করা হবে।' সালার তার কথায় কথা টেনে বলল। ইমামা হাসতে লাগল।

: 'তুমি হাসছ কেন?' সালার অপ্রস্তুত হলো।

: তুমি তো বললে, খুতবার কয়েকটি বিধানও তোমার মনে নেই। তাহলে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ময়দানে দীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণা করেছেন, এটা কীভাবে মনে পড়ল এখন?

সালার কিছুটা নিরুত্তর হয়ে বলল, আমি তো বলেছিলাম, কিছু বিধান মনে আছে। সে বেশি কিছু বলার আগেই ইমামা পূর্বের ভাবুক ভঙ্গিতেই তাকে বলল, 'আমার মনে হয় সেই শেষ খুতবাটি পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। আমাদের সবার জন্য। আজকের আদম ও হাওয়ার জন্য। ওই খুতবার সবগুলো বিধান যদি আমরা মেনে চলতাম কিংবা মেনে চলি, তাহলে পৃথিবী এমন অশান্তি ও অধঃপতনের শিকার হতো না। সেটি যদি উম্মতের প্রতি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ অসিয়ত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা যে, উনার সুনত তো দূরের কথা, উনার অসিয়ত পর্যন্তও মনে নেই। আমল করা তো অনেক দূরের কথা!' ইমামা খানিক আবেগপ্রবণ হয়ে বলে চলল। সালারও বুঝতে পারছে এই আলোচনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। এই নারীটি সাড়ে নয় বছর আগেও তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে ফেলতে সক্ষম ছিল, আর এখনো সক্ষম।

: সুদের ব্যাপারে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবার বিধানগুলো মনে আছে তোমার?

এই প্রশ্নের তলোয়ারটি যেন সালারের গলায় এসে পড়ল। এই তলোয়ার থেকেই এতক্ষণ বাঁচার চেষ্টা করছিল সে। কোথায় দাঁড়িয়ে ইমামা তাকে কী জিজ্ঞেস করছে। এমন লজ্জাবোধ তো তার খানায়ে কাবার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার কাছেও হয়নি। যতটা লজ্জাবোধ এই মুহূর্তে জাবালে রহমতের এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে অনুভূত হচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদেরবিধান ঘোষণা করেছেন। ক্ষণিকের জন্য সালারের মনে হলো, জাবালে রহমতে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত পাথর তার প্রতি অভিশম্পাত করছে। ঘাম শুধু কপালেই নয়; পায়ের আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র তিনিই, যার চোখে তার প্রতি তলায়ও প্রকাশ পেতে লাগল। তার মনে হচ্ছে, সে এখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু তিরস্কার নয়, বরং পরিতাপ বিরাজ করছে। সালার ওখানে আর দাঁড়াতে পারল না। মাথা নত করে দ্রুত

পায়ে ইমামার অপেক্ষা না করেই নেমে চলে এলো। সে রহমতের যোগ্য নয়। তাহলে জাবালে রহমতে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! নিচে নেমে তার এটি অনুভূত হয়েছিল।

আর আজ ইমামা সেই একই প্রশ্ন হারাম শরিফে দাঁড়িয়ে করছে। সালার এবার তাকে জিজ্ঞেস করল না, তুমি আমার কাছে কী চাও? বরং তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে হারাম শরিফের প্রাপ্তি থেকে বের হতে হতে ইমামাকে বলল, 'আমি সুদও ছেড়ে দেব। তোমার জন্য ছাড়ব না। নবি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছাড়ব।'

দাও।' ইমামা তার ঘোষণা শুনে অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'তবে তাঁর জন্যই ছেড়ে

সালার নড়তে পারল না। এই নারীটি তার জীবনে কেন এসেছে, কিংবা আনা হয়েছে, সালার তা জানে না। সে অর্থনীতি ও হিসাব বিজ্ঞানের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জানে। কেবল এই একটি

প্রশ্নের উত্তর ব্যতীত, 'সালার! তুমি তো হাফেজে কুরআন। তা সত্ত্বেও কুরআন পাক ও আল্লাহ তাআলার এতটা অবাধ্য হচ্ছ!' হারাম শরিফ থেকে বের হতে হতে ইমামা তাকে বলল।

: তুমি জানো যে, আমি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং করছি। মানুষদেরকে আর...।

ইমামা তার কথা খামিয়ে দিল, 'তোমার কি মনে হয়, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে তুমি যা করছ, তাতে অণুপরিমাণ সুদও সম্পৃক্ত নেই?'

সালার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সময় নিয়ে বলল, 'ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুমি জানো। আচ্ছা আমি ছেড়েই দিলাম ব্যাংকিং। একেবারে ছেড়ে দিলাম। তাহলে কি প্রতিটি মুসলিম ব্যাংক ছেড়ে দিবে? তারপর কী হবে? আমি ছেড়ে দিলেই হারাম কি হালাল হয়ে যাবে?' সালার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাকে বলল। 'এখন আমরা হারামে সম্পৃক্ত

হলেও, এই সিস্টেমের ভেতর ঢুকে এটি বোঝার চেষ্টা করছি। একসময় আসবে, আমরা তখন সমসাময়িক ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলব। আর সেটি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।"

: 'আর এমন সময় কখনোই আসবে না।' ইমামা তার কথা রুখে দিল। 'অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় তো নয়ই।'

তুমি এমনটা কেন বলছ?

: সুদ যাদের রক্তে রিজিক হয়ে প্রবাহিত ভাববে না। হয়, তারা কখনোই সুদ ধ্বংস করার কথা

মুহূর্তের জন্য সালারের মনে হলো, ইমামা যেন তার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে। তিক্ত হলেও কথা সত্য। সালার চাইলে খুতু ফেলতে পারবে, কিন্তু তার তিক্ততা দূর করতে পারবে না।

: আমি কেবল এতটুকু চাই, সিস্টেম পরিবর্তন করতে না পারলে, নিজের যোগ্যতাকে একটি ভুল কাজ প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে ব্যয় করো না।

সে সেই ইমামার ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছে, যে ইমামা স্ত্রী হয়ে এখনো আগের মতোই খোদাভীতির কথা বলছে। এতে সালারের হয়তো অভিমান হচ্ছে কিংবা লজ্জা। যে অনুভূতি তাকে তার চোখের দিকে তাকাতে দিচ্ছে না। এই নারীটিকে অনুগত ও বাধ্যগত করার জন্য সে কী না করেছে! এখন এই নারীটিই একটু আগে হারামের চত্বরে তার প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের ঘোষণা দিয়েছে। নিঃশর্ত ও সার্বক্ষণিক ভালোবাসা ও সঙ্গতার ঘোষণা। সেই ঘোষণার পরও সে এখন শুদ্ধাশুদ্ধির আলোচনা নিয়ে বসে পড়েছে। তাই বলে তার ভালোবাসাকে মিথ্যা বলা যাবে না। কারণ, তার মধ্যে আনুগত্যও বিদ্যমান রয়েছে। এই কথাগুলো ইমামার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা।

ইমামার প্রতি তার পুনরায় ঈর্ষা হতে লাগল। তার জীবনে কি এমন কোনো সময় আসবে, যখন ইমামার সামনে সে কোনো দৈত্য নয়, বরং মহিরুহ হয়ে উঠবে। এবং মহিরুহ হয়েই থাকবে। তার চোখে দানব হবে না, ফেরেশতা হয়ে উঠবে, শয়তান হয়ে রবে না।

: 'আমি শেষ খুতবাটি পড়ছি।' অন্য কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলে ফেলল অন্য কিছু।

: 'আমার মুখে শুনবে?' ইমামা তার হাত ধরে হারাম শরিফ থেকে বের হতে হতে অত্যন্ত আগ্রহভরে বলল।

: 'তোমার মুখস্থ আছে?' সালার অবাক না হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'এতবার পড়েছি যে, মনে হচ্ছে মুখস্থ বলতে পারব।' বলতে বলতে ইমামা যেন কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে।

: 'শোনাও!' সালার তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

: এক 'আদম' মক্কার জমিনে দাঁড়িয়ে কয়েকশ বছর পর এই খুতবাটি এক 'হাওয়া'র মুখ থেকে শোনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।
যে খুতবা কয়েকশ বছর পূর্বে আখেরিহায়াত

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের পরিপূর্ণতা ঘোষণা করতে করতে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে দিয়েছিলেন। কেবল মুসলিমদের জন্য নয়।

৪৪

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করছি। তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তাঁর নিকটেই তাওবা করছি। তাঁর কাছে প্রবৃত্তির অকল্যাণ ও মন্দ আমল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়ত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট

করেন, তাকে কেউ হেদায়ত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

হে লোকসকল, আমি তোমাদেরকে খোদাভীতির উপদেশ দিচ্ছি। তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি। আর উত্তম কথার মাধ্যমে আমার খুতবা শুরু করছি।

হে জনমণ্ডলী শোনো, আমি তোমাদেরকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলছি। কেননা, হতে পারে আজকের পর তোমাদের সাথে কখনো এই জায়গায় মিলিত হতে পারব না।

ভালো করে শুনে নাও, তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত, তারা যেন এই কথাগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। হতে পারে এখানকার উপস্থিত লোকদের তুলনায় অনুপস্থিত

লোকেৱা এই কথাগুলো অধিক উত্তমভাবে মনে রাখবে এবং এগুলো হেফাজত কৰবে।

হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা সুদকে হাৰাম কৰেছেন। আর আমি আজ থেকে সমস্ত সুদকে রহিত ঘোষণা কৰছি। সৰ্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের প্রাপ্য সুদ রহিত ঘোষণা কৰছি। তবে তোমরা তোমাদের মূলধনের হকদার। যাতে তোমাদের কিংবা অন্য কৰও কোনো ক্ষতি নেই।

হে লোকসকল, আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আমার পর তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবির সুনত বা হাদিসসম্ভার। তোমরা বাড়াবাড়ি কৰা থেকে নিজেদের রক্ষা কৰো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেৱা এই কৰণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছোদেখো, আমি সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। যদি কৰও কাছে আমানত রাখা হয়, তাহলে

সে সেই আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ।
নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে
যেতে হবে এবং তাঁর কাছেই হিসাব দিতে হবে।

হে লোকেরা, নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো।
আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের হালাল করেছ এবং
তাদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছ। নারীদের ওপর তোমাদের
যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমনি
অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর দায়িত্ব হলো, তারা যেন এমন
কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক না করে, যাদেরকে তোমরা
অপছন্দ করো। আর তারা তোমাদের সম্মানের হেফাজত
করবে। তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের
প্রাপ্য অধিকার হলো, তোমরা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে
এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে।

হে মানবসকল, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ একে
অপরের কাছে আজকের দিন, আজকের মাস ও এই শহরের

মতোই পবিত্র। সাবধান! জাহেলি যুগের সকল প্রথা ও রীতি আজ আমি পদপিষ্ট করলাম। জাহেলি যুগের সকল রক্তের প্রতিশোধ ক্ষমা ঘোষণা করা করলাম। আর সর্বপ্রথম আমি আমার পক্ষ থেকে হারিস ইবনে রবিয়ার রক্ত ক্ষমা ঘোষণা করলাম। দেখো, আমার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে একে অপরের রক্ত ঝরাতে শুরু করো না।

হে লোকসকল, আমার পর নতুন কোনো নবি আসবে না। আর না তোমাদের পর নতুন কোনো উম্মত। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি তার ওপর আমল করো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর শয়তানের ব্যাপারে সাবধান! এই জমিনে তোমরা তার উপাসনা করবে, এ ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে এই ভেবে খুশি যে, তোমাদের মাঝে সে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে থাকবে। তাই তোমরা তোমাদের দীন ও ইমানের হেফাজত করবে।

জেনে রেখো, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। আর সমস্ত মুসলমান এক উম্মত। কারও জন্য জায়েজ নয় যে, সে তার ভাইয়ের থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু তার ভাই তাকে সন্তুষ্টচিত্তে দিলে ভিন্ন ব্যাপার। নিজের ও অন্যের ওপর জুলুম করো না। তোমরা সবাই আদম ও হওয়ার সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে বানানো হয়েছে। কোনো আরবের ওপর কোনো অনারবের এবং কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের; কোনো কৃষগাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষগাঙ্গের কোনো প্রাধান্য নেই। কেবল তাকওয়া ব্যতীত। নিজেদের দাসদের ব্যাপারে খেয়াল রেখো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তা খেতে দিবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তা পরতে দিবে। তারা ক্ষমার অযোগ্য কোনো অপরাধ করলে, তাদের বিক্রি করে দাও। কিন্তু কোনো শাস্তি দিয়ো না।

খুব ভালো করে শুনে নাও! নিজের রবের ইবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। রমজানের রোযা রাখবে।



সন্তুষ্টচিত্তে সম্পদের জাকাত আদায় করবে। নিজ শাসকের
আনুগত্য করবে, হোক সে একজন নাক-কাটা হাবশি। আর
এভাবেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।’

Whispers of Stories

তৃতীয় অধ্যায়



হাসেল ও মাহসুল

০১

আপনজনের মৃত্যু যে মানুষকে মুহূর্তেই নিঃশেষ করে দেয়, কেউ এটি ইমামাকে জিজ্ঞেস করুক। কেননা, ওয়াসিম ও সাদের মৃত্যু তাকে বুঝিয়ে দিল, মানুষকে মারে তো মৃত্যুই আর আপনজনের বিচ্ছেদ। এর মতো যন্ত্রণা আর অন্য কিছুতে নেই।

চাইলে আবে হায়াত পান করেও মানুষ নিজের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে। কিন্তু প্রাণের চেয়ে প্রিয়দের মৃত্যুতে যে যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তা কীভাবে ঠেকাবে!

ইমামা এখন নিউইয়র্কে। সন্তানসম্ভবা। খুশিতে সাত আসমানে উড়ছে সে। জান্নাত এখন তার পায়ের তলায় আসতে চলছে। আল্লাহ পাক তাকে এত এত নিয়ামত দিচ্ছেন যে, তা গণনা করা সম্ভব নয়। তন্মধ্যে একটি মাতৃত্বের নিয়ামত। এটি তার

মাতৃত্বের পথযাত্রার তৃতীয় মাস। আজ রাতে হঠাৎ সালার তাকে ডেকে তুলল। হুট করে সে বুঝতে পারল না, সালার তাকে এত রাতে কী বলতে চাচ্ছে। এমন অবস্থা হয়তো সালারেরও হচ্ছে। কেননা, সেও বুঝতে পারছে না, কীভাবে সে তাকে এই দুঃসংবাদটি দিবে! একটু আগে সালার, সিকান্দার উসমানের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছিল। এই অবস্থায় ইমামাকে সংবাদটি দেওয়া ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে।

সিকান্দার উসমান বলছিলেন, তাকে এখনই এসব জানানো ঠিক হবে না। কিন্তু সালার বলছিল, এত বড় একটি সংবাদ গোপন করে সারাটা জীবন ইমামাকে কোনো যন্ত্রণায় ফেলতে চাই না। তাছাড়া কলে ও মেসেজে ওয়াসিমের সঙ্গে ইমামার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাই দুয়েকদিন পর ইমামা এটি জানতে পারবে না, তা অসম্ভব!

ওয়াসিম ও সাদ, কাদিয়ানিদের উপাসনালয়ে এক সন্ত্রাসী হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছে। তাতে মোট দশ-বারো

জন নিহত হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে ইমামাও একটি পাকিস্তানি চ্যানেলে এই সংবাদ দেখেছে। এই প্রাণঘাতী ঘটনায় একজন মানুষ হিসেবে গভীর দুঃখবোধও প্রকাশ করেছে সে। কিন্তু তার কল্পনাতেও ছিল না, নিহতদের মাঝে তার এত কাছের দুজন মানুষও রয়েছে। সন্দেহই হবেও-বা কা করে, এটি তো ইসলামাবাদের কোনো উপাসনালয় নয়। এটি অন্য একটি শহরের উপসনালয়। সাদ ও ওয়াসিম সেখানে কীভাবে যাবে। তাছাড়া ওয়াসিম তো খুব কমই উপাসনালয়ে যায়।

সংবাদটি শুনে সে কয়েক ঘণ্টা নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে, অশ্রুপাতহীন মূর্তির মতো বিছানায় বসে রইল। এমনকি সালারের কোনো কথার উত্তরও করল না। এমন যেন সে কোনো মানুষ নয়, জমাট বরফখণ্ড হয়ে গেছে। উহু, বরফখণ্ড নয়, যেন বালির প্রাচীর, যা এখন ধসে পড়েছে। ইমামার মনে হচ্ছে, সে জীবনে আর আঙুলটিও নাড়াতে পারবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। নিশ্বাসের গমনাগমন হবে না। সে বাঁচতেই পারবে না। কেউ তো এভাবে চলে যায় না! এভাবে!

ইমামার অবস্থা দেখে এখন সালারের প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছে।
সিকান্দার উসমানের কথা না শুনে অনেক বড় ভুল করে
ফেলেছে, তা এখন বুঝতে পারছে সে।

মাঝরাতেই চেকআপ করতে সালার তার এক ডাক্তার
কাজিনকে ডেকে আনল। তারপর কী হয়েছিল, ইমামার তা
মনে নেই। ক্ষণে ক্ষণে সালারের চেহারা মনে ছিল। সালার
কয়েক সপ্তাহ তাকে উন্মাদনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পুনরায়
ফিরে আসতে দেখেছে। চুপ হলে টানা কয়েকদিন চুপ করে
থাকে সে। এমন যেন সে এই ঘরেই নেই। কান্না করলে ঘন্টার
পর ঘন্টা কান্না করে। ঘুমালে, পুরো রাতদিন চব্বিশ ঘন্টায়
চোখই খোলে না। আর জেগে থাকলে, দুই-তিন দিন পর্যন্ত
লাউঞ্জ থেকে রুম, রুম থেকে লাউঞ্জে পায়চারি করতে করতে
পা ফুলিয়ে ফেলো। এটি কেবল এক মুজেরজা যে, এমন
অবস্থায়ও তার ভেতর বেড়ে চলা জিবরিলের কোনো ক্ষতি
হয়নি। ইমামা যেন ভুলেই বসেছিল, তার ভেতর একটি জীবন

বেড়ে উঠছে। মনে থাকবেই-বা কী করে? মস্তিষ্ক শোকের স্মৃতি থেকে মুক্তি পেলেই না দেহের কথা ভাবনায় আসবে!

ভয় কিছুটা কমতেই সালারকে সে পাকিস্তান নিয়ে যেতে বলল, তার বাড়িতে যাবে সে। সালার তাকে জিজ্ঞেস করল না, কার বাড়িকে সে নিজের বাড়ি বলছে। চুপচাপ সে দুটি সিট বুক করে নিল।

: 'আমি ইসলামাবাদ যাব।' উত্তরে ইমামা বলল। সালার কোনো কথা বাড়াল না। তার বাড়ির লোকদের সাথে দেখা করলে যদি সে স্বাভাবিক হয়, তাহলে এই সাক্ষাতের জন্য সালার সবকিছু করতে পারে। হাশেম মুবিন তাদের প্রতিবেশী। তাদের বাড়িতে আগত ধ্বংসলীলার ব্যাপারে সালারের পরিবার অনবগত নয়। তারা হাশেম মুবিনের বাড়িতে গিয়ে অন্যান্য মানুষের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করে এসেছে। এই শোকের মাঝেও হাশেম মুবিন অত্যন্ত শীতলভাবে তাদের সমবেদনা গ্রহণ করেছেন। যেন তারা ওখানে না গেলেই বেশি খুশি হতেন তিনি। এই

মুহূর্তেও সিকান্দার উসমানের বিশ্বাস হলো না, হাশেম পরিবার ইমামার সঙ্গে দেখা করত সম্মত হবে। সালার ওই বাড়িতে গেলে তার ক্ষাত করতে পারে তারা, সিকান্দার উসমান তা অবশ্যই উল্লেখ করলেন। কিন্তু ইমামাকে এই অবস্থায় দেখে, সালারকে একটি চেষ্টা করে দেখতে বাধা দিতে পারলেন না।

হাশেম মুবিন কেবল ফোনেই সিকান্দার উসমানের সঙ্গে কথা বলতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন না; বরং সালারকে তাদের গেটও অতিক্রম করতে দিলেন না। সিকান্দার উসমান ও সালার দুজনেই হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে এলেন। সালার তাদের সামনে এখন নিরুপায়। কিন্তু এই প্রথম সালার ইমামার সামনে আত্মসমর্পণ করল না। তার জেদ মেনে নিয়ে একাকী তাকে তার বাড়িতে যেতে চেষ্টা করতেও দিল না।

: 'বাড়িতে যেতে চাইলে প্রথমে তোমার বাবার সাথে কথা বলো। তিনি অনুমতি দিলে আমি তোমার সাথে যাব। কিন্তু অনুমতি ছাড়া গেটের দারোয়ানের কাছে আমি তোমাকে

অপদস্থ হতে যেতে দিতে পারি না।" তার কান্নাকাটি আর অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সালার টলল না। অবশেষে ইমামা তার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে সক্ষম হলো। কিন্তু সেই ফোনকল তার সবকিছু বদলে দিল। যা সালার তাকে বোঝাতে পারেনি, হাশেম মুবিন তা তাকে ফোনে বুঝিয়ে দিলেন।

: 'এসবকিছু তোমার জন্য হয়েছে। যাদের সাথে গিয়ে সঙ্গ নিয়েছ তুমি, তারাই আমার দুই সন্তানের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আর এখন তুমি আমার বাড়িতে আসতে চাচ্ছ! খুনিদের সঙ্গে করে নিয়ে আমার ঘরে আসতে চাচ্ছে।' হাশেম মুবিন উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে, গালি দিতে দিতে বলতে থাকলেন।

'তোমরা' আর 'আমরা' এই দুটোর মাঝে কতটা পার্থক্য, ইমামা তা বুঝে গেল। আজও, ভাইয়ের মৃত্যুর শোক নিয়েও সেই ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার জন্য কোনো আফসোস হচ্ছে না ইমামার। তার মনে পড়ল, একবার তার বাবা বলেছিলেন, একদিন তুমি

অনুনয়-বিনয় করতে করতে আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইবো।
আর আজ সে এটিই করতে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন?

রক্তের সম্পর্ক আছে, যন্ত্রণা আছে, তাদের প্রতি আকর্ষিতও
সে। এখন যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে তার প্রাণহানির কোনো
আশঙ্কা নেই, তাহলে রক্তের সম্পর্কের টান কেবল ইমামার
মধ্যেই কেন? অস্থিরতা রয়েছে তো, তা কেবল তার মধ্যেই
কেন? তাদের মধ্যে নেই কেন? হয়তো এজন্যই যে, তারা
ব্যতীত ইমামার রক্ত সম্পর্কীয় কেউ নেই। পরিবারের অভাব
কেবল ইমামাই অনুভব করছে; হাশেম মুবিন নয়। কারণ, তিনি
তার পরিবার নিয়ে আছেন। আর তার সঙ্গে রয়েছে কেবল
সালার। কিন্তু সে রক্ত সম্পর্কীয় কেউ নয়; ভালোবাসার
সম্পর্কীয়। রক্তের সম্পর্কের ব্যাকুলতা বোঝার জন্য ইমামার
আরও কয়েক বছর প্রয়োজন। অনুভূতি ও চেতনাশূন্য হওয়ার
পরও এই প্রথম সে উপলব্ধি করছে, যে শোক তাকে নিউইয়র্ক
থেকে এখানে টেনে এনেছে, ওই বাড়িতে গেলে তা
আফসোসে পরিণত হতো।

ইমামা হাশেম মুবিনের আর একটি কথাও শুনল না। সাথে সাথে ফোন রেখে দিল। তারপর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওই বাড়িতে এবং এই পৃথিবীতে তার আর রক্ত সম্পর্কীয় কেউ রইল না। ওই বাড়িতে কেবল ওয়াসিমই ছিল তার আপন কেউ। এখন ওয়াসিম চলে গিয়েছে। পেছনের দিকের আলো-বাতাসের জন্য যোগ্য জানালাটি এখন ঝড়ের ঝাপটায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এই জানালাটি আর কখনো খুলবে না।



ইমামা সালারের সাথে পুনরায় নিউইয়র্কে চলে এলো। সালার বুঝতে পারল, সে স্বাভাবিক হচ্ছে, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। কিছুটা সময় লাগবে। ইমামাও এমনটাই মনে করছে। কিন্তু এমন হলো না। এখানে বিদ্যমান একাকিত্ব তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পুনরায় নিশ্চল করে দিতে লাগল। সালার এখন পিএইচডি করছে। পাশাপাশি একটি অর্গানাইজেশনে সপ্তাহে

তিন দিন পাঁচটাইম জব করে। ভোর পাঁচটায় বাসা থেকে বের হয়ে, রাত আটটা-নয়টায় ফিরে। ফিরে এসে এতটা ক্লান্তি বোধ করে যে, দুয়েক ঘন্টা টিভি দেখে খাবার খেয়ে পুনরায় শুয়ে পড়ে।

ইমামা অষ্টম তলার এই অ্যাপার্টমেন্টের একটি বেডরুমে, ১২-১৪ ঘন্টা একদম একা থাকে। একাকিত্বের এই ধারাবাহিকতা সালার বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আরও বেড়ে যায়। একটি বেডরুম, একটি লাউঞ্জ এবং কিচেন এরিয়া ছাড়া সেখানে আর এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে সে কিছু সময় কাটাতে পারে। বাসার কাজও অনেক কম। কেননা, তা অনেক ছোট। তার ঘুম আসে না, বাসায়ও কোনো কাজ নেই, কেবল চিন্তাভাবনা আর দুশ্চিন্তা করা ছাড়া।

ওয়াসিম তার মাথা থেকে বের হয়ই না। সে প্রতিদিন তাদের পুরোনো মেসেজগুলো পড়ে পড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। তার সাথে হওয়া শত শত মেসেজ এখন যেন ইমামার

মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু না জানি আত্মপীড়ার এটি কোন পর্যায়, যেখানে বসে সে প্রতিদিন অশ্রুসিক্ত চোখে একই কাজ করে যায়। ইমামা হাশেম যেন এই সময়টিতে নিজের অস্তিত্বের নিষ্ক্রিয়তা ও জীবনের অর্থহীনতা উপলব্ধি করছে। ইতিপূর্বে কখনো করেনি। তার নিজের সত্তা এখন নিজের কাছেই প্রচণ্ড বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বোঝা সে কোথায় ছুড়ে আসবে, তা বুঝতে পারছে না। সকালে চোখ খুলতেই তার মাথায় এই ভাবনাই খেলা করে। আরও একটি দিন; তারপর একই রুটিন। পুনরায় একই একাকিত্ব। একই দুশ্চিন্তা। সে ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনে যেতে লাগল। আর সালার পুনরায় নিজেই নিজেকে অসহায় উপলব্ধি করতে লাগল। ইমামার স্বাভাবিকতার জন্য সে কী করবে, বুঝতে পারছে না। চৌদ্দ ঘন্টা চাকরি ও জার্নির ক্লান্তি শেষে বাসায় ফিরেও ইমামা কোথাও যেতে বললে, সাথে সাথে সে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়। দূরে কোথাও না গেলেও অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের পার্ক পর্যন্ত হলেও যায়। কিন্তু ইমামা এখন তাকে কোথাও নিয়ে যেতেও বলে না।

সালার প্রতিদিন সকালে তাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বের হয়। আর রাতে যখন ফেরার জন্য ট্রেনে চড়ে বসে, তখনো তাকে নিয়েই ভাবতে থাকে। ইমামার মানসিক অবস্থা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যেন ক্রমশ পঙ্গু করে দিচ্ছে। জিবরিলের ভূমিষ্ঠের এখনো অনেক দিন বাকি। আর সালার এদিকে ইমামাকে তার মানসিক টানাপোড়েন থেকে বের করে আনতে চাচ্ছে। অবশেষে তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার আগেই ইমামা একদিন তাকে বলল, 'আমি পাকিস্তান যেতে চাই।'

: 'কেন?' প্রশ্নটি সালারের নিজের কাছেই অনর্থক মনে হলো। ইমামা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। যেন উত্তর খুঁজতে লাগল। তারপর সে যা বলল, তা যেন সালারকে হতভম্ব করে দিল।

: 'গতকাল আমি ওয়াসিমকে দেখেছি। ওখানে কিচেন কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে সে পানি পান করছে। দুদিন আগেও আমি তাকে দেখেছি। সে তখন ওই জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল।' কথা বলতে বলতে ইমামার গলা ধরে এলো।

তারপর হয়তো অশ্রু সংবরণ করতে খানিক বিরতি নিল।
বিরতির পর ইমামা পুনরায় বলতে লাগল, 'আমার মনে হচ্ছে
আর কিছুদিন এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। কিংবা
হতে শুরু করেছি। কিন্তু আমি তা চাই না।' সে যদি ভ্রমের
শিকার হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেও এ বিষয়ে অবগত। আর
তাই সে তা থেকে পালাতে চাচ্ছে। এত কিছু মধ্যও

এটি যেন তার একটি শুভ লক্ষণ।

: 'ঠিক আছে, আমরা চলে যাব। সবকিছু গোছানোর জন্য
আমাকে কেবল দুই সপ্তাহ দাও।' সালার যেন মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত
নিয়ে নিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে

ইমামা অসম্মতিতে মাথা দোলাল।

: তুমি পিএইচডি করছ, তুমি কীভাবে যাবে?

: 'পিএইচডি আমি বাদ দিয়ে দেব। ডক্টরেট ডিগ্রি আবশ্যিক নয়।
তুমি ও তোমার জীবন আবশ্যিক।' প্রত্যুত্তরে সালার বলল। কিছু
বলতে চেষ্টা করেও ধরা গলায় ইমামা কিছু বলতে পারল না।
সে পুনরায় বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কান্না করে উঠল।

: না, তুমি সাথে যাবে না। এটা তো জরুরি নয় যে, সারা জীবন
তুমি ত্যাগ করেই যাবে; আমার জন্য কুরবানি দিয়েই যাবে।
এখন পিএইচডি ছেড়ে দিবে, নিজের ক্যারিয়ার ছেড়ে দিবে,
এটা তোমার জীবন। তোমার সময় অনেক মূল্যবান। তুমি কেন
আমার জন্য তোমার জীবনের মূল্যবান বছর নষ্ট করবে?

উত্তরে সালার কিছু বলার চেষ্টা করল। এই পরিস্থিতি ছাড়া অন্য
কোনো সময় হলে ইমামার এই স্বীকারোক্তিতে সালার অনেক
খুশি হতো। কিন্তু ইমামার কান্না ভেজা কথাগুলো শুনে এখন
তার কষ্ট অনুভূত হচ্ছে। ইমামা আবার বলতে শুরু করল,

'আমি অনেক লজ্জিত, কিন্তু নিরুপায়। চেষ্টা করেও নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারছি না। আর এখন, ওয়াসিমকে দেখার পর তো আমি আরও, আরও...' সে বলতে বলতে থেমে গেল। কেবল তার হেঁচকি আর অশ্রু থামল না। 'সালার, তুমি অনেক ভালো মানুষ। অনেক ভালো তুমি। অনেক যোগ্য। তুমি আমার চেয়ে ভালো কারও যোগ্য। আমি নই। I am a worthless women. I am a nobody. আমি এক নগণ্য নারী। কিছু না আমি। তুমি এমন নারীর উপযুক্ত, যে তোমার মতো। যে তোমাকে জীবনে এগিয়ে যেতে সঙ্গ দিবে, আমার মতো তোমার পায়ের শেকল হয়ে বাধা দিবে না।'

: এসব তুমি এখন বলছ, অথচ আমরা আমাদের প্রথম সন্তানের জন্য অপেক্ষা করছি।

: 'আমার মনে হয় এই সন্তানও মারা যাবে।' ইমামা অদ্ভুত কথা বলল। সালার তার হাত ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু সে হাত ছাড়িয়ে নিল।

: 'তুমি এমন কেন ভাবছ? তার কিছুই হবে না।' জানা নেই সালার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে, নাকি নিজেকে! কিন্তু এই মুহূর্তে ইমামার চেয়ে তার অবস্থাও অনেক করুণ হয়ে পড়ছে।

: 'তুমি শুধু আমাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দাও।' ইমামা তার প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলল না। আবারও সে একই আবেদন করল।

: 'আমি তোমাকে ইসলামাবাদ পাঠাব না।' সালার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল।

: আমি সেখানে যেতেও চাই না। আমি সায়েদা আম্মার কাছে যাব। সেখানেই আমি থেকে নেব।

তার কথায় সালার প্রচণ্ড অবাক হলো।

: 'সায়েদা আম্মা নয়, তুমি ডাক্তার সাহেবের ওখানে যাও। সেখানে যেতে চাইলে, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করছি।' সালার কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বলল। ঠিক আছে, আমাকে উনার কাছেই পাঠিয়ে দাও।' এক মুহূর্ত দেরি না করেই সে বলল।

: তুমি যদি ওখানে গিয়ে খুশি থাকো, তাহলে ঠিক আছে। আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফিরবে কবে?

সমস্ত কথোপকথনে এই প্রথম ইমামা তার চোখে চোখ রাখল। এই হৃদয় কেবল লাঞ্চার নাম। সম্মান এমনভাবে ছিনিয়ে নেয়, যেন সম্মান কোনো জিনিসই নয়। এ হৃদয় লাঞ্ছনাকে এতটা সাধারণ করে দেয় যে, মানুষ তার চোখের জল আটকে রাখে। জমাট কান্না গিলে ফেলে। সালার সমস্ত জগৎকে পায়ের তলায় রাখতে সক্ষম, এমন পুরুষ। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে দমিয়ে রাখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তার গলায় ভালোবাসার

রশি পড়ালেন। এটি রশি, শেকল নয়। কিন্তু বেড়ির চেয়েও
অধিক ভারী কড়া!

ইমামার মনে হচ্ছে, সে সালারের চোখে চোখ রাখার যোগ্যও
নয় এখন। আর চোখ রেখেই-বা কী করবে! বলার মতো কোনো
শব্দই খুঁজে পাচ্ছে না সে। অভিযোগ যা আছে, তা নিজের
প্রতি। সকল খুঁত নিজের ভেতর। সালারকে যেন সে এই
দুর্ভাগ্যের কবল থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছে, যে কবলে সে
নিজেই বছরের পর বছর ধরে বন্দি হয়ে আছে। হয়তো
আজীবন বন্দি থাকাটাই তার ভাগ্যে রয়েছে। সালারের নিঃস্বার্থ
ও অমূল্য ভালোবাসার এতটুকু প্রতিদান তো সে দিতে পারে
যে, তার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে সালারকে না টেনে, তাকে খানিক
স্বস্তি দিবে। তাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিবে।

: 'চলে এসো।' তার দীর্ঘ নীরবতাকে সালার সংক্ষিপ্ত ভাষা দিল।
এটি পরামর্শ নয়, মিনতি। আকাঙ্ক্ষা নয়, অসহায়ত্ব, যা শেষই

হচ্ছে না। ইমামা তার কথা নীরবে শুনে, নীরবতার ভাষায়ই উত্তর দিল। মুখ ফুটে কিছুই বলল না।

এক সপ্তাহ পর ইমামা পাকিস্তানে ফিরে এলো। যেন কোনো জেলখানা থেকে মুক্তি পেল। আমেরিকা থেকে আসার আগে, ওখানে থাকা তার সমস্ত জিনিস সে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এমন যেন ঘষে ঘষে সালারের ঘর ও জীবন থেকে ইমামা তার অস্তিত্ব ও স্মৃতির সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে চেয়েছে। সালারের জীবনকে যেন সে ওই সমস্ত অকল্যাণ থেকে পবিত্র করতে চায়, যা তার সাথে সালারের ঘর ও জীবনে প্রবেশ করেছে। ইমামা এখানে না ফেরার উদ্দেশ্যে এসেছে। এটি সালার আসার আগে তার প্রতিটি আচরণে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে তবু তাকে আসতে দিয়েছে। যদি দূরত্ব তাকে সুস্থ করে তোলে, তাহলে সে এই দূরত্বই কামনা করে। তবু যেন সে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আসার দিন তার ফ্লাইট ছিল সন্ধ্যায়। ইমামা তখন আবারও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তার মনে হতে থাকে, বহু কষ্টে গড়া তার সংসারটি এবার ভেঙে যেতে চলেছে।

নিয়ে এলো। ইমামা তার হ্যান্ডক্যারি টানতে টানতে সালারের পেছন পেছন এলো। : 'যেয়ো না।' টেক্সি আসতেই সালার ইমামার ব্যাগ উঠিয়ে বেডরুম থেকে লাউঞ্জে তারপর সেটিও সে সালারের হাতে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। ঠিক তখনই সালার তার হাত ধরে ফেলল, কিন্তু হাত ধরে টানল না। বরং হাতের উপর হাত রেখে, অনেকক্ষণ সে এভাবেই ধরে থাকল। তারপর প্রচণ্ড বিষন্ন মনে তার হাত ছেড়ে দিল।

সেদিনের সেই স্পর্শও ইমামার সঙ্গে এসেছে। আমেরিকার জেলখানা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও এই স্পর্শ তাকে আস্থর করে রাখছে। বহু বছর পর সে পুনরায় ডাক্তার সিবতে আলির বাসায় আশ্রয় নিতে এসেছে। আর এবারও সে আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব ও উনার স্ত্রী তার মানসিক অবস্থা

সম্পর্কে জানেন। এখানে কয়েক দিন থেকে ইমামার মনে হলো, সে যেন একাকিত্বের এক বন্দি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু পরিবর্তিত এই অবস্থাও সাময়িক হলো। যে প্রশান্তি সে খুঁজে চলছে, তা এখানেও নেই। অস্বস্তি ও অস্থিরতা এখানেও ওরকমই আছে। ডাক্তার সিবতে আলি, উনার স্ত্রী আর সায়েদা আম্মার ভালোবাসাও তার ক্ষতের উপশম হয়ে উঠছে না। সালার প্রতিদিন তাকে কল করে। কখনো সে কল রিসিভ করে, কখনো আবার না। কখনো সে তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে, কখনো আবার সংক্ষিপ্ততায় ফোন রেখে দেয়।

জানা নেই কতদিন এখানে এভাবে কেটে গেল। নিদ্রায়, অনিদ্রায় কিংবা কখনো ঘর ছেড়ে উদ্দেশ্যহীন বেরিয়ে পড়ে। ড্রাইভারকে নিয়ে সমস্ত শহর ঘুরে বেড়ায়। চলন্ত গাড়ি থেকে দৃশ্যমান দৃশ্য তার মস্তিষ্কে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার ভাবনাকে তার জীবন থেকে অন্যের জীবনের দিকে নিয়ে

চলে। এমনিভাবে আজও সে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে; সাথে ড্রাইভার। নদীর পাশঘেঁষে পথ চলতে চলতে তারা শহর ছাড়িয়ে উপশহরে এসে পড়েছে। একপাশে গাড়ি থামিয়ে সে নিচে নেমে এলো। নদীর সবুজ প্রান্ত ছুঁয়ে, নদীতে বহমান আবর্জনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল। যেন সেও আবর্জনার মতোই অনর্থক একটি জিনিস। সেও ভেসে চলছে সামনের দিকে। জানা নেই কতক্ষণ ধরে সে এভাবে হাঁটছে। তারপর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বহমান পানির দিকে তাকিয়ে রইল। ঘন গাছগাছালির শীতল ছায়ায়, শীতের ঋতুতে নদীতে বহমান পানি বর্ষার পানির মতো অতটা শ্রোতঃস্থিনী নয়। আর পানিও অতটা প্রবল নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এই নদী তাকে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। যেন সে তাকে তার মাঝে নেমে পড়তে বলছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সোয়েটার ও শাল ভেদ করে, দেহকে অসাড় করে দেওয়া শীতের প্রচণ্ডতাও ভুলে গেল সে। নদীর দু-পাশে লাগানো সুদীর্ঘ উঁচু গাছগুলো বাতাসে দুলতেই পাতার ফাঁক

গলে সূর্যের কিরণ নদীতে এসে পড়ছে; পলকের জন্য আলোকিত করে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার পানিতে নেমে যেতে ইচ্ছা করল। দেখতে চাইল, সেখানে নিচে কী আছে। পা ফেলার আগেই কোনো এক মহিলার ডাকে থমকে গেল।

: 'এই দড়িটা একটু শক্ত কইরা বাঁইধা দেও, মা।' সত্তর-আশি বছরের জীর্ণশীর্ণ শ্যামবর্ণের এক মহিলা তাকে ডেকে উঠলেন। তাকে বরং বুড়িমা বলাই মানানসই। চেহারায় লেগে আছে বয়সের ভাঁজ। বুড়িমা গাছের শুকনো লাকড়ি কুড়িয়ে সেগুলো এখন চাদরের মতো একটি কাপড়ে বাঁধার চেষ্টা করছেন। দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাদের দুজনকে ছাড়া ওখানে আর কাউকে চোখে পড়ছে না। তাছাড়া উনি কখন কীভাবে এখানে এলেন, ইমামা তা টেরও পায়নি। চুপচাপ সে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুড়িমার দিকে এগিয়ে চলল।

এত বড় বোঝা দেখে ইমামার বিশ্বাস হলো না যে, বুড়িমা কখনো এটি মাথায় নিতে পারবেন। কিন্তু তিনি ইমামার সাহায্যে খুব সহজভাবেই বোঝাটি মাথায় তুলে নিলেন।

: 'ছাগলের দড়িটা আমাকে একটু ধরিয়ে দাও।' বুড়িমা এখন দূরে গাছের ছায়ায় ঘাস খেয়ে চলা এক ছাগলের দিকে ইশারা করে তাকে বললেন। ইমামা খানিক দ্বিধাশ্রিত হলো। কিন্তু খানিক কষ্টেসৃষ্টে অবশেষে ছাগলের দড়িটা ধরেই ফেলল।

: 'আপনি চলুন, আপনার সাথেই আসছি আমি। কোথায় যাবেন আপনি?' ইমামার মনে হলো এত বড় লাকড়ির গাটি নিয়ে ছাগল কীভাবে সামলাবেন!

: 'এই তো একটু সামনেই যাব। রাস্তা পার করে ওইপাশে।' বুড়িমা শস্যখেত পেরিয়ে রাস্তার দিকে যেতে যেতে হাতের ইশারায় তাকে বোঝালেন। ইমামা ছাগলের দড়ি টেনে টেনে চুপচাপ উনার পেছন পেছন চলতে লাগল। বুড়িমার পা খালি।

গোড়ালিগুলো রুম্ব হয়ে উঠেছে। ফেটে গিয়েছে এখানে-
ওখানে। ইমামা পশমি মোজা আর আরামদায়ক কোট পরেও,
খালি পায়ের বুড়িমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।
উনার হাঁটার গতি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি যেন উঁচুনিচু
আলপথে নয়; বরং কোনো টাইলসের ফ্লোরে কিংবা মখমলের
বিছানায় হেঁটে চলছেন।

রাস্তা পার করতেই দশ-বিশটি বুপড়িঘর দেখতে পেল ইমামা।
যেগুলোকে বুড়িমা তার ঘর বলে ইশারা করেছিলেন। সেগুলো
শুধু বুপড়িই নয়, মানুষগুলো বুপড়ির চারপাশে নলখাগড়ার
দেওয়াল দাঁড় করিয়ে আঙিনার মতো করে নিয়েছে।
মেজেগুলো কাদামাটি দিয়ে লেপা। ইমামা খানিক দ্বিধাশ্রিত
হয়ে এমনই একটি বুপড়ির আঙিনায় ছাগলের রশি হাতে
প্রবেশ করল।

বুড়িমা আঙিনার এক কোণে মাথার গাড়িটি এনে ছুড়ে
ফেললেন। তারপর কোমরে ইমামার হাত থেকে ছুটে
নলখাগড়ার বেড়ার পাশে, যেখানে বাঁধা হয় সেখানে চলে দুই

হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করলেন।
ছাগলটি ততক্ষণে গেল। সেখানে মাটিতে কিছু শুকনো ঘাস
পড়ে আছে, ছাগলটি এখন সেগুলোতে মুদ দিচ্ছে।

আঙিনার অপর পাশে মাটির একটি চুলায় একটি পাতিল চড়ানো
রয়েছে। তা থেকে ছড়ানো ঘ্রাণ চারপাশে ছাড়িয়ে পড়ছে।
আঙিনাটি দুপুরের রোদে ঝলমলে ও তপ্ত হয়ে আছে।
নদীপাড়ের মতো ঠান্ডা এখানে নেই। কিন্তু একটি স্নিগ্ধ উষ্ণতা
বিরাজ করছে। তারা যেন কোনো তপ্ত-উষ্ণ কোলে এসে
পড়েছে।

বুড়িমা ততক্ষণে লাকড়ির গাটি খুলে, সেখান থেকে কিছু
লাকড়ি বের করে নিয়ে চুলার কাছে চলে এলেন।

: 'আরে! তুই দাঁড়িয়ে আছিস ক্যান এখনো? বসে একটু জিরা
তো। আমার জন্য কতটা হাঁটতে হলো তোকে। আমি বলেও
ছিলাম, আমিই নিয়ে যাচ্ছি ছাগল। এটা তো আমার রোজকার

কাজ। জন্মের পর থেকেই করে আসছি খাটাখাটুনি। তুই তো শহরের মেয়ে। খাটুনি তো তুই করতে পারিস না।" বুড়িমা বলতে বলতে চুলা থেকে খানিকটা দূরে রাখা একটি পিঁড়ি তার দিকে ঠেলে দিলেন।

: 'আমিও খাটুনিই করে আসছি বুড়িমা! এই কষ্ট তো কিছুই না।' বলতে বলতে ইমামাও সামনে এগিয়ে এলো। তার মনে হলো, বুড়িমা হয়তো দূর থেকে তার কথা শুনতে পাননি। অথচ বুড়িমা হাসতে লাগলেন।

: 'কিন্তু আমার কাছে এটা কষ্ট মনে হয় না, তোর কাছে মনে হয়; এটাই পার্থক্য। তাছাড়া তোর কোনো দোষ নাই, সবটাই যৌবনের তফাত। যৌবনে সবকিছুই কষ্ট মনে হয়। বৃদ্ধাবস্থা তো নিজেই এমন এক কষ্ট, যার কাছে সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ।' বুড়িমা তার দিকে না ফিরেই বললেন। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এই বেশভূষা ও এমন জায়গায় বসবাসরত যাযাবর বুড়িমার মুখে এমন কথার প্রত্যাশা করেনি।

: 'আপনি পড়াশোনা করেছেন?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: 'অনেক!' বুড়িমা এখনো চুলার দিকেই মনোযোগী হয়ে আছেন। এবারও তিনি হেসেই উত্তর করলেন। কিন্তু ভঙ্গিতে নিজের প্রতি উপহাসের সুর। ইমামা পরবর্তী কোনো প্রশ্ন করল না। সে এখন বুড়িমার সামনের পাতিল ও চুলার দিকে মনোযোগী হলো। ইট দিয়ে বানানো মাটির চুলায় ক্ষয়ে যাওয়া পুরোনো পাতিলে শাক সিদ্ধ হচ্ছে। বুড়িমা এখন নদীপাড় থেকে কুড়ানো লাকড়ি টুকরো টুকরো করে চুলায় ছুড়তে লাগলেন। তিনি আগুনকে এভাবেই জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। ইমামা মাটি দিয়ে লেপা চুলার পাশের তপ্ত মেঝেতে এসে বসে পড়ল। পা থেকে জুতা ও মোজা খুলে, তার ঠান্ডা ও ফোলা পাগুলো গরম মেঝেতে ছুঁয়ে যেন উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করল।

বুড়িমা এই বয়সেও পায়ের আঙুলে ভর করে বসে খড়িগুলো ভেঙেচুরে চুলায় ছুড়ে দিচ্ছেন। আগুন থেকে ঘড়িগুলোর চটচট-ফটফট শব্দ আসতে শুরু করেছে। পাশে বসে ইমামা শাকের পাতিল থেকে উঠন্ত ভাপ ও গরম পানির উথলানো দৃশ্য দেখতে থাকল।

: 'তোমার জামাই কী করে?' ইমামা বুড়িমার এই হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠল। তারপর বিড়বিড় করল।

: 'কী করে?' ইমামা যেন মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'কাজ করে।'

: 'কী কাজ করে?' বুড়িমা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন।

: 'বাইরে কাজ করে।' ইমামা শাকের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল।

: 'বৈদেশে থাকে?' বুড়িমা প্রত্যুত্তরে বলল। এদিকে ইমামাও এখন উনার মতো। মাটিতে বসে পড়েছে।

: 'হ্যাঁ, বৈদেশে।' ইমামা ওভাবেই শাকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল।

: তাইলে তুই এখানে কার কাছে থাকোস? শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে?

: না।

: তাইলে?

: 'আমি কারও কাছেই থাকি না।' শাকের দিকে তাকিয়ে সে অসংলগ্ন উত্তর করল।

: জামাই কি ঘর থেকে বের করে দিছে?

ইমামা চমকে বুড়িমার দিকে তাকাল।

: না।

: তাহলে কি তুই ঝগড়া করে আসছিস?

: 'না' সে অবচেতন মনে মাথা নাড়াল।

: তাহলে এখানে কেন আসছিস?

: 'শান্তির জন্য।' ইমামা আনমনেই বলে উঠল।

: 'শান্তি কোথাও নেই।' সে বুড়িমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'সুতরাং যে জিনিস দুনিয়াতে নাইই, তা দুনিয়াতে কী আর খুঁজবি?'

ইমামা হতভম্ব হয়ে বুড়িমার দিকে তাকাল। এটি অনেক গভীর কথা। আর বুড়িমার মুখে শুনে আরও গভীর অনুভূত হলো।

: 'অশান্তিতে যদি থাকতেই হয়, তাহলে মানুষ দুনিয়াতে থাকে কেন?' ইনাম। উনাকে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছিল না, তবু করে ফেলল।

: 'তাহলে কোথায় থাকবে?' চুলায় লাকড়ি ছড়তে ছুড়তে এক মুহূর্তের জন্য থেমে বুড়িমা তাকে সোজা প্রশ্ন করলেন। ইমামা খানিক নিরুত্তর হয়ে পুনরায় শাকের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমার জামাই কি তোকে ফিরে যেতে বলে না?'

: 'আগে বলত, এখন আর বলে না।' ইমামা নিজেও এখন লাকড়ি টুকরো করে করে চুলায় ছুড়তে শুরু করেছে।

: বেচারী একা একা ওখানে।

ইমামা এক মুহূর্তের জন্য থমকাল। তারপর মৃদুস্বরে উত্তর করল, 'হ্যাঁ।'

বুড়িমা এখন প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে আটা বের করে থালায় রাখছেন।

: 'তাহলে একাই ফেলে রেখে আসছিস তাকে?' রোদে রাখা একটি মাটির ঘড়া থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বুড়িমা যেন আফসোস প্রকাশ করলেন। ইমামা চুলায় উদ্দেশ্যহীন খড়ি ছুড়তে থাকল।

: তোরে কি মহব্বত করত না?

ইমামা মুহূর্তের জন্য ঝুঙ্ক হয়ে গেল।

: 'করত।' তার গলা অত্যন্ত শীতল।

: 'যত্ন করত না?' শাক থেকে উঠন্তু ভাপ তার চোখে এসে লাগতে থাকল। বহু সময় পর তার হঠাৎ কী কী মনে পড়তে লাগল, জানা নেই।

: 'করত।' গলা আরও শীতল হয়ে গেল। বুড়িমা এখন তার পাশে বসে সেই থালায় আটা গুলতে শুরু করেছেন।

: ভাত-কাপড় দিত না?

ইমামা চাদরের কোণে চোখ ঘষল। 'দিত।' তার গলা আরও মৃদু হয়ে এলো। বহু কষ্টে নিজেই নিজের আওয়াজ শুনল।

: 'তবু তুই তাকে ছেড়ে দিয়েছিস? তুইও আল্লাহর সাথে বান্দার মতোই আচরণ করেছিস। সবকিছু পেয়েও তার থেকে দূর হয়ে গিয়েছিস।' বুড়িমা আটা মাখতে মাখতে যেন হেসে বললেন। ইমামা কিছু বলতে পারল না। বলার মতো কিছু নেইই। অপলক চোখে সে কেবল বুড়িমার দিকে তাকিয়ে রইল।

: তোর কি এই ভয়ও হয়নি যে, অন্য কোনো বিবি নিয়ে আসবে সে?

: না।

এবার আটা মাখতে মাখতে বুড়িমা তার মুখ দেখতে লাগলেন।
'তার জন্য তোর মহব্বত নাই?'

কী প্রশ্নে এসে পৌঁছাল! ইমামা চোখ লুকিয়ে ফেলল। তার নীরবতা যেন বুড়িমার মনে আরও একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল।

: কখনো মহব্বত করেছিস?

প্রশ্ন শুনে ইমামার চোখে বর্ষণ নেমে এলো। কত কীই-না মনে পড়ল!

: 'করেছিলাম।' ইমামা অশ্রু বইতে দিল।

: 'তারপর কী হয়েছিল?' বুড়িমা তার অশ্রু উপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

: 'পাইনি।' মাথা নিচু করে আরও কিছু লাকড়ি চুলায় ছুড়ল ইমামা।

: পাসনি, নাকি সে ছেড়ে দিয়েছে?

প্রশ্নটি শুনে ইমামার মনে হচ্ছে, তার মুখে যেন কেউ কাঁচা লক্ষা পুরে দিয়েছে।

: 'সে ছেড়ে দিয়েছে।' জানা নেই হাঁড়িতে শাক বেশি পানি প্রবাহিত করছে, নাকি তার চোখ। কিন্তু আগুন দুই জায়গাতেই জ্বলছে। মনে ও চুলায়, দুইখানে।

: 'হয়তো মহব্বত করত না।' বুড়িমা সহসাই বলে উঠলেন।

: 'মহব্বত করত, কিন্তু অপেক্ষা করতে পারেনি।' জানা নেই কেন সে জালালের পক্ষ নিয়ে উত্তর করল।

: 'যে মহব্বত করে, সে অপেক্ষাও করে।' প্রত্যুত্তর সঙ্গে সঙ্গে এলো। বুড়িমা তার সমস্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তি ভেঙে চুরমার করে দিলেন। সে কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল। কিংবা হাসতে হাসতে কাঁদল। এই মহিলাটি তাকে কি শিখিয়ে দিল! যা তার মন ও মস্তিষ্ক কখনো এটি বুঝতেই পারেনি!

: 'এই মানুষটির কারণে তোর ঘর ছেড়ে এসেছিস?' বুড়িমা পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

: 'না, ওখানে কেবল অশান্তি লাগছিল, তাই চলে এসেছি।' সিন্ত চেহারায় বলল ইমামা।

: কীসের অশান্তি?

ইমামা বর্ষণরত চোখে বলে চলল। বুড়িমা চুপচাপ আটা গুলতে থাকলেন। ইমামা কথা শেষ করার পরও তিনি কিছু বললেন না। নীরবতার সময় দীর্ঘ হলো। অসম্ভব দীর্ঘ। বুড়িমা আটা গুলার পাশাপাশি এখন খুন্তি চালাতে লাগলেন। ইমামা দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে শাকের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'ওখানে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলি কেন?' বুড়িমা হুট করেই শাক নাড়াতে নাড়াতে জিজ্ঞেস করলেন। ইমামা চোখ তুলে বুড়িমার দিকে তাকাল।

: 'অনেক স্বার্থপর আমি বুড়িমা! মরার জন্য দাড়াইনি।' সিন্ত চোখে ইমামা যেন খিলখিল করে হাসতে হাসতে বুড়িমাকে বলল। সে এখন বুঝতে পারছে, বুড়িমা তাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছেন। তার হাসি দেখে বুড়িমাও যেন হাসলেন। এতে তার ভাঙাচোরা ময়লা দাঁতগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

: তার মানে তুই তো অনেক সাহসী! আমি তো তোকে ভীতু, স্বার্থপর মনে করেছিলাম। তাহলে তো তুই আমার চেয়ে বেশি সাহসী!

: না, আপনার চেয়ে বেশি সাহসী তো নই। আমি তো অত্যন্ত দুর্বল। এই ছাগলের চেয়েও বেশি দুর্বল।

: 'তোর মনে কি তোর আগত সন্তানের দিকে কোনো খেয়াল নেই? তার ওপর কি তার কোনো মহব্বত জাগে না?' ইমামার চোখ পুনরায় বর্ষণ করতে লাগল। 'তোর মতো কি এভাবে কেউ ঘর-স্বামী ছাইড়া আসে? কত প্রাণের প্রিয় মানুষ মরে যায়, তাই বলে কি একজনের জন্য বাকি সবাইকে ছাইড়া দিতে হয়?'

প্রবাহিত চোখে ইমামা উনার কথা শুনতে থাকল। বুড়িমা সে সবই বলছিলেন, যেগুলো তাকে কেউ প্রশ্ন করলে সেও বলত। কিন্তু সে কারও কাছে বুড়িমার মতো করে মনের কথা খুলে

বলেনি। যে বুড়িমার সাথে তার কোনো পরিচয় পর্যন্ত নেই।
কখনো কখনো মানুষ হৃদয়ের যে ভার আপন মানুষের কাছে
হালকা করতে পারে না, তা পরের কাছে অনায়াসে করে
ফেলে। সেখানেই প্রকাশ করে, যেখানে তার বিশ্বাস হয় যে,
এই মানুষটি আমার গোপন কথা গোপনই রাখবে। কখনো পর্দা
ভেদ করে সামনে আনবে না।

: 'আমি এখন আর কাউকে মহব্বত করতে চাই না, বুড়িমা!'
বুড়িমা পুনরায় শাকের ঢাকনা খুলে তাতে খুন্তি ঢালালেন।
'আমার কেন যেন মনে হয়, যাকেই আমি মহব্বত করি, সে-ই
আমার থেকে হারিয়ে যায়। সে জিনিস আমার কাছে থাকে না।
তাহলে কেন বারবার এই কষ্ট সইব? জীবনে কেন এমন সম্পর্ক
গড়ব, যার বিচ্ছেদ আমাকে এতটা যন্ত্রণা দেয়?' ইমামা যেন
কাঁদতে কাঁদতে বুকে আটকা যন্ত্রণাদায়ক সেই কাঁটাটি উগড়ে
দিল। যে কাঁটাটি তার নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে। 'বারবার
মহব্বত করব, বারবার হারিয়ে ফেলব, এই যন্ত্রণা আর সইতে
পারব না।' ইমামা কেঁদে চলল। অশ্রু ঝরছে, যেন ফোসকা-

ফাটা পানি। জানা নেই বুড়িমার চোখে শাকের ভাপ পানি নিয়ে এলো, নাকি তার দুঃখমাখা গল্প! কিন্তু তিনিও তার জরাজীর্ণ ময়লা চাদরের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

: তা তো করতে পারব না। এটা কোনো মানুষই করতে পারে না যে, বিচ্ছেদের ভয়ে সবাইকে দূরে ছেড়ে থাকবে। কিন্তু সবাইকে একসাথে ছেড়ে কি তুই সেই যন্ত্রণা সহিতে পারবি?

বুড়িমা তাকে এখন যে প্রশ্নটি করলেন, এর কোনো উত্তর তার কাছে নেই। আর থাকলেও তা মুখ ফুটে বলার মতো হিম্মত তার নেই।

: 'এই বুপড়ির ভেতরে আমার আর আটত্রিশ বছরের যুবক ছেলে... একটু দাঁড়াও, তাকে নিয়ে আসছি আমি। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে তো তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।' বুড়িমা একদম উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর তিনি ঠেলাগাড়ির মতো একটি ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে এলেন। তাতে একটি জীর্ণশীর্ণ পুরুষ বিছানায় শুয়ে অটুহাসি দিচ্ছে। যেন মায়ের মনোযোগ পেয়ে সে খুশি। বুড়িমা তাকে যদি তার ছেলের বয়স আটত্রিশ না বলতেন, তাহলে ইমামা তাকে আঠারো-উনিশ বছরের কোনো ছেলে মনে করত। সে মানসিক ও শারীরিক; দুদিকেই অক্ষম। ঠিকমতো কথা বলতে পারে না। বুড়িমাকে দেখে কেবল হাসতে থাকল। আর বুড়িমাও তাকে দেখে।

তিনি ঠেলাগাড়ি এনে ইমামার কাছাকাছি দাঁড় করিয়ে পুনরায় রুটি তৈরি করতে বসে পড়লেন।

: 'এ আমার একমাত্র ছেলে। আল্লাহর পর আটত্রিশ বছর আমি তার ভরসায় কাটাচ্ছি।' বুড়িমা আটার মণ্ড বানাতে বানাতে তাকে বলতে লাগলেন।

: 'আর কোনো সন্তান নেই আপনার?' ইমামার অশ্রু এখন থামতে শুরু করেছে।

: 'পাঁচ সন্তান জন্ম নিচ্ছে, সবাই সুস্থ। কিন্তু অল্প দিনে সবাই চলে গেল। তারপর এ জন্ম নিল। স্বামী বলল, একে কোনো দরগায় ছেড়ে আয়। এমন ছেলে আমি পালতে পারব না। অনেক চাপের দায়িত্ব এটা। কিন্তু আমি কীভাবে ফেলতে পারি আমার ছেলেকে! তার ওপর তো সত্যি সত্যিই আমার মহব্বত হয়ে গিয়েছিল।' বলতে বলতে বুড়িমা এখন শাকের পাতিল নামানো তাওয়ায় রুটি দিতে লাগলেন। তারপর তিনি তার ছেলেকে এমনভাবে ডাকতে লাগলেন যে, এ আটত্রিশ বছর বয়সি কোনো ছেলে নয়, যেন আট মাসের শিশু সন্তান। আর সেও বিছানায় শুয়ে মায়ের ডাকে তার জীর্ণশীর্ণ, হাড়জিরজিরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওভাবেই গুটিয়ে নিচ্ছে হাস্যরত হয়ে, যেন সত্যিই সে কোনো বাচ্চা শিশু। স্নামী চার-পাঁচ বছর বোঝাইছিল আমাকে। কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। আল্লাহ দিয়েছেন সন্তান, আল্লাহর দেওয়া জিনিস কীভাবে ফিলে দিয়ে আসতাম।

মানুষের দানের জিনিস হলে ফেলে আসতাম। এরপর আর আমার কোনো সন্তান হয়নি। আমার প্রতি স্বামীর অনেক মহব্বত ছিল। নতুন সন্তানও চাইত সে। আমারও তখন মন চাইছিল নিজেই তার জীবন থেকে সরে আসতে। কিন্তু আমার দুকূলে কেউ ছিল না। তাই ওখানেই পড়ে থাকি। সে দ্বিতীয় বিয়ে করার দশ দিন পর তাকে খেতের আইলে সাপে কাটে। লোকেরা বলতে শুরু করে, আমার অভিশাপ লেগেছে। কিন্তু আমি তো কখনো তাকে অভিশাপ করিনি। যতদিন তার সাথে ছিলাম, আমি তো ভালোই ছিলাম।" বড়িমার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি আঁচলে মুছে তাওয়ায় রুটি সেকতে লাগলেন।

'সে মরে যেতেই সমস্ত জমি-জমা আত্মীয়রা ছিনিয়ে নিল। কেবল এই ছেলেটিকেই আমার কাছে রেখে দিল। এ সুস্থ থাকলে, একেও ছিনিয়ে নিত। কিন্তু আল্লাহর দয়া, সে এমন হয়েছে। আটত্রিশ বছর ধরে সে আমার সাথে আছে। স্বামীর কথায় যদি তাকে দরগায় ফেলে আসতাম, তাহলে আজ

আমার কী হতো!" বলতে বলতে বুড়িমা অদ্ভুত আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে একটি রুটি তার সামনে রাখলেন। কথাগুলো

শুনে ইমামার মনে হচ্ছে, তার কাঁধ থেকে যেন কোনো বোঝা নেমে যাচ্ছে। কোনো

বন্ধ তালা খুলে যাচ্ছে। কোনো জাদু যেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

: 'আল্লাহ যা ছিনাই নিছেন, তাতে ধৈর্যধারণ করো। নিজেরে কারও থাইকা দূরে সরাই রাখিস না। আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না।' বুড়িমা রুটিতে শাক রাখতে রাখতে বললেন।

: 'বুড়িমা! আঘাত ছিল অনেক বড়।' বলতে বলতে ইমামা প্রথম লোকমার জন্য রুটি ভাঙল।

: আল্লাহ তোকে কষ্ট দিয়েছেন, আর তুই দিয়েছিস তোর স্বামীকে। তাহলে তুই কোথায় তোর কষ্ট নিজের ভেতর রেখে বসে আছিস! তুইও তো উলটো আরেকজনকে কষ্ট দিলি।

ইমামা লোকমা হাতে নিয়ে বসে রইল। মুখে পুরতে পারল না। চোখে অশ্রুর কুয়াশা। সালারের কথা তার মনে পড়ল। বিদায়ের সময় তার হাতে ভালোবাসা-মাখা ছোঁয়ার কথা মনে এলো। মনে এলো তার ভালোবাসা ও দানের কথা। তার আগত সন্তানের কথাও মনে পড়ল। যাকে সে কতশত দোয়া করে আল্লাহর কাছে চেয়েছিল। আর যখন দোয়া কবুল হলো, এখন সে তার কোনো মূল্যায়ন করছে না।

বুড়িমার পাশে বসে এই প্রথম ওয়াসিমের মৃত্যুশোকে তার মনে ধৈর্য এলো। ধৈর্য এলো সাদের হারিয়ে যাওয়ার শোকে। সে দৌড়ে এখান থেকে পালাতে লাগল। তাকে তার ঘরে ফিরতে হবে। সালারের কাছে যেতে হবে। বাসায় পৌঁছে সে সালারকে ফোন করল। ফোনে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার কথা বলল।

সালার হতভম্ব হলো। হতভম্বের চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবু সে তার টিকিট বুক করে ফেলল।



আমেরিকায় ফেরার আগে সে বুড়িমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। উনার জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওই বুপড়ি সে খুঁজে পেল না।

ড্রাইভারকে সাথে নিয়ে অর্ধেক দিন বুপড়ি বস্তি এলাকাটি খুঁজতে থাকল। আগেরবার ড্রাইভার ওই এলাকাটি দেখেনি। কারণ, ইমামা সেদিন ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে বহুদূর নদীর কিনারে চলে এসেছিল। তারপর পায়ে হেঁটেই ওখান থেকে গাড়ির কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তবু তো ওই জায়গাটি এখানেই থাকার কথা; এই রাস্তার কোথাও। কিন্তু এখানে কোনো বুপড়ি বস্তি নেই। আর না সেই বুড়িমা, যার হাতের রুটি ও শাকের স্বাদ এখনো তার জিহ্বায় লেগে আছে। এখনো তার মনে ভেসে

আছে সেই আটত্রিশ বছরের ছেলেটির কষ্টের কথা, যে বুড়িমার প্রতিটি বোঝাকে হালকা করে দিয়েছিল। এখনো তার মনে গেঁথে আছে, সেই অতি শিক্ষিত বুড়িমার কথাগুলো, যা তার অস্তিত্বের তালো ও জটিলতাগুলো খুলে দিয়েছিল জাদুর চাবির মতো।

3

০২

দীর্ঘ ছয় বছর পর পরিচারিকাই বাইরের গেটটি খুলল। ড্রাইভ-ওয়েতে গাড়ি দাঁড় করাতে করাতে সালার এখন ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলতে চলছে, ঠিক তখন প্রতিদিনের মতো লনে খেলাধুলায় মগ্ন তার দুই সন্তান দৌড়ে তার কাছে এলো। চার বছরের জিবরিল আগে পৌঁছাল। ড্রাইভিং সিটে বসে বসেই সালার তার ছেলের গালে চুমু খেল। জিবরিলের শরীর এখন ঘামে ভিজে একাকার হয়ে আছে।

: 'আসসালামু আলাইকুম!' গাড়ির টিস্যুবক্স থেকে টিস্যু বের করে সে জিবরিলের মাথা ও মুখ মুছতে লাগল। দুই বছরের ইনায়া ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে, চিৎকার করতে করতে, উঠতে-পড়তে পড়তে তার কাছে এসে পৌঁছাল। দূর থেকে সালারের দুই হাত ছড়ানো কোল দেখে, সে আরও খানিকটা খিলখিল করে হাসতে লাগল। সব সময়ের মতো সালার তাকে কোলে তুলে নিল। শক্ত করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, একে একে তার উভয় গালে চুমু খেল। ততক্ষণে জিবরিল ড্রাইভিং সিটের দরজা বন্ধ করে ফেলেছে। ইনায়াকে সালার নিচে নামিয়ে দিল। বাবার সাথে দেখা করে তারা পুনরায় লনে দৌড়ে গেল। ওখানে তারা এতক্ষণ পরিচারিকার দুই মেয়ের সাথে খেলছিল। সালার কতক্ষণ ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে তার দুই সন্তানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গাড়ির পেছন থেকে ব্রিফকেস ও জ্যাকেট বের করে ভেতরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

ইমামা ততক্ষণে তার অভ্যর্থনার জন্য দরজায় চলে এসেছে।
উভয়ের মধ্যে চোখাচোখি হলো। ইমামা অবাক হয়ে তার
দিকে আসতে আসতে হাসল।

: আজ তুমি একটু তাড়াতাড়িই চলে এলে না?

সালার সব সময়ের মতো তাকে জড়িয়ে ধরে তার চুলের
ভেতর আলতো করে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, 'হ্যাঁ,
আজ কাজ বেশি ছিল না।'

: 'তাহলে খুঁজে নিতে।' প্রত্যুত্তর করে সালারের হাত থেকে
জ্যাকেট নিতে নিতে সে হাসল। সালার এবার কোনো উত্তর না
করে মৃদু হাসল।

সালার বেডরুমে বসে জুতা খুলতে খুলতে ইমামা তার জন্য
পানি নিয়ে এলো।

: 'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?' সালার তার হাতে ধরা ট্রে থেকে গ্লাস ওঠাচ্ছে। ইমামা হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করল। সালার চমকে তার দিকে তাকাল।

: হ্যাঁ, একদম। কেন?

: না, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

সালার উত্তর করার পরিবর্তে হোঁটে গ্লাস ছোঁয়াল। ইমামা ট্রে নিয়ে চলে গেল।

অতঃপর কাপড় পালটে সালার সিটিং এরিয়ায় চলে এলো। লনে এখনো তার দুই সন্তান ফুটবলের পেছনে দৌড়াচ্ছে। সালার সিটিং এরিয়ার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কঙ্গোর আবহাওয়া তার কখনোই ভালো লাগে না। আর এর কারণ, হুটহাট বৃষ্টি। হয়তো একটু পরেই আবার শুরু হয়ে যাবে। কিনশাসায় গত কয়েকদিন ধরে প্রতিদিন এই সময়েই

বৃষ্টি হচ্ছে। বিকেলের শেষ কয়েক ঘন্টাতে, এক দেড় ঘন্টা বৃষ্টি, আর তারপর আকাশ পরিষ্কার।

: চা।

ইমামার গলা শুনে সে অবচেতনেই পেছনে তাকাল। সে একটি ট্রেতে করে দুই মগ চা ও এক প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

: 'থ্যাংকস!' সালার মগ ও এক টুকরো বিস্কুট ওঠাতে ওঠাতে হাসল।

: 'চলো, বাচ্চাদের কাছে বাইরে যাই।' বলতে বলতে ইমামা বাইরে যেতে লাগল।

: যাও, আমি এখনই আসছি। একটা কলের জন্য অপেক্ষা করছি।

ইমামা মাথা নেড়ে বাইরে চলে গেল।

কয়েক মিনিট পর ইমামা লনে এলো। লনের এক কোণে পড়ে থাকা চেয়ারে বসা সালারকে দেখে সে হাসল। সালারও প্রত্যুত্তরে হাসল। চায়ের মগ ও বিস্কুটের প্লেট এখন লনে তার সামনের টেবিলে রেখে দিয়েছে। জিবরিল ও ইনায়া দৌড়ে এসে প্লেট থেকে বিস্কুট নিতে লাগল। জিবরিল বিস্কুট নিয়ে নুনা ও লুয়াকে দিল। চারটি বাচ্চাই পুনরায় ফুটবল খেলতে লাগল। ইমামা এখন পুরোপুরি বাচ্চাদের দিকে মনোযোগী হয়ে আছে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ডান কাঁধে জড়িয়ে থাকা শাল দিয়ে সে শরীরের ওই অংশটি আবৃত করল, যেখানে একটি নতুন জীবন বেড়ে উঠছে। (সে এখন তৃতীয় সন্তানসম্ভবা।) ফুটবলের পেছনে ছুটন্ত বাচ্চাদের দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। তাদের নির্দেশনা দিচ্ছে।



সিটিং এরিয়ার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে সালার যেন কোনো সিনেমা দেখছে। একটি পূর্ণাঙ্গ সিনেমা। তার হাতের চা এখন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে সে পাশের টেবিলে মগটি রেখে দিল। ইমামার ধারণাই ঠিক। সালার সুস্থ নয়। সালার জানালার বাইরে লনে দৃশ্যমান একটি আনন্দমুখর পরিবারকে দেখছে। আইডিয়াল পারফেক্ট লাইফ। একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবনের দৃশ্য; তার সন্তানদের শৈশবের মূল্যবান মুহূর্ত। দেখছে, নিজের ভেতর আরও একটি কচি অস্তিত্বের অপেক্ষায় তার স্ত্রীর হাসিখুশি মুখ।

কয়েকটি কাগজ ছিঁড়ে ফেললেই এই জীবন এমনই সুন্দর থাকতে পারত! এক মুহূর্তের জন্য সালার অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। স্ত্রী-সন্তান বাস্তবিকই মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সালারও সেই পরীক্ষার শিকার হচ্ছে। একজন পুরুষ, একজন স্বামী, একজন বাবা হিসেবে লনে বিদ্যমান এই পরিবারটি তার দায়িত্বে। সে তাদের সঙ্গে রক্ত ও ভালোবাসার সম্পর্কে আবদ্ধ।



মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টিভ্রষ্ট হলো। সে জিবরিল ও ইনায়ার সাথে খেলায়রত চার ও ছয় বছরের কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় বাচ্চা দুটোর দিকে তাকাল। তার সুন্দর-ফরসা বাচ্চাদের সাথে খেলারত ওই কৃষ্ণবর্ণ বাচ্চা দুটিকে আরও অধিক অসুন্দর দেখাচ্ছে। বাচ্চাদুটো পরিচারিকা হেডির দুই মেয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও তারা এমন মানসম্মত পোশাক ও জুতা পরতে পারছে, এর কারণ একটিই। আর তা হলো, সালারের বাসায় হেডির পরিচারিকার কাজ। আর নয়তো গোস্বের দুরবস্থার স্বীকার হাজার হাজার শিশুদের মতো তাদের শৈশবও কোনো উপকরণহীন না খেয়ে, না পরে, কষ্ট-পরিশ্রমে কাটত। সালারের বাসার কাজ থেকে বরখাস্ত করলে, তাদের ভবিষ্যৎ আবারও অনিশ্চয়তার ডুবে যেত। যেভাবে এই পশ্চিমা উপনিবেশবাদ আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছে। সালার নিজেও সেই পশ্চিমা উপনিবেশবাদের একজন সদস্য হয়েই এখানে এসেছে। সালার এখন হোউর দিকে তাকিয়ে আছে। হেডির বাচ্চারা ফুটবলে দারুণ শট দিচ্ছে। তা দেখে

হেডি ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। যেভাবে লনের এক কোণে চেয়ারে বসে তার স্ত্রী ইমামাও নিজের দুই সন্তানকে খেলতে দেখে আনন্দিত হচ্ছে। প্রশান্তি অনুভব করছে। হেডি নিজেও কখনো তার শৈশব দেখেনি। সে জন্মের পরপরই দায়িত্বের চাপে 'যুবতি' হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকার ৯০% বাচ্চাই তার মতো হয়তো সুন্দর শৈশব কিংবা জীবন-সংগ্রাম, এ দুটোর একটি পায়। দুটোই একসাথে কেউ কখনো পায় না। তাদের কাছে শৈশব এক বিলাসিতার নাম, যা কেবল ভাগ্যবানরাই পায়; সাধারণ মানুষ নয়। আর হেডি তার সন্তানদের সেই বিলাসী শৈশব দিতে একা, একহাতে লড়ে চলছে। সালারদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে তারা এখন মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ।

একটি দীর্ঘ সময় পর, এখানে দাঁড়িয়ে সালার এই প্রথম তার সন্তানদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ নারীটির সন্তানদের সাথে তুলনা করছে। নিজের স্ত্রীর জীবন ও সেই নারীটির জীবন নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করছে। যদিও আজ সে এটি করার

জন্য এখানে দাঁড়ায়নি। হঠাৎ তার ফোন বেজে উঠতেই, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফোন-কর্তার আইডির দিকে তাকাল। কল রিসিভ করতে করতে বুঝে ফেলল, ওপাশ থেকে এখন কে কথা বলতে পারে! সালার এখন ক্যারিয়ারের এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে এখন তাকে তার পরিবারের জীবন কিংবা চাকরি, এ দুটোর একটি বেছে নিতে হবে!

০৩

আফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ কঙ্গো, গত কয়েক দশক ধরে এটি সারা বিশ্বে কেবল পাঁচটি জিনিসের জন্য পরিচিত-

১. গৃহযুদ্ধ; যেখানে এ পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

২. দরিদ্রতা; জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সূচকে ১৮৮টি দেশের মধ্যে কঙ্গো ১৮৭তম স্থানে রয়েছে।



৩. খনিজ সম্পদ; এগুলো সংরক্ষণের দিক থেকে কঙ্গো বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ।

৪. ঘন জঙ্গল; এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

৫. পিঁপড়ের মতো খর্বাকৃতি (পিগমি জনগোষ্ঠীর) কৃষগাঙ্গ মানুষ; কঙ্গোর সেই জঙ্গলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করা এক মানবগোষ্ঠী এটি। যারা সভ্য যুগের একমাত্র দাস। যাদের দাস বানানো আইনত বৈধ।

এই পরিচিতি কেবল কঙ্গোর নয়; আফ্রিকার প্রতিটি দেশই কম-বেশি এসবের জন্যই পরিচিত। এসব দেশের মধ্যে সাধারণ যষ্ঠ একটি পরিচয় হলো, সর্বত্র বিরাজমান পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার নতুন রূপ। বিশ্বব্যাংক এই সংস্থাটি এই সমস্ত দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য এমন সুযোগ করে দিচ্ছে, যে সুযোগের ফলে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে

আফ্রিকার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ আখের রসের মতো
প্রতিনিয়ত নিংড়ে নিচ্ছে। কঙ্গোতেও ঠিক এটাই চলছে। আর
এটা এক-দুই দিন ধরে নয়; বরং বহু দশক ধরেই চলছে।

১৯৬০ সালে বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ
করার পর, ত্রিশ বছরে কঙ্গো অন্তত বিশবার তার নাম পরিবর্তন
করেছে। সমস্ত যুদ্ধ কেবল নামকরণ ও পরিবর্তন করার মাঝেই
সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধ করে এ ছাড়া আর কোনো ফায়দা হয়নি।
কিন্তু তা ধীরে ধীরে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতো বৃহৎ শক্তির
পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। এমন এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ,
যেখানে স্বাধীনতার ৫৫ বছরের মধ্যে কঙ্গো ৪৫ লক্ষ মানুষের
প্রাণ হারায়।

সাড়ে ৬ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে এমন কোনো ঘর বাকি
নেই, যারা এই গৃহযুদ্ধে জড়ায়নি। এমন কোনো পরিবার নেই,
যার কোনো না কোনো সদস্য এই হত্যাযজ্ঞে প্রাণ কিংবা
শরীরের কোনো অঙ্গ হারায়নি। অথবা যার পরিবারের নারীরা

লাঞ্ছনার শিকার হয়নি। এমন কেউ নেই, যার ছেলে-মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়নি। কিংবা তাদের সন্তানগুলো শিশু সৈনিক হিসেবে যুদ্ধরত দলগুলোর হাতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি। এটি বিশ্বের তথাকথিত সভ্য ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ। যে যুদ্ধে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গোত্রগুলো হত্যাযজ্ঞ চালাত। তাদের মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত। গৃহযুদ্ধ যেন কঙ্গো নদীর তীরবর্তী দেশের মানুষের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গিয়েছিল। এমন একটি সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি সভ্য পৃথিবীর সভ্য মানুষেরাই তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব-শক্তিগুলো কঙ্গোর ভূমি ও খনিজ সম্পদের ওপর দখল বিস্তার করে, কোটি কোটি টাকার খনিজ তাদের নিজেদের দেশ ও সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। পুরো আফ্রিকায় তারা কতভাবে মানবতার অবমাননা করেছে, এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

এই যুদ্ধে ৪৫ লাখ মানুষ যদি প্রাণ হারিয়ে থাকে, তাহলে প্রায় এই পরিমাণ মানুষই ক্ষুধা, রোগব্যাধি ও মৌলিক চাহিদার অভাবে মৃত্যুর শিকার হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব অভাব এমন এক দেশে হয়েছিল, যে দেশ ধনীয় সম্পদের দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। যার জমিনজুড়ে ছড়িয়ে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু-কোবাল্ট, প্লাটিনাম ও ইউরেনিয়ামের মতো অমূল্য সম্পদ।

কঙ্গো শুধু এসব ধাতুতেই সমৃদ্ধ ছিল না, বরং সে সময় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অপরিিশোধিত হীরার উৎপাদকও ছিল। এ ছাড়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃষ্টি-অরণ্যের অধিকারীর গৌরবও ছিল কঙ্গোরই। সেখানে শুধু বিলিয়ন ডলারের মূল্যবান কষ্টে ছিল না; বরং সেখান থেকেই বিশ্বজুড়ে রাবার সরবরাহ করা হতো। আর কঙ্গোর সেই মাটিতেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃষ্টি-অরণ্যে প্রায় পাঁচ লাখের মতো দরিদ্র মানুষ বসবাস করত। পশু শিকার ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র মাধ্যম।

এদের অনেকে আজও নিজেদের শরীর গাছের ছাল, পাতা বা পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখে। আর না হয় নগ্ন থাকে। এই পাঁচ লাখ মানুষের দল ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে, ফ্রান্সের দ্বিগুণ আয়তনের এই বৃষ্টি-অরণ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তন্ত্র সংখ্যার দিক থেকে তারা কখনোই বনাঞ্চলের আশেপাশে বসবাসকারী বানু গোত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না। কেননা, এই গোত্র সবদিক থেকেই ছিল তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা ছিল কঙ্গোর সাংবিধানিক ও আইনি নাগরিক। তাদের হায়ে ছিল মৌলিক অধিকার, মৌলিক চাহিদার উপকরণ এবং উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধা। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও সেই হতদরিদ্র খর্বাকৃতি মানুষগুলোর কাছে কিছুই ছিল না। তাদের কাছে ছিল শুধু সেই জঙ্গল, যেখানে তারা বাস করত, নিজেরা নিজেরা বিয়ে করত এবং ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়ার মতো সাধারণ রোগে ভুগে মারা যেত। তাদের জীবনের পরিধি ছিল এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ।

২০০২ সালে কঙ্গোর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছু বৈশ্বিক শক্তির চাপে বনাঞ্চল উজাড়করণের জন্য নতুন একটি বন-আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের অধীনে কঙ্গো সরকার বনাঞ্চলের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে। ফলে আইন অনুযায়ী সরকার চাইলে তার ইচ্ছামতো বনাঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি ও জনগোষ্ঠীগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, বনভূমির যেকোনো অংশ ব্যবহার করতে পারত। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধু এই কাঠামোকে সমর্থনই করেনি, বরং কঙ্গো সরকারকে অর্থও সরবরাহ করে। যাতে বনাঞ্চলকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে চিহ্নিত করা যায়-কোন অংশে গাছ কাটা হবে, কোন অংশ শিল্পকারখানার কাজে লাগবে, কোন অংশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য রাখা হবে আর কোন অংশকে ন্যাশনাল পার্কে রূপান্তর করে মানব বসতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বিশ্বব্যাংক জাতিসংঘের খাদ্য

সংস্থার সঙ্গে মিলে কঙ্গোর বন ধ্বংসের একটি বিশাল প্রকল্প শুরু করে।

সালার সিকান্দার যখন এই প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কঙ্গোতে পৌঁছেছে, তখন প্রকল্পটির বয়স ইতিমধ্যে তিন বছর হয়ে গিয়েছে। সালার বুঝতেও পারেনি, বিশ্বব্যাংক তাকে কীভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে। কিন্তু সে তা খুব দ্রুতই বুঝে গেল- ইবাকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই।

০৪

পেট্রোস ইবাকার সঙ্গে সালার সিকান্দারের প্রথম সাক্ষাৎটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে হলো। সালার কঙ্গোতে এসেছে প্রায় এক বছর হতে চলছে। সে লামকো নামক স্থানে তার টিম নিয়ে জায়গাটি পরিদর্শন করছে। ইবাকা তখন হঠাৎই দুই ডজন খর্বাকৃতি পিগমি মানুষ নিয়ে উপস্থিত। সালার ও তার টিম গাড়ি থেকে নেমে এই জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করছিল। জায়গাটি কিছুদিন আগে একটি ইউরোপিয়ান কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি সব রকম

নিরাপত্তাকর্মীও রয়েছে। সালারের দলের গার্ডরা হঠাৎ পেট্রোস ইবাকা ও তার দলের লোকদের আবির্ভূত হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।

সালার দেখে দুই পিগমি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর বাকিরা গাছের পেছনে নিজেদের আড়াল করে নিয়েছে। তা দেখে সালার গাছের আড়াল থেকে ইবাকাকে জোরে চিৎকার করে ইংরেজিতে কথা বলতে শোনে। ইবাকা বলছে, আমরা এখানে আক্রমণ করতে আসিনি, কথা বলতে এসেছি। সালার তখন তার গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, আর সে-ই সবার আগে ইবাকার চিৎকার শুনতে পায়।

সালারের টিমের গার্ডরা ততক্ষণে আক্সায়ুদ্ধ গুলি চালাতে চালাতে দলের সকল সদস্যকে গাড়িতে তুলে দিয়েছে। কেবল সালার সিকান্দার বাকি। সালার নিজেও গার্ডদের সহায়তায় গাড়িতে উঠে, দ্রুত বেগে এখান থেকে চলে যেত। কিন্তু তার আগেই সালার কঙ্গোর স্থানীয় ভাষা কিংগালাতে গার্ডদের

বলল, সে ওই চিৎকার করা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারা যেন গুলি চালানো বন্ধ করে দেয়। কারণ, এটি একটি একতরফা ফায়ারিং হচ্ছে; অপরপক্ষ থেকে কোনো গুলি ছোড়া হচ্ছে না। অন্য কোনো অস্ত্রও ব্যবহার করা হচ্ছে না।

তার গার্ডরা তখন তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। আর সেই তর্কের অবসান ঘটাতে সালার যে সমাধানের পথ বেছে নিল, তা তার জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামি হতে পারত-যদি অপর দলটির হাতে সত্যিই কোনো অস্ত্র থেকে থাকত। সালার হঠাৎ গাড়ির আড়াল ছেড়ে সামনে বেরিয়ে আসে। তার এভাবে সামনে চলে আসায় তার নিরাপত্তা গার্ডরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, এতটা আতঙ্কিত তারা পিগমি দল সামনে আসাতেও হয়নি। ফলে মুহূর্তেই গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। সালারকে অনুসরণ করে তার নিরাপত্তারক্ষীরাও গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। এখানে এখন কেবল দুটি গাড়ি অবশিষ্ট আছে। দলের বাকি সদস্যরা ইতিমধ্যে গার্ডদের নিরাপত্তায় সেখান থেকে চলে গিয়েছে।

গুলিবর্ষণ বন্ধ হতেই ইবাকাও বাইরে বেরিয়ে এলো। সালার চিৎকার করে তার গার্ডদের গুলি চালাতে নিষেধ করতে থাকল। তারপর সে সাড়ে চার ফুট উচ্চতার, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, চ্যাপটা নাকওয়ালা আর বড় বড় কালো চোখের মানুষটির দিকে মনোযোগী হলো। যে কালো মানুষটি তার সঙ্গীদের মতো উপজাতি পোশাক না পরে, আধুনিক জিন্স ও শার্ট পরেছে। খালি পায়ের বেঁটে লোকদের ভিড়ে জগার্স পরা সেই মানুষটিকে ভীষণ অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

: 'পেট্রোস ইবাকা।' সেই বেঁটে মানুষটি এগিয়ে এসে তার পরিচয় দিয়ে সালারের দিকে হাত বাড়াল। হাত মেলানোর আগে সালার অত্যন্ত হিসেবি দৃষ্টিতে ইবাকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করল। সালার এখনো ভাবছে, ইবাকাও নিশ্চয় সেই দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের মতো কেউ হবে, যারা বিদেশিদের গাড়ি দেখতেই সাহায্যের জন্য সামনে এসে দাঁড়ায়। আর্থিক সাহায্য না হোক, শুকনো খাবারের প্যাকেট, দুধ, বালিও তাদের কাছে এক বিলাসিতার নাম। সালারও ইবাকার থেকে

এমন কোনো আবদারের অপেক্ষা করছে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ইবাকার মুখে নিজের নাম শুনে সালার হতবাক হয়ে গেল। সে তো ইবাকাকে তার পরিচয় দেয়নি, তাহলে সে তার নাম কীভাবে জানল। তাকে এই প্রশ্ন না করে সালার থাকতে পারল না। প্রত্যুত্তরে ইবাকা তাকে বলল, সে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে-এমনকি লোমুকা পরিদর্শন করতে যে আসছে, সে সম্পর্কেও। ব্যাংকের অফিসে কর্মরত একজন স্থানীয় ব্যক্তি তাকে এটি জানিয়েছে। ইবাকা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সালারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেই কর্মকর্তাটি তাকে মুখের ওপর না করে দেয়। আর এটি কোনো কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের কথা না। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি হেডের সঙ্গে দেখা করার জন্য বহু মাস ধরে চেষ্টা করছে ইবাকা। সালারের অফিসের নম্বরে সে প্রতিদিন অসংখ্য কল করেছে। ওয়েবসাইটে থাকা তার ইমেলে শত শত মেইল পাঠিয়েছে। প্রত্যেকটি মেইলের জবাবে শুধু বলা হতো, আমরা আপনার মেইলটি পেয়েছি। তারপর আর কিছুই না।

সালারের অফিসে ফোন করলেও রিসিভ করে কর্মকর্তারা বলত, স্যার এখন মিটিংয়ে আছেন, আপনার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানার পরও তাকে খুব সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হতো। তার কথা শুনতে শুনতে সালার তার ভাষা ও বক্তব্যে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। সালারের এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, বেলজিয়ামের উপনিবেশ হিসেবে যে দেশের জাতীয় ভাষা ফরাসি-সেই দেশের একজন বনবাসী মানুষ আমেরিকান উচ্চারণে এত সাবলীল ইংরেজি বলছে মানে, সে নিশ্চয়ই বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এটি অবিশ্বাস্য একটি বিষয়। কিন্তু এরপর সালার সিকান্দার যা শুনল, তা তাকে সম্পূর্ণ হতবাক করে দিল।

পেট্রোস ইবাকা হার্ডার্ড বিজনেস স্কুলের গ্র্যাজুয়েট। ওয়াল স্ট্রিটে জেপি মরগ্যান গ্রুপের সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করে সে কঙ্গোতে ফিরে এসেছে। ওয়ালেট থেকে কয়েকটি ভিজিটিং কার্ড বের করে সে সালারের দিকে বাড়িয়ে দিল। সালার প্রচণ্ড অবিশ্বাস্য চোখে কার্ডগুলো হাতে নিল। ভিখারিসদৃশ,

খর্বাকৃতি, অসহায় এই মানুষটি, যে কঙ্গোর জঙ্গলে তির-বর্শা আর পাথর দিয়ে শিকার করে পেটের ভাত জোটায়, সে কীভাবে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পৌঁছাল? আর জেপি মরগ্যান গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহলে এখন সে এখানে কী করছে? পেট্রোস ইবাকা সালারের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল পরদিন তার অফিসে গিয়ে, তার হাতে একগাদা নথিপত্র তুলে দিয়ে। এই নথিগুলোই সে সালারকে দিতে এসেছে।

পেট্রোস ইবাকার বয়স তখন দশ। এক শিশু হিসেবে লোমুকাতে এক মিশনারির সঙ্গে পরিচয় হয় তার। সেই মিশনারি তাকে কঙ্গোর জঙ্গলে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সাথে করে ঘুরত। তারপর ধীরে ধীরে মিশনারির সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক হয়ে যায়। ফলে রোগব্যাধির মহামারির কারণে মিশনারিটি কঙ্গো ছাড়ার সময় তাকেও সাথে করে আমেরিকায় নিয়ে যায়। ওখানে নিয়ে তার নতুন নাম দেয়-পেট্রোস। দেয় নতুন ধর্মও। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় হলো, তারা তাকে শিক্ষা-অর্জনের সুযোগ করে দেয়। তার জন্য দাতব্য সংস্থা থেকে অর্থের ব্যবস্থা করে। ইবাকা ছিল অত্যন্ত মেধাবী। রেভারেন্ড জনসন তার সেই মেধা উপলব্ধি করতে পারেন। অতঃপর তাকে তিনি প্রতিবছর তার জন্মস্থান কঙ্গোতে, তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করাতে থাকেন। সেখানে আজও তার পরিবার একইভাবে বসবাস করছে। দশ বছরের ইবাকা তার জীবনের পাঁচশটি বছর আমেরিকায় কাটিয়ে, অবশেষে আমেরিকা ছেড়ে নিজ দেশে চলে আসে।

সে তার আপন মানুষের কাছে থাকতে চায়। কারণ, তার অত্যন্ত প্রয়োজন তাদের। তাদের প্রয়োজনের বিশেষ কারণটি ছিল-বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত বহু প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্পের জন্য। প্রকল্পটি ইবাকার গোত্রের বসবাস অঞ্চলে শুরু হয়েছে। তার পরিবার এবং পরিবারের বাইরেও আরও ১০ হাজার মানুষকে সেই অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অথচ সেখানে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করছে। জঙ্গল

কেটে সমস্ত অঞ্চল পরিকার করে ফেলা হচ্ছে। তারপর এখানে শুরু হয় প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ-খনিজ অনুসন্ধান।

ইবাকার পরিবারই তার মূল সমস্যা নয়। তার মূল সমস্যা হলো, সেই পুরো জঙ্গলাঞ্চল, যাকে এখন টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হচ্ছে। কোথাও গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, কোথাও ন্যাশনাল পার্ক বানিয়ে সেখান থেকে মানুষদের গণহারে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

জীবিকা দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক কাঠশিল্পকে সমর্থন দিচ্ছে। কারণ, এতে আমাদের দারিদ্র্য : 'আমরা পাঁচ লাখ মানুষ। কিন্তু এই জঙ্গল তো কঙ্গোর সাড়ে তিন কোটি মানুষকে আমেরিকার কারখানা আর শোরুমে অতি-দামে বিক্রীত কাঠের আসবাবে পরিণত দূর হবে। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে যখন এই জঙ্গলই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ইউরোপ-হবে, তখন কঙ্গোর মানুষ কী করবে? খোদা আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তোমরা আমাদের কাছ থেকে সেটাও কেড়ে নিতে চাও। আমরা যদি কখনো

পশ্চিমে গিয়ে তাদের সবকিছু কেড়ে নিই, তখন তোমাদের কেমন লাগবে?' ইবাকা অত্যন্ত মার্জিতভাবে তার বক্তব্য তুলে ধরল। কিন্তু শেষের দিকে এসে তার অস্থিরতা কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিমায় ফুটে উঠল।

সালার সিকান্দারের কাছে তার প্রশ্নের উত্তর সব মুখস্থ। এই প্রকল্পের মতো কঙ্গোতে চলমান অসংখ্য প্রকল্পের খুঁটিনাটি তথ্য তার নখদর্পণে। বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি হেড সে। এই হিসেবে এসব প্রকল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাব্যতার রিপোর্ট তার অজানা থাকবে, এটি অসম্ভব। তবে এবারের পরিস্থিতি একদম ভিন্ন। পেট্রোস ইবাকার উল্লিখিত তথ্য ও তার প্রশ্নগুলো প্রথমবারের মতো সালারকে বিচলিত করে তুলল। অনেক কিছুই তার নাকের নিচে ঘটছে, অথচ সে ওসব জানে না। তবু অজ্ঞাতেই সালার এই সবকিছুর অংশীদার হয়ে আছে, কারণ প্রতিটি অনুমোদন তার স্বাক্ষরেই গৃহীত হয়।

সালার কঙ্গোতে এই প্রথম আসেনি। আফ্রিকা এবং তার সমস্যাগুলোও তার কাছে নতুন কিছু নয়। আর এখানকার সম্পদের প্রতি পশ্চিমাদের লোভের ব্যাপারেও সে অজ্ঞ নয়। তবু সে তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করত, তাদেরকে খানিক ছাড় দিত এই ভেবে যে- প্রতিটি বিষয়েরই দুটি দিক থাকে। কেননা, কোনো আন্তর্জাতিক অর্থ-সংস্থা তাদের নিজস্ব স্বার্থ বাদ দিয়ে একান্তভাবে কোনো দেশ বা জাতির কল্যাণে ব্যয় করবে না। সালার তাই ভেবেছে, কঙ্গোবাসীর উপকারের বিনিময়ে পশ্চিমারা যদি কিছু নিতে চায়, নিকা। কিন্তু আজ ইবাকার আপত্তি ও তার মুখে সত্যিটা শুনে সে হতবাক হয়ে গেছে। এখানে যা হচ্ছে, তা বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব চাটারের বিরোধী। তবু তা হচ্ছে। সেটাও বিশ্বব্যাংকের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা আর সম্মতিতেই।

ইবাকার দেওয়া ফাইলের স্তুপাট সালার কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়ে পড়ল। সেই কয়েক সপ্তাহ সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে এমন কিছু কোম্পানিকে কাঠ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাদের অতীত রেকর্ড

আফ্রিকার বহু দেশে বিতর্কিত হয়ে আছে। গাছ কাটা হচ্ছে, জঙ্গল সাফ হচ্ছে, মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছে-কিন্তু যেসব শর্তে এই কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তাদের সেসব শর্ত পূরণ হচ্ছে না। শর্ত দেওয়া হয়েছে, কাঠের বিনিময়ে তারা ওই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার ভিন্নরূপ। তারা কোটি কোটি ডলারের কাঠ নিয়ে বিনিময়ে কেবল কয়েকটি অস্থায়ী স্কুল আর ছোটখাটো চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করে দিয়েই দায় সারছে।

খাবার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে শুকনো দুধ, লবণ আর মসলা জাতীয় জিনিসপত্র। এই সবই ঘটছে বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাদের নজরদারির মধ্যেই। কারণ, পিগমি জাতি-গোষ্ঠীকে এই দেশে অস্পৃশ্যের জায়গা দেওয়া হয়েছে। তারা এই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে না, সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। তারা শুধু একটি কাজ করতে পারে, সেটি হলো-প্রতিবাদ। তাও এনজিও কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু এটা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, পিগমিরা এমন কোনো সভ্য

দুনিয়ায় বসবাস করে না যে, তাদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের খবর, চার ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি বড় নিউজ চ্যানেলের শিরোনাম হয়ে যাবে। বরং তারা বসবাস করে আফ্রিকায়, প্রান্তিক অঞ্চলে, যেখানে এমন অন্যায়গুলোকে ভয় আর হুমকির মাধ্যমে ধামাচাপা দিয়ে ফেলা হয়।

পরবর্তী দুই মাস সালার ইবাকাকে নিয়ে, কখনো একা একাই, ইবাকার দেওয়া নথিপত্রে উল্লিখিত স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল। এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, নথিপত্র ও তাতে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য। বিবেক খুব সহজেই রায় দিয়ে দিল- যা ঘটছে, তা সম্পূর্ণ ভুল এবং সে এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় না। কিন্তু সমস্যা হলো, এখন সে করবে কী? একটি পদত্যাগপত্র দিয়ে কি এই অবস্থা যেমন আছে, তেমনই ফেলে চলে যাবে? তাছাড়া সে জানে, এমনটা করলে, যা চলছে, তা-ই চলতে থাকবে। নাকি সে এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে সরব হবে? এর মূল মর্ম প্রকাশের জন্য 'অনিয়ম' খুবই তুচ্ছ একটি শব্দ।

বিশ্বব্যাংক এখানে যা করছে, তা নৈতিকতা ও মানবতার চরম অবমাননা।

আফ্রিকায় ইবাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সালার সিকান্দার এই প্রথম নবি কারিম-এর বিদায় হজের ভাষণের সেই অমর বাণী উপলব্ধি করতে পারছে-'কোনো কৃষগাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষগাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' এই কথাগুলো সালার সবসময় কেবল জাতপাত আর উঁচু-নিচুর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে। কিন্তু এখন সে নিজের চোখে সেই কৃষগাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে দেখছে, সেই বিপুল জনসংখ্যার দুরবস্থা ও শোষণকে দেখছে, যারা বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে বাস করে। যাদের রয়েছে এক বিশাল ভূখণ্ড, যা খনিজ সম্পদ আর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ।

অপরদিকে সে প্রত্যক্ষ করছে, সাদা চামড়ার মানুষের মানসিক পশ্চাৎপদতা ও লালসার উগ্র রূপ। যার অংশ সে নিজেও। তার ভেতর এক ভয় সঞ্চারিত হতে থাকে। এটা কি আসন্ন যুগের

ব্যাপারে নবি কারিম -এর হাদিসের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী, নাকি এক সতর্কবার্তা, যেটি শুধু শ্বেতাঙ্গরা নয়, বরং মুসলমানরাও উপেক্ষা করে এসেছে? শতাব্দীপর্বে কৃষ্ণাঙ্গদের গলা থেকে দাসত্বের যে শিকল খুলে নেওয়া হয়েছে, একবিংশ শতাব্দীর এই সভ্য যুগে আফ্রিকায় উপনিবেশবাদ সেই শিকল পুনরায় গলায় জড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই কৃষ্ণাঙ্গ ক্ষুদ্রদেহা মানুষগুলোর একজন পেট্রোস ইবাকা। যে আমেরিকার মতো উন্নত দেশে পাঁচশ বছরের জীবন কাটানোর পরও আফ্রিকার এই অন্ধকার যুগে ফিরে এসেছে। কেবল নিজের জাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য। 'টিকিয়ে রাখা'র প্রকৃত অর্থ সালার সিকান্দার পেট্রোস ইবাকা থেকেই শিখছে। মিলেমিশে বেঁাঁয়ে থাকার জন্য কী কী বিসর্জন দিতে হয়, তাও সে তার কাছ থেকেই শিখছে।

জীবনে তাকওয়া বা খোদাভীতির অর্থও তাকে এই মানুষটি শিখিয়েছে, যে নিজে কোনো মুসলমান নয়। এটি সেই তাকওয়া-যার উল্লেখ রয়েছে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবায়। যা বর্ণ, জাতি, গোত্র ও প্রতিটি জাগতিক অহংকারের উর্ধ্বে গিয়ে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

পেট্রোস ইবাকা একজন আল্লাহভীরু। নাস্তিকতা থেকে ক্যাথলিক, আর ক্যাথলিক থেকে আবার নাস্তিকতায় ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করে। তাকে মান্য করে। তাঁর ইবাদতও করে এবং তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে। কিন্তু এসব সে কোনো গির্জায়, মন্দিরে বা মসজিদে গিয়ে করে না। কঙ্গোতে তার জাতির ওপর নেমে আসা অমানবিক নির্মমতা সত্ত্বেও তার ভেতর বিরাজ করছে মানবতার প্রতি গভীর বেদনাবোধ। সে অত্যন্ত সৎ এবং নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত একজন মানুষ। তার সবচেয়ে বড় গুণ হলো, সে শুধুমাত্র আল্লাহভীতির কারণেই প্রলোভন ও লালসাকে পদপিষ্ট করেছে। সে ভোগবাদী নয়, নয় লোভে অন্ধ কোনো মানবাত্মা। সালার প্রায়ই এই মানুষটিকে বুঝে উঠতে পারে না। ইবাকা নিঃসন্দেহে এক বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সালার সিকান্দারকে প্রভাবিত করতে

পারছে মানে, সে যেকোনো মানুষকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম।

এটি পৃথিবীর দুই মেধাবী মানুষের মুখোমুখি সাক্ষাৎ। তাহলে এটি কী করে সম্ভব যে, তাদের একজন প্রভাবিত হবে আর অন্যজন নয়?

: 'সালার সিকান্দার, আমি জীবনে কখনো তোমার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন আর মেধাবী কোনো মানুষ দেখিনি।' বিগত এক মাসে সালারের সঙ্গে একাধিক সাক্ষাতের পর যেন অকপটে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে ইবাকা। প্রত্যুত্তরে সালার কেবল মুচকি হাসিতেই সীমাবদ্ধ রইল। 'আমি নিজে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছি। সেখানে কর্মরত বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তুমি তাদের সবার থেকে আলাদা। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

: 'প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাকো, তোমার এই চাটুকারিতায় চোখ বন্ধ করে তোমার ওপর বিশ্বাস করব, তোমার কথামতো ক্রুশে ঝুলে যাব, তাহলে তুমি ভুল ভাবছ। আমি যা কিছুই করব, ভেবেচিন্তেই করব।'

ইবাকার এই উদার প্রশংসাকে চাটুকারিতা বলে অভিহিত করলেও সালার জানে, ইবাকার কাছে সে এখন সত্যিই এক মাসিহা হয়ে উঠেছে। সালারের রূপে, এই উচ্চপদে বসা এমন একজন মাসিহা সে পেয়ে গেছে, যে বিশ্বব্যাপ্তিকে কাজ করলেও নিজের বিবেককে বড়োজোর, জোর করে অজ্ঞান করতে পারলেও, ঘুম পাড়াতে পারে না। তার হৃদয় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নিতে সদা বদ্ধপরিকর।

: 'তোমার রসবোধ দারুণ! এই গুণটি আমার মধ্যে নেই।' ইবাকা হেসে উত্তর করল। সালার পিঠাপিঠি বলল, 'এখন যে পরিস্থিতিতে তুমি আমাকে ফেললে, এরপর তো আগামী

কয়েক বছরেও এই রসবোধ আমার মধ্যে জন্ম নেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

: আমি বহু মুসলিমের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। কাজ করেছি। মিশেছি। কিন্তু তুমি তাদের থেকে আলাদা। এটি এক অদ্ভুত মন্তব্য। অন্তত সালারের কাছে তা-ই মনে হলো।

: 'আমি কীভাবে আলাদা?' সালার জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: তুমি একজন ভালো মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি একজন ভালো মানুষও। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তারা হয় ভালো মুসলিম ছিল, নয়তো ভালো মানুষ। উভয়টি কেউ ছিল না।

সালার কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। কিছুই বলতে পারল না। আফ্রিকার এই নাস্তিক মানুষটি যেন তার বলার সক্ষমতাই কেড়ে নিয়েছে।

: 'তোমার দৃষ্টিতে ভালো মুসলিম কাকে বলে?' দীর্ঘক্ষণ পর সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমার কথা তোমার খারাপ লাগেনি তো?' ইবাকা হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল।

: না, তোমার কথাটি আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। তবে এটি হলো তোমার মুখ থেকে বের হওয়া প্রথম বাক্য, যাতে তোমার অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

ইবাকা এবার বিভ্রান্ত হলো। তারা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে এখানে আসেনি, কিন্তু ধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক করতে চায়নি, অথচ ধর্ম নিয়ে বিতর্ক চলছে।

: 'ভালো মুসালম? যে খুব বেশি ধর্মচর্চা করে। সমস্ত ইবাদত পালন করে। শুকরের মাংস খায় না, মদ পান করে না,

নাইটক্লাবে যায় না। আমার কাছে সেই এই একজন ভালো মুসলিম। যেমনটা একজন ভালো খ্রিষ্টান বা ভালো ইহুদি। ইবাকা নিজেও জানে না ইসলাম সম্পর্কে তার স্বল্প জ্ঞান সত্ত্বেও যা কিছু সে বলছে, তা সালার সিকান্দারকে লজ্জায় ফেলার জন্য যথেষ্ট। নিজের জন্য সালারের কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট হচ্ছে নামধারী মুসলিমদের জন্য। অর্থাৎ এই স্বল্প জ্ঞানী ইবাকার দৃষ্টিতেও, কেবল ইবাদাতের জন্য একজন হিন্দু ও খ্রিস্টানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইবাদত করলে সবাই সমান, যে ধর্মেরই হোক। তার মধ্যে যদি চারিত্রিক গুণাবলি থাকে, তাহলে সে উত্তম। এই মুহূর্তট সালারের জন্য, নিজেকে নিয়ে ভাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত। ইবাকা তাকে একজন ভালো মানুষ ও একজন ভালো মুসলিম মনে করছে। কিন্তু সত্যিই কি সে সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ? কেবল ইবাদত ব্যতীত তার মধ্যে কি সত্যিই কোনো প্রশংসনীয় মানবিক গুণাবলি আছে, যার ফলে সে একজন ধর্মপরায়ণ ইহুদি বা খ্রিষ্টানের থেকে নিজেকে ভিন্নমাত্রার ভালো মানুষ প্রমাণ করতে পারে?

কঙ্গোর এই জঙ্গলে বসে পেট্রোস ইবাকা যেভাবে ধর্মকে দেখছে, সালার কখনো এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেনি।

: 'এটি আমার দুর্ভাগ্য নাকি নিছক ঘটনাচক্র, জানি না। কিন্তু আমার জীবনে কখনো কোনো ভালো মুসলিম, ভালো খ্রিষ্টান কিংবা ভালো কোনো ইহুদির সঙ্গে উত্তম কোনো অভিজ্ঞতা জন্মায়নি। তারা কেউই আমাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারেনি। আর যারা প্রভাবিত করেছে এবং যাদেরকে আমি আজও ভালো মানুষের তালিকায় রাখি, তারা কখনো ধর্মপ্রাণ ছিল না, আর না তারা কেউ ইবাদতগুজার।' ইবাকা তার কথা সম্পূর্ণ করল।

: 'রেভারেন্ড জনসনের ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?' সালার হঠাৎ বলে উঠল।

: 'ভালো!' ইবাকা হাসল। 'আমার প্রতি তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো আমার আদর্শ হতে পারেননি।'

করছে। : 'কেন?' এই প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতায় সালার অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব

: 'ওই অনুগ্রহের পেছনে তার একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন আমাকে খ্রিষ্টান বানাতে। তাই সেই ধর্ম গ্রহণ করায়, তিনি একজন খ্রিষ্টান শিশু হিসেবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন। একজন মানুষ হিসেবে আমার জন্য কিছুই করেননি। ধর্মকে কারও মন ও মস্তিষ্কে জোর করে ঢোকানো যায় না। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগ পর্যন্ত চার্চে গিয়েছি, তারপর আর যাইনি।' ইবাকা ধীর কণ্ঠে বলে চলছে। হয়তো রেভারেণ্ড জনসনকে হতাশ করার জন্য তার মধ্যে অনুশোচনা ও অনুতাপ হচ্ছে। ইবাকা বলতে থাকল, 'সব ধর্ম নিয়ে আমি অল্লবিস্তর পড়াশোনা করেছি। সবগুলোই ভালো। কিন্তু জানি না কেন, মানুষ যখন এসব ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়, তখন নিজের

ভালো গুণগুলো হারিয়ে ফেলো। তোমার মনে হতে পারে আমি হয়তো দার্শনিকের মতো কথা বলছি।' ইবাকা কথা বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল করল, সালার অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চুপ হয়ে আছে। ইবাকার মনে হলো, সালার হয়তো কথা বলতে আগ্রহী নয়।

: 'না, এতটুকু দার্শনিক তো আমি নিজেও।' সালার হেসে বলল। 'তারপর তুমি আমেরিকা থেকে এখানে কীভাবে ফিরে এলে?' যে প্রশ্নটি সালারকে সবসময় ভাবাত, তা এখন সে করল।

: 'রেভারেন্ড জনসনের কাছে আমি একটি জিনিস শিখেছি, আর তা হলো-আপন মানুষদের জন্য আত্মত্যাগ। নিজস্ব সত্তা পেরিয়ে অন্য কারও কথা ভাবা।

আমেরিকা খুব ভালো ছিল, সেখানে আমার উৎকৃষ্ট ভবিষ্যৎ ছিল। কিন্তু সেটা শুধু আমার ভবিষ্যৎ। আমার জাতির জন্য কিছুই না। আমি কঙ্গোর এক খর্বকায়, তুচ্ছ কৃষগঙ্গ মানুষ। আর

আমেরিকাতেও আমি কঙ্গোরই একজন হয়ে ছিলাম। কিন্তু আমেরিকা ছেড়ে কঙ্গোতে আমি অন্য কিছু হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ফিরেছি।" ইবাকা বিস্তারিত বলে চলল।

: 'আর সেই স্বপ্নটি কী?' সালারের মন পুনরায় অনুসন্ধানী হয়ে উঠল।

: কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হওয়া।

সালারের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

: 'তুমি সজোরে হাসলে না?' ইবাকা প্রত্যুত্তরে বলল।

: তুমি হাসার মতো কিছু বলোনি। হার্ভার্ড কেনেডি স্কুল থেকে পড়াশোনা করে তোমার এমন বড় স্বপ্ন দেখা উচিত।

ইবাকা এবার সালারের কথায় হেসে ফেলল।



এই মাসগুলো সালাবের প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় কাটছে। কী করা উচিত, আর কী করা সম্ভব-এ দুটোর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সে ইবাকাকে সাহায্য না করলেও ইবাকা যেভাবে নিজের অধিকারের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করছে, সালাবের দৃঢ় বিশ্বাস, খুব শিগগিরই কিংবা অল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপ্তির মুখে এক বিশাল কেলেকারির কালিমা লেপন হয়ে যাবে।

প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের সময় এখন পেরিয়ে গেছে। পেট্রোস ইবাকা কেবল এক দরিদ্র কিংবা সোয়াহিলি ভাষাভাষী খর্বকায় একজন কৃষগঙ্গ নয়, যাকে কঙ্গোর জঙ্গলের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। বরং সে এমন একজন মানুষ, যে তার জীবনের বড় একটি অংশ আমেরিকায় কাটিয়েছে। সেখানে তার পরিচিত উচ্চপদস্থ সহপাঠীরা আছে। সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো সাময়িকভাবে তার কোনো কাজে আসছে না

বলে হীনম্মন্য হয়ে পড়েনি সে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে আরও অধিক শক্তিশালী রূপে ফিরে এসেছে। এখন সে কেবল তার পিগমি জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরই নয়; বরং এখন বান্টু গোত্রের বহু মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। যারা পিগমিদের মতোই জঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল এক জাতি।

সালার পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে স্বার্থলোভী মানুষদের চোখে পড়ে যায়। তারা তাকে ইবাকার সঙ্গে মেলামেশা করতে লক্ষ্য করে। সালারের ওপর নজরদারি শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই ইংল্যান্ডের একটি পত্রিকা পেট্রোস ইবাকার সরবরাহ করা তথ্য যাচাই করে একটি কভার স্টোরি প্রকাশ করে। তাতে কঙ্গোর বৃষ্টি-অরণ্য অঞ্চলগুলোতে পিগমি ও বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেই প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে বহু আপত্তি তোলা হয়। ফলে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিশ্বমিডিয়া এই ঘটনা নিয়ে কোনোরূপ সংবাদ প্রচার

ও কভারেজ দমন করতে চেষ্টা করার আগেই, ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশের খ্যাতনামা পত্রিকাগুলোতে সেই নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়ে যায়।

বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ এই অস্থিরতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই সময়ে সালার সিকান্দার বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে কঙ্গোরতে চলমান প্রকল্পগুলো নিয়ে একটি বিস্তারিত ইমেইল পাঠায়। তাতে সে পরিবেশগত বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যও সংযুক্ত করে। তাতে প্রমাণ করে, এভাবে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার একটি বড় পূর্বাভাস দিচ্ছে। এক মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সালারের এই চিঠি ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের জন্য তীব্র উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারপর থেকেই বিভিন্ন অজ্ঞাত উৎস থেকে সালারকে হুমকি দিতে শুরু করে।

এই প্রকল্পগুলো, পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এনে দিচ্ছে। এখন ব্যাংকের নিজস্ব কান্ট্রি হেড

সালার সিকান্দার নিজেই যদি তাদের বিরোধিতা করে, তাহলে কোম্পানিগুলো এবং তাদের পেছনে থাকা আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো নিশ্চুপ দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। আর তাই তারা সালারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এটি সাধারণ কোনো পরিস্থিতি হলে, এতক্ষণে সালার সিকান্দারকে পদত্যাগপত্র দিয়ে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে চাকরিচ্যুত করা হতো। কিন্তু এখন তাকে চাকরিচ্যুত করলে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে চায়ের কাপের ঝড়, কাপের বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে।

বিশ্বব্যাপক তাই এই নিবুদ্ধিতামূলক পদক্ষেপ নিল না; বরং তার ইমেইলের জবাব সতর্কবার্তার মতো করে দিল। তার সরল অর্থ হলো, সালার যেন নিশ্চুপ হয়ে যায়। আর সালারের কাছেও এটি অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি।

ব্যাপক শুধু তার ইমেইলের বিশ্লেষণকেই অপছন্দ করেনি; বরং পেট্রোস ইবাকার সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতে দ্য গার্ডিয়ানে

প্রকাশিত কভার স্টোরির দায়ও তার ওপর চাপিয়ে দেয়। ইবাকার সঙ্গে তাকেও সেই প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সংগ্রাহক জোগানদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করে।

এই অভিযোগ সালার সিকান্দারের পেশাগত জীবনে এক কলঙ্কের মতো। সালার পেট্রোস ইবাকার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছে; তবু কখনো সে তার সঙ্গে ব্যাংকের কোনো তথ্য বা নথি নিয়ে আলোচনা করেনি। ইবাকা কোথেকে এসব তথ্য বা নথি সংগ্রহ করেছে, ইবাকা ছাড়া তা আর কেউ জানে না।

তাদের পাঠানো সতর্কবার্তার জবাবে সালার ব্যাংকে পদত্যাগের প্রস্তাব করল। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, তাকে পূর্ণ নজরদারিতে রাখা হয়েছে। তার ফোন কলগুলো আড়ি পেতে শোনা হচ্ছে এবং তার মেইলগুলো হ্যাক করা হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তার অফিসের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে

গেল। ব্যাংকের অসন্তোষ ও নির্দেশনা সত্ত্বেও সে ইবাকার সঙ্গে না মেলামেশা বন্ধ করল, আর না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল।

পদত্যাগ প্রস্তাবের সঙ্গে সালার বিশ্বব্যাংকে কঙ্গোর বনাঞ্চল প্রকল্পের বিরুদ্ধে তার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনও পাঠায়। সেটি সে তার নিজস্ব অনুসন্ধান ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছে। ফলে প্রত্যাশিতভাবেই তাকে ওয়াশিংটনে তলব করা হলো। এই পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে ইমামার কোনো ধারণাই নেই। সে সন্তানসম্ভবা। সালার নিজে যে চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাতে ইমামাকেও জড়াতে চাচ্ছে না।

: 'সবকিছু ঠিক আছে তো সালার?' রাতে ইমামা সালারের ব্যাগ প্যাক করতে করতে হঠাৎই তাকে প্রশ্ন করল। পাশেই সালার তার ব্রিফকেস গোছাচ্ছে।

: 'হ্যাঁ, এটা জিঙ্কেস করছ কেন?' প্রত্যুত্তরে সালার তাকে জিঙ্কেস করল।



'তুমি ওয়াশিংটনে কেন যাচ্ছ?' ইমামা মূলত তার আশঙ্কাকে কোনো সঠিক প্রশ্নে প্রকাশ করতে পারছে না।

: 'মিটিং আছে। আমি তো এমনিতেই নানান জায়গায় আসা-যাওয়া কর। এবার কেন এমন প্রশ্ন করছ?' ব্রিফকেস বন্ধ করতে করতে সে ইমামার দিকে তাকিয়ে বলল।

: আগে কখনো তোমাকে এতটা অস্থির দেখিনি।

কয়েক মুহূর্ত সালার কিছুই বলতে পারল না। চেষ্টা করেও তার চেহারা স্বাভাবিক করতে পারল না।

: 'না, তেমন কোনো বড় সমস্যা নয়। এতটুকু হতে পারে, চাকরিটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।' ইমামার কাঁধে হাত রেখে বলতে বলতে কথার ভঙ্গি যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সালার। এবার ইমামার হতভম্ব হওয়ার পালা।

: 'চাকরি ছাড়তে হবে? তুমি তো তোমার চাকরি নিয়ে খুব খুশি।' ইমামা বিস্মিত না হয়ে পারল না।

: 'ছিলাম, কিন্তু এখন আর নই।' সংক্ষিপ্ত উত্তর করল সালার। 'কিছু সমস্যা আছে। ফিরে এসে তোমাকে বলব। তুমি নিজের ও বাচ্চাদের খেয়াল রেখো। তারা কোথায়, দেখছি না যে?' খুব সহজেই প্রসঙ্গ পালটে দিল সালার। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, এই পরিস্থিতিতে ইমামা ও তার ছেলে-মেয়েকে কিনশাসায় একা রেখে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু এর কোনো সমাধানও তার কাছে নেই। ইমামার গর্ভাবস্থার শেষ মাস চলছে। ফ্লাইটে ভ্রমণ করতে পারবে না সে। এদিকে ওয়াশিংটনের

এই মিটিং স্থগিত বা বাতিল করার কোনো উপায়ও তার কাছে নেই।

: তুমি তোমার নিজের ও বাচ্চাদের খেয়াল রেখো। আমি মাত্র তিন দিনের জন্য যাচ্ছি, জলদিই ফিরে আসব।

বলতে বলতে সালার বাচ্চাদের রুমের দিকে গেল। নীরবে ঘুমন্ত জিবরিল ও ইনাযাকে আদর করল। কয়েক ঘণ্টা পরই তার ফ্লাইট। 'আমি না আসা পর্যন্ত পরিচারিকাকে কাছেই রাখবো' ইমামাকে নির্দেশনা দিতে দিতে বলল।

: 'আমাদের নিয়ে চিন্তা করো না তুমি। তিন দিনেরই তো ব্যাপার। তুমি তোমার মিটিংয়ের দিকে মনোযোগ দাও। আশা করি সবকিছু সুন্দর হবে।' ইমামা মূলত তার মিটিং নিয়েই দুশ্চিন্তা করছে। আধা ঘণ্টার ভেতরেই তাকে বের হতে হবে। জিনিসপত্র রেডি। শেষ এক কাপ চা পানের জন্য তারা লাউঞ্জে এসে বসেছে। চায়ে প্রথম চুমুক দেওয়ার আগেই সালার তাকে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং সবসময় বাসব।'

ইমামা তার চায়ের কাপ ওঠাতে ওঠাতে থমকাল। অতঃপর হাসল। 'বহুদিন পর আজ কোথাও যাওয়ার আগে এমন কথা বলছ। সবকিছু ঠিক আছে তো?' ইমামা এখন তার হাতে আলতো চাপড় দিল। সালার মৃদু হেসে চায়ের কাপ তুলে নিল।

: হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি বলে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

: একা তো নই আমি। জিবরিল আর ইনায়া আছে আমার সাথে।
তুমি চিন্তা করো

না।

সালার চায়ে চুমুক দিল। ইমামাও চা খেতে লাগল। কিন্তু তার মনে হলো, সালার যেন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

: 'তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও?' জিজ্ঞেস না করে পারল না সে। সালার চা খেতে খেতে হকচকাল। তারপর হেসে উঠল। ইমামা সবসময়ই তাকে বুঝে ফেলে। সবসময়।

: 'একটা কথা বলতে চাই, কিন্তু এখন নয়। ফিরে এসে বলব।' সালার চায়ের কাপ নিচে নামিয়ে বলল।

: 'তোমার এই অভ্যাস আমার একদম অপছন্দ। প্রতিবার কোথাও যাওয়ার আগে আমাকে অস্থির করে যাও। আমি ভাবতেই থাকব, না জানি কী না কী বলবো।' ইমামা সব সময়ের মতো মন খারাপ করল। তার অভিযোগ একদম অযৌক্তিক নয়। সালার সত্যিই সবসময় এমনটাই করে। আর তা ইচ্ছা করেই করে।

: 'আচ্ছা, আর কখনো করব না।' হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল সালার। তার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বাত্ন মেলে ইমামাকে

শেষবারের মতো বুকে টেনে নিল। সব সময়ের মতো উষ্ণ এক আলিঙ্গন।

: 'আই উইল মিস ইউ। তাড়াতাড়ি ফিরো।' ইমামা সব সময়ের মতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল। আর সব সময়ের মতোই সেই একই কথা বলল।

সালারকে বিদায় জানাতে পোর্টে এসে দাঁড়িয়েছে ইমামা। তার গাড়ি স্টার্ট হতেই বিদায়ের ভঙ্গিতে চলন্ত গাড়ির দিকে হাত নাড়ল। গাড়িটি এখন দ্রুতগতিতে লম্বা পোর্ট পেরিয়ে খোলা গেট ধরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। ইমামার মনে হচ্ছে, জীবন আর সময়; দুটোই যেন থেমে গেছে। সালার যখনই কোথাও যায়, সে এই একই অনুভবের শিকার হয়। আজও হচ্ছে। এদিকে গার্ড খোলা গেটটি এখন বন্ধ করে দিয়েছে।

বিয়ের ছয় বছর পর অনেক কিছুই বদলে যায়। জীবন যেন একটা নির্দিষ্ট ছকে চলতে শুরু করে; দিনযাপনের

একঘেয়েমির ছকে। না চাইতেও মানুষ একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। দুই সন্তানের আগমন সালার ও ইমামার জীবনকেও অনেকটা সেই বৃত্তে নিয়ে এসেছে। যেখানে নিজের চাওয়া-পাওয়া পেছনে পড়ে যায়। জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় সন্তান। দাম্পত্যজীবনের শুরুতে যে ভয়, প্রত্যাশা আর ভুল বোঝাবুঝির জালে আটকে থাকে স্বামী-স্ত্রী, তা ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে থাকে। পরিণত হতে থাকে জীবন। তখন বিশ্বাসগুলো এক মুহূর্তেই অবিশ্বাসে রূপ হয় নীরব, বোবা। সম্পর্ক হয়ে ওঠে অভ্যাসে বাঁধা। আর জীবন তখন এমন এক নেয় না। আর অবিশ্বাসগুলোও এক মুহূর্তেই মিলিয়ে যেতে শিখে যায়। অভিমানগুলো রুটিনে পরিণত হয়, যেখানে মানুষ দিন, সপ্তাহ বা মাস নয়; বছরের হিসাবও ভুলে যায়।

ইমামাও ভুলে গিয়েছে। পেছনে ফিরে আর তাকাতে চায় না সে। কেননা, পেছনে কেবলই স্মৃতি। আর স্মৃতিরা কেবল অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রাখতে চায়। পেছনে এখন আর

তার কিছুই বাকি নেই। কেউ নেই। যারা আছে, তাদের চোখে
সে বহু আগেই মরে গেছে!

০৫

বোর্ডরুমের পরিবেশ এখন আর আগের মতো নেই। গম্ভীরতা
প্রতিটি বোর্ডরুমের একটি সাধারণ উপাদান হলেও, আজকের
পরিবেশের এই গম্ভীরতা নিছক গম্ভীরতা নয়-তা একধরনের
শীতলতা। এই শীতলতা কেবল একজন বা দুজনের
অঙ্গভঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ নয়; বোর্ডরুমে উপস্থিত সাতজনের
চোখে মুখেই তা বিরাজমান। এমন এক শীতলতা, যা দুর্বল
মনের যেকোনো মানুষকে মুহূর্তেই জ্ঞানশূন্য করে দিতে পারে।
সকলের অভিব্যক্তিহীন চেহারা, ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতো
দৃষ্টি, বিরস বদনে শক্তভাবে চেপে রাখা চোঁট। খানিক হাসলেও
তা উপহাসপূর্ণ ও অপমানজনক বাঁকা হাসি ছাড়া আর কিছু নয়।
মুখে এসেই যা মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়।



একটি ডিম্বাকৃতি টেবিলের চারপাশে পা তুলে বসে আছে সেই পাঁচজন পুরুষ আর দুজন নারী। তারা সালার সিকান্দারের মতো বিশ্বব্যাপকের বহু হৃদয়বান কর্মীর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিয়েছে। যাদের পেশাগত জীবনের কোনো এক পর্যায়ে হঠাৎ নীতিশিক্ষার আচমকা বোধ হয়, বিবেকের জাগরণ ঘটে। ফলে তারা পেশার বাইরে গিয়ে মানবতার কল্যাণের কথা ভাবতে থাকে। তাদের ক্যারিয়ারকেই ধ্বংস করে দেয় এরা। সালার সিকান্দারও আজ সেই অবস্থায় উপনীত। সেও কঙ্গোদের প্রতি দয়াবান হয়ে চাকরি হারাতে বসেছে। সালার সিকান্দার তাদের কাছে তেমন আর কী! অন্তত এই মিটিং শুরু হওয়ার আগে তারা এমনটাই ভাবছিল। সম্মিলিতভাবে তারা এমনটা না ভেবে থাকলেও, এককভাবে তাদের আচরণে তা-ই ফুটে উঠছে। তারা সাতজনই সালারের পেশাগত জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কেই জানে। আর সালারও তাদের সম্পর্কে ঠিক ততটাই অবগত। তাদের কাউকে কারও কাছে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

মিটিংয়ের সভাপতিত্বকারী প্রধানের সূচনা বক্তব্য সালার অত্যন্ত ধৈর্য ধরে শুনল। তাতে সে সালারের অযোগ্যতা, উদাসীনতা ও ব্যর্থতা নিয়ে বিবৃতি দিল। সালার উপলব্ধি করল, বাকি ছয়জনের দৃষ্টি তার দিকেই স্থির হয়ে আছে। বক্তব্যে মাইকেল ফ্র্যাঙ্ক যেন এই প্রকল্পের ব্যাপারে সালারের ওপর একটি অভিযোগনামা চাপাল। সালারও ঠিক ততটাই নির্লিপ্ত চেহারায়ে সেই অভিযোগগুলো শুনে গেল। এই মিটিংয়ের মূল আলোচ্য বিষয় এটা নয়। তবু সালারের কাছে এসব অভিযোগ অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

: 'এসব অভিযোগের উত্তর দেওয়ার আগে আমি এই প্রকল্প নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দিতে চাই। কেননা আমার ধারণা, এই প্রেজেন্টেশন আমার ওপর তোলা আপনাদের বহু প্রশ্ন ও আপত্তির উত্তর দিয়ে দেবো' সালার মাইকেলের সূচনা বক্তব্যের পর কোনো অভিযোগের উত্তর না করে বলল। বোর্ডরুমের কেউই তার প্রেজেন্টেশনে আপত্তি করল না। সেই

সঙ্গে তারা কেউই এই প্রেজেন্টেশনের ধরন বা উদ্দেশ্য জানার আগ্রহও দেখাল না।

প্রজেক্টরে সালার একের পর এক স্লাইড দেখাতে লাগল। এই স্লাইডগুলোতে রয়েছে বিপুল তথ্য ও পরিসংখ্যান। এতে তার নিজের ব্যক্তিগত গবেষণাও রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই প্রকল্প চালু হলে, তাতে আফ্রিকার বন্যপ্রাণী এবং পিগমি জনগোষ্ঠীর সম্ভাব্য ধ্বংস সম্পর্কে ভয়াবহ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে সেখানে। এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সনদের কোন কোন ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে, কঙ্গোর অরণ্যে বিভিন্ন কোম্পানির চলমান প্রকল্পগুলোর ফলে স্থানীয় জনগণের ওপর চালানো শোষণের প্রামাণ্য দলিল, সেই সাথে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও এনজিওগুলোর উদ্বেগভিত্তিক রিপোর্ট-সবই তার প্রেজেন্টেশনে উঠে এসেছে।

এই প্রেজেন্টেশনটি যদি কোনো পত্রিকা বা সংবাদমাধ্যমের হাতে পৌঁছে যায়, তাহলে এটি বিশ্বব্যাংকের ইতিহাসে

আফ্রিকায় সবচেয়ে বড় কেলেক্সারির প্রতিবেদন সাব্যস্ত হবে। বোর্ডরুমে উপবিষ্ট সাতজন ব্যক্তি নিষ্পৃহ চেহারায়, নিঃশব্দে তার অর্ধঘণ্টার প্রেজেন্টেশনটি দেখল। প্রেজেন্টেশন শেষ হতেই তাদের সবার মনে কেবল একটি আশঙ্কাই উঁকি দিল, এই মুহূর্তে সালার সিকান্দারের হাতে একটি গ্রেনেড রয়েছে। যে গ্রেনেডের পিন খুলে সে তা হাতে ধরে আছে। এই গ্রেনেড অন্য কারও দিকে ছুড়ে দিলে, এই সাতজন বেঁচে যাবে এমন নয়। বরং এটি যেখানেই বিস্ফোরিত হোক, ধ্বংস এখান থেকেই শুরু হবে।

প্রজেক্টরের স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল। সালার ল্যাপটপ বন্ধ করতে করতে উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল। তাকাল, সভাপতির আসনে উপবিষ্ট মাইকেলের দিকেও। এত বছরের পাবলিক ডিলিং অভিজ্ঞতার পর, সালার অন্তত এটুকু বুঝতে পারছে যে, এই প্রেজেন্টেশন তৈরি করে এখানে উপস্থাপন করে সে তার সময় নষ্ট করেছে।

: 'তাহলে কি তুমি এই প্রকল্পে কাজ করতে চাচ্ছ না?' মাইকেল অবশেষে নীরবতা ভেঙে সালারকে জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্নটি যেন তাদের ব্যাপারে সালারের মনের সন্দেহকে সত্য প্রমাণ করল।

: 'আমি চাই, বিশ্বব্যাংক কঙ্গোর এই প্রকল্পটি বন্ধ করে দিক।' মাইকেলের মতো সালারও কোনো ভূমিকা ছাড়াই তার অবস্থান জানিয়ে দিল।

: 'তুমি হাস্যকর কথা বলছ। তুমি কি মনে করেছ যে, তোমার মতো নিচু পদের একজন অফিসারের কথায় এত দীর্ঘ বছরের প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংক বন্ধ করে দেবে? সেটাও তোমার মনে হঠাৎ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনুভব জেগে উঠেছে বলেই?' জুলিয়া পারওয়ার্ড উত্তর করল। তার কথায় ছিল বিদ্রূপ ও কটাক্ষের মিশেল। মাইকেলের পর সে-ই এই কক্ষে সবচেয়ে সিনিয়র।

: 'মানবাধিকার রক্ষা করা যদি কোনো ফোবিয়া হয়ে থাকে, আর আমি তার শিকার হই। কিংবা এটি যদি আমার মানসিক কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এই রোগ এখন কঙ্গোর জঙ্গলে বসবাসকারী লক্ষাধিক মানুষের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে।' সালার সিকান্দার দ্ব্যর্থহীনভাবে উত্তর করল।

: 'তুমি মূলত কী? কোন অবস্থানে তুমি কঙ্গোতে আছ? বিশ্বব্যাংকের একজন কর্মচারী হিসেবে, নাকি একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে? কঙ্গোর মানুষজন কিংবা পিগমি জনগোষ্ঠী তোমার মাথাব্যথার বিষয় নয়। তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই প্রকল্পটি যেন তার সব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়।' এবার কথার তীক্ষ্ণ জবাব দিল আলেকজান্ডার রাফায়েল। সে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহকারীদের একজন।

: 'তুমি কি তোমার চাকরির চুক্তিনামা পড়ে দেখেছ? ওখানে লেখা যেসব শর্ত ও নিয়মের প্রতি সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর

করেছিলে, সেসব খেয়াল করেছ? এখন তুমি তোমার চুক্তির লঙ্ঘন করছ। তাই ব্যাংক তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার পূর্ণ অধিকার রাখে।" রাফায়েলের কণ্ঠের রুক্ষতাই তার পরিচয়। সে এই রুক্ষতা ও নির্দয়তার জন্যই পরিচিত। সালার এখানে উপস্থিত সকলকে শুধু তাদের যোগ্যতা অনুযায়ীই নয়; বরং তাদের বৈশিষ্ট্যও জানে।

: 'আমি আমার চুক্তিনামা পড়েছি। তা শুধু একবার নয়, বহুবার পড়েছি। আমি বিশ্বব্যাংকের চার্টারও পড়েছি। আমার কন্ট্রাক্টে কিংবা বিশ্বব্যাংকের চার্টারে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার বা কোনো দেশের আইন লঙ্ঘন করে, এমন কিছু কোথাও লেখা নেই। এমন কোনো ধারা যদি আমার চুক্তিনামায় থেকে থাকে, আর আমি তা এড়িয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আপনি আমাকে সেই রেফারেন্স দিন। এখনই আমি আমার চুক্তিনামা পড়ে দেখে নিই সেটা।' বলতে বলতে সালার পুনরায় তার ল্যাপটপ অন করল।

রাফায়েল কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না। তার কপালে ভাঁজ পড়ে আছে। ধারাবাহিক চাপের ফলে সেই ভাঁজগুলো এখন স্থায়ী রেখায় রূপ নিয়েছে। ভুল করে কখনো একটু হাসলে তাকে খানিক কোমল দেখাত। আর নয়তো রুম্ফতা শুধু তার স্বভাবেই নয়, তার চেহারাতেও সর্বদা স্পষ্ট। সে তার কাচের মতো তীক্ষ্ণ চোখ ফিরিয়ে সালারকে লক্ষ্য করে বলল, 'বহু বছর গবেষণা করে এ প্রকল্পটি যারা শুরু করেছে, তুমি কি নিজেকে তাদের চেয়ে অধিক যোগ্য ভাব? তুমি কি ভাব যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের বৈধতা যারা দিয়েছে, তারা সব নির্বোধ?' সালারকে এবার সে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগল।

: 'না, তারা নির্বোধ নয়; আর আমিও নই। তবে তারা সৎ নয়; কিন্তু আমি সৎ। এটি সেই সততা, যা এই প্রকল্পের বৈধতা দেওয়ার সময় তারা উপেক্ষা করেছে। নয়তো তারা এতটা অন্ধ ও অযোগ্য নয় যে, এসব কিছুই তাদের চোখে পড়েনি। যেসব এখন আমি স্পষ্টভাবে দেখছি, আমার মতো দেখছে ওখানকার

আরও লক্ষ লক্ষ স্থানীয় মানুষজন; তারাও তা দেখেছিল। এই প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের পুনরায় তদন্ত করা উচিত। আমার বিশ্বাস, তদন্ত কমিটি যদি সততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে তারাও আমার মতোই এসব ত্রুটি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশাল ক্ষত দেখতে পাবো। সালার সিকান্দার রাফায়েলের অপমানজনক মন্তব্যগুলো উপেক্ষা করে যুক্তিসংগত উত্তর করল।

: 'আমার মনে হয়, এই প্রকল্প নিয়ে যে অচলাবস্থা তোমাদের ওয়াশিংটন ও গোম্বের অফিসে তৈরি হয়েছে, তা কাটানোর জন্য একটি কাজ করা দরকার।' এবার কথা বলল জিউলস। সে ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের মিডিয়া কো-অর্ডিনেশন বিভাগ পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। এই প্রকল্প সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদগুলো দমন করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও প্রভাবের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে অত্যন্ত ধৈর্য ও কোমল স্বরে সালারকে যেন পরামর্শ দিয়ে বলল, 'তুমি তোমার কথামতো পদত্যাগ করে

নাও। যেমনভাবে তুমি তোমার প্রেজেন্টেশন ও ব্যাংকের সঙ্গে অফিশিয়াল চিঠিপত্রের যোগাযোগেও বলে এসেছ যে, এভাবে এই প্রকল্প তুমি আর চালাতে পারবে না।’

: 'এই অপশনটি বিশ্বব্যাংকের কাছে যদি অধিক উপযুক্ত মনে হয়, তবে আমারও এতে কোনো আপত্তি নেই। আমিও এই সমস্যার সমাধান আমার পদত্যাগেই দেখছি। তবে আমি আমার পদত্যাগের কারণগুলোর মধ্যে প্রেজেন্টেশন উল্লিখিত সকল পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করব। এবং তাতে আমার আপত্তিগুলোও যুক্ত করে, সোর্ট জনসম্মুখে নিয়ে আসব।’

বোর্ডরুমে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। যার জন্য সালারকে কঙ্গো থেকে ওয়াশিংটনে ডাকা হয়েছে, যেসব তথ্য বিশ্বব্যাংকের গলার কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে, আলোচনা ঘুরেফিরে এখন সেই প্রসঙ্গতেই ফিরে এসেছে। বোর্ডরুমে উপস্থিত এই সাতজন মানুষের কাছে এখন কেবল দুটি কাজই অবশিষ্ট রয়েছে। হয়তো, এই প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে সালারকে

রাজি করানো এবং তাকে বিশ্বব্যাপ্তি পাঠিয়ে তার রিপোর্টটি ফিরিয়ে নিতে বলা। আর নয়তো চুপচাপ তার থেকে পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করা এবং এই পদত্যাগের কারণ হিসেবে শুধু সালারের ব্যক্তিগত সমস্যা উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া তাতে আর অন্য কোনো কারণ উল্লেখ করা যাবে না। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সালার এটি মানতে নারাজ। সে তার পদত্যাগপত্রে বিস্তারিত রিপোর্ট উল্লেখ করতে চাচ্ছে এবং সেটি জনসমক্ষে প্রকাশও করবে বলছে।

পরবর্তী তিন ঘণ্টা যাবৎ বোর্ডরুমে উপবিষ্ট সাতজন ব্যক্তি তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা তার ওপর সম্ভাব্য সকল কৌশল প্রয়োগ করে ফেলেছে। যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে, তারা তার পদত্যাগপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। তাতে কয়টি ধারা উল্লেখ করে দিল।

১. আপনি আপনার কর্মকালীন জীবনে জানা সমস্ত পেশাগত বিষয় গোপন রাখতে বাধ্য।



২. আপনি যদি এই পদত্যাগপত্র প্রকাশ করেন, কিংবা এ রিপোর্ট মিডিয়ার কাছে নিয়ে যান, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. আর এর জন্য শুধু আপনাকে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণই দিতে হবে না; বরং ভবিষ্যতে ব্যাংক কিংবা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ছোট বা বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আপনাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

সালার জানে এটি নিছক ছোটখাটো কোনো হুমকি নয়; বরং অনেক বড় একটি হুমকি। তারা পরোক্ষভাবে তাকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, এমন কিছু করলে তারা তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে। শুধু বিশ্বব্যাপকেই নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাতেও তার কোনো চাকরি হবে না। আর সালারও জানে যে, তারা সত্যিই এটি করতে সক্ষম। এসে এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন এক অবস্থানে

কাজ করছে, এখানে তার বিরুদ্ধে সামান্য একটি আইনগত মামলা তার অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকের সুনাম চিরতরে নিঃশেষ করতে যথেষ্ট। মামলায় আভ্যুক্ত হলে কোনো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা তাকে কোনো চাকারতে নেবে না। কারণ, সে তার চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, তার পেশাগত গোপনীয়তার শর্ত লঙ্ঘন করেছে। এটি তার সুখ্যাতির ললাটে এমন এক কলঙ্ক-তিলক, যা সে কখনো মুছতে পারবে না।

তারা তাকে আরও হুমকি দেয় যে, আমাদের কোনো তথ্য প্রকাশ করলে, বিশ্বব্যাংকে তোমার অধীন প্রকল্পটি পুনরায় নিরীক্ষণ করে, তার অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য অনিয়মের প্রমাণ সংগ্রহ করে তোমাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে, বর্তমান পদ থেকে বহিস্কার করবে। আর যদি তুমি এই প্রতিবেদন নিয়ে মিডিয়ার কাছে যাও, তাতে আমাদের কিছুই হবে না। কারণ, ব্যাংকের পক্ষ থেকে তোমাকে প্রতিরোধ করার অনেক যুক্তি রয়েছে। তোমাকে বরখাস্ত করার পর, ওসব তুমি মিডিয়ার কাছে নিয়ে গেলে, মিডিয়া তোমার প্রমাণগুলোকে কেবল

তোমার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও ক্ষোভহিসেবেই দেখবো। তারা ভাববে, তোমাকে চাকরিচ্যুত করেছি বলেই তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এসব করছ।

এটি নীচতর একটি ব্ল্যাকমেইলিং। সালার জানে, তারা চাইলেই এটা করতে পারে। মিডিয়া-ক্ষমতা তাদের হাতেই। বিশ্বব্যাংক কখনোই তার আর্থিক ও পেশাদার সততার ওপর আঙুল তুলতে পারেনি। এ বিষয়ে তার রেকর্ড ছিল ঈর্ষণীয়। কিন্তু সে জানে, বিশ্বব্যাংক যদি চায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন কঙ্গোর প্রকল্পে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ বের করতে, তাহলে তারা নিশ্চিত তা বের কর ফেলবে। সে কিংবা পৃথিবীর অন্য কেউই বিশ্বব্যাংকের অডিট টিমের ছুরির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদেরকে যদি আর্থিক অনিয়ম খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়, তবে তারা তা খুঁজে বের করবেই।

সাধারণ অবস্থা হলে, সালার নিজেকে কখনোই এতটা কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলত না। বিশেষ করে এখন যেহেতু তার একটি

পরিবার আছে, তার ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী-সন্তান আছে। কিন্তু এটি কোনো সাধারণ অবস্থা নয়। পেট্রোস ইবাকা তাকে এসব বাস্তবতা উপেক্ষা করতে দেয়নি। তাকে এসব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। এটাই ছিল তার দুর্ভাগ্য।

সে আফ্রিকা ও পিগমিদের নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ভাবতে শুরু করেছে। আর এই আবেগই এখন পথের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নীরবে পদত্যাগ করে এই পুরো ঘটনা থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেলার মানে হলো, একবিংশ শতাব্দীর এই দশকে পিগমিদের সাথে সংঘটিত এই অপরাধ কর্মের অংশীদার হওয়া। সে চাইলেই প্রতিবাদকারী পিগমিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইতিহাসের অংশ হতে পারবে। কিন্তু ইতিহাসের অংশ হওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। তার ইচ্ছা কেবল এই অমানবিক কাজে বাধা দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে মুক্তি লাভ করা। আর নয়তো এই অপরাধবোধ তাকে চিরকাল দংশন করে যাবে।

চাপ ও হুমকি যত বাড়ছে, সালার সিকান্দারের জেদও ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিকান্দার উসমান যে বলে থাকেন, জেদের ক্ষেত্রে সালারের মতো কেউ নেই, তা

তিনি ঠিকই বলে থাকেন। তার সেই দৃঢ়তা ও জেদের একটি বাস্তব প্রদর্শনী সে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে দিয়ে এসেছে। এমন মানুষদের সামনে তা দেখিয়েছে, যারা তার মতো সাধারণ পদের মানুষকে ইচ্ছামতো বাঁকিয়ে ফেলতে পারে মোমের নাকের মতো।

: 'তুমি কী চাও?' তিন ঘণ্টা পর অবশেষে মাইকেল তার জেদের কাছে হার মেনে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি চাই, এমন একটি নিরপেক্ষ তদন্ত টিম গঠন করা হোক, যারা এই প্রকল্পের পুনঃপর্যালোচনা করবে। অতঃপর পিগমি ও বৃষ্টি-অরণ্যের কল্যাণকর স্বার্থে এই প্রকল্প বন্ধ করে দেবে। অথবা এমন কোনো সমাধান বের করবে, যা এই বনাঞ্চলে

বসবাসকারী মানুষ মেনে নেবে। বনাঞ্চলে বসবাসকারী বলতে আমি ওখানকার স্থানীয় মানুষদের কথা বলছি। স্থানীয় সরকার ও তাদের কর্মকর্তাদের কথা বলছি না।" জবাবে সালার সিকান্দার সেই একই আবেদন পুনরাবৃত্তি করল, যা সে তার প্রেজেন্টেশনে উল্লেখ করেছে।

: 'তোমার মূল্য কী?' অ্যালেক্সান্ডারের এই প্রশ্ন যেন সালারকে নির্বাক করে দিল। এই হেডকোয়ার্টারে বসে সে অন্যদের থেকে নরম-গরম সব রকমের কথাই প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য এমন প্রস্তাবের প্রত্যাশা সে করেনি।

: 'এমন কোনো না কোনো জিনিস তো অবশ্যই আছে, যার জন্য তুমি তোমার এই দাবি থেকে সরে আসবে। আমাদের বলো, কী সেই জিনিস, যা পেলে তুমি আমাদের সাথে এই বিকিকিনি করবে?' রাফায়েল তার কথা জারি রেখে বলল। সালার টেবিল থেকে তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

'আমার কোনো মূল্য নেই। বিশ্বজুড়ে নিজের পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার জন্য পরিচিত এমন মানুষদের সঙ্গে কাজ করব ভেবেই আমি বিশ্বব্যাংকে জয়েন করেছিলাম। কিন্তু এটা ছিল আমার ভুল ধারণা। আমি দালালদের সঙ্গে কাজ করতে চাইলে, বেচাকেনা ও দরদামের বিজনেস করতে চাইলে, স্টক এক্সচেঞ্জে কাজ করতাম। অথবা কোনো ব্যাংকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং করতাম।' শান্ত স্বরে সালার যেন তাদের মুখে জুতা ছুড়ে মারল। আর সেহ জুতার আঘাতে একযোগে সাতজনই একই তীব্রতা অনুভব করল।

সালার সরল ভাষায় তাদের দালাল বলেছে, আর তা ঠিকই বলেছে। তার সঙ্গে লেনদেন করতেই এদেরকে পাঠানো হয়েছে। লেনদেন সম্পূর্ণ হলে বিভিন্ন রূপে তারা এ থেকে কমিশন পেত। তারা মূলত বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ লবির প্রতিনিধি। বাহ্যিকভাবে তারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করলেও, আসলে তারা বড় বড় কর্পোরেট সেক্টরের স্বার্থ রক্ষা

করে চলে। যেসব সেক্টর তাদের দেশীয় সরকারগুলোর আড়ালে কাজ করে, তাদের স্বার্থরক্ষা করে।

বোর্ডরুমে উপস্থিত সাতজনের কেউ আর কিছুই বলল না। নিস্তন্ধ-চওড়া চেহারায সবাই তাদের কাগজপত্র ও ল্যাপটপ সামলাতে লাগল। মিটিং কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়ে গেল। সালারও উপলব্ধি করল, এই মিটিংয়ের পর বিশ্বব্যাপ্তে তার ক্যারিয়ারও শেষ হয়ে গেছে।

সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি মিটিংয়ের মতোই এটিও নিশ্চয় রেকর্ড করা হয়েছে। সালার এমনটাই ভেবেছে। কিন্তু সে এটা প্রত্যাশা করেনি যে, মিটিংটি তখন লাইভআকারে অন্য একটি জায়গাতেও প্রচারিত হচ্ছিল। তার মানে সালার সিকান্দার বোর্ডরুম থেকে বের হওয়ার আগেই, তাকে দমন করার জন্য অন্য আরেকটি কৌশল ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

আলেকজান্ডার রাফায়েল বোর্ডরুম থেকে সালারের পেছন পেছন বেরিয়ে, তার সঙ্গে আলাদাভাবে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাইল। সালার খানিক বিস্মিত হলেও তাতে সম্মত হলো। কী এমন কথা, যা বোর্ডরুমে বলা সম্ভব নয়! একান্ত সাক্ষাতে বলতে হবে? মিটিংয়ে এমন কিছু কথাও বলা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাংকের মতো স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে শোনার প্রত্যাশা সে করেনি। সেখানে একযোগে সবার মুখ থেকে শোনার প্রত্যাশা করা তো অনেক দূরের কথা! এই ঘটনায় সে শুধু হতাশই হয়নি; বরং তার মনোবলও ভেঙে গেছে। কারণ, বিশ্বব্যাংকে সে এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে যোগ দেয়নি।

সালার আলেকজান্ডার রাফায়েলের অফিসে গেল বোর্ডরুমের মতোই কিছু কথা শোনার প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু এখানে এসে দেখল রাফায়েলের আচরণ অদ্ভুতভাবে

সম্পূর্ণ ভিন্ন।



: 'তোমার রিপোর্টটি অনেক প্রশংসনীয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি ভীষণ মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি নই, প্রেসিডেন্টও।' তার প্রথম বাক্যটিই সালারকে অবাক করল। রাফায়েল একটি কফির কাপ সালারের সামনে রেখে, নিজের জন্য আরেকটি কাপ হাতে তুলে তার আসনের দিকে চলে গেলাসে প্রেসিডেন্ট বলতে বুঝিয়েছে রালফ এডগারকে। যিনি এখন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। রাফায়েল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহকারীদের একজন। বরং বহুদিক বিবেচনায় তাকে প্রেসিডেন্টের ডান হাত মনে করা হয়।

চেয়ারে বসতেই রাফায়েলের ভাঙ্গ বদলে গেল। ঠোঁটের হালকা বাঁকের ফলে তার মুখের কঠোরতা কিছুটা কমে গিয়েছে। একে কেবল অভিধানের ভাষায় 'হাসি' বলা যায়। কিন্তু এটি সেই প্রচলিত হাসির অর্থ বহন করছে না।

আফ্রিকার ব্যাপারে তার যে পরিকল্পনা, একমাত্র তুমিই তা বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। : 'প্রেসিডেন্ট সবসময়ই তোমার কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা রেখেছেন। আর এই প্রকল্পটি কেবল শত শত প্রকল্পের মধ্যে ছোট একটি প্রকল্পমাত্র। তোমার ব্যাপারে তিনি যা ভাবছেন, সেটা আরও অনেক বড় কিছু। তোমার মাধ্যমেই আফ্রিকার ভাগ্য বদলে দেওয়া সম্ভব। তোমাকে আমি এই নিশ্চয়তাও দিচ্ছি যে, আফ্রিকা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভীষণ সিরিয়াস। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি প্রকৃতপক্ষেই সেখান থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর রোগ-শোক মুছে ফেলতে চান। পেট্রোস ইবাকা এক নির্বোধ মানুষ। সে এমন কিছু লোকের হাতের খেলনা হয়ে গেছে, যারা আফ্রিকার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়।'

আলোচনায় পেট্রোস ইবাকার নাম শুনে সালার অবাক হলো না। কেননা, ওয়াশিংটনে বসা হর্তাকর্তারা খুব ভালো করেই জানে, তার মত পরিবর্তনের পেছনে কার হাত রয়েছে।

: 'তুমি কোনো প্রশ্ন করলে না যে?' তার নীরবতা রাফায়েলকে বিরক্ত করছে। প্রেসিডেন্টের প্রশংসামূলক বাণী শুনিye সালারকে রাজি করাতে চেয়ে থাকলে, এটি তার ব্যর্থতা। কেননা, এতে সালারের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

: আমার যা প্রশ্ন ছিল, সেগুলো আমি ইতিমধ্যে আমার রিপোর্টে তুলে ধরেছি। আফ্রিকায় আমার কাজ আর এই রিপোর্ট দেখে প্রেসিডেন্ট মুগ্ধ হয়েছেন শুনে আমি খুশি হলাম। তবে আমি আরও বেশি খুশি হব, এই রিপোর্টের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পেলো।

: 'ব্যাংক তোমাকে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ দিতে চায়। আর এটি প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে চান বলেই। এই মাসেই দুজন ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় পদ থেকে অব্যাহতি পাবেন। তার মধ্যে একটি পদে তারা তোমাকে নিয়োগ দিতে চান। এ বিষয়ে আমেরিকান গভর্নমেন্টের সঙ্গেও তাদের কথা হয়েছে। তারাও এতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

তারাও চায় তোমাকে তোমার যোগ্যতা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করতে।" রাফায়েল এমনভাবে কথা বলছে, যেন সে বড় কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করছে। এমন তথ্য, যা শুনে রীতিমতো সালার সিকান্দারের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যাবে। কিন্তু তার সামনে উপবিষ্ট সাঁইত্রিশ বছর বয়সি এই যুবকের চেহারা যখন এ সংবাদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখল না, তখন সে যারপরনাই হতাশ হলো।

: আর ভাইস প্রেসিডেন্টের পদের বদলে আমাকে কী করতে হবে?

এত দীর্ঘ বক্তব্যের পর প্রত্যুত্তরে তার মুখে রাফায়েল এমন স্পষ্ট ও স্বাথহীন প্রশ্নের প্রত্যাশা করেনি।

: 'এই প্রজেক্টে প্রেসিডেন্ট তোমার পরিপূর্ণ ও নিঃশর্ত সমর্থন চান।' রাফায়েল এখন ফাঁকা বুলি বা কথার দীর্ঘসূত্রিতা বাদ দিয়ে

সরাসরি বলল। কারণ, সে বুঝে গিয়েছে, সালারের কাছে এসব কথা অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক।

: 'আমার মনে হয়, আমি সেটা দিতে পারব না। এই প্রকল্পের ব্যাপারে আমার মতামত ও অবস্থান, তা আমি আগেই জানিয়েছি। সুবিধা বা পদ আমার অবস্থান বদলাতে পারবে না। আমি ইচ্ছা করছি, প্রেসিডেন্ট যদি আফ্রিকার জন্য সত্যিই সহানুভূতি ও আন্তরিকতা রাখেন, তাহলে তিনি শুধু এই প্রতিবেদনে মুগ্ধই থাকবেন না। বরং অবিলম্বে এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেবেন। আপনি কি আর কিছু বলতে চান?'

সালার তার সামনে রাখা কফির কাপটিতে আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়াল না। আলেকজান্ডার রাফায়েল বিশ্বের বহু বড় বড় সংস্থায় নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে কাজ করেছে। এই সাক্ষাতের পূর্বে সালার সিকান্দার সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না। এখন সে তাকে একটি নির্বোধ মনে করেছে। কারণ, সাঁইত্রিশ বছর বয়সে, প্লেটে তুলে তাকে এমন বড়

একটি পদ দেওয়া হচ্ছে, আর সে তা নিশ্চিন্তে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এটা যদি তার অহংকার হয়ে থাকে, তাহলে তা অনর্থক। যদি নিবুদ্বিতা হয়, তবে তা চরম পর্যায়ে। আর যদি এটি জেদ হয়, তবে তা উদ্দেশ্যহীন। রাফায়েল তার জীবনে কখনো কোনো বুদ্ধিমান মানুষকে এতটা নিবোধ ও নিঃস্বার্থ হতে দেখেনি। বিষয়টি স্বীকার করতে চায়নি সে, তবু করছে। রাফায়েল এই প্রথম বুদ্ধিমত্তাকে এমন নিঃস্বার্থ দেখছে। কেননা সে জানে, সালার যে জগতে কাজ করছে, সেখানে এই নিঃস্বার্থ বুদ্ধিমত্তা কখনোই শীর্ষে পৌঁছাতে পারে না। তারপর সে সালারকে উদ্দেশ্য করে বলল-'তুমি সবকিছু জানো, কেবল কৌশল জানো না। তাই তুমি কখনো সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারবে না।' রাফায়েল এমন কথা বলতে চায়নি, তবু বলে ফেলল।

: 'কৌশলী হওয়ার অর্থ যদি হয় বিবেকহীন ও অসৎ হওয়া, তাহলে আমি জীবনে কখনো এই গুণ অর্জন করতে চাই না। আজই আমি আমার পদত্যাগপত্র মেইল করব।' বলতে বলতে



সালার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিদায়ি হ্যান্ডশেকের জন্য সালার তার টেবিলে খানিক ঝুকে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সে সালারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। সালার তার রুম থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। রাফায়েল একদৃষ্টে তার চলে যাওয়া পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল। কেন তাকিয়ে রইল, তা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

সালার সিকান্দার এখন বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। এখানে সে ক্যাবে করে এসেছিল। আর ক্যাবে করেই ফেবার কথা। কিন্তু গত কয়েক ঘন্টায় ভেতরে যা ঘটেছে, এতে সে সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ফুটপাতে হাটতে লাগল। এখান থেকে তার হোটেল কাছেই। হেঁটে গেলে আধাঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টায় পৌঁছে যেতে পারবে। আসার সময় তার তাড়া ছিল, ফেবার পথে নেই। টিপটিপ বৃষ্টিতে ঠান্ডা বেড়ে গিয়েছে। তবে সে স্যুটের ওপর নং কোট পরে আছে। গোস্বে থেকে রওনা হওয়ার সময়ই সে ওয়াশিংটনের আগামী তিন দিনের আবহাওয়ার

পূর্বাভাস পড়েই রওনা হয়েছে। জীবনের বড় একটি অংশ আমেরিকায় কাটানোর ফলে, সে যেন এক বাঁধাধরা ও যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে আগে থেকেই খোঁজখবর নিয়ে নেয়। বিশ্বব্যাপ্তকের এই চাকরিটিকেও সে এমনই যান্ত্রিক ও পেশাদার মানসিকতায় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন যে বিড়ম্বনায় ভুগছে, তা তার কল্পনাতেও কোনোদিন আসেনি।

পিএইচডি সম্পন্ন করার পর এটিই তার প্রথম চাকরি। এই চাকরি নিয়ে খুব সন্তুষ্ট ছিল। এখন সে শুধু বর্তমান নিয়ে চিন্তা করে না। কোনোকিছু করার আগে আগামী পাঁচ, দশ বা পনেরো বছরের কথা মাথায় রেখেই করে। কারণ, এখন তার সঙ্গে আরও কিছু জীবন এবং জীবনের দায়িত্বও জড়িয়ে আছে। আর ঠিক এই সময়টিতেই সে তার পেশাগত জীবনের সবচেয়ে বড় সংকটে জড়িয়ে পড়েছে। তার কাঁধে যদি স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব না থাকত, তবে সে এতটা দুশ্চিন্তা করত না। কারণ, তখন যেকোনো সিদ্ধান্ত নিলে, তার ফল তাকে একাই ভোগ করতে হতো। তার

কোনো সিদ্ধান্তের ফলে অন্য কাউকে কোনো ক্ষতির শিকার হতে হতো না। কিন্তু এখন? ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে অজান্তেই একটা দীর্ঘ শ্বাস নিল।

কয়েক দিন আগেও সে নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম মানুষ মনে করত। আর এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে অকাজের মানুষ মনে হচ্ছে। এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় সময় যাচ্ছে তার। আপাতত করার মতো কিছুই নেই। না আছে কোনো মিটিং, কোনো ভিজিট, কোনো অ্যাজেন্ডা, ফোনকল বা কোনো ইমেইল। এমনকি কোনো প্রেজেন্টেশনও নেই। কিন্তু ভাবার মতো আছে অনেক কিছু।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, কী হবে সমঝোতা করে ফেললে? এখান থেকে পুনরায় সদর দপ্তরে ফিরে গেলে? একটু আগেই আমাকে যে প্রস্তাবটি দেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণ করে নিলে? এ তো কোনো জটিল-কঠিন বা অসম্ভব কিছু নয়। এখনো সবাকছু আমার হাতেহ

আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবন সুযোগ-সুবিধা, পদমর্যাদা। মন্দ কী হতো, সে যদি তার বিবেককে কিছুক্ষণের জন্য ঘুম আবার আগের মতো হয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপ্তকে আগের চেয়েও বড় পদ, পদোন্নতি, পাড়িয়ে রেখে সবকিছু মেনে নেয়? কঙ্গো তো তার দেশ নয়। আর না পিগমিরা তার স্বজাতি। তাহলে?

তাহলে? তাহলে রাফায়েলই ঠিক বলেছিল। সে কেন তাদের জন্য এসব করছে? আর এসব করতে করতে নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখানে সামনে কূপ, আর পেছনে খাদ। কিন্তু তখনই তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল ওই সমস্ত দরিদ্রতা ও দুরবস্থা, যা সে সরাসরি সাক্ষাৎকারে দেখেছে। সেই আশাপূর্ণ চোখগুলোর কথা তার মনে পড়ল, যে চোখগুলো তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে ছিল। নথিপত্রের সেই ভূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, যার প্রতিটি শব্দ তাকে বলছিল, এখানে যা হচ্ছে, তা মানবতার অপমান। এটি দাসত্ব ও শোষণের নতুন রূপ। যে দাসত্ব ও শোষণ চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করেছে।

এসব কথার ভিড়ে তার ইমামার কথাও মনে পড়ল। পকেট থেকে সেলফোন বের করে ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে তাকে কল দিল। কিন্তু সংযোগ হলো না। সিগন্যালের কোনো সমস্যা হবে হয়তো। ফোনটি পুনরায় সে পকেটে ঢুকিয়ে নিল। এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ও একাকিত্ব তাকে ঘিরে ধরল। যদিও ফুটপাতে তার আশেপাশে সারি সারি মানুষ যাচ্ছে। রাস্তাজুড়ে চলছে ব্যস্তসমস্ত গাড়ির বহর। তবু এক অদ্ভুত একাকিত্ব অনুভব করছে সে। যেমন একাকিত্ব অনুভব করত ইমামার অনুপস্থিতিতে।

: 'আমার মনে হয়, আমার জীবনে কোনো শান্তি নেই। কিছুক্ষণ সবকিছু ঠিক থাকে, তারপর আবার কিছু না কিছু এলোমেলো হতে শুরু করে।' ইমামার মুখে সে বহুবার এ কথাটি শুনেছে। শুনেও কখনো তাকে বলতে পারেনি যে, এটি শুধু তোমার জীবনেই নয়, আমার জীবনটাও ঠিক এমনই। কোথাও না কোথাও এলোমেলো হয়েই যায়।



ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে বহুদিন পর সালার সিকান্দার তার সাঁইত্রিশ বছর জীবনের অর্জনগুলোর প্রতি চোখ বোলাল। নিঃসন্দেহে অসংখ্য নিয়ামত সে পেয়েছে। এত যে, তা গণনা করতে বসলে গণনাও ভুলে যাবে। কিন্তু শান্তি ছিল না। অশান্তি যেন কোনো অভিষাপের মতো তার জীবনে চেপে বসেছে। অশান্তির কারণ খুঁজে পেতেও সে অক্ষম। সে একজন হাফেজে কুরআন, আমলি মুসলিম, ইবাদত ও বান্দার হক আদায়ে আদর্শ পুরুষ, গুনাহ থেকে তাওবাকৃত, নিয়ামতে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রশান্তির আশায় অস্থির হৃদয়, যেন শূন্যতায় ভুগছে সে। তার চিন্তার গতি হঠাৎ থেমে গেল। নিজের প্রতি অবাক হলো। কোন সংকটে, কী নিয়ে ভাবতে বসে পড়েছে?

সে পরীক্ষায় পড়েছে। কিন্তু এত বড় পরীক্ষাও নয় যে, তাকে তার সমস্ত জীবনের অর্জন নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবতে হবে! এই টিপটিপ বৃষ্টিতে, বিশ্বব্যাকের সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে অদ্ভুতভাবে অস্থির করে তুলছে। সে তার সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল। এটি হয়তো মানসিক চাপের কারণে হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেবে সে নিজেকে প্রশান্ত করার চেষ্টা করল।

হোটেল রুমে পৌঁছে ল্যাপটপ-ব্যাগ রেখে স্বাভাবিকভাবেই সে টিভি চালু করল। একটি স্থানীয় চ্যানেলে ভোরে ওয়াশিংটনে সংঘটিত একটি ট্রাফিক দুর্ঘটনার খবর হচ্ছে। দুজন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে। তৃতীয়জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। চ্যানেলে এখন ভাঙাচোরা গাড়িটিকে ঘটনাস্থল থেকে সরানো হচ্ছে। লংকোট খুলতে খুলতে রিমোট চেপে সালার চ্যানেল পরিবর্তন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্ক্রিনে চলমান একটি সংবাদ দেখে সে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তাতে দুর্ঘটনার বিস্তারিত তথ্য দেখানো হচ্ছে। আহত ব্যক্তির নাম পেট্রোস ইবাকা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। যিনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট ও বিপ্লবী। তিনি এখানে সিএনএন-এর একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। সালার যেন মুহূর্তেই চেতনাশূন্য হয়ে গেল।

পৃথিবীতে হাজারো পেট্রোস ইবাকা থাকতে পারে। কিন্তু কঙ্গোতে পিগমিদের হয়ে লড়াই করা পেট্রোস ইবাকা ছিল একজনই। সালার গত কয়েকদিন ধরে আমেরিকায় আছে। এখানে আসার আগে ইবাকা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ইবাকা তখন তাকে বলেছিল, 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ পিগমিদের নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর কয়েকটি বড় নিউজ চ্যানেলে প্রোগ্রাম করার সুযোগ পেয়েছে সে। এগুলো অবশ্য তার কিছু বন্ধুবান্ধব বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে।

: 'তার মানে, অবশেষে ছুরিটা আমার গলায় পড়তে চলেছে।' সালার হেসে তাকে বলেছিল। 'তুমি যদি এই প্রকল্প নিয়ে

বিশ্বব্যাংক ও তার কর্মকর্তাদের সমালোচনা করো, তাহলে কর্মকর্তাদের মধ্যে সবার আগে আমিই নজরে আসব। আর এই চ্যানেলগুলো তখন আমার প্রতিক্রিয়া জানতে মরিয়া হয়ে উঠবে।

পেট্রোস ইবাকা চ্যানেলগুলোতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার পর সালার যে কতটা জটিল পরিস্থিতিতে পড়তে যাচ্ছে, তা সে বুঝতে পারছিল। যে আগ্নেয়গিরি দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তা এখন বিস্ফোরিত হতে চলেছে। আর এটি বিস্ফোরিত হলে অনেককেই ধ্বংস করে দেবে।

: 'আমি তোমাকে বাঁচাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।' ইবাকা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল। 'আমি তোমার সমালোচনা করব না, বরং আমাকে সমর্থন করার জন্য তোমার প্রশংসা করব। তুমি তো এখন এসেছ, কিন্তু এই প্রকল্প তো তুমি আসার বহু আগে থেকেই চলছে।' ইবাকা ছিল অত্যন্ত গম্ভীর। কিন্তু সালারের মতো সেও জানত, তার এই আশ্বাস কেবল এক মিথ্যে সান্ত্বনা।

কেননা, সালার সিকান্দার এখন এই প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে তো এখানে কেবল কয়েক দিনের জন্য আসেনি। প্রকল্পের খুঁটিনাটি জেনেই সে এখানে যোগ দিয়েছে। সে এই প্রকল্পের একজন অফিসার মানেই তাকেও গণমাধ্যমের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। ইবাকার প্রশংসা বিশ্বব্যাংকের প্রশাসনের চোখে তার ভাবমূর্তি নষ্ট করবে। আর গণমাধ্যমের প্রশ্নে তার নীরবতা তার ভাবমূর্তি নষ্ট করবে বিশ্ববাসীর চোখে।

: 'তুমি যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বব্যাংক ছেড়ে দাও। আমি তোমার রিপোর্টে উল্লেখ করব, তুমি এই প্রকল্পে সন্তুষ্ট ছিলে না। আর তাই এই পদ ছেড়ে দিয়েছ।' ইবাকা যেন তাকে এক পথ দেখিয়েছিল।

: 'তার আগে আমি অবশ্য একটি চেষ্টা করব। ব্যাংক যাতে এই প্রকল্পটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করে, সেজন্য।' উত্তরে সালার বলেছিল। ইবাকা তার জন্য যে পথ খুঁজে বের করেছিল, তা

সালার আগে থেকেই জানে। পদত্যাগের আগে তবু সে একটি শেষ চেষ্টা করতে চাচ্ছিল। তার এতটুকু প্রত্যাশা ছিল, ব্যাংক তৎক্ষণাৎ প্রকল্পটি বন্ধ করে না দিলেও, অন্তত তদন্তের একটি আদেশ দিতে পারে। এত বিশদ তথ্য ও যুক্তি থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক চোখ বন্ধ করে বধির ও মূক হয়ে বসে থাকবে, তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এ নিয়ে ইবাকা আর তার সঙ্গে কোনো তর্ক করেনি। ওটাই ছিল তাদের শেষ যোগাযোগ।

ওয়াশিংটনে রওনা দেওয়ার পর থেকে সালার টিভি-চ্যানেলে ইবাকা ও কঙ্গোর বৃষ্টি-অরণ্য সম্পর্কিত নতুন সংবাদের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু নতুন সংবাদ সে আজই পেল। নিউজ চ্যানেল জানাচ্ছে, বেঁচে যাওয়া যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। সালার কিছুক্ষণ অবশ দেহে ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফোন করে খোঁজ নিতে চেষ্টা করল, ইবাকাকে এখন কোথায় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার! হঠাৎ তার ফোন যেন কোথাও সংযোগ হতে পারছে না। একটু আগে সে কঙ্গোতে ইমামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে

পারেনি। আর এখন সে কোনো লোকাল কলও করতে পারছে না। কিছুক্ষণ নিজের সেলফোন দিয়ে সংযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে সালার বিরক্ত হয়ে হোটেল রুমের ফোন লাইন ব্যবহার করার চেষ্টা করল। এটাও কোনো কাজ করছে না। সালার অবাক হলো। এটি একটি ফাইভ-স্টার হোটেল। এর ফোন লাইন কাজ করছে না, এ তো বিস্ময়কর ব্যাপার! সে ইন্টারকমে অপারেটরের মাধ্যমে একটি কল বুক করে, আধাঘন্টা যাবৎ সেই অপারেটরের কলের অপেক্ষা করতে লাগল।

এই প্রথম তার দুশ্চিন্তা লাগছে। মনে হচ্ছে, তাকে হয়তো কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সে এই সন্দেহ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিছু না ভেবে, অস্থির-অশান্ত মনে রুম থেকে বেরিয়ে সোজা রিসেপশনে চলে এলো। এবার নিজে কোথাও কল না করে, সে রিসেপশনিস্টকে বলল, আজ সকালে ওয়াশিংটনে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে কোথায় নেওয়া হয়েছে, তা আমাকে পুলিশ ইনকোয়ারির মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানান। রিসেপশনিস্ট তাকে

লবির একটি সোফায় বসতে বলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সালারকে সেই হাসপাতালের নাম জানিয়ে দিল। সালার পুনরায় রিসেপশনিস্টকে তার কঙ্গোর বাসার ফোন নম্বর ও ইমামার সেলফোন নম্বর দিল। পরের কলটি সালার ওখানেই করতে চাচ্ছে। যেন সে তার মনে উকি দেওয়া আশঙ্কার সত্যতা যাচাই করতে চাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে রিসেপশনিস্ট তাকে বলল, তার বাড়ির নম্বর বা ইমামার সেলফোন, কোনোটাতেই কল করা যাচ্ছে না। হয়তো কঙ্গো ও আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ সমস্যা হচ্ছে ভেবে, মুহূর্তেই সালারের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সে ভাবল, আমি হয়তো অযথাই সন্দেহ করছি। মাথা ঝেকে সবকিছু ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। তারপর রিসেপশনিস্টকে তার রুমের ডাইরেক্ট ফোন লাইন কাজ করছে না বলে অভিযোগ করে, পেট্রোস ইবাকার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিল।

হাসপাতালে পৌঁছে ইবাকাকে খুঁজে বের করা কঠিন হয়নি। কিন্তু সালারকে তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। ইবাকা এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। অপারেশনের পর তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। তবে নিজেকে ইবাকার আত্মীয় পরিচয় দেওয়ায়, দূর থেকে এক ঝলক দেখার অনুমতি সে পেলে।

হাসপাতালের আইসিইউতে নল, তার আর ব্যাভেজে জড়ানো ইবাকাকে দেখে, প্রথমবার সালার তাকে চিনতেই পারল না। এই কৃষ্ণাঙ্গ খাটো মানুষটিকে সে তার মোটা চকচকে চোখ আর সদা প্রাণবন্ত হাসির জন্য চিনে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠাও ছিল তার অভ্যাস। তার মোটা কালো ঠোঁটের ফাঁক গলে দেখা যেত দুধসাদা দাঁত আর মাড়ি। হেসে উঠলেই সেগুলো নজরে পড়ত সবার আগে। সালার নির্বাক দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সে শুধু পিগমিদের নয়-কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নও দেখত। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল আর জন এফ. কেনেডি স্কুল অফ গভর্নমেন্ট থেকে

স্নাতকোত্তর অসামান্য মেধাবীদের একজন পেট্রোস ইবাকা।
যদি জীবন তাকে সুযোগ দিত, হয়তো একদিন সে কঙ্গোর
প্রেসিডেন্ট হয়ে যেত এবং আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের
মধ্যে তার নাম থাকত। কিন্তু জীবন এই মুহূর্তে তাকে সেই
সুযোগ দিচ্ছে না।

এখানে দাঁড়িয়ে সালারের মনে পুনরায় উদয় হলো, সে চাইলে
এখনো সবকিছু ঠিক করে ফেলতে পারে। বিশ্বব্যাপ্তির দেওয়া
প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতে পারে। কেননা, ইবাকা তো মারাই
যাচ্ছে। সে মারা গেলে তার সঙ্গে সব সত্য ও প্রমাণ হারিয়ে
যাবে। হয়তো কুদরত তাকে আরও একটি সুযোগ দিচ্ছে। সে
বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ ও প্রলুব্ধ হলো। বিবেকের চাবুক পুনরায় তার
গায়ে এসে পড়ল। এবার বিবেকের চাবুকই কেবল তাকে নাড়া
দিল না; বরং হোটেলে ফেরার পর তার জন্য যে বড় দুর্দশাটি
অপেক্ষা করছে, সেটিও তাকে নাড়া দিল।

রুমে পৌঁছে দেখল, তার লকার খুলে পড়ে আছে। তাতে রাখা পাসপোর্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি নেই। শুধু তা-ই নয়, তার ল্যাপটপ এবং রিপোর্টের সব প্রমাণ সংরক্ষিত সেই ব্যাগটিও উধাও। কয়েক মুহূর্ত সালার কিছুই বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হচ্ছিল, এটা তার রুম নয়। হয়তো ভুল করে অন্য কারও রুমে ঢুকে পড়েছে। রুম থেকে বেরিয়ে সে দরজায় রুম নম্বর পড়ে দেখল। এটি ছিল এক নিরেট নিবুদ্ধিতামূলক কাজ। কিন্তু না করে সে পারল না। নিশ্চিত হলো এটি তারই রুম।

চেতনাশূন্য হয়ে সে পুনরায় রুমে প্রবেশ করল। পাগলের মতো তন্নতন্ন করে রুমের প্রতিটি কোণ খুঁজে দেখতে লাগল। এক অদ্ভুত অলীক আশায় ভাবতে লাগল, সে হয়তো মানসিক চাপের কারণে জিনিসপত্র অন্য কোথাও রেখে গিয়েছে। কিন্তু রুমের কোথাও কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব খোঁজা শেষ। এটি একটি ফাইভ-স্টার হোটেল। হোটেল কর্তৃপক্ষ যদিও রুমে রাখা মূল্যবান জিনিস হেফাজতের সরাসরি দায়িত্ব নেয়নি, তবু সালারের বিশ্বাস হচ্ছিল না, এখানে এমন কিছু ঘটতে পারে।

শুধু শুধুই কেউ কেন তার ট্রাভেল ডকুমেন্টস আর ল্যাপটপ নিয়ে যাবে? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, কে নিয়েছে এসব?

প্রচণ্ড রাগের মাথায় তৎক্ষণাৎ কল করে সে ম্যানেজারকে রুমে ডেকে আনল। তখনো তার বিশ্বাস ছিল, করিডোরে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অপরাধীকে সহজেই শনাক্ত করা যাবে। কিন্তু ম্যানেজার ও নিরাপত্তা গার্ডরা যখন বলল, পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গত দুই ঘণ্টা যাবৎ সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে, তখন সালার যেন দিকশূন্য হয়ে গেল। এটি অবিশ্বাস্য। তার মনে হচ্ছে, তার দেহ থেকে হাত-পা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তার কাছে যা ছিল, তার সবটাই ছিল ল্যাপটপ আর ব্যাগের মধ্যে। এগুলো হারিয়ে যাওয়ার মানে হলো, সে যেন হাত-পাশূন্য হয়ে গিয়েছে। সে তার রিপোর্টের কোনো অভিযোগ বা তদন্ত, কোনো ডকুমেন্টারি প্রমাণ ছাড়া প্রমাণ করতে পারবে না। সেই ডকুমেন্টারি প্রমাণের একটি কপি তার সাথে নিয়ে এসেছিল।



আর আরেকটি কপি গোশ্বেতে তার বাসার লকারে ইমামার দায়িত্বে দিয়ে এসেছে।

এই প্রথম সালার এক অদ্ভুত ভয় অনুভব করছে। যেসব ঘটনাকে সে কাকতালীয় মনে করেছে, সেগুলোকে এখন জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর তা খুব সহজেই জোড়া লেগেও যাচ্ছে। সন্দেহপ্রবণ মানুষ নয় সে। আর না ষড়যন্ত্রমূলক তত্ত্বে বিশ্বাসী কেউ। কিন্তু এই একদিনে যা ঘটেছে, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। পেট্রোস ইবাকার দুর্ঘটনাও তার কাছে এখন আর আকস্মিক ঘটনা মনে হচ্ছে না। এর পেছনে কেউ একজন রয়েছে, যে ইবাকাকে আহত করে, তার সমস্ত ডকুমেন্ট চার করে, তার হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে, তাকে বিকলাঙ্গ করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে তার মাথায় কেবল ইমামা ও তার সন্তানদের সুরক্ষার কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

একটি ফোন বুথ থেকে সে আবারও কঙ্গোতে তার বাসায় ফোন করার চেষ্টা করল। ফলাফল পূর্বোক্ত। তার মস্তিষ্ক পুরো নিভেজ



হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সে ইমেইল ও সোশ্যাল মেসেজিংয়ের মাধ্যমে ইমামার সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো ইমেইল বা মেসেজের উত্তরও এলো না। সালার পাগলের মতো তার পরিচিত অফিসের প্রতিটি ব্যক্তিকে কল করতে শুরু করল। কিন্তু কারও সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না। অবশেষে সে পাকিস্তানে সিকান্দার উসমানকে ফোন করল। সিকান্দারের কণ্ঠ শুনে সালার কিছুক্ষণ বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, অবশেষে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছে সে। সিকান্দার উসমানও তার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলেন যে, সালার চিন্তিত।

সালার কোনো বিস্তারিত কথা না বলে, সংক্ষেপে উনাকে জানাল যে, ট্রাভেলের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেছে সে। তাই পরবর্তী ফ্লাইটে ফিরতে পারছে না। এদিকে ইমামার সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। সে সিকান্দারকে পাকিস্তান থেকে ইমামাকে ফোন করতে বলল। তার সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে, যেন ফরেন অফিসে গিয়ে পরিচিতদের

সহায়তায় কিনশাসায় অবস্থিত পাকিস্তানের দূতাবাসের মাধ্যমে তার খোঁজ নেন। এবং ইমামাকে বলেন, লকারের সমস্ত ডকুমেন্ট নিয়ে সে দ্রুত দূতাবাসে চলে যায়। এই ঘটনায় সিকান্দার উসমান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

: এমন কী হয়েছে যে, তোমার এসব করতে হচ্ছে? সব ঠিক আছে তো সালার?

: 'পাপা! আপাতত আপনাকে যা বলছি তা-ই করুন। বিস্তারিত আমি আপনাকে পরে জানাব।' সালার খানিক বিরক্ত হলো। 'কিছুক্ষণ পর আমিই আপনাকে কল করে জিজ্ঞেস করব। আপনি আমার ফোনে কল করবেন না। এমনকি আমার নম্বরে কোনো মেসেজও পাঠাবেন না।' সিকান্দারকে সে অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলল।

: 'সালার! তুমি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলছ।' সালারের এমন নির্দেশনার পর সিকান্দার উসমান খানিক ভয়ে থাকবেন এটাই

স্বাভাবিক। সালার কল কেটে দিল। সে তার বাবাকে বলতে পারছে না যে, এই মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা উনার চেয়েও বেশি খারাপ। ফোন বুথের পাশের একটি বেঞ্চে বসে অবচেতনভাবেই সে নিজেকে তিরস্কার করছে। কঙ্গোতে স্ত্রী-সন্তান ফেলে রেখে এখানে আসা ঠিক হয়নি তার। এই পরিস্থিতিতে মিটিং জাহান্নামে যেত। মিটিংয়ের ডেট পিছিয়ে দেওয়াও যেত। এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল!

এখন রাত হয়ে আসছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত তার ফোনে কোনো কল বা টেক্সট মেসেজও আসেনি। তার ফোন মনিটর কন্ট্রোল না করা হলে, তার সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ না করা হলে, এমনটা হতো না। ফোনের সিগন্যাল এখন অনেক ভালো দেখাচ্ছে। তবু তার বিশ্বাস, তার ফোন ও কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা কেন? সালারের তা বুঝে আসছে না। তারা তার ক্ষতি করতে চাইলে সরাসরিই করতে পারে। এসব কৌশলের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনটা পেট্রোস ইবাকার সাথে করেছে। তারা তাকে ব্যাংক থেকে বের করে দিতে চেয়ে

থাকলে, সেটা তো সালার নিজেই পদত্যাগ করেছে। তাহলে এসব এখন কেন করা হচ্ছে? তার মেরুদণ্ডে যেন একটি শিহরন বয়ে গেল। হঠাৎ তার অনুভূত হলো, তারা হয়তো তাকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, তাকে নজরদারি করা হচ্ছে। তারা চাইলেই তার ক্ষতি করতে পারবে। আর কী কী ক্ষতি করতে পারবে, তাও যেন বলে দিচ্ছে ইঙ্গিতে।

তাকে বোঝানো হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক এসব করতে পারে না। কেবল বিশ্বব্যাংকই নয়, বরং তাকে সিআইএ মনিটর করেছে। সে বুঝতে পারছে না, শরীর থেকে ঝরে পড়া ঘামের কারণ কী, ঠান্ডা নাকি উষ্ণতা? কিন্তু সালার কিছুক্ষণ পানিতে ডুবে রইল। তার মাথা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেছে। সে কখনো কল্পনাও করেনি এমন কোনো জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে, যেখানে সিআইএ তার পিছু নেবে। এখন সে বুঝতে পারছে, এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের ইচ্ছায় নয়; বরং আমেরিকার ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হচ্ছিল। আর এটি সম্পূর্ণ করতে তারা যেকোনো পর্যায়ে যেতে পারে।

দেড় ঘন্টা ধরে সে মূর্তির মতো এখানে এভাবেই বসে আছে; পানিতে গা ডুবিয়ে। তিন দিনের জন্য সে ওয়াশিংটনে এসেছিল। তৃতীয় দিন চলে যেত। কিন্তু এখন ট্রাভেল ডকুমেন্ট হারানোর ফলে তার বিশ্বাস হয়ে গেল, খুব দ্রুতই সে ফিরে যেতে পারবে না। অন্তত তাদের দাবিগুলোতে কিছুটা নমনীয়তা না দেখানো পর্যন্ত।

দেড় ঘন্টা পর সে পুনরায় সিকান্দার উসমানকে ফোন করল। তিনি তাকে জানালেন, ইমামা ও তার বাচ্চারা বাসায় নেই। বাড়ি তালাবদ্ধ। সেখানে কোনো কর্মচারী বা দারোয়ানও নেই যে, তাদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারে। এম্ব্যাসির কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কঙ্গোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা বলেছে, 'এখনই তার পরিবারের খোঁজ দেওয়া যাচ্ছে না। কিছুটা সময় লাগবে।' এতটুকু তথ্যই তার শরীরে কম্পন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট। তাকে না বলে তার স্ত্রী-সন্তান কোথাও যেতে পারে না। বাড়ির দারোয়ানরাও তো ছিল ব্যাংকেরই নিয়োগ

করা। তাহলে বাড়ি তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারাও কীভাবে
ওখান থেকে চলে গেল?

: 'আমি খুব দ্রুতই ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি। দূতাবাসে
যোগাযোগ করে ভিসার ব্যবস্থা করছি। আমি নিজে ওখানে
গিয়ে পুরো ব্যাপারটি দেখছি।' সিকান্দার উসমান তাকে সান্ত্বনা
দেওয়ার চেষ্টা করলেন। 'তুমিও ওখানে দ্রুত পৌঁছানোর চেষ্টা
করো।

আমেরিকান নাগরিক। সুতরাং তারা পাকিস্তানের দূতাবাসের
চেয়ে বেশি তৎপর হয়ে আমেরিকান দূতাবাসে তাদের নিখোঁজ
বিজ্ঞপ্তি দাও। তুমি ও তোমার বাচ্চারা তো খোঁজ নিবো।'
সিকান্দার উসমান তাকে একটি পথ দেখালেন এবং সেটি
নিঃসন্দেহে সুন্দর একটি পথ। কিন্তু তিনি তো জানেন না যে,
সালার ইতিমধ্যে আমেরিকান সরকারের সঙ্গেই জট পাকিয়ে
ফেলেছে।

বিগড়ে যাইনি যে, তোমার পরিবার এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবে।
সিকান্দার উসমান : 'সব ঠিক হয়ে যাবে সালার! দুশ্চিন্তা করো
না। কঙ্গোর পরিস্থিতি এখনো এতটা আগে কখনো কঙ্গোতে
থেকে থাকলে, কখনোই তিনি এমন কথা বলতেন না। উনি
ভাবছেন, তার ছেলে আমেরিকান নাগরিক, সেই সাথে
বিশ্বব্যাংকে নিযুক্ত অফিসার। সুতরাং তার পরিবারের কোনো
সমস্যা হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে বলার মতো সালারের কাছে
কিছুই নেই, কিছুই না। আজ সে কথার কথা নয়, বরং
বাস্তবিকই বোবা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় তার ইচ্ছা করছে
গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে। কল কেটে সে বুথ থেকে বাসার
দিকে রওনা দিল।

হোটেলে ফিরতে তার মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল। কিন্তু এই পাঁচ
মিনিট তার কাছে হাজার বছরের মতো মনে হচ্ছিল।
ওয়াশিংটন তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনে ভরপুর। একটি
ফোন কলের মাধ্যমেই সবাইকে সে জড়ো করে ফেলতে
পারে। কিন্তু কোনো জমায়েতই তার সমস্যার সমাধান করতে

পারবে না। এই পরীক্ষা যেন বজ্রপাতের মতো তার মাথায় এসে পড়েছে। তার চেয়ে বেশি প্রচণ্ডভাবে তার স্ত্রী-সন্তানের মাথায়। হোটেল রুমে ফিরে দরজা বন্ধ করেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। অবচেতনেই চিৎকার করতে শুরু করল। হোটেলের সপ্তম তলায় ডাবল-গ্লোজড কাচের সাউন্ডপ্রুফ রুমের দরজা বন্ধ করে, দরজায় ঠেস দিয়ে, পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল। ঠিক সেভাবে, যেভাবে বহু বছর আগে মারগালার পাহাড়ে এক অন্ধকার রাতে, গাছের সাথে দড়িবাঁধা হয়ে চিৎকার করছিল।

অসহায়ত্বের সেই চরম অবস্থা সে আজও অনুভব করছে। আগের চেয়েও তীব্রভাবে। তখন যা হয়েছিল, তা কেবল নিজের সাথেই। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা তার স্ত্রী আর শিশু বাচ্চাদের সাথেও। তারা কোনো কষ্টে আছে, এটা ভাবতেই যেন তার নিজেকে ক্রুশে ঝুলন্ত মনে হচ্ছে। কোনো ভুল হয়ে থাকলে, সেটা তার ব্যক্তিগত। এতে তার পরিবারের দোষ কোথায়? পেট্রোস ইবাকার মতো তারা যদি তাকে মেরেও

ফেলত, তাও মেনে নিত। এমনকি ইবাকার মতো এমন হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকলেও তার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইমামা, জিবরিল, ইনায়া, আর সেই সন্তান-যে এখনো পৃথিবীতে আসেইনি, তাদের কী দোষ?

যারা তাকে পঙ্গু করে ফেলতে চাচ্ছে, তারা নিঃসন্দেহে তাতে সফল হচ্ছে। তার যদি তাকে নতজানু করার ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে সে নতজানু হয়ে পড়েছে। তার যদি তাকে মুখ খুবড়ে ফেলার ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে সে এখন মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। এই রাতটি তার জন্য প্রচণ্ড পাহাড় হয়ে উঠেছে। কতবার যে হোটেল থেকে বেরিয়ে ফোন বুথে গিয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। ওখানে গিয়ে সিকান্দার উসমানকে ফোন করে ইমামা ও সন্তানদের খোজ নিয়ে আবার হোটেল ফিরে আসছে। পুরো রাত সে এক মুহূর্তের জন্যও দুচোখ বন্ধ করতে পারল না। ইমামা, জিবরিল আর ইনায়ার চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

পরদিন সকালে, অফিস খোলার অনেক আগেই সে বিশ্বব্যংকের সদর দপ্তরে পৌঁছে গেল। আলেকজান্ডার রাফায়েল তার অফিস রুমে প্রবেশ করতে করতে সালার সিকান্দারকে অত্যন্ত শান্তভাবে লক্ষ করল। এ সেই সালার নয়, যে গতকাল এখানে এসেছিল। এক দিন ও এক রাত যেন তাকে পাহাড় থেকে ধুলোয় পরিণত করে দিয়েছে।

: আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অফিসে ঢুকেই তার মুখে সরাসরি এই কথাটি প্রত্যাশা করেনি রাফায়েল। তার ধারণা ছিল, সালার হয়তো বলবে, সব শর্ত মেনে নিতে রাজি। কিন্তু সে বলছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু।

: 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা... এটা তো খুব কঠিন। অন্তত এই মাসে তো তা সম্ভব নয়ই। তাছাড়া উনার সাথে দেখা করার প্রয়োজনটাই-বা কেন পড়ল তোমার? তুমি যদি গতকালের

কথাগুলোই আবার উনাকে বলতে চাও, তাহলে আমি তা ইতিমধ্যেই উনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

আজ রাফায়েল গতকাল বোর্ডরুমে বলা কথার সুরে কথা বলছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সালার বুঝে উঠতে পারল না, কী বলবে। বিশ্বব্যংকের সদর দপ্তরে বসে সে কান্না করতে চাচ্ছে না। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে। অবশেষে এটি ছাড়া তার আর যেন কিছুই করার নেই।

: 'গতকাল থেকে কিনশাসায় আমার পরিবার নিখোঁজ। আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে।' গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে রাফায়েলের চোখে চোখ রেখে বলতে শুরু করল সে।

: 'ওহ! শুনে খুব খারাপ লাগল। তোমাকে তো তাহলে অবিলম্বে কঙ্গো ফিরে যাওয়া উচিত। পুলিশের সহায়তায় তোমার পরিবারকে যাতে উদ্ধার করতে পারো। কঙ্গোর যে

পরিস্থিতি, সেখানে খুব কম নিখোঁজ ব্যক্তিকেই সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু তবু...।" রাফায়েল এমনভাবে কথা বলছে, যেন কোনো পত্রিকার সংবাদ পাঠ করছে। সালারের ঘটনায় তার চোখে-মুখে সামান্যতম আফসোস বা সহানুভূতির ছোঁয়াও নেই। সালার তার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার পাসপোর্ট আর সব কাগজপত্র হারিয়ে গেছে। হোটেল রুম থেকে সবকিছু গতকালই উদ্ধাও হয়ে গেছে। তাই এখন আমি কালই কিনশাসায় ফিরতে পারব না। আমার পাসপোর্ট ও অন্যান্য ডকুমেন্টের জন্য সদর দপ্তরের সাহায্য প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক থেকে অবিলম্বে আমার কিছু ডকুমেন্ট লাগবে, যাতে আমি পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারি।'

রাফায়েল তার কথা নীরবে শোনার পর অত্যন্ত শীতল ও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'এই পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক তোমাকে নতুন পাসপোর্টের জন্য কোনো চিঠি দিতে পারবে না। কেননা, তুমি আজই পদত্যাগ করেছ। আমার মনে হয়, তোমার উচিত

স্বাভাবিক নিয়মে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা। তারপর একজন ভিজিটর হিসোর কঙ্গো যাওয়া।

তুমি যদি বিশ্বব্যাংকের কর্মচারী হতে, তাহলে আমরা তোমার পরিবারের জন্য যেকোনো পদক্ষেপ নিতাম। কিন্তু এখন তারা ও তাদের নিরাপত্তা আমাদের সংস্থার দায়িত্ব নয়। তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, কিনশাসায় আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমার পরিবারের জন্য সাহায্য চাও। অথবা পাকিস্তান দূতাবাসের কাছে। তুমি জন্মগতভাবে পাকিস্তানেরই না?' আলোচনার শেষে রাফায়েল যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে, অবুঝের মতো তাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, যেন সে দ্বৈত নাগরিক। সালার তার তচ্ছল্য-ভরা বিষ বাক্যটি যেন মধুর মতো গিলে নিল। বিশ্বব্যাংকের কর্মীদের ক্ল পাসপোর্ট দেওয়া হয়। এখন সেই পাসপোর্ট পেতে হলে তাকে পুনরায় সদর দপ্তর থেকে সুপারিশপত্র নিতে হবে। কিংবা বিশ্বব্যাংক নিজেই তার পক্ষ হয়ে আবেদন করে সেই পাসপোর্ট এনে দিতে পারবে। কিন্তু রাফায়েলের স্পষ্ট

প্রত্যাখ্যান সালারের ভেতরে চলমান উত্তেজনাকে আরও
উসকে দিল। বিশ্বব্যাংকের প্রতি যতটা ঘৃণা এখন জন্মাচ্ছে,
জীবনে কখনো কোনো পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের প্রতি এতটা প্রবল
ঘৃণা তার জন্মায়নি।

সালার তার জীবনের সেরা বছরগুলো এবং সেরা দক্ষতা
পশ্চিমাদের দিয়ে আসছে। জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা এবং
এই বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে গতকাল পর্যন্ত সে একটি বিশেষ
পদমর্যাদা নিয়ে আসত। আর আজ ওরা তার সঙ্গে এমন ব্যবহার
করছে, যেন সে একজন ভিক্ষুক। একটি অকেজো, অব্যবহৃত
মানুষ, বিশ্বব্যাংককে দেওয়ার মতো যার কাছে আর কিছুই
নেই। তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সভ্যতার উন্নতির জন্য যেটুকু
সততা, আন্তরিকতা ও বিবেকের প্রয়োজন, তারা ততটুকুই
চায়। তাদের স্বার্থের বাইরে বাড়তি কোনো সততা ও মানবতার
প্রয়োজন নেই। মানবতা জিনিসটি তাদের বস্তুবাদী লালসার
কাছে কিছুই নয়; যে বস্তুবাদী লালসাকে তারা উন্নতি বলে
ডাকে। আর এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় সালার সারা জীবন ঘুরে

বেড়িয়েছে। জীবনের কিছু ক্ষণ, মানুষের জীবনে পরিবর্তনের লগন নিয়ে আসে। তুমুল পরিবর্তনের লগন। মাত্র এক মুহূর্ত, যা মানুষকে অসংখ্য বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে আজ দ্বিতীয়বার তার জীবনে সেই মুহূর্ত এসেছে। এসেছে সেই লগন।

প্রথমবার মারগালা পাহাড়ে মৃত্যুভয়ের কবলে ছেড়ে দিয়েছিল অতীত জীবনধারা। আর আজ, দ্বিতীয়বার, তার স্ত্রী-সন্তানদের মৃত্যুভয় এবং বিশ্বব্যাকের হাতে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে, যে সিদ্ধান্ত নিতে এতদিন দ্বিধাশ্রিত ছিল। কিছু কিছু ভয় সমস্ত ভয়কে নিঃশেষ করে দেয়। সালার সিকান্দারের সঙ্গেও আজ তা-ই হচ্ছে। এখানে বসে বসে সে সিদ্ধান্ত নিল, আগামী দশ বছরে বিশ্বব্যাকের থেকেও বড় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। সে বিশ্ব-অর্থনীতি ব্যবস্থাকে উলটে দিবে: যে ব্যবস্থার ওপর পশ্চিমা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। সারা জীবন সে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে

পড়াশোনা করেছে। পশ্চিমাদের ব্যাপারে প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছে। কিন্তু পশ্চিমার অনুগত হতে পারেনি কখনোই।

অপমান খুব কম মানুষকেই অনুগত করে তোলে। অপমান মানুষকে বরং প্রতিশোধপরায়ণ হতে শেখায়। প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করে। সালার সিকান্দার তার পেশাগত জীবনে এই প্রথম এমন অপমানের স্বাদ আস্বাদন করল। অপমান, হেয়প্রতিপন্নতা-যে শব্দই এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই সবই সে এখন অনুভব করছে। পশ্চিমা যন্ত্রের একটি সেরা ও কার্যকর অংশ হয়েও সে এখনো কেবল একটি যন্ত্রাংশ হয়েই রয়ে গিয়েছে। যে যন্ত্রাংশের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে এবং প্রয়োজন শেষ হলে তাকে অকেজো ভেবে ছুড়ে ফেলা হয়।

সারা জীবন সে ভেবে এসেছে, তার যোগ্যতা, দক্ষতা ও কাজের মাধ্যমে সে পশ্চিমা যন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সে নিজেকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। তার এই বিশ্বাস আজ ভুল প্রমাণিত হলো। তা নিছক ভ্রান্ত ধারণা ছিল।

: 'তুমি কি আর কোনো বিষয়ে কথা বলতে চাও?' রাফায়েল বাহ্যিক উদাসীনতা প্রদর্শন করে বলল।

: 'না।' সালারও অতিরিক্ত কিছু না বলে উঠে পড়ল। রাফায়েল হতভম্ব হয়ে রয়ে গেল। সালারকে সে তার স্ত্রী-সন্তানের জন্য অনুনয়-বিনয় করে কান্নারত অবস্থায় দেখতে চাচ্ছিল। সে প্রত্যাশা করছিল, সালার তার পাসপোর্ট ইস্যু করানোর জন্য বিশ্বব্যাপ্তকের উর্ধ্বতনদের কাছে অনুরোধ করে সহযোগিতার ভিক্ষা চাইবে। অবশেষে তাদের সকল শর্ত ও নিয়ম মেনে, কঙ্গোর সেই প্রকল্প পুনরায় চালিয়ে যেতে সম্মত হবে। এই দুটোর একটি বেছে নেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে সালার রয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সে চুপচাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভবন থেকে এভাবে বের হতে হতে সালারের নিজের কাছেও এমনটাই মনে হচ্ছে। রাফায়েলের মনে হলো, তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। হেডকোয়ার্টারের যেন সত্যিই তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। না হলে সে এতটা কঠোর ও নিষ্ঠুরের মতো ইমামা ও তার সন্তানদের জন্য কিছুই না করে এখান থেকে বেরিয়ে আসত না। সে এখানে এসেছিল আপস করতে। নিজের স্ত্রী-সন্তানের জীবন বাঁচাতে। তাদের সব শর্ত মেনে নিতে। কিন্তু রাফায়েলের কথা ও আচরণ যেন তার মানসিকতা পুরোপুরি পালটে দিয়েছে।

'আমি এদের কারও কাছে আমার পরিবারের জীবন ভিক্ষা চাইব না। যদি মিনতি হাতে। আল্লাহ সবসময় আমাকে সম্মান দিয়েছেন। যখনই আমি লাঞ্চিত হয়েছি, তা করি, তবে এদের কারও সামনে মিনতি করব না। সম্মান ও অপমান-দুটোই আল্লাহর কেবল আমার নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হয়েছি। আজও আমি শুধু আল্লাহর কাছেই সম্মান চাইব। অতঃপর আল্লাহ যদি আমাকে সম্মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা দেন, তবে

আমি সেই লাঞ্ছনাই মাথা পেতে নেব। কিন্তু আমি পৃথিবীর আর কারও কাছে লাঞ্ছনার দ্বারস্থ হব না। কারও সামনে মাথা নোয়াব না, আপস করব না। অন্তত আজকের তো পর আর নয়ই।" সে মাটির টুকরো হয়ে সদর দপ্তরে প্রবেশ করেছিল। আর এখন আগ্নেয়গিরি হয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর এই মুহূর্তে সে ইমামা ও তার সন্তানদের জীবনও বাজিতে লাগিয়ে এসেছে।

'ইমামা, জিবরিল, ইনায়া-এই নিয়ামতগুলো আমাকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কোনো মানুষ তো দেয়নি। তাহলে আমি মানুষের কাছে কেন তাদের জন্য ভিক্ষা চাইব?' সালার জেদি ছিল। কিন্তু জীবনে কখনো ভাবেনি, এমন সময় আসবে, যখন ইমামা ও তার সন্তানদের জীবনও সেই জেদের কাছে কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যাবো।

সালারকে ফাঁসাতে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, সে তা উপেক্ষা করে মাড়িয়ে এসেছে। আর যারা সেই ফাঁদ পেতেছে, তারা বুঝতেও পারেনি, কীভাবে পাশার বোর্ড উলটে যেতে চলেছে।



তারা তাকে হারাতে চেয়েছিল, আর সে তাদেরকে 'শাহমাতের' চাল দিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

আজ বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি বড় সুখবর। কারণ, পেট্রোস ইবাকা কোমাতেই মারা গিয়েছে। সালার এই সংবাদটি ব্যাংক থেকে ফিরে হোটেলে বসে শুনছে। এটি তার জন্য আরেকটি আঘাত। কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। ইবাকাকে সে হাসপিটালে যে অবস্থায় দেখে এসেছে, এরপর তার সুস্থ হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু আজকের রাতটি বিশ্বব্যাংকের জন্য সবচেয়ে অন্ধকারতম রাত। কেননা, ইবাকা তার মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বব্যাংকের মৃত্যুপ্রস্তুতি তৈরি করে গিয়েছে।

নিউইয়র্কস্থ আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিডিয়া টাড টাউন ম্যানহাটনের কলম্বাস সার্কেলো। সেখানে টাইম ওয়ার্নার সেন্টার ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পেট্রোস ইবাকা। তার চোখ খুশিতে ঝলমল করছিল। টলমল করছিল আনন্দের

অশ্রুতে। কিছুক্ষণ পরেই সে এই ভবনস্থ সিএনএন-এর স্টুডিওতে '৩৬০' নামক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। তার সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছিল আমেরিকার অন্যতম প্রখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন দুই সপ্তাহ পর কঙ্গোর বৃষ্টি-অরণ্য নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

সে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় পেট্রোস ইবাকার সাক্ষাৎকার ও পিগমিদের অস্তিত্ব রক্ষায় ইবাকার সংগ্রামের তথ্য সংগ্রহ করে। অতঃপর ইবাকার সঙ্গে দেখা করার জন্য যোগাযোগ করে। ইবাকা বুঝতে পারেনি যে, অ্যান্ডারসনের এই ফোন তার জীবন-মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে দাঁড়াবে। তাকে যারা নজরে রেখেছিল তারা বুঝতে পারছিল না, এই মুহূর্তে কী করবে। ইবাকা এই ভবনে প্রবেশ করলেই তো তাদের সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা যা করার তা-ই করে ফেলল। তাদের দুশ্চিন্তা ছিল, অ্যান্ডারসনের মতো ব্যক্তি যদি তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে না জানি

আরও কত সাংবাদিক তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে!

পেট্রোস ইবাকা সবসময় ছোট ছোট নিউজ চ্যানেল আর সাংবাদিকদের বড় ও শক্তিশালী মনে করে। এজন্য সে ওয়াশিংটনে তাদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটিয়ে ফিরেছে। ইবাকার সঙ্গে ওই সকল সাংবাদিকের ওপরও নজর রাখা হচ্ছিল। ওই সকল সাংবাদিককে সেট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশনা দিয়ে ইবাকার সঙ্গে ছাড়ার জন্য বলা হয়েছিল। তার সাক্ষাৎকার কভারেজ করলে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, তাও তাদের হুঁশিয়ারির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এসব ছোট ছোট চ্যানেল ও সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখাও ছিল তুলনামূলক সহজ। সিএনএন একটি বড় প্রভাবশালী মিডিয়া। এটি সবসময় আমেরিকার স্বার্থ বজায় রেখে চলে, এমন নয়। তবু ছোটখাটো সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণে রেখে, কঙ্গোর বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়াও ছিল অনেক কঠিন কাজ। কারণ, সিএনএনের মতো বড় মিডিয়া যখনই কোনো বিষয়কে

আমেরিকার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করে, তখন তা নতুন কোনো না কোনো সংঘাতের সূত্রপাত করে।

এখানেও ইবাকাকে নজরদারিতে রাখা সিআই-এর লোকদের সামনে হঠাৎ একটি চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়ায়। তা হলো, ইবাকাকে এই সাক্ষাৎকার দেওয়া থেকে যেকোনো মূল্যে ফেরাতে হবে। কিন্তু এখানে ইবাকা তার কাজ প্রায় সম্পন্ন করে পুনরায় কঙ্গো যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই শেষ মুহূর্তে সিআইএ আর কী করতে পারে! এটি তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাভারসনের কল পেয়ে ইবাকা ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা দিতেই তাদের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তারা নতুন কোনো পরিকল্পনা করার আগেই ইবাকা সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য টাইম ওয়ার্নার সেন্টারে পৌঁছে যায়। অ্যাভারসনের সঙ্গে দুই ঘণ্টার তীব্র বৈঠকের পর সিএনএন-এর স্টুডিও থেকে বের হতেই ইবাকার উত্তেজনা অনেক বেশি বেড়ে যায়।

অ্যাভারসন কোপার এই প্রকল্পের ব্যাপারে আরও যাদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সালার সিকান্দার ছিল শীর্ষে। সিআইএ এটা আগে থেকেই জানত। সালার যেদিন যাত্রা করে ওয়াশিংটনে পৌঁছায়, সে জানত না যে, তার দুর্ভাগ্য তার আগেই অপেক্ষায় বসে আছে। ইবাকা ওই ভবন থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল পার্কের দিকে যেতে যেতে, খুশি মনে সালারকে একটি টেক্সট মেসেজ পাঠায়। তাতে ইবাকা তাকে জানায়, সে এখন সিএনএন-এ যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেছে। অ্যাভারসন কোপার ও তার দলের আরও কয়েক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছে। ইবাকা খুশিতে যেন সপ্তম আকাশে উড়ছিল।

সেই মেসেজটি ছিল অনেক দীর্ঘ। তাতে আরও অনেক কিছু লেখা ছিল। পেট্রোস ইবাকার উচ্ছ্বাস সেখানেই শেষ হয়নি; বরং সেই দীর্ঘ মেসেজটিকে সে ইমেইল করে পাঠিয়ে দেয়। সালার তখন বিমানে। কয়েক ঘণ্টা পর সালার ওয়াশিংটনে অবতরণ করতেই, তার সমস্ত যোগাযোগমাধ্যম নজরদারির আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সে কোনো যোগাযোগ করতে

পারে না। তাই পেট্রোস ইবাকার সেই শেষ ইমেইল সালার তার মৃত্যুর পর দেখতে পায়। কিন্তু যারা ইবাকার জীবন-মৃত্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল, তারা সেই মেসেজটি পেয়ে গিয়েছিল সালার ওয়াশিংটনে পা ফেলার বহু ঘন্টা আগেই।

কখনো কখনো কারও জীবন, অন্য কারও মৃত্যুর কারণ হয়ে যায়। আবার কারও মৃত্যু হয়ে যায়, অন্য কারও বেঁচে থাকার নিগূঢ় হেতু। ইবাকার মৃত্যুতে সিআইএ সালার সিকান্দারের হত্যা-পরিকল্পনা বদলে দেয়। আর নয়তো আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল, সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে সালার সিকান্দার অসম্মতি জানালে, দুর্ঘটনার মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলা হবে। অ্যান্ডারসন কুপারের সঙ্গে ইবাকার হঠাৎ সাক্ষাৎকার, সিআইএ-কে সালার হত্যার পরিকল্পনা থেকে পিছু হটতে বাধ্য করে। তারা ইবাকা ও সালার; দুজনকে একসাথে হত্যা করতে পারত না। অথবা তাদেরকে হত্যার পরিকল্পনা করলেও একসাথে আমেরিকায় করতে পারত না। কারণ, সেক্ষেত্রে ইবাকা ও সালারের আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে কোনো না কোনো

সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর সিআইএ তাই এই ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। আপাতত সালারকে বরং শুধু ভয় দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সিআইএ বুঝতে পারেনি যে, তারা ভুল কৌশল, ভুল ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করতে চলেছে।

তার কয়েক ঘণ্টা পর পেট্রোস হবাকা ব্রুকলিনের এক অন্ধকার সরু গলি ধরে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তার পথ আটকে দেওয়া হয়। সিআইএ ভেবেছিল, ইবাকা তাদের কাছে একদম সহজ শিকার। পান্তা ভাত। ইচ্ছা করলেই যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনা তেমনটি ঘটেনি। হঠাৎ দুজন ব্যক্তি তার গাড়ি থামিয়ে রিভলবার তাক করে তাকে তুলে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ইবাকা সাহসিকতার সঙ্গে তাদের সাথে লড়াই করে। ইবাকা সারা জীবন আমেরিকার সভ্য সমাজে সভ্যভাবে চলাফেরা করেছে। কিন্তু বন আর বন্য জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তার রক্ত ও স্বভাবো। নিজেকে রক্ষা করতে জানে সে। প্রশিক্ষিত গুন্ডাদের কবজায় সে ধরা দেয়নি।

বরং লড়ে গেছে। খাটো গড়নের হলেও সে ছিল শক্তসামর্থ ও সুঠাম। সে মার খেয়েছে, কিন্তু পালটা মেরেও গেছে।

লড়াই করতে করতে রিভলবার একপর্যায়ে ইবাকার হাতে চলে আসে। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে দেয়। একজনের গায়ে গুলি লাগে। অন্যজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগেই রিভলবার বের করে ইবাকার ওপর দু-রাউন্ড গুলি ছুড়ে দেয়। গুলি দুটো ইবাকার বুকে এসে লাগে। একের পর এক তিনটি গুলির শব্দে পথচারীরা দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাদের কেউ একজন পুলিশকে ফোন করে। কিন্তু পুলিশ পৌঁছানোর আগেই, গুরুতর আহত ও যন্ত্রণায় কাতর ইবাকাকে গাড়িতে তুলে, সেই দুই অ্যাজেন্ট পালিয়ে যায়।

ইবাকার ওই অবস্থা সিআইএ-র জন্য দ্বিতীয় ধাক্কা সাব্যস্ত হয়। কারণ, ইবাকাকে তারা কয়েক ঘণ্টার জন্য অক্ষত অবস্থায় পেতে চেয়েছিল। যাতে তার মাধ্যমে তার তৈরি সকল ডকুমেন্ট ও প্রমাণাদি ধ্বংস করা যায়। ওই সকল প্রমাণের

মাধ্যমে যেন দ্বিতীয় কোনো পেট্রোস ইবাকা তৈরি না হয়। সিআইএ-র জন্য তখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইবাকার একটি স্বাক্ষর প্রাপ্তি। ওই স্বাক্ষরটি তাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল। কারণ, সেটি ছাড়া তারা ইবাকার গোপন লকারগুলো খুলতে পারছিল না। মূল ডকুমেন্টগুলো হাতিয়ে নিয়ে ইবাকাকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তারা। কিন্তু তার প্রতিরোধে সবকিছু উলটে যায়।

তাদের প্ল্যান 'এ' এবং প্ল্যান 'বি' ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে সিআইএকে প্ল্যান 'সি'-এর পথ ধরতে হয়। কিন্তু তারা জানে না যে, ইবাকার কাছে একটি প্ল্যান 'ডি' ছিল। যেটি তারা কখনো জানতেই পারেনি। আর সেই প্ল্যান 'ডি'-টি হলো, কঙ্গোতে তার গার্লফ্রেন্ডের কাছে রেখে আসা একটি অসিয়তনামা!

সালার যে রাতে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল, তার পরদিনই ইমামার গাইনিকোলজিস্ট তাকে ফোন করে। তিনদিন পরই ইমামার চেকআপের তারিখ। কিন্তু তার

আমেরিকান ডাক্তার তাকে সেদিনই জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে বলে। কারণ হিসেবে জানায়, এক সপ্তাহের জন্য তিনি ঘানায় মেডিক্যাল ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করতে যাবেন। ডাক্তারের সেক্রেটারি ইমামাকে জানায়, এজন্য উনার সমস্ত রোগীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। ইমামাকে সে, সেদিনই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে বলে। ইমামা নিশ্চিত মনে তাতে সম্মতি জানায়। একে সে স্বাভাবিক রুটিন মনে করে। এতে তার কোনো দোষও ছিল না। সালার সিকান্দারের মতো বুদ্ধিমান একজন মানুষ যেখানে সিআইএ'র হাতে লাঞ্চিত হচ্ছে, সেখানে ইমামা তো একেবারেই তুচ্ছ কেউ!

প্রতিবারের মতো ইমামা জিবরিল ও ইনায়ার সঙ্গে হেডিকেও হসপিটালে নিয়ে যায়। এটি কিনশাসার একটি উন্নত হসপিটাল। এখানে বেশিরভাগ সময় বিদেশি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সদস্য ও কূটনীতিকদের চিকিৎসা করা হয়। সালার তখন ফ্লাইটে। ইমামা ভেবেছিল, সালার ওয়াশিংটন থেকে ফিরে

আসার আগেই সে বাসায় চলে যাবে। কিন্তু সে আর বাসায় ফিরতে পারেনি।

ডাক্তার আলট্রাসাউন্ড করে খানিক চিন্তিত চেহারায় তাকে জানায়, তার বাচ্চার নড়াচড়া অস্বাভাবিক। তাই তাকে আরও কিছু পরীক্ষা করাতে হবে এবং কিছু ইনজেকশন নিতে হবে। এই বলে পর্যবেক্ষণের জন্য ডাক্তার তাকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে অ্যাডমিট করে নেয়। এক রুমে শিফট করে, ব্যথা বৃদ্ধি করার ইনজেকশন পুশ করে। কেননা, ইমামাকে বাসা থেকে সরিয়ে গোপন স্থানে রাখার জন্য, ইমামার অকাল-সন্তান-জন্মদানের পথ ছাড়া ওই মুহূর্তে সিআইএর কাছে অন্য কোনো পথ ছিল না।

ইনজেকশন নেওয়ার আগে ইমামা, হেডি, জিবরিল ও ইনাযাকে তার রুমে নিয়ে আসে। তখনো সে ভাবছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা বাসায় ফিরে যাবে। কিন্তু ব্যথা শুরু হতেই এই প্রথম তার উদ্বেগ হতে থাকে। ডাক্তার নিশ্চিত করেন যে,

ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচাতে হলে খুব দ্রুত সন্তান ভূমিষ্ঠ করাতে হবে। ইমামা এই প্রথম প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। বাসার কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া কিনশাসায় তার আর এমন কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই যে, এই মুহূর্তে তাদের ডাকা যেতে পারে। তার পরিচিত লোকেরা সবাই ছিল সরকারি এবং বিদেশি নাগরিক।

ইমামা তৎক্ষণাৎ এটাও বুঝে উঠতে পারেনি যে, তার সন্তানদের এখন কোথায় পাঠাবে। ডাক্তার তাকে প্রস্তাব করল, সে চাইলে তার ছেলে-মেয়েকে উনার বাসায় রাখতে পারে। কিন্তু ইমামার জন্য এটি অসম্ভব। কারণ, সে তার সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। বিশেষ করে জিবরিলের প্রতি। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, সে একটি মানুষে পরিপূর্ণ মুখর পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে, দশ বছর একাকিত্বের বন্দি জীবন যাপন করেছে। অতঃপর আশা ও হতাশার মাঝে দুলভ জীবনে সে এই রক্তের সম্পর্কগুলো খুঁজে পেয়েছে। এই সন্তানগুলোই তার পুরো কুল কায়েনাত। তাদেরকে সে ওয়াসিমের মৃত্যুর পর

প্রচণ্ড হতাশার সময়টিতে পেয়েছে। সেই মুহূর্তে বসন্ত হয়ে তার জীবনে জিবরিলের আগমন ঘটে। গর্ভাবস্থায় তার ভেতরে বেড়ে ওঠা সময়টিতেও জিবরিল যেন তাকে কোনো মাসিহার মতো সান্ত্বনা ও প্রত্যাশার চাদরে মুড়িয়ে রেখেছিল।

জিবরিল সাধারণ শিশুদের মতো নয়। বুদ্ধিমত্তা পেয়েছে সে বাবার উত্তরাধিকার সূত্রে। কিন্তু সহনশীলতা কোথেকে শিখেছে, তা ইমামা কখনো বুঝে উঠতে পারেনি। তার দুই সন্তানই একগুঁয়ে বা দুষ্ট নয়। কিন্তু জিবরিলের মাঝে ছিল এক অদ্ভুত গাভীর্য ও প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞা তার নিষ্পাপ চেহারায়ে এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে রাখে। হাসপাতালে ইমামা ও ডাক্তারের সকল কথোপকথনও তার সামনেই হতো। সে চুপচাপ সব শুনত আর দেখত।

ইমামা, হেডিকে তার ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব দেওয়ার আগে, জিবরিলকে দিয়েছিল ইনায়ার দায়িত্ব। তাকে বোনের খেয়াল রাখতে বলেছিল। এবং বলেছিল, কখনোই যেন তাকে একা না

ফেলে যায়। জিবরিল সব সময়ের মতোই অনুগত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। এই দায়িত্ব তাকে এই প্রথম দেওয়া হয়নি; বরং সবসময়ই দেওয়া হতো। লনে একা খেলতে গেলে, শপিংমলে কেনাকাটা করতে গেলে, প্র্যামে বা গাড়িতে একা বসে থাকলে কিংবা সালার কখনো বাইরে গিয়ে সার্ভিস স্টেশনে নামলে বা কিছু কিনতে গেলে ওই সময়টুকুতে জিবরিল তখন নিজে থেকেই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আর ইনায়া ভাইয়ের আনুগত্য করত।

এখন পুনরায় তাকে আরও একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেও পুনরায় আগের মতোই মাকে আশ্বস্ত করে- 'আপনি নতুন বেবি নিয়ে আসুন, আমি সেই বেবির যত্ন নেব।' চার বছরের জিবরিল মাকে এই সান্ত্বনা দেয়। তার কথায় কষ্টের মাঝেও ইমামার চোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে ইমামা তাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। অতঃপর হেডিকে তাদের যত্ন নিতে বলে, সালারকে সংবাদ জানানোর জন্য তার হাতে ফোন ও ব্যাগ তুলে দেয়। তারপর যখন তার

জ্ঞান ফেরে, তখন রুম ছিল একদম ফাঁকা। সেখানে না ছিল হেডি, না জিবরিল, না ইনায়া, আর না নবপ্রসূত হামিন!

এই সময়ে ইউটিউবে একটি ভিডিও আপলোড হয়। ভিডিওতে দেখা যায় ব্রুকলিনের তুলনামূলক পশ্চাৎপদ এক এলাকায় এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি গাড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার গাড়ি থামিয়ে দুই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি তার পথ আটকায়। তারপর তাদের মাঝে লড়াই করতে দেখা যায়। লড়াই চলাকালীন শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি তাদের ওপর গুলি চালায়। তারপরও হঠাৎ এক শ্বেতাঙ্গের গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শ্বেতাঙ্গ দুটি তাকে নির্মমভাবে টেনে-হিঁচড়ে প্রায় ছুড়ে ফেলার মতো করে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। এই দৃশ্যটি পুরোপুরি ভিডিওতে ধরা পড়ে। ভিডিওটি মোবাইল ফোনে ধারণকৃত নয়। পাশের ভবনের এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর তার হ্যান্ডিক্যাম দিয়ে এটি ধারণ করে। কাকতালীয়ভাবে সে তখন ভবনের

দ্বিতীয় তলার জানালা থেকে তার স্কুল প্রজেক্টের একটি ভিডিয়ো শুট করছিল। আর সেই সময়ই এই ঘটনাটি ঘটে।

ভিডিয়ো করার সময় ছেলেটি চিৎকার করে করে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটিকে গাড়িতে তুলতে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সে ব্যর্থ হয়। তাই গাড়ির নম্বর প্লেট জুম করে সেটিও ধারণ করে। পুলিশের হাতে ভিডিয়োটি তুলে দেওয়ার আগে, ছেলেটি তা আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কিত একটি ওয়েবসাইটে আপলোড করে। সেই ওয়েবসাইট ভিডিয়োটি ইউটিউবে প্রকাশ করে; আর পরবর্তী বারো ঘণ্টার মধ্যেই তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিয়োটিতে অসংখ্য মানুষ এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। হাজার হাজার নিন্দাসূচক মন্তব্য ও শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশে গালিগালাজে ভরে ওঠে কमेंটবক্স। মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যেই ভিডিয়োটি ইউটিউব থেকে নিউজ চ্যানেলে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেখান থেকে পৌঁছে যায় আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কগুলোতে।

পেট্রোস ইবাকাকে চিনতে খুব বেশি সময় লাগেনি মানুষের। খুব সহজেই তাকে চিনে ফেলে জনগণ। পুলিশ নিকটবর্তী হাসপিটালেও পৌঁছে যায়। যে হাসপিটালে সিআইএ'র অ্যাজেন্টরা তাকে প্রাণ বাঁচাতে নিয়ে যায়। হাসপিটাল কর্তৃপক্ষও বুঝে যায় যে, ইবাকা একজন বিশেষ রোগী। তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে, সার্জারি করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এনওয়াইপিডি সিআইএর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা জেনেও যায় যে, ইবাকাকে দ্রুত ওয়াশিংটনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। সিআইএ এখন হন্যে হয়ে ভাবছে, মিডিয়ায় ছড়ানো পেট্রোস ইবাকার মৃত্যুসংবাদকে কীভাবে দুর্ঘটনা বলে প্রমাণ করা যায়! ইবাকার আহত হওয়ার সংবাদকে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে দুর্ঘটনা বলে প্রচার করে। আর এই প্রচারই এখন তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝড় তো ইউটিউবেও উঠেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ঝড় তো উঠেছে সিআইএ-এর সদর দপ্তরে। ইবাকাকে অপহরণ করার মতো

একটি সহজ অপারেশনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সিআইএ'র মুখে লজ্জা ও গ্লানির কালি মেখে গিয়েছে। সেই সাথে আমেরিকান সরকার আর বিশ্বব্যাংকও সমস্যায় পড়েছে। আপাতত সিএনএন কীভাবে এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবে, বা চলমান পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, তা তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

মানুষকে কখনো কখনো তার বোকামি নয়, বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত চতুরতা তাকে বিপর্যয়ে ফেলে দেয়। সিআইএর সাথেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। এক তির দিয়ে দুই শিকার করতে গিয়ে তারা তাদের আস্ত কামানই ভেঙে ফেলেছে। ইবাকাকে তারা যদি হাসপাতালেই ছেড়ে আসত, তাহলে এখন অনেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। তারা তাকে দুর্ঘটনায় আহত বলে, বেঁচে যেতে চেয়েছিল। এই কাজটি তারা ওয়াশিংটনে করতে চেয়েছে, যেখানে সালার সিকান্দার খোদ উপস্থিত।

ইবাকার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। সার্জারির পর সিআইএ তাকে তাদের গোপন অবস্থানে নিয়ে যায়। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য নিতে পারেনি। ফলে এখন তাদের শেষ কাজটি তারা করতে চাচ্ছিল, যার জন্য তাকে ব্রুকলিন থেকে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তারা সংবাদ চ্যানেলগুলোতে ক্রমাগত সেই দুর্ঘটনার আহত ও মৃত ব্যক্তিদের নাম এবং তাদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি দেখাতে থাকে। সেখানে ইবাকার আহত হওয়ার ছবিটি বিশেষভাবে দেখায়। সিআইএ নিশ্চিত ছিল, এই সংবাদ সালার সিকান্দারের নজরে আসবে, আর সে অবশ্যই ইবাকাকে দেখতে যাবে। যেহেতু তাদের মধ্যে ইদানীং এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়। সালার ওই সংবাদটি দেখে তৎক্ষণাৎ ইবাকার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ে। এই সংবাদটি যদি সালারের চোখে না পড়ত এবং তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে না যেত, তাহলে সিআইএ কৌশল করে হাসপাতালের পক্ষ থেকে সালারকে ডেকে আনত। তাকে

বলত যে, ইবাকার শেষ ইচ্ছা হলো আপনার সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু এই কাজের জন্য তাদের প্ল্যান 'বি'-এর প্রয়োজন পড়েনি। কারণ, সালার নিজেই ইবাকাকে দেখতে চলে যায়। হসপিটালে আসা-যাওয়ায় সালারের দুই ঘন্টা সময় লাগে। আর এই দুই ঘন্টাই সিআইএ'র জন্য যথেষ্ট। এই সময়ের ভেতরে তারা সালারের সমস্ত ডকুমেন্ট হাতিয়ে নেয়।

সবকিছু তাদের পরিকল্পনামাফিক হয়েছে। কিন্তু ফলাফল ছিল তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরের ওই ভিডিয়োটি তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভিডিয়োতে দেখতে পাওয়া চেহারাগুলো একদম স্পষ্ট। সবাই সাথে সাথে তাদের চিনে ফেলে। তাছাড়া ভিডিয়োর নিচে দেখানো সময় ও তারিখ ছিল খুব প্রাসঙ্গিক। ফলে তারা পেট্রোস ইবাকার পরিচয় পালটাতে পারেনি। কিন্তু একটি ভুলের পর সিআইএ শুধু অন্য আরেকটি ভুলই করেনি; বরং আরও দুটো ভুল করেছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ ভুল।

অ্যান্ডারসন কুপারের টিম পেট্রোস ইবাকার সন্দেহজনক মৃত্যুর পর তার পাঠানো মেসেজ ও ইমেইলগুলো, ইবাকার ওপর হামলার ভিডিয়োতে দেখানো সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখছে। সেই সব মেসেজ ও ইমেইল তখনকার, যখন ইবাকা কুপারের শো-তে অংশ নিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। এমনকি কুপারের থেকে কোনো প্রকার সাহায্য নিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এই মেসেজগুলো ছিল ওই ভিডিয়োর দুই ঘণ্টা পরের। অর্থাৎ নিউইয়র্কের হসপিটালে যখন ইবাকার অপারেশন হচ্ছিল, তখনকার।

এই মেসেজগুলো কেবল কুপারকেই নয়; বরং ইবাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য শো-এর উপস্থাপক এবং সাংবাদিকদেরও পাঠানো হয়, যারা পিগমিদের সমস্যাগুলো সামনে আনার জন্য ইবাকাকে অনুরোধ করেছিল। অ্যান্ডারসন কুপার একটি নিউজ প্রোগ্রামে ইবাকার বার্তা ও ভিডিয়োতে দেখানো সময়ের মিল নিয়ে বিষয়টি চিহ্নিত করে। তারপর সে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের দুটি হসপিটালের বিশ্বস্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে

বলে, এই দুই হসপিটালে ইবাকাকে ভর্তি করানোর পেছনে সিআই-এর সম্পর্ক রয়েছে।

পেট্রোস ইবাকার মৃত্যুর কারণ কী হতে পারে? কে তাকে হত্যা করতে পারে এবং কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনই দিতে পারবে-যার নাম ইবাকা কুপারের কাছে একাধিকবার উল্লেখ করেছে। যে একমাত্র ব্যক্তিটি ওয়াশিংটনের হসপিটালে এসে আহত ইবাকার সঙ্গে দেখা করেছে, নিজেকে তার আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছে; সেই ব্যক্তিটিই কেবল এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। আজ রাতের প্রতিটি চ্যানেলে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে কেবল একজন মানুষের নাম প্রচারিত হচ্ছে, আর সে হলো-সালার সিকান্দার। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউই তার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

চার বছরের জিবরিল তার পরিবারের এই বিপদে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা তার জীবনে আরও কয়েকবার পালন করতে হবে। এই ছোট শিশু যদিও তা এখন বুঝতে পারেনি।



ইমামা যাওয়ার পর হেডির হঠাৎ মনে পড়ল, ইমামা তাকে বাসা থেকে নবজাতকের জন্য কিছু জিনিস আনতে বলেছিল। ইমামা সেগুলো বাসায় আগেই একটি ব্যাগে প্যাক করে রেখে এসেছে। সেই সাথে ইমামা তাকে জিবরিল ও ইনায়ার খাবারদাবার ও কাপড়-চোপড় আনার কথাও বলে গিয়েছে। কেননা, সালার ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সবাইকে হসপিটালেই থাকতে হবে। তাই ততদিনের খাবারদাবার ও কাপড়-চোপড় হসপিটালে এনে রাখা আবশ্যিক। হেডিকে সে বলে দিয়েছে, বাচ্চাদের যেন কোনো নারী সহকারীর কাছে রেখে বাসা থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসে। কিংবা বাসার অন্য কোনো পরিচারক যেন সেগুলো দিয়ে যায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বাচ্চাদের কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে না। ইমামার এই নির্দেশনা হেডির মনে ছিল না। দশ মিনিট পরেই তাদের বাসা। হেডি ভাবল, এত কাছে বাসা, সুতরাং তাদেরকে এখানে একা ফেলে না রেখে, সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া যাক।

হেডি তাদেরকে সঙ্গে নেওয়ার কথা বলতেই জিবরিল তাকে না করে দেয়। বলে, মান্নি তো আমাদের কোথাও যেতে নিষেধ করেছেন। হেডি তাই তাদের আর পীড়াপীড়ি করেনি। কারণ, সে জিবরিলকে খুব ভালো করেই চিনে। মাত্র চার বছরের বয়সেই সে তার মা-বাবার কথা তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে, তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তাই কারও কথার ফাঁদে পড়ে সে ইমামা ও সালারের নির্দেশনা ভুলে যাবে, তা অসম্ভব। হেডি তাই অপারগ হয়ে তাদেরকে ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে রেখে বাসায় চলে আসে। সে চলে আসতেই ইনায়ার ঘুম পেতে থাকে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ঘুমে ঢুলতে থাকা এই মেয়েটিকে পাশের রুমের একটি বেঞ্চে শুইয়ে দিতে চাইল। কিন্তু জিবরিল তাকে বাধা দিল। কেননা, হেডির বলে যাওয়া জায়গা থেকে সে একচুলও সরতে নারাজ।

চার বছরের জিবরিল তার দুই বছরের বোনের সঙ্গে এখানেই পাবলিক প্লেসে বসে থাকতে চাচ্ছে। কেননা, সে জানে, কোনো অচেনা মানুষের সঙ্গে দূরে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়।



অ্যাসিস্ট্যান্ট খানিক অবাক হয়ে পুনরায় তার টেবিলে ফিরে গেল। চেয়ারে বসতে বসতে ভাবল, এ শিশুটি অত্যন্ত অদ্ভুত। ইনায়া তখন জিবরিলের কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে শুরু করেছে। জিবরিল অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে বোনকে তার কচি বাহুর বৃত্তে জড়িয়ে ধরে, ভিজিটিং রুমের মানুষদের আসা-যাওয়া দেখতে থাকল। আর তখনই এক মহিলা এসে তাদের পাশে বসে, মুচকি হেসে জিবরিলের মাথায় হাত বোলাল। জবাবে জিবরিলের চেহারার ধরন মহিলাটিকে বুঝিয়ে দিল, এই আন্তরিকতা তার ভালো লাগেনি। মহিলাটি তাই এবার ঘুমন্ত ইনায়ার চুলে আঙুল চালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিবরিল এবার আলতো করে তার হাত সরিয়ে দিয়ে, ফিসফিস করে বলল, 'She is sleeping. সে ঘুমাচ্ছে।'

: 'ওহ, স্যরি!' আমেরিকান মহিলাটি বাহ্যত লজ্জা প্রকাশ করে তার দিকে তাকিয়ে হাসল। জিবরিল পুনরায় নির্লিপ্ত চেহারায় তার দিকে না তাকিয়ে, সেই হাসি এড়িয়ে গেল। মহিলাটি এবার

তার পার্স থেকে একটি চকলেট বের করে জিবরিলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

: 'নো থ্যাংকস!' চকলেট বাড়িয়ে দেওয়ার আগেই উত্তর চলে এলো।

: 'আমার কাছে কিছু খেলনা আছে।' এবার মহিলাটি মেঝেতে রাখা একটি ব্যাগ থেকে, একটি স্টাফড খেলনা বের করে জিবরিলের দিকে বাড়িয়ে দিল। জিবরিলের শীতল উদাসীনতার দেওয়াল ভাঙার এটি ছিল তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। জিবরিল খেলনাটির দিকে এক পলক না তাকিয়েই অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল,

'Would you please stop bothering us? আপনি কি দয়া করে আমাদের বিরক্ত করা বন্ধ করবেন?'

এক মুহূর্তের জন্য মহিলাটি নির্বাক হয়ে গেল। এটি যেন তার প্রতি সরাসরি একটি শাটআপ কল। কিন্তু সে তো এখানে মুখ বন্ধ রাখতে আসেনি। এই দুই শিশুকে নিয়ে যেতে এসেছে। সে ভেবেছিল, গমনা-গমনরত দর্শনার্থীদের ভিড়ে দুই ছোট্ট শিশুকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া তো, তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়! এত লোকের মাঝ থেকে জোর করে ইনায়াকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, জিবরিলকে নয়।

তাই মহিলাটি এখন অপেক্ষা করছে, ইনায়ার মতো জিবরিলও যেন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন হয়তো কোনোভাবে তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু জিবরিলের চেহারা দেখে তার মনে হচ্ছিল, আপাতত তার ঘুমানোর কোনো ইচ্ছাই নেই। মহিলাটি অবশেষে দশ-পনেরো মিনিট বসে থেকে, ওখান থেকে উঠে গেল। শিশু দুটিকে বলার জন্য সে নতুন কোনো নির্দেশনা আনার বাহানা করে চলে গেল। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে দেখল, হেডি এখন তাদের কাছে বসে আছে। মহিলাটি এক দীর্ঘশ্বাস ফেলেই রয়ে গেল। এই শিশু

দুটির কোনো ক্ষতি করতে চাচ্ছিল না সে। কেবল নিজেদের
আয়ত্তে রেখে, নজরদারি করতে চাচ্ছিল। আমেরিকায় যতক্ষণ
না সালারের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের চূড়ান্ত সমঝোতা হয়ে যায়,
ততক্ষণ এই বাচ্চা দুটিকে আয়ত্তে রাখার দায়িত্ব দেওয়া
হয়েছে এই মহিলাটিকে।

সালারের পরিবারের কোনো ক্ষতি করা হবে না বলেও,
সিআইএ তার পরিবারের ওপর নজর রাখছিল। মহিলাটি পুনরায়
ভিজিটর রুমের অন্য কোথাও গিয়ে বসে পড়ল। তখন ইনায়া
জেগে উঠে বাথরুমে যেতে যাচ্ছিল। হেডি আবারও
জিবরিলকে এখানে রেখে ইনায়াকে নিয়ে বাথরুমে যেতে
চাইল। কিন্তু সে এখানে থাকল না। যেকোনো মূল্যে সে
ইনায়াকে চোখের আড়াল করতে চাচ্ছে না। অবশেষে তাকেও
সাথে নিতে হলো। সেই মহিলাটি এবার তাদের পিছুপিছু
বাথরুমেও চলে এলো। জিবরিল মহিলাটিকে পুনরায় লক্ষ
করল।

: Why are you stalking us? আমাদের পিছু পড়ে আছ কেন তুমি?

মহিলাটি তখন ওয়াশ-বেসিনে হাত ধুচ্ছিল। জিবরিলের কথাটি শুনে দ্রুত ফিরে ঘুরে দাঁড়াল। না ঘুরলেও তার বুঝতে কোনো সমস্যা হতো না যে, এ কথাটি তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। হেডি সেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে মুচকি হাসল। যেন সে জিবরিলের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নয়। কিন্তু জিবরিল সেই একই বিরক্তিকর দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সি সেই মহিলাটি মুচকি হেসে চার বছরের এই ছোট শিশুটির প্রশংসা করল। এই প্রথম সে একটি চার বছরের শিশুর কাছে হেরে গেল। তার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবহারে, তার বাবা-মায়ের শিক্ষার প্রশংসা না করে পারল না।

হেডি তাদের দুজনকে নিয়ে ওখান থেকে চলে এলো। কিন্তু সেই মহিলাটি গেল না। কারণ, তাদের পিছু নিয়ে সে এই



শিশুটির মুখ থেকে পুনরায় সেই বাক্যটি শুনতে চাচ্ছে না। মহিলাটির জন্য ভালো হতো, এ কাজের জন্য তাকে না পাঠিয়ে অন্য কাউকে পাঠালে।

এই সময়ে হেডি বারবার ইমামার সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা করল। তার সন্তানদেরকেও ইমামার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কেননা, ইনায়া এখন অস্থির হয়ে উঠছে। ডাক্তার তাকে ইনকিউবেটরে শুয়ে থাকা সদ্যঃপ্রসূত হামিনকে তো দেখাল, কিন্তু ইমামা পর্যন্ত তাদের যেতে দিল না।

ডাক্তার আবারও হেডিকে বলল, জিবরিল ও ইনায়াকে যেন উনার দায়িত্বে দিয়ে দেয়। এ কথা শুনে জিবরিল আগের মতোই ইনায়ার দিকে ছুটে গেল। ঘুমন্ত চোখ ও ক্লান্ত দেহে সে ইনায়ার হাত ধরে বসে রইল। কেননা, মান্নি তাকে ইনায়ার যত্ন নিতে বলে গিয়েছে। সে ইনকিউবেটরে ঘুমন্ত শিশুটিকেও দেখল, তার মান্নি যাকে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু মান্নি

কোথায়? এই প্রশ্নটি এখন কেবল তাকে নয়; বরং হেডিকেও চিন্তিত করছে। হেডি এখন কিনশাসায় অবস্থিত সালারের অফিসের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সালার নিখোঁজ। এদিকে কঙ্গোতে বিশ্বব্যাংকের ওপর এক বিপর্যয় নেমে এসেছে। কেবল বিশ্বব্যাংকের ওপরেই নয়; বরং পশ্চিমা জাতিগুলোর সেই প্রতিনিধিদের ওপরও, যারা কঙ্গোতে ঔপনিবেশিকতার স্তম্ভ হয়ে বসে আছে।

পেট্রোস ইবাকা তার মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শুধু কঙ্গোর পিগমিদের কাছে নয়; বরং সমগ্র আফ্রিকার কাছে নায়ক হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের মানুষগুলো এ পর্যন্ত শুধু বিক্রীত শাসকদেরই দেখে এসেছে। যারা কোটি কোটি ডলারের কমিশন নিয়ে নিজে দেশের সবকিছু বিক্রি করতে সদা প্রস্তুত। এই অঞ্চলটি এই প্রথম নায়ক দেখছে। প্রাণ উৎসর্গকারী নায়ক। পেট্রোস ইবাকা সারা জীবন শান্তিপূর্ণ পথে সংগ্রাম করে গেছে। এবং মানুষকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার যে অসিয়ত প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে এই প্রথম সে তার

অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কারণে জনগণকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করেছে। এই জঙ্গলকে রক্ষা করতে হাল শ্বেতাঙ্গদের মেরে তাড়াতে হবে। এর জন্য যা কিছুই করতে হোক না কেন, তা-ই এখন তাদের করতে হবে।

ইবাকা তার সেই অসিয়তে বিশ্বব্যাংক, আমেরিকা এবং অন্যান্য বিশ্বশক্তিকে কঠোর সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছে। সে মুসলিম নয়। তবে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করত সে। সেই সুবাদে তার গোত্রীয় জনগণের প্রতি অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য 'জিহাদ'-এর চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো শব্দ সে খুঁজে পায়নি।

সে কেবল পিগমিদের উদ্দেশে বলেছে। তাদেরকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শহরে এসে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও তাদের সংগঠনের প্রতিটি অফিসে হামলা চালিয়ে সেখানকার কর্মকর্তাদের তাড়ানোর কথা বলেছে। কিন্তু আজ

কেবল পিগমিরাই ইবাকার আহ্বানে বিশ্বব্যাংক ও বিদেশি সংগঠনগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি; বরং কঙ্গোর সেই সব জনগণও ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যারা বছরের পর বছর উপনিবেশবাদীদের হাতে শোষণের শিকার হয়ে আসছে। তারা সবাই অবশেষে রাস্তায় নেমে এসেছে।

আজ রাতে কিনশাসায় সংঘটিত হয়েছে কিনশাসার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা। যেখানে একটি কৃষগাঙ্গও প্রাণ হারায়নি। বরং মরেছে কেবল শ্বেতাঙ্গরা। বিশ্বব্যাংকের দপ্তরগুলিতে হামলা চালিয়ে লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনাপ্রবাহ শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি। বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাসভবনগুলোতেও হামলা, লুটপাট এবং হত্যা সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে সালার সিকান্দারের বাড়িও ছিল। তবে সেটি সালার সিকান্দারের ব্যক্তিগত বাড়ি নয়; সেটি বরং বিশ্বব্যাংক প্রধানের বাসভবন। সে হিসেবে জনতা এটি ধ্বংস করে দেয়। এই রাতের দাঙ্গায় প্রায় একশত পঞ্চাশ জন আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান নিহত হয়েছে। তাদের

অধিকাংশই বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মী
ও তাদের পরিবারের সদস্য।

বিশ্বব্যাংকের চল্লিশ জন কর্মকর্তা এই দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে।
এদের কেউই নিচু পদের কর্মী নয়। তারা সবাই বিশ্বব্যাংকের
সিনিয়র ও উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সদস্য ও অফিসার।
যারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। বহু বছর ধরে
এই ব্যাংক এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত
রয়েছে এরাই। তারা বিশ্বব্যাংকের খুঁটি হয়ে পুরো কঙ্গোতে
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বিশ্বব্যাংকের ইতিহাসে এই প্রথম তারা
দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞের মুখোমুখি হলো। এর আগে পৃথিবীতে
বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলতে বোঝানো হতো, তাদের
কর্মকর্তাদের দিকে ডিম-টমেটো ছোড়া বা তাদের গায়ে লাল
রং ছুড়ে দেওয়া। আর সেসব প্রতিবাদের কোনো ফলাফল
হতো না। কিন্তু আজকের এটি হলো আদিম দুনিয়ায়
বসবাসকারীদের প্রতিবাদ। পিগমি ও কালো চামড়ার মানুষদের

প্রতিবাদ। যাদেরকে তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার মানুষেরা মানুষ মনে করে না।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট, বিশ্বব্যাংক এবং সিআইএ সদরদপ্তরের অপারেশন রুমগুলোর দেওয়ালে ঝোলে আছে বড় বড় পর্দা। সেসব পর্দায় সিনিয়র অফিসাররা আমেরিকা ও নিরাপদ স্থানে বসে কঙ্গোতে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ দমবন্ধ হয়ে, অসহায় চোখে দেখে যাচ্ছে।

সেগুলো বাঁচানোরও চেষ্টা চলছে। কিন্তু সাথে সাথে এই দাঙ্গায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না। হস্তক্ষেপ করতে গেলে, এটি বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য আরও ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে। বিশ্বব্যাংকের যে আর্থিক ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটেছে, তা কাটিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু যে সুনাম ও মর্যাদা তলিয়ে গিয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করতে হলে এই মুহূর্তে কোনো মুজেক্কার প্রয়োজন। এ ছাড়া সম্ভব নয়।

এই দাঙ্গা শুরুর ঠিক আগে অ্যান্ডারসন কুপার, পেট্রোস ইবাকার সঙ্গে তার অফ-ক্যামেরায় অনুষ্ঠিত সেশনটি প্রচার করেন। তখনো তিনি বুঝতে পারেননি, আজ রাতে কঙ্গোতে কী হতে চলেছে। যদি তার বা সিআইএর এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকত, তাহলে এই রেকর্ডটিও প্রচার হতো না। সেই অফ-ক্যামেরা সেশনে পেট্রোস ইবাকা আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংকের তীব্র সমালোচনা করে তাদের শকুন ও দস্যু বলে আখ্যা দিয়েছে। যারা কঙ্গোকে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে চলেছে, অথচ কেউ তাদের বাধা দিতে পারছে না।

পেট্রোস ইবাকার সেই শেষ সাক্ষাৎকার আফ্রিকার মানুষ কান্নাভেজা চোখে স্টেডিয়াম ও জনচত্বরের বিশাল স্ক্রিনে শুনছিল। তার পুরো বক্তব্যে বিশ্বব্যাংকের মাত্র একজন কর্মকর্তার প্রশংসা ছিল-যে কর্মকর্তারা বিশ্বব্যাংককে এই প্রকল্পের তদন্ত করতে বাধ্য করেছিল। বিশ্বব্যাংক যদি পুনরায় তদন্ত করতে রাজি না হয়, তাহলে চাকরি ছেড়ে দিবে বলেছিল। সেই সাক্ষাৎকারে পেট্রোস ইবাকা ওই প্রথম

সালারের জীবনের ঝুঁকির কথা প্রকাশ করে এবং বলে, যে শক্তিগুলো তাকে হত্যা করতে চায়, তারা সালার সিকান্দারকেও হত্যা করতে চেষ্টা করবে। ফলে পেট্রোস ইবাকার নামের সঙ্গে সঙ্গে সালার সিকান্দারের নামও মাত্র এক রাতেই পুরো আফ্রিকাজুড়ে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। আফ্রিকায় এই ধরনের খ্যাতি ও পরিচিতি, এই প্রথম কোনো বিদেশি ব্যক্তি অর্জন করেছে। অর্জন করেছে কোনো পাকিস্তানি নাগরিক সালার সিকান্দার!

এই প্রশ্নটি করল। : 'আমার বাচ্চারা কোথায়?' জ্ঞান ফিরে অ্যাটেনডেন্টকে দেখামাত্রই ইমামা প্রথম

: 'কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আপনার কাছে চলে আসবে। আপনাকে এখন এই হসপিটাল থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হবে।' অ্যাটেনডেন্ট অত্যন্ত মার্জিতভাবে বলল। ইমামা বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। অপারেশনের জায়গাটি এখন আর অবশ্যই নেই। মনে

হচ্ছিল, কেউ যেন তার তলপেটে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।
অ্যাটেনডেন্ট দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে শুতে সাহায্য করল।
অতঃপর সাইড টেবিলের ট্রে থেকে একটি ইনজেকশন তুলে
সিরিঞ্জ ভরতে লাগল।

: 'আমার কোনো ইনজেকশনের প্রয়োজন নেই। আমি আমার
বাচ্চাদের দেখতে চাই।' ইমামা অত্যন্ত তীব্র স্বরে বলল।

: 'এতে আপনার ব্যথা কমে যাবে। আপনার অবস্থা এখনো
ভালো নয়।' বলতে বলতে অ্যাটেনডেন্ট গ্লুকোজের বোতলে
সিরিঞ্জের সুচ ঢুকিয়ে দিল। ইমামা তার হাতের পিঠের ক্যানুলা
খুলে ফেলল।

: 'আমার আপাতত কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। আমি
আমার বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আর আমার স্বামীর
সঙ্গে কথা বলতে চাই।' এবার সে ক্ষতের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে
উঠে বসল। অ্যাটেনডেন্টের হাতও এবার ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে

দিল। অ্যাটেনডেন্ট খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, নিঃশব্দে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

অ্যাটেনডেন্ট প্রায় আধাঘণ্টা পর হেডি, জিবরিল ও ইনাযাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। রুমের দরজা খোলামাত্রই মাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জিবরিল ও ইনায়া চিৎকার করে তার দিকে দৌড়ে গেল। বিছানায় উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। তারা দেড় দিন পর আজ তাদের মাকে দেখছে। হেডিও ছুটে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল। দেড় দিন যাবৎ ইমামাকে না দেখে, ডাক্তারদের ক্রমাগত গড়িমসির ফলে হেডির মনে নানা রকম অদ্ভুত শঙ্কা জন্মেছিল। এখন তাকে সুস্থ দেখে সে নিজেও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল।

: 'তুমি কি সালারকে খবর দিয়েছ?' ইমামা হেডিকে দেখামাত্রই জিজ্ঞেস করল।

: গতকাল থেকে আমি উনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু উনার নম্বরে সংযোগ হচ্ছে না। আমি উনার অফিস স্টাফদের সঙ্গেও কথা বলেছি। তারাও বলছে, সালার সাহেবের সঙ্গে তাদেরও কোনো যোগাযোগ হচ্ছে না।

ইমামার মাথায় যেন হঠাৎ এক ধাক্কা লাগল। হেডির প্রথম বাক্যটিই তাকে চমকে

দিয়েছে।

: 'গতকাল?' সে বিড়বিড়িয়ে বলল। 'আজ তাহলে কত তারিখ?'

প্রত্যুত্তরে হেডি তাকে যে তারিখ বলল, তা তো তার হসপিটালে আসার তারিখ নয়। এটি তো দেড় দিন আগের তারিখ। সে এখানে আগের দিন দুপুরে এসেছিল, আর এখন পরের রাত। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না-তাকে এত দীর্ঘ সময় ঘুমের

ঘোরে রাখা হয়েছে। এদিকে গতকাল থেকে সালার কোনো যোগাযোগই করেনি। অথচ সে তো গতকালই আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছে। তাহলে যোগাযোগ হচ্ছে না কেন? হেডির থেকে তার ব্যাগ নিয়ে সালারকে কল করার চেষ্টা করল। অ্যাটেনডেন্ট জানাল, হাসপাতালের এই জায়গায় সিগন্যাল পাওয়া যায় না। ইমামা হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অতঃপর তার মোবাইলের সমস্ত চ্যাট অ্যাপ আর টেক্সট মেসেজ চেক করল। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাতে নতুন কোনো মেসেজও দেখতে পেল না।

প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ইমামা ভাবল, হাসপিটালে সিগন্যাল সমস্যার কারণেই হয়তো কোনো কল বা টেক্সট আসেনি। হেডিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, হেডি তাকে কঙ্গোতে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার সংবাদ দিল। সেই সঙ্গে এটাও জানাল যে, গোনস্বেতে তাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছে। ইমামা স্তব্ধ হয়ে গেল। হেডি এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু জানে না। কারণ, হাসপিটালে আসার পর বাচ্চাদের রেখে সে আর কোথাও

যায়নি। যতটুকু জেনেছে, সেগুলো বাড়ি থেকে ফোনে বা হসপিটালের টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদ থেকে জেনেছে। এই প্রথম ইমামা সালারকে নিয়ে অস্থির হতে লাগল। পেট্রোস ইবাকা যদি নিহত হয়ে থাকে, তাহলে সালার কোথায়? সেও তো ওয়াশিংটনে ছিল।

নিউজ চ্যানেলে প্রচারিত সকল খবরই হেডি তাকে বলল। পেট্রোস ইবাকা কীভাবে মারা গিয়েছে এবং তার মৃত্যুর সংবাদ কীভাবে সামনে এসেছে, সবকিছু। তার সঙ্গে শেষবার দেখা করতে গিয়েছিল যে মানুষটি, সে ছিল সালার সিকান্দার। আর * সেই সালার সিকান্দার তখন থেকেই নিখোঁজ। এই সংবাদ শুনে ইমামার হাত কাঁপতে লাগল। তার ধারণা ছিল, পৃথিবীতে সে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে জিবরিলকে, তারপর ইনায়াকে, তারপর সেই সন্তানকে, যাকে কেবল একদিন আগে প্রথমবার দেখেছে। কিন্তু এখন, যখন সালার হঠাৎ করে অদ্ভুতভাবে ক্ষণিকের জন্য তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে, তখন তার

স্থিরতা ভেঙে পড়ছে। তার মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সালারকে।

যন্ত্রণায় ন্যূজ শরীর নিয়ে, জিবরিল ও ইনাযাকে বিছানায় রেখে, টলতে টলতে ফোন হাতে সে রুম থেকে বেরিয়ে এলো। হাসপিটালের যেখানে গেলে তার সঙ্গে কলে কথা বলা যাবে, সেখানেই যেতে চাচ্ছে সে। তার বাড়িঘর লুটপাট ও ধ্বংসের কথাও তার মাথায় এলো না। বাড়িঘর, সন্তান-সবকিছু মুহূর্তেই তুচ্ছ হয়ে গেল সেই একজন ব্যক্তির কাছে, যে তার ছায়া হয়ে ছিল জীবনের প্রখর রোদে। তাকে আশ্রয় দিয়েছ পরম মমতায়। প্রচণ্ড তাপে যখন তার অস্তিত্ব পুড়ে যাচ্ছিল, তার পদযুগল ফোসকায় ভরে গিয়েছিল, সেই মানুষটি তাকে তখন আগলে রেখেছিল অতি যত্নে।

অ্যাটেনডেন্ট ও হেডি তাকে থামানোর চেষ্টা করল। তার পেছন পেছন আসতেও চাইল। কিন্তু সে থামল না। হেডিকে তার পেছনে আসতে দিল না। বরং তাকে বাচ্চাদের কাছে

থাকার নির্দেশ দিয়ে, খালি পায়ে, ফাটা ফোসকার মতো যন্ত্রণাকাতর দেহে, টলতে টলতে করিডোরে বেরিয়ে এলো। সালার এখন এখানে থাকলে, এই অবস্থায় তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই দিত না। কিন্তু সমস্যা তো এটাই যে, সালার এখানে নেই। তাকে খুঁজে পেতেই সে অস্থির হয়ে পড়েছে। হসপিটালের এমন একটি জায়গা খুঁজছে, যেখানে সিগন্যাল পাওয়া যাবে। যেখান থেকে সে সালারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, তার কণ্ঠ শুনতে পারবে। তার শরীর ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছে। এটি আবহাওয়াজনিত ঠান্ডা নয়; এটি আতঙ্ক ও ভয়জনিত ঠান্ডা। যে ভয় তার শিরার রক্ত হিম করে দিচ্ছে। কেবল হাতই নয়, বরং পুরো শরীরকে কাঁপাচ্ছে বৈশাখী পাতার মতো।

: আপনার স্বামী একদম ঠিক আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তার সঙ্গে আপনার কথা বলিয়ে দিচ্ছি।



ইমামা টলমল পায়ে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল।
অ্যাটেনডেন্টের গলা শুনে ফিরে দাঁড়াল। ওখানেই দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে যেন মোমের মতো গলতে লাগল সে। ধূসর চেহারা,
কম্পনরত দেহ, নিশ্চল নীরব কান্না। ইমামা ছিল সন্তানদের
প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী মা। আর আল্লাহ তো তার রব। তাহলে
তিনি কীভাবে তার বান্দাকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারেন!
সাহায্যের জন্য ইমামা যাকে ডাকল, সেই রবই তাকে সাড়া
দিলেন। তার অবস্থা দেখে, তার প্রতি অ্যাটেনডেন্টের মনে দয়া
আসেনি। তার প্রতি দয়া তো এসেছে উচ্চতম মহান রবের।
তাই তো তিনি সালারের সঙ্গে যোগাযোগের একটি পথ করে
দিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই তার বান্দার প্রতি পরম দয়াশীল।

সিআইএ এবং বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি আমেরিকান সরকারও
এই মুহূর্তে সালারের প্রয়োজন অনুভব করছে। কঙ্গোতে এই
সময়ে বিশ্বব্যাংকের সম্মান ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা কেবল
সালার সিকান্দারের হাতেই আছে। ক্ষমতার খেলা আজ
একজনের হাতে চলে এসেছে। পেট্রোস হবাকার মৃত্যু

আফ্রিকায় যে আগুন জ্বালিয়েছে, সেই আগুন শুধু সালার সিকান্দারই নেভাতে পারবে। সিদ্ধান্ত দেৱিতে অপাৰেশনের বিনাশী ফলাফল হিসেবে সিআইএ-র বহু সদস্যের চাকরি হাতছাড়া হলেও, তা নেওয়া হলো। বিশ্বব্যাংক সালার সিকান্দারকেই বেছে নিল। এই হবে। সেই সাথে বিশ্বব্যাংকের অনেকেরও মাথা কাটা পড়বে। সেই কাটা মাথাগুলোর মুকুট এখন অন্য কারও মাথায় পৰানো হবে।

এদিকে সালার সিকান্দার এসবের কিছুই জানে না। হোটেল রুমে বসে সে এখনো নিউজ চ্যানেল দেখছে। কিছুক্ষণ আগে সে তার পাপার সঙ্গে কথা বলল। সিকান্দার উসমান জানালেন, কঙ্গোর পরিস্থিতির কারণে আপাতত কঙ্গোর ফ্লাইট ও ভিসা কোনোটিই পাওয়া যাচ্ছে না। সালার সিকান্দারের যেন মাথাব্যথা হতে শুরু করল। তার সেই মাইগ্ৰেন যেন, এই শোকের মুহূর্তে তার দুঃখ ভোলাতে হাজির হয়েছে।

সালার এখন হোটেলে ফিরে এসেছে। এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে তার সময় কাটছে। টিভির সামনে দাঁড়িয়ে সে, সালার সিকান্দারকে নিয়ে প্রচারিত সংবাদগুলো আর কঙ্গোর রক্ত হিম-করা দৃশ্যগুলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন সে তৃতীয় কোনো মানুষ-সালার সিকান্দারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই কঙ্গোর সঙ্গেও। সেখানে ইনায়া আর জিবরিলকে ফেলে আসা মানুষটিও যেন অন্য কেউ। তাদেরকে ভুলে যাওয়া মানুষটিও যেন ভিন্ন কেউ; সেটি সে নয়।

: 'What is next to ecstasy? পরমানন্দের পর কী?' আহ, কী প্রশ্ন! কী স্মরণ করিয়ে দিল তাকে! কী মনে পড়ে গেল তার!

: Pain. যন্ত্রণা।

: And what is next to pain? যন্ত্রণার পর কী?

বহু বছর পর এই প্রশ্নোত্তরগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। যন্ত্রণার পর কিছুই নেই, তাকে এটি বোঝাতে অবশেষে কতগুলো যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি তার জীবনে এসেছে! যন্ত্রণার পর কেবল অনন্তিত্ব, শূন্যতা। সে আবারও সেই অনন্তিত্বের অনুভূতিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী এমন এক স্থানে

ঝুলে আছে সে, যেখান থেকে না উপরে উঠতে পারছে, আর না নিচে নামতে।

: And what is next to nothingness? এই অনন্তিত্ব ও শূন্যতার পর কী? তার প্রশ্নটি এখন উপহাস করে তার সামনে এসেই দাঁড়াল।

: Hell. জাহান্নাম।

'জীবনের এই পরিস্থিতিই তো জাহান্নাম। এ ছাড়া জাহান্নাম বলতে আর কোনো জায়গা আছে কি?' সে যেন অবচেতনেই আতঁনাদ করতে করতে ভাবল।

: And what is next to hell? জাহান্নামের পর কী?

হ্যাঁ, সে জাহান্নামের পরের জায়গাটিতে যেতে চেয়েছিল। এইসব কষ্ট, যন্ত্রণা, পরীক্ষা মাড়িয়ে, জাহান্নাম পেরিয়ে আরও সামনে। যেখানে রয়েছে জান্নাত, কিংবা জান্নাতি সুখের মুহূর্ত!

◇◇◇

দুদিন পর তার সেলফোন যেন ঘুম থেকে নয়, বরং মৃত্যু থেকে জেগে উঠল। রিংটোনে সেই সুর ও আলো-সে ভাবল, সে স্বপ্ন দেখছে। এই গানটি সে ইমামার কলার আইডির জন্য সেভ করে রেখেছিল।

: 'If Tomorrow Never Comes....'- রোনান কেটিংয়ের বিখ্যাত গানটির কলারটিউন। সেলফোনে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর ঝলমলে নাম দেখে সালারের মনে হলো, সে সত্যিই কোনো জান্নাতে আছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে কল রিসিভ করল, কিন্তু 'হ্যালো' বলতে পারল না। হ্যালো ইমামাই বলল; অস্থির গলায়। সে বলতেই পারল না। নিশ্বাস নিতে পারছে, এটাই অনেক কিছু। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, এটাও এক বিস্ময়। অপর পাশ থেকে ইমামা অস্থির হয়ে তাকে ডেকে যাচ্ছে। ক্রমাগত। সালারের পুরো অস্তিত্ব যেন কাঁপতে শুরু করেছে। এই কণ্ঠ যেন তাকে পুনর্জীবিত করছে। যেন বৃষ্টি পেয়ে শুকনো, জরাজীর্ণ গাছে ফুটে ওঠা বসন্তের সবুজ কুঁড়ি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে চাচ্ছে। কিন্তু তার সামনে কাঁদতে পারছে না। সে পুরুষ। তার এখন কথা বলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলা জরুরি।

: 'ইমামা!' সে তার গলায় আটকানো নামটি এবার মুক্ত করল। অপরদিকে ইমামা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করছে। সে একজন

নারী। এটি সে খুব সহজেই করতে পারে। কেননা, তাকে সাহসিকতা ও পুরুষত্বের ঝান্ডা উড্ডীন করতে হয় না। সালার নিঃশব্দে কাঁদছে। তারা এখন জাহান্নাম অতিক্রম করে চলে এসেছে। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছে না যে, তুমি কোথায় ছিলে? কেন কাঁদছ? নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে সালার, ওভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামার ফুপানো কান্না শুনতে শুনতে জুতা খুলে ফেলল। অতঃপর হাঁটু গেড়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

হায়! কেউ যদি তাকে এখন জিজ্ঞেস করত! আল্লাহ কোথায়? কীভাবে বান্দার ফরিয়াদ শোনেন? উত্তরে সে বলত, তার শাহরগের কাছে। বরং তার চেয়েও অধিক নিকটে। বহু বছর আগে, ওই মেয়েটি ইমামা না হওয়ায়, নিষিদ্ধ পল্লির সেই যৌনকর্মীর কামরায় সে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল। আর আজ, ফোনের ওপাশে ইমামা হওয়ায়, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। পূর্ব-পশ্চিম তাঁরই মালিকানাধীন। তিনি 'কুন' বললেই হয়ে যায়; কল্পনাভীত

ও বর্ণনাভীতভাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বশক্তিমান।

: 'He is cute.' হামিনের দিকে তাকিয়ে তিন শব্দে জিবরিল এই মন্তব্যটি করল। তার পরিবারে আগত এই নতুন সদস্যের ব্যাপারে এটি একটি সংযত ও সূক্ষ্ম মন্তব্য। নতুন সদস্যটি এখনো আগের মতোই ইনকিউবেটরে শুয়ে আছে। ইনায়া এদিকে প্রবল আগ্রহ ও মমতা নিয়ে তার কচি ছোট ভাইটির দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মাস ধরেই যার আগমনের কথা সে শুনে আসছে। যাকে এক পরি, পরিদের রাজ্য থেকে নিয়ে এসে তাদের বাড়িতে রেখে যাবে। ইমামার মুখে এসব শুনে, ছোট ভাইয়ের আগমনের চেয়ে সেই পরিকে দেখার আগ্রহ তার মধ্যে বেশি হয়েছিল। যে পরি প্রতিদিন তাদের বাড়িতে এসে খোঁজ নিয়ে যায়, সত্যিই তাদের একজন ভাইয়ের প্রয়োজন আছে কি না। ইমামার কাছে সে ছোট ভাইয়ের চেয়ে বেশি পরির ব্যাপারে প্রবল আগ্রহে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করত। জিবরিল তখন তাদের পাশে বসে গল্পের বইয়ের পাতা

উলটাতে উলটাতে তাদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনত। সে না কখনো আগত ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করত, আর না পরির ব্যাপারে। কেননা সে জানত, মাম্মি মিথ্যে বলছে। পরি বলতে কিছুই নেই, আর না তার ভাইকে কোনো পরি এনে দিয়ে যাবে। ভাই আসবে হসপিটাল থেকে। আর সেই হসপিটালে স্বয়ং নিজেকে যেতে হবে। এমনকি তা গাড়িতে চেপে। যে হসপিটালে সে কিছুদিন পরপর মায়ের সঙ্গে যায়। তবে এই তথ্যটি সে শুধু ইনায়াকে একান্তে জানিয়েছিল। ইমামার আড়ালে।

: 'মাম্মি কি তাহলে মিথ্যে বলে?' ইনায়া তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

সে বেশ প্রজ্ঞাপূর্ণ ভঙ্গিতে বোনকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এভাবেই তার স্পষ্ট ও সাবলীল : 'না, তিনি মিথ্যে বলেন না, কিন্তু তুমি ছোট বলে তিনি তোমাকে এসব বলেন।' কথা বলা শুনে, ইনায়াও খুব দ্রুত কথা বলা শিখে ফেলেছিল।

তারা সবাই এখন আমেরিকান দূতাবাসের ভেতর একটি ছোট্ট মেডিক্যাল ইউনিটে আছে। তাদের জীবন লন্ডভন্ড করতে যে ঝড় এসেছিল, তা কিছুই না করে গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। তিন সন্তান এবং সালারের সঙ্গে কথা বলে অবশেষে ইমামা এখন নিশ্চিত। তারপর ধীরে ধীরে পাকিস্তানে সবার সঙ্গে কথা বলল। সবাইকে তার সুস্থতার সংবাদ দিল। সবাই হামিনকে শুভকামনা ও শুভেচ্ছা জানাল। বাচ্চার লিঙ্গ জানার পর কয়েক মাস আগেই তারা তার নাম ঠিক করে রেখেছিল।

হামিনের অবস্থা শুরু থেকেই ভালো। সে দুর্বল, কিন্তু সুস্থ ও সক্রিয়। এই মুহূর্তে হামিনের জন্ম ও ইমামার সার্জারি না হলে সালার এখনই তাদেরকে ওয়াশিংটনে নিয়ে যেত। কিন্তু আপাতত ইমামা ও হামিন বিমানে ভ্রমণ করতে পারবে না। তাই সালারই এখন কঙ্গো আসছে। আর তারা আমেরিকান দূতাবাসে তার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। এই দূতাবাসে আরও অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে। যতদিন তাদেরকে এখান থেকে

সরিয়ে নেওয়া না হয়, অথবা কঙ্গোর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসে, ততদিন তাদেরকে এখানেই রাখা হবে।

ইমামা ও তার সন্তানদের এখানে 'হাই প্রোফাইল গেস্ট' মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই মর্যাদা পাওয়ার আগে আমেরিকায় তার স্বামীর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, ইমামা যদি তা জানতে পারে, তাহলে মরে গেলেও সে আমেরিকান দূতাবাসের মুখও দেখবে না। সালার তার কাছে সবকিছু গোপন রেখেছে। ফোনে তারা দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে পারেনি। বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে একটি জরুরি মিটিং থাকায়, সালার তাকে বিশ্রাম নিতে বলে ফোন রেখে দিয়েছিল। যোগাযোগহীনতার কারণ হিসেবে সে ইমামাকে বলেছে, সিগন্যাল ও স্যাটেলাইটের কিছু সমস্যার ফলে এমনটা হয়েছে। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারেনি। আর এজন্য সে এমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

পেট্রোস ইবাকা সম্পর্কে ইমামা জানতে চাইলে, সালার তাকে আশ্বস্ত করে বলে, সবকিছু ঠিক আছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। এতে তার জীবনেরও কোনো ঝুঁকি নেই। এ বিষয়ে পুলিশের সঙ্গেও সে যোগাযোগ করেছে। এতে ইমামা আশ্বস্ত হয়। যোগাযোগহীনতার কারণ জানার পরও তার দুশ্চিন্তা পুরোপুরি শেষ হলো না। তাই চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঘুমাতে পারছে না। দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার মাঝে ওষুধ ছাড়া ঘুমাতে পারবে না সে। আবার ওষুধ খেয়ে সে ঘুমাতেও চাচ্ছে না এখন। হেডি এখনো তার পাশেই আছে। সে রুমে পায়চারি করতে করতে টিভিতে কঙ্গোর পরিস্থিতি নিয়ে প্রচারিত সংবাদগুলো দেখছে। দেশি-বিদেশি সব চ্যানেলই ঘুরেফিরে দেখছে। সংবাদগুলোতে পেট্রোস ইবাকার সঙ্গে সালার সিকান্দারের নামও উল্লেখ করা হচ্ছে। যেখানেই ইবাকার নাম, সেখানেই সালার সিকান্দারেরও নাম। ইবাকার সাক্ষাৎকারের যেখানে যেখানে সালারের প্রশংসা করেছে, সে অংশটুকু বারবার দেখানো হচ্ছে। সাক্ষাৎকারে ইবাকা, সালার ও তার নিজের জীবনের ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছে। সালারের সঙ্গে কথা বলে ইমামার যে দুশ্চিন্তা উধাও

হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কারণ, এসব ব্যাপারে সালার তাকে একদম কিছুই জানায়নি।

বিগত কয়েক মাস ধরে সালার কঙ্গোর জঙ্গলগুলোতে ইবাকার সঙ্গে অনেক বেশি যাতায়াত করেছে। ইমামা কেবল জানত এবং বিশ্বাস করত যে, এটি একটি অফিসিয়াল কাজ। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্পের ব্যাপারে সালার সিকান্দারের মতভিন্ন রিপোর্টের কথা, আজ প্রথম সে জানতে পারল। আর সেটাও ইবাকার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। বিষয়টি এতটা সরল ও পরিচ্ছন্ন নয়; যতটা ওয়াশিংটনে বসে সালার তাকে বলছিল। সালার বিপদে আছে, কিন্তু তাকে কেন জানাল না, ইমামা তা এখন উপলব্ধি করতে পারছে।

ইমামা তখন কিনশাসায় বসে ফোনে সব প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল না। সে সালারের সামনে বসে সরাসরি তার মুখ থেকে প্রকৃত ঘটনা শুনতে চাচ্ছিল।



: 'মান্নি!' জিবরিল তাকে ডাক দিল। সে চিন্তার মাঝেও চমকে গেল। 'Who wants to kill Papa? পাপাকে কে হত্যা করতে চায়?'

ইমামা তার প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে গেল। চার বছরের ছোট্ট সেই শিশু উদ্‌যুক্তভাবে তার কাছে জিজ্ঞেস করছে, তার পাপাকে কে মারতে চায়। টিভি দেখার সময় ইমামা বুঝতেই পারেনি, জিবরিলও তার সঙ্গে এসব দেখছে এবং সবই বুঝতে পারছে। সে তার বাবার মতো অত্যন্ত প্রতিভাবান। এজন্য ইমামা ও সালার তার সামনে কথা বলার সময় সতর্ক থাকে। ইমামা টিভি বন্ধ করে দিল। সে এখন তাকে বুঝিয়ে নিশ্চিত করতে চাচ্ছে।

: 'No one wants to kill Papa. কেউ তোমার পাপাকে মারতে চায় না।' জিবরিলকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে সে বলল। ইমামা তাকিয়ায় ভর করে আধশোয়া হয়ে আছে। তারপর সে

জিবরিলের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আল্লাহ তোমার পাপাকে হেফাজত করছেন, আর আমাদেরকেও।'

: আল্লাহ পেট্রোস ইবাকাকে হেফাজত করলেন না কেন?

ইমামা নিরুত্তর হয়ে গেল। বড়দের প্রশ্নের উত্তর সহজ; কিন্তু বাচ্চাদের নয়। জিবরিলের প্রশ্ন সবসময়ই তাকে এমন নিরুত্তর করে দেয়। সে কোনো তর্ক করে না, শুধু প্রশ্ন করে। তারপর উত্তর শুনে ভাবে আর নিঃশব্দে চলে যায়। কিন্তু ইমামা কখনো বুঝতে পারে না, তার উত্তরে সে সন্তুষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছে, নাকি না? সে প্রচণ্ড গভীর মননের অধিকারী শিশু, ইমামা তা বুঝতে পারে। সে অত্যন্ত সংবেদনশীল, এটা ইমামার কাছেও অজানা নয়। ইমামা জানে, জিবরিল তার সব কথা বোঝে। কিন্তু এটি জানে না যে, সে তাকে ও সালারকে নিয়ে নিজে নিজে আরও কত কী ভাবে!

: 'দেখো তো তোমার ছোট ভাইটাকো কেমন লাগছে তাকে?'
ইমামা মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করল।

: 'He is cute. সে অনেক কিউট।' হামিনকে গভীরভাবে
পর্যবেক্ষণ করে সে উত্তর করল। কিন্তু এই উত্তরে কোনো
আবেগ, আনন্দ বা বিস্ময় নেই।

: 'তোমার মতো, তাই না?' ইমামা তাকে খুশি করার চেষ্টা
করল।

: 'আমার তো মনে হয় না।' জিবরিল আরও খানিক সতর্ক
পর্যবেক্ষণ করে সাথে সাথে মাকে উত্তর করল। তার হয়তো
মায়ের এই মন্তব্য ও তুলনাটি পছন্দ হয়নি।

: 'আচ্ছা, তাহলে তোমার থেকে ভিন্ন কীভাবে?' ইমামা আগ্রহী
হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: তার মোচ আছে, আমার নেই।

ইমামা অবচেতনে হেসে ফেলল। সে হামিনের চেহারা ও ঠোঁটের উপরে প্রকাশিত পশমগুলোর দিকে লক্ষ করে বলেছে। ইনায়া এখনো ইনকিউবেটরের দেওয়ালের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। যেন হামিন কোনো চিড়িয়াখানার দর্শনীয় প্রাণী। যাকে সে কাচের দেওয়াল গলে তার নাক ও হাত টিপে মুগ্ধ চোখে দেখছে।

: 'একে আমার মতো মনে হয়।' ইনায়া খুব শান্তস্বরে বলল। ইমামা তার শান্ত গলা শুনে হাসতে লাগল। ইনায়া তাকে হাসতে সাবধান করল, ঘুমন্ত ভাই যেন জেগে না ওঠে। তারা বুঝতে পারছে না, সে ঘুমন্ত ভাই নয়; বরং এক ঘুমন্ত প্রাণ, যে তার বাবার আগমনের অপেক্ষায় আছে।

সালার সিকান্দার ও ইমামা সবসময় নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে। কেননা, তাদের সন্তানগুলো তাদেরকে কখনো



বিরক্ত করে না। সেই সঙ্গে কখনো কোনো জটিলতা তৈরি করে না। তাদের পরিবার পরিমণ্ডল, বন্ধুবান্ধব এবং জীবনিলের স্কুলেও সবাই তাদেরকে আদর্শ শিশু এবং তাদের বাবা-মাকে আদর্শ অভিভাবক হিসেবেই চিনে। আর কঙ্গোর দাঙ্গায় জন্ম নেওয়া এই তৃতীয় সন্তানটিকে, তাদের শান্তি ও স্বস্তি ছিনিয়ে নিয়ে, সত্যিকার অর্থেই তাদের দৃষ্টান্ত বানানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। সিআইএ যে শিশুটিকে ওষুধের মাধ্যমে তিন সপ্তাহ আগেই ভূমিষ্ঠ করিয়েছে, তারা যদি এই মুহাম্মদ হামিন সিকান্দারের সঙ্গে পরিচিত হতো, তাহলে তারা তার জন্মকে অন্তত তিনশ বছর পিছিয়ে দিত!

বিশ্বব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরদের একটি জরুরি সভায়, সর্বসম্মতিক্রমে সালার সিকান্দারকে আফ্রিকার বিশ্বব্যাংকের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হলো। বিশ্বব্যাংকের ইতিহাসে এই পদটি প্রথমবার কোনো নন-আফ্রিকানকে দেওয়া হলো। এর কারণও সারা বিশ্বের সামনে স্পষ্ট।

সালার সিকান্দার চ্যানেলে চলমান ব্রেকিং নিউজ এবং অ্যালাটের মধ্যে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সাক্ষাৎ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের অনুরোধেই হচ্ছে। সালার গত দুদিন আগে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুনয়-বিনয় করে ফিরেছে। ব্যর্থ হয়ে সদর দপ্তর থেকে কুকুরের মতো বেরিয়ে গিয়েছে। আর এখন খোদ প্রেসিডেন্টের আবদার, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ব্যবহৃত গাড়ি লিমোজিনে করে, শোফারসহ, রাজাদের মতো নিরাপত্তা এবং প্রটোকলের সঙ্গে তাকে ডাকা হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম সে লিমোজিনে বসছে না; আর না এই প্রথম নিরাপত্তা ও প্রটোকলের সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম দম বন্ধ অনুভূতি অনুভব করছে। যে অনুভূতি তার বুকের পিঞ্জরে বন্দি পাখি অনুভব করছে।

হেডকোয়ার্টারের বাইরে মিডিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের মেশিনগানের মতো ক্যামেরা ও সাউন্ড সিস্টেমের প্রস্তুতি



নিচ্ছে। তাতে বিদ্যুৎচমকের মতো ফ্ল্যাশ লাইটের আলো চমকাচ্ছে। তাদেরকে এখানে আসার সংবাদ কে দিল? সালার সিকান্দারের কাছে এটি আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। সে এখন সার্কাসের সেই প্রাণীর মতো, যাকে ব্যাংক ও সিআইএ নাচিয়ে মানুষকে দেখাতে চাচ্ছে। আর সার্কাসের এই প্রাণীটি অর্থাৎ সালার সিকান্দার এখন লিমোজিন থেকে নেমে, ফ্ল্যাশ লাইট ও প্রশ্নের ঝড়ের মাঝে, তার পরবর্তী কার্য-কৌশল ঠিক করছে। তাকে যদি নাচতেই হয়, তাহলে সে নিজ শর্তমাফিক নাচবে। পুতুল হতে হলে, হবে। তবে অন্য কারও হাতের ইশারায় নয়। লিমোজিন থেকে নেমে সে তার খোলা কোটের বোতাম লাগিয়ে দিল। ফ্ল্যাশ লাইটের ঝলকানির মাঝে, ওয়ার্নিং টেপের ওপারে দাঁড়ানো ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিকদের ভিড় এড়িয়ে, বড় বড় পা ফেলে সে ভেতরে চলে গেল।

বোর্ডরুমে উপস্থিত কিছু নতুন লোক ছাড়া বাকি সবার সাথে তার কয়দিন আগেই দেখা হয়েছে। কিন্তু এখন সবকিছু বদলে গিয়েছে। বাহির এবং ভেতর, দুটোই। বোর্ডরুমে তাকে

নায়কের মতো অভ্যর্থনা জানানো হলো। তালি আর স্বাগত স্লোগানে মুখর হয়ে উঠল পুরো বোর্ডরুম। সে যেন কোনো যুদ্ধ জিতে, কোনো সম্রাটের দরবারে বড় সম্মাননা নিতে এসেছে। সবার মুখে ফুটে আছে হাসি ও কোমলতা। চোখে প্রশংসার ঝিলিক। ঠোঁটে প্রশংসা ও শুভেচ্ছাবাণী। উষ্ণ করমর্দন আর আলিঙ্গনে ভরা এই মুহূর্তে সালার সিকান্দার শুধু এটাই বুঝতে পারছে না যে, সে এমন কী করে এসেছে। যার জন্য এমন মুখর অভ্যর্থনা!

গোল টেবিলে, প্রেসিডেন্টের সিটের ডানপাশে, প্রথম আসনেই তাকে বসানো হলো। যে প্রেসিডেন্টের অহংকারা গলা আর উদ্ধত ভঙ্গি কিছুদিন আগে তার আত্মসম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল, সেই প্রেসিডেন্টের পাশে। মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সে কিছুই ভোলে না। না ভালো, না মন্দ। না হীনতা, না ত্যাগ, না অবহেলা, না উপকার, না সম্মান, না অপমান। কিছুই ভোলে না মানুষ। সালার সিকান্দারও এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী মানুষ। তার সাথে যা হয়েছে,

তা ছিল পাথরে খোদাইয়ের মতো স্থায়ী। আর এখন যা হচ্ছে,
তা পানির ছিটার মতো অস্থায়ী।

তার আসার ঠিক পাঁচ মিনিট পরই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট
বোর্ডরুমে প্রবেশ করলেন। সালার সিকান্দারও অন্য সবার
মতোই তার প্রতি সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়াল।

: 'বিশ্বব্যাংক আপনার জন্য গর্বিত।' অভ্যর্থনা বাক্যের পর
প্রেসিডেন্ট সর্বপ্রথম এই বাক্যটিই বললেন। তা শুনে সালারের
হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছা করল। এই মুহূর্তে সিকান্দার
উসমানের কথা তার মনে পড়ল। ছোটবেলায় স্কুলে তার
শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হলে, তিনি তার এই পঞ্চম 'দুট্টু'
সন্তানকে এভাবে প্রশংসা করে কথা বলতেন। কারণ,
সাইকিয়াট্রিস্ট উনাকে বলে দিয়েছিলেন, তিরস্কারমূলক শব্দ
তার এই মেধাবী ছেলের মন ও মস্তিষ্কে খারাপ প্রভাব ফেলতে
পারে। তাই তিনি তার জ্বালাতনে অতিষ্ঠ থাকলেও, তাকে
সবসময় বলতেন, তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত।



বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট সালারের বাপ নয়; কিন্তু আমেরিকা তাদের বাপ। তাই এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট তার পদ নিয়ে চিন্তিত। ওদিকে আমেরিকা চিন্তিত আফ্রিকায় তাদের স্বার্থ ও সুনাম নিয়ে। তাদের দুজনের জন্য সালার সিকান্দার এখন মাসিহা-স্বরূপ। যে সালার এখন সবকিছু করতে পারে; অন্তত আফ্রিকায়।

প্রেসিডেন্টের প্রশংসামূলক বাক্যের পর বোর্ডরুমে উপস্থিত সবাই হাততালি দিতে লাগল। যেন তারা প্রেসিডেন্টের প্রশংসার সঙ্গে একমত। সালার উনাকে ধন্যবাদ জানাল। প্রেসিডেন্ট তার আসন গ্রহণ করার পর, সালারও তার আসনে বসে পড়ল। প্রেসিডেন্ট এখন কঙ্গোর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। সেখানকার হামলায় বিশ্বব্যাংকের আহত ও নিহত কর্মীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন। তারপর কয়েক বাক্যে ইবাকার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এরপর তিনি সালার সিকান্দারের রিপোর্টের

প্রসঙ্গে এলেন। এই রিপোর্টটি ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নর্স শুধু পড়েই দেখেনি, বরং তাতে উল্লিখিত সব সুপারিশ মেনে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশনও গঠন করেছে। এই কমিশনটি প্রকল্পকে সাময়িকভাবে স্থগিত করে নতুন করে এর পর্যালোচনা করবে।

এতে সালার সিকান্দার হতভম্ব কিংবা প্রভাবিত, কোনটাই হলো না। কারণ সে জানত, বিশ্বব্যাংক অন্তত এতটুকু পদক্ষেপ না নিলে দ্বিতীয়বার আর কঙ্গোতে প্রবেশ করতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে ওই প্রকল্পটি তাদের বন্ধ করতেই হতো। আর যদি তারা এটা বোঝাতে চায় যে, সালারের রিপোর্টটি তারা আগে পড়েনি, বরং এখন পড়েই সাথে সাথে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছে; তাহলে তাদের হাতে এর বাইরে অন্য কোনো বিকল্প নেই বলেই করেছে। এটি ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিআইএ-এর প্রথম কৌশল। এই প্যাণ্ডোরার বক্সটি তাদের কারণেই খোলা হয়েছিল। আর এখন এটি বন্ধ করার দায়িত্বও তাদেরই নিতে হচ্ছে। যে আক্রমণাত্মক কৌশলকে তারা সেরা কৌশল ভেবে প্রয়োগ করেছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই এখন তাদেরকে

পেছনে গিয়ে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

সালার সিকান্দার চুপচাপ প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে যাচ্ছে। বক্তৃতা শেষে প্রেসিডেন্ট সালার সিকান্দারের নতুন পদ অর্পণের ঘোষণা করলেন। বোর্ডরুমে প্রতিধ্বনিত হাততালির মধ্যে নির্বিকার চেহারা সালার তার গুরুত্বহীন কাজের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ পদটির প্রকৃত গুরুত্ব মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছে। কয়দিন আগে বোর্ডরুমে তার দেওয়া প্রেজেন্টেশনটি সে কয়েক মাস আগে বিশ্বব্যাংককে পাঠিয়েছিল। এই প্রেজেন্টেশনের ভিত্তিতেই তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর এখন সেই রিপোর্টটি তারা বোর্ডরুমে বসে এমন ভাব ধরে দেখছে, যেন জীবনে এই প্রথম তারা এটি দেখছে। এর আগে এর নামগন্ধও শোনেনি। তারা যদি অভিনেতা হয়ে থাকে, তাহলে থার্ড ক্লাস কোনো থিয়েটার কোম্পানির অভিনেতা। আর যদি তারা ভণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে তা উচ্চমানের।

এখানে বসে বসে সালারের মনে হচ্ছে, সে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সদরদপ্তরে নয়; বরং কোনো সস্তা থিয়েটারে চলমান হাস্যকর নাটকের সামনে বসে আছে। যেখানে প্রতিটি অভিনেতাই ওভার অ্যাকটিং করছে। রিপোর্টের প্রতিটি সংলাপ ও অভিব্যক্তির পর, রেকর্ড করা হাসি ও হাততালি বাজিয়ে তা মাস্টারপিস প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

: 'আমি প্রেসিডেন্ট ও বোর্ডে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাকে এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এই রিপোর্টকে ভিত্তি করে এতে উপস্থাপিত সমস্ত সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়েছে। আশা করি, এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপককে পুনরায় কঙ্গোতে তার সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।' মিটিংয়ে সালার সিকান্দারকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলায়, সে খুব সংক্ষেপে এই কথাগুলো বলল। সরাসরি মূল কথা। ফরমাল ও

প্রফেশনালভাবে। একদম নিরাবেগ ও নিষ্প্রাণ। যে দ্ব্যর্থহীন ভাষার জন্য সে প্রসিদ্ধ, সেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

'আমি কৃতজ্ঞ যে, বিশ্বব্যাংক ও বোর্ড অব গভর্নর্স আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তবে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু ব্যস্ততার কারণে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারব না। আমি নিশ্চিত যে, এই পদের জন্য বিশ্বব্যাংকের টিমে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত অনেক ব্যক্তি রয়েছেন।'

সালারের শেষ কথাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট চিন্তিত চেহারায তার আসনের দিক পরিবর্তন করলেন। তার প্রত্যাশা ছিল, শুধু তার নয়; বরং উপস্থিত সবার প্রত্যাশা ছিল-এই প্রস্তাবে সালার সিকান্দারের উত্তর কী হতে পারে। তা সত্ত্বেও তিনি উদবিগ্ন হচ্ছেন। এই সময় তার সুনাম রক্ষা করা অপরিহার্য। আর এটি এখন কেবল সালারই করতে পারে।

মিটিংটি পরবর্তী দু-তিন মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এরপর সালার সিকান্দার বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাতে বসল। এখানে পরিবেশ ভিন্ন এবং আলোচ্য বিষয়ও সম্পূর্ণ অন্য।

: 'আমার রুম থেকে চুরি হওয়ার সমস্ত জিনিস ফেরত চাই। ল্যাপটপ, ট্রাভেল ডকুমেন্টস এবং আমার অন্যান্য কাগজপত্র।' সালার আজকের মিটিংয়ে মূলত এই উদ্দেশ্যেই এসেছে। তার হারানো জিনিসগুলো ফেরত নেওয়ার দাবিতে। আর সুযোগ পেতেই সে তার দাবি উপস্থাপন করে বসল।

: 'আপনার রুম থেকে চুরি হওয়া জিনিসগুলোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের কী সম্পর্ক?' প্রেসিডেন্ট না জানার ভান করার প্রথম ও শেষ চেষ্টা করলেন। সালার উনার কথা থামিয়ে দিল।

: আমার জিনিসগুলো ফিরে না পেলে, এখানে আমি আর কোনো বিষয়ে কথা বলতে বসছি না।

প্রেসিডেন্ট তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর
সুর নরম করে তিনি যেন এই দাবি মেনে নিলেন।

: আমি নির্দেশ দিচ্ছি, অতি দ্রুত যেন আপনার ক্ষতিপূরণ প্রদান
করা হয়। এবং আপনার ডকুমেন্টগুলোর বিকল্প সরবরাহ করা
হয়।

সালার তার সেই কঠোর স্থিরতা নিয়েই বলল, 'আমি আমার
জিনিসগুলোই চাই। এর ক্ষতিপূরণ বা কোনো বিকল্প চাই না।
আমি আমার ওরিজিনাল ডকুমেন্টগুলোই চাই।'

দীর্ঘ নীরবতার পর প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে,
পেয়ে যাবেন। তবে কঙ্গোতে বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকার
আপনার প্রয়োজন।'

একটি দাবি সালার তাদের থেকে আদায় করে নিল। এখন একটি দাবি তারা সালারের সামনে উপস্থাপন করল।

: 'আমি কারও পুতুল হয়ে কঙ্গোতে মানুষকে ব্যবহার করতে পারি না। আর করবও না।' সালার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলল।

: 'আপনি কঙ্গোতে গিয়ে যা করতে চান তা করুন।' প্রেসিডেন্ট বললেন।

: আমি বাঁধা হাতে কোথাও কিছু করতে পারি না।

: 'ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাকে বিশাল ক্ষমতা দেওয়া হবে। সাথে সাথে তা আপনাকে জানিয়েও দেওয়া হবে। আপনি চাইলে এই প্রকল্প বন্ধ করতে পারবেন বা সেখানে চলমান যেকোনো প্রকল্পে বাধা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে হেডকোয়ার্টারের অনুমোদন নেওয়ার দরকার হবে না।

আপনাকে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ক্ষমতা দেওয়া হবে।"

কয়েক মুহূর্ত সালার কিছুই বলতে পারল না।

যদি এটি ফাঁদ হয়, তবে তা নিখুঁত। যদি প্রলোভন হয়, তবে তা চমৎকার। কপালে ভাঁজ ফেলে ঠোঁট শক্ত করে, সালার টেবিলের অপর প্রান্তে বসা ওই ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল, যার চেয়ার যেকোনো সময় ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে। এ ধারণা শুধু প্রেসিডেন্টের নয়, বরং সবারই। কিন্তু সালার এখন এক সম্মানজনক প্রশ্ন চাচ্ছে। লাখি খেয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছে না। কথার মাধ্যমে সুন্দর বিদায় চাচ্ছে।

: 'যে ক্ষমতা দিয়ে আপনি আমাকে কঙ্গো পাঠাতে চান, সেই একই ক্ষমতা দিয়ে অন্য কাউকে পাঠালেও, সেও পরিস্থিতি সামলাতে পারবে।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে সালার বলল।

: 'সমস্যা ক্ষমতা নিয়ে নয়, সমস্যাটা নীতির। আফ্রিকায় আপনি যা করতে চান, তা আর অন্য কেউ করতে চাইবে না।' সালার তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'কিছু সময় নিন, ভাবুন; তারপর সিদ্ধান্ত জানান।' প্রেসিডেন্ট তাকে যেন বন্দি করে মুক্ত করে দিলেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক শেষে ফেরার পথেও সে মিডিয়ার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। বিভ্রান্তি যেন আরও গভীর হয়েছে। দমবন্ধ ভাব যেন চরমে উঠে গিয়েছে। পুনরায় লিমোজিনের কাঁটা মাড়িয়েই সে ফিরে এলো।

হোটেলে ফিরে এসে টিভিতে সে শুধু তার বিশ্বব্যাপ্তির সদর দপ্তরে যাওয়ার ফুটেজই দেখছে না; সেই সঙ্গে বরং তার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ হওয়ার সংবাদও প্রচারিত হতে দেখছে। তার অস্বীকারকে তারা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। জালের সুতো ক্রমে শক্ত হয়ে গিট পাকাচ্ছে।



তার মোবাইল ফোন মিনিটেই শুভেচ্ছাবার্তা ও কলের শব্দে বেজে উঠতে লাগল।

আগে এই ফোনের বেজে না ওঠা ছিল তার কাছে কিয়ামতের মতো। আর এখন তা থামছে না বলে, তা হয়ে উঠেছে এক আজাব। এসবের মাঝেই সে ইমামাকে ফোন করল। যদিও সে জানে সংবাদটি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ইমামার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? তার মনে পড়ল, প্রথম উমরার পর ইমামার সাথে সে ব্যাংকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। চাকরি তার জন্য কোনো সমস্যা না। সে যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় চাকরি পেতে পারবে। কিন্তু এর আগে সে কখনো ভাবেনি যে, যেসব জায়গায় সে এতদিন কাজ করেছে, সেগুলো সরাসরি বা গোপনে সুদের সঙ্গে জড়িত। বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন-যারা বিশ্ব-অর্থনীতির নাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে, সবাই সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সুদের রক্তেই তারা সবকিছু পরিচালনা করে। উন্নয়নমূলক কাজ বা সামাজিক অনুদানমূলক কাজ, সবই সুদের টাকা থেকে আসে। আর সালার সিকান্দারও সেই সুদি ব্যবস্থার একটি অংশ। সালার সেই আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার এক যন্ত্রাংশ, যা সুদের অর্থে পরিচালিত হয়। বলতে পারবে না যে, এই বিষয়ে আল্লাহর বিধান সে জানে না। বরং সে স্বীকার করে, আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা সে জানে। আর সেই সীমা ভাঙার পাপ সে বহুবার করেছে।

জীবনে অনেক সময় রিজিক আমাদের বাধ্য করে, আমরা যেন কেবল ভক্ষণকারী পেটের কথাই ভাবি; উপার্জনকারী হাতের কথা নয়। কিন্তু সালারের রিজিকের কোনো অভাব ছিল না। তবে সাফল্যের ক্ষুধা ছিল অবশ্যই। কোনোরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই সে সেই সাফল্যের পেছনে জড়িয়ে পড়েছে।

ইমামাই প্রথম নির্লজ্জভাবে ভেঙে দিয়েছিল তার সেই কাচের ঘর; যে ঘর সে তার চারপাশে গড়ে তুলেছিল সুদের কাচে।

সালারকে সে সেই প্রতিচ্ছবি দেখতে বাধ্য করেছে, যেটিকে সালার তার নিজের প্রতিচ্ছবি বলে মানতে চাইত না। নিজের এমন প্রতিচ্ছবি দেখার পর, তা সে স্বীকার করেনি। কিন্তু লজ্জিত হয়েছিল অবশ্যই। অস্থিরও হয়েছিল। সেই সঙ্গে তার ভেতরে একধরনের স্বস্তিও কাজ করছিল। কারণ, খুব তাড়াতাড়িই ব্যাংকের সঙ্গে তার চুক্তি শেষ হতে চলেছিল। আর সালার সেই চুক্তিটি পুনরায় নবায়নও করবে না বলে ওয়াদাও করেছিল।

আমেরিকায় এসে, পিএইচডির পাশাপাশি সে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন অর্থনীতিবিদের চাকরি নেয়। সেটি কোনো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক নয়। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সেটিও সুদ থেকে মুক্ত নয়। সালার তখন নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিত যে, এখানে সে শুধু একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করেছে, প্রতিষ্ঠানটি তাকে দিয়ে সুদবিষয়ক কোনো কাজ করাচ্ছে না। তবু বিবেকের সুচ এই

কাজের জন্য তাকে ক্ষণে ক্ষণে খোঁচা দিত। কারণ, তার বেতন আসত এই প্রতিষ্ঠানের সুদের মুনাফা থেকেই।

বিশ্বব্যাংকে যোগদানের সিদ্ধান্তে ইমামা তখন সন্তুষ্ট ছিল না। তার আপত্তি ছিল একই এবং সেই এক জায়গাতেই।

: 'তুমি নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু বিশ্বব্যাংক তো মূলত সুদের ব্যবসাই করে, তাই না? ছোট ব্যাংকরা ব্যক্তিদের ব্যবহার করে, আর বিশ্বব্যাংক জাতিদের। তাহলে বলো, কী পার্থক্য রইল এতে? সহজ ঋণ, কঠিন ঋণ, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, স্বল্পমেয়াদি ঋণ, সহজ শর্তে ঋণ-বিশ্বব্যাংকের কাছে কি এমন কোনো ঋণ আছে, যেটিতে তারা সুদ নেয় না?' সে তখন সালারের সঙ্গে বিতর্ক করেছিল।

জিবরিল তখন এক বছরের শিশু। সালারের মনে হয়েছিল, জীবন একদম প্রশান্তময় হতে শুরু করেছে। একটি সুখী পরিবার। ওয়াসিম ও সাদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পর ইমামার

বিষণ্ণতা এবং পাকিস্তানে চলে যাওয়া দুর্বিষহ জীবনের অবসান হতে শুরু করেছিল জিবরিলের আগমনে। আর তখনই বিশ্বব্যাপক সালারকে যে সুযোগটি প্রস্তাব করেছিল, তা ছিল তার অভিজ্ঞতা ও বয়স অনুযায়ী অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রস্তাব। যার জন্য ইমামার তখনকার আপত্তিতে সে রেগে গিয়েছিল।

: 'সবকিছুতে আমরা যদি এমন খুঁত ধরতে থাকি, তাহলে তো আমরা এই সমাজ ও সিস্টেমে কোথাও কোনো কাজই করতে পারব না। কারণ, পুরো সমাজব্যবস্থাই তো সুদের ওপর চলছে। আর তারা আমাদের জন্য তাদের সিস্টেম বদলাবেও না।' সে ইমামাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল।

: 'তাহলে তো আমাদের হালাল খাওয়ার চেষ্টাও ছেড়ে দিতে হবে। তাহলে তুমি শুধু শুধু সুপারস্টোরে গিয়ে শুকর আর গরুর মাংসের পার্থক্য কেন খোঁজো? তাদের সিস্টেম এটি, তাদের সমাজ। তাদের স্টোরে তারা যা রাখে, তা-ই খেয়ে

ফেললেই তো চলে!" কয়েক মুহূর্তের জন্য ইমামা তাকে নির্বাক করে দিয়েছিল। তারপর সালার বিতর্ক এড়িয়ে ওখান থেকে উঠে গিয়েছিল।

ইমামার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও অবশেষে সে বিশ্বব্যাপ্তকে যোগ দেয়। যোগ দেওয়ার পর সবার আগে সেই অ্যাগ্রিমেন্ট ও জব প্রোফাইলের কাগজপত্র জোর করে করে ইমামাকে পড়ে শোনায়। অ্যাগ্রিমেন্টে উল্লিখিত মানব সেবার ফিরিস্তি শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল তার। প্রত্যুত্তরে ইমামা তাকে বলে, 'তুমি সুদের টাকা দিয়ে মানব সেবা ও উন্নতির স্বপ্ন দেখছ, আর মনে করছ এতে কল্যাণ আছে; কিন্তু তা নেই। সুদের ফলাফল মানুষদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, তবে তা ধ্বংসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন; উৎকৃষ্টতা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নয়।' ইমামার সুই যেখানে আটকে ছিল, সেখানেই এখনো আটকে আছে। সালার জানে, ইমামা জেদি। সে নিজেও জেদি ছিল। কিন্তু তাদের জেদ কখনো একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়না। কোনো

না কোনোভাবে একজন না একজন হার মেনে নিত। কিন্তু তারা কখনো এমন পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন-এ পৌঁছায়নি।

এই বিষয়ে তার সঙ্গে তীব্র নীতিগত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, ইমামা প্রতিবার তার চাকরিকে বাধ্য হয়েই মেনে নিয়ে এসেছে। তবে সে কখনো এ বিষয়ে চুপ থাকেনি। তার এই প্রকাশ্য সমালোচনা সালারকে মাঝে মাঝে মনঃক্ষুণ্ণও করত, দুর্বলও করত। এখনো ইমামাকে ফোন করতে গিয়ে সে বুঝতে পারছে, উত্তরে ইমামা কী বলবে। কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে, ইমামা তার নতুন পদ নিয়ে কোনো কথা বলল না। সে জিবরিল ও ইনাযাকে নিয়ে কথা বলছে। হামিনের ব্যাপারে এটা-ওটা জানাচ্ছে। এদিকে সালারের অপরাধবোধ বেড়েই চলছে। সে চাচ্ছিল, ইমামা তার নিন্দা করুক। তাকে তিরস্কার ও মালামাত করুক। কেউ একজন শুভেচ্ছা না জানিয়ে তার বিবেককে খোঁচা দিক।

: তুমি জানো, বিশ্বব্যাংক আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছে।



ইমামা তার কথা শেষ করতে দিল না।

: 'হ্যাঁ।' তার আগেই সে সংক্ষিপ্ত উত্তর করল।

: 'তো?' সালার এই এক শব্দের উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না।

: 'তো কী?' ইমামা মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল।

: 'তো, তুমি কিছুই বলবে না?' সালার ইচ্ছা করেই বলল না,
এই ব্যাপারে তোমার মত কী?

: 'না।' আরও একটি এক শব্দের প্রত্যুত্তর।

'কেন?' সালার অস্থির হলো।

: তুমি সব সিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছামতো নাও। তাহলে মত দিয়ে লাভ?

সালার এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'আমি এখনো প্রস্তাবটি গ্রহণ করিনি।'

: করে ফেলবে, আমি জানি।

উত্তরটি তাকে দিকশূন্য করে দিল। সেই সঙ্গে হাসালও।

: 'এখানে তো হাসার মতো কিছু নেই।' সালারের হাসিটা তার ভালো লাগল, তবু তাকে এটি বলল।

: 'আমি যখনই তোমার মতের বাইরে যাই, তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হই।' সালার হঠাৎ তাকে এক অদ্ভুত স্বীকারোক্তি দিল। যেন সে বোঝাতে চাইল-বিশ্বব্যাপ্তকে যোগদানের বিষয়ে ইমামার কথা না শুনে সে ভুল করেছিল। কিন্তু এখন সেটা এত

খোলাখুলিভাবে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইমামা এবার হেসে উঠল।

: 'খুব ভালো লাগল এটি শোনে। তাহলে কি আমি ধরে নেব যে, ভবিষ্যতে তুমি সবসময় আমার কথা শুনবে?' সে সালারকে খোঁচা দিল।

: 'অবশ্যই।' উত্তর এক ঝটকায় এলো। এবার দুজনেই হেসে উঠল। তারপর সালার গভীর শ্বাস নিয়ে তাকে বলল, 'এই কথাটিই তোমাকে ওয়াশিংটনে আসার আগে বলতে চেয়েছিলাম।'

ইমামার মনে পড়ল, সালার ফিরে এসে একটি স্বীকারোক্তি দিতে চেয়েছিল।

: 'ওহ, আমি ভেবেছিলাম, কী না কী বলবে!' ইমামা হালকা একটু হেসে নিল। তারপর বলল, 'এমন কী হয়েছে যে, তুমি আমাকে এ কথা বলছ? বা তখন বলতে চেয়েছিলে?'

ইমামা নিশ্চয়ই বোকা নয়। সালারের বুঝে আসছে না, এই কথার কী জবাব দিবে। কিংবা আদৌ কোনো জবাব দিবে কি দিবে না।

পেট্রোস ইবাকার সঙ্গে দেখা করে এবং ওই প্রকল্প সম্পর্কে তার থেকে সত্যাসত্য জেনে যে আফসোস হয়েছিল তার, আমেরিকায় পৌঁছে সেটি অপরাধবোধে রূপ নেবে, এটা তার জানা ছিল না।

: 'তুমি কি তাহলে আমাকে ওটা বলতে চাও না?' নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল

ইমামা।

: 'এখন না।' সালার উত্তর করল।

: 'এখানে কবে আসবে?' ইমামা প্রসঙ্গ পালটাল।

: 'এখন কিনশাসার ফ্লাইট অফ। বিমানবন্দরও সাময়িকভাবে বন্ধ। আমি চেষ্টা করছি। কোনো না কোনোভাবে ওখানে চলে আসব। তুমি আবার দুশ্চিন্তা করছ না তো?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'এখন আর করছি না। আর তুমিও করো না। আমরা সবাই নিরাপদে আছি। আমার আর হামিনের চিকিৎসার সব রকম সুবিধাই পাচ্ছি।' তার কণ্ঠে প্রকাশিত উদ্বেগ টের পেয়ে ইমামা তাকে বলল। ইমামা তার সার্জারি ও হামিনের অকাল জন্মের ফলে, অন্তত এক মাস কোথাও ভ্রমণ করতে পারবে না। আর নয়তো সালার এখানে না এসে তাদেরকে ওখানে ওয়াশিংটনেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত।

সালার বেশ আশ্বস্ত হয়ে কিছুক্ষণ জিবরিল ও ইনায়ার সঙ্গে কথা বলল। এরপর কল কেটে সে ল্যাপটপ আর সেই ডকুমেন্টগুলোর দিকে মনোযোগী হলো। একটু আগেই একজন একটি সিলমোহরকৃত ব্যাগে করে এগুলো তার রুমে দিয়ে গিয়েছে। সবকিছু একদম ঠিকঠাক আছে। কোনোকিছুই ডিলেট, গায়েব, কিংবা বদলানোও হয়নি। তবু ইনবক্সে ঢুকেই সালারের মনে হলো, কেউ একজন তার আগেই এখানে এসেছে। কিংবা হয়তো এখনো তাকে নজরে রাখা হচ্ছে। কেননা, ইনবক্সে আসা গত সাত ঘণ্টা আগের ইমেইলগুলোও ওপেন করা এবং সেগুলো পড়া হয়েছে দেখাচ্ছে। সে তার ফোন থেকে ইনবক্সে অ্যাক্সেস করতে পারছে না। না হলে হয়তো আগেই সে এই ব্যাপারটি টের পেত। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের সময় যদি সে এই জিনিসগুলো ফেরত না চাইত, তাহলে হয়তো তার এই হেকড ইমেইল অ্যাদ্রেস কখনোই ব্যবহার করতে পারত না।

এখন আর তার কোনো রাগ হচ্ছে না। আর না কোনো অসহায়ত্ব অনুভব করছে। যে বিপদগুলো তাকে ঘিরে নিয়েছে, এগুলো মূলত তারই বেছে নেওয়া। ইনবক্সের মেইলগুলো চেক করতে করতে হঠাৎ একটি মেইলে চোখ পড়তেই তার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। এটি মিডিয়া সেন্টারের বাইরে থেকে পাঠানো পেট্রোস ইবাকার-শেষ বার্তা। বার্তাটি অনেক বড় হওয়ায় ইবাকা সেটি টেক্সট না করে, মেইল করে দিয়েছিল। ভারাক্রান্ত মনে সে মেইলটি খুলল।

'তুমি কি জানো, আমি এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? টাইম ওয়ার্নার সেন্টারো। আর কেন? আমি কিছুক্ষণ আগে অ্যান্ডারসন কুপারের সঙ্গে ছিলাম সিএনএন স্টুডিয়োতে। তার শোতে অংশ নেওয়ার আগে একটি প্রাথমিক আলাপচারিতার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। আমি জানি, এখন তুমি বলবে, ওহ মাই গড! Man, you did it! তুমি এটা করেই ফেলেছ! Yes I did it. হ্যাঁ, আমি এটি করেই ফেলেছি।'



সালার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল। কয়েক রাত ধরে সে ঘুমাতে পারছে না। চোখ জ্বলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ইবাকার সেই হাসি তার চোখ ঝাপসা করে দিস। তারপর ইবাকার মেইলের পরবর্তী অংশ পড়তে লাগল, 'অ্যান্ডারসন কুপারের সঙ্গে দেখা করে সবার আগে আমি তোমাকে মেসেজ করলাম। কারণ, আমি যদি বিশ্বব্যাপ্তকের নির্দয় দুনিয়ায়, তোমার মাঝে দয়ার ঝলক দেখতে না পেতাম, তাহলে আমি কখনোই এখানে পৌঁছাতে পারতাম না। এ কথা আমি তোমাকে কখনো বলিনি যে, প্রথমবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তখন আমি এই লড়াই থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হতাশা আর নিরাশা ছাড়া তখন আমার হাতে কিছুই ছিল না। আমার তখন মনে হচ্ছিল, আমি এক পরাজিত যুদ্ধ লড়াছি। তখন আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

আমি সত্যিই তখন, আমার দেশকে লুট করতে আসা সেসব দানবদের সামনে, এক ক্ষুদ্র বামন ছিলাম। আমি আমার জনগণের জন্য কিছুই করতে পারছিলাম না। তারপর তোমার

সঙ্গে আমার দেখা হলো। আমার মনে হলো, এখনই আমার
অস্ত্র ফেলে দেওয়া উচিত নয়। এখনো এক আশার আলো
আছে, তোমার রূপে। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। আশাহত
হইনি আমি। যুদ্ধ চালিয়ে গেছি আমি। আর সেই আশাই
আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। এই তো কদিনের মধ্যেই
সারা পৃথিবী এখন কঙ্গো নিয়ে কথা বলবে। আমাদের মতো
ক্ষুদ্রদেহী, কৃষগাঙ্গ, কুৎসিত ও সাধারণ মানুষের পক্ষে
আওয়াজ তুলবে; যারা পৃথিবীতে কেবল পরাজিত আর দাস
হতে আসিনি।

কুপারকেও আজ আমি তোমার কথা বলেছি। সে তোমার
সঙ্গেও কথা বলবে। আমার বিশ্বাস, কঙ্গোর ইতিহাস এখন
বদলাতে চলেছে। আমার দেশের লোকেরা এখন এক সুন্দর
জীবনযাপন করবে। পশুর মতো বন্দি জীবন ছেড়ে, মানুষের
মতো স্বাধীন হয়ে বাঁচবে। ওয়াশিংটনে পৌঁছে তুমি আমাকে
খবর দিয়ো। আমাদের দেখা করতে হবে। অনেক দিন হলো
স্টারবাকসের কফি খাওয়া হয়নি। এবার বিলটা কিন্তু আমি দেব।"

ইমেইলের শেষটাও ছিল আরও একটি হাসিতে ভরা। এক চঞ্চল, চোখ টিপে দুষ্টুমি-মাখা হাসি।

সালার মূর্তির মতো সেই বাক্যগুলো বারবার পড়তে লাগল। বারবার। প্রতিবারই শেষ বাক্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার মনে হচ্ছে, সে আগের সব বাক্য ভুলে গেছে। আজ রাতে এই মেইলটি সে ডজনখানেকবার পড়ল। পেট্রোস ইবাকা ছিল একজন প্রচণ্ড বাগ্মী মানুষ। অসম্ভব আলোচনা-প্রিয় এক মুখ। একবার শুরু করলে থামতেই চাইত না। কথায় শত শত বই, লেখক আর দার্শনিকের উদ্ধৃতি টানত। সালার তার আলাপচারিতা উপভোগ করত। যদিও মাঝে মাঝে বিরক্তও হতো।

কিন্তু আজকের এই মেইলে ইবাকা কোনো বই বা দার্শনিকের উক্তি উদ্ধৃত করেনি। এতে শুধু লিখেছে তার চিন্তাভাবনা, তার অনুভূতি। সব সময়ের মতো আবেগদীপ্ত। সে সেই আশার কথা লিখেছে, যা সে হারাতে বসেছিল এবং যার সঙ্গ তাকে

ওয়াশিংটনে পৌঁছে দিয়েছিল। কখনো কখনো মুখ থেকে কেবল শব্দ নয়, ইলহামি বাণীও বেরিয়ে আসে। এই মেইলেও ইবাকা তেমনই একটি কথা বলেছে, যা পুরোপুরি সত্য, আর তা হলো, কঙ্গোর ইতিহাস বদলাতে শুরু করেছে। আর সেই ইতিহাস ইবাকা তার রক্ত দিয়েই বদলে দিয়েছে।

সালার মেইলটি বন্ধ করে ফেলল। এই মেইলে যদি সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করত, তাহলে এটি তার ইনবক্স থেকে গায়েব হয়ে যেত। কিন্তু এই মেইলটি তার হৃদয়কে আরও ভারী করে তুলল। দাঁড়িপাল্লার যে টানাপোড়েনে সে ঝুলছে, তার অস্থির ভারসাম্য আরও বেড়ে গেল। রাতভর সে জায়নামাজে বসে আকুল প্রার্থনা করতে লাগল। আল্লাহর কাছে পরীক্ষা আসান করার দোয়া করতে লাগল। সোজা পথ ভিক্ষা চাইল, যে পথ থেকে সে আবারও সরে গিয়েছে। যাদের ওপর আল্লাহ তাদালা গজব নাজিল করেন, তাদের অন্তভুক্ত যেন না করেন, সেজন্য দোয়া করল। ভেতরে ডেকে আনছে। স্ত্রী-সন্তান আর ধনসম্পদের পরীক্ষা যদি প্রাণঘাতী হয়ে থাকে, ভেতরে তার

এই ভয়ও কাজ করছে যে, না জানি সে নিজেই আল্লাহর আজাবকে তাহলে এই মুহূর্তে আল্লাহর আজাবের অনুভূতিটিও তার কাছে প্রাণঘাতী মনে হচ্ছে।

ফজরের সময় তার হঠাৎ ডা. সিবতে আলির কথা মনে পড়ল। কেবল মনেই পড়েনি; বরং পাগলের মতো উনার দিকে ছুটে যেতে চাইল। আর জরুরি ভিত্তিতে টিকিট কেটে পরের রাতেই পাকিস্তান চলে এলো। ডা. সিবতে আলি সব সময়ের মতোই তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উষ্ণ অভ্যর্থনায়, তবে বিস্মিত চোখে। এত বছর পর হঠাৎ সে উনার কাছে এভাবে ছুটে এসেছে, এটি সত্যিই বিস্ময়কর। তার কাছে তিনি একে একে সবার খোঁজখবর নিলেন।

: ইমামা কেমন আছে?

: 'জি, ভালো আছে।' সালার আজও একাকী উনার স্টাডি রুমে বসে আছে। মাথা নিচু করে। একান্তভাবে উনাকে সঙ্গে করে।



: 'জিবরিল কেমন আছে?' তিনি পরবর্তী প্রশ্ন করলেন।

: সেও ভালো আছে।

: ইনায়া?

: সেও।

: আর হামিন?

: 'সেও।' সালার মাথা নিচু করে একে একে সবার খবর জানাতে লাগল। ডা. সিবতে আলিও প্রতিবার আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকলেন। তারপর এক দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি মৃদু স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর আপনি?'

: 'না, আমি ভালো নেই।' সালার এবার মাথা তুলে তাকাল। আর তারপর শিশুদের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ডা. সিবতে আলি হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই প্রথম সে এভাবে ভেঙে পড়ে কাঁদছে।

: 'আমার একটি গুনাহ হয়ে গেছে, ডাক্তার সাহেব!' সে কাঁদতে কাঁদতে দু'হাতে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল। প্রত্যুত্তরে ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। শুধু তাকিয়েই রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি বললেন, 'সেটি আমাকে বইলেন না।'

সালার বিস্ময়ে উনার মুখের দিকে তাকাল।

: আপনাকে বলার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি।

: আমি আপনার গুনাহ জেনে কী করব? এখন তো আমি আপনাকে থামাতে পারব না। আপনার অনুশোচনাও আমি দেখেছি। এখন উত্তম হলো, একে শুধু আপনার আর আল্লাহর

মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। যা গোপন আছে, তা গোপনই থাকতে দিন। আল্লাহ গাফুরুর রহিম। তিনি ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তিনিই তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করেন।" তিনি সব সময়ের মতো সুস্থিরভাবে তাকে বোঝালেন।

: আমি না বললে তো আমার গোমরাহি শেষ হবে না। আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি কী ভয়াবহ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। আর সেই অন্ধকার যেন ক্রমশ বেড়েই চলছে। আমি সেই অন্ধকারকে ভয় পেতেও শুরু করেছি।

ডাক্তার সিবতে আলি তাকে কখনো এমন অসহায় হতে দেখেনি। উনার কাছে সে যখনই আসে, কোনো না কোনো মসিবতে পড়েই আসে। কিন্তু এমন অবস্থায় তাকে কখনো দেখেননি তিনি।

: 'সুদের পথ বেছে নিয়ে আমি আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করেছি। এখন আমার জীবনে একের পর এক বিপদ আসছে।

আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না, কী করব।" বলতে বলতে সালার আবারও কাঁদতে লাগল। এতদিন যে স্বীকারোক্তি শুধু তার বিবেকই দিয়ে এসেছে, তা আজ এই প্রথম নিজের মুখে অন্য কারও সামনে প্রকাশ করছে।

: 'তাওবা করো এবং সেই উপার্জনের পথ বাদ দাও।' তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে অত্যন্ত সাবলীলভাবে বললেন।

: 'তাওবা করা সহজ, কিন্তু সেই নাপাক উপার্জনের চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।'

জবাবে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে কোনো কাজই সহজ নয়। কিন্তু চেষ্টা করে তা সহজ ও সম্ভব করে তুলতে হয়।'

: আমার বয়স সাঁইত্রিশ। জীবনের দশটি বছর আমি বিশ্বের সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেছি। সমস্ত উপার্জন সুদ থেকেই। যা নিজের ওপর খরচ করেছি এবং যা অন্যের তরে;

সবই সুদের টাকা। আমার স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের অর্থও সুদ উপার্জিত। কিন্তু এখন আমি কী করব, আমার কিছুই বুঝে আসছে না।

ডা. সিবতে আলি তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এত বছর পর আজ হঠাৎ আপনার কেন মনে হলো, আপনার উপার্জন হালাল নয়, হারাম?'

এই প্রথম উনার কণ্ঠস্বর সালারের কাছে অদ্ভুত মনে হলো।

: 'কারণ, আমার প্রশান্তি নেই। জীবনে কোনো না কোনো ভুল হয়েই চলছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার এই উপার্জনের জন্যই আমি এসব পরীক্ষা ও বিপদের মুখোমুখি হচ্ছি।' সালার অসহায়ভাবে বলে চলল।

: 'আপনার কি মনে আছে, ইমামা যখন অসুস্থ ছিল, তখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন? জিজ্ঞেস করেছিলেন,

আমার ঘরে অশান্তি কেন? ইমামা আপনাকে ভালোবাসে না কেন? অথচ আপনি দুনিয়ার সমস্ত সুখের উপকরণ তার পায়ে ঢেলে দিয়েছেন। তার প্রতি অসম্ভব অনুগ্রহ করেছেন। তবু সে কেন আপনার প্রতি টান অনুভব করে না? কেন উপেক্ষা করে চলে? কেন অকৃতজ্ঞ হয়? কেন আপনার অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি দেয় না?' সালার ডাক্তার সিবতে আলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম, এসব ইমামার কারণে নয়; বরং আপনার কারণেই হচ্ছে। এই অশান্তির মূল আপনার উপার্জন। আপনার উপার্জন যতদিন এমন থাকবে, ততদিন আপনার জীবনও এমনই চলবে। তখন আপনি বিদায় নেওয়ার সময় বলেছিলেন, আমি তো এখন আর ব্যাংকে কাজ করি না। এখন তো অন্য প্রতিষ্ঠানে অন্য পদে কাজ করছি। সেই সঙ্গে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আমি সব সময়ের মতো এখনো ইমামার পক্ষই নিচ্ছি। তার কোনো ভুল স্বীকার করছি না। সবসময় সব বিষয়ের জন্য আপনাকেই দায়ী করছি।' তিনি একইভাবে শান্তকণ্ঠে বলে চললেন। 'তখনো আপনি উলটো প্রশ্ন করেছিলেন। আমার উত্তর মেনে নিতে

চাননি। আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করিনি। কারণ, আপনি তখন
ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তর্ক করে আমি আপনাকে অতিরিক্ত
দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইনি। তবে আমি আপনাকে সেদিন যে
উত্তর দিয়েছিলাম, আজও সেই একই উত্তর দিচ্ছি। তবে আজ
আমার ভালো লাগছে এই ভেবে যে, আজ আপনি কোনো প্রশ্ন
করতে কিংবা আপত্তি জানাতে আসেননি। আজ আপনি উত্তর
ও সমাধান খুঁজতে এসেছেন।

ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর আবার বলতে
শুরু করলেন, 'আপনি যে বিজনেসের সঙ্গে জড়িত, তা কোটি
মানুষের ঘর ও জীবনে অশান্তি ও ধ্বংস বয়ে এনেছে। তাহলে
সেই অশান্তি ও অকল্যাণ আপনার ঘরেও আসবে না, তা
কীভাবে সম্ভব! আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না,
হোক সে মুসলমান কিংবা কাফির।'

সালার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উনাকে থামিয়ে দিল।

: 'ডাক্তার সাহেব! ইমামার প্রতি এখন আর আমার কোনো অভিযোগ নেই। সে আর এখন আমার জীবনের অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ নয়। সংসার জীবনে আমি শান্তিতে আছি।'

এবার ডাক্তার সাহেব তার কথা থামিয়ে দিলেন।

‘কারণ, ইমামার প্রতি এখন আর আপনার সেই টান ও মহব্বত নেই, যে টান ও মহব্বত ছিল শুরুতে; সে যখন আপনার জীবনে এসেছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তার অবহেলার চেয়ে অন্য কোনো জিনিস আপনাকে এতটা কষ্ট দিতে পারত না। তার অবহেলা ও উদাসীনতার মাধ্যমে আপনাকে অশান্তি দিয়েছিলেন। কেননা, তখন আর আজ আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা দিয়েই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছেন, যা আজ আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’

সালার যেন নির্বাক হয়ে গেল। কথাগুলো ঠিকই। ডাক্তার সাহেব আগের মতোই তার ঠুটিগুলো ঢেকে, তার অন্তরে লুকানো চোরটিকেই প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

'আপনি সাময়িকভাবে ব্যাংকের চাকরি ছেড়েছিলেন। তারপর সরাসরি সুদের সঙ্গে জড়িত না হয়ে, কিছুদিন পর পরোক্ষভাবে সুদের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। এর সমাধান সালার সিকান্দারই আমার চেয়ে ভালো জানে। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই সমাধানের পথে যেতে আপনার মন সায় দেয় না, আর কোনোদিন দিবেও না।'

: 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যা বলেছেন সবই সত্য। কিন্তু আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারছি না, আমি কী করব।' সে ডাক্তার সাহেবের প্রতিটি কথাই মেনে নিল। 'আমি গত বছর আমেরিকায় একটি বাড়ি মর্টগেজ (বন্ধক) নিয়েছি। এ বছর ইমামার জন্মদিনে আমি তাকে সেই বাড়িটি দিতে চেয়েছিলাম। পাঁচ বেডরুমের বাড়ি। প্রাইভেট সৈকত-সংলগ্ন, সমুদ্রতীরে

অবস্থিত। অত্যন্ত দামি। আগামী কয়েক বছর আমাকে এর মটগেজ ঋণ শোধ করতে হবে।

এখন আমার তিনটি সন্তান। একজন স্কুলে যাচ্ছে, দুজন কয়েক বছরের মধ্যে স্কুলে যেতে শুরু করবে। আমি তাদের সেরা স্কুলে পড়াতে চাই, সেরা শিক্ষা দিতে চাই এবং সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে চাই। ঠিক যেমন আমার বাবা করেছিলেন। আর এসবের জন্য আমার অর্থের প্রয়োজন। আমি বিলাসবহুল জীবনের অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এই ভোগবিলাস ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আর এসব ভোগবিলাসের জীবনধারা অর্থ চায়। অর্থ ছাড়া এমন জীবনযাপন সম্ভব নয়। এখন আমি যদি হালাল-হারাম এবং সুদ ও ধারের মধ্যে পার্থক্য করতে বসি, তাহলে এসব কিছুই করতে পারব না। যেখানেই আমি উন্নতি ও সাফল্য দেখি, সেখানেই সুদ। আর যেখানে সুদ নেই, সেখানে উন্নতির সে গতিই নেই, যে গতিতে আমি এগিয়ে চলেছি। এখন আপনিই বলুন, আমি কী করব?

আমি কোনো ছোটখাটো কোম্পানিতে, সামান্য পদে চাকরি করে অল্প কিছু অর্থ উপার্জন করে বেঁচে থাকতে পারব, কিন্তু তাতে আমি সুখে থাকতে পারব না। যেসব প্রতিষ্ঠানে আমি উদ্যমতা ও সম্ভাবনা দেখি, যেগুলো আমাকে আকর্ষণ করে, সেখানে কোনো না কোনোভাবে সুদ আছেই। সেসবে হালাল-হারামের কোনো ভেদ নেই। আমি কী করব? সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন্যান্স ও ইকোনমিকস পড়িয়ে জীবন কাটাব? নাকি কোনো কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার হয়ে থাকব?' সালার যেন হঠাৎ ফেটে পড়েছে। তার মনের সকল দ্বিধা-সংশয় এখন ঠোঁটে চলে এসেছে। আর ঠোঁট ফুটে বলতেই যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভীষণ স্বস্তিবোধ করছে।

'আপনি আমার উপার্জনকে আমার সব সমস্যার মূল বলছেন। ঠিকই বলছেন। আমিও এই আয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমিও সুদকে ঘৃণা করি। কিন্তু সেই সাথে কোনো বিকল্প

পথও নেই আমার কাছে" বলতে বলতে সালার পুনরায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

'আমি বিকল্প পথও তৈরি করতে চাই। কিন্তু তাতেও সময় লাগবে। ততদিন আমি কী করব? আজ যদি আমি বিশ্বব্যাপক ছেড়ে দেই, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যে আমি পুরোনো গল্প হয়ে যাব। কঙ্গোতে যা ঘটছে, ঘটতেই থাকবে। এই প্রকল্প আজ বন্ধ হয়েছে, কাল আবার শুরু হয়ে যাবে।'

ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'সালার, আগে আপনি সিদ্ধান্ত নিন, কোনটি আপনার জন্য বেশি দুশ্চিন্তার? আপনার নিজের জীবন, নাকি অন্যদের জীবন। যেখানে অপশন দুটো থাকে, সেখানে তো আমরা নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনকে প্রাধান্য দিতে পারি না। সেখানে তো আমরা নিজের জীবনকেই প্রাধান্য দেব।' ডাক্তার সিবতে আলি যেন তাকে আয়না দেখিয়ে দিলেন।

: 'আমার মন ও জীবন এই মুহূর্তে এক চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা দুটো হলে মানুষ কোনো না কোনোভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই নেয়। কিন্তু চারটা হলে কী করবে?' বলতে বলতে সালার এক অদ্ভুত অসহায়ত্বে হেসে উঠল।

: 'আপনি মাসিহা নন। আল্লাহ পাক আপনাকে মাসিহা হওয়ার জন্য সৃষ্টিও করেননি। আল্লাহ পাক আপনাকে সৃষ্টি করেছেন একজন ভালো মানুষ এবং ভালো মুসলিম হওয়ার জন্য। তাই আগে আল্লাহর দেওয়া ফরজ বিধান পূর্ণ করুন। তারপর পূর্ণ করুন আপনার কাঁধে অর্পিত আপনার পরিবারের দায়িত্ব। তারপর তাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবুন, যাদের ব্যাপারে আপনাকে সরাসরি দায়ী করা হবে না।' ডাক্তার সিবতে আলি যেন একে একে তার মস্তিষ্কের সমস্ত গিঁট খুলে দিচ্ছেন। 'জীবনে আমরা ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত নিই আর সেগুলোর মূল্যও দেই। এখন আপনি যদি আপনার সন্তানদের সোনালি ভবিষ্যৎ, আরাম-আয়েশ আর একটি বন্ধকি বাড়ির মালিক হওয়ার লোভে সুদ খেতে থাকেন, তাহলে দিনশেষে এর মূল্যও

আপনাকেই চুকাতে হবে। আপনি যদি কোনো বিকল্প পথ বের করতে চান, আর তাতে কিছুটা সময় লাগে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছাধিকার আপনার হাতেই আছে। তবে মাঝে মাঝে আমরা ভালো পথ আর সঠিক সময় খুঁজতে গিয়ে আমাদের জীবনটাই শেষ করে ফেলি।’

সালার সব সময়ের মতোই এখনো উনার কথাগুলো শ্বাসরুদ্ধ বিস্ময়ে শুনে চলছে।

‘প্রথমে আপনাকে আপনার ঘরের অশান্তি ও অমিলের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর এখন আপনার কর্মজীবনের সমস্যার সম্মুখীন করে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। আমি তো শুধু এই দোয়াই করছি যে, আপনার পরবর্তী পরীক্ষাটা যেন এর থেকেও বড় না হয়।’ তিনি গিঁটগুলো খুলে, সেগুলো এখন বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন। আর সালারের ভেতরটা ক্রমশ নড়ে উঠতে শুরু করেছে।

: 'আমি প্রথম যখন আপনার কাছে এসেছিলাম, আপনাকে জানিয়েছিলাম আমি ব্যাংকে চাকরি করি, তখন কেন এসব বলেননি আপনি? আপনি তো জানতেন, আমি সুদের সঙ্গে জড়িত, তাহলে তখন কেন এসব আমাকে বলেননি? কখনো এভাবে সতর্ক করেননি?' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সালার যেন উনার প্রতি অভিযোগ করতে লাগল।

: 'আমি অমন ধর্মপ্রচারক বা দীনের দায়ি নই সালার! যারা আসতে না-আসতেই মানুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এ দুনিয়া আল্লাহর। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহ নিজেই যদি বেআমল হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে নিজে নিজে খুঁজে নেওয়ার এবং শেখার সুযোগ দেন, তাহলে আমি কীভাবে আসতেই আপনাকে ধমকাতে শুরু করতাম? আপনি যে রবকে মানেন, তাঁর কালামের হাফেজ হয়ে, নিয়মিত তিলাওয়াত করেও আপনি তাঁর নির্দেশ অমান্য করছেন। আপনি যে নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসারী, সেই নবির সুন্নত ও নির্দেশ মানতে প্রস্তুত নন। আর যে নারীর প্রেমে আবদ্ধ আপনি, তার

পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ওই পথ ছাড়তে পারছেন না; তাহলে এক ডাক্তার সিবতে আলি আপনাকে কীভাবে বদলে দিত? কীভাবে থামিয়ে ফেলত আপনার হারামের পথচলা?

সালার লজ্জায় ডুবে যেতে লাগল।

'আমি যদি তখন আপনাকে নিষেধ করতাম, ভয় দেখাতাম, তাহলে হয়তো আপনি আমার কাছে আসাই ছেড়ে দিতেন। আমি ভাবলাম, আপনি আসতে থাকলে একসময় বদলে যাবেন। আপনার মনে আছে কি, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনাকে আমার লেখা কিছু বই দিয়েছিলাম পড়ার জন্য? সেটা আমার জ্ঞানের দৌড় দেখানোর জন্য ছিল না। সেটা ছিল, আপনাকে সহিহ-গলতের বুঝ দেওয়ার জন্য। এটা বোঝানোর জন্য যে, আপনি যে অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত, তা ইসলামি নয়। তা জায়েজ ও হালাল নয়। সেটি সুদের ওপর দাঁড়ানো একটি সিস্টেম। আমি বিশ্বাস করি না যে, সেই বইগুলো পড়ার সময় আপনার মনে একবারও আসেনি,

আপনার উপার্জন সুদ মিশ্রিত। আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, আপনি নিয়মিত আমার কাছে এত এত লেকচার শুনতে এসেছেন, আর তাতে কখনো সুদের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা আলোচনা শোনেননি। কিংবা আপনার মনে অনুভূতি জাগেনি যে, যে হারাম ও নিষিদ্ধ উপার্জনের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, সেটি তো আমার উপার্জিত এই সুদই।

উনার কথার উত্তর দেওয়ার মতো কোনো সক্ষমতা নেই সালারের। কারণ, তিনি ঠিকই বলছেন। উনাকে সে বহুবার সুদ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছে। সালার ফটোগ্রাফিক মেমোরি-সম্পন্ন একজন মানুষ। সুদ সম্পর্কে ডাক্তার সিবতে আলির সমস্ত আলোচনা সে হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারবে। সবকিছু মনে আছে তার। প্রথমবার যখন তিনি সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেন, সে তখন ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। শুধু সে নয়, ওখানে উপস্থিত যারা যারা ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে যুক্ত ছিল, তারা সবাই অস্বস্তি বোধ করে।

কেউ একজন তখন ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল, অবশেষে সুদে এমন কী মন্দ আছে যে, কুরআন একে হারাম বলে? অথচ ব্যবসার মুনাফাকে হালাল সাব্যস্ত করে। ডাক্তার সাহেব তখন উত্তর করেছিলেন, 'সুদ ইসলামি ভিত্তির বিরোধী। আমাদের দীন যেসব মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হলো মানবিক সহমর্মিতা ও সাহায্যের নীতি। তাহলে এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই হলে, সে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে সহমর্মী হয়ে দেওয়া অর্থের মধ্যে কীভাবে মুনাফার শর্তে বেঁধে দিতে পারে! আমাদের ধর্ম আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত অন্য কারও প্রতি আল্লাহর সমবিশ্বাস ও ভক্তির বিরুদ্ধে। টাকা কেবলই এই পার্থিব জীবন চালানোর একটি মাধ্যম। এখন সেই টাকাকে আমরা যদি আমাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে পুঁজিবাদের নীতি অনুসরণ করি, তাহলে তো আমরা মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাতে'র মর্যাদা থেকে নামিয়ে, ধনসম্পদকে সেই মর্যাদাই অধিষ্ঠিত করে দিলাম।

আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে সুদের ব্যবসায়ীকে আল্লাহ ও তাঁর নবির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাকারী সাব্যস্ত করেছেন। সেখানে ধনকে মূর্তি বানিয়ে, মানুষের প্রয়োজন ও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে, তাদেরকে শোষণ করা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করার সমতুল্য। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষকে ফি সাবিলিল্লাহ একে অপরের সাহায্য করার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দা এবং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আখেরি নবি মাননে-ওয়ালা উম্মত যদি আল্লাহর ভয়ে অপর মুসলমানকে সুদবিহীন সাহায্য করতে রাজি না হয়, তাহলে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে কী পার্থক্য রইল? কাফিররা ধন উপার্জন ও সম্পদের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য বহু দেবতার পূজা করে। কিন্তু মুসলমানরা তো কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালে মুক্তির জন্যই তাঁর ইবাদত করে। তারা তো ধন বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর ইবাদত করে না।

ডাক্তার সিবতে আলির প্রতিটি কথাই তার হৃদয় মনে আছে।
কেননা, উনার আলোচনা শোনার পর লাগাতার কয়েক দিন
সেগুলো তার কানে বাজতে থাকে।

'মানুষের ইমান যখন আল্লাহর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁর
ওপর তাওয়াঙ্কুল থাকে না, তখন দুনিয়াবি জিনিসের ওপর তার
তাওয়াঙ্কুল বেড়ে যায়। টাকা, ধনসম্পদ আর জমানো পজিকে
সম্বল করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে বসে যায় সে। আল্লাহকে
একপাশে সরিয়ে রাখে। সে ভাবতে থাকে, এত টাকা জমিয়ে,
এ বছর এটা কিনব। কিন্তু এই টাকা দিয়ে যদি আমি কোনো
আত্মীয়স্বজন বা অভাবীকে সাহায্য করি, সে যদি ঋণ পরিশোধ
করতে না পারে, তাহলে আমার সব টাকা জলে যাবো। কত
বছর পর বাড়ি করবে, কোন বছর থেকে কোন ব্রান্ডের গাড়ি
থাকা উচিত, সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাই পাই করে
পয়সা জমাতে হবে, মেয়েদের বিয়ের জন্যও টাকা জমিয়ে
রাখতে হবে। আবার টাকা ছাড়া তো চিকিৎসাও হয় না। এসব
নিয়ে ভাবতে ভাবতে মানুষ বুঝতেই পারে না, কখন সে

আল্লাহকে পেছনে ফেলে, অর্থ-সম্পদকে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছে। অর্থ-সম্পদের সঙ্গে তখন মানুষ এমন এক সম্পর্ক গড়ে তোলে যে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কল্পনাও সে করতে পারে না। সম্পত্তি বৃদ্ধির পেছনে সে মরিয়া হয়ে পড়ে। সেই টাকায় প্রপাটি ও অটেল উপকরণ কিনে, নিজের এবং সন্তানদের জীবন ও ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়ে গেছে বলে মনে করে। অথচ এটি সম্পদের লালসার এক শয়তানি প্রভাব। ফলে মানুষ মনে করে, এগুলো ছাড়া দুনিয়ায় চলা সম্ভব নয়। অথচ দুনিয়ার নেজাম ও শৃঙ্খলা তো আল্লাহ তাআলাই পরিচালনা করেন। এক মুহূর্তেই তিনি শত বছরের জমানো সম্পদ ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তাঁর অবাধ্য হয়ে অর্জিত সম্পদ, তাদের মাধ্যমেই তিনি মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেন। এমন হলে মানুষ তখন কী করবে?'

ডাক্তার সাহেবের দেওয়া সমস্ত উত্তর তার এখনো মনে আছে। এসব উত্তর তাকে ওই সময় অস্থির করে রেখেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ, সে যে পশ্চিমা শিক্ষা ও সভ্যতায় বড় হয়েছে, সেখানে উন্নতিকেই মানুষের চূড়ান্ত

লক্ষ্য ধরা হয়। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেখানে আইন ও বেআইনের মধ্যে ফারাক করা হয়, কিন্তু হালাল ও হারামের কোনো বাছবিছার নেই। সেই পাশ্চাত্য সমাজই সুদের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, এরাই সুদের বীজ বপন করেছে এবং আজ তার ফল ভোগ করেছে। নৈতিকতা ও মানবতার মৌলিক নীতি বিবর্জিত সুদ নামক এই মুনাফার পদ্ধতিকে তারা বৈধ ঘোষণা দিয়েছে।

এই পশ্চিমা অর্থব্যবস্থা ইহুদিরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই ব্যবস্থাই আজ পৃথিবীর অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। পৃথিবীতে তারাই অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং এতে ঈর্ষণীয় সাফল্যও অর্জন করেছে। যে সুদের কারণে একসময় বনি ইসরাইলের পতন হয়েছিল, তাদের ওপর বারবার শাস্তি নেমে এসেছিল, সেই সুদকেই তারা আজও আঁকড়ে ধরে আছে। কেবল আঁকড়েই ধরে নেই, বরং সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসবাসকারী মুসলমানের রক্ত-

সত্তায় তা গেঁথে আছে। তারা একে সহিহ ও জায়েজ প্রমাণ করার জন্য ইহুদিদের সুরে সুর মিলিয়ে যুক্তি দিতে শুরু করে। অথচ মুসলমানরা তাদের থেকে ভিন্ন। এই উম্মতে মুহাম্মাদিকে ভিন্ন মর্যাদা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিবলা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। বনি ইসরাইলের হাত থেকে ইমামত ও নেতৃত্বের দায়িত্ব হস্তান্তর করে উম্মাতে মুহাম্মাদির হাতে তুলে দিয়েছেন।

ডাক্তার সিবতে আলির এই কথাগুলো একসময় তার মনে নুড়ি-পাথরের মতো আঘাত করত, কিন্তু আজ সেগুলো যেন হাতুড়ি পেটা করছে।

: 'তুমি কী ভাবছ, সালাহ?' তার দীর্ঘ নীরবতায় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উনার মনে হলো, উনি হয়তো তাকে একটু বেশি কঠিন কথা বলে ফেলেছেন।

: 'আমি আর এখন কী ভাবব? আমার হাত এখন এতটা জড় হয়ে গেছে যে, বুঝতেই পারছি না এই পরিস্থিতি থেকে বের হব কীভাবে? কী করব?' সালার যেন তার সমস্যা ডাক্তারের সামনে তুলে ধরল।

: 'আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনিই আপনার জন্য পথ খুলে দেবেন। আর সেই পথ অন্যের জীবনও গুছিয়ে দেবে।' সালার উনার কথা পুরোপুরি বুঝতে পারল না। কিন্তু 'আমিন' বলল।

: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দুঃসাহস করতে চাই না। আর না আমি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। আমি এই পুরো ব্যবস্থার অংশ হয়ে ছিলাম কেবল এজন্য যে, ভবিষ্যতে যাতে এমন কোনো সিস্টেম তৈরি করতে পারি, যেখানে কোনো সুদ থাকবে না; তা সত্ত্বেও সেটি কার্যকরী ও লাভজনক হয়ে উঠবে। আমার ভুল শুধু একটাই যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

এ নিয়ে কখনো চেষ্টা করিনি। জীবনের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার একটি পাহাড় আমার পথে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফলে সুদূরবিহীন অর্থব্যবস্থা গড়ার স্বপ্ন আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি, জীবনে আর কখনো আপনার কাছে সুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে আসব না। সমাধান নিয়ে আসব।

ডাক্তার সাহেব তার কথায় হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আমি এখন আমার জীবনের শেষ পর্যায়ে আছি। তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও এই সিস্টেম পরিবর্তন করার জন্য সারা জীবনে কিছুই করতে পারিনি। কেবল বই লিখতে পেরেছি। পরামর্শ দিয়েছি। মানুষকে সতর্ক করেছি। কিন্তু কার্যকরীভাবে কিছুই করতে পারিনি। আমি তোমার মতো মেধাবী নই, আর না তোমার মতো যোগ্য। তোমার মতো প্রভাবশালীও নই। তুমি হয়তো সেই কাজটিই করতে পারবে, যা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখে দেখে, ভেবে ভেবে এবং আলোচনা

করে করে এখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছি।" বলতে বলতে তিনি এখন বেদনাক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

'সুদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই পশ্চিমা অর্থব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী। কারণ, এটি তোমার মতো মেধাবী মানুষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যারা তাদের বুদ্ধিমত্তা কেবল পার্থিব আরাম-আয়েশের জন্য উৎসর্গ করছে। তোমার মতো মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্নরা যেদিন তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করবে, সেদিন পশ্চিমা অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কারণ, সেটি শোষণমূলক, সাম্রাজ্যবাদী ও ক্ষমতামূলক। ক্ষমতামূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। ক্ষমতামূলক ও ধনবানরা, দুর্বল ও দুঃস্থদের যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে। আমার দুঃখ হয় কেবল এজন্য যে, তুমি হাফেজে কুরআন ও অবস্থাসম্পন্ন হওয়ার পরও এমন কাজ করছ, যা কেউ অপারগ হয়ে করতে গেলেও সম্ভবত দুবার ভাববে।'

সালার মাথা নিচু করে হাতের তালুতে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আজ তার কাছে বলার মতো কিছুই নেই।

: 'আপনি আমাকে বলুন, আমি কী করব? এই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাই? চাকরি ছেড়ে দেই?' দীর্ঘক্ষণ পর সালার উনাকে কেবল একটি প্রশ্নই করল।

: 'আল্লাহর দেওয়া মেধা খাটিয়ে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। আল্লাহকে জিজ্ঞেস করো, তিনিই তোমাকে সিদ্ধান্ত দিবেন।' ডাক্তার সাহেব সিদ্ধান্ত আরও একবার তার উপরেই ছেড়ে দিলেন। সালার ভেজা চোখে হেসে ফেলল। এখন আর কেউ তাকে সিদ্ধান্ত দিতে চাচ্ছে না। সবাই তার সেই মেধার প্রশংসা করছে, যে মেধা এখন তার জন্য সত্য প্রমাণিত হয়ে উঠেছে।

: 'আল্লাহ মানুষের প্রতি অনেক দয়ালু, সালার! গুনাহ করলে তিনি বলেন না যে, তাওবার সুযোগ দেব না। বারবার তাওবার

সুযোগ দেন। তার দিকে ফিরে আসার মওকা দেন।" তিনি এখন তার ক্ষতে মলম মাখানোর চেষ্টা করছেন।

: জীবনে মানুষ যখন হেদায়ত পায়, তখন তার দেখা উচিত নয় যে, সে অতীতে কী করেছে। তার উচিত কেবল সেই মুহূর্ত থেকে পথ বদলে নেওয়া।

সালার চুপচাপ উনার কথা শুনতে থাকল। ডাক্তার সাহেব যে কোমল স্বরের জন্য প্রসিদ্ধ, যে স্বর সে বছ বছর ধরে শুনে আসছে। সেই স্বরে বলা আজকের কথাগুলো সালার কেন জানি মেনে নিতে পারছে না যে, তার তাওবা এত সহজে, এত আসানভাবে কবুল হবে! আল্লাহ তার বান্দাদের মাফ করেন, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু-এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, তার মনের গভীরে কোথাও না কোথাও এই অনুভূতি কাজ করছে যে, সে আল্লাহকে রুষ্ট করেছে। কতটা করেছে, তা সে বুঝতে পারছে না।

সে হাফেজে কুরআন। আসমানি কালাম হৃদয়ে ধারণ করে,
এতটুকু আসমানি অনুভূতি তার হৃদয়ে তো জাগরুক হওয়ার
কথা যে, তার খালিক তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি রুষ্ট! আল্লাহর সঙ্গে
এতটুকু সম্পর্ক তো ছিল, যাতে সে বুঝতে পারত, আল্লাহ তার
প্রতি সন্তুষ্ট নন। দেরিতে হলেও, তার আত্মায় থাকা মানদণ্ড,
আত্মার শূন্যতা অনুভব করতে শুরু করেছিল। যে শূন্যতা
কেবল আল্লাহর মহব্বতেই পূর্ণ হতে পারে। তাঁর সন্তুষ্টির
মধ্যেই তা টইটুম্বুর হতে পারে।

সে ডাক্তার সিবতে আলির বাড়ি থেকে একই পদক্ষেপে ফিরে
এলো। এখন তাকে সেই গুনাহের কাফফারা আদায় করতে
হবে, যাকে সে এত বছর গুনাহ নয়; বরং প্রয়োজন বলে মনে
করে আসছে। বিশ্বব্যাংকের হেডকোয়ার্টার্সে পাওয়া
অপদস্থতার পর একটি নতুন ইসলামি অর্থব্যবস্থা তৈরির যে
প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছিল, তা এখন আগের চেয়েও আরও দৃঢ় হয়ে
উঠেছে। এখন এটিই কেবল তার গুনাহের কাফফারা হতে

পারে। ওয়াশিংটনে, বিশ্বব্যাংক হেডকোয়ার্টার্সে তার পদ গ্রহণের আনন্দে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছিল। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু তার তখন প্রয়োজন ছিল, তা সে পেয়ে গিয়েছে। সালার সিকান্দার অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এখন পদোন্নতির সেই অগ্রগতি, তার কাছে অগ্রগতি মনে হচ্ছে না। বরং এটি যেন চোরাবালির আরও একটি গভীর খাদ। এই খাদ থেকে বের হতে হলে তাকে আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে হাত-পা ছুড়তে হবে।

: 'হামিন তোমার জন্য সৌভাগ্য প্রমাণিত হয়েছে।' সিকান্দার উসমান ফোনে সালারকে অভিনন্দন জানাতে জানাতে বললেন। সে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেই ক্ষান্ত রইল। 'ও সুস্থ আছে না?' সিকান্দার উসমান হামিনের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। সেদিন তিনি ইমামার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। অকাল প্রসবের কারণে প্রতিদিনই তার স্ত্রী ইমামার খোঁজখবর নেন।

: 'হ্যাঁ, একদম সুস্থ। স্টেবল আছে।' সে জানাল। হঠাৎ সিকান্দার উসমানের স্কুলের এক দারোয়ানের কথা মনে পড়ল। দারোয়ানটি সেদিন কিছু টাকা চাইতে এসেছিল। বলছিল, তার মা-বাবা বোনদের বিয়ের জন্য সুদে টাকা নিয়েছিল। আর সেই দেনা এখনো শোধ করে যাচ্ছে। এবার হয়তো নতুন কোনো বিপদ এসে পড়েছে তার ওপর। সিকান্দার উসমান বলছেন, আর সালারের মনে হচ্ছে তার গলায় বাঁধা দড়িতে আরও একটি গিঁট বেঁধে দিল। কখনো কখনো আল্লাহ পাক যখন কাউকে কঠিনভাবে হুশিয়ারি করতে চান, তখন চারপাশ থেকেই সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে থাকে।

সালার পিএইচডি করতে আমেরিকায় আসার পর থেকে, সিকান্দার উসমানই গ্রামের স্কুলটি দেখাশোনা করছেন। তিনি সপ্তাহে একবার সেখানে যান এবং স্কুলের ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের বিষয়গুলো দেখভাল করেন। সালার এখন কেবল নামমাত্র স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছে।



: 'আপনি তাকে সাহায্য করুন। তার ঋণটা শোধ করে দিন।'
সালার উনাকে বলল।

: 'হ্যাঁ, তারপর যেন ঋণগ্রস্তদের লাইন লেগে যায় এখানে।'
সিকান্দার গম্ভীরভাবে বললেন। 'তাছাড়া আমরা কি জানি নাকি
যে, সে সত্য বলছে নাকি মিথ্যা? একজনের ঋণ শোধ করলে
তো পুরো গ্রাম তাদের ঋণ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। কেউ
নিয়েছে গরু-মহিষের জন্য, কেউ জমিতে চাষবাসের জন্য,
কেউ টিউবওয়েল বসানোর জন্য, তো কেউ আবার মেয়ের
বিয়ের জন্য। এখানকার গ্রামে প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ একে
অপরের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নেয় আর দেয়ও। এটাই
তাদের জীবন আর ব্যবসার চক্র। তুমি বা আমি তা থামাতে
পারব না, আর না পারব বদলাতে। একবার তুমি গোলাম
ফারিদের ঋণ শোধ করে দেবো। পরেরবার তার প্রয়োজন হলে
সে আবারও কারও থেকে সুদে ঋণ নেবো। সেখানে কেউ
কাউকে সুদ ছাড়া ধার দেয় না। আর গ্রামের মানুষ ঋণ-করজা

ছাড়া কোনো কাজও করতে পারে না। তাই তুমি-আমি এসবে
না জড়ানোই ভালো।"

সিকান্দার উসমান যে যুক্তি দেখালেন, তা ভুল নয়। তবে
সালার ঝুঁক হয়ে গেল, এই মহামারি ক্যান্সারের মতো কোথায়
কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে! এ ব্যাপারে সিকান্দার উসমানের
জানাশোনা ছিল। কিন্তু সালারের ছিল না। যদিও সে পাকিস্তানে
থাকাকালীন গ্রামে প্রায়শই যাতায়াত করত। আর এখন সে
বিমানে বসে আছে। বিমানটি তাকে কিনশাসার দিকে নিয়ে
যাচ্ছে। অতঃপর সালার তার সমস্ত জীবনটাকে কোনো
সিনেমার মতো পর্দায় ভাসতে দেখছে।

'যারা সুদ খায়, কিয়ামতের দিন তারা সেই ব্যক্তির মতোই
উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে বোধশক্তিহীন করে দিয়েছে।
কারণ তারা বলে, ব্যবসাও তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ
ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।'



সালার একবার কুরআন পাকে সুরা বাকারায় এটি পড়েছিল।
দ্বিতীয় বাক্যটি তার বুঝে এসেছিল, কিন্তু প্রথম বাক্যটি সে তখন
বুঝতে পারেনি। আজ এটি তার বুঝে আসছে। 'তারা সেই
ব্যক্তির মতোই উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ করে বোধহীন করে
দিয়েছে।'

এই অবস্থায় তো সে নিজেই এখন। কথাটি ভাবতেই তার গলায়
যেন কেউ চেপে ধরল মনে হলো।

কিনশাসার দিকে যেতে যেতে আকাশপথে বসে বসেই সে
সিদ্ধান্ত নিল, চাকরি থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে আর কখনো
পরিবারের ভরণপোষণ করবে না। হালাল টাকায় তাদের
ভরণপোষণ করতে, তার কাছে আরও বহু পথ আছে। এটি তার
কাছে কোনো সমস্যা নয়। আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
তাকে লেকচারের আমন্ত্রণ জানানো হতো। আর সে
লেকচারের বিনিময়ে তাকে সম্মানিও দেওয়া হতো। এর আগে

চাকরির বাইরে উপার্জনের অন্য কোনো উপায় নিয়ে সে ভাবেইনি, যেখানে কাজ করে সে খুব সহজেই তার পরিবার চালাতে পারবে।

এখন সে কেবল দুটো কারণে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদটি নিতে চাচ্ছে। প্রথমত, ইবাকার দেওয়া ঋণের বোঝা সে শোধ করতে চাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বে প্রথম একটি সুদমুক্ত আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কিছুটা সময় নিতে চাচ্ছে। লক্ষ্য অনেক বড়। প্রয়োজনীয় অর্থও দরকার তেমনই। মস্তিষ্ক বলছে, সবই সম্ভব, অসম্ভব বলে কিছু নেই। মন বলছে, এ নিছক বোকামি। আর বিবেক বলছে-যদি কোনো পথ থেকে থাকে, তবে এই সেই পথ। আর আল্লাহ? জীবনে এই প্রথম মনে হচ্ছে আল্লাহও তার এই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত তার উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। ভেতরের যেই আওয়াজ তাকে সবসময় পথ দেখিয়ে চলত, সেই আওয়াজও এখন সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গিয়েছে। আর সালাহ

সিকান্দার যদি মনে করে থাকে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তবে সেটা নিছক কল্পনা নয়।

'তার হাত ধরে ছেলেটি এখন তাকে কোনো এক পথে নিয়ে যাচ্ছে। এক কদম, দুই কদম, তিন কদম... হঠাৎই সে থমকে দাঁড়াল। সেটি একটি হ্রদ। ছোট। তার পাড়েই ছেলেটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সে। হালকা নীলাভ আভাযুক্ত স্বচ্ছ জলের সেই হ্রদ। তাতে বাহারি রঙের মাছেরা সাঁতরে বেড়াচ্ছে। তার তলায় ছড়িয়ে আছে অগণিত বর্ণিল মুক্তা, পাথর আর ঝিনুকের এলোমেলো।

ঝিলের জলে ভাসছে জলচর পাখি। অনিন্দ্য সুন্দর রাজহাঁস। তার চারপাশ ফুলে ছেয়ে আছে। কিছু ফুল পাপড়ি বাড়িয়ে হ্রদের জলে গিয়ে মিশে গিয়েছে। কিছু ফুল তার সৌন্দর্যই তার চলা থামাতে পারেনি। তাকে থামিয়ে দিয়েছে হ্রদের জলে দুলন্ত কাঠের জলে ডুব দিয়েছে। কিছু জলের গায়ে পাপড়ি

মেলে ভাসছে। কিন্তু আশেপাশের কোনো তৈরি ছোট্ট একটি নৌকা। সে হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল।

শিশুর মতো নৌকার দিকে দৌড়ে গেল। ছেলেটিও তার পেছন পেছন ছুটে এলো। সে : 'এটা কি আমার?' সে মুচকি হেসে উঠল। তারপর ছেলেটির হাত ছাড়িয়ে কাছে আসতেই ছোট্ট নৌকাটি কিনারে এসে পড়ল। আর খুব সহজেই সে তাতে চেপে বসল। তার মনে হলো নৌকাটি যেন চন্দনকাঠের তৈরি; সুগন্ধি চন্দন দিয়ে। ছেলেটিও তার পাশে এসে বসে পড়ল। এক দমকা হাওয়া নৌকাটিকে জলের গভীরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দুজনেই হেসে উঠল। নৌকাটি এখন ধীরে ধীরে হ্রদের অপর দিকে এগোতে লাগল। সে ঝুঁকে জলে ভাসা এক পদ্ম তুলে আদর করে পুনরায় জলে ছেড়ে দিল।

অতঃপর নৌকার অপর পাশে ঝুঁকে দুহাতের অঞ্জলি ভরে জল নিল। সেই জলে উঠে এলো ছোট্ট রঙিন একটি মাছ। দুহাত উঁচু করে ছেলেটিকে মাছটি দেখাল। নিজের হাতে ছটফটাতে থাকা

মাছটি দেখে সে হাসতে লাগল। তারপর মাছটিকে জলে ছেড়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল। তারা দুজনেই এখন ঝুঁকে মাছটিকে সাঁতরে যেতে দেখছে।

জলের ওপর ভেসে থাকা একটি হাঁস নৌকার কাছে চলে এলো। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি। এভাবে তারা নৌকার চারপাশে এক বৃত্ত বানিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। যেন তাদের অভ্যর্থনা করছে। সেগুলো তাদের পাশ দিয়ে সাঁতরে যাচ্ছে, আর সে হাত বাড়িয়ে তাদের ছুঁয়ে দিচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে। হঠাৎই সে লক্ষ করল, হ্রদের জলে ভাসন্ত পদ্মফুলের সারি নড়েচড়ে উঠছে। সেগুলো জলে ভেসে ভেসে যেন নৃত্য করছে। এদিক-সেদিক ছুটছে। মনোরম নকশা আঁকছে। কাছে আসছে। দূরে যাচ্ছে। আবার কাছে আসছে। যেন এগুলো হাঁসদের মতো জীবিত হয়ে গেছে। হ্রদের নীলাভ জলে সাদা পদ্মগুলো, সবুজ সুন্দর পাতার দোলনে অবিরাম তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। সে অচেতন হয়ে পড়ছে, নাকি

উন্মাতাল? তা নিজেও বুঝতে পারছে না। বোঝার প্রয়োজনও
আর নেই এখন।

হৃদের নীল জলে নাচতে থাকা অগণিত ফুলের মধ্যে হঠাৎ সে
একটি প্রতিচ্ছায়া উদয় হতে দেখল। নৌকায় বসে সে
আচমকাই ঘুরে তাকাল, আর তারপর অচেতনভাবেই দাঁড়িয়ে
পড়ল। নৌকাটি হৃদের অন্য ধারে চলে এসেছে। আর এখানে....
এখানে কিছু একটা রয়েছে।

ঘুমের মধ্যেই ইমামা তার কবজিতে কারও স্পর্শ অনুভব
করতেই, হড়বড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘুমের ওষুধের প্রভাবে,
রুমের আধো আলোয় এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, সে
যেন এক স্বপ্ন থেকে অন্য স্বপ্নে প্রবেশ করল। সালার তার
বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে। তার পাশ ঘেঁষে। ইমামার
হাত তার হাতের মুঠোয় পুরে। জানা নেই, এটি ঘুম ভেঙেছে
নাকি স্বপ্ন? নাকি এটিই সেই স্পর্শ, যা তাকে স্বপ্ন থেকে
বাস্তবতায় নিয়ে এসেছে। ঘুমঘোর ওষুধের প্রভাব সত্ত্বেও,

ইমামা হঠাৎ তার হাত গুটিয়ে কনুইয়ে ভর করে বসতে লাগল।
সালার তাকে থামাল।

: উঠো না।

'তুমি সত্যিই এসে পড়েছ?' ইমামার যেন এখনো বিশ্বাস হচ্ছে
না। সালার মৃদু হাসল।

তোমাকে বলেছিলাম তো, এসে পড়বা।

এ তো বলোনি যে করে আসবে। আর তুমি আমাকে জাগালে
না কেন?

'ভাবলাম তোমার ঘুম নষ্ট হবে, তাই।' সালার মৃদু স্বরে কথা
বলছে। অপর বিছানায় শুয়ে আছে জিবরিল ও ইনায়া। তারা
গভীর ঘুমে মগ্ন। আর সোফায় বসে আছে হেডি। সে একটু

আগেই সালারের দরজা খোলার শব্দে জেগে উঠেছে।
সালারের সঙ্গে দু-চার কথা বলে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

সালার রাতের শেষ প্রহরে কিনশাসায় এসে পৌঁছেছে।
এয়ারপোর্টে দেরি না করে সোজা এখানে চলে এসেছে।
শহরের পরিস্থিতি এখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু
করেছে। সেনাবাহিনী ও সরকার, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে
সফল হচ্ছে।

'তোমার কী হয়েছে?' ইমামা এই প্রথম সালারের মুখের দিকে
খেয়াল করে তাকাল। তার চোখের চারপাশে কালো দাগ। চোখ
লাল হয়ে ফুলে আছে, যেন বহু রাত ঘুমায়নি।

'কিছু না। এতদিন বাসা থেকে দূরে ছিলাম, তাই হয়তো।'
সালার তার চোখ লুকিয়ে উত্তর করল। ইমামা তার কথা থামিয়ে
দিল। তার হঠাৎ স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল।

সালার, তুমি জানো, আমি একটু আগে স্বপ্নে কী দেখছিলাম?

সালার বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল, 'কী?'

আমি স্বপ্নে একটি বাড়ি দেখেছি-হৃদের ধারে। সেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ, এক নৌকায় বসিয়ে।

মুহূর্তেই সালার ঝুঙ্ক হয়ে গেল। কেননা, আমেরিকায় তার জন্য যে বাড়িটি সে মর্টগেজ করেছিল, সেটিও ছিল হৃদতীরবর্তী এক বাড়ি। ওই বাড়ির ব্যাপারে এখনো সে ইমামাকে কিছু বলেনি। সে এটি তাকে আগামী জন্মদিনে সারপ্রাইজ দিতে চাচ্ছিল। আর এখন সে হুট করেই তাকে হৃদের ধারের এক বাড়ির গল্প শোনাচ্ছে।

যে হৃদের ধারে সেই বাড়িটি ছিল, সেটি ছিল অসম্ভব সুন্দর একটি হৃদ। নীলাভ জলে ভেসে থাকা সাদা পদ্মফুল শোভিত



হুদাজলের তলায় সাঁতার কাটছিল রঙিন মাছের সারি।
সেখানের চারপাশে রাজহাস ভেসে বেড়াচ্ছিল। নৌকাটি ঠান্ডা
বাতাসের দমকায় নিজে নিজেই এগিয়ে চলছিল। আর হুদের
তীর ঘিরে ছিল ফুটন্ত ফুলেল গাছগাছালি। ঝোপঝাড়। নানা
রঙের ফুল সবুজে ছড়িয়ে ছিল। আর সেসব ফুল ঝরে ঝরে
জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

ইমামার এমন বর্ণনা শুনে সালার যেন কিছু বলতে পারছে না।
যে হুদের ধারে সে বাড়িটি কিনেছিল, সেটিও ছিল অনেকটা
এমনই। তার চারপাশেও ছিল ফুল, জলচর পাখি আর রাজহাস।
পদ্মফুলের সারিও। হুদের তীরঘেঁষে গড়ে ওঠা সকল বাড়ির
নৌকাও সেই জলে রাখা থাকে। শুধু পার্থক্য ছিল এটুকু-তার
স্বপ্নের ছবির মতো কোনো দাঁড়ওয়ালা নৌকা নেই সেখানে।

এক মুহূর্তের জন্য সালারের মনে হলো, ইমামা হয়তো তার
বাড়িটির কথা জেনে গেছে। হয়তো তার ল্যাপটপে বাড়ির ছবি
দেখে ফেলেছে, আর এখন ইচ্ছা করেই তাকে খোঁচা দিচ্ছে।

ধরে নিলাম এমনটাই হয়েছে, কিন্তু সে ল্যাপটপ দেখল কখন? গত কয়েক দিন তো তা সম্ভবই নয়। কেননা, ল্যাপটপ সারাক্ষণ তার সাথে ওয়াশিংটন ও পাকিস্তানে সফরে ছিল। আর যদি তার আগেই দেখে থাকে, তাহলে এখন এই অসুস্থ অবস্থায় কেন সে স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছে? সালার প্রচণ্ড বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

'আর বাড়িটি কেমন ছিল?' সালার জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'কাচের।' সালারের পশম দাঁড়াতে শুরু করল। কারণ, তার মর্টগেজ করা বাড়িটিও ছিল কাচের। 'কিন্তু আমি তার ভেতরে কিছুই দেখতে পাইনি। বাড়িটি কাচের হলেও ভেতরে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমি নৌকা থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল।' বলতে বলতে ইমামাকে অত্যন্ত হতাশ দেখাতে লাগল। তার যেন ভীষণ আফসোস হচ্ছে। সালার অপলক তার দিকে তাকিয়ে রইল। ইমামা বলতে থাকল, 'কিন্তু সেই বাড়িটি ছিল আমার মনের মতো। যেমনটা আমি আমার স্কেচে ড্রইং করেছিলাম। সেই

একই হৃদ, সেই একই সবুজে মোড়া প্রান্তর, সেই কাচের বাড়ি আর চারপাশে অসংখ্য ফুলা" ইমামা যেন এখনো কোনো ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে। সালারও নির্বাক হয়ে আছে। বাড়িটি মটগেজ করার সময় সালারও তো ইমামার স্কেচে আঁকা বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই করেই পছন্দ করেছিল। তার বুঝে আসছে না সে ইমামাকে কী বলবে। এটি কোনো খেলা হলে, ইমামা খুব ভালোই খেলছে। আর যদি খেলা না হয়ে থাকে, তাহলে তার মস্তিষ্কের ভিত নড়ে উঠছে।

তুমি কি কখনো এমন কোনো হৃদ দেখেছ, যেমনটা আমি তোমাকে বলছি?' প্রশ্নটি হঠাৎই এলো। আর তা ভীষণ অদ্ভুত শোনাল।

আমি?' সালার চমকে উঠল। 'আমি?' সে স্মৃতিতে জোর দিয়ে মনে করার চেষ্টা করল। হঠাৎ ঝলকেই তার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, এই হৃদ তো সে স্বপ্নে দেখেছিল! যে রাতে প্রথম ইমামাকে সায়েদা আন্নার বাড়ি থেকে তার অ্যাপার্টমেন্টে রুখসত করে

এনেছিল। সেদিন স্বপ্নে সে একটি অপরূপ সুন্দর উপত্যকায় ইমামার জন্য অপেক্ষা করছিল। অতঃপর ইমামা তার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সেখানে এসেছিল। তারা সেই অদ্ভুত সুন্দর উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে একটি হ্রদের ধারে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেখানে বাঁধা ছিল এক নৌকা। সেই হ্রদটিও ছিল ইমামার বর্ণনার মতোই এমন। ফুলে ভরা, সবুজে মোড়া, নীল জল, রাজহাঁস, পদ্মের দল আর দাঁড়ওয়ালা চন্দনকাঠের নৌকা। সালারের শরীর কাঁপতে লাগল। এই স্বপ্নটি যদি কোনো পাজল হয়ে থাকে, তাহলে এই টুকরো দুজনের মাঝে অদ্ভুতভাবে মিলে আছে।

তুমি হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন করলে, আমি স্বপ্নে কখনো হ্রদ দেখেছি কি না।" সালার ভাসা ভাসা গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল।

তোমার মনে আছে? হারাম শরিফ নিয়ে দেখা আমাদের সেই স্বপ্নের কথা? যার এক অংশ আমি দেখেছিলাম, আর এক অংশ



দেখেছিলে তুমি। আর সেটাও একই রাতে।" ইমামা যেন তাকে অদ্ভুত স্মৃতি স্মরণ করাতে বসে পড়ল। 'আমি ভাবলাম, এটিও হয়তো তেমনই কোনো স্বপ্ন। আমার দেখতে না পাওয়া বাড়ির ভেতরের অংশ হয়তো তুমি দেখেছ।' বলতে বলতে ইমামা বাচ্চাদের মতো প্রবল কৌতূহলী হয়ে সালারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন প্রত্যাশা করছে, প্রত্যুত্তরে সালার বলবে- হ্যাঁ, আমি সেই বাড়িটির ভেতর দেখেছি। কিন্তু সালার নিখর মূর্তির মতো কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুই বলল না।

হ্যাঁ, এই স্বপ্নেরও নিশ্চিত দুটি অংশ। কিন্তু সালার প্রথম অংশটি দেখেছে। সে দেখেছে, হৃদঘেঁষা উপত্যকাটি। তবে হৃদটি সে দূর থেকেই দেখেছে। কিন্তু ইমামা সেটি অতিক্রম করে অপর পাশেও চলে গিয়েছিল। বাড়ি পর্যন্ত তাদের কেউ পৌঁছাতে পারেনি। সালার তো সেই বাড়ির ঝলকও দেখেনি। ইমামা অবশ্য দেখেছিল, কিন্তু ভেতরে উঁকি দিতে পারেনি। তবে এই স্বপ্নটি তারা আগের স্বপ্নের মতো একই রাতে দেখেনি। সালার



দেখেছিল তাকে ঘরে তুলে আনার দিন। আর ইমামা দেখল
আজ প্রায় ছয় বছর পর।

'আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?' সালারের দৃষ্টি
তার কাছে ভীষণ অদ্ভুত লাগলো। সালার তার থেকে চোখ
সরিয়ে ফেললো। সে তাকে এটা বলতে পারলো না যে, এখানে
আসার আগে ডাক্তার সিবতে আলির সঙ্গে দেখা করে
ওয়াশিংটনের সেই বাড়ির মর্টগেজ বাতিল করে দিয়ে এসেছে।
ইমামার স্বপ্নের বাড়িটি তার হাত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এক
মুহূর্তের জন্য, কেবল এক মুহূর্তের জন্য সালারের মনে এক
অদ্ভুত অনুশোচনা ও যাতনা চাগাড় দিয়ে উঠল। সেই
মর্টগেজটি ক্যানসেল করার পর হঠাৎ তার মনে হয়েছিল,
বাড়িটি পুনরায় ফিরিয়ে আনা যাক। সাথে সাথে আমেরিকায়
ফোন করলে সেটি সে ব্যবস্থা করতে পারবে, এতটুকু ক্ষমতা
তার আছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে তা মাথা থেকে ঝেড়ে
ফেলল। কারণ, শুধু সিআইএ-ই তার জন্য ফাঁদ পেতে রাখেনি;

শয়তানও রেখেছে। রবের গোলামকে নিজের গোলাম বানানোর জন্য কোমর বেঁধে সদা প্রস্তুত হয়ে আছে সে।

'হামিন কেমন আছো ? সালার হুট করে বিষয়টি সেখানেই রেখে হামিনের ইনকিউবেটরের দিকে চলে এলো। শয়তান যেন আফসোস করে হাত কচলে বলল, ' এই প্রসঙ্গ ফেলে সালার কীভাবে চলে গেল? সে বিদ্যুতের মতো এসে, পলকেই উধাও হয়ে গেছে। তার কাজ তো ছিল কেবল ওয়াসওয়াসা ও সংশয় জাগানো। আর সেটি জাগিয়ে সে চলেও গেছে।

একদম ঠিক আছে, দেখো-ঘুমোচ্ছে।' ইমামা বালিশে হেলান দিয়ে শান্ত গলায় বলল। সালার এই প্রথম ইনকিউবেটর খুলে ছোট্ট মুহাম্মদ হামিনকে কোলে তুলে নিল। সমস্ত ডাক্তারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে, ভেজা চোখে, ঝুঁকে ঝুঁকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কপালে চুমু খেল। নাজুক কচি শিশুটি বাবার স্পর্শে কুঁকড়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল।

কালো, গোলগাল, মোটা চোখদুটি তার ক্ষীণ ও ভঙ্গুর দেহের
তুলনায় অদ্ভুতুড়ে মনে হতে লাগল।

চোখ মেলেই সে বাবার দিকে তাকাল। অপলক চেয়ে রইল।
সালারও ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎই
তার কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল, নাক কুঁচকে উঠল, আর
তারপর সে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এত জোরালো
আর তীক্ষ্ণ সেই কান্না! কয়েক মুহূর্তের জন্য সালার বিস্ময়ে
হতভম্ব হয়ে গেল। এত ক্ষুদ্র শরীরে এত শক্তি এলো কোথা
থেকে! এমন চিৎকার দেওয়ার জন্য এই দেহে প্রাণ দিল কে!
তার কান্নায় জিবরিল আর ইনায়াও অবচেতনেই হকচকিয়ে
জেগে উঠল। হামিন যখনই কাঁদে, এভাবেই হঠাৎ, আর এমন
উচ্চৈঃস্বরেই কাঁদে। হেডি দৌড়ে একেবারে ভেতরে চলে
এলো। এদিকে সালার হামিনকে পুনরায় ইনকিউবেটরে রাখার
চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এক সপ্তাহ বয়সি শিশুটি একবার
ইনকিউবেটর থেকে বেরোনোর পর, আর ভেতরে না যাওয়ার
জন্য যতটুকু লড়াই করা সম্ভব, ততটুকুই করছে। তার সাধ্য

থাকলে সে তার হাত, বুক, নাক আর শরীরের প্রতিটি অংশে লাগানো নল-তারগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলত। যদিও সে এগুলোর কোনোটা খুলতে পারল না, কিন্তু তার শরীরের লাগাতার ঝাঁকুনির ফলে হালকা করে বাঁধা ডায়াপার হঠাৎ খুলে গেল। ডায়াপার ছাড়া হামিনের শরীরে কেবল তার আর নলই রয়েছে। আর তখনই সে হঠাৎ টারজানের বাচ্চার মতো রূপ ধারণ করল। জিবরিল পাশের বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, বাবার দিকে দৌড়ে আসতে আসতে ছোট ভাইয়ের এমন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে চিৎকার করে হাত চেপে চোখ ঢেকে ফেলল।

: 'Baba! Baby is naked. বাবা! বেবি উলঙ্গ হয়ে গেছে।' জিবরিল যেন অবিশ্বাস্যভাবে সালারকেও হাত চেপে চোখ বন্ধ করতে ঘোষণা করল। জিবরিল যদি তখন চোখ বন্ধ না করত, তাহলে নিশ্চিত লজ্জায় জমে যেত। কেননা, বেবিটি এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে তার ভেতরের পানি বের করে দিয়েছে। হামিনকে হেডির হাতে তুলে দিয়ে সালার অবিশ্বাস্য



চোখে প্রস্রাবে ভেজা শাটের দিকে তাকিয়ে রইল। এই কাণ্ড তার প্রথম দুই সন্তান কখনোই করতে পারেনি।

না জানি তুমি তাকে কীভাবে ধরেছ! কীভাবে চেপে ধরেছ যে, সে এভাবে কাঁদছে! হেডি! লেডি ডাক্তারকে ডাকো। না, তুমি বরং একে আমার কাছে দাও। আচ্ছা থাক আমিই আসছি।" ইমামা নিজের শরীরের দিকে খেয়াল না করে, অস্থির হয়ে তার কাঁদতে থাকা বাচ্চাটিকে কোলে নিতে বিছানা থেকে নামতে শুরু করল।

: 'Baba! Can I open my eyes? বাবা, আমি কি এখন চোখ খুলব?' জিবরিল অন্ধের মতো দুহাত ছড়িয়ে, চোখ বন্ধ করে টলমল পায়ে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে সালারের দিকে এগোতে লাগল। সে তার ছোট ভাইয়ের উলঙ্গতা দেখার জন্য একেবারেই প্রস্তুত নয়। তার ছোট ভাই তখন লিটল স্টুয়ার্টের মতো চিৎকার করতে করতে ইনকিউবেটর থেকে যেন লাফিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে।



ইনায়া একবার হতচকিত হয়ে জেগে, সালারের দিকে লক্ষ না করে আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিকে সালার জিবরিলের ছড়ানো হাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর সব সময়ের মতো পায়ের আঙুলে ভর করে মাটিতে বসে পড়ল। জিবরিল তার জীবন ও পৃথিবী; দুটোই। এই পৃথিবী তার হাত ফসকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। তার আঙুলের ডগা ছুঁয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে তার সেই জীবন। এই স্বরগুলো, এই পরিবার, এই কক্ষ এবং তাতে বিদ্যমান দুটি কচি অস্তিত্ব-এরাই তার অস্তিত্বের পূর্ণতা।

: 'Yes, you can. হ্যাঁ, খুলতে পারো।' সালার ওভাবেই তাকে জড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বলল। জিবরিল চোখ খুলে প্রথমেই সতর্ক দৃষ্টিতে চোরের মতো ইনকিউবেটরের দিকে তাকাল। ওখানে হামিন এখন হেডি আর ইমামার আড়ালে ঢেকে আছে।

: 'Why are you crying papa? পাপা, আপনি কেন কাঁদছেন?' বাবার দিকে মনোযোগ ফেরাতেই জিবরিল প্রথম নজরেই সালারের চোখে পানি দেখে প্রশ্ন করল। তার এই প্রশ্নটি ইমামাকেও ঘুরে তাকাতে বাধ্য করল। সালারের পিঠ এখন ইমামার দিকে। সে এখন জিবরিলকে শুইয়ে তাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে এটি যেহেতু বিশ্বব্যাপ্তির দেওয়া একটি আবাসন ছিল, তাই সেই ক্ষতি পূরণ হয়ে যাওয়ারই কথা। সালারের সঙ্গে এমনটা দ্বিতীয়বার হলো। প্রথমবার সে তার গ্রামের স্কুল ভবনকে এভাবে ভস্মীভূত হতে দেখেছিল। কিন্তু এই বাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তার যা মনে হচ্ছে, স্কুলের ভবন দেখে তা মনে হয়নি। তখন সে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দায় চাপিয়ে দিয়েছিল ইমামার পরিবারের ওপর। একবারও ভাবেনি যে, এটি

তার কোনো আমলের শাস্তি হতে পারে। কিংবা তাকে দেওয়া
কোনো সতর্কবার্তা।

সে তখন সুদ-উপার্জিত অর্থ দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করার
চেষ্টা করছিল। অথচ আল্লাহ এটি কবুল করবেন, তা কীভাবে
সম্ভব! আজও পুনরায় সে এমনই এক ধ্বংসস্তূপের সামনে
দাঁড়িয়ে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে, তার উপার্জনের পথটি এমন
ছিল, যেখান থেকে সারা জীবন কেবল অকল্যাণই বের
হয়েছে; কোনো কল্যাণ নয়। বাড়িতে লাগা আগুনে তার
ছোটখাটো সমস্ত গয়না, সেভিংস সার্টিফিকেট আর সন্তানদের
ইনশিওরেন্সের কাগজপত্র হয়তো ছাই হয়ে গেছে, নয়তো লুট
হয়ে।

সালারের পরিবার থেকে পাওয়া গয়নাগুলো ইমামা,
পাকিস্তানের একটি লকারেই রেখে এসেছে। এখানে তার কাছে
কেবল কিছু ছোটখাটো হীরের গয়না ছিল। এগুলো সে সময়ে
সময়ে আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে কিনেছিল। কিন্তু এই

ছোটখাটো গয়নাগুলোর দামও চল্লিশ লক্ষ টাকার কম ছিল না। এই বাড়িতে আরও অনেক কিছু ছাই হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে ইমামা কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু সালার নয়। সম্পদের জন্য কোনো চিন্তা নেই, তার পরিবার নিরাপদ আছে, এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

বিশ্বব্যাংক ইতিমধ্যে জরুরি ভিত্তিতে তাদের সকল কর্মচারীর ক্ষয়ক্ষতি পূরণের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। কর্মচারীদেরকে তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু সালার সিকান্দার কোনো দাবি জমা দিল না। এই হারাম উপার্জনকে সে এখন ভয় পাচ্ছে। এই উপার্জন যখনই তার হাতে আসে, তার হালাল উপার্জনকেও এর সাথে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তারা এখন এম্ব্যাসি থেকে একটি ফাইভ-স্টার হোটেলে শিফট করেছে। হামিন এখনো আমেরিকান এম্ব্যাসির অধীন সেই হাসপাতালেই রয়ে গেছে।

আমি চাচ্ছি, ডাক্তার হামিনকে ভ্রমণের অনুমতি দিলে, বাচ্চাদের নিয়ে তুমি পাকিস্তান চলে যাবো।" এক রাতে সালার ইমামাকে বলল।

কেন?' ইমামা অসন্তুষ্ট হলো।

কারণ, কঙ্গোতে যা ঘটেছে, এরপরও আমি তোমাদের জীবনের কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।

একটু আগেই ইমামা তার জন্য কফি বানিয়ে এনেছে। অনেকদিন পর তারা রাতের এই নীরবতায় একে অপরের সঙ্গে বসে কথা বলার সুযোগ পেল। হামিন জলদিই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে চলেছে। আর সালার যেন তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে, ঘড়ির কাঁটা গুনছে।

কঙ্গো এতটাই অনিরাপদ হলে তুমি এখানে কেন থাকতে চাও? তুমিও আমাদের সাথে চলো।" প্রত্যুত্তরে ইমামা বলল। সালার

একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়েই রয়ে গেল। 'আমি আপাতত যেতে পারব না।' বলতে বলতে এক চুমুক পান করল।

আপাতত?' প্রত্যুত্তরে ইমামা এবার প্রশ্ন করল।

আগামী পাঁচ বছর।

কখনোই নয়।' ইমামা কফির কাপ ওভাবেই রেখে দিল। যেন বাড়তি কিছু না বলেই তার রায় শুনিয়ে দিল।

তোমার জেদ আমাকে দুর্বল করে দিবে। তুমি আর বাচ্চারা এখানে থাকলে, আমি সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকব। কাজে মন দিতে পারব না। তোমরা নিরাপদ...।

ইমামা তার কথা থামিয়ে দিল।

তোমার কি মনে হয় যে, তুমি এখানে একা থাকলে আমি আর আমার বাচ্চারা পাকিস্তানে খুব সুখে-শান্তিতে থাকব? তুমি নিজে শান্তিতে থাকার জন্য আমাকে অশান্তিতে রাখতে চাচ্ছ? আমি যাব না, সালার! তুমি যেখানে থাকবে, আমি সেখানেই থাকতে চাই।

সালার শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল। সে ইমামার প্রতিটি আচরণ সম্পর্কে অবগত এবং জ্ঞাত। আর ইমামা তার এই জেদ থেকে কখনো পিছপা হবে না। ডাক্তার সিবতে আলি তাকে বলেছিলেন, ইমামার থেকে আপনি যে কষ্ট পান, সেটি আপনার আমলের ফল। কিন্তু সালারের এখন উনাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে, ইমামার সঙ্গে থেকে যে সুকুন ও প্রশান্তি সে পায়, তা আমার কোন নেকির প্রতিদান?

বিশ্বব্যাংক ও আমেরিকান সরকার তাকে ওয়াশিংটনে যে ফ্রি হ্যান্ড বা অবাধ ক্ষমতা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিল, তারা তা পূর্ণ করেছে। তারা সালার সিকান্দারকে আফ্রিকার ভালো-

মন্দের মালিক বানিয়েই এখানে পাঠিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্টদের মধ্যে তাকেই এই প্রথম এতটা অবাধ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এমনকি শুধু বিশ্বব্যাংকের বোর্ড অফ গভর্নর্সই নয়, আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টও সাময়িকভাবে তার কাছে নত হতে বাধ্য হয়েছে। সালার তাদের সেই পেয়াদা, যে হঠাৎ করেই রাজায় পরিণত হয়ে গেছে। আর বোর্ডে বসা সব গুরুত্বপূর্ণ মোহরাগুলোকেও এক লহমায় তাকে রাজা হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্সি পদ গ্রহণের পরের দিন সালার সিকান্দার, ওয়াশিংটনের প্রধান নিউজ চ্যানেলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক প্রেস কনফারেন্স করে। পেট্রোস ইবাকার মৃত্যুর পর সেটি ছিল তার প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তব্য। তাতে সে কঙ্গোতে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প কর্তৃক চলমান অন্যায় নির্মূল করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সাথে ব্যাংকের বিরুদ্ধে

উত্থাপিত সমস্ত সমালোচনা স্বীকার করে নেয়। কোনো কপতটার আশ্রয় নিয়ে সে ব্যাংকের পক্ষ নেয়নি।

সালার সিকান্দারের এই প্রেস কনফারেন্স বিশ্বব্যাংক প্রশাসনের জন্য খানিক অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও এটি ছিল একটি ইতিবাচক আশাব্যঞ্জক প্রেস কনফারেন্স। কেননা, এখানে সে বিশ্বব্যাংকের ভুল স্বীকার করার পাশাপাশি আফ্রিকায় বিশ্বব্যাংকের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বও তুলে ধরেছে। বিশেষ করে বিশ্বের এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পরের দিন তার এই প্রথম প্রেস কনফারেন্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আফ্রিকার প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলো হেডলাইনে প্রকাশ করেছিল। কঙ্গোবাসীর কাছে সালার সিকান্দারের চেহারা শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক নয়। তাদের কাছে সে পেট্রোস ইবাকার একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী।

পেট্রোস ইবাকার মরদেহ কঙ্গোতে পৌঁছার আগেই, সালার সিকান্দার এখানে পৌঁছায়। এখানে পেট্রোস ইবাকার সহযোদ্ধা বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রধানদের সঙ্গে সে দেখা করে। ইবাকার পরিবার যেকোনো প্রকারের বিদেশি সংস্থা ও সরকার-প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সালারের সাক্ষাতের অনুরোধ তারা ফিরিয়ে দিতে পারেনি। সালার মার্কিন সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ইবাকার মরদেহ সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে দিলে কঙ্গোর মানুষকে শান্ত করা সম্ভব। অবশেষে দুই সপ্তাহ পর মার্কিন সরকার তার মরদেহ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়।

ইবাকার মরদেহ দাফন করতে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু কঙ্গোর সরকার তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে জানায় যে, লক্ষাধিক মানুষের ভিড়ে তারা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে না। ফলে তারা আর তাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ইবাকার পরিবার সালারকে আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাংক প্রশাসন ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাকেও তার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ

করেছিল। কিন্তু সালার সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ইমামাও অসন্তুষ্ট ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সালারকে থামাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সে। ইবাকার মরদেহ কিনশাসায় পৌঁছানোর পরও ইমামা তাকে বোঝাতে থাকে। এদিকে সেই সন্ধ্যাতেই তার দাফনের আয়োজন শুরু হয়ে যায়।

এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে সালার দুই রাকাত নফল পড়তে দাঁড়ায়। ইমামা এদিকে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে অসহায়ের মতো অনুনয়-বিনয় করতে থাকে।

আমার কিছু হয়ে গেলে বাচ্চাদের নিয়ে তুমি সাথে সাথে পাকিস্তান চলে যেয়ো। আমার মৃতদেহ পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকো না।" নফল শেষ করে সালার প্রথম এই কথাটিই বলল। সালার তখন তার বেডরুমে। আর বাচ্চারা স্যুইটের অপর রুমে। ইমামা তখন বাচ্চাদের রেখে সালারকে বোঝাতে এসেছে। সালারের মুখে এমন কথা শুনে ইমামা আঘাত পেল।

তুমি অনেক নির্দয়, সালার!" সে চোখ কচলাতে কচলাতে সালারকে বলল।

তোমার চেয়ে কম।" সালার হাসতে হাসতে তাকে কাছে টেনে নিল। তারপর সে পাশের রুমে বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আসার সময় জিবরিল তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলো। দরজা থেকে বেরোতে বেরোতে সালার ইমামাকে বিদায় জানাতেই, ইমামা তার বাহু টেনে ধরল।

: 'তুমি ফিরে আসবে না তো ?' বর্ষণরত চোখে মিনতি ভরা কণ্ঠে ইমামা তাকে বলল। যেন সালার তার কথা কোনোভাবেই ফেলতে পারবে না। হয়তো থেকেই যাবে। কিন্তু সালার তার চোখের দিকে না তাকিয়ে, বাহু থেকে তার হাতখানা তুলে, তাতে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল, 'ইনশাআল্লাহ।' তারপর পা জড়িয়ে থাকা জিবরিলকে কোলে তুলে তার মুখে চুমু খেয়ে তাকে বলল, 'তোমার মান্নি আর ভাইবোনদের খেয়াল রাখবে।'

: 'I always do baba. বাবা, আমি তো তা সবসময়ই রাখি।' জিবরিল আশ্বস্ত করল। সালার আবারও তার মুখে চুমু খেয়ে বলল, 'আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ। আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত।' বলতে বলতে সালার তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। তারপর সবাইকে বিদায় জানিয়ে ইবাকার দাফনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। দরজায় দাঁড়ানো অশ্রুসিক্ত ইমামার দিকে একবারও তাকাল না।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে, লাখো মানুষের ভিড়ে সালার সিকান্দার ইবাকার মৃতদেহ গ্রহণ করে। ওই লাখো মানুষের ভিড়ে সালার ছাড়া আর কোনো শ্বেতাঙ্গ মানুষ নেই। এমনকি এই নিউজ কাভার করতে আসা সব চ্যানেলের কর্মীরাও স্থানীয়। জীবন ঝুঁকি কেউই নিতে চায়নি তারা। যে বন্য, প্রাচীন আর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় দেওয়া ও জীবন নেওয়ার মতো অস্পষ্টজিত দুঃসাহসী উন্মত্ত উপজাতির ভিড়ে ঢোকার বন্ধপরিকর উপজাতিরা তাদের পথের সমস্ত বাধা গুড়িয়ে দিতে সদা

প্রস্তুত, তাদের মাঝে কেবল একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি সালার সিকান্দার। যদিও সে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ নয়; তবুও অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গের মাঝে তাকে শ্বেতাঙ্গই মনে হচ্ছে। সালার এখানে এসেছে একেবারে নিরস্ত্র হয়ে। কঙ্গো সরকার তাকে খানিক নিরাপত্তা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু উপজাতিরা তা ফিরিয়ে দিয়েছে। ফলে সালার সিকান্দার একাই নির্ভয়ে সেই ভিড়ের ভেতর প্রবেশ করেছে।

গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি টিভি পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠানে। এতে লাখো মানুষের মাঝে যেন কেবল একজন মানুষকেই ফোকাস করা হচ্ছে বারবার। আর সে হলো সালার সিকান্দার। তীক্ষ্ণ নাক-চোখসম্পন্ন এই দীর্ঘদেহী মানুষটি, ইবাকার শেষকৃত্যে তার পরিবারের সঙ্গে মঞ্চে বসে আছে। এখানে কেউ যদি গুলি চালায়, তাহলে অনায়াসে তাকে শেষ করে দিতে পারবে। সে কে? কোথায় আছে সে? তার এসব পদমর্যাদা দিয়ে তাকে আলাদা করার মতো কোনো সুযোগ নেই এখানে। আর যদি সেই ভিড় হঠাৎ তার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। পদপিষ্ট হয়ে যাবে সে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জেনেও সালার এই মঞ্চে এসে বসেছে।

মঞ্চে বিভিন্ন উপজাতি প্রধান তাদের উপজাতি নিয়মে উত্তাল বক্তৃতা দিচ্ছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ডেকে আনার স্লোগান তুলছে। সালার তাদের একজন সহযাত্রী হয়ে সবকিছু দেখে চলছে। তার অন্তরে ভয়, আর ঠোঁটে কুরআনের আয়াত। আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট জেনেও সে কেবল আল্লাহকেই ডাকছে। ওদিকে আমেরিকার সিআইএ সদর দপ্তর এবং বিশ্বব্যাংকের হেডকোয়ার্টারের পর্দায় ভেসে উঠেছে এই লাইভ। সালার সিকান্দার নামের এই মানুষটি যেন তাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলছে। সাহসী হলে সালারের মতোই হওয়া উচিত। দুঃসাহসী হলেও তার মতোই হওয়া উচিত। সালারের এই বীরত্ব ও সম্মান দেখে ওয়াশিংটনের সবাই শুদ্ধ, নির্বাক ও অভিভূত হয়ে টিভির সামনে বসে আছে।

সালারের নাম ঘোষণা করতেই সালার পেট্রোস ইবাকাকে শ্রদ্ধা জানাতে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লক্ষ মানুষের ঢল হাততালি দিয়ে তাকে প্রশংসা জানাল। ছাফুটের চেয়ে দীর্ঘ তীক্ষ্ণ অবয়ব আর গম্ভীর চেহারার একজন মানুষ, সালার সিকান্দার। কালো ট-পিস স্যুট তাকে সৌন্দর্য ও মর্যাদার এক অপরূপ প্রতিমূর্তি করে তুলেছে। গোটা বিশ্বের ক্যামেরা তখন তার দিকে নিবদ্ধ।

মঞ্চার অনেকটা উপরে, একটি ব্ল্যাক-হক হেলিকপ্টারে করে, সিআইএ-র কিছু কমান্ডো এই বিশাল জনসমুদ্রকে পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের হাতে রয়েছে ভি-স্কোপ।

আরও কিছু ব্ল্যাক বক্স আশপাশের ভবনগুলোতে নজর রাখছে।

সালার সিকান্দারের নিরাপত্তার জন্য এটুকু ছাড়া এই মুহূর্তে সিআইএ'র আর কিছু করার নেই।

সালার সিকান্দার এখন রোস্ট্রামের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দাঁড়াতেই জনসমুদ্র হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সালার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়ে, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত শুরু করল। জীবনে সে বহু বক্তৃতা দিয়েছে; কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই এমন লক্ষ মানুষের সামনে ছিল না। এখানকার সবাই আবার অপরিচিত। এদের সঙ্গে তার কেবল মানবিক সহমর্মিতা ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কও নেই। সালার তাদের স্থানীয় ভাষা লিংগালাতে কথা বলতে শুরু করল। সেগুলো আবার সাথে সাথে অনুবাদ হয়ে টিভিপর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।

বিশ্বজুড়ে টেলিভিশন সম্প্রচারে, স্থানীয় নেতাদের সোয়াহিলি ও লিংগালা ভাষায় দেওয়া প্রতিটি বক্তৃতা, ইংরেজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু এদিকে সালার কিংবা ইমামা কারোরই ধারণা ছিল না, আজ সে আফ্রিকার এই কৃষ্ণাঙ্গ জনসমুদ্রের সামনে আখেরি নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবা পুনরাবৃত্তি করবে! খুতবার যে

শব্দগুলো থেকে সালার সারা জীবন পালিয়ে বেরিয়েছে, সেগুলো আজ অবচেতন থেকে চেতনার ভেতর দিয়ে যাত্রা করে তার ঠোঁটে এসে ভিড় করেছে। শুধু ভিড়ই করেনি; বরং সেগুলো লাখো মানুষের সামনে উচ্চারিত হয়ে, পৌঁছে যাচ্ছে কোটি কোটি মানুষের কাছে।

সে সব সময়ের মতো বিসমিল্লাহ বলে তার বক্তৃতা শুরু করল। জনসমুদ্রকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শোনাল, যার অর্থ-সম্মান ও অপদস্থতা কেবল আল্লাহরই হাতে। অতঃপর মাথা তুলে জনসমুদ্রের দিকে তাকাতেই তার মস্তিষ্ক যেন শূন্য হয়ে গেল। এখানে সে কী বলতে এসেছে, এক মুহূর্তের জন্য তা ভুলে গেল। তারপর সে নিচে ঝুঁকে রোস্ট্রামের উপর রাখা নোটবুকে নজর দিল। তাতে সে বক্তব্যের মূল পয়েন্টগুলো লিখে এনেছে। সারা জীবন সে শুধু পয়েন্টগুলো নোট করে নিয়েই বক্তৃতা দিয়ে এসেছে, বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন হয়নি। কেননা, নিজের স্মরণশক্তি ও জ্ঞানের ওপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। অথচ এখন সে একদম শূন্য মগজে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে বিশাল জনসমুদ্র তার পরবর্তী বাক্য শোনার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। কেননা, এই বিশাল জনসমুদ্র তার শুরুর কুরআনের আয়াতের অর্থ একটুও বুঝতে পারেনি। কারণ, তারা এখনো আল্লাহকে চিনে না, আল্লাহর পরিচয় জানে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে তারা মহান ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। তারা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু সেই মহান রবকে তেমনই চিনে না, যেমন চিনে না, সম্মান ও লাঞ্ছনা প্রদানকারী রবকে। সালার সিকান্দার এখন আর এমন কী বলতে পারে, যা তারা সহজে বুঝবে! ঠিক তখনই তার শেষ খুতবার কথা মনে পড়ে গেল।

'আমি এমন একটি সংগঠনের অংশ, যারা অতীতে এই অঞ্চলে এবং আপনাদের সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছে। আপনাদের তুচ্ছ মনে করা হয়েছে। আপনাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। আপনাদের ভূমি ও সম্পদে অবৈধ দখল করা হয়েছে। এ সবকিছুর জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কেননা, আমি এমন এক ধর্মের অনুসারী, যার প্রেরিত নবি আমানতের খেয়ানত করতে নিষেধ করেছেন। নিজের জন্য যা পছন্দ, তা

অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করতে বলেছেন। যিনি বলেছেন, কোনো কৃষগাঙ্গের ওপর কোনো শ্বেতাঙ্গের এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কোনো কৃষগাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তিনি সাম্যের কথা বলতেন। জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ ও কোনো অদ্ভুত প্রথা মানতেন না।"

সালার সিকান্দার ছিল কেবল হাফেজে কুরআন; কোনো ধর্মপ্রচারক মুবাল্লিগ নয়। বক্তা ছিল, তবে মুফাসসির নয়। জীবনে কখনো সে তার পেশায় ধর্মকে টেনে আনার চেষ্টা করেনি। আজও সে এ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মুখ থেকে যা বের হচ্ছে, তা ছিল তার হৃদয়ের কথা। আর সেগুলো উপস্থিতদের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে।

আফ্রিকার অমানবিক পরিস্থিতিতে বসবাসকারী কৃষগাঙ্গ জনগোষ্ঠী তার কথা শুনে চলছে। এই প্রথম তারা ধীরস্থির, নীরব ও সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে শুনছে। আর এই নীরবতা একটি আকস্মিক প্রশংসার হাততালিতে ভেঙে গেল। কিন্তু এই

প্রশংসাটি সালার সিকান্দারের জন্য নয়; বরং এটি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবার মৌলিক দর্শনের জন্য। এটি ছিল আল্লাহর বাণী, যা চৌদ্দশ বছর আগে সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছিল। আর আজও সেই বাণী মানুষের হৃদয় দখল করে চলছে, তাদের আহত মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কারণ, এই বার্তাটি হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ ও মানবতার জন্য।

এদিকে ওয়াশিংটনে টিভির সামনে বসা লোকেরা এখনো স্তম্ভিত। লক্ষ মানুষের জনসমুদ্র দেখে এই মানুষটি ভয় পায়নি। তার মুখনিঃসৃত শব্দগুলো যেন পুরো জনসমুদ্রকে তার মুঠোয় পুরে দিয়েছে। সালার সিকান্দার সেই ইসমে আজম পড়তে পড়তে আফ্রিকার স্নায়ুতে হাত রেখেছে, যে ইসমে আজম চৌদ্দশ বছর পূর্বে নাজিল করা হয়েছিল। ইমামাও হতভম্ব হয়ে আছে। এই মানুষটি কোথায় দাঁড়িয়ে, কোন বাণী পুনরাবৃত্তি করছে! আর তার যদি খুতবার এই অংশটি মনে থেকে থাকে,

তাহলে বাকি অংশটুকুও মনে নেই, তা কীভাবে সম্ভব! আর যদি মনে থেকে থাকে, তাহলে সে কোনো চিন্তায় ডুবে গিয়েছে বলেই, মনে আছে।

এই মানুষগুলো কি বাবার জন্য হাততালি দিচ্ছে?' জিবরিলের আচানক প্রশ্নে ইমামা চমকে উঠল। সেও তার পাশে বসে টিভি দেখছে। ইমামা কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়েই রয়ে গেল।

তালির গর্জন এখন থামতে শুরু করেছে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরে বাজছিল যে, ততক্ষণে সালারের মনে পড়ে গেল সে এখানে কী বলতে এসেছে। কিন্তু ভুলে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়াতে তার আনন্দ অনুভূত হলো না। বরং ভুলে গিয়ে অবচেতনে শেষ খুতবার যে কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো ভেবেই তার খুশি অনুভূত হচ্ছিল।

'আফ্রিকায় আমি আমার ধর্মের সেই মূলনীতি ও চেতনা নিয়েই কাজ করতে এসেছি। এবং সেটা করবও। আমি আপনাদের

কথা দিচ্ছি, আমার যদি কখনো মনে হয় আমি সেই মূলনীতিগুলো অনুযায়ী আপনাদের কল্যাণে কাজ করতে পারছি না, তাহলে তখনই আমি এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু আমি সেই শক্তিগুলোর হাত বৃদ্ধি করব না, যাদের বিরুদ্ধে ইবাকা লড়েছেন এবং লড়তে লড়তে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।" বক্তব্যের পরবর্তী অংশে সালার সিকান্দার বলল।

'কিন্তু ইবাকা তার দেশের মানুষকে আগের মতো কষ্টের মাঝে বেঁচে থাকতে তার জীবন দেয়নি। সে আপনাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখত। একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন।' সালার সিকান্দার এখন তাদেরকে ইবাকার শেষ ইমেইলটি শোনাচ্ছে। জনসমুদ্র সালারের প্রতিটি কথায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠছে। সেটি যেন ইবাকার শেষ ইমেইল নয়; বরং তার অন্তিম অসিয়ত। আর এটি কেবল সালার সিকান্দারের হাতেই পৌঁছেছিল।

'কঙ্গোকে নিয়ে ইবাকা যে স্বপ্ন দেখত, তা ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং রোগব্যাধির স্বপ্ন নয়। সে শান্তি ও মানবতায় বিশ্বাস রাখত।



মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও সে শান্তির কথাই বলে গিয়েছে। কিন্তু সেই শান্তি তার নিজের জন্য নয়, আপনাদের জন্য, তার জাতির জন্য। যতদিন আপনারা কঙ্গোকে একটি আধুনিক, উন্নত জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে না পারবেন, ততদিন ইবাকার প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখানো হবে না। আর আমি বিশ্বাস করি, কঙ্গোবাসী তা পারবে। পিগমি জনগোষ্ঠী তা পারবে। এজন্য আমি ও আমার প্রতিষ্ঠান, পেট্রোস ইবাকার সেই স্বপ্ন পূরণে আপনাদের পাশে আছি। আমরা চাইলেও গতকালকে বদলাতে পারব না। কিন্তু আগামীকালকে বদলানোর সুযোগ আমাদের হাতে।

আমার প্রত্যাশা, একবিংশ শতাব্দীর কঙ্গো ইবাকার মতো আরও বহু নেতার জন্ম দিবে। যারা উন্নতি, শান্তি এবং কঙ্গোর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবো। এবং তাকে উন্নত জাতিগুলোর কাতারে নিয়ে দাঁড় করাবো। এটি আমার কথা নয়; এটি ইবাকার কথা। সে কোনো ধর্মের অনুসারী ছিল না। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। আল্লাহর এই জমিন,

আল্লাহর বান্দাদের জন্যই। কোনো দখলদারের জন্য নয়।
কোনো সাম্রাজ্যবাদের জন্য নয়। এটি আপনাদের জন্য। কঙ্গোর
জনগণের জন্য।"

লাখো মানুষের যে জনসমুদ্রকে, একটু আগেও অটল
পাহাড়ের মতো মনে হচ্ছিল, তা এখন সালার সিকান্দারের
কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ছে। কান্নায় ভেঙে পড়ছে। তার কথায়
হাততালি দিচ্ছে। তার আহ্বানে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত
করছে চারপাশ।

সালার সিকান্দার তার বক্তব্য শেষ করে রোস্ট্রাম থেকে সরে,
তার আসনের দিকে যেতে লাগল। আর জনসমুদ্র তার নাম ধরে
ডাকতে শুরু করল। সমগ্র আফ্রিকা সালার সিকান্দারের নাম
উচ্চারণ করতে থাকল। সে রোস্ট্রামে গিয়েছিল জনসমুদ্রের
গর্জনতুল্য আওয়াজের মধ্যে, ফিরেও এলো তেমনই
গর্জনতুল্য শব্দে ভর করে। কিন্তু পরিস্থিতি ততক্ষণে সম্পূর্ণ
পালটে গেছে। সে গিয়েছিল দশ মিনিটের ভাষণ দিতে, অথচ

আধাঘন্টা পর রোস্ট্রাম ছাড়তে হলো। এটি ছিল তার জীবনের দীর্ঘতম আধাঘন্টা। শুধু তার নয়, ইমামার জীবনেরও। অশ্রু কেবল বিপুল জনতার চোখ থেকেই নয়, ইমামার চোখ থেকেও ঝরছে। এই কৃষ্ণাঙ্গ জনতা সালার সিকান্দারকে নিজেদের মুক্তিদাতা হিসেবে পেয়ে কাঁদছে। আর ইমামা কাঁদছে, এই মুক্তিদাতা ওখান থেকে আরও একবার বেঁচে ফিরতে পারছে বলে।

: 'মাম্মা, আপনি কাঁদছেন কেন?' জিবরিল খানিক অস্থির হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল। কয়েক ঘন্টা যাবৎ ইমামা টিভির সামনে চুপচাপ বসে আছে, কোনো কথা বলছে না। অবশেষে জিবরিলের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। 'মানুষ কাঁদে কেন?' এই সহজ প্রশ্নটি কখনো কখনো বীজগণিতের মতো জটিল প্রশ্ন হয়ে যায়।

বক্তব্যের প্রথম দশ মিনিট সালার সিকান্দারকে যেন আবারও লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে দিল। সে যে শেষ খুতবার অংশবিশেষ

মনে পড়াতে, নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারল, সেই খুতবা কেন তার নিজের জীবনে প্রতিফলিত হতে পারল না? তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মাঝে এগুলোর ওপর আমল করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন হতে পারল না? এটি একটি হুঁশিয়ারি, যা তাকে অবচেতনেই বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার জীবনের মহৎ সংকল্প ও ইচ্ছাকে মিশনে পরিণত করতে, শেষ খুতবার এই হুঁশিয়ারির প্রয়োজনীয়তা অনেক।

পরবর্তী দশ মিনিট সালাত সিকান্দার চুপচাপ মঞ্চে বসে আছে। তার ঠোঁটে এখনো কুরআনের আয়াত, শুকরিয়ার শব্দ। সেই মহান রব, সব সময়ের মতো আজও তার সম্মান রেখেছেন। সেই মহান সত্তা এই হাফেজে কুরআনকে দুনিয়ার সামনে লাঞ্ছিত করেননি। এই অনুভূতি তার মধ্যে কেবল কৃতজ্ঞতা-বোধই জাগিয়ে তুলছে না; বরং লজ্জাও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

: 'তুমি কি জানো যে, তোমার ভেতর সতেরো বছর আগের আত্মহত্যার ইচ্ছা এখনো রয়ে গেছে?' সালার সিকান্দার ল্যাপটপে শেষ ইমেইলটির রিপ্লাই করতে করতে, এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইমামার সর্বশেষ তিরস্কারটি শুনল। বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। আর ইমামা, না জানি কতবার হোটেলের ওয়ারড্রব খুলে কাপড়গুলো বারবার ভাঁজ করে পুনরায় রেখে দিচ্ছে। প্রথমে এক সেলে, পরে অন্য সেলে, পরে আবার ঘুরেফিরে আগের সেলেই রাখছে। সালার সবকিছু লক্ষ করেও, চুপচাপ ল্যাপটপে ইমেইল চেক করতে করতে আগামীকালের শিডিউল তৈরি করছে। আর এখন তার কাজ শেষ হতেই ইমামার দিকে সে মনোযোগী হলো। ইমামা অস্থির হয়ে আছে। যা কিছু আজ ঘটেছে, এরপর তার মানসিক টানাপোড়েন সালার অনুমান করতে পারছে।

: 'তুমি ঠিকই বলছ।' সালার ল্যাপটপ বন্ধ করে বিছানার দিকে যেতে যেতে বলল। সে দুই ঘণ্টা আগে হোটেলে এসেছে। এসেই কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এখন কাজ শেষ

হতেই সে ইমামার প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছে। কষ্টে ইমামার যেন কান্না চলে আসছে।

তুমি কি জানো, তোমাকে আমার কেন প্রয়োজন? তোমাকে নিয়ে কেন দুশ্চিন্তা করি আমি?' সালারের উত্তর শুনে ইমামা রেগে উঠল। হাতে ভাঁজ করা সালারের শাটটি ওয়ারড্রবের খোপে ছুড়ে ফেলে, সালারের বিছানার পাশে চলে এলো। 'কারণ, বাচ্চারা অস্থির হয়ে যায়। তুমি কোনো সুপারম্যান নও যে, তারা তোমার অলৌকিক দক্ষতা দেখে হাততালি দেবে। আনন্দে শঙ্খধ্বনি তুলবে। তোমার কিছু হয়ে গেলে...' কথা বলতে বলতে সে আবারও কান্নাতুর হয়ে পড়ল। বাক্য পূর্ণ করতে পারল না। সালাার মাথা নিচু করে গভীর নীরব হয়ে তার কথা শুনছে। তারপর ইমামা চুপ হতেই সে মাথা তুলে তাকাল। ইমামা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর সে বিছানায় বসে। রুমের হলুদ আলোয় তার লাল চোখ ও লাল নাক কান্নার ভাবকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। ফলে ইমামা তার দৃষ্টি

লুকানোর চেষ্টা করছে। কেননা, এই মানুষটি তার চেহারা পড়েই ভেতর পড়ার সক্ষমতা রাখে।

তুমি ঠিকই বলেছ।' উত্তর আগের মতোই ধীর স্বরে এলো এবং সেটিই এলো। ফলে ইমামা আরও উত্তেজিত হয়ে গেল।

: 'আমি মজা করছি না।' তার মনে হলো সালার সব সময়ের মতো তার মন ভোলাচ্ছে। 'এই কথাটি যদি তুমি আরেকবার বলো, তাহলে আমি এই রুম থেকে বেরিয়ে যাব। আমার সব কথা তোমার ফালতু মনে হচ্ছে?'

: ইউ আর রাইট। তুমি ঠিকই বলছ।

ইমামা এবার বিরক্ত হয়ে হেসে উঠল। তারপর তার পাশে বিছানায় বসে পড়ল।

: 'বক্তৃতায় শেষ খুতবা বলছিলে, তাহলে পুরোটাই বলতে!'
ইমামা এখন সালারকে খোঁচা দিচ্ছে।

: 'সাহস হয়নি। তাই তো বলছি, তুমি যা বলেছ, সব ঠিকই বলেছ। আগেও ঠিক বলেছ, আজও ঠিক বলেছ।' সালার জীবনে এই প্রথম এমন স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। ইমামা তার মুখ দেখেই ঝুঙ্ক হয়ে রইল। আগেও রাগ ছিল না, তবে অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগও এখন একদম উধাও হয়ে গেল।

: 'ইবাকা তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শান্তির জন্য লড়েছে। সে নিউইয়র্কের এক গলিপথে নিজের জীবন রক্ষার জন্য সেসব লোকের সাথে লড়েছে, যাদের সঙ্গে মিলে তুমি এখন আফ্রিকার ভাগ্য বদলাতে চাও।' ইমামা হাশিম এবার সালারকে সেই আয়নাটা দেখাল, যা কেবল সে-ই দেখাতে পারে। 'তুমি কি মনে করো, তারা তোমাকে এসব করতে দেবে?'

: 'তুমি কি মনে করো, আমি এসব করতে চাই?' প্রত্যুত্তরে সালার একই ভঙ্গিতে তাকে পালটা প্রশ্ন করল। ইমামা আর কিছু বলতে পারল না। প্রশ্নটি অদ্ভুত। দুজন একে অপরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। তারপর ইমামা জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি কী করতে চাও?'

: 'আমি নিজের জন্য একটি সম্মানজনক পথ চাই। সেই সঙ্গে তোমার জন্য, আমাদের সন্তানদের জন্য। যে জটিল ফাঁদে আমি নিজেকে ও তোমাদেরকে আটকে ফেলেছি, সেখান থেকে আমি বেরোতে চাই। কিন্তু এক কূপ থেকে বের হতে গিয়ে আমি এমন আরেক কূপে লাফিয়ে পড়তে চাই না; যে কূপ আগেরটির চেয়ে আরও গভীর, আরও অন্ধকার।'

ইমামা বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যে প্রসঙ্গে সে আলোচনা করতে চাচ্ছিল, সালার আগেই তাতে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছে। কিন্তু এখন যা কিছু সে বলছে, ইমামা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ বুঝতে চাচ্ছে।

তাহলে তুমি কী করতে চাও, সালার?' ইমামা পুনরায় প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না।

বিশ্বে আমি প্রথম ইসলামি অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যা হবে সুদমুক্ত। কিন্তু সেটি কেবল একটি ব্যবস্থাই হবে না। সেটি হবে সুসংগঠিত, কার্যকরী এবং শক্তিশালী একটি বিকল্প, যা প্রচলিত অর্থব্যবস্থার জায়গা দখল করতে সক্ষম।

উত্তর এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, সালারের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েই রইল ইমামা। কিছু বলতেই পারল না। সালার সব সময়ই অদ্ভুত কথা বলে। ইমামা সেসব শুনে শুনে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এবার সে যা বলল, তা ইমামার জীবনে শোনা সবচেয়ে অদ্ভুত কথা। সালারের অনেক কথাতেই সে হতভম্ব হতো, অবাকও হতো। কিন্তু আজকের এই নীরবতার কী নাম দেবে সে, 'হতভম্বতা, বিস্ময়' নাকি অন্য কিছু, তা ইমামা নিজেও বুঝতে পারছে না।

: 'তোমার কি মনে হয়, আমি এটা করতে পারব না?' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে সালার তাকে প্রশ্ন করল। সে যেন এর মাধ্যমে ইমামার মনের অবস্থাকে শব্দে প্রকাশ করল না; বরং নিজের ভেতরের সমস্ত আশঙ্কাকে প্রশ্নাকারে তার সামনে তুলে ধরল। প্রশ্নটি তার অবচেতন মন থেকেই এসে পড়েছে; দৃঢ় বিশ্বাস থেকে নয়, আশঙ্কা থেকে জন্মেছে। সে মূলত উত্তর চাচ্ছে না, চাচ্ছে আশ্বাস।

: দুনিয়াতে যদি কেউ এই কাজ করতে পারে, তাহলে সেটা তুমি পারবে, সালার!

এবার নির্বাক হয়ে যাওয়ার পালা সালারের। এটি কোনো উত্তর নয়; এটি সেই আস্থা, যার ভীষণ প্রয়োজন তার। উত্তর শুনে সালারের রক্ত যেন তপ্ত হয়ে উঠল। ইমামার চেহারা থেকে সে চোখ সরিয়ে ফেলল। তার উত্তর যেন তার বুকের ভার হালকা করে দিল।

: 'থ্যাংক ইউ।' ইমামার দিকে না তাকিয়ে, মাথা নিচু করে সালার কৃতজ্ঞতা জানাল। কৃতজ্ঞতাটি ছিল অপ্রত্যাশিত। ইমামা এর কারণ বুঝতে পারল না। তবু সে তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল, যেন অপেক্ষা করছে, সালার হয়তো আরও কিছু

বলবে।

: 'তোমাকে অনেক কষ্ট সইতে হবে।' অবশেষে সালার বলল। ইমামা হেসে উঠল,

যেন সে কোনো অদ্ভুত কথা বলেছে।

: কষ্টের কথা তুমি আমাকে বলছ, সালার?

সালার তার দিকে তাকাল। ইমামার ভঙ্গিটা ছিল বিদ্রূপাত্মক, কিন্তু প্রশ্নটা নয়।

: জীবনে আমি অনেক ভয়াবহ দিন কাটিয়েছি।

উত্তর শুনে সালার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কারণেই আসবে। আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমার কাজের প্রভাব তোমার : 'কিন্তু সেই খারাপ দিনগুলো আমার কারণে আসেনি। এখন হয়তো আমার এবং বাচ্চাদের ওপরও পড়বে। এই একটি জিনিসই আমাকে দুর্বল করে দেয়। নিজের কষ্ট মানুষ কোনো না কোনোভাবে সয়ে নিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-সন্তানের কষ্ট, তা সহ্যে পারে না মানুষ।' কথাগুলো বলতে গিয়ে ওয়াশিংটনের দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা মনে পড়ল সালারের। স্ত্রী-সন্তানের জীবন নিয়ে যখন আতঙ্কিত দিন কাটিয়েছিল সো

: 'তুমি এসব ভেবো না। যা করতে চাও, করে ফেলো। বাকিটা পরে দেখা যাবে। আশা করি জীবনে অতীতের চেয়ে বেশি

খারাপ দিন আসবে না। এলেও সমস্যা নেই; সবকিছুই সয়ে নিতে পারে মানুষ।" এসব বলতে বলতে ইমামা বুঝতে পারছে না, যে ভয় ও আশঙ্কার কথা সালার ভাবছে, এগুলো মূলত তা নয়। বরং এর চেয়ে বেশি কিছু। ইমামা ভাবছে, সালার হয়তো আর্থিক কষ্টের কথাই বলছে।

'আমি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম। সেই সময় কেটে গেছে। তারপর এমন এক সময়ও এসেছে, যখন নিজের মৌলিক প্রয়োজনগুলোও পূরণ করতে পারতাম না, অন্যের ওপর ভরসা করে জীবন কাটাতে হতো। সেই সময়ও চলে গেল। তারপর তোমার সঙ্গে গত সাত বছর ধরে দুনিয়ার সব নিয়ামত, সব বিলাসিতায় কাটাচ্ছি। কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে, এ সময়ও ফুরিয়ে যাবে। মূলত জিনিসের কোনো মূল্য নেই, সেটা হারালে কখনো না কখনো ফিরে পাওয়াই যায়। কেবল মানুষই অদ্বিতীয়, যার উত্তম কোনো বিকল্প হয় না। তা একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে ইমামা বিমর্ষ হয়ে উঠল। 'তাই যতদিন বাচ্চারা আর তুমি পাশে আছ,

কোনোকিছুর পরোয়া করি না আমি। কমবেশি সবকিছুতে আমি মানিয়ে নিতে পারি।"

সে সালারের দিকে তাকাল। সালার চুপচাপ তার কথা শুনছে। ইমামা ভয় পাবে বলে সালার তাকে বলতে চাচ্ছে না যে, তাকে এবং সন্তানদেরও তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে। যেমনটা আগেও নেওয়া হয়েছে। সব পরীক্ষা সবসময় সম্পদের মাধ্যমেই হয় না, প্রিয় মানুষগুলোকে কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমেও হয়। কিন্তু এসব বলে সে তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাচ্ছে না।

: 'এসব তুমি কীভাবে করবে? কারও সঙ্গে মিলে করবে?' অবশেষে ইমামা তার মাথায় ঘুরতে থাকা প্রশ্নটি করেই ফেলল।

: 'জানি না।' উত্তর এলো এক অদ্ভুত হাসির সঙ্গে। সেই সঙ্গে চেহারায় এক অসহায়ত্বের ছাপ। ইমামা পুনরায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে রইল। তবু তার বিশ্বাস, সালার এখন

নিজেকে যতটা অজ্ঞ প্রকাশ করছে, তার পরিকল্পনা সম্পর্কে সে ততটা অজ্ঞ নয়। নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে সে পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে।

: বলো যে, তুমি আমাকে বলতে চাও না।

: 'বলেও কোনো লাভ নেই। অন্তত এখন। যেহেতু এটি এখন কেবল চিন্তা আর কল্পনার মধ্যেই আছে। বাস্তবিক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' সালার উত্তর করল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখ ইমামার হাতের আংটিতে গিয়ে পড়ল। বিস্ময়ে সেই আংটির দিকে তাকিয়ে সে নির্বাক হয়ে গেল। আমেরিকা থেকে ফিরে, এতসব জুট-ঝামেলার পরিস্থিতি পেরিয়ে, কয়েক সপ্তাহ পর আজ প্রথম সালার আংটিটি দেখল। বরং ইমামার গায়ে কোনো অলংকার দেখল।

সে ভেবেছিল এটা ঘরের আলমারির অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে পুড়ে গেছে। আর এখন ঝলমলে মূল্যবান এই আংটিটি ইমামার

সরু আঙুলে দেখতে পেয়ে যারপরনাই খুশি হলো। সে ইমামার হাত ধরে ফেলল।

: 'এটা কোথেকে এলো?' কথার প্রসঙ্গ হঠাৎই অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। ইমামা হেসে উঠল। দেখানোর ভঙ্গিতে তার হাত সালারের তালুর উপর মেলে ধরল।

সালার কঙ্গোতে ফেরার পর ইমামার হঠাৎ আংটির কথা মনে পড়ে। এরপর যখন জানতে পারে, বাড়ির সবকিছু পুড়ে গেছে, বাকি সব লুট হয়ে গেছে, তখন সে আংটির আশা ছেড়ে দেয়। তারপর তার হঠাৎ মনে পড়ে, এগুলো সে সিজারের আগে হসপিটালে চেকআপের সময় খুলে রেখেছিল। তবে এটা সে নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। কারণ, সিজারের আগে তাকে যে অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হয়েছিল, তার ফলে তার স্বাভাবিক হুঁশ ছিল না।

কিন্তু আজ সালার আসার দু-ঘন্টা আগে পাকিস্তান যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে গিয়ে, পুরোনো হ্যান্ডব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করে নতুন হ্যান্ডব্যাগে ঢোকানোর সময় একটি ছোট্ট থলে দেখতে পায়। সেটি হাতে নিতেই যেন তার নিশ্বাস থমকে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, অপারেশনের আগে সব গয়না খুলে সে এই ব্যাগেই রেখে, এটি হেডিকে রাখতে দিয়েছিল। এতদিন সে ব্যাগটি খুলেছে ঠিকই, কিন্তু একবারও এভাবে খুঁটিয়ে দেখেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে হয়তো খুঁটিয়ে দেখত।

থলিটা হাতে টিপে দেখতেই আনন্দে ইমামার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। তাতে ছিল অলংকার এবং এই আংটিও। থলে খুলে আংটিটি হাতে নিতেই তার সারা দিনের সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়। এক অদ্ভুত সুখ অনুভব করতে থাকে। এতে অবশ্য হেডির সততাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে বিশ্বস্ত আমানতদারির সঙ্গে ব্যাগটি নিরাপদে তার কাছে পৌঁছে না

দিলে, এটির কথা তার মনেই পড়ত না। ভাবত, সব পুড়ে গেছে। ইমামার জন্য সেটিও ছিল একটি কৃতজ্ঞতার মুহূর্ত।

ভেজা চোখে সে আংটিটি আবার আঙুলে পরে নেয়। তারপর সোনার চেইন, কানের দুল। কিন্তু সালারকে এই চমক দেওয়ার আগেই সে ভুলে গিয়েছিল এটি। আর সালার এখন তার কানের দুল কিংবা চেইনের দিকে লক্ষ করেনি, তার দৃষ্টি থেমে আছে কেবল আংটিটির ওপর।

: 'তুমি আমার দুল আর চেইন দেখোনি?' ইমামা এবার বাচ্চাদের মতো উচ্ছ্বাসে ওগুলোও তাকে হাতে ছুঁয়ে দেখাতে লাগল। যেন হারিয়ে যাওয়া খেলনা হঠাৎ ফিরে পেয়েছে, একদম অপ্রত্যাশিতভাবে।

সালার মুচকি হেসে জিনিসগুলোর দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফেরাল ইমামার উদ্ভাসিত চেহারার দিকে। সে যেন সমস্ত দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়েছে এই মুহূর্তে। গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে

তার মনে পড়ল, চেনটি দিয়েছিলেন ডাক্তার সিবতে আলি।
দুলগুলো বিয়ের উপহার হিসেবে ইমামা তার শ্বশুর-শাশুড়ির
কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল। আর তার দেওয়া আংটিটা?
এটি সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বাবার একটি প্লট বিক্রি করে
কিনেছিল। এই তিনটির কোনোটিই সুদ বা হারাম পয়সায় কেনা
হয়নি। ইমামাকে দেওয়া এটিই তার একমাত্র অলংকার, যা সে
তার উপার্জিত পয়সায় কিনেনি। অবশেষে হালাল টাকায় কেনা
এই অলংকারগুলোই ফিরে এসেছে।

: 'এই! কী ভাবছ?' ইমামা তাকে সম্বোধন করল। ইমামার
হাতের আংটিটিতে হাত বোলাতে বোলাতে সালার হঠাৎ
চমকে উঠল। যেন ধ্যান থেকে বেরিয়ে এলো। কিছু বাস্তবতা ও
উপলব্ধি মানুষকে যেমন লজ্জিত করে, তেমনি অনুতপ্তও।
এমন অনুতপ্ত যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ তা কারও কাছে বলতে
পারে না। সালারও এখন তেমনই এক মুহূর্ত পার করছে।

: 'কিছু না। এমনিই কিছু একটা মনে পড়ল।' সালার দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ পালটে ফেলল।

: 'আচ্ছা, এই আংটিটির মূল্য কত?' জানা নেই ইমামার মনে হঠাৎ এটা জানতে ইচ্ছা হলো কেন।

: 'এটি অমূল্য। কারণ, এটি তোমার হাতে আছে।' সালার তার হাতে চুমু খেয়ে সেই একই উত্তর দিল, যা প্রথমবার আংটি পরানোর সময় দিয়েছিল। ইমামাও সব সময়ের মতোই মুগ্ধ হলো। এই প্রশংসা সে বহুবার করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তা তার কাছে নতুন মনে হয়। কেননা, এটি শুনতে তার ভালো লাগে। এ আর সেই সালার সিকান্দার নয়, যে ইমামা হাশিমকে এক সময় বুঝতে পারত না; তাকে সান্ত্বনা দিতেও চেষ্টা করত না। জীবনের এতগুলো বছর একসঙ্গে পার করে তারা এখন একে অপরের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত অবগত।

সিকান্দার উসমানের বাড়িতে আগত এই অতিথি কেবল অপ্রত্যাশিতই নয়; বরং অবিশ্বাসযোগ্যও। সিকান্দার উসমান তাদের বাড়িতে বহুবার গিয়েছেন। প্রতিবেশী হিসেবে, মীমাংসার জন্য, শোক প্রকাশের জন্য। কিন্তু হাশেম মুবিন কখনোই তাদের বাড়িতে আসেননি। আর আজ যখন এলেন, তা সিকান্দারের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। তিনি এখন আর তাদের এরিয়ায় থাকেন না; বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। ওই বাড়িতে এখন অন্য কেউ থাকে। বাড়ি বিক্রির খবর পেয়ে সালার তখন গোপনে, অন্য কারও মাধ্যমে সেই বাড়িটি কিনতে অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা পারেনি।

হাশেম মুবিনের ছেলেরা এখন অনেক শক্তিশালী। আর হাশেম মুবিন হয়ে পড়েছেন দুর্বল। হাশেম বাড়িটি বিক্রি না করে, সবার মাঝে ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। যেসব প্রপাটি ডিলারদের মাধ্যমে সালার সেটি কিনতে চেষ্টা করেছিল, তারাও সফল হতে পারেনি। ফলে বাড়িটি টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রি হয়ে যায়। কেননা, এটি ছিল

অনেক বড় একটি বাড়ি। ৮২ শতকব্যাপী বিস্তৃত সেই বাড়িটি, তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিক্রি হয়েছে। বাড়িটি নিয়ে ইমামার বোনেরা ওয়ারিশ চেয়ে কিছু মামলাও করেছিল।

সিকান্দার উসমান সালারের সকল চেষ্টাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি ওই বিরোধপূর্ণ সম্পত্তি কেনার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষ করে সেটি যেহেতু ইমামার বাপ-ভাইয়ের সম্পত্তি। আর তাদের মধ্যে আগে থেকেই ঝামেলা চলে আসছে। সালার অন্য কারও মাধ্যমে বাড়ি কেনার যে কৌশল করেছিল, সিকান্দার তাতেও তীব্র বিরোধিতা করেন। তাছাড়া আরেকটি বড় কারণ হলো, সালারের কাছে তখন এত বড় বাড়ি কেনার মতো অর্থ ছিল না। ঋণ-করজা না করে সে এটা কিছুতে কিনতে পারত না। অথচ সিকান্দার সারা জীবন ঋণ-করজা করে বিলাসিতা করার বিরোধী মানুষ।

কিন্তু আজকের হাশেম মুবিন, আগের সেই উদ্ধত, জৌলুসপূর্ণ হাশেম মুবিন নন। যিনি এক সময় উনাদের প্রতিবেশী হয়েও,

উনাদের সঙ্গে কথা বলার ভদ্রতাটুকুও দেখাতেন না। চেহরায়
ঝাপসা দাগ, ফ্যাকাশে হলদে আভা, কুঁজো পিঠের মানুষটিকে
তারা প্রথম দেখায় চিনতেই পারেনি। তারা বুঝতে পারছে না,
এই মানুষটির সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত। অবশেষে কী
উনাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে?

'আমাকে ইমামার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে।' দুচার
কথা বলেই তিনি তাদের বললেন।

সে এখানে নেই।' সিকান্দার উসমান খুবই সাবধানি ভঙ্গিতে
জানালেন।

'জানি। সে কঙ্গোতে আছে। সে ভালো আছে তো?' থেমে
থেমে হলেও যেন এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি।
আমি ওখানকার নম্বর চাচ্ছি। সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ।
সিকান্দার বুঝতে পারছেন না, তিনি কী বলবেন।

: 'হ্যাঁ, সে, সালার ও বাচ্চারা সবাই ভালো আছে।' তিনি যদি তাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করে এখানে এসে থাকেন, তাই সিকান্দার তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। ফোন নম্বরের প্রসঙ্গ অবশ্য তিনি এড়িয়ে গেলেন।

: 'তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।' হাশেম মুবিন তার দাবি ভুললেন না।

: 'আমি ইমামাকে জিজ্ঞেস না করে তার নম্বর বা ঠিকানা দিতে পারব না।' সিকান্দার কোনো ভূমিকা না টেনেই বললেন।

: 'আমি তো এখন আর তার কোনো ক্ষতি করতে পারব না।' তিনি খুব ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন।

: 'আপনি ইতিমধ্যেই তার অনেক ক্ষতি করে ফেলেছেন।' সিকান্দার পিঠাপিঠি উত্তর করলেন। 'সে এখন তার জীবন গুছিয়ে নিয়েছে। ছেলসন্তান নিয়ে সুখী এবং নিশ্চিত জীবন

কাটাচ্ছে। আপনি আবারও তাকে কেন অস্বস্তিতে ফেলতে চান? আপনার মেয়ে আপনার কারণে আগেই অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। এখন তাকে মুক্তি দিন। তাকে মাফ করুন।"

হাশেম মুবিনের মুখের ভাঁজ হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেল। তারপর তিনি মৃদু স্বরে বললেন, তা আমি জানি। সেই উপলব্ধি আমার আছে।" সিকান্দার উসমান কিছু বলতে পারলেন না। তিনি তার মুখে এই বাক্য শোনার প্রত্যাশা করেননি। 'ব্যস, শেষবারের মতো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার একটি আমানত আছে আমার কাছে। সেটি পৌঁছে দিতে চাই। আর তার কাছে ক্ষমাও চাইতে হবে।"

: 'আপনি আপনার ফোন নম্বর ও ঠিকানা দিয়ে যান। আমি তার সাথে কথা বলে, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এখন আপনারা কোথায় থাকেন?' সিকান্দার জিজ্ঞেস করলেন।

: 'এক বৃদ্ধাশ্রমে' উত্তর শুনে ঙ্গর সিকান্দার ঙ্গর হয়েই রয়ে গেলেন। হাশেম মুবিন উঠে দাঁড়ালেন। 'ইমামাকে বলে দি়েন, আমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছি। তাহলে সে আমার সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবে।'

বসা থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সিকান্দার উনার পরবর্তী বাক্যটি শুনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

কঙ্গো-সংকট ও এর পূর্বের ঘটনাগুলোর ফলে সিআইএ সালার সিকান্দারকে নজরদারিতে রাখতে থাকে। আফ্রিকায় সালার এখন তাদের Key figure বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে তাদের অধীনে কাজ করেছে, কিন্তু তাদের সহযোগী নয়। সে তাদের বেতনভুক্তও নয়। সালার এবারই প্রথম এক অদ্ভুত কাজে অংশ নিল। Shadow work partner বা গোপন অংশীদারত্ব। বিশ্বব্যাংক ও সালার সিকান্দার, দুজনেই একে

অপরকে চিনে। একে অপরের নাম ও কাজ সম্পর্কেও অবগত।
সালার এটাও জানে যে, তাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

সালারের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে টপ প্রফেশনাল একটি
টিমও দেওয়া হয়েছে, যারা মূলত সিআইএ-এর আন্ডারকভার
অ্যাজেন্ট। তারা দুই পক্ষই একে অপরের বাড়তি সচেতনতা
টের পেয়েও নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকায় সালারের
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পগুলো সফল
করাই সিআইএ-এর দায়িত্ব। আর তারা সেই দায়িত্ব খুব
ভালোভাবেই পালন করছে। সালার এখন বিশ্বব্যাংক, মার্কিন
সরকার এবং সিআইএ-এই তিন পক্ষের জন্যই এক অমূল্য
সম্পদ রূপে পরিণত হয়েছে। কেননা, সালার তাদের সবাইকে
কঙ্গো ও আফ্রিকায়, অত্যন্ত নাজুক সময়ে এক ভীষণ
লজ্জাজনক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বের করে এনেছে।

অবিশ্বাস্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দেওয়া সেই বক্তব্যে তার
নিজের প্রতিষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর তীব্র

সমালোচনা সত্ত্বেও, তা কারও কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এরচেয়ে জঘন্য গালি খেতেও প্রস্তুত ছিল তারা। তার বক্তৃতায় যদি তাদের কোনো বিষয় খারাপ লেগে থাকে, তাহলে তা হলো, তাতে ইসলাম ও নবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ। ধর্মকে সে মনুষ্যত্ব ও মানবতার কোনো সেকুলারিজমের মোড়কে উপস্থাপন করেনি; বরং সে তার ধর্ম ও নবির শেষ খুতবা উপস্থাপন করেছিল। অথচ সালার সিকান্দারকে বরাবরই একজন উদারমনস্ক মুসলিম হিসেবে মনে করা হতো। ধর্ম নিয়ে হঠাৎ তার বক্তৃতায় এমন উগ্রতার ছাপ শুধু বিশ্বব্যাপক নয়, আমেরিকান সরকার আর সিআইএ-এর কাছেও কঠিন আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিঃসন্দেহে আফ্রিকায় সে-ই তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও 'ইসলামি ভাবধারা প্রচারের জন্য' বিশ্বব্যাপকের পদকে ব্যবহার করতে পারে না। পরিস্থিতির স্বাভাবিক হলে এই বক্তব্যই সালারকে

বহিষ্কার করার একটি শক্তিশালী কারণ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি আমেরিকান সরকার এবং সিআইএ-ও, সালার সিকান্দারের ওই বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে বাহ্যত আড়াল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আড়ালে আড়ালে তারা নিজস্ব সাংবাদিকদের মাধ্যমে মিডিয়াগুলোতে সালারের ধর্মীয় আলোচনা উল্লেখ করার অপরাধে, তাকে তীব্র সমালোচনার নিশানায় পরিণত করেছে। আর এটি শুরু হয় তার বক্তব্যের লাইভ সম্প্রচার শেষ হতেই। আমেরিকা ও সিআইএ, কঙ্গো ও আফ্রিকায় একজন রাষ্ট্রদূত চেয়েছিল; কোনো মাসিহা বা মহান নেতা চায়নি। তারা জানে, প্রত্যেককে কীভাবে তার সীমার ভেতর রাখতে হয়। আর এখন সেই নীতির ওপরই আমল করছে তারা। সালারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছে।

চ্যানেলগুলোতে সালার সিকান্দারের বক্তৃতা আলোচনার ঝড় উঠতেই, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শেষ খুতবার অন্যান্য দিককেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত

করা হয়। সালার সিকান্দারের ধর্মীয় পরিচয়, বিশ্বাস আর তার জীবনাচার নিয়ে এক নতুন হটগোল শুরু হয়। শেষ খুতবার অন্যতম একটি বিষয় ছিল সুদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। পশ্চিমা গণমাধ্যম সেটিকে বিশেষভাবে সামনে তুলে ধরে। কারণ, তাদের কাছে সেটা যেন পশ্চিমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এক দর্শন। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে বলতে পারছে না যে, এটি পশ্চিমা নয়, বরং ইহুদি অর্থনৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার মতো এক দর্শন।

সালার সিকান্দারের বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়ায় ওঠা ঝড়, তাকে আফ্রিকায় আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলে। এদিকে সালার তার বক্তব্যের জন্য কোনো ব্যাখ্যা, সাফাই কিংবা দুঃখ প্রকাশ করেনি। তার প্রতিষ্ঠান ভাবছিল, তার বক্তব্যের কিছু অংশ খানিকটা নরম করে নতুন প্রেক্ষাপটে হাজির করা যেতে পারে। এতে পরিস্থিতি কিছুটা শিথিল হবে। কিন্তু সালার কোনো

অজুহাত, ক্ষমা, ব্যাখ্যা কিংবা প্রেক্ষাপটের আশ্রয় নিতে রাজি হয়নি।

দুদিন পর তার অফিস থেকে মাত্র এক লাইনের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়, 'সালার সিকান্দার তার বক্তব্যের প্রতিটি বাক্যে ও শব্দে বিশ্বাস রেখে, এর পূর্ণ দায়দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং সেটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছেন।'

যেসব মিডিয়া সমালোচনার পর সালারের থেকে ব্যাখ্যা ও দুঃখ প্রকাশ আশা করেছিল, তাদের মুখে যেন এটি প্রকাশ্য চপেটাঘাত। অবশেষে তাকে বিশ্বব্যাংকের প্রথম মৌলবাদী সহ-সভাপতি আখ্যা দেওয়া হলো।

সালার সিকান্দারকে নজরদারি করতে গিয়ে সিআইএ বুঝতে পারল, সে একধরনের সুদমুক্ত ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলছে। তবে এ নিয়ে তারা কোনো দুশ্চিন্তা করছে না। কারণ, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত থেকে সালার সিকান্দারের

পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব নয়। তারা সালারের এই স্বপ্নকে কাল্পনিক পোলাওয়ার চেয়ে বেশি কিছু ভাবছে না। তারা দুশ্চিন্তা করছে, হুট করে সালারের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ্যে আসা নিয়ে। তাদের মতে, আফ্রিকার মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে, সালারের এই ধর্মীয় পরিচয় তাদের জন্য নানা জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তাকে সব জায়গায় নজরদারিতে রাখা জরুরি হয়ে উঠেছে। আর সিআইএ ঠিক সেই কাজটিই করছে।

তার কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিনিয়ত সিআইএ-এর রেকর্ডের অংশ হয়ে যাচ্ছে। আর সেই রেকর্ডে সালারের প্রথম অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডটি হলো, ইবাকার দাফনের তিন সপ্তাহ পর, মাস্কাটের একটি লঞ্চে পাঁচজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাদের মধ্যে একজন ছিল মাস্কাটের রাজপরিবারের সদস্য। বাহ্যত এই সাক্ষাৎকে একটি সাধারণ দেখা-সাক্ষাৎ হিসেবে দেখা যেতে পারত। কেননা, তারা পাঁচজনই ছিল পূর্বপরিচিত বন্ধু। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে। তারা প্রত্যেকেই

আলাদা জাতি ও পেশার মানুষ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় বিখ্যাত। এবং সালার ছাড়া তাদের কারোর সঙ্গেই কঙ্গো বা আফ্রিকার কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বব্যাংক কিংবা কঙ্গোর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল রয়েছে। তারা সবাই সালারের সমবয়সী। তাদের মধ্যে কেবল একজন মাস্কাটের রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর বাকি সবাই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর। তবে তারা সবাই আমেরিকার নাগরিক। এমনকি মাস্কাটের রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিটিও এখন আমেরিকাতেই থাকছে।

তারা সবাই 'হান্ড্রেড আন্ডার ৪০ গ্লোবাল লিডারস' এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, দশ বছর পর তারা বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে একজন হবে।

তাদের কোনো কথা কিংবা বিষয়ই সিআইএ-এর কাছে দুশ্চিন্তাজনক মনে হয়নি। তবে সর্বশেষ একটি মিল ব্যতীত।

আর তা হলো, সালারসহ তারা সবাই মুসলিম। প্রত্যেকেই প্র্যাকটিসিং মুসলিম এবং হাফেজে কুরআন।

সিআইএ শুধু সালার সিকান্দারের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্তই করেনি; বরং তারা এই বৈঠকে অংশ নেওয়া পাঁচজনকেও নজরদারির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পরবর্তী কয়েক মাসে সালার ও এই পাঁচজন নানা বিনোদনমূলক ট্যুরে যায়। তখন সালারের সাথে সাথে তাদের গতিবিধিও নিবিড়ভাবে লক্ষ করা হয়। এক অদ্ভুত রহস্যময় নেটওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে তাদের পেছনে লেগে থাকে।

কয়েক মাস এভাবে সালার ও ওই পাঁচ বন্ধুর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে। তারপর হঠাৎ তাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারা পৃথক পৃথকভাবে একে অপরের সঙ্গে দেখা করতে থাকে। আগের মতোই একই প্যাটার্ন-চার-পাঁচজন দক্ষ ও বিখ্যাত ব্যক্তি, একেকজন একেক দেশের, সবাই প্রায় সমবয়সি এবং সবাই আমেরিকান নাগরিক। তারপর

সবকিছু যেন একই কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হয়ে যায়। তারা সবাই মুসলিম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাফেজে কুরআন। কেউ আবার নয়। তবে তারা সবাই প্র্যাকটিসিং মুসলিম। তারা একটি ইসলামি অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। সিআইএ-ও তা জানে। কিন্তু এই ব্যবস্থার রূপ কেমন হবে, কাঠামো কীরূপ, তা তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আর তার কারণ হলো, তাদের অসাধারণ দক্ষতা। তাদের কারও কাছে সব তথ্য নেই। ওই পাঁচ-সাত সদস্যের একেকজনের কাছে, জিগস পাজলের মতো একেকটি টুকরো। প্রত্যেকেই তার নিকট থাকা টুকরো সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানে ও বোঝে। কোন পাজলের কোন টুকরোটি ছবির কোন জায়গায় বসবে, তা জানে কেবল একজন; এক সালার সিকান্দার।

পঁয়ত্রিশ বছরের এক ব্যক্তি, গোলাম ফরিদ। সে জাতের দিক থেকে কুমোর আর পেশায় একটি স্কুলের দারোয়ান। সে গ্রামে থাকে। কিন্তু তার স্বপ্ন শহরে থাকা। তার সেই স্বপ্ন কেবল শহরে

থাকাই নয়; সে রাতারাতি ধনী হতেও আকাঙ্ক্ষী। এ নিয়ে তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আক্ষেপই বেশি। তার যে সকল বন্ধু গ্রাম থেকে দুবাই কিংবা সৌদিতে গিয়ে ধনী হয়ে গেছে, সেও তাদের মতো ধনী হতে চায়।

সে সাত বোনের একমাত্র ভাই। এবং সবার বড়ও। তার জন্ম হতেই তার মা তার বিয়ের স্বপ্ন বুনে ফেলেছিল। সেই জাঁকজমকপূর্ণ বিয়েতে খরচ করার জন্য আত্মীয়স্বজনের থেকে তার বাবা-মা কমবেশি করে ঋণ নিয়েছিল। বহু বছর লাগিয়ে সে সেই ঋণ আদায় করতে থাকে। তারপর সেই ঋণ শোধ হতেই, বোনদের বিয়ের জন্য আবারও ঋণ নিতে হয়। এবার আত্মীয়স্বজনরা তাকে ঋণ দিল না। ফলে বাধ্য হয়ে সে সুদে ঋণ নেয়। সাত বোন; প্রতিবছর কারও না কারও বিয়ে হতেই থাকে। পুরোনো ঋণের বোঝা শেষ না হতেই, নতুন ঋণ মাথায় চেপে বসে। সেই সঙ্গে একের পর এক সন্তানের জন্ম। সব মিলিয়ে মাঝে মাঝে তার মনে হয়, তার নাম 'গুলাম ফরিদ' না হয়ে 'গুলাম ঋণ' হওয়াই উচিত ছিল।

বিয়ের তেরো বছরে গুলাম ফরিদ ধারের সব টাকা তো শোধ করে ফেলেছে, কিন্তু সুদের পরিমাণ মাথার চুলের চেয়েও বেশি হয়ে গেছে। তার স্ত্রী নাসিমা। সেও তার স্কুলেই পরিচ্ছন্ন কর্মীর কাজ করে। বড় দুই সন্তানও গ্রামের দোকানে কাজ করে। একজন চায়ের দোকানে, আর আরেকজন ওয়ার্কশপে মোটরসাইকেল ধোয়ার কাজে। দশ-এগারো বছরের ছেলেরা এর চেয়ে বেশি আর কীই-বা করবে! তারা মাসিক বেতন পায় না। দিনমজুরের মতো দৈনিক কিছু করে পায়। সেই সামান্য আয়ে কোনো রকমে সংসারের ডালভাত জুটে। কারণ, নাসিমা আর গুলাম ফরিদের পুরো মাসের বেতন তো সুদের পেছনেই শেষ হয়ে যায়। বহু বছর কেটে গেছে, তবু সেই সুদের কাঁটা তাদের বুক থেকে নামেনি। বোঝার মতো করে বেড়েই চলেছে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তার মাঝে মাঝে মনে হয়, তার বয়স যেন পঞ্চাশ। কখনো মনে হয় সে শতবর্ষী বৃদ্ধ। আবার কখনো মনে

হয়, সে যেন মরে গেছে, মরে যাচ্ছে। কে জানে, মানুষের
জীবনের কত বছর বয়স হলে নিজেকে এমন মৃত মনে হয়!
প্রতিটি নিশ্বাস এমন ভারী লাগে!

মাঝে মাঝে ভাবে, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে রাতের আঁধারে এই গ্রাম
ছেড়ে পালিয়ে যাবো। চলে যাবে অন্য কোনো শহরে। কিংবা
পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্তে, যেখানে গেলে আর সুদের বোঝা
বইতে হবে না। রাতে মন ভরে ঘুমাবো। তার ও স্ত্রী-সন্তানের
কামাই নিজেদের জন্য খরচ করবো। অনেক অনেক রান্না
করবো। পেট ভরে খাবো। বেশি থেকে গেলে তা প্রতিবেশীকে
দিয়ে দেবো। প্লেট চেটে চেটে, রুটির শেষ টুকরোটি দিয়ে আর
প্লেট মুছতে হবে না। নিজেদের ও ছেলে সন্তানদের জন্য বছরে
দশখানা না হলেও অন্তত দু-চার জোড়া নতুন জামা-কাপড়
সেলাই করাবো। গ্রামের বড়লোকদের ছেলেমেয়েদের
পুরোনো পোশাক পরতে হবে না আর। ঈদের দিন লুন্ডা বাজার
থেকে সস্তার পুরোনো কাপড় না কিনে, নতুন জামা কিনে ঈদ
করতে পারবো।



তারপর সে একখানা বাড়ি করবে-নিজের বাড়ি। ইট-সিমেন্টে গাঁথা, পাকা ছাদওয়ালা বাড়ি। হয়তো দোতলা বাড়িই বানিয়ে ফেলবে। মেঝেতে দিবে চীনা মাটির প্রলেপ। পানির জন্য বসাবে মোটর। বাড়িতে আনবে ফ্রিজ, টিভি, দামি ফার্নিচার আর ঝলমলে পর্দা। চীনা মাটির বাসন সাজানো থাকবে আলমারিতে। আর তখন তার সন্তানরা মাটিতে নয়; বরং চেয়ার-টেবিলে বসে কাঁটা-চামচে করে খাবে সেই চীনা মাটির থালায়।

গুলাম ফরিদের স্বপ্নের রেলগাড়ি সারা রাত ঝকঝক করে ছুটে চলে। প্রতিটি স্টেশনে থামে, নতুন স্বপ্ন আহরণ করে, আবারও রেললাইনে ছুটে চলে। ছুটতে ছুটতে সেখানেই এসে দাঁড়ায়, যেখান থেকে শুরু করেছিল। রাত কেটে যাচ্ছে, জীবনও পার হচ্ছে। গোলাম ফরিদ জানে-রাতকে সে স্বপ্নে কাটিয়ে দিতে পারলেও, জীবনকে নয়।

গ্রাম থেকে পালিয়ে যাওয়া সহজ; কিন্তু ঋণদাতাদের থেকে নয়। ঋণ শোধ হয়ে গেলেও সুদ আগের মতোই থেকে যায়। সুদি মহাজনরা ইচ্ছা করলে তার চামড়াও উঠিয়ে ফেলতে পারে। কিংবা কুকুরের সামনে ছুড়ে দিতেও দ্বিধা করবে না। গোলাম ফরিদ ভেবে পায় না, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এমন কোথায় লুকানো যাবে, যেখানে কেউ আর খুঁজে পাবে না। কিন্তু ভাবে, নিজের আত্মীয়স্বজনের থেকে কী করে চিরতরে হারিয়ে যাবে! গোলাম ফরিদের সামনে পালানোর কোনো পথ নেই। তার কাছে কেবল একটি পথ আছে, আর তা হলো, ধনী হওয়া। না জানি কেন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, একদিন সে ধনী হবে। অনেক ধনী।

চন্নি গোলাম ফরিদের সবচেয়ে ছোট সন্তান। নাসিমা যদি বেঁচে থাকত, তার জীবনে ওইসব ঘটনা না ঘটত, তাহলে হয়তো সে সর্বশেষ সন্তান হতো না। চন্নির পরেও নাসিমার নতুন কোনো সন্তান জন্ম লাভ করত। কিন্তু জীবনের একপর্যায়ে এসে, তার

ছোট সন্তানই হয়ে উঠবে একমাত্র সন্তান, তা সে জানত না। এখনকার দেড় বছরের এই চন্নির জন্মের পূর্বেই বহুবার মারার চেষ্টা করা হয়েছে। নাসিমা যখন বুঝতে পারল, সে নবমবারের মতো গর্ভবতী হয়েছে, তখন এই সন্তানটিকে নষ্ট করার জন্য গ্রামের দাইয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের গাছগাছালির ওষুধ খেয়েছে। তাতেও চন্নির কিছু হয়নি। গর্ভে সে ঠিকঠাক বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু সেসব ক্ষতিকর ওষুধের ফলে, নানা অসুখ আঁকড়ে ধরে নাসিমাকে।

অবশেষে সুস্থাবস্থায় চন্নির জন্ম হয়। অবশ্য ততটুকু সুস্থই, যতটা ছিল তার মা-বাবা, ভাই-বোন। সে যেন নিজ দায়িত্বে জন্ম লাভ করেছে। নাসিমার এত এত ওষুধ খাওয়ার পরও যেন একপ্রকার লড়াই করেই সে পৃথিবীতে এসেছে। জন্মের পর বড় হওয়ার দায়িত্বও যেন তার নিজের কাঁধেই খোদা তাআলা অর্পণ করে দিয়েছেন। জন্মের এক সপ্তাহ পরই নাসিমাকে পুনরায় কাজে ফিরতে হয়। কারণ, এটা কোনো শহর নয় যে,

এখানে মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবো। তার ওপর এটি তার নবম সন্তানের জন্ম।

গোলাম ফরিদের একমাত্র পারিবারিক সম্পদ, দুই কামরার পুরোনো বাড়ি। সেটিও চন্নির জন্মের কয়েক সপ্তাহ পরই সুদের কাছে বন্ধক রাখা হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে গোলাম ফরিদকে স্কুলের পক্ষ থেকে থাকার জন্য একটি কোয়ার্টার দেওয়া হয়। তাতে মাত্র একটি রুম। তবু তা তার কাছে অমূল্য গনিমত। এতে অন্তত মাথা গোঁজার ঠাঁই তো পেল। কিন্তু চন্নির খুব ভালো করেই মনে আছে, তার জন্মই তার বাবা-মাকে সারা জীবনের জন্য গৃহহীন করে দিয়েছে। তবু চন্নির ভাগ্য ভালো এজন্য যে, কুসংস্কারে বিশ্বাসী গ্রাম্য মানুষজন তার গায়ে 'অশুভ, অপায়া' তকমা সেঁটে দেয়নি। তার কারণ হলো, গোলাম ফরিদের কোনো সন্তানের জন্ম হলেই কোনো না কোনো দুঃসংবাদ পেয়ে এসেছে। তার এমন কোনো সন্তানের কথা মনে পড়ে না, যার জন্ম তার জীবনে সামান্যতম স্বস্তি ও সহজতা বয়ে এনেছে।

হাডিসার-দুর্বল, শ্যামলা বর্ণের চন্নি সারা দিন রোদদুরে বাঁশের এক খাটিয়ায়, পাতলা এক টুকরো কাপড়ে পড়ে থাকে। কান্না করে, গুটিগুটি নড়াচড়া করে, তারপর আঙুল মুখে পুরে একা একাই ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো বোনের হঠাৎ তার কথা মনে পড়লে পুরোনো সস্তা প্লাস্টিকের একটি ফিডারে করে দুধ খাইয়ে যায়। এই ফিডার দিয়েই এক সময় তারা সব ভাই-বোন দুধ খেয়েছিল। এত বছরের ব্যবহারে সেটা মলিন, ময়লা হয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে, তাতে দুধ ঢাললে দুধও যেন ময়লা হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে সেটি জীবাণুর এক আস্তানা। কিন্তু চন্নির সৌভাগ্য হলো, সে গরিবের সন্তান। গরিবের সন্তান ক্ষুধায় মরে, কিন্তু নোংরায় নয়। সারা দিনে দুয়েকবার সেই দুধের ফিডারই তার একমাত্র খাবার। গোলাম ফরিদের ঘরে এর চেয়ে বেশি খাবার কোনো সন্তান পায়নি। তবে প্রথম দুই ছেলে খানিকটা পেয়েছে।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত নাসিমা বাড়িতে ফিরে, যা কিছু শুকনো-
রুক্ষ খাবার জুটত তা-ই খেয়ে নিত। তারপর ঘরের কোণে
কোনো এক সন্তানের হাঁটুতে মাথা রেখে ওভাবেই ঘুমিয়ে
পড়ত। ঘুম এসে গেলে যেন ভুলেই যেত, তার ঘরে এক
নবজাতক সন্তানও আছে। তবে হ্যাঁ, বড় ছেলে-মেয়েদের
যখন সন্দেহ হতো যে চন্নি মারা গেছে, তখন সে উঠে সত্যতা
যাচাই করতে চন্নিকে দেখত। কারণ, চন্নি মাঝে মাঝে ঠিকমতো
নিশ্বাস নিতে পারত না। আর কখনো কখনো তার শরীর এতটাই
ঠান্ডা ও নীলচে হয়ে উঠত যে, নাসিমার মনে হতো, এই বুঝি
তার বোঝা সত্যি সত্যিই হালকা হয়ে গেল। কিন্তু চন্নি যেন
মায়ের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ করে দিয়ে পুনরায় নিশ্বাস
নিতে শুরু করত।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, অথচ কারও মনে হলো না চন্নির
জন্মনিবন্ধন করা উচিত। কিংবা তার একটা নাম থাকা উচিত।
তার ক্ষুদ্র দেহ দেখে নাসিমাই তাকে চন্নি বলে ডাকতে থাকে।
তারপর বাকিরাও সেই নামেই ডাকতে শুরু করে। পরে গ্রামে

টিকার কর্মীরা এলে, গোলাম ফরিদকে বাধ্য হয়ে চন্নির নামে জন্মনিবন্ধন করাতে হয়। এর জন্য তাকে তিনশত টাকা ধার নিতে হয়েছিল। আর সেটিও গ্রামের মসজিদের ইমামের কাছ থেকে।

সে তিনশ টাকা তার জীবনে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে কি না, এর কোনো ধারণা না গোলাম ফরিদের আছে, আর না খোদ চন্নির। নিবন্ধন অনুযায়ী যার নতুন নাম এখন কানিজ। কে যে সেদিন তার এই নামটি রেখেছে, তাও কারও মনে নেই। হয়তো মহল্লার কোনো বৃদ্ধা মহিলা! মানুষের জীবনে তার নামের প্রভাব রয়েছে, এটা ভেবে তার নাম রেখেছে কানিজ। যার অর্থ হলো আনুগত্য ও বাধ্যতা। হয়তো এই নামের ফলেই তার মাঝেও আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। কিন্তু গ্রামের কারও কোনো ধারণা ছিল না যে, গোলাম ফরিদের মেয়ে কানিজ ওরফে চন্নি, তার আদৌ কোনো নামের প্রয়োজন আছে কি না। কিংবা তার মাঝে সেই আনুগত্যের বৈশিষ্ট্যেরও কোনো

দরকার আছে কি না। তাকে তো আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছিলেন অন্য কোনো কাজের জন্য।

ইমাম সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া সেই তিনশ টাকার ঋণই, গোলাম ফরিদের মনে এই প্রথম উপলব্ধি জাগাল, ধনী হওয়া আসলে ততটা কঠিন নয়, যতটা সে ভেবেছিল। তার গ্রামের আরও অনেকেই বছরের পর বছর ধনী হওয়ার এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে, অবশেষে এমন পথ খুঁজে পেয়েছে, যাতে সহজেই ধনী হওয়া যায়।

মসজিদের ইমাম সাহেবও সেসব লোকদের একজন, যারা কেবল পরকালে জান্নাত কামনা করে না। বরং দুনিয়াতেও জান্নাতি আরাম-আয়েশ চায়। ইমাম সাহেব তাকে ঋণ দেওয়ার সাথে সাথে একটি দায়িত্বও চাপিয়ে দেন। তিনি তাকে স্কুলের মালিকদের থেকে মসজিদের জন্য চাঁদা তুলে দিতে বলেন। গোলাম ফরিদও সাথে সাথে উনাকে এই আশ্বাস দেয় যে,

স্কুলের মালিকরা অনেক উদার মনের মানুষ। সেই সাথে বাড়িয়ে মিথ্যে করেও বলে যে, মালিকরা আমাকে অনেক মান্য করে। গ্রামে কাউকে কিছু দান করার আগে আমার সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করে। সেখানে মসজিদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা তো আমার বাম হাতের খেল।

ইমাম সাহেব গোলাম ফরিদের কথায় একেবারে অন্ধবিশ্বাস তো করেনি। তা না হলে, এক হাজার টাকা চাওয়াতে তাকে মাত্র তিনশত টাকা ধার দিতো না। তবে পুরোপুরি অন্ধবিশ্বাস না করলেও কিছুটা হলেও তার কথায় বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু বাস্তবতা তো ছিল এটাই যে, গোলাম ফরিদকে স্কুলের মালিকেরা হয়তো চেহারায় চিনে, কিন্তু তার নাম কেউ জানে না। তার কারণ হলো, স্কুলে কেবল একজন দারোয়ানই নয়; বিশাল এরিয়ার স্কুলটিতে পালাক্রমে ভাগ করে করে তিন-চারজন দারোয়ান এটি পাহারা দেয়। গোলাম ফরিদ তাদেরই একজন। সেখানে তার কতটুকু দাম আর কেমন অবস্থান, সে ব্যাপারে সে খুব ভালো করেই জানে।

ইমাম সাহেবের কাছে তো গোলাম ফরিদ মিথ্যা বলে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর ইমাম সাহেবের ক্রমাগত তাগাদার ফলে অবশেষে অপারগ হয়ে স্কুলের মালিকদের কাছে গিয়ে মসজিদের জন্য চাঁদার কথা তুলতে হলো। স্কুলের মালিকও ইমাম সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। ডেকে উনার কাছে চাঁদা সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব ছোটখাটো খরচের একটি দীর্ঘ তালিকা মালিকের সামনে তুলে ধরলেন। সব শুনে স্কুলের মালিক শুধু ওই মুহূর্তে কিছু টাকাই দিলেন না, বরং প্রতি মাসে মসজিদের খরচের জন্য একটি স্থায়ী অঙ্ক দেওয়ার অঙ্গীকারও করলেন। ইমাম সাহেব এতে যারপরনাই খুশি হলেন। উনার দেওয়া তিনশত টাকার ঋণ হাজার টাকায় পরিবর্তিত হয়ে তার কাছেই ফিরে এসেছে। গোলাম ফরিদের মতো এক তুচ্ছ মানুষের সম্মান উনার চোখে মুহূর্তেই বেড়ে গেল। আর গ্রামে এই প্রথম কেউ তাকে এমন সম্মান দিল। আর সেটাও গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেব। জুমার খুতবায় বসে লাউড স্পিকারে তিনি কেবল স্কুল প্রশাসন ও মালিকদের

দানশীলতার প্রশংসাই করলেন না; বরং প্রকাশ্যে গোলাম ফরিদের প্রশংসাও করলেন, যার প্রচেষ্টায় এই দানের অর্থ মিলেছে।

সেদিন জুমার খুতবায় তার নাম উল্লেখ করাতে ওখানে বসে বসে গর্বে যেন তার সিনা চওড়া হয়ে ওঠে। স্কুলের মালিক কথা দিলেন, গোলাম ফরিদের হাতেই প্রতি মাসের টাকা তিনি মসজিদে পৌঁছে দেবেন। সেই সঙ্গে তাকে এই টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না, তা তদারকি করার দায়িত্বও দিলেন। পরের মাসে মালিক মসজিদে এলেন। ইমাম সাহেব তখন গোলাম ফরিদকে সাথে নিয়ে হেঁটে হেঁটে উনাকে মসজিদের সমস্ত নির্মাণকাজ দেখালেন। মালিক এতে খুশি হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু এটি কেবল সেই মাসেরই দৃশ্য। পরের মাসে গোলাম ফরিদের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ইমাম সাহেব কী করেছেন, সে ব্যাপারে সে কোনো ধারণা পেল না। মসজিদে সে দুচারবার গিয়েছে। ইমাম সাহেব প্রতিবারই তার দারুণ আপ্যায়ন করেছেন। নিজের ঘর থেকে খাবার, পানি, এমনকি চাও এনে

খাইয়েছেন। কিন্তু মাসিক চাঁদার খরচের হিসাব চাইতেই শুধু নয়-ছয় কথা বলেই এড়িয়ে গেছেন। চাঁদার সঠিক ব্যবহারের প্রতি গোলাম ফরিদের খুব বেশি আগ্রহ নেই। ইমাম সাহেব তাকে গোশত খাওয়াচ্ছেন, সাধারণভাবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সমস্যা হলো, গোলাম ফরিদ যে কষ্ট করে প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছে, তা কেবল গোলাম ফরিদই জানে। আর এর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না, তাও সে খুব ভালো করেই জানে। সবকিছু বাদে তার মনে কেবল একটি বিষয় নিয়েই ভয়, আর তা হলো, আল্লাহর ভয়। কেননা, এগুলো মসজিদের টাকা। আর সে হলো এগুলোর আমানতদার। কিন্তু ইমাম সাহেবের হাতে এসে টাকাগুলো এভাবে গায়েব হয়ে যাচ্ছে, তা সে মানতে পারছে না।

মসজিদের টাকার ব্যাপারে, গোলাম ফরিদের মন থেকে আল্লাহর ভয় দূর করতে, ইমাম সাহেব তার প্রাথমিক ভূমিকা পালন করলেন। ইমাম সাহেব যদি চাঁদার টাকা আত্মসাৎ করে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে এতে তো

গোলাম ফরিদেরও হক আছে। তারও অনেক অভাব ও চাহিদা।
সেও অপারগ। তার মাথায় তো ঋণের বোঝাও আছে।

পরের মাসের টাকা দিতে গিয়ে গোলাম ফরিদ ইমাম সাহেবের
নতুন মোটরসাইকেল দেখে এত প্রচণ্ড হিংসায় জ্বলতে থাকে
যে, এই নতুন মোটরসাইকেলের মিষ্টিমুখ হিসেবে এই মাসের
পুরো টাকা নিজেই গিলে ফেলে। মাসের প্রথম তারিখ ছিল
বলে ইমাম সাহেবও তাকে চাঁদার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন।
গোলাম ফরিদ মসজিদে বসে জীবনের এই প্রথম মিথ্যেটা বলে।
সে বলে, মালিক দেশের বাইরে গেছে, এখনো ফিরেনি। ইমাম
সাহেব সাথে সাথে চিন্তিত হয়ে পড়েন। স্কুলের মালিক যদি দিন
কয়েকের ভেতর ফেরত না আসে, তাহলে এই মাসের টাকার
দায়িত্ব নেবে কে? গোলাম ফরিদের কাছে এই প্রশ্নের কোনো
উত্তর নেই। তবু সে ইমাম সাহেবকে মালিকের একটি ভুল
ফোন নম্বর দিয়ে দেয়। তিনি এতে আশ্বস্ত হন। কয়েকদিনের
ভেতর যদি টাকাটা না আসে, তাহলে তিনি নিজেই মালিকের
সঙ্গে কথা বলবেন, মনে মনে ভাবেন।



গোলাম ফরিদ সেই বিশ হাজার টাকা নিয়ে খুশিমনে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। তার মনে হলো যেন সে লটারি পেয়ে গেছে। সে জানে, ইমাম সাহেব প্রতিবছর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা গ্রামের বিভিন্ন সুদখোরদের কাছে দিয়ে ব্যবসায় লগ্নি করে। আর সেই সুদখোরেরা এই টাকাগুলোর মাধ্যমে গোলাম ফরিদের মতো অসংখ্য দরিদ্র মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর মতো পঙ্গু করে রাখে। ইমাম সাহেব বাইরে বাইরে এমন দেখান, যেন তিনি সুদখোরদের সুদি ব্যবসা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি সেই মাসিক নির্দিষ্ট টাকাকে আবার সুদ নয়; বরং মুনাফা বলে ডাকেন। কারণ, তিনিও কিছু ধনী লোকের সঙ্গে মুনাফা লাভের ব্যবসায় জড়িত।

ইমাম সাহেব টাকার জন্য আরও এক-দেড় সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন। তারপর অধৈর্য হয়ে গোলাম ফরিদের দেওয়া নম্বরটিতে কল করলেন। নম্বর বন্ধ। লাগাতার দুদিন কল করার পর যখন নম্বর বন্ধই পেলেন, তখন গোলাম ফরিদের কাছে না

গিয়ে সরাসরি তিনি স্কুলে চলে এলেন। এখানে এসে জানতে পারলেন, স্কুলের মালিক কয়েকদিন আগেই এসেছিলেন এবং কাজ সেরে চলেও গেছেন। ইমাম সাহেবের রাগ এবার মাথায় চড়ে বসল। তিনি সোজা গোলাম ফরিদের কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হলেন। গোলাম ফরিদ আবারও তাকে কথার খেলায় এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ইমাম সাহেব এবার তার মিথ্যে ফাঁস করে দিলেন। বললেন, আমি এখন স্কুল থেকে এসেছি। মালিক প্রতি মাসের মতো এ মাসেও এসে কাজ সেরে গেছেন। জবাবে গোলাম ফরিদ তাকে বলল, হতে পারে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু সেদিন আমার ছুটি ছিল। তাই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। ইমাম সাহেব এবার আরও বেশি রেগে গেলেন। রেগে বললেন, তুই আমাকে মালিকের নম্বরও ভুল দিয়েছিস। শতবার কল করেও সেই নম্বরে কল ঢোকেনি। তাই এখন আমি স্কুলের অফিস থেকে মালিকের সঠিক নম্বর নিয়ে তাকে কল করব।

গোলাম ফরিদ এবার বুঝতে পারল, মিথ্যা বলে ইমাম সাহেবকে এখন আর ঘোরানো যাবে না। তার মুখের ওপর স্পষ্ট করে



সবকিছু বলে দিতে হবে। অবশেষে সে তার মুখ খুলল। ইমাম সাহেবকে জানাল, সেই টাকা থেকে প্রতি মাসে সে তার ভাগ চায়। কিছুক্ষণের জন্য ইমাম সাহেব যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না, গ্রামের এক তুচ্ছ দারোয়ান মহল্লা-মসজিদের ইমামের মুখের ওপর এমন দাবিও করতে পারে! আর যখন বিশ্বাস এলো, রাগে তার মুখে যেন ফেনা বেরোতে লাগল। ইতিপূর্বে কেউ কখনো উনার সঙ্গে এমন দুঃসাহস দেখানোর হিম্মত পায়নি। তিনি গোলাম ফরিদকে ধমকের সুরে বললেন, 'তুই আল্লাহর ঘরের মালে ভাগ চাস, জাহান্নামি ইনসান!' উনার ধারণাও নেই যে, গোলাম ফরিদ দুনিয়াতে যে জাহান্নামের জীবন কাটাচ্ছে, মরার পরের জাহান্নামকে আর কী ভয় করবে!

: 'আল্লাহর ঘরের টাকা যদি আল্লাহর ঘরেই খরচ হতো, তাহলে আমি কোনোদিনই চাইতাম না, ইমাম সাহেব!' গোলাম ফরিদও সিনা টান করে পিঠাপিঠি উত্তর করল। ইমাম সাহেব এবার তাকে হুমকি দিলেন। বললেন, তিনি সরাসরি স্কুলের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তার সমস্ত কুকর্ম ফাঁস করে দেবেন।

গোলাম ফরিদও প্রত্যুত্তরে উনাকে পালটা হুমকি দিল। বলল, সেও স্কুলের মালিককে জানিয়ে দেবে, ইমাম সাহেব সমস্ত টাকা নিজেই খেয়ে ফেলো। এমনকি মসজিদের টাকা সুদখোরদের হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে সুদের ভাগ খায়। শুধু তা-ই নয়; সে পুরো গ্রামে ইমাম সাহেবকে কলঙ্কিত করবে। একে একে তার সমস্ত কুকীর্তি ফাঁস করে দেবে। উত্তর শুনে ইমাম সাহেবের শরীরে যেন আগুন জ্বলে গেল। তিনি পারলে এই মুহূর্তেই গোলাম ফরিদকে কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুরের সামনে ছুড়ে দিতেন। তিনি বুঝতে পারেননি, এই নিকৃষ্ট লোকটা তার এমন ভয়ংকর গোপন কথা জেনে গেছে। ইমাম সাহেব জীবনে যত গালি শুনেছেন, একাধারে সবগুলো গালিই তিনি গোলাম ফরিদের ওপর বর্ষণ করলেন। কিন্তু ফরিদ নির্লজ্জের মতো তার হলুদ দাঁতগুলো বের করে উনার সামনে হাসতে লাগল।

: 'ঠিক আছে ইমাম সাহেব, এর জন্য আমার গায়ে তো কিড়াই পড়বে। কবরে সাপ-বিচ্ছু আমার লাশ খুবলে খাবে। আর হয়তো



মরার সময় আমার ঠোঁটে কলেমাও জুটবে না। পরকালে আমার সঙ্গে যা-ই হোক না কেন, কিন্তু ইহকালে তো আপনার বিশ হাজার টাকার লুটপাট বন্ধ হয়ে যাবো। এই মাসেই আমি মালিককে জানিয়ে দেব, মসজিদে আপনি এক পয়সাও খরচ করেন না, তাই আপনাকে আর টাকা দেইনি। তো এখন ভেবে দেখুন, ক্ষতি কার বেশি হবে? আমি দোজখির নাকি আপনি জান্নাতির?' গোলাম ফরিদ নিজেও কখনো কল্পনা করেনি যে, এর মতো নীচ একটা মানুষ গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে এভাবে কথা বলবে। কেউ একজন ঠিকই বলেছে, টাকা বড় কুত্তাসুলভ জিনিস। বড় বড় মানুষকেও এটা কুকুর বানিয়ে দেয়। বড় বড় মানুষকে ঘেউঘেউ করতেও বাধ্য করে ফেলে। আর ইমাম সাহেবও এখন ঘেউঘেউ করতে শুরু করেছেন।

সমস্ত গালাগাল ও অভিশম্পাত উগরে দিয়ে ইমাম সাহেব বাড়ি ফিরে গেলেন। রাতে স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। রাতভর ভেবেচিন্তে, পরদিন সকালে

তিনি গোলাম ফরিদের সঙ্গে পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার চুক্তি করলেন। তার চেয়ে বড় উদার মনের পরিচয় তখন দিতে হলো, গোলাম ফরিদ যখন বলল, এই মাসের বিশ হাজার সে ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছে। আর এটা নাকি গত চার মাসের টাকার ক্ষতিপূরণ। এখান থেকে এক কানাকড়িও ইমাম সাহেব পাবেন না। ইমাম সাহেবের ইচ্ছা করল, এই নীচ লোকটাকে খেতের মাঝখানে খুঁটির সাথে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে দিতে। কাক-পক্ষী তাড়ানোর জন্য চাষিরা যেমন খেতের মাঝখানে পুতুল লটকিয়ে রাখে, তেমন করে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল, বছর শেষ হতেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আর যে নতুন জমিটার জন্য বায়না দিয়ে রেখেছেন, সেটাও কিনতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে কিছু বিষাক্ত গালি ছুড়ে দিয়ে ঠান্ডা মাথায় ওখান থেকে চলে এলেন।

গোলাম ফরিদের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না, বসে বসে সে প্রতি মাসে ফ্রি ফ্রি কিছু টাকা পাবে। এগুলো নিয়মিত পেলে সে খুব তাড়াতাড়ি তার সুদের ঋণ শেষ করতে পারবে। গোলাম



ফরিদের স্বপ্নের রেলগাড়ি আজ প্রথম ঝকঝক করে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না যে, ইমাম সাহেবের সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে সে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে ফেলেছে।

গোলাম ফরিদের হুমকিতে ইমাম সাহেবের কয়েক দিনের ঘুম হারাম হয়ে গেল। বসে বসে বিশ হাজার টাকা পেত, সেখানে এখন পনেরো হাজার হয়ে গেল। সেই সাথে মসজিদে টাকা দিয়ে সুদের ব্যবসা করার খবর যদি কেউ কোনভাবে জেনে যায়, তাহলে তো ভবিষ্যতে কেউ আর কোনো অনুদান দিবে না। এই ভয়ে তিনি আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে ইমাম সাহেব সুদি ব্যবসায় লগ্নি করা টাকা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছেন, কিন্তু তার বিবি সাহেবা তা ফিরিয়ে আনতে দিচ্ছে না। গোলাম ফরিদের হুমকি থেকে বাঁচার জন্য, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইমাম সাহেব সুদে লাগানো টাকা ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছেন। যাতে করে গোলাম ফরিদ যদি কোনোক্রমে বলেও দেয়, তাহলে তা যেন মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন। তাই তিনি

তার বিবিকে না জানিয়ে মাতব্বরের কাছে সুদি টাকা ফেরত চাইতে গেলেন। বললেন, মসজিদের সংস্কারের জন্য এখনই মোটা অঙ্কের একটা টাকা দরকার। তাই আমি চাচ্ছি, নিজের পকেট থেকেও কিছু টাকা মসজিদে দান করতে। কিন্তু সব টাকা তো আপনাদের কাছে লগ্নি করা। কিন্তু মাতব্বর যে উত্তর দিল, ইমাম সাহেব কখনো তা কল্পনাও করেননি। টাকা ফেরত দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করল। সে জানাল, টাকা বর্তমানে ব্যবসায় লগ্নি আছে। আগামী দু-তিন বছর পর্যন্ত সে মূল টাকা ফেরত দিতে পারবে না, কেবল সুদ দিতে পারবে। ইমাম সাহেব যেন চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলেন। তাকে তিনি পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছেন। সব কমিশন বাদে, সেখান থেকে মাসে প্রায় সত্তর-আশি হাজার টাকা সুদ পান। এখন মাতব্বরের এমন অস্বীকার বাণী শুনে যেন উনার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল।

অনেক বছর ধরেই তিনি মাতব্বরের সঙ্গে সুদি কারবার করে আসছেন। দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করা কারবার এখন

পাঁচ লাখে এসে পৌঁছেছে। এখন মাতব্বর বলছে, মূল টাকা ফেরত দিতে পারবে না, কেবল সুদ দিতে পারবে। এই ঘটনায় গোলাম ফরিদের প্রতি ইমাম সাহেবের ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। বাড়ি ফিরে তিনি বিবিকে পুরো ঘটনা শোনালেন। বিবিও উনার মতোই ঝুঁক হয়ে গেল।

পরের মাসেও গোলাম ফরিদ ইমাম সাহেবকে একটি টাকাও দিল না। মাতব্বরও সুদের এক পয়সাও দিল না। এক মাস আগে ইমাম সাহেব মাতব্বরের কাছে মূলধন ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলায় মাতব্বর বুঝতে পারল, ইমাম সাহেব এখন তাদের দল ছেড়ে দিচ্ছে। দল যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছে, তাহলে এখন আর তাকে লাভ দিতে যাবে কেন! কিন্তু এসব কিছুই সে ইমাম সাহেবকে জানাল না। বরং উনার কাছে সে ছয় মাসের সময় নিল। বলল, ছয় মাসের মধ্যে আপনার সমস্ত টাকা সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেব। ব্যবসায় আজকাল আকাল চলছে। মাতব্বর এসব জানিয়ে উনার কাছে কেবল দোয়াই চাইল না,

বরং ব্যবসায় বরকতের জন্য কিছু কুরআনি অজিফা শিখিয়ে
দেওয়ার জন্যও বলল।

মাতব্বরের কথা শুনে ইমাম সাহেবের যেন শীতল ঘাম
বেরোতে লাগল। প্রায় হাট ফেল করে বসতেন। মুহূর্তেই তিনি
লাখপতি থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। আর সেটাও দিনে-
দুপুরে। মাতব্বর, গোলাম ফরিদের মতো কোনো নীচ জাতের
মানুষ নয়; ইমাম সাহেব যাকে তার বাড়িতে দাঁড়িয়ে মুখ ভরে
গালাগাল করে আসবেন। আর সে নির্লজ্জের মতো দাঁত বের
করে হাসবে। সে গ্রামের সওদাগর। টাকাপয়সার অভাবের
মাঝেও দালান কোঠায় বসে থাকে। তার চারপাশে চাকর-
চাকরানির ভিড় জমে থাকে। ইমাম সাহেব টু শব্দ করলেও
মাতব্বর তাকে ঘর থেকে তুলে বাইরে ফেলে দিবে। সে গ্রামের
ইমাম, এ নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবে না। তাই তিনি চুপচাপ
সেখান থেকে চলে এলেন। কিন্তু উনার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির রাগ
ঝাড়লেন গোলাম ফরিদের ওপর। তার জন্যই এসব হয়েছে।
তাই তাকেও এখন বরবাদ হতে হবে।



তিনি স্কুল থেকে মালিকের নম্বর সংগ্রহ করে, তাকে ফোন করেন। ফোনে গোলাম ফরিদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই অভিযোগ করেন। মালিক সাথে সাথে পদক্ষেপ নেন। এমনটাই হওয়ার ছিল। সুযোগ পেতেই তিনি দেশে চলে এলেন। এসে গোলাম ফরিদের সমস্ত ব্যাখ্যা, জবাবদিহি ও ক্ষমাপ্রার্থনা শোনার পরও তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। গোলাম ফরিদের মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। আর শুধু তাকেই নয়, তার স্ত্রীকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়ে সেই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে বাধ্য করলেন। ফলে এগারো সদস্যের এই পরিবার মুহূর্তেই মাথার উপর থেকে ছাদ হারাল।

ইমাম সাহেবের বদৌলতে গোলাম ফরিদ স্ত্রী-সন্তানসহ কলঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার বিরুদ্ধে বদনাম ছড়াল, সে এমন এক চোর, যে আল্লাহর ঘরের টাকাকেও ছাড় দেয় না। ইমাম সাহেবের মুখে বারবার এসব কাহিনি শুনে গ্রামবাসী যেন গোলাম ফরিদকে বয়কটই করে বসল। গোলাম ফরিদও ইমাম

সাহেবের কুকীৰ্তি সবার সামনে ফাঁস করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ এক হত-দরিদ্র চোরের কথা বিশ্বাস করল না। সে নিজেই তো অসততা ও আত্মসাতের অপরাধে চাকরি হারিয়েছে, তার কথা কে বিশ্বাস করবে? আর সেটাও ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে! অবশেষে ইমাম সাহেব নিষ্পাপ ও নির্দোষ স্বীকৃতি পেলেন। আর গোলাম ফরিদ পেল নির্মম সাজা।

কে জানে কবে থেকে গোলাম ফরিদ তার মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে!

ক্ষুধা আর দারিদ্র্য তার মস্তিষ্ক বিগড়ে দিল। গ্রামবাসীর তির্যক উপহাস, কৈশোরে পদার্পণকারী মেয়েদের প্রতি গ্রামের বখাটে ছেলেদের কুদৃষ্টি আর নিজের অসহায়ত্ব তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদে পরিণত করল। কিংবা হয়তো সুদখোরদের হুমকি-ধমকি, ক্রমাগত পীড়াপীড়ি আর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। মূলত কী হয়েছে গোলাম ফরিদের,

জানা নেই। মানুষ এটাও জানে না যে, মানুষের কী এমন হলে নিজ রক্তের সম্পর্ককে নিজ হাতেই শেষ করে দেয়।

চন্নির বয়স তখন এক। এক রাতে তখন গোলাম ফরিদ তার পরিবারের নয়জন সদস্যকেই জবাই করে ফেলে। একমাত্র চন্নিই বেঁচে যায়। তা হয়তো উন্মাদনার কারণে গোলাম ফরিদ সংখ্যা গণনা ভুলে গিয়েছিল বলেই। চন্নিকে তো সে কখনো কোলে তুলেও দেখেনি। তাহলে তার কথা মনে থাকবেই-বা কীভাবে? তাছাড়া পাশে ভাই-বোনদের নয়টি রক্তাক্ত কাটা লাশের পাশে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা চন্নিকে সে মৃতই মনে করেছিল।

নয়টি প্রাণ নিয়েও গোলাম ফরিদ নিজের প্রাণ নেয়নি। সে বেঁচে ছিলই-বা কবে? মানুষ তো আত্মমর্যাদার মাঝেই বেঁচে থাকে। সেই আত্মমর্যাদা তো বহু আগেই তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। দরিদ্রতা ও ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন

নিরক্ষর মানুষের কাছে নিজের পরিবারকে হত্যা করাই একমাত্র
উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ইয়া মুজিবাস সাইলিন

০১

ইমামা পাকিস্তানে এসেছে আজ তৃতীয় সপ্তাহ। শুরুর দুই
সপ্তাহ লাহোরে ডা. সিবতে আলি ও সায়েদা আম্মার কাছে
কাটিয়ে, এখন ইসলামাবাদে এসেছে। এখানে বাকি দুই সপ্তাহ
কাটাতে। জীবনের দৌড়ঝাঁপে এখন পাশের বাড়িটির দিকে
তাকিয়ে মন খারাপের সময়ও হয় না। এই বাড়ি বিক্রি হয়ে
গেছে, ইমামা তা জানে। সেই পুরোনো বিশাল লনে এখন নতুন

নতুন ভবন উঠেছে। নতুন বাসিন্দারা বাড়ির চেহারাই পালটে ফেলেছে।

এদিকে সালারদের বাড়িতে এখন সিকান্দার উসমান আর তাইয়েবা একাই থাকেন। তাইয়েবা মাঝে মাঝে বিদেশে একেক ছেলের কাছে আসা-যাওয়া করেন। কিন্তু তিনি বেশিরভাগ সময় ইসলামাবাদেই থাকেন। বাকি ছেলেরা তাদের বউ-বাচ্চা নিয়ে এলে, সিকান্দার উসমান আর তাইয়েবার প্রতিদিনের রুটিনে ভাঙন ধরে। তেমনি ইমামা আর তার বাচ্চারা এলেও তাদের রুটিন ঠিক থাকে না। ছন্দপতন হয়ে নতুন ছন্দ আসে জীবনে।

সালারও ইমামার সঙ্গেই পাকিস্তানে এসেছে। তার ফ্লাইটও ইসলামাবাদেই ছিল। দু-তিন দিন ইমামা এখানে সালারের সঙ্গে থাকে, তারপর সালারের সঙ্গেই আবার লাহোরে চলে যায়। সেখানে সায়েদা আন্মা ও ডা. সিবতে আলির কাছে কয়েকদিন থেকে পুনরায় ইসলামাবাদে চলে আসে। আর এখান থেকেই

ইমামাকে এখন কঙ্গোতে চলে যেতে হবে। আজ দুদিন হলো সে ইসলামাবাদে এসেছে। সালার হঠাৎ তাকে আমেরিকার এক পুরোনো বন্ধুর কথা বলল। সে তার পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে স্থায়ী হয়েছে। সালারকে মোবারকবাদ জানাতে সে এখন তার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।

সালার এখন তার ব্যক্তিগত সফরে এসেছে। কিন্তু এই এক সপ্তাহেও তাকে অনেক সরকারি কর্মকর্তা ও পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ পাওয়ার পর যারা এখনো ব্যক্তিগতভাবে তাকে মোবারকবাদ জানাতে পারেনি, এই সুযোগে তারা তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। বহু বছর পর, সাদ তার পরিবার নিয়ে সালারের বাড়িতে দেখা করতে এল। সালার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারল না। তার মুখভরা দাড়ি। সেগুলোর প্রায় আশিভাগ পেকে গেছে। তাতে কোনো কলপ কিংবা মেহেদি মেখে রঙিন করা হয়নি। পুরোপুরি শুভ্রসাদা দাড়ি। অনেক দামি ব্র্যান্ডের কুর্তা-পায়জামা পরেছে সে। স্বাস্থ্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাকে দেখে

বোঝাই যাচ্ছে, খাবারদাবাবের প্রতি সে খুব শৌখিন। ব্যায়ামের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই।

তার সাথে নিকাব পরিহিতা তার স্ত্রী, আট বছরের একটি ছেলে এবং ছোট দুটি মেয়ে। সে আর তার স্ত্রী সালার ও ইমামার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দেখা করল। ইমামা জানে, সাদ সালারের পরিচিত বন্ধু। খুব কাছের বন্ধু নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাদ এখন তার গালগল্প আর মনখোলা অটুহাসিতে সালারের সাথে আমেরিকায় কাটানো বিভিন্ন ঘটনার কথা এমনভাবে বলছে, তাদের মধ্যে যেন গভীর বন্ধুত্ব ছিল। যেন গুহার বন্ধুর মতো বিপদের কেউ।

আমি তো আগে থেকেই ভাবতাম, সালার একদিন অনেক বড় হবে। শুধু ইমান-আমলে একটু ঢিল ছিল। তা আমি ঠেলে-ধাক্কিয়ে ঠিক করতে চেষ্টা করতাম।' চা পান করতে করতে সে ইমামার কাছে যেন গোপন কিছু প্রকাশ করল। সালার ও ইমামা একে অপরের দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসেই চুপ রইল। 'আর

এখন দেখেন না ভাবি! কেমন বদলে গেছে। আমার মেহনত কেমন কাজে লেগেছে।" সাদ বলে চলছে। এদিকে সালার কাপ নামিয়ে ওভাবেই মুচকি হেসে বলল, 'তবে তুমি কিন্তু একটুও বদলাওনি। আমার মেহনত তোমার কোনো কাজে আসেনি, এ নিয়ে বড়ই আফসোস আমার।' সালার জেতার ভঙ্গিতে বলল। সাদ হো হো করে হেসে উঠল।

আরে, আমার ওপর আবার কার মেহনত ফলতে যাবে? আমার ওপর আমার নিজের মেহনতই ছিল পাকা। ভাবি, আপনার এই স্বামী কিন্তু নাইটক্লাব আর ডিস্কোর প্রতি ছিল ভীষণ আসক্ত। আমাকেও ঠেলে-ধাক্কিয়ে নিয়ে যেতে চাইত মাঝেমধ্যে। নতুন নতুন মেয়েদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। বড়ই রঙিলা জীবন কাটিয়েছে সে!"

সাদের ব্যাপারে সালার ঠিকই বলেছে, আসলেই বদলায়নি সে। অধিকাংশ মানুষই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান প্রমাণ করার জন্য অন্যের খুঁত-খামতি ধরার রোগে আক্রান্ত। তাদের ইসলাম যেন

তাদেরকে কেবল প্রতিযোগিতা আর তুলনা করতেই শেখায়; কারও দোষ গোপন রাখতে শেখায় না। তারা কারও বর্তমান অবস্থা ও সাফল্যে মোবারকবাদ দিতে পারে, তার প্রতি ঈর্ষা করতে পারে, এমনকি তাকে বন্ধু বলে গর্বও করতে পারে-কিন্তু তার অতীতের ত্রুটিগুলো ভুলতে পারে না।

মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া, কিংবা কাউকে অপমানিত করা যেন তাদের কাছে গুনাহ মনে হয় না। সাদও এখন সেই কাজটাই করছে। সে তার স্ত্রীকে বোঝাতে চাচ্ছে যে কত বড় একজন নেক মানুষের স্ত্রী সে। যে যৌবনে কখনো গুনাহ করেনি। সে প্রবতো দুনিয়াবি সাফল্যে সালারের চেয়ে পেছনে আছে, কিন্তু ইমানদারি, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও সচ্চরিত্রে তার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হীনম্মন্যতার এ এক সয়ংকর রূপ-যেখানে মানুষ বুঝতেই পারে না, তাকে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে, নাকি শত্রুতা।

অতীত প্রকাশ করে সাদ যেন নিজেই নিজেকে নিয়ে প্রফুল্ল হয়ে, প্লেটে আরও একটি কাবাব নিল। ইমামার চেহারা ধূসর হয়ে গেল। সব সত্য সবার কাছে সবসময় হজমযোগ্য হয় না। আর সেটাও এভাবে সবার সামনে তুচ্ছতাচ্ছল্য করে বলা হলে!

ভাবি, সাদ একদম ঠিকই বলছে। সত্যিই আমার নানান রঙের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিলো। তবে সাদ কেবল এক রং নিয়েই খুশি ছিলো। আমি একটু শৌখিন ছিলাম, তাই ডিস্কো আর নাইটক্লাবে যেতাম ওসব মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু সাদ, ঠিক আছে আমার মতো শৌখিন ছিলো না। তাই সে বাসাতেই তার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে সময় কাটাতে পছন্দ করত।

কাবাব তো সাদ প্লেটে তুলেছে, কিন্তু প্লেটটা প্রায় হাত থেকে পড়তে পড়তে রক্ষা পেল। বহু বছর পর সালার সিকান্দার কথাবার্তায় এমন হীনতা আর অভদ্রতা দেখাল। একসময় সে এমন অভদ্র কথার জন্যই পরিচিত ছিলো। তবে সাদের তিনটি

অল্পবয়সি সন্তান আর স্ত্রীর সামনে এ রকম নোংরামি দেখিয়ে তার মনে কোনো আনন্দ লাগলো না। কিন্তু অতীতের এমন বেলেল্লাপনার আরও একটি 'গৌরবময় পদক' সাদ তার গুলায় পরিয়ে দেওয়ার আগেই, তাকে থামানোর জন্য সালারকে এটা বলতে হলো।

'আচ্ছা, কী নাম ছিল ওর? হ্যাঁ, স্টেফানি। এখন হয়তো শুধু হাই-হ্যালোই হয়, নাকি সেটাও নেই?'

সালারের স্মৃতিশক্তি ভয়ংকর রকমের প্রখর। নাম উল্লেখ করে যেন সাদকে মেরেই ফেলল সে। সাদের ভেতরের শ্বাস যেন ভেতরে, আর বাইরের শ্বাস বাইরেই আটকে রইল। সালার তার সাথে এমন খোলামেলাভাবে কথা বলছে, মনে হচ্ছে তারা দুজন কোনো বারে বা পার্কে বসে আছে, আশেপাশে কেউ নেই। কেউ শুনছে না তাদের একান্ত দুষ্টুমি। এসবের শুরুটা করেছিলো সাদ, কিন্তু শেষটা করছে এখন সালার। উত্তর আর

কী দেবে সাদ? নিশ্বাস নেওয়াই তো তার জন্য কষ্টকর হয়ে
যাচ্ছে এখন!

ইমামা সাদের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া দেখতে পেল না। তার চেহারা
ছিল নিকাবে ঢাকা। তবে তার চোখই বলে দিচ্ছে, সালারের
এমন খোলামেলা সত্য বলাতে সে মোটেও খুশি হয়নি।
সালারের এই পাল্টা আঘাত ইমামার নিজেরও ভালো লাগছে
না।

ভাবি, আপনি কিছু নিন।" পরিস্থিতি সামলানোর জন্য ইমামা
সময়মতো বলে উঠল; সাদের স্ত্রী আলিয়ার মনোযোগ যেন
তাদের আলোচনা থেকে সরে যায়।

না, বাচ্চারা আর সে নিচ্ছে, এতটুকুই যথেষ্ট। একটু আগেই
আমরা একটা লাঞ্চ থেকে এসেছি। তাই একদম খিদে নেই
আমার।

আলিয়ার গলা ইমামার কাছে বেশ আহত মনে হলো। আলিয়া সাদের মতো বাকপটু নয়। কিংবা হয়তো সালার সামনে থাকায় বা তাদের দুজনের কথার মাঝে বলার সুযোগ না পাওয়ায় এমন চুপ হয়ে আছে।

আপনি তো খতমে নুবুওয়াতে বিশ্বাস করেন না, তাই না?' সাদের স্ত্রী আলিয়ার মুখ থেকে কী তীব্র প্রশ্ন বের হলো! রুমে যেন নীরবতা নয়; নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। এটি জানার জন্য কোনো প্রশ্ন নয়। এটি ছিল পালটা আঘাত। আঘাতটি এবার সাদের কাছ থেকে নয়; তার স্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে।

না, আলহামদুলিল্লাহ, আমি মুসলিম।' চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে সরিয়ে খুব কষ্ট করে মুচকি হাসার চেষ্টা করল ইমামা। কিছু অতীত কখনো পুরোপুরি অতীত হয়ে যায় না। এটাও তার সেই অতীত জীবনেরই এক অংশ, যা তার উচ্ছ্বাস মাটি করে দিতে যথেষ্ট।

ওহ... আচ্ছা! সাদ আমাকে এটা কখনো বলেনি।" আলিয়া একই ভাবলেশহীন চেহারা় সাদের দিকে তাকিয়ে বলল। 'তো ভাবি, আপনি কোনো ইসলামি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হোন। আপনার তো অনেক ইসলাম ও ইলমের প্রয়োজন। যতদিন পাকিস্তানে আছেন, আমার সঙ্গে এক মাদরাসায় চলুন। সেখানে কুরআনের দারস হয়। পাশাপাশি আপনার আমল-আখলাকেরও উন্নতি হবে।'

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কাদিয়ানি ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি আমি বহু বছর হয়ে গেছে। প্রায় ষোলো-সতেরো বছর। তাছাড়া আমি একজন হাফেজে কুরআনের স্ত্রী।" ইমামা খুব নম্রভাবে তার কথা থামিয়ে দিল।

হাফেজে কুরআনের স্ত্রী তো আমিও। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়?" আলিয়া একই ভঙ্গিতে বলল।

আপনার কিছু যায় না আসতে পারে, কিন্তু আমার যায়-আসে।



ভাবি, এ ব্যাপারে যখনই আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমরা আছি। অনেক তো দেখা-সাক্ষাৎ হবেই। আমিও ইনশাআল্লাহ এ বছর কিছুদিন সময় করে তাবলিগের উদ্দেশ্যে কঙ্গো আসব। তখন আপনাদের খেদমতে হাজির হব। এমনিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা একসাথে মেলামেশা করলে সেটাও অনেক ভালো হবে।" সাদ সময়মতো হস্তক্ষেপ করে আলোচনা সামলানোর চেষ্টা করল।

'জি ভাবি, ঠিকই বলছে সে। আমাদের বাচ্চাদের মেলামেশা করা উচিত, সেই সাথে আমাদেরও। আপনার বাচ্চাদের তরবিতের জন্য অনেক সময় আমাদের নির্দেশনার প্রয়োজন হবে।' আলিয়া তার স্বামীর কথাটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করল।

কখনো যদি এমন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আমি ও ইমামা অবশ্যই আপনাদের নির্দেশনা নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আপাতত আমার মনে হচ্ছে, এর কোনো দরকার নেই

আমাদের।" এবার সালার এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করে যেন এর ইতি টানার চেষ্টা করলো।

আবে ইয়ার! তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায়? তাদের সঙ্গে দেখা তো করাও। আমি চাচ্ছিলাম আহসান আর জিবরিলও এই সুযোগে পরিচিত হয়ে যাক।" পুনরায় সাদ প্রসঙ্গ পালটে পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। কারণ, ওই বিষয়ে সে সালারের অনীহা বুঝে গিয়েছে। এতটুকু অন্তত সে তাকে চিনে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। এখনই হয়তো পরিচারক তাদের নিয়ে আসছে। তারা তো বাইরে লনে খেলছিলো।' ইমামা সাদের এই চেষ্টাকে সফল করতে তার সঙ্গ দিলো। অন্য কোনো প্রসঙ্গ আসার আগেই পরিচারকের সঙ্গে ইনায়া ও জিবরিল রুমে ঢুকলো। সাদ গভীর উষ্ণতায় তাদেরকে আদর দিল। তারপর জিবরিল ও আহসানকে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এটাই ছিল সাড়ে চার বছরের জিবরিল আর আট-নয় বছরের আহসানের প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু শেষ সাক্ষাৎ নয়।



তারা দুজনই যেন একই রকম। স্বভাবতই কম কথা বলে, সংযত এবং অত্যন্ত ভদ্র। জিবরিলের শরীরের গড়ন ভালো হওয়ায় তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য অতটা চোখে পড়ছে না। আহসানের তুলনায় ছয় বছরের আছিয়া ও চার বছরের মারওয়া অনেক চঞ্চল।

এখানে আরও আধাঘণ্টা সময় কাটিয়ে তারা বিদায় নিল। বিদায়ের সময় সালাদেরকে তারা তাদের বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে গেল। এটি কোনো বিশেষ সুরণীয় বা আনন্দময় সাক্ষাৎ নয়। কিন্তু তারা কেউই বুঝতে পারছে না, ভবিষ্যতেও তাদের প্রতিটি সাক্ষাৎই এমন নিরস নিষ্প্রাণ পরিবেশ তৈরি করবে।

সাদ ও আলিয়ার বিদায়ের পর, সালার ও ইমামা তাদের বলা কথাগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা করলো না। আর না তাদেরকে নিয়েও কোনো কথা বললো। কারণ, তাদের ধারণা,

এরা শুধু তাদের পরিচিত মুখ হয়েই থাকবে, বন্ধুদের কাতারে আসতে পারবে না কখনোই। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা কল্পনা করতে পারছে না, তাদের দুই পরিবার এক অদ্ভুত ও জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলছে!

এক সপ্তাহ পর সালার পুনরায় কঙ্গো চলে গেল। যাওয়ার সময় ইমামা তার সাথেই ইসলামাবাদ থেকে লাহোরে চলে এলো। এখানে সে দুই সপ্তাহ কাটাল-কিছুদিন ডাক্তার সাহেবের বাসায় আর কিছুদিন সায়েদা আন্নার সঙ্গে। সায়েদা আন্না তখন পাকিস্তানে ঘুরতে এসেছেন। আর নয়তো তিনি এখন ছেলেদের সঙ্গে দেশের বাইরেই বেশি থাকেন।

কিছুদিন পর ইসলামাবাদ ফিরে আসে ইমামা। এখানে এসে সিকান্দার উসমান ও তাইয়েবার সঙ্গে অনেক সময় কাটানোর সুযোগ হয় তাদের। সালার কঙ্গোতে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে, সিকান্দার উসমান একদিন গভীর চিন্তিত হয়ে হাশেম মুবিনের ব্যাপারে তাকে জানালেন।

: 'তিনি অনেকবার এখানে এসেছিলেন তোমার ফোন নম্বর ও অ্যাড্রেস নেওয়ার জন্য। কিন্তু তোমার সাথে যোগাযোগ করানোর মতো সাহস আমার ছিল না। আমি চাইনি, আবারও তুমি দুশ্চিন্তায় পড়ো।' সিকান্দার উসমান ইমামাকে বললেন। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি উনার এই ইচ্ছে পূরণ না করি, তাহলে তোমার ও উনার সঙ্গে অনেক বাড়াবাড়ি করা হবে।'

ইমামা অবিশ্বাস্যভাবে উনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তিনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চান?'

: 'এমন প্রশ্ন মানুষ বাবা-মাকে করে না, বেটা।' সিকান্দার উসমান ধীর স্বরে বললেন। ইমামার গলায় যেন কাঁটা আটকাল। ঠিকই বলছেন তিনি, বাবা-মাকে তো মানুষ এমন প্রশ্ন করে না। কিন্তু সে তো এও ভুলে গেছে যে, তারও বাবা-মা আছে। জীবনের ষোলো-সতেরোটি বছর সে তাদের ছাড়া কাটিয়েছে।

আজও সে তাদেরকে ভালোবাসে। এখনো তাদের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। কিন্তু গত কয়েক বছর সবকিছুই বদলে দিয়েছে। ওয়াসিমের মৃত্যু, জিবরিল, ইনায়া ও হামিনের জন্ম আর সালারের কর্মব্যস্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবন।

: 'এখন দেখা করে কোনো লাভ নেই।' ইমামা মাথা নিচু করে সিকান্দার উসমানকে বললো। সিকান্দার উসমানের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না, ইমামা তাদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করছে। সে তো সবসময় তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে অনুনয়-বিনয় করেই গেছে। অস্বীকার তো সবসময় অপরপক্ষ থেকে হয়েছে। কিন্তু আজ প্রথমবার সে নিজেই অস্বীকার করছে। ইমামার মাঝে কিছু না কিছু পরিবর্তন এসেছে, নাকি সে পুরোটাই বদলে গেছে?

'মা-বাবার ব্যাপারে আমরা কখনো কোনো লাভ-ক্ষতির কথাও ভাবি না। কেবল তাদের অধিকার ও তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নিয়ে ভাবি।' সিকান্দার উসমান পুনরায় তাকে অত্যন্ত

সাবলীলভাবে বললেন। এবারও তিনি ঠিক বলেছেন। মাথা নিচু করে কোলে রাখা হাতের দিকে তাকিয়ে, ইমামা যেন সম্পূর্ণ অতীতকে কোনো সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো চলে যেতে দেখল। এই সিনেমা সে এতবার দেখেছে যে, এখন আর তা দেখতেও চায় না। সে যেন তার স্মৃতির সেই অংশটুকু কেটে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়।

'পাপা, সেই ঝুলন্ত সেতুতে আমি আর ঝুলতে পারি না। আমার ছেলে-সন্তান আছে। আমার মানসিক বিক্ষিপ্ততা আমি তাদের (আমার সন্তানের) সামনে প্রকাশ করতে চাই না। আমি আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত। ব্যস, এমনই থাকতে চাই। এখন আর আমি কোনো অভিশাপ-তিরস্কারের বোঝা বহিতে পারব না। কোনো ক্ষমাপ্রার্থনারও প্রয়োজন নেই। এখন, যা যাওয়ার, চলে গেছে। পিছু ফিরে আর তাকাতে চাই না আমি।' সিকান্দার উসমানকে বলতে বলতে কখন যে সে অশ্রু ঝরাতে শুরু করেছে, তা নিজেও জানে না।

: ইমামা! তারা মুসলমান হয়ে গেছে।

ইমামা যেন ভুজ্জিত হয়ে গেল। বুঝতে পারছে না, কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। খুশি হবে? সে সত্যিই খুশি হয়েছে। নাকি কাঁদবে? কিন্তু সে তো আগে থেকেই কাঁদছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে? শুকরিয়া তো সে সব সময়ই আদায় করে।

"তারা মুসলমান না হলেও, তবু আমি তোমাকে তাদের সঙ্গে দেখা করতে বলতাম। আমরা সবাই অনেক ত্রুটিপূর্ণ মানুষ। ভুল, পাপ-সবই করি। আমরা সবাই একই। সবার মধ্যেই ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ আছে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়তো সে-ই, যার মধ্যে ক্ষমা করার ধৈর্য আছে। তাছাড়া কিছু পাপের শাস্তি যখন আল্লাহ তাআলা নিজেই দেন, তখন সেটা আর আমাদের দিতে হয় না।" সিকান্দার উসমান তাকে বোঝাচ্ছেন। ইমামা তার বাবা-মায়ের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানে না। যদি জানত, তাহলে এসব কখনো বলত না। ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই তো ছিল না। মা-বাবা আর সন্তানের সম্পর্কে তো



ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। অভিযোগ-অনুযোগের সময়ও পেরিয়ে গেছে। ইমামা তাদের সামনে গিয়ে নিজেকে আর ভাঙতে চাচ্ছে না, তাই সে দেখা করতে অস্বীকার করেছে। অনেক কষ্টে সে নিজেকে জোড়া লাগিয়েছে। নিজেকে গড়ে তুলেছে-সালারের জন্য, নিজের সন্তানদের জন্য, একটি সুন্দর সংসারের জন্য।

সিকান্দার উসমানের সঙ্গে সে কোনো বিতর্ক করল না। আগামীকাল হাশেম মুবিনের সঙ্গে দেখা করতেও রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সারা রাত সে ঘুমাতে পারল না। কিছু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মানুষ সারা জীবন ছটফট করে, আর তারপর যখন সেই সাক্ষাতের সময় আসে, তখন সে বুঝতে পারে না, কীভাবে তার মুখোমুখি হবে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে যদি হাশিম মুবিন এটি করতেন, তাহলে ইমামা তখন খুশিতে সপ্তম আসমানে থাকত।

তার পরিবারকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে, ভ্রান্তির পথ থেকে সরে আসতে, বহু বছর দোয়া করেছে সে। আর সেই পরিবারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধান ব্যক্তিটিই এখন তাওবা করে ইসলামের পথে ফিরে এসেছে, এই সংবাদে ইমামা যেন তার নিজের মনের অবস্থাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

পরদিন দুপুরে তারা ওখানে গেল। রুমে ঢুকে বাবার দিকে চোখ যেতেই তার চোখ ভিজে উঠলো। কান্না করবে না বলে নিয়ত করা সত্ত্বেও সে, অঝোরে কাঁদতে লাগলো। হাশেম মুবিনকে প্রচণ্ড দুর্বল দেখাচ্ছে। এটা সেই কঠোর মানুষটি নয়, যাকে সারা জীবন ভয় করে এসেছে। হাশিম মুবিন তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভেজা চোখেও সে প্রচণ্ড সাহস নিয়ে উনাকে জড়িয়ে ধরে, পৃথক হয়ে গেল। কারণ, এখন তো তাদের আর আগের মতো জড়িয়ে ধরা হয় না।

তারপর তারা মুখোমুখি দুটি সোফায় বসে পড়লো। তারা দুজন ছাড়া এই রুমে আর কেউ নেই। তারা দুজন আর তাদের দীর্ঘ

নীরবতা। হঠাৎ হাশেম মুবিনের ফোঁপানো কান্নার শব্দে এই নীরবতা ভাঙল। এই বৃদ্ধ মানুষটি এখন বাচ্চাদের মতো অঝোরে কাঁদছেন। ইমামা চুপচাপ তাকিয়ে দেখছে। সেও নিঃশব্দে কাঁদছে। তার নীরব অশ্রু চিবুক বেয়ে কোলে রাখা হাতে এসে পড়ছে।

: 'সময় সত্যিই বড় নিষ্ঠুর! আমার দ্বারা অনেক বড় গুনাহ হয়ে গেছে। আমি অনেক জুলুম করেছি নিজের ওপর, নিজের পরিবারের ওপর। জানি না কীভাবে হয়েছে এসব?' হাশেম মুবিন এখন কাঁদতে কাঁদতে অতীত ভুলের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন। ইমামার হঠাৎ মনে পড়লো, তিনি একবার তাকে বলেছিলেন, 'যা তুমি করতে চলেছো, এজন্য অনেক আফসোস করবো। একটা সময় আসবে, যখন তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারবো। তখন তুমি আমাদের কাছে এসে মাফ চাইবো। কিন্তু আমরা তোমাকে মাফ করব না।' সময় সত্যিই বড় নির্দয়, বড় নিষ্ঠুর! তার সামনে বসে কাঁদতে থাকা এই বৃদ্ধ মানুষটি তার বাবা না হলে, সে আজ অনেক গর্ববোধ করত। কারণ,

আজ তার মাথা নত হয়নি; নত হয়েছে অন্য কারও। কিন্তু দুঃখ তো এখানেই যে, তার বাবা যদি এখন নিজের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পেয়ে থাকেন, তাহলে সেই কষ্ট তো তারই।

হাশেম মুবিন কাঁদতে কাঁদতে বললেন। "আমার মনে হয়, ইমামা! আমার ওপর তোমার অভিশাপ লেগেছে।"

'অভিশাপ দেওয়ার চিন্তা কখনো আমার মনেও আসেনি আব্বু! আপনার প্রতি কেন, কারও প্রতিই আসেনি।' অবশেষে সে হাশেম মুবিনকে বলল। হাশেম মুবিন যদি আজ আগের মতো শক্তসমর্থ অবস্থায় তার সামনে হতেন, তাহলে সে উনাকে বলত, আপনার ওপর আমার কোনো অভিশাপ লাগেনি: আপনি তো নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অবমাননার শাস্তি পেয়েছেন।

যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে দিয়েছেন, সেই মর্যাদা অন্য কাউকে দেওয়ার পরিণাম ভোগ করছে তার পরিবার।

তারা কেবল কাদিয়ানিই হয়নি, বরং তারা জান-প্রাণ দিয়ে সেই ধর্মের প্রচারও করেছে। না জানি তারা কত মানুষকে গোমরাহ করেছে! ওই গোমরাহির ফলে কত মানুষের ভাগ্য নষ্ট করেছে। সেই অভিশাপই লেগেছে তাদের। নাহলে তাদের সঙ্গে তো এমন কিছু হওয়ার কথা নয়। কোটিপতি ছিল তারা। সারা জীবন ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে, বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হচ্ছে এখন। তাদের পরিবারে এই প্রথম কেউ এমন ঘরহারা, নির্দয় হলো। তবে তাদের পরিবারে গোমরাহির শুরুটা করেছিলেন হাশেম মুবিনই।

: 'দেরিতে হলেও আপনি সঠিক ও উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' এই একটি বাক্য বলতে গিয়ে ইমামার প্রচণ্ড কষ্ট অনুভূত হচ্ছে। ওয়াসিমের কথা মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে, তার পুরো অমুসলিম পরিবারের কথা, যারা এখনো অমুসলিম হয়েই আছে। ফিরে তো এসেছে সে কিংবা হাশেম মুবিন।

: 'তোমার মুখোমুখি হওয়ার সাহস হয়নি আমার। অনেক দেরি করে ফেললাম তোমার সামনে আসতে। তবে কেবল মাফ চাইতেই চাচ্ছি তোমার কাছে। আর তোমার একটি আমানত রয়ে গেছে আমার কাছে। সে মৃত্যুর আগে আমাকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল।' হাশেম মুবিন অবশেষে তার কান্না নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেন। তিনি এখন নিজের ব্যাগ থেকে একটি খাম বের করে ইমামার হাতে তুলে দিচ্ছেন।

: 'এটা কী?' খামটি হাতে না নিয়েই ইমামা প্রশ্ন করল।

: সম্পত্তিতে তোমার অংশ। এর জন্যই তোমার ভাইয়েরা আমার ওপর রেগে আছে। তারা এটাও আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তোমার প্রাপ্য আমি তাদেরকে দিয়ে দিতে পারিনি। সারা জীবন তোমাকে কিছু দিতে পারিনি, মরার আগে অন্তত কিছু দিয়ে যাই।

উনার কথা শুনে ইমামা কান্নায় ভেঙে পড়ল।



আব্বু, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার। এর কোনো দরকার নেই। এটা নিয়ে আমি কী করব? আমার অংশ পেয়ে যদি আমার ভাইদের জীবনে আপনার সামান্য জায়গা হয়, তাহলে দয়া করে আপনি এটাও তাদের দিয়ে দিন।

হাশেম মুবিন প্রচণ্ড নিরাশ হয়ে নেতিবাচক মাথা নাড়লেন।

: 'তাদের কাছে আমি এখন অমুসলিম। তারা আমাকে জীবন থেকে ছুড়ে ফেলেছে। যেভাবে একদিন আমি তোমাকে ছুড়ে ফেলেছিলাম।' তিনি কোনো পরাজিত মানুষের মতো বলে চললেন।

: 'তাহলে আপনি আমার অংশ বিক্রি করে একটা বাড়ি করে নিন। কোনো জায়গা কিনে নিন। আমার কাছে এখন সব আছে। আপনার কোনো টাকাপয়সার এখন আর কোনো প্রয়োজন

নেই আমার।" খামটি নিয়ে ইমামা পুনরায় উনার ব্যাগে রেখে দিল।

: 'তুমি আমাকে ক্ষমা করোনি?' হাশেম মুবিন ব্যথিত স্বরে বললেন।

: আমি আপনাকে ক্ষমা করার কে আবু? এই ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে। আমি তো কেবল আপনার জন্য এই দোয়া করতে পারি যে, আল্লাহ যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন। বড় ক্ষমা তো ওখান থেকেই আসতে হবে।

হাশেম মুবিন মাথা নিচু করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসবে তো?'

কথাটিতে মিশে আছে এক অদ্ভুত আকৃতি, এক গভীর হাহাকার। ইমামা নীরবে মাথা নাড়ল। বাবা-মায়ের এই ভগ্নদশা

তার বুক ভারী করে তুলল। ইমামার মাথা নাড়ানো দেখে, এই প্রথম হাশেম মুবিনের চেহারা খানিক হাসি ফুটল।

: এই সম্পত্তিটুকু আমি তোমার ছেলে-মেয়ের নামে করে দিচ্ছি ইমামা!

: 'আব্বু! আমি আপনার সম্পত্তি, টাকাপয়সা কিছুই নেব না। আমি নিলেও সালার তা ফিরিয়ে দিবো।' হাশেম মুবিনকে সে স্পষ্ট ভাষায় বলল। হাশেম মুবিন কিছুক্ষণ এভাবেই বসে থেকে, ইমামাকে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এলেন। সিকান্দার উসমান আর তার স্ত্রীও সাথে এলেন। এটি আরও একটি আবেগঘন সাক্ষাৎ।

: 'এখন তুমি অনেক সাহসী হয়ে গেছ।' ইমামা বাসায় ফিরে ফোনে সালারকে সব জানাল। উত্তরে সালার তাকে এটা বলল। সালারের মন্তব্যে সে অবাক হলো।

কীভাবে?

আজ তুমি তোমার বাবা-মায়ের কথা বলার সময় একটুও কাঁদোনি।

ইমামা চুপ করে রইল। তারপর সালারকে বলল, 'আজ আরও একটি বোঝা আমার কাঁধ থেকে সরে গেল। অনেক দেরিতে হলেও আল্লাহ পাক আমার মা-বাবাকে গোমরাহির অন্ধকার থেকে বের করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, দোয়া কবুল হয়, সালারা দেরিতে হলেও তা কবুল হয়।' কথাগুলো বলতে বলতে ইমামার কণ্ঠে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ভর করছিল। আর সেই প্রশান্তি হাজার মাইল দূরে বসা সালারও অনুভব করল।

'তোমার দোয়াগুলো হয়।' সালার মৃদু স্বরে বলল।

: 'তোমার কি হয় না?' ইমামা পালটা প্রশ্ন করল।



: 'আমারও হয়, কিন্তু তোমারটা একটু বেশি হয়।' সালার উত্তর করল।

: 'আলহামদুলিল্লাহ।' প্রত্যুত্তরে ইমামা বলল। সালার হেসে উঠল। 'আমার বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রম থেকে বের করে একটা বাড়ি করে দাও সালার! উনার কাছে আমার যে উত্তরাধিকারের জায়গাটুকু আছে, সেটা বিক্রি করেই একটা ব্যবস্থা করে দাও। ছোট্ট কোনো বাড়ি হলেও চলবে। তাদেরকে আমি আর ওখানে দেখতে পারছি না, সালার!'

: আমি পাপাকে বলে দেব, তিনিই এর ব্যবস্থা করে দেবেন। উনাদের খেয়ালও রাখবেন। তুমি যদি ইসলামাবাদে স্থায়ীভাবে থাকতে চাও, তাহলে থাকতে পারো, ইমামা। তুমি আর বাচ্চারা ওখানে...।

ইমামা তার কথা থামিয়ে দিল। 'আমি এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে চাই না। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। আর এই মাসেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসছি।'

: 'মান্নি, হামিন কবে বড় হবে?' জিবরিল তার আঁটবুকে কিছু একটা আঁকতে আঁকতে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা তখন কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হামিনকে বুকে জড়িয়ে শান্ত করে, কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা করতে করতে যেন বেহাল হয়ে পড়ছে। ইমামার এই অবস্থা জিবরিল ও ইনায়া গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। হোটেলে দু-তিন মাস থেকে, কয়েক মাস আগেই তারা কঙ্গোতে তাদের এই নতুন বাড়িতে উঠেছে।

বড় তো হয়ে গেছে।' ইমামা তার প্রশ্ন ও ভঙ্গিমার দিকে খেয়াল না করেই বললো।

: তাহলে শুধু কান্না করে কেন?

ইমামা অসহায়ের মতো তার বড় ছেলের দিকে তাকিয়েই ক্ষান্ত রইল। "আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কী চায়?" জিবরিল যেন তাকে সমস্যার সমাধান বলে দিল।

'আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না, আর সে বলতেও পারবে না।' ইমামা এখনো তাকে কোলে করে লাউঞ্জে পায়চারি করতে করতে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর হামিন ওভাবেই কান্না করতে করতে ইমামার কোল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। সে যদি তাকে নিচে বসিয়ে দেয়, তাহলে একটু পরেই আবার কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে। দিনে দু-তিনবার এমন করাই তার রুটিন। কান্না যেন হামিন সিকান্দারের প্রিয় শখ। অশ্রু ছাড়াই গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কান্নার মাঝখানে মজার কোনো জিনিস চোখে পড়লে, হুট করেই কান্না থামিয়ে দেয়। তারপর গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি দেখতে থাকে। দেখার কাজ শেষ হলে, পুনরায় সেখান থেকেই কান্না শুরু করে, যেখানে শেষ করেছিল।

সাত-আট মাস বয়সেই তার একসঙ্গে চারটি দাঁত উঠতে শুরু করেছে। দাঁতগুলো একদম খরগোশের দাঁতের মতো মাঝখানে। হাসলে-কাঁদলে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

: 'তার এত তাড়া কীসের?' একসঙ্গে চারটা দাঁত বের হতে দেখে সালার বলল। জিবরিল আর সালার, দুজনেরই হামিনকে নিয়ে একই রকম চিন্তাধারা।

: 'তা তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করে নাও।' ইমামা উত্তর করল।

তাদের আগের দুই সন্তানের তুলনায় হামিনকে লালনপালন করা অনেক বেশি জটিল ও কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চার দাঁত প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই হামিন সিকান্দার কেবল বড়দের চটকদার খাবারের দিকেই আগ্রহ দেখায়। দাঁত ছাড়া মুখেও তার প্রিয় খাবার ছিল চিপস। ওটা শুধু সে চিবোতই

না, বরং গিলেও ফেলত। দূর থেকে চিপসের প্যাকেট দেখলেও সে চিনে ফেলত। তার পাশে বসে জিবরিল ও ইনায়া নিশ্চিন্তে কিছু খেয়ে ফেলবে আর তাকে খাওয়াবে না, তা তো হতেই পারে না। সে এক অদ্ভুত শিশু। তাকে নিয়ে এই মন্তব্যটি করেছে খোদ সালার সিকান্দার। তার মতে, এমন প্রাণী সে জীবনে কখনো দেখেনি। তখন সিকান্দার উসমান হেসে বলেছিলেন, 'আমি দেখেছি, ও তো তোমারই জেরক্স কপি।'

: 'এটা বাড়াবাড়ি পাপা!' সালার উনার কথায় আপত্তি জানিয়েছিল। সিকান্দার উসমান ও তাইয়েবা তখন তার বাসায় কঙ্গোতে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন তারা নিজ চোখেই দেখে গিয়েছেন, হামিনকে নিয়ে কীভাবে সবাই কেমন বিপাকে পড়ে।

তখন সে দশ মাসের শিশু। সর্বপ্রথম যে শব্দটি সে বলতে শুরু করেছিল, তা হলো সাদা। সালারকে সে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই দারুণ খুশিতে এদিক ওদিক হাত-পা ছুড়তে শুরু

করত। 'সালা, সালা' বলে চিৎকার করে করে তার দিকে এগোনোর চেষ্টা করত। এই শব্দটিই সে সর্বপ্রথম বলতে শুরু করেছিল। জিবরিল আর ইনায়ার মতো সেও এখন খুব দ্রুতই কথা বলতে শিখে যাচ্ছে। কোনো কিছু চিনে, সেটি শনাক্ত করার সক্ষমতাও ছিল তার বাকি দুজনের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু তার কথা বলার দক্ষতা ছিল তাদের চেয়েও উত্তম।

'বাবা' বলো বেটা।' প্রথমবার সালারকে 'সালা' বলাতে ইমামা হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে পড়ে। তারপর তাকে শেখাতে থাকে, 'বাবা'-কে সালা নয়; 'বাবা' বলে ডাকতে হয়। সে সালারের দিকে ইশারা করে তাকে শেখাতে থাকে, বলো-'বাবা'।

সালা।' হামিন অবশেষে মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে তাকে সালা বলেই ডেকে ওঠে। কেননা, সে তার মায়ের মুখে সালারকে সবসময়, 'সালা' বলতে শুনে তা মুখস্থ করে ফেলেছে।

তোমার ওকে 'বাবা' ডাক শেখানোর প্রয়োজন নেই, আমার সঙ্গে মিলিয়ে 'সালা পাপা' এমন কিছুই শিখিয়ে দাও, এটাই আমার জন্য অনেক।' সালার তখন ইমামাকে পরামর্শ দিয়েছিল। সালার এতে অবশ্য খুব বেশি খুশিও হয়নি। তবে এটা সিকান্দার উসমান আর তাইয়েবার কাছে এক মজার বিনোদন হয়ে উঠেছিল।

পাঁচ বছরের জিবরিলও যেন বৌদ্ধের মতো ধৈর্য আর শতবর্ষীর মতো প্রজ্ঞা নিয়ে তার একমাত্র ছোট ভাইটির দিকে তাকিয়ে থাকে। যে ভাইটি গত এক বছর ধরে তাদের ঘরের সুখ, শান্তি সব তছনছ করে ফেলেছে। প্রথমে সে ভেবেছিল, হামিন বড় হয়ে হাঁটতে শুরু করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অবশেষে যখন হামিন হাঁটতে শুরু করল, তখনই জিবরিল বুঝতে পারল, সে যে সমাধান ভেবে রেখেছিল, তা ভুল।

হাঁটতে শিখতেই হামিন সিকান্দারের যেন পা নয়, ডানা গজিয়েছে। এখন সে যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারে।



যেখানে ইচ্ছে বলতে সত্যিই যেখানে ইচ্ছে সেখানে। আর তার প্রিয় জায়গা ছিল বাথরুম। বিশেষ করে জিবরিলকে ওখানে যেতে দেখলেই হয়েছে, সেও তখন বাথরুমে যাবেই যাবে। ফলে বহুবার জিবরিলকে বেশ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কারণ, বাচ্চাদের ব্যবহারের বাথরুমে কোনো লক নেই। আর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সেটা খোলা হামিনের বা হাতের খেলা। তাই হামিনের উপস্থিতিতে বাথরুমে যাওয়া, জিবরিলের জন্য এক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ইমামা বা হেডি হামিনের আশেপাশে না থাকলে, জিবরিল তখন বাথরুমের ভেতরের দিকে এটা-ওটা দাঁড় করিয়ে, ঠেক দিয়ে, তারপর বাথরুম ব্যবহার করে।

সালার সিকান্দার তাকে 'অদ্ভুত' নামে উপাধি দিয়েছিল, আর হামিন সিকান্দার যেন তার বাবার দেওয়া সেই উপাধিকে সত্য প্রমাণ করতে, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড করে যায়; আর সেটাও একদম জান-প্রাণ দিয়ে। মাঝে মাঝে তাদের মনে হয়, হামিন সিকান্দারকে কেউ থামাতেই পারবে না। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিটি

ফেরাউনের জন্যই রয়েছে এক মুসা। তার জীবনে চন্নির আগমন, তেমনই এক মুসার পদাপগী নিয়ামত।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সালার সিকান্দার আফ্রিকার জন্য মানুষ নয়, বরং এক যান্ত্রিক দক্ষতাসম্পন্ন মেশিনের মতো কাজ করেছে। তার কর্মকালকে আফ্রিকার ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। আফ্রিকায় নিযুক্ত হওয়ার আগেই তাকে আফ্রিকার একজন বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ মনে করা হতো। তারপর সেখানে বছ বছর কাজ করার ফলে, সে যেন পুরো আফ্রিকা সম্পর্কে অবগত এক এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষে পরিণত হয়। পুরো আফ্রিকা তার নখদর্পণে চলে আসে। সেখানে এমন কোনো অঞ্চল বা জায়গা নেই, যার ব্যাপারে সে জানে না কিংবা সেখানে তার সংযোগ স্থাপন হয়নি।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করে, আফ্রিকার কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করাটা যেন তার কাছে দুধারি তরবারির উপর হেঁটে

চলার মতো কঠিন মনে হচ্ছে। কারণ, আফ্রিকার কল্যাণ করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংককে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। আবার বিশ্বব্যাংকে সন্তুষ্ট করে আফ্রিকার কল্যাণ কাজ ঠিকমতো করা যাচ্ছে না। তবু সে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করছে, আর তাতে সফলও হচ্ছে। পেট্রোস ইবাকার মৃত্যু এবং সৃষ্ট পরিস্থিতি বিশ্বব্যাংকের জন্য ছিল সাময়িক এক ধাক্কা। বিশ্বব্যাংক তখন কৌশলগতভাবে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তার মানে এই নয় যে, আফ্রিকার ব্যাপারে বিশ্বশক্তিগুলোর নীতি পাল্টে গিয়েছে। সালার তা খুব ভালোভাবেই জানে। কিছুদিন যেতেই ধীরে ধীরে সব ঢাকা পড়তে লাগল। স্মৃতি থেকে মুছে যেতে লাগল বিপ্লবের বেশ। দরিদ্র জাতিগুলোর স্মৃতি বাঁধা থাকে তাদের পেটের সঙ্গে। পেট শূন্য হলে তাদের স্মৃতিও শূন্য হয়ে যায়।

পেট্রোস ইবাকাও খুব দ্রুতই তার জাতির স্মৃতি থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে। সালারও তা বুঝতে পারছে। সে জানে, এটি ছিল কেবল সাময়িক উত্তেজনা, যা কিছুদিন তার জাতিকে

উত্তেজিত রাখবে। অতঃপর বাস্তবতা তাদেরকে সব ভুলে যেতে বাধ্য করবে। আর সেই বাস্তবতা হলো-আফ্রিকার মানুষগুলো তাদের প্রতিটি প্রয়োজনে উন্নত জাতিগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাদের প্রকল্পগুলোতে কাজ করেই তাদের ডাল-ভাত জোটে। তাদের সরকার ও নেতারা সব দুর্নীতিরাস্ত্র, চোর। দেশের সম্পদ লুট করে তারা বিদেশে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভারী করতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের জীবন পরিবর্তনের কোনো চিন্তা নেই তাদের। অথচ আফ্রিকায় সবকিছুই আছে, নেই শুধু নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছে। আর এই ইচ্ছে বাইরের কেউ তাদের মধ্যে জাগাতে পারবে না। এমনকি সালার সিকান্দারও না। আর এই সত্যটি পশ্চিমা দুনিয়া যেমন জানে, তেমনি জানে খোদ আফ্রিকাও।

সালার সিকান্দারের উপস্থিতিতেও তাতে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। যা এসেছে তা হলো, প্রকল্পগুলো থেকে আগে দশ শতাংশ সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করা হতো, আর এখন সেটা বেড়ে বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ হয়েছে। এর চেয়ে বেশি কোনো

পরিবর্তন সে আনতে পারবে না। অথচ সেই ত্রিশ শতাংশ সম্পদও যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যেত, তাহলে উন্নয়নের গতি অন্তত চারগুণ বাড়তে পারত। আর এই কাজটিই করেছিল সালার। সব সম্পদের ব্যবহার সে শতভাগ স্বচ্ছ করতে পারবে না, তবে এগুলোর যথাযথ ব্যবহারের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে। কোন কাজটি আগে আর কোনটি পরে করা প্রয়োজন, সেটা বলে দিতে পারে। আর এসব কাজে সে অনেকটা সফলও হচ্ছে।

একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আফ্রিকায় তার এবং তার দপ্তরের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত ভাইস প্রেসিডেন্টদের তুলনায় অনেক উত্তম। সালার সিকান্দারের হাত ধরে আফ্রিকায় শুরু হওয়া প্রকল্পগুলো একে একে যেন দৃষ্টান্তে পরিণত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এগুলো অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কেস স্টাডি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্টরা এগুলো থেকে শিক্ষা নিতে বাধ্য হয়। সে বিশ্বব্যাপক-প্রধান নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সালার নিজের

নাম খুব বেশি প্রচার না করেও অন্যান্য ভাইস প্রেসিডেন্টদের নামকে মূলত অকার্যকর করে দিয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাংকের সেই নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্টকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, যাকে পেট্রোস ইবাকার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে, প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিগত টানা তিন বছর ধরে সালার টাইম ম্যাগাজিনের 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' হিসেবে প্রচ্ছদে জায়গা করে নিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চলমান প্রকল্পে মতপার্থক্যের আগ পর্যন্ত সে সবার কাছে একজন প্রভাবশালী কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল। সে ছিল একজন নিরপেক্ষ এবং অন্যান্য খ্যাতির অধিকারী একজন মানুষ। আর এখন সেই সুনামকে কলঙ্কিত করতে একমাত্র কারণ দাঁড়িয়েছে-তার 'মৌলবাদী মুসলিম' পরিচয়। যদিও এটি কেবল তার একটি বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত জীবনাচারণে প্রকাশ পেয়েছে। তার অফিসিয়াল কাজকর্ম বা নীতিমালায় কখনো এমনটি প্রকাশ পায়নি।

সালার সিকান্দারের চাকরির মেয়াদ শেষের পথে। বিশ্বব্যাংক এই মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর আগেই তাকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সে তা ফিরিয়ে দেয়। পরে তাকে আরও একাধিকবার, আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সালার তার সিদ্ধান্তে অটল। কারণ, আফ্রিকা থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছিল সে। আর এই সিদ্ধান্তটি কেবল বিশ্বব্যাংককেই নয়, বরং মার্কিন সরকারকেও ভীষণ চিন্তিত করে তুলছে।

আফ্রিকাকে সালার সিকান্দারের চেয়ে ভালো করে আর কেউ চালাতে পারবে না, এ বিষয়ে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। আমেরিকান সরকারেরও এতে কোনো সন্দেহ নেই। গত কয়েক বছরে আফ্রিকায় সালার শুধু বিশ্বব্যাংকের সুনাম ও ভাবমূর্তিই বদলে দেয়নি, বরং আমেরিকান সরকারের প্রতি সেখানকার মানুষের মধ্যে সুধারণা তৈরি করতেও সফল হয়েছে। তাই সালার এখন বিশ্বব্যাংক ছেড়ে গেলে তারা একটি বড় ধাক্কার মুখোমুখি হবে। কিন্তু

সালার আর এখানে থাকতে চাচ্ছে না। তার সামনে কোন জিনিস পেশ করলে, এখানে থাকতে রাজি হবে সে, আমেরিকান সরকার এখন তা-ই ভাবছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদই তাকে থামাতে পারে। কারণ, এটি এমন একটি মুকুট, যে মুকুটের জন্য সালার সিকান্দার সবচেয়ে যোগ্য এবং কম বয়সি প্রার্থী। কিন্তু সালার নিজেই এই পদের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হলো তার মৌলবাদী মুসলিম উপাধি। তারা একজন মৌলবাদী মুসলিমকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করতে পারে না। এদিকে অন্য কোনো লোভ দেখিয়েও তাকে তারা আটকাতে পারছে না। এ বিষয়ে এখন তাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, সালারের এই মৌলবাদী মুসলিম পরিচয়কে এড়ানো সম্ভব কি না। এদিকে আমেরিকান সরকার ও বিশ্বব্যাংকের কাছে এখনো অনেক সময় আছে। কারণ, সালারের চাকরির মেয়াদ শেষ হতে এখনো এক বছর বাকি।

এই এক বছরে সালারের জীবনে তিনটি বড় বড় ঘটনা ঘটে। প্রতিটি ঘটনাই তার জীবনে গভীর ছাপ রেখে যায়। গহিন গভীর সেই দাগগুলো, চিরকাল থেকে যাওয়ার মতো হয়ে যায়। আর এই ঘটনাগুলোই আরও একবার তার জীবনকে বদলে দেয়।

সে সময় তার চতুর্থ এবং সর্বশেষ সন্তান হিসেবে, চন্নি গোলাম ফরিদেরও আগমন ঘটে তার জীবনে। আর এটি হয় তার এক বছরের জীবনের প্রথম বড় ঘটনা।

চন্নির সাথে সালারের অদৃশ্য পরিচয়টি সবসময় বেনামি হয়েই ছিল। প্রানের স্কুলের অন্যান্য কর্মচারীর মতো গোলাম ফরিদের ব্যাপারেও সে সিকান্দার উসমানের কাছে নানা খবরাখবর শুনত। কারণ, গোলাম ফরিদ যেই স্কুলে দারোয়ানের চাকরি করত, সেটি ছিল সালারেরই নির্মিত স্কুল। ফলে অন্যান্য খবরাখবরের সঙ্গে সিকান্দার সালারকে গোলাম ফরিদের ঘটনাও জানান। সালারের নির্দেশেই সিকান্দার তখন প্রতি মাসে গ্রামের মসজিদে দান করতে শুরু করেন। মসজিদের

অনুদান থেকে চুরি করার অপরাধে দারোয়ানের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশও দিয়েছিল সালারই। প্রতারণা আর অসততা সালার একদমই সহ্য করতে পারে না। বিষয়টি তার কাছে আরও বেশি গুরুতর মনে হয়েছে, মসজিদের দান করা টাকায় অনিয়ম করার জন্য। মসজিদের টাকায় অনিয়মকারীকে কোনো ছাড় দিতে সে রাজি নয়। সিকান্দারও গোলাম ফরিদকে এই শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি সালারের নির্দেশ অনুযায়ী তা পুরোপুরি বাস্তবায়নও করেছিলেন।

গোলাম ফরিদের হাতে তার পুরো পরিবার হত্যার ঘটনা সিকান্দারকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা বহুদিন মিডিয়ায় আলোচিত হতে থাকে। মিডিয়া গোলাম ফরিদকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে, আর সেসব প্রশ্নের উত্তর হেডলাইন করে পত্রিকায় ছাপাতে থাকে। সেগুলো কেবল সিকান্দার উসমান নয়, সালারের চোখেও পড়ে। নিজের পরিবারকে হত্যাকারী মানুষটিকে মিডিয়ার কাছে মানসিক

ভারসাম্যহীন মনে হয়। কারণ, সে তাদেরকে একেক দিন একেক উত্তর দিত।

'তার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ ছিল, তাই সে তার পরিবারকে হত্যা করেছে।' ঘটনার পরদিন মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদের শিরোনাম ছিল এটি।

এটি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অসচেতন সাংবাদিক অনুমানের ভিত্তিতে টিভিতে সম্প্রচার করে দেয়। আর বাকিরা সবাই চোখ বুজে তার অনুসরণ করে। ডেস্ক জার্নালিজমের এই ছোটখাটো অসততা কয়েক বছর পরে কারও গলার ফাঁস হয়ে জেগে উঠতে পারে, তা সেই সাংবাদিকের জানা ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে গোলাম ফরিদের সঙ্গে যতই সাক্ষাৎকার হতে থাকে, ততই বিভিন্ন তথ্য সামনে আসতে থাকে। প্রথম শিরোনাম ঢাকা পড়ে যায়। এই হত্যার কারণ হিসেবে নতুন করে সামনে আসে-দরিদ্রতা; স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, সংসারে অভাব-অনটন, অসুস্থতা; আত্মীয়স্বজন ও ঋণ-দাতাদের

উপর্যুপরি চাপ এবং সবশেষে অনিয়মের কারণে স্কুলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গৃহহীন হয়ে পড়া। এটি সিকান্দার ও সালারকে অপরাধবোধে ভোগাতে থাকে।

এখন আর তাদের কিছু করার নেই। যা আছে, তা হলো, তারা চাইলে গোলাম ফরিদ ও তার বেঁচে যাওয়া একমাত্র কন্যার দেখাশোনা ও ভবণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। আর সালারের নির্দেশে সিকান্দার তা-ই করেন। তিনি তাদের দায়িত্ব নিয়ে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাতে থাকেন। সেগুলো তার আত্মীয়রা এসে নিয়ে যায়। সিকান্দার মাঝে মাঝে চন্নি কে দেখতে চাইলে, তারা তাকে উনার কাছে নিয়ে আসে। সিকান্দার এতে নিশ্চিত হন যে, টাকাগুলো তাদের পেছনেই খরচ হচ্ছে, চন্নির সঠিক দেখভাল করা হচ্ছে এবং সে নিরাপদেই আছে।

বিষয়টি হয়তো এভাবেই চলতে থাকত, সালার যদি তখন দুই সপ্তাহের ছুটিতে সপরিবারে পাকিস্তানে বেড়াতে না আসত।

আর যদি স্কুলের দেখভাল করতে নিজেই গ্রামে না যেত। গ্রামে গিয়ে হঠাৎ তার গোলাম ফরিদের মেয়ের কথা মনে পড়ে। চনিকে তার দেখতে ইচ্ছে করে। ফলে চনিকে স্কুলে নিয়ে আসার কথা না বলে কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিজেই তার বাড়িতে চলে যায়।

প্রথম দেখায়, দেড় বছরের চনিকে সালারের কাছে সাত-আট মাসের বাচ্চা বলে মনে হয়। প্রচণ্ড দুর্বল, রোগা-পাতলা। তার বাদামি চামড়া যেন হলুদাভ রং ধারণ করে আছে। ত্বকের সংক্রমণের ফলে তার শরীর ও মুখ, ছোট-বড় পুঁজপূর্ণ ফোড়ায় ভরে আছে। তার কালো চুলগুলো রোদ ও ময়লায় পড়ে পড়ে লটায় পরিণত হয়েছে। নিয়মিত গোসল না করার ফলে জট পাকিয়ে আছে। তার পরনের ফ্রকখানা ছিঁড়ে, ফেটে আছে। এতে তার দরিদ্রতা ও দুরবস্থা প্রকাশের সাথে সাথে, সাইজে বড় হওয়ায় বোঝাই যাচ্ছে যে, এর আগে ফ্রকটি অন্য কেউ ব্যবহার করেছে। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে আছে, মনে হচ্ছে পানি-

শূন্যতায় ভুগছে। হাত-পায়ের লম্বা ময়লাযুক্ত ভাঙাচোরা নখ
দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কতটা যত্ন নেওয়া হচ্ছে তার!

সালার তাদের বাড়িতে ঢুকে দেখে, মেয়েটি দানা কুটকুটে
খাওয়া মুরগির পাশে, কাঁচা মাটির উঠোনে বসে আছে।
ময়লামাখা ওসব দানা হাতে তুলে মুখে পুরছে। সালার
উঠোনের এক কোণে, মুরগির পাশে পড়ে থাকা বাচ্চাটির দিকে
ভালো করে লক্ষ্যও করেনি। কারণ, সে কল্পনাও করতে পারেনি,
এত মোটা অঙ্কের টাকা পাঠানোর পরও মেয়েটি এই অবস্থায়
থাকতে পারে!

চন্নির আত্মীয়স্বজনেরা তখন ভীষণ অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।
সালারকে তারা মেহমানখানায় নিয়ে বসাতে চাচ্ছিল। কিন্তু
সালারের তেমন সময় ছিল না। বাইরে থেকেই বাচ্চাটিকে
একনজর দেখেই ফিরে যেতে চাচ্ছিল সে। কিন্তু চন্নির
আত্মীয়দের দুর্ভাগ্য আর চন্নির সৌভাগ্য যে, চন্নি তখন উঠানেই

ছিল। তাই তারা সালারকে দেখানোর জন্য তাকে সাজানো-গোছানোর সুযোগ পায়নি।

: 'সে তো এভাবেই থাকে। যতবারই কাপড় পালটিয়ে দেই, একটু পরেই গিয়ে আবারও মুরগির পাশে গিয়ে বসে পড়ে। হামিদা! ও হামিদা! একটু দ্যাখ তো চন্নিকে। কাপড় পালটে দে, ছাহেব দেখা করতে আসছেন।' বাড়ির মালিক প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে, চন্নির দিকে ইশারা করতে করতে স্ত্রীকে ডাকতে লাগল। আর তখনই সালার ভালো করে চন্নির দিকে লক্ষ করল। চন্নির নাম ডাকতে দেখে, চন্নিও খানিক স্ফীত হয়ে সালারের দিকে মনোযোগী হলো। হামিদা এসে হুলস্থূল করে চন্নিকে ভিতরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু সালার থামিয়ে দিল। তারা যা লুকাতে চাচ্ছিল, তা আর লুকাতে পারল না। তাই চন্নিকে সে ওভাবেই সালারের কাছে নিয়ে এলো।

তামিদার কোলে, নাক বেয়ে সর্দি ঝরতে থাকা বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে সালারের হঠাৎ অদ্ভুত মায়া হলো। আফ্রিকায় সে এর

চেয়ে খারাপ অবস্থায় বাচ্চাদের দেখেছে, কিন্তু তাদের দেখে তার মনে কোনো অপরাধবোধ জাগেনি, চনিকে দেখে যে অপরাধবোধ জেগে উঠেছে।

'না না, ওরে কোলে নিয়েন না, একদমই নোংরা হয়ে আছে ছাহেবা আপনার জামা-কাপড় নষ্ট করে দিবে। এহনো সে নিজে নিজে টয়লেটে যাইতে পারে না।' হামিদার আগে তার স্বামীই চনিকে কোলে তুলতে সাবধান করল। সালার তাদের কোনো কথা তোয়াক্কা না করেই তাকে কোলে তুলে নিল। চল্লিও খুশিমনে তার কোলে উঠে এলো। জীবনে ওই প্রথম সে সালার সিকান্দারের মতো চেহারা-সুরতওয়ালা কাউকে দেখল। সালার তাকে বুকে জড়িয়ে স্নেহভরে আদর করল। চন্নি চুপচাপ থাকে। জড়িয়ে ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

: হ্যাঁ, একটু-আধটু অসুখ লেগেই থাকে। শুরু থেকেই এমন। ওষুধ খেয়ে কোনো লাভ হয়নি। একটু আগেই পির ছাবের কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক করিয়ে আনলাম। গলায় ঝোলাতে উনি

তাবিজও দিচ্ছেন। হামিদা, তুই এখনো ওটা গলায় ঝোলাস নাই?

সালার তখন চন্নির খোঁজখবর নিতে শুরু করে। প্রত্যুত্তরে বাড়ির মালিক বিস্তারিত কারণ বলতে থাকে। সালার বুঝে গেল যে, চন্নি ভুল জায়গায় আছে। ঠিকমতো তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। তার জন্য পাঠানো টাকাও তার পেছনে ব্যয় হচ্ছে না।

কে জানে কোন টানে চন্নিরকে সে সাথে সাথে ওখান থেকে নিয়ে কোনো নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার সিদ্ধান্ত নিল। অথবা এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাইল, যেখানে থাকলে সুন্দরভাবে তার লালনপালন হবে। সেই মনের টানেই সিদ্ধান্তটি সে চন্নির আত্মীয়দের জানিয়ে দিল। তারা এতে আপত্তি করল, তা সত্ত্বেও সালার তাকে সাথে করে নিয়ে এলো। তারা এতে আপত্তি করছে, কারণ সালার চন্নিরকে নিয়ে যাচ্ছে, এর অর্থ হলো, মাসে মাসে আসা মোটা অঙ্কের টাকাটাই নিয়ে যাচ্ছে। চন্নির জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাদের আসল চিন্তা

টাকার জন্য। সালারের সাথে ওদের স্টাফ ও গণ্যমান্য অনেক মানুষ ছিল, তাই তারা মুখে আপত্তি জানালেও চনিকে আনতে বাধা দিতে পারল না।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের এমন শোরগোল ও আপত্তি-ওজরের হইচইয়ের মাঝেও চন্নি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও শান্তভাবে সালারের কলার ধরে কোলে শুয়ে রইল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ও সে কান্নাকাটি কিংবা ছটফট করল না। তাকে নিয়ে গাড়ির সামনের সিটে বসানোর পরও কোনো টু শব্দও করল না।

গ্রাম থেকে ইসলামাবাদ ফেরার পথে সালার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। আর চন্নি সামনের সিটে বসে চুপচাপ শান্ত হয়ে পুরো রাস্তা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। সে একটু ছটফট করল কেবল গাড়িতে বসিয়ে সেফটি বেল্ট বাঁধার সময়। এ ছাড়া পুরো সময় সে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল। অস্বস্তিতে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে দেখে সালার তার বেল্ট খুলে দিল। তখন

তার হামিনের কথা মনে পড়ল। এই বয়সে হামিনও এভাবে সেফটি বেল্ট থেকে মুক্তি পেতে চাইত।

সেফটি বেল্ট খুলে দিতেই চন্নি আবার একদম শান্ত হয়ে গেল। পুরো পথজুড়ে সালার মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু সে এত নিশ্চিতভাবে বাইরের রাস্তা ও গাড়ির যানজটের দিকে তাকিয়ে আছে যে, চোখ ফিরিয়ে একবারও সে গাড়ির ভেতরে বসা সালারের দিকে তাকানোর চেষ্টাও করছে না। সালার তার এই একাগ্রতা দেখে শুধু হাসছে। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সে তাকে একটি জুস ও বিস্কুটের একটি প্যাকেট কিনে দিল। কয়েক মিনিটেই চন্নি দুটোই খেয়ে শেষ করে ফেলল। মনে হলো যেন সে অনেকদিন ধরে না খেয়ে আছে।

ইসলামাবাদ আসতে আসতে সালার তার থাকার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গার কথা ভাবতে থাকল। তখন সে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি যে, চন্নিকে সে নিজের কাছেই রাখতে পারে। এত বড় দায়িত্ব নেওয়ার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।



আর কল্পনা করলেও, ইমামাকে জিজ্ঞেস না করে সে এটি করতে পারে না।

চন্নিকে নিয়ে সম্ভাব্য বিভিন্ন চিন্তা তার মাথায় আসতে লাগল, আর সে নিজেই তা বাতিল করে দিতে লাগল। ইসলামাবাদে পৌঁছাতেই, বাড়ির গ্যারেজে গাড়ি ঢুকতেই তার বাচ্চারা দৌড়ে এসে তাকে স্বাগত জানাল। গাড়ির ভেতরে বসা চন্নিকে সবার আগে দেখল সাড়ে তিন বছরের হামিন। তাকে দেখতেই বিস্ময়ে সব সময়ের মতো তার চোখ গোল হয়ে গেল। এমন যেন সে বনের কোনো জন্তু দেখে ফেলেছে।

সে জানালার কাছে নাক-মুখ চেপে উঁকি দিয়ে চন্নিকে হ্যালো বলল। চন্নি ভেতরের দিক থেকে জানালার কাচের সঙ্গে চোখ লাগিয়ে হামিনের দিকে তাকিয়ে আছে, আর বাইরের দিক থেকে তাকিয়ে আছে হামিন। চন্নি খানিক ভয় পেয়ে একটু পেছনে সরে গেল। হামিন আর কোনো কাণ্ড করার আগেই সালার গাড়ি থেকে নেমে গ্যারেজের অপর দিকে চলে এলো।



তারপর সালার তাকে পাশে সরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে চন্নিকে
বাইরে বের করল। চন্নির গায়ের দুর্গন্ধ হামিনই সবার আগে
উপলব্ধি করল। অবচেতনেই সে নাকের কাছে হাত রেখে
বাবাকে বলল, Oh my God! she is so smelly and dirty
and ugly. ওরে আল্লা! সে কি দুর্গন্ধময়, নোংরা আর কুৎসিত।
অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হামিন নাক চেপে বলে চলল। ওদিকে
জিবরিল ও ইনায়া দূরে দাড়িয়ে কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন না
করেই, বাবার সঙ্গে আগত মেহমানের দিকে তাকিয়ে রইল।

'হামি... ন' সালার তাকে শাসানোর ভঙ্গিতে চোখ রাঙিয়ে ডাক
দিল।

Oh but then that's ok...

May be she likes to live like this

I mean some people like to be different.



I like her hairstyle...She is cool.

ওকে, তাহলে ঠিক আছে। সে হয়তো এমনই থাকতে পছন্দ করে। আমি বোঝাচ্ছি, কিছু মানুষ ভিন্ন হতে পছন্দ করে। তার চুলের স্টাইল আমার ভালো লেগেছে। সে বেশ চমৎকার!

হামিন, সব সময়ের মতো বাবার ধমক খেয়ে কয়েক সেকেন্ডেই বোল পালটে ফেলল। কথার শেষে চন্নির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাবাকে বলল, Baba I also want to have her hair style. বাবা, আমি ওর মতো হেয়ার স্টাইল করতে চাই।

সালার তার কথার তীক্ষ্ণতা উপেক্ষা করল। সে যেন এক পিচ্চি বাচাল জিন। কখনো চুপই হয় না। সারাক্ষণ এর-ওর কাছে ঘুরে ঘুরে শত শত প্রশ্ন করতে থাকে। তার এত এত প্রশ্ন ইমামা ও সালারকে আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার ইচ্ছেকে শেষ করে দেয়।

: I think she is goldilocks. আমার মনে হয় সে গোল্ডিলকস-এর মতো।

হামিনের প্রশংসার ধারাবাহিকতা চলতেই থাকল। সে এখন বাপকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, এই মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছে।

: 'এ গোল্ডিলকস নয়, নোংরা। মনে হয় কয়েক সপ্তাহ ধরে তার চুল ধোয় না। হয়তো কয়েক মাস ধরে।' জিবরিল হামিনকে মুখের ওপর উত্তর করল। তারা তিনজনই এখন সালারের পেছন পেছন ভেতরে যাচ্ছে।

: 'ঠিক আছে, তার মানে এই নয় যে, সে চমৎকার নয়।' উত্তরটা আগের মতোই চট করে এলো। জিবরিল আনমনেই আফসোস করল। হামিনের উত্তর দিয়ে সে, সালারের বিপদকে নিজের কাঁধে টেনে এনেছে।

- 'আমি যদি কয়েক মাস আমার চুল না ধুই, তাহলে আমার চুলও এমনই হবে। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, গোল্ডেন ব্রাউন বা অ্যাশগ্রে বা মিস্টার ডেলো।' তার মন এখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোঁটাছুটি করছে।

: 'না।' জিবরিল অত্যন্ত কঠোর জ্বরে তার কথায় ফুলস্টপ লাগাল।

: 'ওকে, কিন্তু আমি আমার চুল রং করাতে তো পারি।' হামিন এবার অত্যন্ত শান্তভাবে বলল। জিবরিল এবার তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেল। তার কথার কোনো উত্তর করল না। সে চাচ্ছে না, চুলের পর হামিন চন্নির মতো নখ বানানোর কথাও। বলতে শুরু করুক।

ইমামা এসেই দেখল, বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে সালার। সালার তখন তাইয়েবার সঙ্গে বসে চা পান করছে। আর তাইয়েবা যেন চা পান করতেই ভুলে গেছেন।

: এ কে?

: 'পরে বলব। আগে একে গোসল করিয়ে, কাপড় পালটে দাও। এরপর আমি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' সালার চনিকে কোল থেকে নামাতে নামাতে বলল। ইমামা খানিক বিক্ষিপ্ত হলো। তবু চুপচাপ তাকে নিয়ে চলে গেল। গোসল করানো শুরু করতেই ইমামা বুঝে গেল, চুল কাটা ছাড়া একে গোসল করানো সম্ভব নয়। তার মাথায় বড় বড় ফোড়া। আর ফোড়া থেকে নির্গত পুঁজ চুলগুলোকে আঠার মতো জট পাকিয়ে রেখেছে। চুল না কেটে এগুলো আলাগা করা সম্ভব নয়। ইমামা শেভিং কাট রেখে, কেচি দিয়ে চুলগুলো গোড়া থেকে কাটতে লাগল। মাথা একদম শেভ করে ফেলতে পারল না। কারণ, তার মাথা ভরা ফোড়া।

বাচ্চাটিকে গোসল করাতে করাতে ইমামার খুব মায়া হলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ময়। চন্নি একদম চুপচাপ বসে গোসল করছে। অন্যান্য বাচ্চার মতো কোনো কান্নাকাটি করছে না। এমনকি চুল কেটে ফেলাতে বা ফোড়াগুলোতে হাত লাগার পরও কোনোরকম চিৎকার করছে না।

এদিকে বেডরুমে জিবরিল আর ইনায়া, হামিনকে আটকে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কারণ, সে চন্নির গোসল করা দেখার জন্য বাথরুমে আসতে অনেক পীড়াপীড়ি করছে। ইমামাই তাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে রেখে গেছে। অবশেষে চন্নিকে গোসল করিয়ে, হামিনেরই একজোড়া জামা পরিয়ে বাইরে নিয়ে এলো, তাকে দেখেই সর্বপ্রথম হামিনই চিৎকার করে উঠল।

: 'Oh my God! Mommy you have made her uglier horrible and you have destroyed my most favourite



shirt. হায় আল্লা, মান্নি! তুমি ওকে আরও কুৎসিত, ভয়ংকর করে ফেলেছ। আর তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় শাটাল ও নষ্ট করে ফেলেছ।

একসাথে হামিনের দুটো চিন্তা হলো। চন্নির চুল আর তার নতুন শাট।

"Momy she was girl You have made her a boy. God will never forgive you for that. মান্নি! সে একটা মেয়ে। আর তুমি ওকে ছেলে বানিয়ে ফেলেছ। আল্লাহ এর জন্য তোমাকে কখনো ক্ষমা করবেন না।"

তার কথা শুনে ইমামা হেসে ফেলল। সত্যিই, সালার ঠিকই বলে, হামিন আসলেই অদ্ভুত। এই কথোপকথনকালীন চন্নি, চুপচাপ তার এই নতুন পরিবারকে দেখছে। সে তাদের বাড়িতে সারা জীবনের জন্য এসেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের কেউ কল্পনাও করছে না যে, চন্নি সত্যিই সারা জীবনের জন্য এখানে

এসেছে। তারা কেবল ভাবছে, চন্নি এখানের সাময়িক এক মেহমান।

'এবার ওকে কী করবে?' ইমামা আর সালারের মাঝখানে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে চন্নি। ইমামা তখন তার দিকে তাকিয়ে সালারকে জিজ্ঞেস করল। সালারও তখন ইমামার অপর পাশে আধশোয়া হয়ে চন্নির দিকে তাকিয়ে আছে। যে চন্নি নিজেও জানে না, সে এখন কোথায়!

জীবনে প্রথমবার কেউ তাকে ভালোবেসে, আদর করে পেট ভরে খাইয়েছে। সেও গভীর আগ্রহে ইমামা ও হামিনের হাত থেকে লোকমা নিয়ে নিয়ে খেয়ে চলছিল। বিশেষ করে হামিনের হাত থেকে, যে একদম জেদ ধরে এই কল্যাণকর্মে শরিক হয়েছিল।

'ওহ মাই গড!' হামিনের হাত থেকে চন্নি প্রথম লোকমা খেতেই হামিন আনন্দে, উত্তেজনায় তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে



চিংকার করে ওঠে-'মান্নি, মান্নি! ও আমাকে পছন্দ করে!'
টমেটোর মতো লাল হয়ে ইমামার কানে কানে ফিসফিস করে
বলেছিল এটা। কিন্তু তার ফিসফিস করে বলা কথাটি লাউঞ্জে
বসা সবাই দূর থেকেও শুনে নিয়েছিল। ছয় ফিট দূরে বসে
জিবরিল তখন বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। হামিনের কথা শুনে
এক মুহূর্তের জন্য সে চোখ তুলে ওর দিকে তাকায়, তারপর
এক প্রচণ্ড ধৈর্য নিয়ে পরের পাতা উল্টাতে উল্টাতে, পালটা
এক ফিসফিসানি ছুড়ে দিয়ে ইমামার কানে কানে বলে, 'She
is the only one who likes you. সে কেবল তোমাকে
পছন্দ করে।

ইমামা হামিনের কথার মতো জিবরিলের কথাটিও এড়িয়ে যায়।
কারণ, তার পূর্ব মনোযোগ তখন চনিকে খাওয়ানোর দিকে। এই
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটিই তাকে দেওয়া হয়েছে। চন্নি অপলক,
কখনো ইমামা, কখনো-বা হামিনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
খেয়ে চলছিল। যে ভীষণ শান্ত ও নিশ্চিত্ত মনে সে খেয়ে
চলছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর। আর এখন ঘুমের মাঝেও তার

চেহায়ায় সেই প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা ঝলকে উঠছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সালার কোনো গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছে।

একটু আগেই সে ইমামাকে চল্লির বাবা-মা ও তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বলেছে। বলার সময় তার চেহায়ায় এক অপরাধবোধও ফুটে ছিল। এই ঘটনাগুলো চল্লির প্রতি ইমামার দয়া, মায়া আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। তা সত্ত্বেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল ইমামার করা প্রশ্নটি।

: 'আমি তাকে কোনো এতিমখানা বা ওয়েল ফেয়ারে ভর্তি করাতে নিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে যা ঘটেছে, এরপর তো আমার ওপর দায়িত্ব বর্তায় যে, অন্তত তার জীবনটা যেন নষ্ট না হয়। অথচ গ্রামে থাকলে তার জীবন নষ্ট হতে বাধ্য।' সালার অত্যন্ত গভীর হয়ে তাকে বলল।

: 'তুমি কি অপরাধবোধে ভুগছ?' স্বীকারোক্তির পরও ইমামা প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না।

: 'হ্যাঁ। তার বাবা তার পরিবারের সঙ্গে যা করেছে, তাতে আমিও কোনো না কোনোভাবে দোষী। আমি একটু খেয়াল করলেই এসব হতো না।' সালার তার দিকে তাকিয়ে বলল। ইমামা তার হাতে সান্ত্বনার চাপড় দিল।

- 'ওকে তুমি তোমার দায়িত্বে কোনো এতিমখানায় দিতে পারবে না। যেহেতু ওর অভিভাবক হিসেবে তার আত্মীয়রা জীবিত আছে। তাছাড়া কোর্ট ইতিমধ্যেই তাদেরকে অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে। তারা চাইলে এখন তোমার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপণ নিতে পারে।' ইমামা যেন তাকে সতর্ক করল।

: 'এসব পরোয়া করি না আমি। এসবেরও কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে ফেলব। আপাতত আমি আমার লিগ্যাল টিমকে

পরামর্শ দিতে বলেছি, তার অভিভাবকত্ব পরিবর্তন করার জন্য, যেন আবেদন করতে পারি। তার ভালো কোনো আত্মীয়কে খোঁজা যেতে পারে, বা কোনো ওয়েল ফেয়ারকে তার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।" ইমামাকে সে বলে চলল। পুরো কথোপকথনে একবারও সে বাচ্চাটিকে নিজেরাই দত্তক নেওয়ার কথা ভাবেনি। সে কেবল বাচ্চাটির উত্তম দেখভালের কথাই ভাবছে। এর জন্য টাকা খরচ করতেও রাজি। তার মনে হচ্ছে, পাকিস্তানে থাকতে থাকতেই চন্নির জন্য কোনো না কোনো ভালো জায়গা সে পেয়ে যাবে।

দত্তক নেওয়ার চিন্তাটি সবার আগে হামিনের মনে এলো। পরের দিন সে ইমামার কাছে জানতে উঠেপড়ে লাগল।

। 'ওর নাম কী মান্নি?' হামিন হুট করে তার নাম জানতে চায়।

। 'আমার তো মনেই ছিল না তোমার বাবাকে ওর নাম জিজ্ঞেস করতে।' তার প্রশ্ন শুনে ইমামার মনে পড়ল।



সালার তখন বাসায় নেই। চন্নি এখন ইমামা ও তার বাচ্চার সঙ্গে লাউঞ্জে বসে আছে। ইনায়া চন্নির হাতে কিছু খেলনা তুলে দিয়েছে, সে ওগুলো নিয়ে খেলছে। তার মাথা ও শরীরের অ্যালার্জিতে ইমামা মলম লাগিয়ে দিয়েছে। একটু আগেই সে তাকে ডাক্তার দেখিয়ে এনেছে।

: 'Can I name her? আমি কি তাকে একটা নাম দিতে পারি?'
মায়ের কথার উত্তরে হামিন প্রস্তাব করল।

: 'না, তুমি তা পারো না।' পাশে বসে বই পড়তে পড়তে জিবরিল যেন তার লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করল।

: 'কেন?' হামিন তার চোখ-মুখ বড় বড় করে, প্রচণ্ড আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'কারণ, আগে থেকেই তার নাম আছে।' জিবরিল একই শীতল ভঙ্গিতে তাকে উত্তর দিল, যেন হামিনের বোকামি দেখে তার আফসোস হচ্ছে।

: 'তুমি কি তার নাম জানো?' চট করে পরবর্তী প্রশ্নটি জিবরিলের দিকে ছুড়ে দিল।

: 'না।' জিবরিল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। 'তার নাম আমার জানা নেই।'

হামিন একই ভঙ্গিতে, বুকে হাত রেখে, নাটকীয়ভাবে বলল, 'মান্নি তার নাম জানেন না।' হামিন এখন ইমামার দিকে মনোযোগী হলো। ইমামা তখন ইনাযাকে কিছু একটা ড্রইং করে দিচ্ছে। 'ইনাযাও তার নাম জানে না।' হামিন এখন তার কচি দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে হতাশা প্রকাশ করছে। 'ওহো পুরো দুনিয়ার কেউ কি তার নাম জানে না।' সে যেন আদালতে তার মামলা লড়তে প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। 'আর তুমি, তুমি কি

চাও না যে, তার কোনো নাম থাকুক?' তার ভঙ্গিতে এতটা তাক্ষিল্য ছিল যে, ক্ষণিকের জন্য জিবরিলকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দাঁড়াতে হলো। সে প্রচণ্ড ঘাবড়ে বলল, 'আমি তো তা বলিনি।'

: 'আমি নিজে শুনেছি।' হামিন তার বুকে দুই হাত বেঁধে, তার বড় বড় কালো চোখদুটো একদম গোল করে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মতো জোর দিয়ে বলল। জিবরিল সাথে সাথে তার চেহারা বইয়ের পেছনে লুকানো নিরাপদ মনে করল। হামিনকে তো সে ছোটবেলায়ই চুপ করাতে পারেনি, যখন সে কথা বলতে পারত না; আর এখন চুপ করানো তো অসম্ভব!

- 'হামিন, ওর বাবা-মা নিশ্চয়ই ওর কোনো না কোনো নাম রেখেছেন। ও তো এখন অনেক বড়।' ইমামা এবার কথা বলা জরুরি মনে করল। তার কথায় যেন হামিন শক খেল। 'বাবা-মা!' কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে করতে তার গলা থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ বের হলো। জিবরিল এবার বই সরিয়ে তার দিকে না

তাকিয়ে পারল না। 'ওহ মাই গড!' তার গলায় যেন ব্যথার সুর বেজে উঠল। 'তাহলে সে তাদের কাছে নেই কেন?' ব্যথিত মনে সে যেন ইমামার কথায় প্রতিবাদ করল। এটি এমন একটি প্রশ্ন, যার উত্তর ইমাম দিতে পারল না। সে বুঝতে পারল না, চন্নির পরিবারের কথা তাকে কী বলবে। তার নীরবতা যেন হামিনকে আরও অস্থির করে তুলল।

: ওর কি কোনো ভাই-বোনও নেই?

: 'না, তার কেউ নেই।' ইমামা উত্তর করল। হামিনের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

: 'তাহলে তো আমি তার নাম রাখতেই পারি!' আলোচনা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, ঘুরেফিরে সেখানেই চলে এলো। হামিন কখনো তার কথা ভুলে না। এটা তার বাবা-মায়ের দুর্ভাগ্য!

: 'ঠিক আছে, তুমি ওর নাম রাখো।' ইমামা যেন হাত জোড় করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। অতঃপর পুনরায় ইনায়ার ছবি আঁকার দিকে মনোযোগ দিল।

: 'মাম্মি, ও কি আমাদের সঙ্গে থাকবে?' হামিন আরও একটি প্রশ্ন করে তাকে যন্ত্রণায় ফেলা আবশ্যিক মনে করল।

: 'না।' ইমামা এখনো তার কাজে মগ্ন হয়ে, উদাসীনভাবে উত্তর করল।

: 'কেন?' হামিন যেন একদম চিৎকার করে বলে উঠল। ইমামা এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেই ক্ষান্ত রইল। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে, হামিনের সব প্রশ্ন শেষ হয়ে যাক, কিংবা সাময়িকভাবে তা বন্ধ হয়ে যাক।

: 'তোমার বাবা এলে, তার কাছেই জিজ্ঞেস করে নিয়ো।' ইমামা এই বিপদ তার মাথা থেকে সরানোর চেষ্টা করল।

: 'মান্নি, আমরা কি তাকে দত্তক নিতে পারি?' ইমামার মাথা ঘুরে গেল এই প্রশ্নে।

'না, তা সম্ভব নয়।' অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে সে হয়তো এই প্রশ্নে হেসে উঠত। কিন্তু মুহাম্মদ হামিন সিকান্দার ইতিমধ্যে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙার সাথে সাথে, তার বাবা-মায়ের রসিকতার মানসিকতাকেও চিরতরে শেষ করে দিয়েছে।

: তুমি কেন তাকে দত্তক নিতে চাও?' জিবরিল যেন ভয়ে চমকে বলল।

'কারণ, আমার একটা বেবি লাগবে।' সে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে কারও দিকে না তাকিয়েই ঘোষণা করল। জিবরিল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ইমামা তার সাড়ে তিন বছরের ছেলেটির দিকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। এদিকে লাউঞ্জে প্রবেশ করতে করতে সিকান্দার উসমান তার হাসি আটকাতে পারছেন না। হামিন

উনাকে হাসতে হাসতে ভেতরে আসতে দেখে ফেলল। সে দৌড়ে গিয়ে উনার পায়ে জাপটে ধরে পুনরায় তার দাবি পেশ করল।

: 'একদিন আসবে, সেদিন বেবি আপনার কাছে থাকবে।' তিনি তাকে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিলেন।

- 'এক দিন?' হামিনের চোখ বড় হয়ে উঠল। 'আজ কেন নয়?' সে জেদ ধরে বসল। সিকান্দার উসমান চনিকে মাটিতে বসে খেলতে দেখলেন। সালার সিকান্দারের মতো উনার মনেও চন্নির প্রতি দয়া ও অপরাধবোধ জেগে আছে। চন্নি যেন তাদের দুজনের সম্মিলিত অপরাধবোধের প্রতিচ্ছবি।

: 'ভাই! ওকে তো চলে যেতে হবে। সে আপনার বেবি হতে পারবে না।' সিকান্দার উসমান এবার হামিনকে বোঝাতে শুরু করলেন।

: 'কোথায় যাবে সে?' সিকান্দারের কথায় হামিন নতুনভাবে চমকে গেল। হতভম্ব হয়ে সে চন্নিকে দেখতে লাগল।

: 'তার পরিবারের কাছে।' সিকান্দার সংক্ষেপে বললেন। তিনি তাকে চন্নির এতিমখানায় যাওয়ার কথা বলতে চাচ্ছেন না। এটা বলে চন্নির ব্যাপারে আরও শত প্রশ্নের প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলতে চাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না যে, তার এই প্রশ্নই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

: কিন্তু মাস্মি তো বললেন যে, তার কোনো পরিবার নেই!

সিকান্দার এবার ইমামার দিকে তাকালেন।

: 'আপনার বাবা তাকে নার্সারিতে ভর্তি করাতে চাচ্ছেন।' এবার ইমামা খুঁজে খুঁজে এই উত্তর দিল।

'ও আমাদের সঙ্গে কেন থাকতে পারবে না? আমাদের বাড়ি কত বড়' সে দু-হাত ছড়িয়ে দেখাতে দেখাতে 'কত' শব্দে জোর দিল। প্রশ্নটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আর উত্তরও প্রশ্নের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। বাচ্চারা মাঝে মাঝে সহজেই এমন সমাধান বের করে দেয়, যা শুনে বড়রা লজ্জায় চোখ লুকিয়ে ফেলো। হামিনের এই 'সমাধান' সালার সিকান্দারও শুনে ফেলল। সে তখন কয়েকটি এতিমখানার তথ্য নিয়ে লাউঞ্জে ঢুকছিল। হামিনের এই সমাধান সবার কাছে কেবল একটি বাচ্চামো জেদ আর ফ্যান্টাসি বলেই মনে হলো।

তারা আর দুই সপ্তাহ পাকিস্তান থাকবে। আর এই দুই সপ্তাহের মধ্যেই চন্নির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে। তার আগে সে চন্নির আত্মীয়দের থেকে অভিভাবকত্ব নিতে, টাকাপয়সা দিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত আছে।

'এটা আমাদের বাড়ি নয়। এটা তোমার দাদা-আব্বুর বাড়ি।'
ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সালার তার প্রশ্নের উত্তর পেশ করল।
হামিন চিন্তায় পড়ে গেল।

: 'তোমার বাবা ঠিক বলছেন।' ইমামা তাকে চুপ হতে দেখে
যেন স্বস্তির নিশ্বাস নিল।

: 'আমাদের বাড়ি নেই।' হামিন বিক্ষিপ্ত হলো। 'ও তো আমাদের
সঙ্গে কিনশাসায় থাকতে পারে।' হামিনের হঠাৎ কিনশাসার
বাড়ির কথা মনে পড়ল।

: 'কিন্তু সেটাও তো আমাদের বাড়ি নয়। খুব তাড়াতাড়িই
আমরা ওটা ছেড়ে দেব। সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যেই।' সালার
অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, যেন সে
কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বলছে। তার তিনটি সন্তানই
প্রচণ্ড মেধাবী। বংশগতভাবেই তারা তা পেয়েছে। কিন্তু এই
অস্বাভাবিক মেধা ও বুদ্ধিমত্তা জিবরিল ও ইনয়ার জন্য

আশীর্বাদ হলেও, হামিনের জন্য তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হামিন এখনো চিন্তায় ডুবে আছে। যেন সে চন্নির জন্য এমন কোনো বাড়ি খুঁজছে, যেখানে তাকে রাখা যায়। বাড়ির কথা উঠতেই ইমামার যেন তার নিজেরই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল।

: 'আমাদের নিজেদের কোনো বাড়ি নেই কেন?' হামিন আবার প্রশ্ন করল।

: 'আমাদের বাড়ি হবে।' ইমামা যেন তাকে ভোলানোর চেষ্টা করল।

: কবে?

: খুব জলদিই।

ইমামা চিনি নেড়ে চা বানিয়ে সালার ও সিকান্দার উসমানের সামনে পরিবেশন করল। একটু আগেই পরিচারিকা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গিয়েছে।

: 'এজন্যই আমি সবসময় বলতাম, অকারণ খরচ করো না। সময় থাকতে তোমার ভাইদের মতো একটা বাড়ি করে নাও।' কথাটি বলতে গিয়ে সিকান্দার উসমানের সেই প্লট ও আংটির কথা মনে পড়ল। 'ওই প্লটটা এখনো থাকলে অন্তত চার-পাঁচ কোটি টাকা হতো। ওই আংটির সেই সময়ের বাজার মূল্যের দ্বিগুণ।' সিকান্দার উসমান একটানে বলে গেলেন। কাপে চা ঢালতে ঢালতে এক মুহূর্তের জন্য ইমামা প্রথমে থমকাল, তারপর বিক্ষিপ্ত হলো।

'কোন আংটির?' ইমামা হতবাক হয়ে সিকান্দার উসমানকে জিজ্ঞেস করল।

: 'যে আংটি তুমি পরে আছ।' সিকান্দার চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন। সালার এখন তার ভুল বুঝতে পারল, এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগেই সিকান্দারকে তার থামানো উচিত ছিল। কিন্তু তির এখন ধনুক ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। ইমামা অবিশ্বাস্য চোখে তার হাতের আংটির দিকে তাকাল। তারপর তাকাল সালারের দিকে, তারপর সিকান্দার উসমানের।

: এটা প্লট বিক্রির টাকায় কেনা?

: 'এক কোটি সাঁইত্রিশ লাখ টাকার। একটু ভাবো, দশ-এগারো বছর আগে যদি ওই প্লট বিক্রি না করত, তাহলে আজ সেটি আরও চার-পাঁচ গুণ বেশি টাকার সম্পদ হতো। দিনে দিনে আংটির তো আর দাম বাড়ে না।' সিকান্দার উসমান ইমামা, সালার কারও দিকেই না তাকিয়ে গড়গড় করে বলে চললেন।

ইমামা নিস্তব্ধ ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সালার এখন দৃষ্টি লোকাতে, চা পানে ব্যস্ত। এটা ছাড়া এই

মুহূর্তে তার আর কিছু করার নেই। কথা বলা শেষ করতেই
রুমে নীরবতা ছেয়ে গেল। সিকান্দারের মনে হলো, কিছু একটা
হয়েছে। চায়ের শেষ ঢোক পান করতে করতে তিনি থামলেন।
তারপর চুপচাপ বসে থাকা ইমামার দিকে তাকালেন। ইমামা
তখন সালারের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। এক
পলকেই তিনি তার নীরবতার কারণ বুঝে গেলেন।

'ইমামা কি এটা এখনো জানে না?' সিকান্দার এখন
অবিশ্বাস্যভরে সালারকে জিজ্ঞেস করছেন। সালার হাতের বই
সামনের টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'এখন তো জেনে
গেলা'

সিকান্দার বুঝে উঠতে পারছেন না, এই গোপন কথা প্রকাশ
করে যে বোকামি করেছেন, কী বলে এখন সেই লজ্জা
লুকাবেন!

ইমামা তার হাত মেলে আংটিটির দিকে তাকাল। তারপর সিকান্দার এবং ক্রমান্বয়ে সালারের দিকে। সালার যে সবসময় বলত, এটি অমূল্য, সে ঠিকই বলত। তার জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, যখন কেবল সালারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করেছে। কোনো শব্দ, কোনো স্বীকারোক্তি ছাড়া, তাকে শুধু জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে করেছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কখনো কখনো পৃথিবীর সমস্ত শব্দ নিছক তুচ্ছ হয়ে যায়, যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি মানুষের হৃদয় থেকে ঝরনার বেগে ফেটে পড়ে। এই মুহূর্তেও তার মন সালারের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। বাচ্চাদের মতো অবুঝ অতল হয়ে। জীবনে সে আর কতবার তাকে এভাবে নির্বাক করে দিবে! ইমামা তার সামনে বসা এই মানুষটির দিকে তাকিয়ে ভাবল; যে মানুষটি তার জীবন-বইয়ের সবচেয়ে সুন্দরতম অধ্যায়। আংটির দাম শুনে, বিস্ময়ে ইমামা হাশেমের শব্দ ফুরিয়ে যায়নি; এটি বরং আংটিদাতা মানুষটির নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেখে ফুরিয়েছে। যে ভালোবাসার সামনে সে এখন

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এমন ভালোবাসার জবাবে সে কী বলবো সালার সিকান্দারকে কীই-বা বলতে পারে সে।

: 'আংটি খুলে ফেলেছ তুমি?' রাতে ইমামার হাতে আংটিটি দেখতে না পেয়ে, জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না সে।

: 'আমি এত বোকা নই যে, এত দামি আংটি পরে চব্বিশ ঘন্টা ঘুরে বেড়াব।' জবাবে ইমামা তাকে বলল। সে তখন ফোনে কোথাও মেসেজ করছে। আর সালার টিভিতে নিউজ চ্যানেল চালু করে বসে আছে। চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে হঠাৎ ইমামার হাতে তার চোখ পড়তেই সে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'এর মূল্য আমাকে বলা উচিত ছিল তোমার।' সালারকে সে বলল।

: 'বললে তুমি সেটা পরতে না। এই ভয়েই তোমাকে বলিনি। আর দেখো, আমার অনুমান ঠিকই ছিল। ওটা তো এখনই তুমি

লকারে রেখে দিবো।" সালার খানিক অসন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় টিভির দিকে চোখ ফেরাল। এক মুহূর্তের জন্য ইমামা নিশ্চুপ হয়ে রইল। তারপর সে বলল, 'তাহলে আর কোথায় রাখব? সাথে নিয়ে ঘোরা তো বোকামি। যদি হারিয়ে যায়? আগেরবার হারিয়ে যে আঘাত পেয়েছি। আর এখন, এখন হারালে তো হাট অ্যাটাকই হয়ে যাবে আমার। এক কোটির চেয়েও বেশি দামি আংটি।'

: 'প্রায় সোয়া দুই কোটি।' সালার টিভিতে চোখ জমিয়ে বিড়বিড় করে বলল। ইমামা ঠিক বুঝতে পারল না।

: কী?

এর বর্তমান বাজারমূল্য।' সালার একই ভঙ্গিতে তার দিকে না ফিরেই উত্তর করল।

: 'এজন্যই তো পরছি না...। তাছাড়া এটা বোকামি ছিল তোমার।' সে একই নিশ্বাসে খানিক বিরতি নিয়ে বলল।

: 'কী?' সালার এবার তার দিকে তাকাল।

-একটা প্লট বিক্রি করে আংটি কেনা, আর সেটাও এত দামি। তোমার জায়গায়। আমি হলে, কখনোই এটা কিনতাম না।

- 'এজন্যই তুমি আমার জায়গায় নেই, ইমামা।' সালার নিজেকে জাহির করে বলল। ইমামা লজ্জিত হলো, কিন্তু তা প্রকাশ করল না।

: 'সেই প্লটটি এখনো থাকলে তা বিক্রি করে এখন বাড়ি বানাতে পারতাম।' ইমামা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল।

: 'তোমার স্বপ্নের কয়েক একরের বিস্তৃত বাড়ি এই কয়েক কোটিতেই হয়ে যেত?'

সালার এখন তাকে খোঁচানোর ভঙ্গিতে কিছু মনে করিয়ে দিতে চাইল। আর হঠাৎই ইমামার সেই ফ্র্যাগবুকের কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে সে তার স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে শত শত আকিবুকি করেছিল। শুধু বাড়ির নকশাই নয়, রুমগুলোর কালার, এমনকি ভেতরের খুঁটিনাটি সাজসজ্জাও। সেই ফ্র্যাগবুকটা এখন সিকান্দার উসমানের বাড়ির উপরতলার সেটাররুমে অসংখ্য জিনিসপত্রের সঙ্গে কোথাও চাপা পড়ে আছে। দশ বছর আগে আমেরিকায় যাওয়ার পরও সেটি তার সাথেই ছিল। কিন্তু সেখান থেকে কঙ্গো যাওয়ার আগে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে তা পাকিস্তানের রেখে গিয়েছিল। ফ্র্যাগবুকটি রক্ষা পাবে, এটি হয়তো তার ভাগ্যে ছিল। আর নয়তো কঙ্গো নিয়ে গেলে, ওখানে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে এটিও পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

: 'বাহ! কীসের কথা মনে করিয়ে দিলে আমাকে! দাঁড়াও! আমি তো কালই সেই ফ্র্যাগবুক খুঁজে বের করছি। অনেকদিন হয়েছে দেখি না। তাতে নতুন কিছু যোগও করা হয় না।'



ইমামার মন হুট করে আংটি থেকে সরে বাড়ির দিকে চলে এলো। জানি না কী হলো, টিভি দেখতে দেখতে সালারেরও তখন আমেরিকায় কেনা বাড়ির কথা মনে পড়ল। সেই বাড়ি কিনে বিক্রিও করে দিয়েছিল, তা সে ইমামাকে কখনো বলেওনি।

: 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাই?' সালার রিমোট চেপে টিভির সাউন্ড অফ করে, সামনের টেবিল থেকে ল্যাপটপ হাতে নিল।

'কী?' ইমামা পুনরায় তার ফোনের দিকে মনোযোগী হতে হতে রমকাল। সাধারণ ল্যাপটপ খুলে গ্যালারিতে গিয়ে বাড়ির ছবি খুঁজতে লাগল। কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজির পর তা স্ক্রিনে ভেসে উঠল।

: 'এটা কী?' একের পর এক ভেসে ওঠা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইমামা, সালারের দিকে ফিরল।

: একটি বাড়ি, একটি হৃদ, তার পাশে বিস্তৃত লন।

ইমামা তার কথায় হাসল।

: তা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কার বাড়ি? আর আমাকে কেন দেখাচ্ছ?

: 'তুমি কি আগে কখনো এই ছবিগুলো দেখেছ?' সালার এক মুহূর্ত থেমে তাকে জিজ্ঞেস করল।

'না, কেন?' তার প্রশ্নে ইমামা খানিক অবাক হয়ে বলল।

: 'হামিনের জন্মের পর, আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরে তোমার কাছে এসেছিলাম, সেই রাতে তুমি স্বপ্নে একটি বাড়ি দেখেছিলে। সেই বাড়িটি কি এমন ছিল? সেই স্বপ্নের কথা তোমার মনে আছে না?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, মনে আছে।' ইমামা এক মুহূর্ত থমকাল। 'কিন্তু সেই বাড়িটি। এমন ছিল না। সেই হৃদও এমন নয়।' ইমামা যেন তার স্মৃতিতে জোর দিয়ে মনে করার চেষ্টা করল। 'স্বপ্ন হয়তো পুরোনো, কিন্তু কল্পনা কখনো পুরোনো হয় না।'

এটা বলে ইমামা যেন সালারের মনের অপরাধবোধ নিঃশেষ করে দিল।

: 'কেন? তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ এসব? আর এটা কার বাড়ি?' ইমামা এবার অস্থির হলো।

: 'তোমার জন্য কিনেছিলাম।' বলতে বলতে সালার আবারও ছবিগুলো দেখতে লাগল। তার কথায় ইমামা যেন হৌচট খেলো।

: আমার জন্য? মানে কী?

: 'হ্যাঁ, তোমার জন্য আমেরিকায় মর্টগেজ করেছিলাম। তোমার জন্মদিনে গিফট করে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...' সালার এখন ছবিগুলো দেখতে দেখতে শেষ ছবিতে গিয়ে থামল।

: 'কিন্তু কী...?' সে চুপ হতেই ইমামা জিজ্ঞেস করল।

: 'কিন্তু সেটা আমি কঙ্গো যাওয়ার আগেই পুনরায় বিক্রি করে দিয়েছিলাম।' সালার ছবির ফোল্ডার অফ করে, সেটা ডিলেট করতে করতে বলল। 'সুদের টাকায় তো আমি দুনিয়াতে বাড়ি কিনতেই পারতাম, জান্নাতে বাড়ি পেতাম না।' সালার ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে ইমামার দিকে তাকাল। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসল। লজ্জা, অনুতাপ, অসহায়ত্ব সবকিছুই ছিল সেই হাসিতে। এমন যেন কেউ আত্মসমর্পণ করছে।

- "তুমি কিনে নিলেও আমি কখনো সেই বাড়িতে যেতাম না। সারা জীবনে তোমার কাছে কেবল একটি বাড়িই চেয়েছি। সেটাও হারাম টাকায় বানিয়ে দিতে আমাকে?" ইমামা গম্ভীরভাবে বলল।

: 'আমি তোমার স্বপ্নের বাড়ি বানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। হ্রদের তীরে, গেজেবো-ওয়ালা সামার হাউস। আর সেটা খুব দ্রুতই বানাতে চাচ্ছি, বৃদ্ধ হওয়ার আগেই।' বলতে বলতে সালার ল্যাপটপ বন্ধ করে ফেলল। ইমানা মাথা নাড়ল।

: 'তুমি সত্যিই বোকা। আমার স্বপ্নের বাড়ির ভিত্তি হবে হারাম টাকায়, এই ইচ্ছে আমি কখনো করিনি। একর-একর জমির বাড়ির কথা তোমাকে বলেছিলাম, কিন্তু সেই সাথে তো আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তা পূর্ণ করেন এবং আমাদের সামর্থ্য দেন। আমি তো তোমাকে কখনো বলিনি যে, এত এত ইনকাম করো, এ বছরেই বাড়ি করে দাও। এত বছরে

আমি কি কখনো তোমার কাছে জেদ করেছি যে, এ বছরই আমাকে বাড়ি করে দাও? কখনো মনে করাইওনি তোমাকে। তাহলে সেই বাড়ির জন্য মটগেজ করার এত তাড়া কেন ছিল?" ইমামার খুব আফসোস হতে লাগল।

: 'তুমি কখনো আমাকে বলোনি। আমাকে সুরণ করিয়েও দাওনি। কিন্তু আমি তো জানতাম যে, এটা তোমার ইচ্ছে। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমার সেই ইচ্ছে পূরণ করতে। তুমি তো শুধু এই একটি জিনিসই চেয়েছিলে আমার কাছে, তাই...' সালার। তাকে বলে চলল। ইমামা হেসে উঠল।

: 'তুমি স্বপ্ন দেখছ সুদমুক্ত এক নিখুঁত ইসলামি অর্থব্যবস্থার, যা একদিন সারা দুনিয়ায় চালু হবে। আর আমি স্বপ্ন দেখি, এক একর জমির ওপর নির্মিত বিস্তৃত একটি বাড়ির, হালাল পয়সায় নির্মিত এক বাড়ি। এখন তোমার স্বপ্ন কেবল আল্লাহ তাআলাই পূরণ করতে পারেন। আর আমার স্বপ্নও তিনিই। তাই একে

আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দেই। তাছাড়া আমি ভাবছি যে, ওই আংটিটি বিক্রি করে কোনো একটি প্লট কিনে রেখে দিতে পারি।

সালার প্রচণ্ড অভিমানে তার কথা থামিয়ে দিল।

: ওটা তুমি বিক্রি করে দিবে?

ইমামা হেসে উঠল।

: না, তোমার কি মনে হয় আমি ওটা বিক্রি করতে পারি?

: 'হ্যাঁ' সালার সেই একই অভিমানী সুরে বলল। ইমামা আবারও হেসে উঠল।

: তুমি কি জানো, পুরো দুনিয়ায় কেবল একজন পুরুষই আছে, যে আমার জন্য এমন একটি আংটি কিনতে পারে!

: 'এখন কি তুমি কান্না করে আমাকে আবেগী করে দেবে?'
সালার তার চোখ টলমল করতে দেখে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা
নিল। তাকে থামাল। 'এই আংটি অমূল্য। আর তুমিও অমূল্য।'
সালার ঠিকই আঁচ করেছিল। ইমামা এখন কাঁদতে শুরু
করেছে। সালার তার হাত ধরল।

: একটা কথা শুনবে?

: কী?

: ওটা হাতে পরে নাও।

'হারিয়ে যাবে।' সে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

: 'আমি আবার এনে দেব।' সালার তার অশ্রু মুছল।

'তোমার কাছে এখন বিক্রি করার মতো আর কিছুই নেই'
কান্নার মাঝেও ইমামা বুদ্ধিমত্তা দেখাল। সালার হেসে উঠল।

: তুমি কিন্তু আমাকে আন্ডার-এস্টিমেট করছ। দাম দিচ্ছ না।

সালার আর কিছু বলার আগেই বাইরের ম্যাট্রেসে শোয়া হামিন
হঠাৎ জেগে উঠল। দুজনেই একসঙ্গে তার দিকে তাকাল।
হামিন আধো ঘুমে কিছু একটা বকবক করছে।

: 'এ আবার কী বলছে?' সালার অবাক হলো। এই প্রথম সে
তাকে ঘুমের মধ্যে কথা বলতে দেখছে।

: 'হয়তো তৃপ্ত হয়নি সে। হয়তো তার কোনো আকাঙ্ক্ষার কথা
মনে পড়েছে।' ইমামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হামিনের দিকে যেতে
যেতে বলল। হামিন এখন ম্যাট্রেসে বসে চোখ বন্ধ করে কিছু
বলে যাচ্ছে। যেন কারও সঙ্গে কোনো জরুরি কথা বলছে।
ইমামা তাকে পুনরায় শুইয়ে, হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার

পাশেই আঙুল মুখে পুরে গভীর ঘুমে ডুবে আছে চন্নি। তার ম্যাট্রেস হামিনের ম্যাট্রেসের সাথেই। চন্নির খোসপাঁচড়া না হলে, তাকেও হয়তো হামিনের সঙ্গেই শোয়াত। কেননা, ইমামা তাকে দত্তক সন্তান হিসেবে মেনে নিয়েছে।

: 'সালার, তার ব্যাপারে যাই সিদ্ধান্ত নাও না কেন, জলদিই নাও। হামিন যেভাবে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে-আমি চাচ্ছি না, কিছুদিন তার সঙ্গে থেকে কঙ্গোতে গিয়ে সে কষ্ট পাক।' ইমামা হামিনের পিঠ চাপড়ে, চন্নির গায়ের চাদর ঠিক করতে করতে, সালারকে বলল।

: 'সকালে সিদ্ধান্ত নাও, তাকে কোথায় দিবো। তারপর সেখানেই দিয়ে আসব। যে দুচারটি প্রতিষ্ঠান আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে, সেগুলোর তথ্য নিয়ে এসেছি। বিছানার দিকে যেতে যেতে সালার যে কাজটিকে এতটা সহজ মনে করে ইমামাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তা মূলত এতটা সহজ প্রমাণিত হয়নি।

পরের দিন তারা চন্ডিকে রেখে আসতে চারটি প্রতিষ্ঠানে গেল। দুটি প্রতিষ্ঠান যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া তাকে রাখতে সম্মত হলো না। আর যে দুটি প্রতিষ্ঠান রাখতে সম্মত হলো, তাদের প্রতিষ্ঠান দেখে সালারের পছন্দ হলো না।

সন্ধ্যায় তারা চন্ডিকে নিয়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে এলো। তাকে দেখে হামিনের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল। সকালেও সে বহু কষ্টে তাকে বিদায় জানিয়েছিল, আর এখন তার ফিরে আসাটা যেন এক বড় সুসংবাদ। চন্ডিও তাকে দেখে এমনটাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দুদিন যাবৎ চন্ডি মুখে কিছু না বললেও, তার চোখের চমক, মুখের হাসি ও খিলখিল খুশিই বলে দিচ্ছে, হামিনকে দেখে সেও অনেক উচ্ছ্বাসিত।

এরপর কয়েক দিন সালার চন্ডির অভিভাবকত্ব নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করল। তার জন্ম ও জন্ম-সংক্রান্ত কাগজপত্র জোগাড় করতে চেষ্টা চালাতে লাগল। এই কয়েক দিনের

দৌড়ঝাঁপের মাঝেই হামিন চন্নির ব্যাপারে একটি সত্য টের পেল-চন্নি আসলে বোবা। কারণ, গত তিন-চার দিন সে কোনো কথাই বলেনি; প্রয়োজনে শুধু গলা থেকে কিছু অস্পষ্ট শব্দ বের করেছিল, আর সেগুলোও ছিল খুব সীমিত, উউউ, আআআ এগুলোতেই সীমাবদ্ধ। এটি ছিল এমন এক সত্য, যা ইমামা ও সালার; দুজনকেই গভীরভাবে নাড়িয়ে দিল।

dumb. বোবা। ইমামার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এটা।

: 'Mummy, she is dumb. মাম্মি, ও বোবা!' হামিন তার কথা জারি রেখে বলে, 'আমার পুরো বিশ্বাস, সে বোবা।' হামিন সেদিন চন্নির ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি দিল, যা সে তার ধারাবাহিক নীরবতা দেখে বুঝেছিল।

: 'না, শুনতে তো পাচ্ছে।' ইমামা চন্নির সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করে এই সিদ্ধান্তে এলো। ইমামার প্রতিটি শব্দেই সে সাড়া দিচ্ছিল।

- 'মান্নি, এসব কিছু না।' মায়ের আশ্বাসে হামিন একটুও সন্তুষ্ট হলো না। তার মনে হচ্ছিল, তার উদ্ঘাটনই সত্যি এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

"The most important thing is to talk and she can't talk, সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো কথা বলা, আর সে তো কথা বলতেই পারে না।" চন্নির অক্ষমতার কথা বলে তার চোখে যতটা সম্ভব বেদনা আর অনুশোচনার ছাপ ফুটিয়ে তুলল সে।

"The most important thing is to listen. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শোনা।" বড়ই ভুল জায়গায় ইমামা তার ছেলেকে নসিহত করার চেষ্টা করল। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সে যেন মায়ের কথাটি নিয়ে ভাবতে থাকল। তারপর বলল, 'dont think so.... There are so many things which can listen, but only few can talk. আমার তা মনে হয়

না। দুনিয়াতে এমন অনেক জিনিসই আছে, যেগুলো শুনতে পারে, কিন্তু বলতে পারে কেবল কিছুসংখ্যক।

মুহাম্মদ হামিন সিকান্দারের বুদ্ধিমত্তা সব সময়ের মতো ইমামাকে ধরাশায়ী করল। সে এখন ওখানে বিদ্যমান ওই সমস্ত জিনিস মাকে গুনে গুনে বলতে থাকল, যেগুলো শুনতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। আর সেগুলোর মধ্যে হামিন চন্নি ও তার পুতুলটিকেও অন্তর্ভুক্ত করল। হাত জোড় করে ইমামা তাকে থামতে বলল। সে যেন এক জীবন্ত ডিকশনারি। যে ডিকশনারি হাঁটে-চলে, ঘুরেফিরে। যে শব্দই শোনে, মাথায় যেন সেটা হুবহু রেকর্ড করে রাখে। তারপর সেটা যেকোনো সময় হুবহু বলতেও পারে। ব্যস, একবার শুনতে পারলেই হয়েছে তার।

চন্নির ব্যাপারে তার এই পর্যবেক্ষণ ইমামার কাছে প্রথমে বাচ্চামো-বোকামি মনে হয়েছিল। সে ভেবেছিল, ছুট করে নতুন পরিবেশে চলে আসায়, মানিয়ে নিতে সময় লাগছে

বলেই কথা বলছে না। বাহ্যত তাকে খুব শান্ত ও নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার জন্মতারিখ জানার পর, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে গেল যে, দেড় বছরের চন্নি এতদিনে একটি শব্দও বলেনি। ইমামা সাত-আট মাস বয়সেই বাচ্চাদের ভাঙাচোরা কথা বলতে দেখে আসছে। কিন্তু তার সত্যিই জানা ছিল না, কেউ যখন কারও নবম সন্তান হয়, আর তাদের ঘরে অভাব-অনটন, ক্ষুধা লেগেই থাকে, হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জীবন জাহান্নাম হয়ে যায়, সেই পরিবেশে থেকে দেখতে শেখা, কথা বলতে শেখা সত্যিই এক বড় সংগ্রাম হয়ে যায়। আর এই সংগ্রাম মানুষ শৈশব থেকে করতে পারে না। সেই জায়গায় চন্নির সবচেয়ে বড় সফলতা হলো, কারও হাত না ধরেই সে নিজে নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। কথা বলা তো অন্য একটি সংগ্রাম। সে বোবা নয়; তবে এখানে আসার আগে সে কোনো শব্দ পুরোপুরি উচ্চারণ করতে শেখেনি। এদিকে এই নতুন পরিবেশে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশু, তার সঙ্গী শিশুকে কোনো বয়স্ক মানুষের তুলনায় অধিক ভালো করে বুঝে উঠছে।

Oh my God! She can talk. ও আল্লাহ! সে তো কথা বলতে পারে।" সালারের দিকে দৌড়াতে গিয়ে হামিনের পায়ে যেন ব্রেক লেগে গেল। সে তার বড় বড় চোখ গোল গোল করে চন্নির দিকে তাকিয়ে রইল। এদিকে চন্নি সালারের পা জড়িয়ে ধরে ছিল। সালাার তখন ইনাযাকে কোলে নিয়ে ছিল, আর চন্নি তার পা জাপটে ধরে, মুখ উচিয়ে বা...বা...বা...বলেই চলছে। তার চোখগুলো চকচক করছে। অ্যালার্জির শুকনো দাগে ভরা মুখ, মাথায় নতুন চুলের হালকা ভাঁজ, সুস্থ-সবল চেহারা; এ সেই মেয়ে নয়, যাকে সে এক মাস আগে মুরগির পাশে নোংরা দানা খেতে দেখেছিল। চন্নি তখন দুই হাত মেলে সালারের দিকে ফিরে এমনভাবে নাড়াতে শুরু করল, যেন সালাার তাকেও ইনাযার মতো কোলে তুলে নিবে। বাবার স্নেহ বলতে যদি কোনো জিনিস থেকে থাকে, তাহলে সালাার তখন চন্নির প্রতি তাই অনুভব করছিল। কিন্তু কোন সম্পর্কের টানে? তা সে নিজেও বুঝতে পারছিল না। সে কখনো বুঝবে না যে, কিছু

সম্পর্ক রক্তের হয় না, ভাগ্যের হয়। সালার সিকান্দার ও তার পরিবার ভাগ্যক্রমে চন্নিকে পেয়েছে।

সালার ইনায়াকে নিচে নামিয়ে, পায়ে জড়ানো চন্নিকে কোলে তুলে নিল। চন্নি খিলখিল করে হেসে উঠল। ইনায়ার মতো সেও একে একে সালারের দুই গালে চুমু খেয়ে তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, যেন সে আর নামতে চাচ্ছে না। আর তখনই সালার বুঝতে পারল, চন্নি থেকে আলাদা হওয়া সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কীভাবে যে সে তাদের ঘর ও জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, হামিন ছাড়া তাদের কেউই তা বুঝতে পারেনি। কেননা, সে দিনে প্রায় তিনশবার ঘোষণা করত, 'That he finally has a baby sister, অবশেষে তার একটা বোন হয়েছে।' জিবরিলের মাধ্যমেই চন্নি এই নতুন পরিচয় পেয়েছে। টানা কয়েকদিন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অবশেষে জিবরিল এটি মানতে বাধ্য করেছে যে, চন্নিকে সে দত্তক নিয়ে নিজের সন্তান নয়; বরং বোন বানাতে পারে, 'বেবি সিস্টার'।

আর এখন হামিনের সেই ছোট 'বেবি সিস্টার'কে কোনো অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসা, সালারের জন্য অদ্ভুত ঝুঁকির খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই দেড় বছরের মেয়েটি তাকে এক অদ্ভুত সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কঙ্গোতে ফিরে যাওয়ার আগে সালার চন্নির ব্যাপারে যত ভাবনা আছে, সবগুলো ভাবনাই ইমামাকে বলতে লাগল আর নিজেই সেগুলো নাকচ করে দিতে থাকল। অবশেষে ইমামা বলেই ফেলল, 'তুমি কি তাকে দত্তক নিতে চাও?'

অসংখ্য সম্ভাবনার ভিড়ে এটিই ছিল একমাত্র সম্ভাবনা, যা নাকচ করে দেওয়ার মতো সাহস সালারের হলো না। শেষমেশ ইমামার মুখে এই সম্ভাবনার কথা শুনে, সে আর চুপ থাকতে পারল না।

হ্যাঁ, কিন্তু তা তোমার অমতে করতে পারব না। যেই দত্তক নিক, পালতে তো হবে তোমাকেই। তুমি কি পালতে পারবে?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

'এতদিন কে পালন করেছে?' ইমামা যেন এক অদ্ভুত উত্তর দিয়ে তাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিল।

'তার কপালে বেঁচে থাকা ছিল বলেই সে বেঁচে আছে। এখন তার ভাগ্যে যদি আমাদের ঘরেই বেড়ে ওঠা থেকে থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে তা আটকাব? হয়তো এতেই তার ও আমাদের কল্যাণ লুকিয়ে আছে।' ইমামা সালারকে বলল। আর যা সে বলেনি, তা হলো, চন্নির পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলে তার মনে যে অপরাধবোধ বাসা বেঁধেছে, সালার মূলত তা-ই দূর করতে চাচ্ছে। এই বাচ্চাটির শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালনের দায়িত্ব যাতে তার অপরাধের কাফফারা হয়, তাহলে ইমামা হাশেম তার স্বামীর এই কাফফারা আদায় করতে প্রস্তুত।

অবশেষে সালার তাকে দত্তক নিয়ে নিজের বংশনামও দিয়ে দেয়। তাকে দত্তক নেওয়ার সময় সালারের ভাবনায় আসেনি



যে, এটি কোনো কাফফারা নয়, বরং অন্য কিছু। 'রাইসা সালার' তার ও তার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের ভাগ্যে কেবল সুখই ছিল। সে ছিল এক হুমা পাখি। সৌভাগ্যের এই পাখি যার ভাগ্যে এসেই জুটত, তাকেই বাদশাহ বানিয়ে দিত। আর এই হুমা পাখির ভাগ্যেও কোনো বাদশাহের রানি হওয়াই লেখা ছিল।

কঙ্গোর শেষ বছরটি বহু দিক থেকেই সালার সিকান্দারের জন্য অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ সময়। শেষ বছরে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমস্ত কাজবাজ গুটিয়ে নিচ্ছে সে। এখন তার অর্ধেক দিনরাত দৌড়াদৌড়িতে প্লেনেই কেটে যায়। চাকরির মেয়াদ শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ বাকি। তখন তাকে হঠাৎ ওয়াশিংটনে ডাকল। আমেরিকান সরকার তাকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের পদ অফার করল। গত এক বছর ধরে তাকে সরাসরি এই অফার করে আসছে। একে সে সবসময় লোভনীয় গোলাপ মনে করে এসেছে, যার মাঝে লুকিয়ে আছে ক্ষতিকর কাঁটা। কিন্তু এখন তা একটি দৃঢ় বাস্তবতা হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এটি ফিরিয়ে দেওয়া ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ সে মনে

করেছে। এটি অনেক বড় একটি প্রলোভন। যে প্রকল্পে সে কাজ করেছে, সেটি থেকে তার চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দিতে এখনো কিছুটা সময় বাকি।

বিশ্বব্যাংকের প্রথম, সবচেয়ে কম বয়সি মুসলিম প্রেসিডেন্ট হিসেবে, বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এই পদের জন্য যে-কেউ, যেকোনো কিছু করতে রাজি হতো। কারণ, করলেই সে ইতিহাসের অংশ হয়ে যেত। একটি পদ গ্রহণ করে সালার সিকান্দার তার জীবনের এই জায়গায় এসে বুঝতে পারছে, লোভ থেকে বেঁচে থাকা অতটা সহজ নয়, যতটা সহজ সে মনে করত।

কঙ্গো ফিরে সবার আগে এই অফারের কথা সে ইমামাকে জানাল। তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে, তা শুনে ইমামার মনে খটকা লাগল।

: 'তো?' সালারকে সে জিজ্ঞেস করল।



: 'তো কী?' সালারও একই দ্বারে বলল। একটু আগেই তারা ডিনার করেছে। এখনো ডিনার টেবিলেই বসে আছে। সালার রাতে দেরি করে ফিরেছিল। তবু সব সময়ের মতোই ঘুম তার চোখ থেকে সহস্র মাইল দূরে।

: 'তাদেরকে কী বললে তুমি?' ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'ভাবার জন্য কিছুটা সময় নিয়েছি।' বলতে বলতে সালার এক চামচ হালুয়া নিল। তার উত্তর শুনে ইমামা যেন খুব অসন্তুষ্ট হলো।

: 'ভাবার জন্য সময় নিয়েছ? তুমি না করে আসোনি?' সে যেন সালারকে মনে করিয়ে দিল।

: 'না করেছিলাম, তারা তা মানেনি। আমাকে ভাবতে বলেছে।'
আরেক চামচ হালুয়া নিয়ে প্লেটটি ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে
দিল।

'তুমি কী ভাবছ, সালার?' ইমামা এখনো মিষ্টি খায়নি। তার প্লেট
এখনো আগের মতোই পড়ে আছে। সালার তাকে দেখতে
থাকল। দুজনেই হাসিমুখে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে
রইল। তখন হঠাৎ ইমামার অসন্তুষ্টি ও অভিমান যেন আরও
বেড়ে গেল। সে সালারের চেহারায এমন কিছু দেখতে পেল,
যা তার পছন্দ হলো না।

: 'এই অফার তুমি গ্রহণ করতে চাও?' সালারকে সে সরাসরি
প্রশ্ন করল।

: 'করা উচিত কি?' জবাবে সালার উলটো প্রশ্ন করল।

: 'না।' এতটা চূড়ান্ত ও স্পষ্ট জবাব এলো যে, সালার কিছু বলতেই পারল না। সর্বপ্রথম আমেরিকায় এসে বিশ্বব্যাংকে চাকরি পাওয়ার সময় ইমামা যে উত্তর দিয়েছিল, সালার আশা করছিল ইমামা এখনো সেই উত্তরই দেবে। আর সেটাই দিয়েছে।

: 'তোমার কি মনে নেই, তুমি কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছ? এবং কী করতে চাও?' ইমামা যেন তাকে মনে করিয়ে দিল।

: একদম মনে আছে।

: 'তাহলে সুশ্চিন্তা কী নিয়ে?' ইমামা জিজ্ঞেস করল।

সুশ্চিন্তা নয়। শুধু ভাবছি, আমার প্রকল্পকে কার্যকরীভাবে দুনিয়ার সামনে আনার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করলে, আমার সেই কাজে অনেক উপকার হবে। এতে আমার ও আমার প্রকল্পের মূল্যায়ন

বেড়ে যাবে। বহু কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে। এমনকি অনেক জায়গায় আমাকে আমাদের সেই প্রকল্পের পরিচয় করিয়ে দিতেও হবে না। আমি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে, সবাই এমনি এমনি তা চিনে যাবে।

ইমামা তাকে থামাল। 'শুধু এই জন্যই।' ইমামা তাকে দেখতে লাগল। সে পরিপূর্ণ চূড়ান্ত ভঙ্গিতে সালারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইমামা পৃথিবীর সেই কয়েকজন মানুষের একজন, যার সামনে সালার মিথ্যে বলতে পারে না। চেষ্টা করেও পারে না। কারণ, সে তার মিথ্যে ধরে ফেলে। কে জানে, এটা কি স্ত্রীদের বিশেষ গুণ নাকি শুধু ইমামার?

- 'বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে একজন মুসলিমের নিয়োগ তো বিশেষ এক সম্মানও।' সালার এবার শান্ত গলায় সেই প্রলোভনটি তুলে ধরল।

: 'বিশ্বব্যাংক কী সালার? এটা কি কোনো জিন? হাওয়া? কী এটা? কিছুই না। সুদি কারবারি একটি জাতিসংঘ। এছাড়া আর কী? সুদি কারবারের নেতৃত্ব একজন মুসলমানের হাতে, এতে কী সম্মান আছে? এটা কোনো সম্মান নয়, লজ্জায় ডুবে মরার মতো বিষয়।' ইমামা যেন তাকে আয়না নয়, জুতা দেখিয়ে দিল। সে বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। আর ভীষণ শান্তভাবে দেখে যাচ্ছে যে, এই প্রলোভন তার স্বামীর পায়ে শিকল হয়ে যাচ্ছে।

: 'যে প্রকল্প নিয়ে তুমি কাজ করছ, তাতে আল্লাহ তাআলা এই সফলতা দেবেন। তোমার জ্ঞান, তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার দক্ষতা কিংবা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পরিচয় তোমাকে সফলতা দিবে না। তোমার বয়স এখন চল্লিশের উপরে। ছেলেরা বড় হচ্ছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ বছর বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট থাকলে তোমার বয়স তখন সাতচল্লিশ হয়ে যাবে। এরপর তুমি একদিন ইসলামি অর্থব্যবস্থা তৈরির কাজ শুরু করবে? ততদিনে তুমি তোমার সমস্ত যৌবন বিশ্বব্যাংকে শেষ করে দিবে। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি মজা করছ? মজা করছ, নিজের

সাথে। যারা তোমার মাধ্যমে এই বিপ্লব দেখতে চাচ্ছে, তাদের সাথে।" বলতে বলতে ইমামা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। আর প্লেট গোটাতে লাগল।

: 'তুমি জানো ইমামা? আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী?' সালার সিকান্দার হুট করে তাকে বলল। ইমামা ওভাবেই প্লেট গোটাতে থাকল। সালারের কোনো কথায়, তার আর কোনো আগ্রহ নেই। সে এখন এতটাই হতাশ হয়ে আছে।

: 'তোমার এই নির্দয় স্পষ্টভাষিতা, যা আমাকে আমার ক্ষমতার দৌড় দেখিয়ে দেয়। আমার কথায় তুমি প্রভাবিত হও না কেন?' সালারের কথার স্বীকারোক্তি, অসহায়ত্ব, প্রশংসা, লজ্জা এবং সরলতা; সবই ছিল। ইমামা এবার যেনে থাকে দেখতে লাগল।

: 'আমি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলাম, লোভে পড়েছিলাম, কিন্তু পথভ্রষ্ট হইনি। তুমি ঠিকই বলেছ, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। বুঝেগুনে, ভেবেচিন্তে, ধৈর্য ধরে কাছ করা উচিত। কিন্তু দেরি

করা যাবে না।" সালার এখন তার স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যা দিচ্ছে।
ইমামার চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

: 'তোমার কথায় প্রভাবিত হাতে, তোমার গুণগান গাইতে
আমাকে সৃষ্টিই করা হয়নি, সালার তোমার প্রশংসার জন্য সারা
দুনিয়া আছে। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার
জন্য আমাকে তোমার সঙ্গী বানানো হয়েছে। তাই আমি ছাড়া
এটা অন্য কেউ করতে পারবে না।' ইমামা এখন মুচকি হেসে
তাকে বলে চলল।

: 'আমি জানি, আর এর মূল্যায়নও আমি করি।' সালার পুনরায়
স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। যে সিদ্ধান্ত তার কাছে কঠিন মনে হয়েছিল,
তার স্ত্রী তা অসম্ভব সহজ করে দিয়েছে। সালার সহজতা চায়,
আর ইমামা চায় জটিলতা। কেননা, জটিলতার ভেতরেই
রয়েছে সহজতা।

অবশেষে খবরটি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্যে চলে এলো। বিশ্বব্যাংকের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে সালার সিকান্দারের নাম বহু জায়গায় আলোচনা হতে লাগল। তার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য এটি একটি গর্বের বিষয় হয়ে উঠল। সালার সিকান্দার এই পদ গ্রহণ করেনি, তাদেরকে এটা বলা সত্ত্বেও, তা তারা বিশ্বাস করল না। কারণ, কেউই এমন একটি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারে না, কিংবা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

সিকান্দার উসমান তার এই সিদ্ধান্তে একদমই সন্তুষ্ট হননি। বিশ্বব্যাংকের সর্বোচ্চ পদ ছেড়ে, নিজেই কিছু একটা করতে চাচ্ছে, তা তিনি মানতে পারছেন না। সালারের সেই নিজেই 'কিছু একটা'র নামও তিনি জানতে চাইলেন না। তিনি শুধু ভাবছিলেন, সালার বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কেন হতে চাচ্ছে না। একজন সাধারণ পিতার মতো তিনিও তার সন্তানের জন্য জাগতিক সাফল্য চাচ্ছেন। আর সেই সাফল্য তো হাতের নাগালেই রয়েছে, শুধু হাত বাড়িয়ে নিলেই হয়।



: 'তুমি আসলেই একটা বুদ্ধ আর বুদ্ধ হয়েই থাকবো' তার অফিসের পক্ষ থেকে মিডিয়ায় একটি সংবাদ দেখে সিকান্দার উসমান প্রচণ্ড মনঃক্ষুব্ধ হয়ে বললেন। সংবাদে বলা হয়েছে, সালার সিকান্দার তার ব্যক্তিগত কারণে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্সি পদ গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। তিনি কেবল আফ্রিকায় তার ভাইস প্রেসিডেন্টের মেয়াদ পূর্ণ করতে চান।

সালার কদিনের জন্য পাকিস্তানে এসেছে। সিকান্দার উসমান ভাবলেন, তাকে একবার বোঝানো যাক। বোঝাতে গিয়ে তিনি সালারের পদ না গ্রহণ করার কারণ শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তার এই সন্তান যেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা আর অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করার জন্য দুনিয়াতে এসেছে।

: 'তুমি বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছ না! যে পদ তোমাকে প্লেটে সাজিয়ে। তোমার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে।' সিকান্দার তিরস্কার করে তাকে বলতে থাকলেন।

এদিকে সালার তখন সামনের সোফায় বসে বাপের নিন্দামন্দ শুনে যাচ্ছে।

: 'তুমি সুদমুক্ত একটি ইসলামি অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্নে, খেয়ালি পোলাও খেয়ে যাচ্ছে।' তিনি আসলে এতটা কঠিন হতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু হয়ে গেছেন। 'সারা দুনিয়ায় তোমার মতো হাজারো মানুষ খেয়ালি এই পোলাও পাকাচ্ছে তো পাকাচ্ছেই। আগেও কেউ কিছু করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কিছু হবে না।' সালারকে তিনি এসব এমনভাবে বোঝাচ্ছেন যে, পৃথিবীর এই পুরোনো ইতিহাস সে যেন জানে না। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কেউ যে কিছু করতে পারেনি, সালার মনে হয় তা দেখেনি। "আমার বিশ্বাস, তোমার এই চিন্তাধারার পেছনে ইমামার হাত রয়েছে। তার সঙ্গে তো পরামর্শ করেছই তুমি, তাই না?" সালারকে তিনি রগে রগে চিনেন। উনার এখন সালারের সঙ্গে সঙ্গে ইমামার ওপরও রাগ হচ্ছে।

: 'সব প্রজন্ম যদি একে খেয়ালি পোলাও ভেবে এড়িয়ে যায়, তাহলে এটি যুগ যুগ ধরে খেয়ালি পোলাও হয়েই থাকবে; একদম ধরাছোঁয়ার বাইরে। কোনো এক প্রজন্মের, অন্তত কাউকে না কাউকে উঠে দাঁড়াতে হবে, কিছু করতে হবে। শুধু 'হারাম, হারাম' বলে তো আমরা এই সুদি ব্যবস্থায় বেঁচে থাকতে পারি না।' সালারের কথাগুলো হয়তো সিকান্দারের কাছে তিক্ত সত্য মনে হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি সেই সত্য মানতে পারছেন না।

: 'তুমি জানো সালার! এই বর্তমান ব্যবস্থাকে সরানো এত কঠিন কেন?' সিকান্দার উসমান প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে বললেন। 'কারণ, এটি ব্যক্তির তৈরি কোনো ব্যবস্থা নয়, রাষ্ট্রের তৈরি ব্যবস্থা। এবং উন্নত দেশগুলোই এর ব্যবস্থাপক। এ ব্যবস্থাটি ইসলামি ব্যবস্থা না হলেও, এর মাধ্যমে তারা তাদের জনগণকে একটি কল্যাণকর উপায় দিয়ে রেখেছে। তুমি ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো, কিন্তু রাষ্ট্রকে নয়। যতদিন না মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার

চেষ্টা করবে, যতদিন না তারা একটি ইসলামি কল্যাণরাষ্ট্রের
রূপে প্রকাশ পাবে, ততদিন কোথাও কিছুই বদলাবে না। দুনিয়া
যেমন আছে তেমনই থাকবে।

শুধু অর্থব্যবস্থাই নয়, যেকোনো ব্যবস্থাই চলে ক্ষমতার জোরে।
দুর্বলের বুদ্ধিকে কেউ মূল্যায়ন করে না। মুদ্রা চলে শক্তিশালীর,
দুর্বলের নয়। এ লড়াই সুদের বিরুদ্ধে নয়, এ লড়াই জাতির
বিরুদ্ধে জাতির। আমরা মুসলমান-অযোগ্য আর অক্ষম। জাতির
জন্য নয়, কেবল নিজেদের জন্য বাঁচি। তাই আজ আমরা মার
খাচ্ছি। আর যতদিন এভাবে থাকব, ততদিন মার খেয়েই যাব।
ওরা ইহুদি ও নাসারা-এ তাদের উত্থানের যুগ। তারা জানে এবং
তা মানো। জাতির জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করার সাহস রাখে।
তাই তারা রাজত্ব করছে। এবং যতদিন তাদের ভেতরে এই
প্রেরণা থাকবে, ততদিন রাজত্ব করেই যাবে।

আমরা শুধু বদদোয়া দিয়েই কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে
পারব না। আমরা সন্ত্রাসী হয়েও কোনো জাতির কিছু মানুষকে

হত্যা করতে পারি, কিছু অটালিকা ভেঙে ফেলতে পারি, আতঙ্ক ছড়াতে পারি; কিন্তু সারা দুনিয়ায় নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে পশ্চিমাজাতিগুলোর চেয়েও অধিক কর্মঠ হতে হবে। এ লড়াই অনেক কঠিন। এ লড়াই ব্যক্তি করে না, করে জাতি। এবং সেটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে, একা নয়।"

দীর্ঘ বয়ানে সিকান্দার উসমান যা বললেন, একদম সত্যি বললেন। কয়েক বছর আগেও সালার সিকান্দারও এমনটাই ভাবত। তার চিন্তা যদি আজও তেমনই থাকত, তাহলে এখন সে সিকান্দারের কথায় সহমত পোষণ করত।

: 'আপনি ঠিকই বলছেন। যতদিন মানুষ কেবল নিজের জন্য বাঁচবে, ততদিন কিছুই বদলাবে না। কিন্তু মানুষ যখন জাতির কথা ভাবতে শুরু করবে, তখন সবকিছু বদলে যাবে।' সিকান্দারকে সে বলল। 'যেসব সমাজ ও জাতির উদাহরণ আপনি দিচ্ছেন, তাদের অসংখ্য মানুষ তাদের জীবন কাটিয়ে

দেয় লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি আর পড়ার টেবিলে। তাদের স্বপ্ন ও সংকল্প, তাদের এই কাজ তাদের জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তাদের কেউই নিজের খ্যাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করে না। আর না তারা কোনো প্রতিষ্ঠাতা বা বিজ্ঞানী হয়ে ইতিহাসে নিজের নাম লেখাতে চায়। তারা কেবল বর্তমান অবস্থাকে পালটে ভবিষ্যতকে আরও উন্নত করতে চায়। আর আমার ইচ্ছেও সেটাই। নিজের জাতির জন্য আমাকেও একটি চেষ্টা করতে দিন। প্রবন্ধ-নিবন্ধ আর বইপত্র লিখে লিখেই আমি আমার বার্ষিক্য কাটাতে চাই না, পাপা।"

সিকান্দার উসমান অনেকক্ষণ কিছু বলতেই পারলেন না। তার ছেলে তার কথাগুলোকেই দলিল বানিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করছে। আর সব সময়ের মতো এই তর্কে সে-ই জিতে গিয়েছে।

'আমার আগে বিশ্বব্যাংকের কত প্রেসিডেন্ট আসছে-গেছে, কারও নামই হয়তো মনে নেই। বিশ্বব্যাংকের হয়ে তারা কী কী

মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছে, তাও হয়তো কারও মনে নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবে শুধু বিশ্বব্যাপকের নামটুকুই আছে, কোনো কর্মচারী বা যন্ত্রাংশের নাম কখনো মনে থাকে না। আমি এমন কর্মচারী বা যন্ত্রাংশ হয়ে ইতিহাসের গল্প হতে চাই না। আমি একটি চেষ্টা করতে চাই। হয়তো তাতে সফল হব, নয়তো না। কিন্তু নিজের মধ্যে অপরাধবোধটুকু তো আর থাকবে না। এই কষ্টটুকু তো আর থাকবে না যে, সারাটা জীবন আমি সুদি কারবারিদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছি।

সিকান্দার উসমান, সালার সিকান্দারের যুক্তির জবাব কখনোই দিতে পারেননি। যখন সে নবযৌবনে ছিল তখনো না; আর এখনো না। সালাবের যুক্তিগুলো এখন আগের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও ভারী।

: 'ঠিক আছে, তুমি যা করতে চাও, করো।' তিনি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে বললেন। 'তুমি আগে কখনো আমার কথা মানোনি, এখন কীভাবে মানবো। আমার কেবল আফসোস থেকে যাবে যে,

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হলে খুব তাড়াতাড়িই তুমি সফল হতে পারতে। এর চেয়ে বহুগুণ উন্নতি করতে পারতে। তোমার এই মানসিক বাতিক সবসময়ই তোমার পথ আটকে ধরেছে। এটা শুধু তোমার সমস্যা নয়, বেশি বোঝে এমন সব মুসলমানেরই এই সমস্যা। তোমরা সবসময় চূড়ান্ত সীমায় দুলতে থাকো। না নিজেরা শান্তিতে থাকো, আর না তোমাদের সাথের মানুষদের শান্তিতে থাকতে দাও।" খোঁচা দেওয়ার পর এখন তিনি ঐতিহ্যবাহী পিতার মতো ছেলেকে তিরস্কার করছেন। সালার হেসে ফেলল। পিতার হতাশা সে বুঝতে পারছে। সে উনার স্বপ্ন ভেঙে দিচ্ছে।

: 'আমার বিশ্বাস পাপা, আমি যা করতে যাচ্ছি তা সঠিক হবে। এ নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না।' সিকান্দারকে সে আশ্বস্ত করল।

: 'আর তোমার এই বিশ্বাস কেন হলো?' আশ্বস্ত করার পরও সিকান্দার বিদ্রূপ না করে পারলেন না।



: 'কারণ, আপনি জীবনে আমাকে যে যে কাজে বাধা দিয়েছেন, সেটাতেই আমি সফল হয়েছি। আপনার বারণ আমার জন্য গুডলাক চার্ম বা শুভ লক্ষণ।

সিকান্দার উসমান ঠিকই বলে থাকেন, সে আসলেই একটা নির্লজ্জ। কিন্তু এই সেন্স অফ হিউমার সে উনার কাছ থেকেই পেয়েছে। উনার মেজাজ মুহূর্তেই খারাপ হয়ে, মুহূর্তেই ভালো হয়ে গেল। তিনি এবার হেসে উঠলেন।

: দুট্টু কোথাকার!

: 'ধন্যবাদ।' মুচকি হেসে সালার উত্তর করল।

: 'কবে থেকে এই ফ্লু (স্বর-ঠান্ডা)?' ফোরকান সালাবকে জিজ্ঞেস করল। তার প্রায় আট মাস পর দেখা করছে। ডাক্তার সিবতে আলির সঙ্গে দেখা করে সালার এখন ফোরকানের

কাছে এসেছে। দুদিন পর সে কঙ্গোতে ফিরে যাবে। ফোরকান এখন তাকে একদম ডাক্তারদের মতো করে জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে।

: 'এক-দেড় মাসের বেশি হবে। আসে-যায়। মাথাব্যথাও করে। হয়তো কোনো জিনিসে অ্যালার্জি আছে আমার।' সালার উদাসীনভাবে বলল।

: 'কোনো ওষুধ খাচ্ছ?' ফোরকান জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, সেই অ্যান্টিবায়োটিকই। কখনো কাজ হয়, কখনো হয় না।' সালার বলল।

: 'তাহলে তুমি ব্লাড টেস্ট করাও। অন্য কোনো সমস্যা আবার নয়তো।' ফোরকান। এই মুহূর্তে মরেও ভাবতে পারছে না যে, তার এই সমস্যাটি এত বড় কিছু হতে পারে। ফোরকান ভেবেছিল, সাধারণ কোনো সমস্যা হবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে,

তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। পরবর্তী দুদিনে একাধিক টেস্ট করিয়ে রিপোর্ট দেখে ফোরকানের পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা সালারের রিপোর্ট!

: 'আবার টেস্ট লাগবে কেন? কোনো গুরুতর সমস্যা তো নেই আমার। জাস্ট ঠান্ডা-জ্বর। আগেও তো এমন হয়েছে। ব্যস, ঠিক হয়ে যাবো।' সালার আবারও উদাসীনভাবে তার কথা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল।

লাহোরে আজ তার অনেক কাজ জমে আছে। এতসব কাজ ফেলে হসপিটালে গিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা করানো তার জন্য অনেক কঠিন। ফোরকান তাকে বলতে সাহস পাচ্ছে না যে, তার প্রথম টেস্টগুলো বড় একটি সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

: 'এটা জরুরি সালার! এসব কাজবাজ থাকেই। কোনো না কোনোভাবে হয়েই যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। স্বাস্থ্যের

ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই।' ফোরকান তার কথার উত্তরে বলল।

: 'স্বাস্থ্য তো একদম ঠিক আছে, ইয়ার! স্বাস্থ্যের আবার কী হয়েছে? সামান্য একটু জ্বর-ঠান্ডার জন্য আমাকেও তুমি ডাক্তারদের মতো হাসপাতালের খান্দায় ফেলে দিলো' সালার একই ভঙ্গিতে বলল। 'তাছাড়া আমি সামনের মাসেই আমেরিকা যাচ্ছি। ওখানে গিয়েই মেডিকেল চেকআপ করাব। তুমি চিন্তা করো না, সব ঠিক আছে।' সালার এখন তাকে ভোলানোর চেষ্টা করছে। ফোনে কথা বলতে বলতে সালার তাকে জানাল যে, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

: 'সব ঠিক নেই সালার।' অবশেষে ফোরকানের তাকে থামাতে হলো।

: 'মানে কী?' সালার থমকাল।

'আধাঘন্টার ভেতর আমি তোমার কাছে আসছি।' বাড়তি কোনো কথা না বলে ফোন রেখে দিল ফোরকান। তার এমন কথায় সালার চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু সালার একে কেবল একজন ডাক্তারের পেশাদারিত্ব হিসেবেই মনে করল। রোগীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ডাক্তাররা এমন গুরুত্ব দেখায়ই।

: 'এখনই তুমি কোথাও যাচ্ছ না। এই সপ্তাহে আমি তোমার সব পরীক্ষা করাতে চাই। তারপরই তুমি কোথাও যাবে।' ফোরকান কেবল আধাঘন্টার ভেতরে চলেই এলো না, সেই সঙ্গে তাকে ফ্লাইট ক্যানসেল করতেও বলল।

: 'কী সমস্যা ফোরকান? সরাসরি বলছ না কেন আমাকে? কী লুকাচ্ছ তুমি? এত এত পরীক্ষার কী দরকার আমার?' সালারের এবার সত্যিই অস্বস্তি হতে লাগল। ফোরকান বুঝতে পারল, খোলাখুলি কিছু না বলে তাকে পরীক্ষার জন্য রাজি করাতে পারবে না। 'আমি জাস্ট এতটুকু নিশ্চিত হতে চাই যে, এটা

কোনো টিউমার নয়।" এটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম বাক্য, যা বলার জন্য ফোরকান শব্দ জমাতে শুরু করেছে। যেন সে সালারকে নয়, বরং নিজেকেই সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে। মনে মনে দোয়া করছে, রিপোর্ট এবং তার ডাক্তারি অভিজ্ঞতা যা বলছে, তা যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। যেকোনো মূল্যে তা যেন মিথ্যাই হয়।

: 'টিউমার?' সালার অবিশ্বাস্যভাবে বলল।

: 'ব্রেন টিউমার।' ফোরকান তার পরবর্তী দুটি শব্দ বলল। শব্দ দুটি শোনার সাথে সাথে সালারের মাথা ঘুরপাক খেতে লাগল। তার কান যেন শাঁ শাঁ করতে লাগল। মস্তিষ্ক ও অনুভূতি দুটোই একসাথে ঝুন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাস্যভাবে সে ফোরকানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'যে পরীক্ষাগুলো তুমি আমাকে করতে দিয়েছ, এগুলো রিপোর্ট বলছে যে...'। বাক্যটি সালার নিজেও পূর্ণ করতে পারল না। জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকরতম মুহূর্ত এটি। এবং ভয়ংকরই

লাগছে তার কাছে। এই মুহূর্তে সে পাকিস্তানের সেরা একজন অনকোলজিস্টের সামনে বসে আছে। সেই অনকোলজিস্ট ফোরকান যদি এমন কিছু দেখে থাকে, তাহলে তা ভুল হতে পারে না।

: 'ও মাই গড' হামিন ইমামার সঙ্গে স্কুলের করিডরে হাঁটতে হাঁটতে তার বিশেষ স্টাইলে চিৎকার করে তার আনন্দ প্রকাশ করল। বলল, 'Mummy! I have made you so famous. মাম্মি! আমার জন্য আপনি অনেক ফেমাস হয়ে গেলেন॥

ইমামা আজ শিক্ষক-অভিভাবক মিটিংয়ে অংশ নিতে স্কুলে এসেছিল। হামিনের প্রত্যেক শিক্ষক তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলেন। একসময় এই মিটিংয়ে এসে সালার ও ইমামা, জিবরিল ও ইনায়ার কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করত। এখন এই মিটিং ইমামার জন্য এক তেতো বড়ি বা দুধারি তরবারি হয়ে গিয়েছে, যা না চাইতেও এখন তাকে গিলতে হচ্ছে বা তাতে চলতে হচ্ছে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আজও এমনটাই হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকের কাছেই হামিনের একই আমলনামা, 'I am so disappointed. আমি অত্যন্ত হাতশা।'

ইমামা পাশে হাঁটতে থাকা রাইসাকে ডান দিক থেকে বাম দিকে সরিয়ে, হামিনকে তিরস্কার করল। অথচ হামিন খুবই গর্ব বোধ করছে, তার কারণে তার মাম্মির নাম এখন সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

: 'দেখো, রাইসার নামে কারও কোনো অভিযোগ নেই। I am so proud of her. তাকে নিয়ে আমি গর্বিত।' ইমামা তাকে রাইসার তুলনা দিতে লাগল।

: 'I don't think so. আমি তা মনে করি না।' হামিন মায়ের কথায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়েই বলতে শুরু করল, 'Every teacher said that she can't speak well. সব শিক্ষকের একই কথা, রাইসা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না।'



তার বাচালিপনা শুরু হওয়ার আগেই ইমামা তাকে থামানো জরুরি মনে করল।

: 'শিখে ফেলবে, এখন সে অনেক ছোট।' ইমামা রাইসার পক্ষ নিয়ে তাকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু হামিন যা বলছে, তা মিথ্যা নয়। রাইসাকে দত্তক নেওয়ার সময় ইমামা কখনো কল্পনাও করেনি, লালনপালনের চেয়ে, লেখাপড়া শেখানোই হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে তো এমন কিছুই হয়নি। ওরা ছিল জন্মগতভাবেই মেধাবী। মা-বাবা দুই দিক থেকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তরাধিকারী। পড়াশোনা তো তাদের জন্য ডাল-ভাত। কিন্তু রাইসার অবস্থা ভিন্ন। কোনো কিছু চিনতে ও মনে রাখতে তার অনেক সময় লাগে। আল্লাহর শোকর, সে প্রতিবন্ধী নয়। কিংবা অন্য কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যাও তার নেই। কিন্তু সে ছিল ইমামার জন্য এক বিরাট ধৈর্যপরীক্ষা। রাইসার কম বুদ্ধিমত্তার কথা জিবরিল, ইনায়াও বুঝতে পেরেছে। ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে ভীষণ আপন

হয়ে উঠলেও ইমামা বুঝতে শুরু করেছে, সে বাকি তিনজনের থেকে সত্যিই আলাদা।

: 'এবার তোমার বাবা এলে শিক্ষকদের সব কথা তাকে বলে দেবা' একসাথে হাঁটতে হাঁটতে ইমামা তাকে হুঁশিয়ারি দিল।

'My teachers back bite, why do you want to pick a bad habit? উনারা চুগলি করেছে, তাদের এই খারাপ অভ্যাস আপনি কেন নিতে চাচ্ছেন?' সে যেন তার মাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

: 'ওকে, দেখো তাহলো' ইমামা তাকে ধমক দিয়ে সালারকে কল দিতে লাগল। কয়েকবার রিং বাজার পর ফোন রিসিভ হলো। কিন্তু ওপাশে সালার নয়, ফোরকানের গলা শুনতে পেল। ইমামা অবাক হলো।

সালার লাহোরে এসে ব্যস্ততার কারণে তার ফ্লাইটের তারিখ এগিয়ে দিয়েছে। তখন সে ফোরকানের সঙ্গে দেখা করেছে, এটাও সে ইমামাকে জানিয়েছিল। ফোরকান তাকে ফ্লুর জন্য টেস্ট করাতে বলছিল, এগুলোও সে ইমামাকে জানিয়েছে। ইমামাও তখন তাকে ফোরকানের কথা শুনতে পরামর্শ দিয়েছিল।

'কী জানি, ফোরকান আমাকে বলল, আমার মুখের এক পাশ নাকি ফোলা দেখাচ্ছে। আমি বলেছি, ফ্লু সবসময় নাকের এদিক থেকেই হয়, এবারও হয়তো তা-ই হয়েছে। কিন্তু ফোরকান আমাকে সিটিস্ক্যান করতে বলছে। করিয়ে ফেলব, যাতে সে নিশ্চিত হয়। ডাক্তাররা সব আধা পাগল হয়।' সালার ইমামাকে তখন কথাগুলো বলেছিল। পরেরদিন সালার তাকে টেস্ট করার কথাও বলেছিল। কিন্তু রিপোর্টের কথা আর কিছু বলেনি। ইমামা বুঝে নিয়েছিল, সে যেহেতু টেস্টের কথা আর কিছু বলেনি, তাহলে হয়তো সব ঠিকই আছে। আর এখন যেহেতু সালারের

ফোনে ফোরকান, তার মানে ফোরকানের সঙ্গে এটি তার তৃতীয় সাক্ষাৎ। ইমামা চিন্তিত না হয়ে পারল না।

ফোরকান এখন তাকে তার ও বাচ্চাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করছে। তার গলা প্রচণ্ড অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যে হাসিখুশি ভঙ্গি তার কথা বলার অংশ ছিল, ইমামার কাছে তা এখন সম্পূর্ণ উধাও মনে হচ্ছে।

: 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সালার তোমাকে কল করবে।' প্রাথমিক সালাম-কালামের পর ফোরকান তাকে বলল।

: 'ফোন আপনার কাছে কেন?' বিষয়টি ইমামার কাছে প্রচণ্ড আশ্চর্যজনক লাগল।

'হ্যাঁ, সে হাসপাতালে এসেছে। আমার সাথে সালারের কিছু কাজ ছিল, তাই সে এখানে দেখা করতে এসেছে। সে একটু ওয়াশরুমে গেছে। ফোন এখানেই ফেলে গেছে।' কথার টানে

ফোরকান তাকে সেই জায়গার কথাই বলল, সালার এখন যেখানে আছে। তার সঙ্গে দেখা করতে আসার কারণও ব্যাখ্যা করল। ফোন তার কাছে কীভাবে, সেই ব্যাখ্যাও দিল। এভাবে ইমামার দুশ্চিন্তা দূর করে দিল।

ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে কোথাও ফোন ফেলে রেখে যাওয়ার মতো মানুষ নয় সালার। আর সেটাও এমন এক পাবলিক প্লেস হোক বা তা ফোরকানেরই হসপিটাল। ইমামার যেন খটকা লাগল। কিন্তু সে আর কোনো প্রশ্ন না করে সালারের কলের অপেক্ষা করাই উত্তম মনে করল।

সালার এমআরআই করাল। গত কয়েকদিনের টেস্টের রিপোর্টগুলো সত্য প্রমাণিত হতে লাগল। তার ব্রেন টিউমার হয়েছে। কিন্তু এটি কোন ধরনের, কোন পর্যায়ে আছে এবং এর ভয়াবহতা কী, এসব জানার জন্য আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ডাক্তারদের মতামতও প্রয়োজন। সালার প্রথম ধাক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার জীবন যেন একদম

পাথর হয়ে গেছে। গত কয়েক বছরের তার অবিশ্রান্ত দৌড়ঝাঁপের জীবন, কর্মমুখর রাতদিন যেন হুট করেই থেমে গেছে।

ব্রেন টিউমার প্রাণঘাতী, তা নিশ্চিত। কিন্তু কতটা প্রাণঘাতী? সুস্থতার সম্ভাবনা কতটুকু? চিকিৎসা কী? কোথায় হবে? কত সময় লাগবে? তার শরীরে এর কী প্রভাব পড়বে? তারচেয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, তার পরিবার এটি জানার পর কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে? তাদের ওপর কেমন প্রভাব পড়বে? তাদেরকে কী বলবে? নাকি বলবে না? লুকালেও, কীভাবে লুকাবে?

এই প্রথম সালার সিকান্দার তার জীবনের বিয়াল্লিশটি বছর নিয়ে ভাবতে বসেছে; ফুরিয়ে ফেলা বিয়াল্লিশ বছর এবং থেকে যাওয়া বাকি সময়টুকু নিয়ে। যে বাকি সময়টুকু দশক থেকে নেমে বছর, মাস কিংবা দিনেও রূপান্তরিত হতে পারে।

'অবকাশ' কুরআন পাকের একটি মৌলিক নীতি। সেই 'অবকাশে'র অর্থ এখন সে বুঝতে পারছে। কিন্তু তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, কুরআনের সেই নীতিটি এখন তার ওপর জারি হতে চলেছে। কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও, নিজের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই তার পশম দাঁড়িয়ে গেল।

: চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। সব রোগের চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন পরীক্ষা, ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। কোনো রোগই তো এখন অনিরাময়যোগ্য নয়।

তার টিউমার ম্যালিগন্যান্ট বা প্রাণঘাতী, তা প্রমাণিত হয়েছে। তা প্রমাণিত হতেই তার চেয়ে কম কষ্ট পায়নি ফোরকান। তবু সে চুপচাপ বসে থাকা সাধারণকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করল। যদিও তার কথাগুলোও খুব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, কেবল এটাই মাথায় রাখো।



তার কথা শুনে সালার এই প্রথম মাথা তুলে তাকাল। তারপর বলল, 'তুমি ডাক্তার হয়ে আমাকে এ কথা বলছ।' ফোরকান কিছু বলতে পারল না। অনেকক্ষন তারা এভাবেই চুপচাপ বসে বইল।

- 'তুমি এখনই আমেরিকায় চলে যাও। বরং আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। সেখানে সেরা ডাক্তার ও হাসপাতাল, দুটোই আছে। হয়তো ওখানে এটি ভালো হয়ে যাবে। কিংবা অন্য কোনো সমাধান বের হবে।' এখন সে ডাক্তার হয়ে কথা বলছে না। কথা বলছে, একজন প্রিয় বন্ধু হয়ে।

'ইমামাকে আমি কী বলব?' ফোরকানকে সে অদ্ভুত প্রশ্ন করল।

: 'এখনই কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আগে আমেরিকায় টেস্ট হতে দাও, দেখো ওখানকার ডাক্তাররা কী বলে।' ফোরকান তাকে বলল।

: 'এখানকার ডাক্তাররা কী বলছে?' সালার তাকে প্রশ্ন করল।
ফোরকান এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। তার ব্যাপারে ডাক্তারদের
সঙ্গে পরামর্শ করে, যা বুঝেছে, ওসব বলার সাহস তার নেই।

: 'পাকিস্তানে আমেরিকার মতো ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা এবং
নিউরোসার্জারি এতটা উন্নত নয়। তাই এখানকার ডাক্তারদের
মতামত আমার কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না।'
ফোরকান দৃষ্টি লুকিয়ে বলে চলল। সালার কেবল তার মুখের
দিকে তাকিয়ে রইল। ফোরকানের অসহায়ত্ব দেখে সালারের
নিজের চেয়েও, তার প্রতি বেশি মায়া হলো। ফোরকান তার
থেকে কিছু লুকাতে চাচ্ছে না, আবার কিছু বলতেও চাচ্ছে না।

: 'না, এমন কোনো কিছু নয়। ফ্লুর জন্যই গিয়েছিলাম পুনরায়।
ব্যস, গল্পটোল্ল করতে করতে টেবিলের উপর ফোন রেখে,

তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম।" রাতে সালার ইমামার সঙ্গে কলে কথা বলতে বলতে বলল। ইমামা নিশ্চিত হয়ে গেল।

: আর ফ্লু? তার কী হলো?

: এই তো চলছে।

: টেস্টের রিপোর্ট চলে আসছে?

: হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। কেবল ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে। কিছু ওষুধ দিয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।

: আমি তো খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, কী না কী সমস্যা হলো যে, ফোরকানের সঙ্গে দেখা করতে আবারও হাসপিটালে গেলে।

সালার চুপচাপ তার কথা শুনতে লাগল। ফোরকান ঠিকই পরামর্শ দিয়েছে, ইমামাকে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। কিন্তু ইমামার অদ্ভুত নিশ্চিত্ততা তাকে আঘাত করছে। মিথ্যে বলে সে তাকে ধোঁকা দিচ্ছে।

ইমামা এখন তাকে বাচ্চাদের ব্যাপারে বলছে। একে একে সবার সঙ্গে কথা বলাচ্ছে। গত তিনদিন ধরে জিবরিলকে সে কুরআন পড়াচ্ছে না, ইমামা তাকে মনে করিয়ে দিল।

'তুমি পড়িয়ে দাও।' সালার উত্তরে বলল।

: 'আমি তো গত তিনদিন ধরে পড়াচ্ছিই। রিভিশনও করাচ্ছি। নতুন সবক তো তুমিই দেবো।' ইমামা তাকে বলে চলল।

: 'কত পারা বাকি আছে?' সালার কেমন অদ্ভুত উদাসীনের মতো জিজ্ঞেস করল। ইমামা তা লক্ষ করল।

: শেষ দশ।

: 'খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।' সালার বিড়বিড়িয়ে বলল।

: 'হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। সে তো মাশাআল্লাহ অনেক মেধাবী। দশ বছরের আগেই কুরআন হেফজ হয়ে যাবে তার।' এবার সে সালারের স্বরের দিকে লক্ষ্য না করেই বলতে থাকল। সালার চাচ্ছিল, জিবরিল আরও কম বয়সে হেফজ শেষ করে ফেলুক। কারণ, সে প্রচণ্ড মেধাবী। কিন্তু সালার তাকে একদম ছোটবেলায় হেফজ করাতে শুরু করেনি। এতটুকু সময় নিয়েছিল, যাতে সে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বোঝার সাথে সাথে কুরআনের বিধানগুলোর গুরুত্বও বুঝতে পারে।

স্ক্রাইপের স্ক্রিনে এখন একে একে তার বাচ্চারা আসতে শুরু করেছে। ল্যাপটপ অন করে বসে সে তাদের দুষ্টুমি দেখছে। এক ভয়ংকর বাস্তবতার মাঝে বসে সে, এক শুভ্রসুন্দর স্বপ্ন



দেখছে। তারা একে একে কম্পিউটারের সামনে এসে বাবাকে
হ্যালো বলছে।

: 'বাবা, আজ আমি কুকি বানিয়েছি।' ইনায়া তাকে ফ্রিনে একটি
বড় সাইজের বিস্কুট দেখাতে দেখাতে বলল।

: 'বাহ, এ তো খুব মজাদার মনে হচ্ছে।' সালার নিজের
ভেতরের উত্তেজনা লুকিয়ে, মেয়ের প্রশংসা করল। এই
সবকিছু সে এমনভাবে দেখছে, যেন সে এই

প্রথম দেখছে: কারণ তার জন্য এই সবকিছু তো শেষ হতে
চলেছে। ইমামা সবাইকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।
কারণ, জিবরিল এখন নতুন সবক পড়বে। এবার সে ও তার নয়



বছর বয়সি ছেলে মুখোমুখি বসে আছে। সালারকে সে নতুন সবকের কথা বলল। সালার তাকে পেছনের সবক শোনাতে বলল। জিবরিল পড়তে লাগল। বুকের উপর হাত বেঁধে, দুচোখ বন্ধ করে, মধুর স্বরে সে পড়তে লাগল। বাবার কাছ থেকে সে কেবল বুদ্ধিমত্তাই নয়, মধুর কণ্ঠস্বরও পেয়েছে। নয় বছর বয়সেই তার তিলাওয়াত হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। যেকোনো শ্রোতাকে অশ্রুসিক্ত করতে পারে। জিবরিল কখন তার পেছনের সবক শেষ করেছে, সালার টেরই পেল না। সে অন্য কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। চোখ খুলে জিবরিল তার সামনে রাখা কুরআনের দিকে তাকাল। তারপর তাকাল কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভাসা বাবার চেহারা। যে চেহারা এখন মূর্তির মতো অনুভূতিহীন-নিশ্চল হয়ে আছে।

: 'বাবা!' জিবরিল তাকে ডাক দিল। মুহূর্তের জন্য জিবরিলের মনে হলো, হয়তো কানেকশন কেটে গেছে। কিংবা সিগন্যালের কারণে ঠিকমতো স্ট্রিমিং হচ্ছে না। সালার চমকে,



খানিক কেশে জিবরিলকে পুনরায় পেছনের সবক শোনাতে বলল। জিবরিল অবাক হলো।

: তা তো আমি শোনালামই।

: আমি শুনতে পারিনি, আবার শোনাও।

এই প্রথম জিবরিল বাবার মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ করল। বাবার কিছু একটা হয়েছে, সে তা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে পুনরায় পেছনের সবক শোনাতে লাগল। এবার সালার অন্য কোথাও হারাল না। ছেলেকে নতুন সবক দিয়ে, কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে স্কাইপ বন্ধ করে দিল।

: 'Is baba ok? বাবা কি ঠিক আছেন?' স্কাইপে কথা বলা শেষ করে জিবরিল মাকে জিঙ্গেস করল।

: 'হ্যাঁ! ঠিক আছেন। কেবল ফ্লু হয়েছে, তাই কিছুটা অসুস্থ।'
ইমামা তার প্রশ্নে গভীর মনোযোগ না দিয়েই বলল।

: 'When is he returning? কবে ফিরছেন তিনি?' জিবরিল
পরবর্তী প্রশ্ন করল।

: 'এখন তো পাকিস্তান থেকে দুই সপ্তাহের জন্য আমেরিকা
যাচ্ছেন। বললেন, কিছু মিটিং আছে। তারপর আমেরিকা থেকে
এখানে আসবেন।' ইমামা ফোনে বলা কথাগুলো তাকে
জানাল।

১৪

বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার মাত্র দুই সপ্তাহ
আগে, সালার তখন কঙ্গোতে বিদায়ি সাক্ষাৎ ও ফেয়ারওয়েল
ডিনারে ব্যস্ত। ঠিক তখনই ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল সালার



সিকান্দারের ব্রেন টিউমারের খবর ফাঁস করে। এবং বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পদ প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে এই অসুস্থতাকে তুলে ধরে। এরপর থেকে অসংখ্য পত্রিকা সেই খবর প্রকাশ করতে থাকে।

সালারের ব্রেন টিউমারের খবর পশ্চিমা সমাজের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মিডিয়ারও এতে কোনো আগ্রহ নেই। যদি কারও আগ্রহ থেকে থাকে, তবে সে হলো সিআইএ। এই মুহূর্তে সালারের প্রাণঘাতী সংবাদ প্রকাশের মানে হলো, তার স্বপ্নের সুদমুগ্ধ ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেই তার কোমর ভেঙে দেওয়া। তারা জানে, বিশ্বব্যাংক ছেড়ে সালার কী করতে চাচ্ছে। এবং তাদের পূর্ণ বিশ্বাসও যে, সে যা করতে চাচ্ছে তা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তবু তাদের সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। আর সেই পদক্ষেপেরই একটি হলো, তার অসুস্থতার সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া। যাতে সবাই তার প্রকল্প থেকে সরে পড়ে।

এটি একটি দাবার চাল। সালার তার ঘুঁটি সাজিয়ে প্রথম চাল চালার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু তারা আগে থেকেই তৈরি হয়ে বসে ছিল। প্রথম চাল তারা দিয়ে দিয়েছে। আর তাদের প্রথম চালেই সালারের রাজা পতনের পথে, এটি অন্তত তাদের বিশ্বাস।

১৫

জিবরিল ইন্টারনেটে গিয়ে glioma (গ্লাইওমা) শব্দটি গুগলে সার্চ করল। তারপর oligodendroglioma (অলিগোডেনড্রোগ্লাইওমা-এটি একটি বিরল একপ্রকার মারাত্মক ব্রেন টিউমার) লিখল। সাড়ে নয় বছর বয়সে মুহাম্মদ জিবরিল সিকান্দার এই দুটো শব্দকে স্পেলিং-বি, বানান প্রতিযোগিতা গ্রুপের জন্য মুখস্থ করে নিল। এই বানান দুটো মুখস্থ করার সময় সে কল্পনাতেও ভাবেনি, আসলে সে মূলত তার বাবাকে গ্রাস করতে আসা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাণঘাতী ব্রেন টিউমার সম্পর্কেই জানতে শুরু করেছে।



স্পেলিং-বি বানান প্রতিযোগিতার জন্য জিবরিল তখন শুধু ওই শব্দগুলোর বানানই মুখস্থ করেছিল। কিন্তু সেই শব্দ দুটি আসলে কী ছিল, তা খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা করেনি। চেষ্টা তখন করল, ইন্টারনেটে যখন বাবার নামের সঙ্গে এই অসুস্থতার সংবাদ দেখতে পেল। সংবাদটি ছিল বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে। এই ওয়েবসাইটটি তাদের কম্পিউটারের হোমপেজে আগে থেকেই সেট করা ছিল। সালার এটি প্রায়ই ব্যবহার করত। সেখানে স্কুল করতে করতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি নিউজ ভেসে উঠল। সংবাদটি আধাঘন্টা আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে সালার সিকান্দারের অসুস্থতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সাড়ে নয় বছরের শিশুটি এই রোগ সম্পর্কে খুঁজতে শুরু করল। সালার তখনো বাড়ি ফেরেনি। ইমামা অন্য রুমে বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছে। আর জিবরিল চুপচাপ ইন্টারনেটে পড়ে যাচ্ছে, তার বাবা গ্রেড-টু অলিগোডেনড্রোগ্নিওমায় আক্রান্ত। এই টিউমারের



কোনো স্থায়ী চিকিৎসা নেই। ভালো চিকিৎসা হলে, রোগী সাত থেকে দশ বছরের বেশি বাঁচতে পারে না। এই ব্রেন টিউমারের রোগী সুস্থভাবে এর চেয়ে বেশি বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

সাড়ে নয় বছরের শিশুটি যেন মুহূর্তেই বড় হয়ে গেল। এই ঘরে সালারের পর সবার আগে সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে সালারের রোগ, রোগের ধরন এবং তার পরিণতি সম্পর্কে জানছে। জিবরিল বুঝতে পারছে না, এই ভয়াবহ সংবাদটি নিয়ে সে কী করবে? মাকে বলবে, নাকি বলবে না? কিন্তু এটি তার আসল দ্বিধা নয়; তার আসল দ্বিধা ছিল ভিন্ন!

: 'হামিন! যাও, ভাইকে ডেকে নিয়ে আসো। ঘুমানোর আগে সে তোমাদের দোয়া পড়িয়ে দিক। কী জানি, এত দেরি করছে কেন!' বাচ্চাদের পড়ানো শেষ করে তাদের ঘুমাতে বলে, ইমামার হঠাৎ জিবরিলের কথা মনে পড়ল। সে তো অনেকক্ষণ আগেই রুম থেকে বেরিয়েছিল।

: 'আজ আমি পড়াব!' হামিন হঠাৎ ঘোষণা করল। সে নামাজের মতো দুহাত বুকে বেঁধে উচ্ছ্বাসী হয়ে দোয়া পড়তে যাবে, তখনই ইমামা তাকে শাসনের ভঙ্গিতে থামিয়ে দিল।

হামিন! চুপ করো, ভাই পড়াবো।

হামিন চোখ খুলে তাকাল এবং বাঁধা হাত খুলল। নিচে নেমে জিবরিলকে ডাকতে যাবে, তখনই ইমামার দৃষ্টি থেমে গেল তার নাইট স্যুটের পাজামার দিকে। সবে বাথরুম থেকে তা পরে বেরিয়েছে। কোমরে ফিতার বদলে একটা বড় গিঁট কষে বাঁধা হয়েছে, আর সেই গিঁটের দুই প্রান্ত খরগোশের দুই কানের মতো দাঁড়িয়ে আছে তার পেটের উপর।

: 'এদিকে আসো হামিন।' ইমামা তাকে ডাকল। 'এটা কী?' ইমামা ঝুঁকে বসতে বসতে তার পায়জামার গিঁট খুলে, তা ঠিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু হামিন হঠাৎ চিৎকার করে, ঝাড়া দিয়ে

দু-হাতে সেই গিঁট চেপে ধরে বলে ওঠে, 'মাম্মি। না। খুলবেন না।'

: 'এর ফিতা কোথায়?' ইমামা এবার বুঝতে পারছে গিঁট কেন বেঁধেছে।

: স্কুলের একজনকে দিয়ে দিয়েছি।

ইমামা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

: 'দান করেছি।' হামিন তার কথা পূর্ণ করে দিল। ইমামা বিস্ময়চকিত চোখে তার ছেলের আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চিত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। 'দান করেছ?' ইমামা সত্যিই অবাক হয়ে আছে।

: 'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর এল।

: তাহলে?

: দড়ি দিয়ে একটা ব্যাগ বেঁধেছিলাম।

: 'কীসের ব্যাগ?' ইমামার কপালে ভাঁজ পড়ল।

: খেলনার ব্যাগ।

: 'কার খেলনা?' ইমামা কপাল কুঁচকে বলল।

: 'আচ্ছা...' হামিন এবার মান্নি, রাইসা ও ইনায়ার দিকে ধীরে ধীরে তাকাল। তারপর তার উত্তরটা ভুলভাল জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করল।

: 'There were many owners. ওগুলো তো অনেকেরই ছিল।

ইমামা মুহূর্তেই বুঝে গেল। 'অনেক মালিক মানে কে? কাকে দিয়েছে? কেন দিয়েছে? কার অনুমতিতে দিয়েছে?' একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঝড়ের বেগে।

এটাই প্রথম নয় যে, হামিন সিকান্দার মহান বুদ্ধ হতে গিয়ে তার ভাই-বোনদের সব খেলনা মানুষকে দান করে দেয়। তার ভাই-বোনগুলো যদি একটু ধৈর্যশীল না হতো, তাহলে তার এমন মহান দানকর্মের (!) ফলে তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঝগড়া বাঁধত।

ইনায়ার চোখ এখন ভিজে জব-জবে হয়ে আছে। তাদের এই ছোট ভাই হামিন যেন, তাদের সব জিনিস যেকোনো সময়, যে-কাউকেই মহৎ দানশীলতার আবেগে দিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে।

: 'মাম্মি!' ইনায়া অসহায় কণ্ঠে কেঁদে উঠল।



: 'Charity is not a sin. দান করা কোনো পাপ নয়।' হামিন তার অভ্যাসমতো দুই চোখ গোল করে বাক্যটি বলল। গত কয়েকদিন ধরে এই বাক্যটিই সে প্রতিটি কথায় ব্যবহার করে আসছে। রাইসা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে তাদের কথা শুনছে।

: 'তুমি আমার খেলনা চুরি করেছ?' ইনায়া পারলে তাকে মারই দিত। অন্তত রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে স্বপ্নের খেলনাগুলো দান করে দেওয়ার কথা শোনে। তাও আবার, না জানি কোন কোন খেলনা দিয়ে দিয়েছে।

: 'এ নিয়ে সকালে কথা হবে, এখন না।' ইমামা আলোচনায় হস্তক্ষেপ করল। আর কিছু বলার আগে সোফায় পড়া সেলফোন বেজে উঠল। সে ভাবল, সালারেরই কল হয়তো।

: 'হামিন, তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।' সোফার দিকে যেতে যেতে ইমামা, দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়া হামিনকে

থামাল। হামিন ভীষণ অনুগতভাবে পুনরায় বিছানায় ফিরে গেল।

ফোনের স্ক্রিনে সিকান্দার উসমানের নাম ঝলমল করতে দেখল ইমামা। কল রিসিভ করতে করতে তার তিন সন্তানের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটে আঙুল চেপে তাদের চুপ করতে বলল।

: 'সালার কোথায়?' সালামের জবাব দিয়েই, অদ্ভুত অস্থির হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

: একটা ডিনারে গিয়েছে। এই তো এখনই চলে আসবো।

: আমি তাকে কল করছি, সে আমার কল রিসিভ করছে না।

উনার কণ্ঠে ইমামা অদ্ভুত দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা উপলব্ধি করল।

: 'ওখানে হয়তো আপনার কল রিসিভ করতে পারছে না। ও প্রায় সময় ফোন সাইলেন্ট করে রাখে। সব ঠিক আছে না, পাপা?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: 'তোমরা আমাকে কেন বলোনি? এত বড় কথা আমার থেকে কেন লুকালে?' সিকান্দার উসমান শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বলে চললেন। একটু আগেই উনার এক নিকটাত্মীয় ফোন করে উনাকে বিষয়টি জানিয়েছে। ওই আত্মীয় সালারের ব্যাপারে এই সংবাদটি কোনো এক চ্যানেলে দেখেছিল। সমবেদনা জানাতে তৎক্ষণাৎ সিকান্দার উসমানকে ফোন করেছিল। তার সমবেদনা শুনে সিকান্দার হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, সালারকে নিয়ে বলা এই সংবাদ সত্যি হতে পারে।

তার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে উনার ফোনে একের পর এক কল আসতে শুরু করে। আর দিশেহারা হয়ে তিনি সালারকে কল করতে থাকেন। কিন্তু সালার তা রিসিভ করছে না।

সিকান্দার উসমান কল করার অনেক আগেই সালার জেনে গেছে যে, মিডিয়ায় তার অসুস্থতার খবর ফাঁস হয়ে গেছে। তার স্টাফই তাকে এই সংবাদ দিয়েছিল। তা শুনে সালার যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই সংবাদ প্রকাশের ফলাফল সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে যায়। সামনে কী হবে, সে যেন ভাবতেই পারছিল না। কয়েক ঘন্টা আগে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সে একটি হাসিখুশি, প্রাণবন্ত পরিবার রেখে এসেছে। আগ্নেয়গিরির লাভা যা ছিল, তা কেবল তার মধ্যেই ছিল। সেই লাভা অন্য কাউকে গ্রাস করে ভস্মীভূত করেনি। আর এখন সালার সিকান্দারের ফোন, টেক্সট মেসেজ ও মিসকলে ভরে গেছে। ডিনার টেবিলে বসে, সে এখন তার সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ভাবছে।

: 'কী বলিনি, পাপা? কী লুকিয়েছি আপনার থেকে?'
সিকান্দারের কথা ইমামা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার মনে হলো, সে হয়তো উনার কথা শুনতে এবং বুঝতে ভুল করছে।



: 'ব্রেন টিউমারের কথা।' সিকান্দার উসমান যেন আতঁনাদ করতে করতে বললেন। তবু তিনি সালারের নাম উচ্চারণ করতে পারলেন না। ফলে ইমামা এখনো কিছু বুঝতে পারল না।

: 'ব্রেন টিউমারের কথা? কার ব্রেন টিউমারের কথা?' ইমামা বিক্ষিপ্ত হলো। এই প্রথম সিকান্দার বুঝতে পারলেন, ইমামাও তার মতো এ বিষয়ে অজ্ঞ। 'পাপা! আপনি কার ব্রেন টিউমারের কথা বলছেন?' উনার নীরবতা দেখে ইমামা পুনরায় জিজ্ঞেস করল। উত্তর সিকান্দারের গলায় আটকে গেল।

: 'পাপা...!' উনার লাগাতার নীরবতা দেখে ইমামা আবারও তার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করতে চাইল। কিন্তু পারল না। বিদ্যুৎচমকের মতো উত্তর তার মাথায় চলে এলো। কার অসুস্থতা নিয়ে সিকান্দার এমন অস্থির হতে পারেন? সালার? তিনি কি সালারের কথা বলছেন? সালারের ব্রেইন টিউমারের কথা?

মুহূর্তেই তার ফোরকানের সঙ্গে বলা কয়েক সপ্তাহ আগের কথোপকথন মনে পড়ে গেল। হাসপাতালে যাওয়া, কয়েক সপ্তাহ ধরে সালারের পরিবর্তিত আচরণ। অবিশ্বাস্যভাবে সে ফোন হাতে নিয়ে বসে রইল। এটি তার ভ্রম। ভ্রমই হতে হবে। সে যেন মনে মনে অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, এখন আর কিছু নয়, নতুন কোনো পরীক্ষা নয়। অবশ্য দেহে সে ইনায়া, হামিন ও রাইসার দিকে তাকাল। তারা হাসিখুশি গল্প করতে করতে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফোনে এখন দু'পাশেই নীরবতা ছেয়ে আছে। না সিকান্দার উসমান কিছু বলতে পারছেন, আর না সে। এখানে বিরাজ করছে পরিতাপ, অবিশ্বাস্যতা। সালারের নাম উচ্চারণ করার মতো সাহস না উনার মধ্যে আছে, আর না তার মধ্যে আছে সেই দুঃসাহস।

: 'আপনাকে কে বলেছে?' অবশেষে ইমামা যেন নিজেকে স্বাভাবিক করে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

: 'সে তোমাকে বলেনি?' সিকান্দার উসমান অদ্ভুত অসহায় ভঙ্গিতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। এমন যেন, প্রশ্নটি তিনি করতে চাচ্ছেন না। বলতে চাচ্ছেন যে, খবরটি মিথ্যা। হায়! যদি বলতে পারতেন।

ইমামা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা ভাবার সুযোগ পেল না। বাইরে সে হর্নের আওয়াজ শুনতে পেল।

: 'আমি একটু পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি পাপা!' অবশ্য হয়ে আসা হাতে ফোন চেপে সিকান্দারকে বলল সে।

: 'তোমাকে বলা ঠিক হয়নি আমার।' তিনি আফসোস না করে থাকতে পারলেন না। এই অবস্থাতেও তিনি অনুমান করতে পারছেন, ইমামার ওপর দিয়ে এখন কী যাচ্ছে। ইমামা কোনো উত্তর করল না। কল কেটে দিল। সবকিছু যেন মুহূর্তেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। ফোন কোলে ফেলে মূর্তির মতো নিশ্চুপ বসে রইল ইমামা।

সারা জীবন সে খারাপ সময়কে ভয় করে এসেছে। খারাপ সময়ের প্রতি সতর্ক হয়ে কান পেতে থেকেছে। কয়েক বছর ধরে সেই কানপাতা বন্ধ করে দিয়েছে। আর তেমনই খারাপ সময়, হুট করেই যেন এখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এত চুপচাপ, এত অকস্মাৎ যে, এখন সে নড়তেও পারছে না।

একটু দূরে ইনায়া ও রাইসার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও হামিন, সোফায় বসা মায়ের দিকে একধ্যানে তাকিয়ে আছে। মান্নি দাদুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, তারপর থেকে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। হর্ন বাজার পরও মান্নি বাইরে যাচ্ছেন না, হাই তুলতে তুলতে হামিন বিষয়টি লক্ষ করল। পুনরায় ইমামার দিকে একপলক তাকাল। তারপর ইনায়া ও রাইসার দিকে, যারা এখন প্রায় ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে চলেছে। তারপর আরেকটি হাই তুলে সে ইমামাকে সম্বোধন করল।

: 'মান্নি! আপনি ঠিক আছেন?' ইমামা চমকে শূন্য দৃষ্টিতে হামিনের দিকে তাকাল। হামিনের প্রশ্ন সে বুঝতে পারেনি। কেবল বুঝতে পারল, কিছু একটা সে বলেছে। উত্তর না দিয়ে বা পালটা কোনো প্রশ্ন না করে সে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাতে আরও কিছুটা গুলিয়ে গেল হামিন।

ঘুমের সময় তার মা কখনো তাদের 'খোদা হাফেজ' না বলে, তাদের কপালে চুমু না খেয়ে বিদায় নেন না। আজ প্রথম এমন করলেন। তার মাথা জট পাকিয়ে গেল। এভাবেই বাড়ির প্রতিটি মানুষ একে একে এই ঝড়ের কম্পন অনুভব করতে শুরু করল।

জিবরিলকে বসে থাকতে দেখল। হঠাৎ বাবার গলা যেন কারেন্ট শকের মতো লাগল।

: 'তুমি এখনো জেগে আছ?'

লাউঞ্জে ঢুকেই সালার কম্পিউটারের সামনে তড়িঘড়ি করে সে স্ক্রিনে খোলা সাইটটা বন্ধ করে দিল। তবে আর কিছু না বন্ধ করেই, রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকাল। এখন বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে সে প্রস্তুত হচ্ছে। সালার বাইরের দরজা থেকে সোজা ভেতরে চলে এলো। কিন্তু এখনো তার কাছাকাছি আসেনি। হর্নের শব্দ শুনেও ইমামা এখনো বাইরে আসেনি। আর জিবরিল তো হর্নের শব্দ শুনতেই পায়নি। তার মন যে ঘূর্ণাবর্তে ডুবে ছিল, সেখানে কোনো শব্দ পৌঁছাতেও পারে না।

: 'আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করছিলাম।' জিবরিল বাবার চোখে চোখ না রেখে বলল। বাবার মুখের দিকে কেন সে তাকাতে পারছে না? সাড়ে নয় বছরের এই শিশুটি তা বুঝতেও পারছে না। অজান্তেই যেন সে এমন একটি গোপন তথ্য জেনে গিয়েছে, যা সে এখন কারও সামনে প্রকাশ হওয়ার ভয় করছে।

সালার জিবরিলের মুখের দিকে তাকাল। তার পেছনে ডেস্কটপের স্ক্রিনে বিশ্বব্যাপকের হোমপেজ ভেসে আছে। ডিনার জ্যাকেট খুলতে খুলতে সালার তাকে বলল, 'অনেক রাত হয়েছে, সাড়ে দশটা বাজছে। দশটা বাজার আগে তোমার সব কাজ শেষ করে ফেলার কথা, মনে আছে?' সালার যেন তাকে মনে করিয়ে দিল। এই ঘরের বাচ্চাদের জন্য এটি একটি নির্দিষ্ট রুটিন। দশটার আগেই সব কাজ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়া। জিবরিল এবারও বাবার দিকে না তাকিয়ে, মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'তোমার মাম্মি কোথায়?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল। হর্নের শব্দ শুনেও সে তাকে এগিয়ে নিতে আসেনি। এদিকে এত রাতে জিবরিল কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। তাদের ঘরে এটি নিয়মের বিপরীত। ডিনার পাটিতে যে আশঙ্কা সে করেছিল, তা যেন এখন সত্যে পরিণত হচ্ছে।

জিবরিলকে কোনো উত্তর দিতে হলো না, তার আগেই পাশের রুমের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো ইমামা। সালার এক পলক

তাকাতেই বুঝে গেল, তার নিকৃষ্ট ধারণা সত্যে পরিণত হয়েছে।
সবকিছু ইমামা ও জিবরিল জেনে গিয়েছে।

লাউঞ্জে তিনজন মানুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত
নাটকীয় ভঙ্গিতে। তারা যেন কোনো স্টেজ প্লের অভিনেতা,
যারা সবাই তাদের সংলাপ ভুলে গেছে। সেই সঙ্গে মঞ্চে
প্রবেশের এবং বের হওয়ার পথও ভুলে বসেছে। প্রত্যেকেই
অপেক্ষা করছে, এই দৃশ্য থেকে অপরজন যেন আগে বেরিয়ে
যায়।

সাড়ে নয় বছরের বালকটি এই প্রথম তার বাবা-মায়ের
মাঝখানে নীরবতার এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠতে দেখল। এই
নীরবতাই তার ভয়কে বাড়িয়ে তুলল। নিঃসন্দেহে সে অদ্ভুত
মেধাবী। কিন্তু কোনো মেধাই সম্পর্কের এলোমেলো সুতোকে
এক রেখায় আনতে পারে না। না আবেগকে দমিয়ে রাখতে
পারে, আর না অনুভূতিশূন্যতা দূর করতে পারে! সালারের
মতো জিবরিলও বুঝে গিয়েছে যে, ইমামা তার বাবার অসুখের

কথা জেনে গেছে। কিন্তু এটি তাকে কতটা কষ্ট দিচ্ছে, জিবরিল তা ভাবতেও পারছে না। আর না তার প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছে।

: 'গুড নাইট।' এটি বলে জিবরিল যেন পালানোর পথ খুঁজে পেল। শব্দ দুটি বলে মায়ের দিকে না তাকিয়ে টলোমলো পায়ে ওখান থেকে চলে গেল। লাউঞ্জে দাঁড়ানো মানুষ দুটি তার চলে যাওয়ার দিকে লক্ষ করল না। পেছনে না তাকিয়েও জিবরিল বুঝতে পারছে, যন্ত্রের মতো ঘোরে-আচ্ছন্ন হয়ে ইমামা তার পেছনেই আসছে। জাদুগ্রস্ত হয়ে নয়, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে সে। যেন অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েও, কিছুই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে না। যেন তার বিশ্বাস হয়ে আছে, আজ যে সংবাদ পেতে যাচ্ছে, তা ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতম হতে যাচ্ছে।

সালার এখনো ইমামার দিকে মনোযোগী নয়। ডিনার জ্যাকেট সোফায় ছুড়ে দিয়ে, বেজে ওঠা ফোন পকেট থেকে বের করছে। সিকান্দার উসমানের কল। সে বারবার তার বাবাকে

এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যেহেতু ইমামা জেনেই গিয়েছে,
তাহলে আর লুকানোর কী আছে।

সালারের গলা শুনতেই সিকান্দার উসমান ভেঙে পড়লেন।
সালার এই প্রথম তার বাবাকে কাঁদতে দেখল। এই প্রথম সে
উপলব্ধি করল, কেবল সন্তানের অশ্রুই যন্ত্রণাদায়ক নয়! মা-
বাবাকে নিজের কারণে নিজের চোখের সামনে কাঁদতে দেখাও
প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক।

: 'সারা জীবন তুমি আমাকে শান্তি দিবে না, এটাই ভেবে
রেখেছ, না?' সিকান্দার ভেজা চোখে তাকে বললেন। তিনি
সন্তানের কষ্টে অস্থির হয়ে পড়ার মতো বাবা, কান্নায় ভেঙে
পড়ার মতো বাবা নন। কিন্তু আজ উনার সেই অহংকারও সে
ভেঙে

দিয়েছে। যে অহংকার উনার গর্বের প্রতীক হয়ে ছিল।



: এবার তো আমি কিছুই করিনি, পাপা!

এই বাক্যটি সিকান্দারকে দ্বিগুণ আঘাত করল। সালার ঠিকই বলছে, সত্যিই এবার তো সে কিছুই করেনি।

: 'এই সপ্তাহেই আমি আর তোমার মাম্মি কিনশাসায় আসছি'
সিকান্দার উসমান

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন।

: 'এসে কী লাভ পাপা? আমি আপনাদের সময় দিতে পারব না। সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি এখানে। কিছুদিন পর আমি নিজেই আপনাদের কাছে পাকিস্তানে চলে আসব।' সালার তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। এই অবস্থায় উনাদেরকে সে সামনে দেখতে চাচ্ছে না।

: 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপাতত আমি একদম ঠিক আছি। চিকিৎসা চলছে।

আপনি কেবল দোয়া করুন। মাম্মির সঙ্গে আমাকে কথা বলিয়ে দিন।" সিকান্দারকে আশ্বস্ত করতে করতে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইল সে। তাইয়েবাও সিকান্দারের মতোই অস্থির হয়ে আছেন।

তার অসুস্থতার সংবাদটি যেন এক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। যা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের জীবন কয়েক মিনিটেই বদলে দিয়েছে। রুমে পায়চারি করতে করতে ফোন কানে চেপে বাবা-মাকে সাত্বনা দিয়ে চলছে সে। তা সত্ত্বেও তার সামনে মূর্তির মত দাঁড়ানো মানুষটির কথা ভুলে যায়নি। যে মানুষটি চুপচাপ তাদের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো কথাই বুঝতে পারছে না। অবশেষে সালার কল কেটে ফোনটি সেন্টার টেবিলে রাখল। এক অদ্ভুত অপরাধবোধে সে ভুগতে লাগল। কে জানে, এটি অপরাধবোধ নাকি নিজের প্রতি

করুণা! তার অসুস্থতা তাকে ভীষণ ভুলভাবে সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে দিয়েছে। বানিয়ে দিয়েছে, সবার মনোযোগের মূল লক্ষ্য ও কষ্টের কারণ।

ফোন রেখে সে ইমামার দিকে তাকাল। তার চেহারা ধূসর হয়ে আছে। একেবারে বিবর্ণ, যেন হঠাৎ কোনো ভূত দেখেছে। স্থির দৃষ্টিতে, অপলক তাকিয়ে আছে সেই ভূতের দিকে। সে দৃষ্টিতে ভর করে আছে অভিযোগ ও অবিশ্বাস্যতা।

: 'চলো বসে কথা বলি।' নীরবতা ভাঙল সালারই। সে ইমামার চোখাচোখি হতে পারছে না। হাত বাড়িয়ে ইমামার হাত ধরে, তাকে সোফার কাছে নিয়ে এলো। ইমামাও সাথে সাথে রোবটের মতো হেঁটে চলে এলো।

: 'তোমাকে কে বলেছে?' অবশেষে গুমোট নীরবতা ভেঙে সালারই তাকে প্রশ্ন করল। দীর্ঘ নীরবতার পর সে বুঝতে পারল, কথা তাকেই শুরু করতে হবে। উত্তর জানা সত্ত্বেও সে প্রশ্নটি

করল। এই প্রশ্নটি ছাড়া সমস্ত প্রশ্ন অর্থহীন। সমস্ত প্রশ্ন থেকে সে বাঁচতে চাচ্ছে। অন্য কারও অসুস্থতার কথা জিজ্ঞেস করা, আলোচনা করা ভিন্ন বিষয়। নিজের সম্পর্কে, নিজের অসুস্থতা, নিজের জীবন, নিজের মৃত্যু, এসব নিয়ে মানুষ কথা বলতে পারে না। অবশেষে সেও তো একজন মানুষ।

: 'তুমি কেন বললে না?' প্রশ্নের উত্তর যা চেয়েছিল, তা এলো না। বরং প্রশ্নের উত্তরে পালটা প্রশ্ন এলো-গলায় আটকানো কাঁটা, ক্ষতবিক্ষত আহত স্বরে। এটি ইমামার স্বর নয়। এটি অসহায়ত্ব ও অবিশ্বাস্যতার স্বর। 'কী হয়েছে? কখন হয়েছে?'-এর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন এটি। সালার তার সঙ্গে জীবনের এত বড় একটি যন্ত্রণাদায়ক সংবাদটি কেন ভাগাভাগি করার যোগ্য মনে করল না? জীবনের এতগুলো বছর একসঙ্গে থাকার পরও লুকানো জরুরি মনে করল কেন?

: সাহস হয়নি।



উত্তরটি ইমামার সাহসও ভেঙে দিল। সে তো কখনো ভীতু ছিল না। তাহলে কি এই অসুখের মাত্রা এতটাই বেশি যে, সালার তাকে বলতে ভয় পাচ্ছিল?

সালার এখন তার দিকে না তাকিয়ে জুতার ফিতা খুলতে খুলতে তার অসুখ সম্পর্কে বলছে। টিউমারের পরিচয়, ধরন, সম্ভাব্য চিকিৎসা, প্রত্যাশিত প্রভাব-সবকিছু শান্ত গলায় বলে চলছে। ইমামা নিস্তব্ধ হয়ে সব শুনে যাচ্ছে। এমন যেন সালার তাকে কোনো ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের কথা বলছে।

: 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে তো?' সমস্ত কথোপকথন শুনে ইমামা সালারের উভয় কাঁধে হাত রেখে অনুরোধের সুরে বলল। যেন সালার রোগী নয়, ডাক্তার। তার জীবন ও অসুস্থতা যেন তারই হাতে। সে কোনো উত্তরই দিতে পারল না। কথাই বলতে পারল না। এ বুঝি কোনো প্রশ্ন ছিল! এ তো ছিল আশা ও প্রত্যাশা। যা সালার তাকে অন্তত নিজের মুখে দিতে চাচ্ছে না। সে তার অসুস্থতা নিয়ে পাকিস্তান ও আমেরিকার ডাক্তারদের

মতামতও বলে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমামা তাকে বোকামিপূর্ণ এই প্রশ্নটি করল। সালার বিরক্ত হলো। রাগ করা উচিত ছিল না, কিন্তু তার রাগ হলো।

: 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো ইমামা!' সালার তার কাঁধ থেকে ইমামার হাত দুটো সরিয়ে খানিক রুম্ব গলায়, তার মতোই একটি বোকামিপূর্ণ পরামর্শ দিল। সালার তার জুতা নিয়ে সোফা থেকে উঠে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না। ইমামা এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। সালারের কাঁধে মাথা লাগিয়ে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে। সালার তাকে ঘুমাতে বলছে। অথচ ঘুম তো এখন তার জীবন থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। এত কষ্ট করে যে ঘর সে সাজিয়েছে, তা এখন ভাঙতে বসেছে। সেই ঘরের চাল এখন নড়তে শুরু করেছে। আর সে তাকে বলছে-'তুমি ঘুমাও।'

ইমামা তাকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে কাঁদছে, আর সে অপরাধীর মতো মাথা নুইয়ে চুপচাপ বসে আছে। সালার তাকে

সাস্তুনা দিতে পারত, কিন্তু কী সাস্তুনা দিবে? এখন তাকে সাস্তুনা দিতে হলে বলতে হবে, 'আমাকে ছাড়া তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো। আমাকে ছাড়া তোমার বর্তমানকে চালাতে শিখো।' এটি তাকে হতাশ কিংবা নিরাশ করা নয়; এটি তাকে বাস্তবতা মেনে নিতে শেখানো। সালারকে ছাড়া যে বাস্তবতাকে ইমামা সবসময়ই ঘৃণা করে, এটি সেই বাস্তবতা।

: 'রিপোর্টগুলো আমি দেখতে চাই।' কাঁদতে কাঁদতে সে হঠাৎ বলে উঠল। কে জানে কোন ধারণাকে সে ভ্রমে পরিণত করতে চাচ্ছে। সালার চুপচাপ উঠে পাশের কেবিনেট থেকে ফাইলের একটি ভূপ এনে তার সামনে, সেন্টার টেবিলে রাখল। কাঁপা হাতে ইমামা রিপোর্টগুলো দেখতে লাগল। ঝাপসা চোখে রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে সে যেন বিশ্বাস করতে চাচ্ছে, সালার লুকাচ্ছে এমন কিছু নেই তো এখানে? পায়ের নিচ থেকে অবশিষ্ট মাটিটুকু কেড়ে নেওয়ার মতো খারাপ কোনো সংবাদ? প্রতিটি রিপোর্ট তার চোখ আরও ঝাপসা করে দিচ্ছে। সে একসময় মেডিকেলের স্টুডেন্ট। রিপোর্টে লেখা

পরিভাষাগুলো পড়তে পারে সে। বুঝতেও পারে। সর্বশেষ ফাইলটি বন্ধ করে পুনরায় সালারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিকিৎসা-বিজ্ঞান ভুলও তো বলতে পারে।'

সালার তার ধরা গলায় বলা কথাটি শুনে হেসে উঠল। সে ভুল মানুষকে, ভুল বাক্যে, ভুল আশা দেওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো এই কথাটি সে সালারকে নয়, বরং নিজেই নিজেকে বলছে-মাথার ভেতর বয়ে চলা তাগুব থামাতে।

: 'হ্যাঁ, বিজ্ঞান ভুলও বলতে পারে। ডাক্তারদের নির্ণয়ও ভুল হতে পারে। চিকিৎসাও।' সে ইমামার কথায় আপত্তি জানাল না। আপত্তি জানিয়ে তার কষ্টকে সে আর বাড়াতে চাচ্ছে না।

: 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?' ইমামা পুনরায় তার বাহু আঁকড়ে ধরল। পুনরায় প্রশ্নটি করল। সালার চুপ থাকতে পারল না, রাগও দেখাতে পারল না।

: এটা যদি আমার হাতে থাকত, তাহলে অবশ্যই। কিন্তু এটি আল্লাহর হাতে। তাই

ইনশাআল্লাহ।

ইমামা পুনরায় হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগল। এবার সালার তাকে জড়িয়ে ধরল। সে পুরুষ, কাঁদতে চাচ্ছে না। কিন্তু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছে। এগুলো অশ্রু নয়, এগুলো তার অসুস্থতার গায়ে ভর করে আসা সমস্ত আশঙ্কা ও ভয়। চারটি শিশু বাচ্চা নিয়ে একজন নারী কীভাবে জীবন কাটানোর কল্পনা করতে পারে! যেখানে এই নারীটি বিগত এগারো বছর ধরে সকল বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করে চলছে। ইমামার মনে প্রচণ্ড ভয়। এগুলো সে প্রকাশ করছে না। তবু সালার যেন তার মন পড়ে নিচ্ছে।

: 'ইমামা! তোমাকে সাহসী হয়ে এসব সামলাতে হবে।' সালার অবশেষে তাকে বলার জন্য একটি বাক্য খুঁজে পেল। হাজার

বছরের পুরোনো প্রচলিত বাক্য। 'যন্ত্রণায় মানুষ তো চেতনাশূন্য হতে পারে, সাহসী হয় কীভাবে?' কথাটি ইমামা তাকে বলতে চাইল, তবে বলতে পারল না।

জীবনে এই প্রথম সালারের কথায় আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, আপত্তি করল না সে। 'বহু বছর সঙ্গী হয়ে থাকার মানুষটির সঙ্গেই তো ঝগড়া, তর্কবিতর্ক হয়।' বহু বছর তারা সঙ্গী হয়ে থেকেছে। এখন যা বাকি আছে, তা হলো অবকাশ। আর সেই অবকাশ তাকে কিছু বলার যোগ্যই রাখেনি। অভিযোগ, অভিমান, দুঃখ, আপত্তি, কিছুই বলতে সক্ষম রাখেনি। ইমামা কাঁদতে থাকল, আর সালার তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

: 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে।' অনেকক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার পর তার থেকে আলাদা হয়ে, যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে বলল।

: 'তুমি আবারও প্রশ্ন করছ?' সালারের মনে হলো তার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই।

হবো' ইমামা সালারের বাক্যটি এখন সালারকেই বলছে। সালার তার দিকে তাকিয়েই : 'না, প্রশ্ন করছি না। বলছি, সাহসের সঙ্গে তোমাকে এসব মোকাবিলা করতে চুপ রইল।

: 'অসুখ হয়েছে, মৃত্যু তো নয়।' ইমামা বলল। এ কেমন সান্ত্বনা দিল তাকে ইমামা! সে হয়তো ভেবেছে, সালারকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। তার কান্না দেখে সে হয়তো অস্থির হচ্ছে। কিন্তু ইমামা এটি বুঝতে পারল না যে, তার ঠোঁটের ভাষা তার মুখের ভাষার সাথে মিলছে না। রক্তিম ফোলা চোখ ও নড়বড়ে গলায় ইমামা তাকে যে ভরসা দিচ্ছে, এর বাস্তবতা সে নিজেও জানে। সালারকেও যেন সেই ভরসাই দিচ্ছে।

: 'তুমি যেহেতু বলছ, তাই বিশ্বাস করলাম।' সালার মুচকি হেসে বলল। ইমামার চোখে অশ্রুর আরও একটি সয়লাব এলো।



: 'আমি জীবনে তোমাকে অনেক অশ্রু উপহার দিয়েছি, তোমার কান্নার বহু কারণ হয়েছি।' তার কান্না দেখে সালার বলল। কিন্তু আজকের এই কান্না তাকে অদ্ভুত আঘাত করছে। অশ্রু চোখে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ইমামা হাসল।

: হ্যাঁ, কিন্তু আমার জীবনের সমস্ত খুশি ও আনন্দের কারণও তুমি।

সালার তার মুখের দিকে তাকিয়েই চুপ রইল। কিছুই বলল না। তারপর উঠে একেবারে দাঁড়িয়ে গেল।

: 'শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।' বলেই কাপড় পালটাতে সালার ওয়াশরুমে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল, ইমামা ওভাবেই ওখানে বসে আছে। রিপোর্টের ভূপ আবারও কোলে নিয়ে। এমন যেন সেগুলোতে মিথ্যা বের করতে চাচ্ছে, কিংবা

কোনো ভুল বা কোনো ভুল বোঝাবুঝি। যদিও এর কোনো আশা নেই।

সালার চুপচাপ তার কোল থেকে ফাইলগুলো উঠিয়ে নিল।
ইমামা কোনো আপত্তি করল না।

: 'ইমামা! একটা কথা দাও!' ফাইলগুলো কেবিনেটে রাখতে
রাখতে সালার তাকে বলল।

: 'কী?' ওড়নায় চোখ মুছতে মুছতে সে উত্তর করল।

: বাচ্চারা যেন কিছু জানতে না পারে, তারা অনেক ছোট।

প্রত্যুত্তরে ইমামা মাথা নাড়ল।



: 'ব্রেন টিউমার কী?' দোয়া শেষ করতেই হামিন জিবরিলকে জিজ্ঞেস করল। জিবরিলের চেহারার রং উবে গেল। একটু আগেই সে রুমে এসেছে।

: 'তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ?' জিবরিলের মনে হলো হামিন হয়তো ইচ্ছে করেই প্রশ্নটি করেছে। এমন যেন, তার চুরি ধরে ফেলেছে। 'কোনো রোগ নাকি?' প্রশ্ন করার

পরও হামিন অনুমান করল।

: 'তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ?' জিবরিল আবারও তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, পালটা প্রশ্নটি করল। আর মনে মনে দোয়া করতে লাগল, হামিন যেন এর কিছুই না জানে।

: 'আমাদের ফ্যামিলিতে কারও ব্রেন টিউমার হয়েছে।' হামিন অবশেষে ঘোষণা করল। জিবরিল, ইনায়া ও রাইসার দিকে তাকাল; তারা দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে।

: 'I think Dada has got brain tumor. আমার মনে হয় দাদুর ব্রেন টিউমার হয়েছে।' জিবরিল উত্তর করার আগেই হামিন আবারও তার মতামত জানাল। 'He told Mummy and Mummy got upset. তিনি মাম্মিকে বলেছেন, আর মাম্মি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

জিবরিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুদ্ধ হয়ে রইল। তার মানে তার মাও এটি জেনে গিয়েছে। তার দাদাও, এমনকি পুরো পরিবারও। জিবরিল ভাবতে থাকল।

: 'Is Dada going to die? দাদা কি মারা যাচ্ছেন?' হামিন এবার শুয়ে শুয়েই অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে জিবরিলকে প্রশ্ন করল।

: 'না' সে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বলে ফেলল।

: 'I thank God... I love him so much. থ্যাংক গড, উনাকে আমি অনেক ভালোবাসি।' হামিন তার কচি কচি হাতগুলো বুকে বেঁধে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

: 'ঠিক আছে তাহলে।'

: 'হামিন, এই কথা তুমি কাউকে বলো না।' জিবরিল হঠাৎ তাকে থামাল।

: 'দাদার ব্রেন টিউমারের কথা?' হামিন অনুসন্ধানী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

: হ্যাঁ।

: কেন?

এই 'কেন'র কোনো যৌক্তিক উত্তর নেই তার কাছে। আবার উত্তর দেওয়া ছাড়া হামিনকে সে থামাতেও পারবে না।

তাই। : এটা মাম্মির সিক্রেট কথা। তিনি একে সবার সামনে প্রকাশ করতে চান না,

: 'ওহ, হ্যাঁ।' হামিন সাথে সাথে বুঝে গেল।

: 'দাদা মাম্মিকে এই কথা বলতেই তিনি চিন্তায় পড়ে গেছেন। এখন তুমি যদি কাউকে বলো, সেও চিন্তিত হয়ে পড়বে।' জিবরিল যতটা সম্ভব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই গোপন তথ্যটি যেন ফাঁস না হয়ে যায়, তাই যুক্তির মাধ্যমে এর বাঁধন আরও শক্ত করছে। এই ছোট শিশুটি বাবা-মায়ের গোপন কথাকে গোপন রাখতে গিয়ে ক্রমশ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

: 'ওহ মাই গড! আমি তো এটা ভেবেই দেখিনি।' হামিনের হঠাৎ খেয়াল হলো, জিবরিলের কথা না শুনে কত বড় ভুল

করতে বসেছিল সে! জিবরিল এখন ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়েছে।

: 'মানুষকে চিন্তায় ফেলা গুনাহের কাজ, তাই না?' একটি নীরব ফিসফিসানির শব্দ পুনরায় জিবরিলের কানে বেজে উঠল।

: 'হ্যাঁ, এটা অনেক বড় গুনাহ।' অন্ধকারে জিবরিল তার মতোই ফিসফিস করে তাকে ভয় দেখাল।

: 'আঁ... আচ্ছা, ওকে।' হামিনের গলায় এবার ভয় প্রকাশ পেল। আর সে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। এরপর থেকে ইদানীং সে সব কাজ করার আগে দাঁড়িপাল্লায় মেনে নিতে লাগল যে, এই কাজ গুনাহ নয় তো?

জিবরিল ওভাবেই কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। ঘুম তার চোখ থেকে বহু মাইল দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হামিনের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। তার নাক ডাকার শব্দে সে প্রচণ্ড বিরক্ত। তাই

সবসময় হামিনের আগে ঘুমানোর চেষ্টা থাকে। কারণ, হামিন আগে ঘুমিয়ে পড়লে সেই নাক ডাকার শব্দে তার ঘুমই আসে না। কিন্তু আজ সে ইচ্ছে করেই হামিনের ঘুমানোর অপেক্ষা করেছে। যখন নিশ্চিত হলো, হামিন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে বিছানা ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে পুনরায় লাউঞ্জে চলে এলো। এখানে লাইট এখন অফ। লাইট না জ্বালিয়েই সে কম্পিউটার অন করল। পুনরায় ওইসব মেডিকেল ওয়েবসাইটগুলো দেখতে লাগল।

সাড়ে নয় বছর বয়সে মুহাম্মদ জিবরিল সিকান্দার এই প্রথম ব্রেন টিউমার সম্পর্কে পড়ছে। নিউরো সার্জারি সম্পর্কে, নিউরো-অনকোলজি সম্পর্কে, অলিগোডেনড্রোগ্লিওমাস এবং এগুলোর প্রতিটি ধরন ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে। আগে থেকেই সে বিজ্ঞানের ক্লাসে মস্তিষ্ক সম্পর্কে অনেক আগ্রহী। কিন্তু এখন এই মস্তিষ্ক ও তাতে ছড়িয়ে পড়া রোগ তার ওই মানুষটির জীবনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যে মানুষটিকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে। জিবরিল এর চিকিৎসা খুঁজে

বের করতে চাচ্ছে, যাতে তার বাবার জীবন বাঁচাতে পারে। এটি সাড়ে নয় বছর বয়সে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের রোগ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া, পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সার্জনের শৈশব।

সালার সিকান্দার তার রোগ সম্পর্কে যতটা জানে, জিবরিল এই এক রাতেই তার চেয়ে দশ গুণ বেশি জেনে ফেলেছে। আর আজ রাতই প্রথম ও শেষ রাত নয়। এটি তার জীবনের সেই দীর্ঘতম রাতগুলোর সূচনা, যে রাতগুলো কাটতে চলেছে মস্তিষ্কের রহস্য উন্মোচনের সাধনায়! এভাবেই একদিন সে হবে পৃথিবীর সেরা একজন নিউরোসার্জন। স্নায়ু বিশেষজ্ঞ।

১৭

ইমামার চোখে একটুও ঘুম আসছে না। সালার ঘুমিয়ে যাওয়ার পরও সে এমনভাবে জেগে আছে, যেন ঘুম নামের কোনো জিনিস সে চিনেই না। সবসময় সে ভয় করত, যাকে সে



ভালোবাসে, তাকেই কেড়ে নেওয়া হয়। সালারকে সে ভালোবাসত না। আর ভালোবাসতে শুরু করার পরও মুখ ফুটে বলতে চাইত না। তাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে থাকত। ভালোবাসা এমন এক খুনি বস্তু, যা তরবারি দিয়ে খুন করে না; 'হয়ে যাওয়া' দিয়েই খুন করে। ভালোবাসা হয়ে গেছে মানেই, খুন হয়ে গেছে।

লাহোরে নদীর কিনারে দেখা পাওয়া সেই যাযাবর বুড়িমার কথাও সে সালারকে বলেছিল। সালার তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল, ইমামা এমন নরম হলো কীভাবে! তার মন কীভাবে পালটে গেল! বুড়িমার গল্পটি সে খুব আগ্রহভরে শুনেছিল। তবে বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছিল, ইমামার মানসিক অবস্থার কারণেই এমন গল্প ভেবে নিয়েছে। চেষ্টা করেও বুড়িমাকে পরে আর খুঁজে পায়নি, এ কথাটিও সালার খুব গুরুত্বসহকারে নেয়নি। আর আজ এত বছর পর ইমামার আবারও সেই বুড়িমার কথা মনে পড়ছে। বুড়িমাকে এখন কোথাও খুঁজে পেলে ইমামা

তাকে বলত, আমি যাকে ভালোবাসি, আমার থেকে সে হারিয়ে যায়, এ কথাটি আমার নিছক কল্পনা নয়।

সালারের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। এখন রাত কয়টা তা সে বলতে পারছে না। পাশের বিছানায় ইমামা নেই, সোফায় বসে আছে সে। সালার বেডসাইড টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিল। ইমামা সত্যিই ওখানে বসে আছে, মাথা নিচু করে। রুমে আলো জ্বলার পরও সে সালারের দিকে তাকাল না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সালার দুচোখ কচলাল। তারপর উঠে ইমামার পাশের সোফায় এসে বসে পড়ল।

: 'তুমি জানো, তোমাকে এসব কেন বলতে চাইনি আমি? শুধু এজন্যই। তুমি আমাকে অনেক চিন্তায় ফেলছ।' সালার শান্ত স্বরে তাকে বলল। সে তাকে শাসাতে চাচ্ছিল, কিন্তু শাসাতে পারল না। ইমামা মাথা তুলে সালারের দিকে তাকাল, 'আমার ঘুম আসছে না।'

: 'তুমি ঘুমানোর জন্য শুলেই না ঘুম আসবো' জবাবে সালার বলল। ইমামা চুপচাপ তার কাছ থেকে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার এই আনুগত্য সালারকে প্রচণ্ড আঘাত করল। লাইট অফ করে সেও এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এখন তার চোখ থেকেও হাজার মাইল দূরে!

১৮

অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশের প্রভাব সে পরের দিন থেকেই টের পেতে শুরু করল। বোর্ড অব গভর্নর্সের পাঁচ সদস্যের পর, একে একে আরও অনেকেই তাকে কল ও মেসেজ দিতে শুরু করল-যারা তার এই অর্থব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছিল। সালার সিকান্দারের জীবন নিয়ে তাদের কোনো দূশ্চিন্তা নেই। তাদের দূশ্চিন্তা, তাদের বিনিয়োগকৃত টাকার নিরাপত্তা নিয়ে। সালারের নামের কারণেই তারা এই প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছিল।

এটি সালার সিকান্দার ও তার সাথীদের জন্য একটি বড় আঘাত। প্রতিষ্ঠানের এই পর্যায়ে এসে এমন একটি আঘাত তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য প্রচণ্ড ক্ষতিকর। পরবর্তী কয়েক দিন সালার সারা দুনিয়া থেকে আগত কল, ইমেইল আর মেসেজের প্লাবনের ডুবে রইল। কিছু বড় বড় বিনিয়োগকারী সরে পড়েছে। প্রতিষ্ঠান চালু হয়ে সফল হলে পুনরায় তারা আসবে। বাকি বিনিয়োগকারীদের ধরে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন ছিল, আর সেই চেষ্টাটাই তারা সবাই মিলে করছে।

একটি পুঁজিবাদী দুনিয়ায় টাকা শুধু টাকার পেছনেই দৌড়ায়। টাকা সাপের মতো। ভীতু-সামান্য আশঙ্কার গন্ধ পেলেই সরে পড়ে। বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, বিশ্বাস-কোনো কিছুই তাকে আটকাতে পারে না। তাকে আটকাতে পারে কেবল নিরাপত্তা আর উন্নতি। টাকা শুধু সেখানেই স্থির হয়, যেখানে সে ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে। দিনদিন দ্বিগুণ-চারগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। যেখানে তার উন্নতি নিয়ে সন্দেহ, সেখানে সে থামে না।



সালার সিকান্দার জীবনের বড় একটি অংশ কাটিয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং-এ। বিনিয়োগকারীদের মনস্তত্ত্ব আর মানসিকতা তার হাতের রেখার মতো চেনা। কখন তারা ডালে বসা পাখির মতো উড়ে যায়, আর কখন দানা খেতে নেমে আসে, এটা তার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রভুদের ষড়যন্ত্রের নিয়ামতে এক জটিল পরিস্থিতিতে আটকে পড়েছে সে।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ তাদের কাছে প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময়ের চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে পড়ল। তাদের সব বড় বড় বিনিয়োগকারী চলে গেছে। তার মানে হলো, তাদের ৭০% পুঁজি হাতে আসার আগেই হারিয়ে গেছে। বাকি ৩০% ছিল বোর্ড অফ ডিরেক্টর অর্থাৎ তাদের ছয় বন্ধুর নিজস্ব অবদান। আর সেই সব টাকাই ইনভেস্ট হিসেবে রাখা আছে। গত পাঁচ বছর ধরে তারা এই ৩০% অর্থ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জমা করেছে। তাদের কাছে চলতি মূলধন খুব কম। অথচ

চলতি মূলধনের ওপর ভিত্তি করেই এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছে।

একজন বিনিয়োগকারী চুক্তি সম্পন্ন করার পর ছেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো, হাজারো নতুন বিনিয়োগকারীরা নিজেদেরকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া। তারা ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে, নতুন আগতদের আসার সম্ভাবনাও শেষ করে দিয়ে যায়। পাঁচ বছরের রাত দিনের এই পরিশ্রম যেন, কয়েক সপ্তাহেই ধোঁয়ার মতো নাই হয়ে গেল। যদিও তারা একদম দেউলিয়া হয়ে যায়নি, তবু তাদের যথেষ্ট সুনাম ভেঙে পড়েছে।

আর এই পুরো ঘটনাটি তাকে আরও একটি শিক্ষা দিল যে, কোনো প্রতিষ্ঠান এক ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে দাঁড় করানো উচিত নয়। ওয়ান ম্যান শো-তে সেই ওয়ান বা একক ব্যক্তিটি শেষ হয়ে গেলে, অর্ধেক দর্শককেও পুনরায় ধরে রাখা যায় না। এটি একটি অনেক বড় শিক্ষা, সালার সিকান্দার যা চরম মূল্য দিয়ে অর্জন করল। জীবনে সে খুব কমই হতাশ হয়েছে। খুব

কমই তার মনে হয়েছে, এটি আমি করতে পারব না। আর আজ এই প্রথম তাকে বসে ভাবতে হচ্ছে, এটা কি সে করতে পারবে না? সে কি তবে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতার চেয়ে বড় কোনো স্বপ্ন দেখছে? তার পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা কি ঠিকই ছিল, যারা তাকে এ পথে হাঁটতে নিষেধ করেছিল? সে বুঝতে পারছে না, এতটা নেতিবাচক হয়ে কেন সে ভাবছে। হয়তো এর একটি মূল কারণ তার অসুস্থতা। যে অসুস্থতা তার চলমান জীবনে, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর কথা ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক শব্দ করে প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে। সাত থেকে দশ বছর, যা তার করা দরকার, এর কম সময়ের মধ্যেই তাকে করতে হবে। প্রাণঘাতী অসুস্থতা তাকে হায়াতের এই সীমা বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু এই সীমার প্রান্ত কোথায়? এর প্রান্ত কীভাবে ধরবে, এই মুহূর্তে এটা তার বুঝে আসছে না।



: 'আমি যদি তোমাকে একটি খারাপ সংবাদ বলি, তাহলে কি তুমি চিন্তিত হবে?'

পরের দিন স্কুল শেষে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে হামিন সিকান্দার রাইসাকে বলল। ড্রাইভার ইনায়া ও জিবরিলকে গাড়িতে তোলার আগে প্রতিদিন তাদের দুজনকে তোলে। তারপর অপর ক্যাম্পাস থেকে জিবরিল ও ইনায়াকে ওঠায়। এক মুহূর্তের জন্য রাইসা বুঝতে পারল না হামিনের এই প্রশ্নের উত্তর সে কী দেবে। জিবরিলের বোঝানো-সোঝানো আর শাসানোর পর এতটুকু সময়ই কোনো সংবাদ পেটে চেপে রাখতে পারে। এর বেশি পারে না। এখন সেই সময় ফুরিয়ে গেছে। আর চেপে রাখা সম্ভব নয়। বাসায় রাইসা একমাত্র ব্যক্তি, যার কাছে সে প্রতিটি ব্রেকিং নিউজ সবার আগে গিয়ে বলে। কারণ, রাইসা ছাড়া আর কেউ তার কথা এতটা মনোযোগ দিয়ে শোনে না। সে কেবল তার কথা আগ্রহভরে শোনেই না, বরং 'আমান্না ও সাদাকনা' বলে তাতে বিশ্বাসও করে।

ঘরে এখন বাচ্চাদের দুটি গ্রুপ। জিবরিল-ইনায়া; এরা দুজন অসাধারণ ও বুদ্ধিমান। আর হামিন-রাইসা; এই দুজনকে কোনো এক ক্যাটাগরিতে ফেলা মুশকিল। কারণ, তারা কোনো এক ক্যাটাগরিতে সীমাবদ্ধ নয়। হামিন প্রচণ্ড দুষ্ট ও বাকপটু। প্রশ্নে ঠাসা তার মন। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড মেধাবী। পড়াশোনা নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই, যত চিন্তা তার বাবা-মায়ের। রাইসা তার বিপরীত। শান্ত, ভদ্র, ভেবেচিন্তে কথা বলে। কিন্তু মেধায় মধ্যম। জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাসের দিক থেকে সে জিবরিল ও ইনায়ার গ্রুপে খুব ভালো করে মিলে। কিন্তু মেধার দিক থেকে সে কোনো গ্রুপেই পড়ে না।

সালারের এই তিন সন্তানের মধ্যে মেধার দিক থেকে উনিশ-বিশ পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু মেধা ও অভ্যাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হামিন সিকান্দারের সঙ্গে তার চমৎকার মিল। ঘরে তারা দুজনই সবচেয়ে ছোট। জিবরিল ও ইনায়ার মতো, তারা দুজনও একসঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। এমন প্রশ্নে রাইসা তার

কথা পুরোপুরি বুঝতে পারল না। কিন্তু তবু তার মনে খুঁতখুঁত করতে লাগল।

: 'না, আমি চিন্তিত হব না।' কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল।

: 'গ্রেট! চমৎকার!' হামিনের মুখ ঝলমলিয়ে উঠল। রাইসা যেহেতু চিন্তিত হবে না, তাহলে সে একটি গুনাহ থেকেও বাঁচতে পারবে, আবার চেপে রাখা কথা প্রকাশ করে মনের ভারও হালকা করতে পারবে।

: 'তুমি কি জানো, আজকাল মান্নি-পাপা চিন্তিত কেন?' সে এখন অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে নাশতার টেবিলে সালার ও ইমামার রহস্যময় নীরবতার তথ্য ফাঁস করতে যাচ্ছে।

: 'কেন?' রাইসা প্রচণ্ড আগ্রহী হলো।

: 'দাদুর ব্রেন টিউমার হয়েছে।' রাইসা প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবে তার মুখের দিকে তাকাল। হামিন তাকে প্রভাবিত করতে আরও বিস্তারিতভাবে বলল, 'এটি একটি রোগ। কিন্তু এতে তিনি মরবেন না।' এ কথাটিও রাইসার বুঝে এলো না।

: 'ওকে।' অভ্যাস মোতাবেক রাইসা তার কথায় উত্তর করল। তারপর ফ্রকের পকেট থেকে হামিনের দেওয়া চকলেটটি বের করে খেতে লাগল।

: 'এটা অনেক বড় একটি সিক্রেট। বরং টপ সিক্রেট।' রাইসাকে খুব বেশি প্রভাবিত হতে না দেখে, হামিন তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করল। রাইসা চকলেট চিবোতে চিবোতে হঠাৎ থেমে তার দিকে তাকাল। 'ওয়াও!' তারপর সে প্রভাবিত হওয়ার ভান করল। কিন্তু হামিন তেতে উঠল।

: আমি তোমাকে একটা খারাপ খবর শুনিয়েছি, আর তুমি বলছ 'ওয়াও'?

: 'তাহলে আমি কী বলব?' রাইসা ভীত হয়ে পড়ল। হামিন দু-হাত কোমরে চেপে প্রচণ্ড মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বলবে, ওহ মাই গড!' হামিন

তার সবসময় বলা বাক্যটি রাইসাকে হুবহু রপ্ত করাতে চেষ্টা করল।

: 'ওহ মাই গড!' রাইসা তার বাক্যটি তার মতো করেই বলার পরিপূর্ণ চেষ্টা করল।

: 'হ্যাঁ, একদম এভাবেই।' হামিন যেন তার উপস্থাপনা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বাহবা দিল। 'এখন কারও কাছে এই সিক্রেট বলো না। ওকে?' রাইসাকে সে পুনরায় সতর্ক করল। 'মনে রেখো, মানুষকে চিন্তিত করা গুনাহ।' এবার সে তাকে সব

সময়ের মতো সবক দিতে লাগল। রাইসাও সব সময়ের মতো চুপচাপ মাথা নাড়ল।

হামিনের কথা সে অর্ধেক বুঝতে পারল, অর্ধেক পারল না। কিন্তু কারও কাছে বলা যাবে না, এটি সে বুঝতে পেরেছে। হামিন এত কঠিন সতর্ক না করলেও রাইসা কাউকে কিছু বলবে না। ঘরের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে কম কথা বলে। হামিনের সঙ্গে এত মিল থাকার পরও সে কথা শুরু করতে পারে না। সে লজ্জা পায়, সংকোচবোধ করে কিংবা আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে। সালারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করা তার জন্য অনেক কঠিন। সে কেবল কথার উত্তর দেয়, উসকানি দিলে প্রশ্ন করে, কিন্তু কেউ ডাক না দিলে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকে। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। কিংবা খেলনা নিয়ে পড়ে থাকে।

: 'গাড়ি এসে পড়েছে।' হামিন তাকে সতর্ক করার পর গেইটে ড্রাইভারকে আসতে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিৎকার করল। সেই সঙ্গে রাইসাকে সতর্কও। 'মনে রেখো, এটি একটি সিক্রেট।'



হামিন তার ব্যাগ ওঠাতে ওঠাতে ঠোঁটে এক আঙুল চেপে দেখাল। তারপর সেই হাত মুঠিবদ্ধ করে নিল। রাইসাও ব্যাগ ওঠানোর আগে তাকে অনুকরণ করল। তারপর হামিন হাত উচিয়ে হাই ফাইভ (উল্লাস) করতে লাগল। রাইসাও প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে তার হাতের মুষ্টি, হামিনের হাতের মুষ্টির সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে করতে হাই ফাইভ করতে লাগল।

২০

: 'সালার, কিছুক্ষণের জন্য এসব রাখো।' ইমামা অবশেষে তাকে বলল। অনেকক্ষণ ধরে সে কারও সঙ্গে কথা বলছিল। ফোনে কথা বলতে বলতে সে ডিনারের কথাই ভুলে গিয়েছে। ইমামা অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটু পরপর তাকে দেখতে বেডরুমে আসছে। তাকে ধারাবাহিক কলে ব্যস্ত দেখে অবশেষে বাচ্চাদের খাইয়ে দিয়েছে। আর এখন রুমে আসতেই দেখল সালার মাত্র কল কেটেছে।



খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই সালার না করে দিল। সোফায় বসে সে হাতের আঙুলে চোখ কচলাচ্ছে। তাকে প্রচণ্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ইমামা তার পাশে এসে বসে পড়ল। যে পরিস্থিতিতে সে আছে, এ ব্যাপারে ইমামা বেখবর নয়। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। বেশির চেয়ে বেশি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। কিন্তু সে এও বুঝে গিয়েছে যে, তার সান্ত্বনা সালারের কাছে কেবল এক শিশুসুলভ মন ভোলানোর প্রচেষ্টা। সালারের রাতের ঘুম যেহেতু হারাম হয়ে গিয়েছে, তাহলে বিষয়টি সত্যিই নাজুক।

সে আর সালার কয়েক দিন ধরে নিজেদের মধ্যে খুব কমই কথা বলতে পারছে। একটু-আধটু কথা হলেও সেগুলো কেবল তার চিকিৎসা সংক্রান্ত। এখন ইমামার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কেবল সালারের জীবন। তার সুস্থতায় এখন তার একমাত্র আরাধ্য বিষয়। চেষ্টা করেও সে মাথা থেকে এটি ফেলতে পারছে না। এদিকে কিনশাসায় চাকরির শেষ সময়ে এসে, ইমামার পাশে বসে অসুস্থতার ব্যাপারে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলার সময় নেই তার।

: 'কী ছেড়ে দেব?' সালার চোখ কচলাতে কচলাতে চমকে তার দিকে মনোনিবেশ করল।

: কাজ।

: 'আচ্ছা!' সালার হাসতে লাগল।

: 'সবকিছু ছেড়ে কেবল চিকিৎসার জন্য সময় দাও। নিজের স্বাস্থ্য, নিজের জীবনের প্রতি মনোযোগ দাও। আমাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।' ইমামা যেন এখন তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

: ইমামা! আমার কাছে বিকল্প নেই। আর আমার কাছে এত সময়ও নেই যে, এক সময়ে কেবল একটি কাজ নিয়েই পড়ে থাকব।

তার কথা শুনে ইমামা যেন কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না। কিছুক্ষণ সে চুপচাপ বসে রইল।

'আজকাল সব দিক থেকে আমি বিপদে জড়িয়ে আছি। খারাপ সময় আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু এমন খারাপ নয় যে, যা-ই ছুঁই, তা-ই বালি হয়ে যায়। ঝরে পড়ে ধরার আগেই।' মাথা নিচু করে বলে চলল সালার। ইমামার চোখ ভিজে উঠতে লাগল। কয়েক সপ্তাহ ধরে সে লাগাতার কেঁদে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও চোখের পানি যেন শেষই হচ্ছে না। সেটি যেন কূপ হয়ে গেছে।

'পাপী তো আমি সবসময়ই। কুধারণা ও অহংকার তো আমি কখনো করিনি। করে থাকলেও তাওবা করে নিয়েছি। কিন্তু জানি না কী এমন পাপ করেছি যে, এমন বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।'

: 'এটি পরীক্ষা সালার! একে পাপের সাজা মনে করছ কেন?'
ইমামা তার কবজিতে হাত রাখল।

: 'হায়! এটা যদি পরীক্ষাই হতো এবং শেষ হয়ে যেত। অন্তহীন সাজা না হতো!' সালার বিড়বিড় বলল। 'তোমার কাছে কত সেভিংস আছে?' সালার কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গ পালটাল।

: 'আমার কাছে?' ইমামা বিক্ষিপ্ত হলো। 'জানি না। পাকিস্তানে ব্যাংকে হয়তো অনেক আছে। বিয়ের আগেরও আছে। পরেও জমা করেছি সবসময়। কিন্তু সঠিক অঙ্কটা আমার জানা নেই। তোমার প্রয়োজন কী?' সে হুট করেই সালারকে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন হয়তো তোমাকে ওগুলো বাচ্চাদের পেছনে খরচ করতে হতে পারে। এখান থেকে পাকিস্তানে গেলে ওখানে পাপার সঙ্গে তোমাদের কতদিন থাকতে হবে, তা বলতে পারছি না। কয়েক মাস থাকতে হতে পারে, নাকি কয়েক বছর? তাও জানি না।' সালার ধীরে ধীরে বলে চলল। 'ওখানে বাবার কাছে বাচ্চাদের

পড়াশোনায় অন্তত এসব ঝামেলার প্রভাব পড়বে না। এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে আমেরিকায় রাখার খরচ বহন করতে পারব না। বিশেষ করে এখন যেহেতু আমার চাকরি শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমার ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুরু করার আগেই বহু ঝামেলায় পড়ে আছি। তার ওপর এই টিউমার। বিশ্বব্যাংকের চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকায় আমার মেডিকেল ইন্সুরেন্সও শেষ হয়ে যাবে। সেটা ক্যানসারের চিকিৎসাখরচ পুরোপুরি বহন করতে পারে না।" সালার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তাই আমি বুঝতে পারছি না, কী করব, আর কী করব না।'

: সালার, এই মুহূর্তে তুমি কেবল একটি জিনিসেই মনোযোগ দাও, তোমার অপারেশন ও চিকিৎসায়। বাকি সবকিছু হয়ে যাবে। বাচ্চাদের পড়াশোনা, তোমার প্রতিষ্ঠান, সবকিছুই। আর টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। বিক্রি করার মতো অনেক কিছুই আছে আমার কাছে।

সালার তাকে থামিয়ে দিল। 'না, এখন আর একটা জিনিসও বিক্রি করব না। এগুলো তোমার থাকা উচিত। তোমাকে একটি বাড়ি বানিয়ে দিতে পারিনি। কিছু তো থাকা উচিত তোমার কাছে, যে...।'

ইমামা তার ঠোঁটে হাত চেপে ধরল। 'আর কিছু বলো না। আমাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বলো না। এই সবকিছু আমার কাছে থাকবে, আর তুমি আমার কাছে থাকবে না, তাহলে এই ভবিষ্যৎ দিয়ে আমি কী করব?' অশ্রু ঝরনার মতো তার গাল বেয়ে ঝরতে লাগল। 'ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই সালার! যা আছে, তা হলো বর্তমান। আজকের দিনটাই আছে, আগামীকালের ভরসা নেই। পড়াশোনা করে নিবে বাচ্চারা। খুব ভালো স্কুলে না পড়লেও, পড়বে তো। আগামীকাল নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি আমি।' ইমামা কেঁদেই চলছে।

: 'তুমি জানো ইমামা! কোন জিনিসটি নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়?' সালার প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করল। তার অশ্রু

থামানোর জন্য এছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। 'তুমি ঠিকই বলো, আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময় সুদের ওপর দাঁড়ানো প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কাজ করতে করতে শেষ করে দিয়েছি। কেবল কয়েক বছর আগেই যদি আমার প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ শুরু করতাম, তাহলে আজ এই প্রতিষ্ঠান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তখন আমার রোগ হলেও এই কষ্ট হতো না যে, আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারিনি। এটি অনেক বড় একটা আফসোস আমার। যে আফসোস আমার গলায় বেড়ির মতো পেঁচিয়ে আছে।' সালার প্রচণ্ড ব্যথিত হয়ে পড়েছে।

: 'এমন কেন ভাবছ তুমি? তুমি তো চেষ্টা করছ। পরিশ্রম করছ তুমি। নিজের ভুল সংশোধনের জন্য মেহনত করছ।' সালারের কথায় ইমামা যেন কেঁপে উঠেছে।

: হ্যাঁ, কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

: তুমি আশা ছেড়ে দিয়েছ?

: 'না। আশা তো ছাড়িনি, কিন্তু...' কথা বলতে বলতে সালার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। 'আমার কখনো মনেই হয়নি যে, এত অল্প সময় বাকি আছে। যতক্ষণ সবকিছু ঠিক থাকে, তখন আমাদের মনে হয়, আমাদের কাছে অনেক সময়। সবকিছু করে ফেলব। সবকিছু হয়ে যাবো। আর ভাবি, যেসব কাজ আমাদের নফসের পছন্দ, সেগুলো আগে করে ফেলি, আর যেগুলো আল্লাহ তাআলার পছন্দ, সেগুলো শেষ বয়সের জন্য ফেলে রাখি। আমিও তার ভিন্ন নই। আমিও এমনটাই করেছি।' সালার প্রচণ্ড ব্যথিত হয়ে হাতে হাত ঘষতে লাগল।

: 'কুরআন বলে, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন প্রতিদান ও শান্তির জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তখন সে চিৎকার করে করে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরও একবার দুনিয়াতে পাঠাও। আরও একটি সুযোগ দাও। এবার আমি তোমার আনুগত্য করব, গুনাহ থেকে দূরে থাকব। কিয়ামতের দিন



কেমন হবে? কুরআনের এ কথাটি আমার চেয়ে অধিক ভালো আর কেউ বুঝতে পারবে না। আরেকবার দুনিয়ায় পাঠানোর ফরিয়াদ কেমন হবে, আরও একটি সুযোগ পাওয়ার আর্তনাদ কেমন হবে।" তার গলা ভরে উঠল। 'একবার আমি মারগালার পাহাড়ে, মাঝরাতে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম, তিনি যেন আমাকে একটি সুযোগ দেন। যেন আমি সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করতে পারি। যেসব পাপ আমি করেছি, এগুলো যেন আর না করি। আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, সমস্ত গুনাহ থেকে আমি তাওবা করে ফেলেছি। কিন্তু এমন ছিল না। আমি ছোট ছোট গুনাহ থেকে তাওবা করে, বড় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি আল্লাহর কাছে আরও একটি সুযোগ প্রার্থনা করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার মধ্যে সেই সাহস নেই। আল্লাহর সামনে আমার অনেক লজ্জা অনুভূত হচ্ছে।' সালার তার অশ্রু মুছতে মুছতে হেসে উঠল। 'এখন আমি কেবল আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার জীবন নয়, বরং শুধু এই কাজটি পূর্ণ করতে দেন। এটি যদি আমি করতে না

পারি, তাহলে আমার দোয়া হলো, আমার সন্তানেরা যেন একে পূর্ণতা দেয়। যদি আমি না থাকি, তাহলে তুমি জিবরিলকে একজন অর্থনীতিবিদ...।"

ইমামা তার কথা খামিয়ে দিল। 'এমন কেন ভাবছ তুমি?'

: ভাবা উচিত ইমামা।

: 'তুমিই করবে এই কাজ সালার! অন্য কেউ করতে পারবে না। তোমার কোনো সন্তানও নয়। সবাই সালার সিকান্দার হতে পারে না।' ইমামা হয়তো জীবনে এই প্রথম স্বীকারোক্তি দিচ্ছে। সালারের অনন্য হওয়ার স্বীকারোক্তি, তার বিশেষ হওয়ার স্বীকারোক্তি। সালারের জীবনের সমস্ত ভুলের গল্প শোনা সত্ত্বেও, তার জীবনের সমস্ত উত্থান-পতন জানা সত্ত্বেও, এটা স্বীকার করতে ইমামার সামান্য সন্দেহও নেই যে, তার স্বামী কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সালার আজ তার সঙ্গে কোনো বিতর্ক করল না।

যেভাবে সে নিজে ভেঙে পড়েছে, সেভাবে ইমামাকেও ভাঙতে চাচ্ছে না। এক সপ্তাহ পরে তাকে আরেকটি চেকআপ ও ট্রিটমেন্টের জন্য আমেরিকায় যেতে হবে। সালার নতুন কোনো দুঃসংবাদ শোনার জন্য নিজে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে।

২১

: মান্নি, আমি আপনাকে আপেল কেটে দেই?

জিবরিলের কথা শুনে ইমামা অবাক হলো। ঘরের জিনিসপত্র প্যাকিং চলছে। ইমামা প্রতিদিন অল্প অল্প জিনিস প্যাক করে করে এক জায়গায় জমাচ্ছে। এখনো সে প্যাকিংয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ জিবরিল এসে তার কাজে হাত লাগাতে লাগাতে তাকে এই প্রস্তাব করল। ইমামার অবাক হওয়াটা যৌক্তিক। ফল কেটে খাওয়ানোর প্রস্তাব হামিন করলে তা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু

জিবরিল কখনো এমন কাজ করে না। এমনকি সে নিজেও ফল খেতে অতটা আগ্রহী নয়।

: 'না, তুমি খেতে চাইলে আমি কেটে দেই?' প্রত্যুত্তরে ইমামা তাকে উলটো প্রস্তাব করল।

: 'না।' জিবরিল উত্তর করল। সে ওয়ারড্রবের খোলা আলমারি থেকে কাপড় বের করে করে ইমামার পাশে বিছানায় রাখছে। ইমামা সেগুলো একটি ব্যাগে ভরছে। সালারের অসুস্থতার পর এত মাসে এই প্রথম ইমামার চিন্তা হতে লাগল। তার সন্তানরা তার দুশ্চিন্তা ও কষ্ট অনুভব করতে শুরু করেছে। এটি কোনো ভালো লক্ষণ নয়। বহু মাস পর জিবরিলকে সে গভীরভাবে লক্ষ করল। দুয়েক মাস পরে সে দশ বছরে পৌঁছাতে যাচ্ছে। কিন্তু শরীরের গঠনে তাকে দশ বছরের চেয়েও বেশি বড় বড় লাগে। চেহারার দিক থেকে ইমামার সঙ্গে তার বেশি মিল। আর হামিনের মিল সালারের সঙ্গে। কিন্তু তার দুই সন্তানের চোখই সালারের মতো। বড়, গভীর, বুদ্ধিমত্তায় প্রদীপ্ত। তাদের চেহারা

দেখে না বুঝলেও, চোখ দেখে যে-কেউ বুঝে ফেলবে, এরা
সালার সিকান্দারের সন্তান।

: 'আপনি এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?' জিবরিল মায়ের দৃষ্টি
তার দিকে নিবন্ধ দেখে জিজ্ঞেস করল। ইমামা মুচকি হাসল।

: তুমি বড় হয়ে গেছ।

জিবরিল খানিক লজ্জা পেয়ে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর
লজ্জা মেশানো মুচকি হেসে বলল, 'একটু।'

: 'হ্যাঁ, একটু। জলদি পুরোপুরি বড় হয়ে যাবে।' ইমামা বিছানা
থেকে কাপড় তাকে ওঠাতে ওঠাতে বলল।

: 'কিন্তু আমি বড় হতে চাই না।' ব্যাগে কাপড় রাখতে রাখতে
ইমামা তাকে বলতে শুনল। জিবরিল এখন ওয়ারড্রবের আরও
একটি শেলফ খালি করছে।

: 'কেন?' ইমামা বিস্মিত হলো।

: 'এমনিই।' খুবই সাধারণ ভঙ্গিতে সে মাকে বলল।

এই প্রথম ইমামার কাছে জিবরিলের আচরণ বিক্ষিপ্ত মনে হলো। এই ঘরে কেবল ইমামা একাই চিন্তিত নয়, তাদের সবচেয়ে বড় সন্তানও এমন দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছে। কিন্তু এই দুশ্চিন্তার ধরন ও কারণ আগে সে বুঝতে পারেনি। ইমামা একে কেবল এক প্রতিক্রিয়া ভেবেছে। জিবরিল আগে থেকেই মায়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড অনুভূতিপ্রবণ। ইমামার কোনো দুশ্চিন্তা হলে সে-ই সবার আগে টের পেয়ে যায়। তারপর তো মাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারে না। এটাই তার স্বভাব।

ইমামা, তার ফল কাটার প্রস্তাবকে তেমনই কোনো উদ্বেগ মনে করল। সে জানে, এই অবস্থায় তাকে দেখলে যে-কেউই

তার দুশ্চিন্তা ধরে ফেলতে পারবে। বহুদিন ধরে তার ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য, চোখের নিচে কালো দাগ আর প্রায় সময় কান্নার ফলে রক্তিম ও ফোলা চোখ দেখে যে-কেউই তার মানসিক ও আবেগী অবস্থার কথা বলে দিতে পারবে। তাই জিবরিল যদি কিছু বুঝেও থাকে, তাহলে এটি কোনো অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইমামা খানিক বিভ্রান্ত হয়ে ওভাবেই ভাবতে ভাবতে জিনিসপত্র গোছাতে থাকল। আর ফাঁকে ফাঁকে জিবরিলের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন তার মনে হলো, নিজের ব্যাপারে জিবরিলকে কোনো সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেওয়া দরকার। এতে হয়তো তার দুশ্চিন্তা খানিক কমবে।

: 'জিবরিল, আমি ঠিক আছি।' বাক্যটি বলেই বুঝতে পারল, এর ভেতরটা কতটা ফাঁপা। জিবরিল ওয়ারড্রবের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জানি।'



ইমামা তার থেকে চোখ লুকিয়ে ফেলল। জিবরিল যেন মায়ের মান রাখল। মাকে সে লজ্জায় ফেলতে চাচ্ছে না। আর না তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে। কারণ, অনেকদিন পর তারা কথা বলার এমন সুযোগ পেয়েছে।

পুনরায় তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। ইমামা তখন হঠাৎ রুমে অদ্ভুত নীরবতা অনুভব করল। এতক্ষণ ধরে তারা কাজ করছে, অথচ তাদের মধ্যে খুব কম কথা হয়েছে। সাধারণত এমনটা হয় না। তার সঙ্গে জিবরিল যখনই একা কথা বলার সুযোগ পায়, তারা অনেক গল্পস্বল্প করে। জিবরিল তাকে স্কুলের অনেক গল্প শোনায়ে।

বন্ধুদের গল্প, শিক্ষকদের গল্প। গল্পবাজ না হওয়া সত্ত্বেও, এমন সুযোগে মায়ের কাছে সে অনেক কিছু বলত। কিন্তু আজ প্রথম ছোট ভাই-বোনদের অনুপস্থিতিতেও এতটা নিশ্চুপ সে।

ইমামার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এক অদ্ভুত ইঙ্গিত দিল। তার মনে হলো, জিবরিল যেন সবকিছু জানে। তা সম্ভব নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়।

: জিবরিল!

: 'জি মান্নি।' ইমামা ডাক দিতেই সে তার দিকে মনোযোগী হলো। ইমামা প্রশ্ন করতে করতে থেমে গেল। হতে পারে এটা তার মনের ভুল। জিবরিল সত্যিই কিছুই জানে না। আর যদি জেনেই না থাকে, তাহলে তাকে এই প্রশ্ন করা...। ইমামা প্রসঙ্গ পালটে ফেলল। 'কিছুদিন পরই তোমার কুরআন হেফজ শেষ হতে চলেছে। তারপর তুমি মাশাআল্লাহ হাফেজে কুরআন হয়ে যাবে। তুমি কুরআন পাক থেকে এ পর্যন্ত কী শিখেছ?' প্রসঙ্গ সে ওদিকে নিয়ে গেল, যে প্রসঙ্গে সে প্রায় সময় তার সঙ্গে কথা বলে।

জিবরিল এখন ওয়ারড্রবের আরও একটি ড্রয়ার খালি করতে যাচ্ছে। মায়ের প্রশ্নে হঠাৎ থমকে গেল।

: 'অনেক কিছু শিখেছি।' সে খানিক ভেবে মাকে বলল।

: 'যদি কোনো একটি জিনিসের কথা বলতে বলি, যেটা তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো লেগেছে, তাহলে কীসের কথা বলবে?' ইমামা নিশ্চিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে গিয়েছে।

: 'আপনি জানেন, কুরআনের কোন কথাটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়?' জিবরিলও এখন প্রচণ্ড আগ্রহভরে কথা বলতে শুরু করেছে।

: কী?

: Hope. আশা।

ইমামা তার মুখ দেখতে লাগল।

: 'কীভাবে?' জানে না কেন সে প্রশ্নটি করল।

: 'দেখুন, সমস্ত কুরআন একটি দোয়া। আর দোয়া মানেই হলো আশা। আল্লাহ সবকিছুর জন্য তিনি কুরআনে দোয়া উল্লেখ করে দিয়েছেন। তার অর্থ এই নয় কি, আল্লাহ সমস্ত বিপদে আমাদের আশাও দিয়ে রেখেছেন? কুরআন পাকে এটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে, আমরা যেন কখনো আশাহত না হই। কোনো গুনাহ হয়ে গেলেও না, কোনো বিপদে পড়লেও না। কেননা, আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন।' তার দশ বছরের ছেলে অসম্ভব সহজ শব্দে তার হাতে সেই জিনিস তুলে দিচ্ছে, পারোন, তা নিষ্পাপতা বুঝিয়ে দিচ্ছে। জিবরিল কথা বলতে বলতে থেমে গেল। আর ইমামার চোখে সে অশ্রুর ঝিলিক দেখতে পেল।

: 'আমি কি ভুল কিছু বলে ফেললাম?' সে একদম সতর্ক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা ভেজা চোখে, মুচকি হেসে মাথা

নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'না, তুমি একদম ঠিক বলেছ। আর তুমি একদম সঠিক জিনিসটিই বেছে নিয়েছ।'

চোখ মুছতে মুছতে ইমামা পুনরায় প্যাকিং করতে শুরু করল। আবারও তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আর কী শিখেছ তুমি কুরআন থেকে?

২২

: 'আপনি ভীষণ সৌভাগ্যবান যে, কাকতালীয়ভাবেই আপনি আপনার টিউমার সম্পর্কে আগেই জেনে গিয়েছেন। টিউমার খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে, শরীরে ছড়িয়ে পড়া লক্ষণ দেখে জানতে হয়নি।' আমেরিকায় আরও একটি টেস্ট করানোর পর একজন শীর্ষস্থানীয় নিউরোসার্জন সালারকে সুসংবাদ দিল। 'দুটি টিউমার আছে। একটি খুব ছোট, আরেকটি কিছুটা বড়। কিন্তু দুটোই এখন এমন পর্যায়ে আছে, যা কোনোরকম ক্ষতি ছাড়াই

সার্জারির মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।" ডাক্তার এখন তার সার্জারি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছেন।

করল। : 'সম্ভাব্য সবচেয়ে কম ক্ষতি কী হতে পারে?' কথার মাঝখানে সালার হস্তক্ষেপ

: 'নিউরোসার্জারি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সার্জারি। যে জায়গায় এই দুটো টিউমার আছে, সেই জায়গাটিও অনেক স্পর্শকাতর। এতে আপনার মস্তিষ্কে প্রভাব পড়তে পারে। আপনার স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রভাব পড়তে পারে। এতে আপনার পারকিনসন্স ডিজিজ বা কাঁপুনি রোগও হতে পারে। মাঝেমধ্যে মৃগীর আক্রমণ হতে পারে। আপনার দৃষ্টিশক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।' ডাক্তার এমনভাবে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো বলে চলছেন, যেন কোনো হোটেলের ওয়েটার মেনু কার্ড না দেখেই খাবারের আইটেমগুলো মুখস্থ বলে চলছে।

: 'আর যদি আমি সার্জারি না করাই, তাহলে?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'কিছুটা সময় আপনি সার্জারি ছাড়া থাকতে পারবেন। কারণ, আমি আপনাকে বলেছি, টিউমার এখনো আপনার মস্তিষ্ক ও শরীরে প্রভাব ছড়াতে শুরু করেনি। কিন্তু কিছু সময় পর তা প্রভাব ছড়াতে শুরু করবে। তখন সার্জারি করা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। আমার পরামর্শ হলো, এই ছোট টিউমারটি যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলুন। কারণ, এটা একটু বড় হলেই আপনার জীবন ঝুঁকিতে পড়বে। অপর টিউমারটি ওষুধ ও অন্যান্য মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, যাতে সেটি আর বড় হতে না পারে।' ডাক্তার নির্জীবভাবে তাকে বলে চলল। সেও নির্জীবভাবে অনুমান করতে লাগল, সার্জারি ছাড়া এভাবে কতদিন থাকতে পারবে।

: ছয় সাত মাস থাকতে পারবেন। কিন্তু আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিব না যে, আপনি এটা খুব বেশি দেরি করেন। যেসব

ওষুধ আপনি ব্যবহার করছেন, তা ছয়-সাত মাসের চেয়ে বেশি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না।

সালার মাথা নেড়েই চুপ রইল। এক মাস পর তাকে কিনশাসা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। তার তিন মাস পর নিজের প্রতিষ্ঠান লঞ্চ করতে হবে। তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, বিশ্বব্যাংকের চাকরি ছাড়ার পরপরই তাকে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে। আর একবার প্রতিষ্ঠান লঞ্চ হয়ে গেলে, সাথে সাথেই সে সার্জারি করাতে পারবে না। কারণ, প্রতিষ্ঠান লঞ্চ করার পর তাকে অনেক কাজ করতে হবে। আর সেগুলো নিজে থেকে করতে হবে। একেবারে গায়েব হয়ে যেতে পারবে না। এমনটা করলে, তা তার নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মারাত্মক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে। আর আল্লাহ না করুক, তখন যদি তার সার্জারি সফল না হয়। তাই ছয়-সাত মাস পর সে সার্জারি করতে পারবে না। আবার এখনই এত কাজের ভিড়ে সার্জারি করার সাহস করতে পারছে না।



তিনদিন পর আমেরিকা থেকে কিনশাসায় ফিরে ইমামাকে সে সবকিছু জানাল। ইমামা তার দ্বিধা ও বিভ্রান্তি বুঝতে পারছে। কিন্তু কোনো সমাধান সেও তাকে দিতে পারছে না। সমাধান আবারও জিবরিলই দিল।

রাতে সালার হঠাৎ কোনো কাজে লাউঞ্জে বের হলো। দরজা খুলতেই সে জিবরিলকে কম্পিউটারের সামনে দেখতে পেল। সালারের আভাস পেতেই বজ্রগতিতে সে সবকিছু বন্ধ করতে লাগল। কিন্তু সে কম্পিউটার বন্ধ করতে পারল না।

: 'কী করছ তুমি জিবরিল?' বলতে বলতে সালার দেওয়াল ঘড়িতে সময় দেখল, রাত বাজে দুটো।

সে বলল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতে : কিছু না বাবা। আমার ঘুম আসছিল না। তাই কার্ড খেলছিলাম। কম্পিউটারের দাঁড়াতে কম্পিউটারটিকে যেন সে তার আড়াল করে ফেলল। যাতে অন্ধকার স্ক্রিনেও সালার কিছু বুঝতে না পারে।

এই উত্তরটি যদি হামিন দিত, তাহলে সালার মেনে নিত। কিন্তু জিবরিলের মুখে এমন উত্তর ভীষণ অস্বাভাবিক মনে হলো। তার সন্তানদের মধ্যে জিবরিল সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও সংযত স্বভাবের। মাঝরাতে কম্পিউটার নিয়ে কার্ড খেলার মতো বাচ্চা সে নয়। সালার একদম স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে বলতে চেয়ারে বসে কম্পিউটার অন করে ফেলল। জিবরিলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

: 'তোমার ঘুম কেন আসছে না?' কিবোর্ডে আঙুল চালাতে চালাতে সালার তার সন্তানের দিকে তাকাল। যে তার একদম পাশঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। চাইলেই তার চোখে ঝুঁকে দেখতে

পারে, এমন। সালার দেখতে পাচ্ছে জিবরিল ঘাবড়ে আছে। ইন্টারনেটে তাহলে সে এমন কী দেখছিল যে, তার চেহারা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল! সালারের নিজের পায়ের নিচ থেকেও তখন মাটি সরে গেল। সে সন্তানের বাবা, এ তো সে জানে। তার সন্তানেরা বড় হচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কের সময়টাতে কোনো আপত্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে পারে, তাও সে জানে। পুরোনো চিন্তাধারার পিতা নয় সো যাদের চিন্তাধারা হলো, সন্তানরা কিছুতেই ভুল করতে পারবে না। সে উদার মনস্ক। তা সত্ত্বেও, বিষয়টি ভাবতেই সে কেঁপে উঠেছিল। কারণ, তার ছেলে মাত্র দশ বছরের। আর কিছুদিন পর হাফেজে কুরআন হতে চলেছে।

: 'জানি না।' জিবরিল তার কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কোমরের পেছনে হাত বেঁধে নিল। নিজের হাতের কম্পনকে বাবার চোখ থেকে লুকাতে এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় আর নেই। বাবা এটা বুঝতে দিচ্ছে না যে, ছেলের প্রতি সে সন্দেহ করছে। কিন্তু

ছেলে জানে, এই মুহূর্তে বাবার কম্পিউটার অন করার কারণ কী হতে পারে।

: 'তুমি প্রতিদিন দেরিতে ঘুমাও?' সালার তার পরবর্তী প্রশ্ন করল।

: 'জি।' জিবরিল এবার মিথ্যা বলল না।

: 'প্রতিদিন ঘুম আসে না, আর প্রতিদিন কম্পিউটারে কার্ড খেলো?' পরবর্তী প্রশ্নটি সালার তার চোখের দিকে তাকিয়ে করল।

: 'জি।' জিবরিল যেন পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। ইতিমধ্যে কম্পিউটার অন হয়ে গিয়েছে। সালার হোম পেজ ওপেন করেছে। আর কোনো প্রশ্ন না করে সরাসরি সে ভিজিটকৃত সাইটগুলোর হিস্ট্রি খুলে ফেলল। এখানে কোনো গেমসের নাম নেই। তাতে বোলানো একটি ভাসাভাসা দৃষ্টিই

তাকে স্তম্ভিত করে দিল। তার ছেলে যা দেখছিল, তা তার থেকে লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

Ligodendroglioma, লাইগোডেনড্রোগ্লিওমা। একটি আবছা দৃষ্টিতেই ওসব সাইটে লেখা শব্দটি সালার মুহূর্তেই ধরে ফেলল। ওখানকার কোনো একটি সাইটই ক্লিক করার সাহস করতে পারল না সে। ঘাড় ফিরিয়ে জিবরিলের দিকে তাকাল। তার চেহারা ফ্যাকাশে ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে।

: তুমি আমার অসুস্থতার কথা জানো?

প্রশ্নটি না করলেও সালার এর উত্তর জানে। মুহূর্তেই জিবরিলের চোখ পানিতে টলমল করে উঠল। সে হ্যাঁ বলে মাথা নাড়াল। লাউঞ্জে এক অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো। বাবা-ছেলে, একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সালার তার দশ বছরের ছেলেটিকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে, কোলে তুলে নিল।

জিবরিলের অশ্রু গাল বেয়ে পড়তে লাগল। শৈশবে তো সালার তাকে কাঁদতে দেখেছে, কিন্তু তারপর বহু বছর ধরে দেখেনি। গত কয়েক বছর ধরে সালার তাকে বড় মনে করে আসছে। আর এই বড় ছেলেটি এখন ছোট বাচ্চার মতো তার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে চলছে। যে গোপন কথা তার নিষ্পাপ হৃদয়কে ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছিল, তা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে।

: 'বাবা... বাবা...!' জিবরিল তার বুকে মাথা গুঁজে হেঁচকি তুলে কাঁদছে। 'I don't want you to die. আপনাকে আমি মরতে দেব না।'

মুহূর্তেই সালার সিকান্দারের মন থেকে সমস্ত ভয় নিঃশেষ হয়ে গেল। তাকে এখন অপারেশন করাতে হবে। এবং খুব দ্রুত। সে তার পরিবারকে আর এভাবে জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে ঝুলন্ত দেখতে পারবে না। যা হওয়ার, হয়ে যাক।



: 'ওকে, I won't. আমি দেব না' সালার তার ছেলের মাথায়
চুমু খেতে খেতে



নাশতার টেবিলে ইমামা জিবরিলের ফোলা চোখ দেখল। সে
সালাম দিয়ে সালার কিংবা ইমামার চোখের দিকে না তাকিয়ে
সোজা চেয়ারে এসে বসে পড়েছে।

: 'তোমার শরীর ঠিক আছে?' ইমামা তার কপাল ছুঁয়ে তাপমাত্রা
পরিমাপের চেষ্টা করল।

: 'জি, আমি ঠিক আছি।' জিবরিল খানিক খতমত করল। চোখ
না তুলে প্লেটে চেষ্টা করল। চায়ের কাপ নিতে নিতে সালারও
জিবরিলের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু থাকা অমলেটে ছার
চালাতে চালাতে তার থেকে যেন ইমামার মনোযোগ সরানোর
বলল না।

: 'তামাক সারা রাত জেগে ছিলে?' তার চোখ হমামাকে এখনো সংশয়ে ফেলছে।

: 'না মাম্মি! ও অনেক কান্না করেছে।' জিবরিল কিছু বলার আগেই, রুটির

উলঙ্গ করে দিল। জিবরিলের অন্তত এমনটাই মনে হলো। টেবিলে উপস্থিত সবার দৃষ্টি টুকরোয় কামড় বসাতে বসাতে অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে হামিন যেন তাকে খোলাবাজারে একযোগে জিবরিলের ওপর গিয়ে পড়ল। সে যেন লজ্জায় ডুবে গেল। কোনো শব্দ না বলে ইমামা সালারের দিকে তাকাল। সালার দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলল। রুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে হামিন ভীষণ নিশ্চিতভাবে রাতের অন্ধকারে জিবরিলের কান্নার কাহিনি কোনো ধারাভাষ্যকারের মতো এক টানে বলে চলল।

: 'জিবরিল প্রতিদিন কান্না করে। তার কান্নার শব্দে আমি ঘুমাতে পারি না। তাকে যখন জিজ্ঞেস করি জেগে আছে কি না, তখন সে কোনো উত্তর করে না। এমন ভান করে, যেন সে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমার...' নাশতার টেবিলে হামিনের এমন সংবাদ এক অদ্ভুত নীরবতার আবহ সৃষ্টি করে দিল। 'আর মাম্মি, আমি জানি সে কেন কান্না করে।' হামিনের শেষ বাক্যটি ইমামা ও সালারের পায়ের নিচ থেকে নতুন করে মাটি সরিয়ে দিল। 'কিন্তু আমি এটা বলব না, কারণ আমি জিবরিলের কাছে প্রমিস করেছি, কারও সঙ্গে তা শেয়ার করব না। আমি কাউকে চিন্তিত করতে চাই না।' হামিন ঘোষণা দেওয়ার ভঙ্গিতে এক নিশ্বাসে তাদেরকে স্তম্ভিত ও শঙ্কিত করে দিল। সালার ও ইমামা দুজনেই বুঝতে পারল না, কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে তারা। চুপ থাকবে? হামিনকে শাসাবে? জিবরিলকে জিজ্ঞেস করবে? কী করবে? আর কী জানতে চাইবে?

: 'আমি তো কান্না করি না।' হামিনকে চুপ হতে দেখে বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে জিবরিল বলল। সে যেন তার গলায়



আটকানো শব্দে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। আর হামিন তার সেই চেষ্টাকে প্রথম আঘাতেই মাটিতে আছড়ে ফেলল।

: 'ওহ মাই গাড! এখন তুমি মিথ্যাও বলছ! তুমি কুরআনের হাফেজ হয়েও মিথ্যা বলো?' রুটির শেষ টুকরোটি হাতে ধরে, যতটুকু সম্ভব হামিন সিকান্দার তার দু-হাত ছড়িয়ে বলল। জিবরিলের ডুবন্ত নদীতে যেন আরেকটি জোয়ার এলো। তার চেহারা আরও কিছুটা লাল হয়ে উঠল।

: 'মাম্মি, মিথ্যা বলা গুনাহ না?' হামিন যেন মায়ের কাছে সত্যায়ন চাইল।

: 'হামিন চুপ করে নাশতা করো।' এবার সালার হস্তক্ষেপ করল। তাকে খানিক কঠিন স্বরে শাসাল। নিজেকে স্বাভাবিক করে পরিস্থিতি সামলাতে, ও জিবরিলকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর মনে মনে দোয়া করছে, জিবরিল যেন কিছু না জানে। তার হাত থেকে বাঁচাতে এই প্রথম চেষ্টা করল সে। ইমামা এখনো

শীতল হাতে জিবরিলের কান্নার কারণ যেন অন্য কিছু হয়। আর হামিন, হামিনকে সে কাঁ বলেছে?

নাশতা শেষ করা পর্যন্ত হামিনকে আর মুখ খুলতে দিল না। তাদের সবাইকে গাড়িতে বসিয়ে, স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে ইমামা সালারের পেছন পেছন ভেতরে চলে এলো।

: 'জিবরিল আমার অসুস্থতার কথা জানো' ভেতরে আসতে আসতে সালার তাকে শান্ত স্বরে বলল। ইমামা তার পেছন পেছন আসতে আসতে থেমে গেল। কদম তোলাও কখনো কখনো পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়, এই মুহূর্তে তা ইমামা উপলব্ধি করতে পারছে। গলায়ও কিছু আটকে আছে, কে জানে, তা নিশ্বাস নাকি ফাঁস? তার মানে সেদিন জিবরিল তাকে যে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তা ঠিক ছিল। সে যে অনুমান করেছিল, জিবরিল হয়তো কিছু জেনে গিয়েছে, তাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে, তা নিছক কল্পনা নয়, সত্যি ছিল।

: 'তার সঙ্গে আমার রাতে কথা হয়েছে।' সালার বলে চলল।

: 'কখন?' বহু কষ্টে ইমামা কথা বলল।

: 'অনেক রাতে। তখন তুমি ঘুমো। এক কাজে লাউঞ্জে গিয়েছিলাম আমি। কম্পিউটারে সে ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা-বিষয়ক ওয়েবসাইট খুলে বসে ছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে সে সারা রাত ধরে এসব করছে। আমি জিজ্ঞেস করিনি, তাকে এটা কে বলেছে, কবে জেনেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, শুরু থেকেই সে জানে।' সালার এখন আবারও সেই কম্পিউটার খুলে চেয়ারে বসেছে। 'আমার সন্দেহ, সে হয়তো হামিন আর ইনাযাকে বলে দিয়েছে।'

ইমামা সালারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সালার কম্পিউটারে সেই ওয়েবসাইটগুলো ডিলেট করে চলছে। ইমামার গলায় আটকানো জিনিস এখন জমাট কান্নায় রূপ নিয়েছে।

মুহাম্মদ জিবরিল সিকান্দার কূপের চেয়েও অধিক গভীর। মা-বাবার সঙ্গে পুনরায় সে নিঃশব্দ দর্শকের মতো তাদের জীবনের যন্ত্রণা ও কষ্ট বয়ে চলছে; যেমন করে বহু বছর পূর্বে, তার জন্মেরও আগে ইমামার গর্ভে থেকে বয়েছিল। ইমামা যখন ওয়াসিমের মৃত্যুতে তার গর্ভের সন্তানের যত্ন নিতে পারেনি। ওয়াসিমের মৃত্যুযন্ত্রণা, সেটি ছিল বড়দের বোঝা। তা বড়দেরই বহন করা উচিত ছিল। গর্ভের সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না। তবু জিবরিল তা সয়ে নিয়েছে। সালার ও ইমামা এই মুহূর্তে প্রচণ্ড লজ্জাবোধ করছে।

: 'সে তোমাকে কী বলেছে?' ইমামা অবশেষে সাহস করে সালারের পেছনে এসে, তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল।

: বাবা! আপনাকে আমি মরতে দেব না।

শান্ত গলায় বলা সালারের বাক্যটি তাকে ছুরির মতো আঘাত করল। শৈশব এক অদ্ভুত জিনিস-সকল ভগিতা, আনুষ্ঠানিকতা

আর পর্দা ভেদ করে শিশুমনের সত্যিকারের কথা এমনভাবে বলে ফেলে, যেন বুকের ভেতরেটাই তুলে রেখে দেয়।

: সে তোমাকে তা-ই বলেছে, যা আমি বলতে পারিনি।

সালার তার কাঁধে ইমামার হাতের কোমলতা ও তার কথার উষ্ণতা; একসঙ্গে দুটোই অনুভব করল।

: 'কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি অপারেশন করাচ্ছি। দুই সপ্তাহের মধ্যেই এখান থেকে পাকিস্তানে চলে যাব। তারপর তোমাদেরকে পাকিস্তানের রেখে আমি অপারেশনের জন্য আমেরিকায় যাব।' সালার পেছন ফিরে ইমামার দিকে তাকাল না। তার হাত কাঁধ থেকে সরালও না। আর না তাকে কোনো সান্ত্বনা দিল। বুকে জড়িয়ে জিবরিলকে যে কথা সে দিয়েছে, সেটি ইমামাকে দিতে পারল না। সে ছিল বাচ্চা, আর এ বাচ্চা নয়। সে মন ভুলে গিয়েছিল, আর একে ভোলানো সম্ভব নয়।

: 'তোমাকে একটি কাজ দিতে চাই, ইমামা!' অবশেষে সালার কম্পিউটার বন্ধ করতে করতে বলল।

: 'কী?' সে ব্যথিত গলায় জানতে চাইল।

: এখন বলব না, অপারেশনে যাওয়ার সময় বলব।

: 'সালার, আমাকে কোনো কাজ দিয়ো না। কোনো কাজই না।' ইমামা কাঁদতে লাগল।

: 'বড় কোনো কাজ নয়। তুমি করতে পারবে না, এমন কোনো কঠিন কাজও নয়।' সালার এখন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। তারা এখন একে অপরের মুখোমুখি।

: 'আমি কোনো সহজ কাজও করতে চাই না।' ইমামা মাথা ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ড অসহায়ভাবে বলল। সালার হাসতে লাগল। অদ্ভুত সান্ত্বনার ভঙ্গিতে তার হাত ধরতে ধরতে বলল, 'গত

কয়েক বছর ধরে আমি আমার আত্মজীবনী লিখছি। ভেবেছিলাম বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ করব।" সালার খানিক থামল। তারপর বলতে লাগল, 'সেটি এখনো অসম্পূর্ণ। আমি হাজার চেষ্টা করেও তা সম্পূর্ণ করতে পারব না। কিন্তু সেটি তোমার কাছে রাখতে চাই। তারা চারজনই এখন অনেক ছোট। আমি জানি না অপারেশনের ফলাফল কী হবে। আমি এও জানি না, ভবিষ্যতে কী হবে। কিন্তু অতীতে যা হয়েছে, তা লিখে ফেলেছি। এখন আমি চাচ্ছি, এটি তুমি তাদের চারজনের জন্য তোমার কাছে রাখো।' তার এই কথাগুলোতে এক অদ্ভুত অস্থিরতা মিশে আছে। সে তাকে সরাসরি বলতে পারল না যে, তার মৃত্যুর পর এই বই পড়িয়ে তার সন্তানদেরকে যেন, তাদের বাবার লেখা শব্দ ও জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সে তাকে এও বলতে পারল না যে, তার অপারেশনের কোনো জটিলতায় মস্তিষ্কের রোগেরও আশঙ্কা রয়েছে। সে যা বলেনি, ইমামা তাও শুনে নিয়েছে। কেবল শুনেছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে সে ভাবতে চাচ্ছে না। কারণ, সেটি অত্যন্ত খারাপ সময়। আর খারাপ সময়কে সে চোখ বন্ধ করে পার করতে চাচ্ছে।

: 'কতগুলো অধ্যায় এই বইয়ে?' না চাইতেও সে জিজ্ঞেস করল।

: 'সাঁইত্রিশ বছর বয়সে প্রথম অধ্যায় লিখে ছিলাম। তারপর প্রতি বছর এক অধ্যায় করে লিখেছি। প্রতি বছর একটি করে লিখতে চেয়েছিলাম। জীবনের প্রথম বছর, তারপর পরবর্তী পাঁচ বছর, তারপর তার পরবর্তী। এ পর্যন্ত কেবল চল্লিশ বছর লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি।' সালার কথা বলতে বলতে থামল। অধ্যায় গণনা রেখে, সে যেন হায়াত গুনতে বসে পড়েছে।

: 'চল্লিশের পরেও তো জীবন আছে, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ।' কথা বলতে বলতে ইমামা আটকাল, থামল, থতমত করল।

: 'সে যা আছে, তা আমি লিপিবদ্ধ করতে চাই না। তুমি করতে চাইলে করে নিয়ো।' সে কি ইমামাকে অনুমতি দিচ্ছে? তাকে যেন বলছে, সে সময়টা তুমি মনে রাখতে চাইলে, মনে রেখো।

: 'বইটি কোথায়?' এই সব সে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছে না, তবু জিজ্ঞেস করেই চলছে।

: 'এই কম্পিউটারেই।' সালার পুনরায় কম্পিউটার অন করতে লাগল। তারপর একটি ফোল্ডার খুলে ইমামাকে দেখাল। ফোল্ডারের উপরে একটি নাম চমকাতে লাগল-তাশ।

: 'তাশ?' ইমামা ব্যথিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

: 'আমার আত্মজীবনীর নাম এটা।' সালার এখন তার দিকে না তাকিয়ে ফোল্ডার খুলে, তাকে ফাইল দেখাতে লাগল।

: 'ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনী বইয়ের নাম উর্দুতে রাখবে?'
স্টাডি টেবিলের কোনায় ঠেস দিয়ে ইমামা তার মুখ দেখতে
লাগল।

: 'আমার জীবনকে এই শব্দের চেয়ে ভালো করে অন্য কোনো
শব্দই প্রকাশ করতে পারবে না। তাতে কী আসে যায়! আমি
তো তোমাদের জন্য লিখেছি, বিদেশিদের জন্য তো লিখিনি।
তোমরা তো বোঝো "তাশ" কী। সালার তার দিকে না
তাকিয়ে বলতে বলতে নিচের দিকে স্কুল করতে লাগল। পৃষ্ঠার
পর পৃষ্ঠাজুড়ে শব্দ দৌড়াতে লাগল, তারপর অদৃশ্য হতে।
একদম তার জীবনের বছরগুলোর মতো। অতঃপর সে শেষ
অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় এসে থামল। অর্ধেক পৃষ্ঠায় লেখা, অর্ধেক
খালি। ফোল্ডারটি খোলার পর এই প্রথম সালার ইমামার দিকে
তাকাল। দেখল, ভেজা চোখে সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

: 'পড়ে দেখবে তুমি?' মৃদু গলায় ইমামাকে জিজ্ঞেস করল।
ইমামা না-বোধকে মাথা নাড়ল।

সালারের অসুস্থতা না থাকলে, কিনশাসা থেকে পাকিস্তানে ফেরার সফরটি তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন সফর হতো। পাঁচ বছর পর তারা নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু সামনে আশঙ্কা ছাড়া আপাতত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বহু বছর পর ইমামা আবাবও ঘরছাড়া-গৃহহীন হয়ে পড়ছে। নিজের ঘরের ছাদ ছেড়ে একদম সালারের পিতা-মাতার ঘরে এসে উঠছে। উনারা অসম্ভব ভালো মানুষ। ভালোবাসতে জানেন। অনুগ্রহ করতে জানেন, তবে কখনো খোঁটা দেন না।

কিনশাসা থেকে পাকিস্তানে আসার আগে, ইমামা তাদের বসিয়ে বুঝিয়েছে, 'আমরা এখন যেখানে যাচ্ছি, সেটা আমাদের বাড়ি নয়। ওখানে আমরা মেহমান। আর যতদিন আমরা সেখানে থাকব, ভালো মেহমান হয়ে থাকব। আর ভালো

মেহমানেরা কী করে?' ইমামা তার গৃহহীনতাকে এক সুন্দর মোড়কে তাদের সামনে পেশ করে।

: 'ভালো মেহমান অনেক কিছু নিয়ে আসে। সুন্দর সুন্দর কথা বলে। এবং তাড়াতাড়ি চলে যায়। কোনো কাজ করে না, সারাক্ষণ বিশ্রাম করে।' হামিন তার অভ্যাসবশত ও প্রত্যাশা মাফিক সবার আগে উত্তর করল। সে তার অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ থেকে কথা বলে ইমামাকে নিরুত্তর করে দিল। ইমামার হাসি চলে এলো। মাকে হাসতে দেখে হামিন উৎফুল্ল হয়ে পড়ল। 'হুররে! আমি জিতে গেছি!' সে শূন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত দোলাতে দোলাতে যেন সঠিক উত্তর বুঝিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিল।

: 'সে কি ঠিক বলেছে?' ইনয়ার যেন বিশ্বাস হলো না।

: 'নো।' ইমামা বলল। হামিনের চেহারা অবিশ্বাস্যতা ফুটে উঠল।

: 'ভালো মেহমান কাউকে বিরক্ত করে না। কাউকে আদেশ করে না। কোনো জিনিসে দোষ খোঁজে না। সব কাজ মেজবানের থেকে অনুমতি নিয়ে করে। নিজের কাজ মেজবানের ওপর চাপিয়ে দেয় না।' ইমামা তাদের বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল।

: 'ওহ মাই গাড! মাম্মি, আমি ভালো মেহমান হতে চাই না। আমি কেবল মেহমান হতে চাই।' হামিন মায়ের কথা খণ্ডন করে প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে বলল।

: 'আমরা দাদার বাড়িতে যাচ্ছি। তাই আমাদের ওখানে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন তারা বিরক্ত না হন। আমাদের প্রতি যেন তাদের কোনো অভিযোগ না থাকে, কিংবা আমাদের দ্বারা কোনো কষ্ট না পান।' ইমামা তার কথা উপেক্ষা করে বলল।

: 'ওকে।' ইনায়া, রাইসা ও জিবরিল সমস্বরে মাকে আশ্বস্ত করল।

: 'আর আমরা আমাদের বাড়িতে কবে যাব?' তাকে উপেক্ষা করার ফলে হামিন অবশেষে নতুন প্রশ্ন করল।

: 'জলদিই যাব।' ইমামা দৃষ্টি লুকিয়ে তাকে উত্তর দিল। সে প্রশান্ত হলো না।

: 'জলদি কবে?' সে অস্থির হয়ে বলল।

: অনেক জলদি।

: 'আর আমাদের বাড়িটা কোথায়?' হামিন আগের প্রশ্নে প্রশান্ত না হয়ে প্রশ্ন পালটাল। ইমামা যেন নিরুত্তর হয়ে গেল। প্রশ্ন সঠিক, তবে তার কোনো উত্তর নেই।

: 'আমরা নতুন বাড়ি কিনব?' ইনায়া যেন ইমামার পক্ষ হয়ে উত্তর করল।

: 'কোথায়?' হামিন পরিপূর্ণ উত্তর চাচ্ছে।

: 'যেখানে বাবা থাকবেন।' জিবরিল এবার তাকে পরিপূর্ণ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল।

: 'আর বাবা কোথায় থাকবেন?' হামিন আরও একটি অকাট্য প্রশ্ন করল। প্রশ্নটিতে ইমামা আঘাত পেল।

: 'এখন আমরা পাকিস্তানে যাচ্ছি, তারপর বাবা যেখানে যাবেন সেখানে আমরাও চলে যাব।' জিবরিল মায়ের চোখ ভিজে উঠতে টের পেয়ে যেন প্রাচীর হওয়ার চেষ্টা করল।

: 'ওয়াও! এটা তো অনেক ভালো।' হামিন অবশেষে প্রশান্ত হলো।

: 'আমি বাবার সঙ্গে থাকতে চাই।' সে যেন ঘোষণা করে তার পছন্দের কথা জানান দিল। ইমামা তাদেরকে বেশি কিছু বলতে পারল না। এটি বোঝানো অনেক কঠিন কাজ। বিশেষ করে এমন জিনিস বোঝানো, যা নিজেরই বুঝে আসে না। তাদের

চারজনকে সে ঘুমাতে যেতে বলে নিজে তাদের রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

: 'মান্নি!' হামিন তার পেছনে লাউঞ্জে বেরিয়ে এলো। ইমামা পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, হামিন যেন কিছু ভাবছে।

: 'ইয়েস!' ইমামা উত্তর করল।

: 'আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। কিন্তু আমি কনফিউজড।' হামিন মাকে বলল।

: 'কেন?' ইমামা তার চেহারা দেখতে লাগল।

: 'কারণ, আমি আমার প্রমিস ভাঙতে চাই না।' হামিন তার অস্থিরতার কারণ বলল। 'কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাই যে, আমি আপনার সিক্রেট জানি।'

ইমামার হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে কণ্ঠনালিতে চলে এলো। 'আমি জানি, আপনি চিন্তিত কেন।' হামিন বলে চলল। ইমামা যেন আরও কিছুটা মাটিতে ঢুকে পড়ল। হামিন এখন তার আরও কাছে চলে এসেছে। ছয় বছর বয়সি তার কোমর পরিমাণ ছোট বাচ্চাটি বলল, 'প্লিজ, আপনি চিন্তিত হবেন না।' I don't like it when you cry. আপনি কান্না করলে আমার ভালো লাগে না।' হামিন এখন ঝুঁকে পড়ে তাকে বলছিল। ইমামা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে জিবরিল, আর এখন হামিন। তার প্রতিটি সন্তানকেই কি এই কষ্ট বহন করার ছিল?

: 'তুমি কী জানো?' ইমামা এই কথাটুকুও যেন বলতে পারছে না। সে কেবল হাত বুলিয়ে হামিনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

: 'দাদা ঠিক হয়ে যাবেন।' হামিন এখন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ইমামার মনে হলো, সে হয়তো শুনতে ভুল করেছে। হামিন হয়তো 'বাবা' বলেছে। 'আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি।' হামিন পুনরায় ইমামাকে বলল। ইমামা আরও বিক্ষিপ্ত হলো।

: কাকে কী জিজ্ঞেস করেছ?

: দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন যে, তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।

ইমামা এবার আরও বিক্ষিপ্ত হলো।

: 'দাদার কী হয়েছে?' সে জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: দাদার কি ব্রেন টিউমার হয়নি? দাদার আলজেইমার হয়েছে।
তবে উনি ভালো হয়ে যাবেন।

ইমামা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

২৪

পাকিস্তানে পৌঁছে ইমামা সর্বপ্রথম সিকান্দার উসমানকে হামিনের বলা টিউমারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, এক মাস আগে রুটিন মোতাবেক মেডিকেল চেকআপে আমার টিউমার ধরা পড়ে। এটি এখন প্রাথমিক স্টেজে আছে। কিন্তু তিনি চিন্তা করছিলেন, ইমামা আবার সালারকে এটা বলে না দেয়। তাহলে আবার সালার চিন্তিত হয়ে পড়বে। ইমামা যখন বলল, সালারকে আমি কিছু বলিনি, তখন তিনি বললেন, সালারকে কিছু বলো না। আমি তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাই না। তার অপারেশন হতে চলছে। এর মধ্যে

আমার অসুস্থতার কথা বলে তাকে পেরেশান করতে চাই না।
তিনি এখনো নিজের চেয়ে সালারকে নিয়ে বেশি চিন্তিত।

: 'পাপা! আমি তাকে বলব না। আমিও চাই না সে চিন্তায়
পড়ুক।' ইমামা উনাকে আশ্বস্ত করল। 'আপনি জানেন, আপনার
সঙ্গে সে আন্তরিকভাবে মিশে আছে। এটা শুনলে, নিজের
অসুখের কথাও ভুলে যাবে সে।'

: 'আমি জানি।' তিনি এক বিষণ্ণ হাসি দিয়ে বললেন। 'এই বয়সে
নিজের রোগ নিয়ে চিন্তা নেই আমার। আল্লাহর শোকর, আমি
আমার জীবন কাটিয়ে ফেলেছি। অনেক ভালো কাটিয়েছি।
এখন সালারের সুস্থতা দরকার।' শেষ বাক্যটি তিনি অদ্ভুত
পরিতাপ মিশিয়ে বললেন।

: যদি আমার সাধ্য থাকত, তাহলে আমি তার অসুখও আমার
কাঁধে নিয়ে নিতাম। আমার জীবনের বাকি আয়ুটুকু তাকে দিয়ে
দিতাম।

ইমামা উনার হাত নিজের হাতে নিয়ে নিল। 'আপনি শুধু তার জন্য দোয়া করুন, পাপা! মা-বাবার দোয়ায় অনেক কিছু হয়।'

: 'দোয়া ছাড়া আর কীই-বা করতে পারি আমি। আমি ভাবতাম, সে আমাকে কৈশোরে ও যৌবনে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। কিন্তু এ তো এখন আমাকে বৃদ্ধ বয়সেও যন্ত্রণা দিচ্ছে...।' তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন।

: 'এক কাজ করুন পাপা!' ইমামা উনার হাতে চাপড় দিতে দিতে বলল।

: কী?

ইমামা তার হাতের আংটি খুলে, সেটি সিকান্দার উসমানের মুঠোয় পুরে দিল।

: এটি বিক্রি করে দিন।

সিকান্দার উসমান তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

: 'কেন?' বহু কষ্টে তিনি বললেন।

: আমার টাকার প্রয়োজন।

: কত?

: এটি বিক্রি করে যা পাওয়া যায়, তা-ই।

: 'ইমামা...!' তিনি কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু ইমামা থামিয়ে দিল।

: না করবেন না। এই কাজ আমি আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে করাতে পারব না।

সিকান্দার উসমান ভেজা চোখে চুপচাপ ইমামার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

২৫

সালারদের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো, Samar Investment Fund-সামার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। তার অপারেশনের দুই সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কে সালার সিকান্দার ও সামার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের বোর্ড অফ গভর্নর্স, বিশ্বে এই প্রথম গ্লোবাল ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল। পাঁচশ কোটি টাকার পুঁজি নিয়ে এই ফান্ডের সূচনা হলো। সামার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (SIF) হলো সেই নতুন অর্থব্যবস্থার প্রথম ইট, যেটি সালার সিকান্দার ও তার পাঁচজন সহযাত্রী মিলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। একে তারা আগামী বিশ বছরের মধ্যে বিশ্বের বড় বড় ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটগুলোতে সুদভিত্তিক ব্যবস্থার সামনে, বিকল্প হিসেবে দাঁড় করাতে চেয়েছে।

সালার সিকান্দারের অসুস্থতার খবর যদি মিডিয়ায় এত জোরেশোরে প্রকাশ না পেত, তবে বোর্ড অফ গভর্নর্সের ছয়জন সদস্য এই ফান্ডের যাত্রা শুরু করতেন এক বিলিয়ন ডলারের পুঁজি নিয়ে। এবং সেটি একসঙ্গে বিশ্বের পঞ্চাশটি দেশে। লক্ষ্যটা কঠিন ছিল, তবে অসম্ভব নয়। কারণ, এর অবকাঠামো দাঁড় করানোর জন্য তাদের হাতে ছিল পুরো পাঁচ বছর। কিন্তু সালার সিকান্দারের অসুস্থতা যেন প্রথম পদক্ষেপেই তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিল। তারপরও বোর্ড অফ গভর্নর্স ভেঙে যায়নি। তারা একসঙ্গে থেকেছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়েছে। কারণ, তাদের ছয়জনের কেউই এই কাজটিকে নিছক ব্যবসা হিসেবে নেয়নি। তারা ঝাঁপিয়েছিল এক অদৃশ্য খাদে, মুজাহিদদের মতো নিজেদের উৎসর্গ করার জজবা নিয়ে। ত্রিশ পেরোনো এই ছয়জন মানুষ একে অপরকে খুব ভালো করেই চেনে। তারা একে অপরের ইচ্ছে, অবস্থান আর খ্যাতি সম্পর্কেও জানে।

সালার সিকান্দার, আমেল কালিম, মুসা বিন রাফি, আবু জর সেলিম, আলি আকমল ও রাকিন মাসউদ-এই ছয়জনকে নিয়ে গঠিত SIF-এর বোর্ড অফ গভর্নর্স। একে অনায়াসেই বিশ্বের সেরা বোর্ড অফ গভর্নর্সগুলোর একটি বলা যেতে পারে। কারণ, এই ছয়জনই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে একেবারে পাওয়ার হাউস। ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি ক্ষেত্রে অর্জিত দক্ষতা, সামর্থ্য আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তারা একত্র করেছে SIF-এর পতাকাতলে। চাঞ্চল্যের কোঠায় পা রাখলেও তাদের প্রত্যেকের ঝুলিতে রয়েছে পনেরো থেকে বিশ বছরের কর্মজীবনের সাফল্য ও সুনাম। তারা বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সি এবং সবচেয়ে যোগ্য বোর্ড অফ গভর্নর্সদের অন্যতম।

আমেল কালিম একজন আমেরিকান মুসলিম। তার মা মালয়েশিয়ান, আর বাবা আরব। তবে তাদের দুজনেরই জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকাতেই। আমেল কালিমের একটি ফাইন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্সি ফার্ম রয়েছে। আমেরিকার দেড়শরও বেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সে পরামর্শ দিয়ে

পরিচালনা করে। বিশ্বসেরা দশজন ইনভেস্টমেন্ট গুরুস বা বিনিয়োগ জগতের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের তালিকায় সে তৃতীয়। এমনকি 'ফোর্বস' ম্যাগাজিনের সেই বিশেষ তালিকায়ও তার নাম রয়েছে, যেখানে পরবর্তী দশ বছরে সম্ভাব্য বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেল কালিম বোর্ড অফ গভর্নর্সের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ ও অনুশীলনকারী মুসলিম। তার গভীর ধর্মীয় জ্ঞান ও আমলের পাবন্দি দেখে, বোর্ড অফ গভর্নর্সের বাকি পাঁচজন সদস্য তাকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। এ নিয়ে সে প্রশান্ত, তবে আনন্দিত নয়। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় থেকেই সে সালারকে চিনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা পাঁচ ছাত্রের মধ্যে সালার ও আমেল কামিল ছিল অন্যতম। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। সবচেয়ে সেরা জিপিএ নিয়ে টপ করা সত্ত্বেও যে কয়েকটি সাবজেক্টে সালার পিছিয়ে থাকত, সেগুলোতে টপ থাকত আমেল কামিল।



মুসা বিন রাফি, যদিও সে মাসকাট ও ওমানের দুই রাজপরিবারের রক্তের সঙ্গে যুক্ত, তবে নিজ দেশের ক্ষমতাসীন পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে, বহু আগে থেকেই আমেরিকায় বসবাস করছে। তার জন্ম হয়েছিল আমেরিকাতেই। জন্মের কিছুদিন পরই তার বাবা-মা স্থায়ীভাবে আমেরিকায় পাড়ি জমায়।

ছাব্বিশ বছর বয়সে বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মুসা পেয়েছিল তার বাবার মালিকানাধীন সেই শিপিং কোম্পানিটি। মাঝারি মানের একটি কোম্পানিকে পরবর্তী পনেরো বছরে সে গড়ে তুলেছে এক শীর্ষস্থানীয় শিপিং লাইনে। তার কোম্পানি এখন বিশ্বের কনটেইনার শিপিং-এর দ্রুততম ও সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য। সালার আর তার পরিচয় হয়েছিল কলম্বিয়ায়। তারপর থেকে তাদের যোগাযোগ চালু থাকে। সালার সিকান্দার রাস্টি ব্যাংকে কাজ করার সময় মুসার পরিবারের বহু সম্পত্তির দেখভাল করেছিল একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে।

আবুজর সেলিম একজন আমেরিকান আফ্রিকান। সে একটি বিশাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির মালিক। আফ্রিকায় তাকে বলা হয় 'ফার্মাসিউটিক্যাল কিং।' কারণ, আমেরিকাভিত্তিক তার কোম্পানি আফ্রিকার বহু দেশে ওষুধ সরবরাহে প্রথম স্থানে রয়েছে। সালারের পর বোর্ড অফ গভর্নর্সে সে-ই হয়েছিল দ্বিতীয় সদস্য। আফ্রিকার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ও সেখানে প্রায়শই আসা-যাওয়ার ফলে সে, বহু আফ্রিকান ভাষা শিখে ফেলে। এবং সেগুলোতে অনর্গল কথাও বলতে পারে। বোর্ড অফ গভর্নর্স তাকে আবুজর সেলিম নামে ডাকে না; তারা তাকে হাতেম তায়ি বলে ডাকে। সে নিঃসন্দেহে এই বোর্ডের সবচেয়ে উদারতম সদস্য। তার কোম্পানি বার্ষিক নিট লাভের এক-চতুর্থাংশ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের চ্যারিটেবল প্রতিষ্ঠানে দান করে থাকে। সালার আর আবুজর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েইনি, তারা একসঙ্গে জাতিসংঘের একটি ইন্টার্নশিপও করেছে।

আলি আকমল একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান। সে টেলিকমিউনিকেশনস-এর একটি কোম্পানি পরিচালনা করে। টেলিকম খাতে তার কোম্পানি গত দশ বছরে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি লাভজনক কোম্পানির মধ্যে গণ্য হয়েছে। বিশ্বের দ্রুততম উন্নতির মুকুটও এই কোম্পানির মাথায়। আলি আকমল নিজে একজন টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার। তার আর সালারের পরিচয় হয় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিতর্কের মাধ্যমে। তারপর সেই পরিচয় ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে রূপ নেয়।

রাকিন মাসউদ একজন পাকিস্তানি-আমেরিকান। সে একটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি পরিচালনা করে। গালফ অঞ্চলের রাজপরিবারের বড় একটি অংশ তার নিয়মিত ক্লায়েন্ট। আর এখন এই ক্লায়েন্ট তালিকায় যুক্ত হয়েছে ইউরোপের বহু বিশিষ্ট পরিবার এবং হলিউডের বহু ধনী ব্যক্তিত্বও।

সালার রাকিনকে পাকিস্তান থেকেই চিনে। যদিও তারা শুরু থেকেই বন্ধু ছিল না, তবু তাদের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

ছিল। রাকিনের মতো সে নিজেও ফাইন্যান্সে পিএইচডি করেছে। রাকিনও তার মতো সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে দৃঢ় ও প্রতিশ্রুতিশীল একজন সমর্থক।

ছয়জনের এই দলটি পাঁচশ কোটি টাকার এই মূলধন শুধু নিজেদের সুনাম ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই একত্র করতে সক্ষম হয়েছে। তারা যদি এই পাঁচশ কোটি টাকা সতেরোটি দেশে বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভজনক করে তুলতে পারে, তাহলে পরবর্তী তিন বছরে পঞ্চাশটি দেশ এবং এক বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব কিছু নয়।

যে প্রকল্পগুলো নিয়ে তারা কাজ করতে চাচ্ছে, SIF-এর প্রথম পর্যায়ে সেগুলোর সংখ্যা খুব সীমিত। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে তারা তাদের আর্থিক পরিকল্পনাগুলো কেবল সেই সতেরো দেশেই নয়; বরং আগামী দশ বছরে সত্তরটি দেশে বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা সবচেয়ে কম আয়ের মানুষটিকেও আর্থিক সেবা দিতে চায়।

SIF কিছু মৌলিক ও সহজ নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা তাদের ফান্ডের বড় অংশ নতুন বিনিয়োগকারীদের দিতে চাচ্ছে। কারণ, এতে কবে এই নতুনরাই একদিন অনেক বড় হয়ে উঠবে। আর এটাই হবে SIF-এর সাফল্য। তবে SIF কোনো ঋণদাতা হয়ে নয়, বরং একজন বন্ধুর মতো অংশীদার হিসেবে তাদের সঙ্গে কাজ করবে। এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। সময়টি কমবেশি হবে লাভ-লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। সময়টি নির্ধারিত হবে তারা কত টাকা বিনিয়োগ করছে, সেটার ওপর নির্ভর করেও। 'খুঁজো, যাচাই করো, শেখাও, ব্যবহার করো, লাভ করো এবং ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থেকো।'- মানবসম্পদে বিনিয়োগের জন্য এটাই হলো SIF-এর মূল দর্শন।

গত পাঁচ বছরে SIF তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অবকাঠামো গড়ে তোলার হোমওয়ার্ক শেষ করে ফেলেছে। ব্যাকআপ সাপোর্টের জন্য এমন কিছু বিনিয়োগও তারা

করেছে, যেগুলো কোনোভাবেই সুদের সঙ্গে জড়িত নয়। এই ছয়জন মানুষ তাদের নিজ নিজ দক্ষতাকে এই কোম্পানির পেছনে ব্যয় করেছে। এর মাধ্যমে তারা বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে তুলছে। তবু 'লাভ-ক্ষতি যা হবে, তা সমান সমান ভাগে ভাগ করে নেব'-এই নীতি মেনে তাদের ওপর ভরসা করে, কে আসবে এই প্রতিষ্ঠানটিতে?

তাদের সামনে আরও বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো, গত পাঁচ বছরে স্টেকহোল্ডারদের দেওয়া টাকাগুলোকে তারা কীভাবে লাভজনক বানাবে? এটি ছিল বিশাল একটি কাজের শুরুতে ছোট্ট একটি পদক্ষেপ। এত ছোট্ট যে, বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের এই বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে নেয়ইনি। অবশ্য ফাইন্যান্সিয়াল মিডিয়া এ নিয়ে অনুষ্ঠান করেছে, খবর ছেপেছে, কৌতূহল দেখিয়েছে। খুব সিরিয়াস না হলেও, একে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কোনো হুমকি মনে করেনি।

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যাংক, কোনো প্রতিষ্ঠান বা ফান্ড নেই, যা পুরোপুরি সুদমুক্ত ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। আর কেউ দাঁড়ালেও, সে যেন অর্থব্যবস্থার হাতিদের সামনে দাঁড়ানো এক ক্ষুদ্র পিঁপড়ের মতো, এর বেশি কিছু না। তাহলে সেখানে SIF-ইবা কী করতে পারবে? আর কী-ইবা বদলাতে পারবে? তারা বড়জোর একটি সফল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু শুধু সফল হলেই হয় না, পৃথিবীতে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হলে নিজেদের টিকে থাকার ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতা এখনো কারও চোখে পড়েনি। কেবল এই ছয়টি মাথাই তা দেখতে পেয়েছে, যে ছয়জন এর মূল প্রতিষ্ঠাতা।

SIF-এর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করাতে কাঁধে চাপা এক বিশাল ভার যেন নেমে পড়েছে। অন্তত সালারের কাছে এমনটা মনে হয়েছে। যতটা স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, ততটা সে পায়নি, তবে এটুকুতেও সে হতাশ নয়। আসলে তারা এমন সব বিশাল

আর্থিক বাজারে প্রবেশ করেছে, যেখানে সেরা সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত। আর তারা জানে, ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা খুব সহজ কিছু নয়।

আমেরিকায় এক সপ্তাহে সালার ডজনেরও বেশি সেমিনার আর মিটিংয়ে যোগ দিয়েছে। বোর্ড অফ গভর্নর্সের অন্যান্য সদস্যদের অবস্থাও প্রায় একই। তারাও লাগাতার বহু মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে। সপ্তাহ শেষে তাকে পাকিস্তান ফিরতে হবে। পাকিস্তানে এসে সবার সঙ্গে দেখা করে, অপারেশনের জন্য পুনরায় তাকে আমেরিকায় আসতে হবে। এদিকে তার রুটিন একের পর এক অ্যাপয়েন্টমেন্টে ভরে আছে। যারা সালারের অসুস্থতার খবর শুনে সরে গিয়েছিল, এক সপ্তাহ সেমিনার ও মিটিং করে করে তারা অবশ্য সেখান থেকে কিছু বিনিয়োগকারীকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এটি ছিল এক বিশাল সাফল্য, যেন বহু প্রত্যাশিত বৃষ্টির সেই প্রথম ফোঁটা, যার অপেক্ষায় ছিল তারা।

SIF প্রতিষ্ঠার জন্য সালার বিনিয়োগকারী এবং মূলধন জোগাড় করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিজের পকেট থেকে বাকি পাঁচজনের মতো মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ সম্ভব হয়নি তার। হাতে যা কিছু ছিল, সেগুলো বিক্রি করেও তার অংশীদারি কোটি টাকার বেশি হয়নি। প্রতিষ্ঠানের এই পর্যায়ে পরিবারের কারও থেকে ঋণ নিতেও চায়নি সে। সন্তানদের জন্য তো সে কিছুই রেখে যেতে পারছে না। তাই তাদের থেকে কিছু নিয়ে, তাদের কাঁধে অন্তত ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও ফান্ড ঘোষণার একদিন পরই সিকান্দার উসমান আমেরিকায় ফোন করলেন। বললেন, 'SIF-এ আমি পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চাই।'

: 'এত টাকা আপনি কোথায় পাবেন?' সালার চমকাল।

: 'বাপকে কি গরিব মনে করো তুমি?' তিনি অভিমানী হলেন।
সালার হাসতে লাগল।



: আপনি গরিব হলেও আমার চেয়ে বেশি না।

: 'আমার সঙ্গে তো তোমার প্রতিযোগিতাই যায় না।' সিকান্দার উসমান উদাসীনভাবে বললেন। 'আমার সমান হতে হলে তোমার আরও দশ-বিশ বছর লাগবে।'

: হয়তো লাগবে না।

: 'আচ্ছা...! দেখা যাবে। আগে আমাকে বলো, এখানে পাকিস্তানে তোমাদের লোকাল অফিস ও কাজবাজের কী প্রক্রিয়া করলে?' তিনি প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন।

: 'এত টাকা কোথায় পেলেন? আপনি কী বিক্রি করেছেন?' সালার উনাকে প্রসঙ্গ পালটাতে দিল না। সরাসরি প্রশ্ন করল।

: 'ফ্যাক্টরি।' সালার স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'এই বয়সে এসব সামলাতে পারব না আরা। কামরানের সঙ্গে কথা বলেছি। সে

আর তার এক বন্ধু কিনতে রাজি হয়েছে। তাছাড়া ফ্যাক্টরি থেকে সবার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেও হবে আমাকে।" তিনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন এটি সাধারণ কোনো বিষয়।

: 'আপনি কাজ করতেন পাপা! একটা চলমান ব্যবসা কেন ছেড়ে দিলেন? এখন আপনি কী করবেন?' সালার প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলো।

: 'কিছু না কিছু করে নেবা। এটা তোমার সমস্যা নয়। আর না করলেও কী হয়েছে! বাবার দায়িত্ব কি তুমি নিতে পারবে না? বাবা তো সারা জীবন দায়িত্ব পালন করেই আসছে।' সিকান্দার উসমান তাকে শাসালেন।

: 'আপনি আমার জন্য করেছেন এসব?' সালার ব্যথিত হয়ে আছে।

: 'হ্যাঁ...'। এবার সিকান্দার কথা না ঘুরিয়ে সরাসরি বললেন।

: পাপা! আমাকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল আপনার। পরামর্শ তো করতেন।

: 'জীবনে কোন কাজটি তুমি আমার পরামর্শে করেছ? সবসময়ই করার পর শুধু জানাতো।' বিষয়টি তিনি রসিকতায় ভোলানোর চেষ্টা করলেন। সালার উনার এই কাজে খুশি হলো না। তার মন অদ্ভুত ভারী হয়ে উঠল।

: 'কী হয়েছে?' সিকান্দার উসমান যেন তার নীরবতায় টোকা দিলেন।

: 'আমার ওপর আপনি এত অনুগ্রহ কেন করেন? কতদিন করবেন?' সালার না বলে পারল না।

না। : 'যতদিন বেঁচে আছি।' সিকান্দার উসমান নিজের অসুখের কথা বলতে পারলেন

: আপনি আমার চেয়ে বেশি বাঁচবেন।

: হায়াতের কথা কে জানে!

সিকান্দার উসমানের স্বর এই প্রথম সালারের কাছে অদ্ভুত মনে হলো। কিন্তু এ নিয়ে সে আর বেশি ভাবতে পারল না। তার আগেই সিকান্দার প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন।

২৬

: 'জিবরিল, তুমি সবার খেয়াল রাখতে পারবে না?' ইমামা তাকে হয়তো এবার দশম বারের মতো প্রশ্নটি করল।

: 'জি মাম্মি, রাখতে পারব। ইউ ডোন্ট ওরি।' মাকে প্যাকিংয়ে সাহায্য করতে করতে সেও দশম বারের মতো একই উত্তর করল।

সালারের অপারেশনের সময় তার পাশে থাকতে চাচ্ছে ইমামা।
সালারের নিষেধ সত্ত্বেও সে তার সঙ্গে যাবেই।

: 'ওখানে আমার অনেক প্রয়োজন পড়বে তোমার। বাচ্চারা এত ছোট নয় যে, আমাকে ছাড়া এক সপ্তাহ থাকতে পারবে না।' ইমামা সালারকে তখন বলেছিল। আর এখন টিকিট কনফার্ম হতেই বাচ্চাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার। এই প্রথম সে তাদের একা ফেলে দূরে কোথাও যাচ্ছে, আর সেটাও এত দীর্ঘ সময়ের জন্য।

: দাদিও তোমাদের কাছে থাকবেন। উনার খেয়ালও রাখতে হবে তোমাকে।

: জি রাখব।

: আর হোমওয়ার্কেরও। এখন তোমাদের স্কুল নতুন। মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে। ছোট ভাই-বোন ঘাবড়ালে তাদেরকে বোঝাতে হবে।

: জি।

: আমি আর তোমার পাপা, প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।

: 'আপনারা ফিরবেন কবে?' এতক্ষণে এই প্রথম প্রশ্ন করল জিবরিল।

: 'এক মাসের মধ্যেই। আরেকটু বেশি লাগতে পারে। অপারেশন হলেই বোঝা যাবে।' ইমামা চিন্তিত চেহারায়ে ভাবতে ভাবতে বলল।

: যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে সর্বোচ্চ এক দিন রাখবে।
পরদিনই বাবা বাড়ি ফিরে আসবেন।

ইমামা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। 'তুমি কীভাবে জানো?'

: 'I read about it. এ ব্যাপারে আমি পড়াশোনা করেছি।' সে
মায়ের দিকে না তাকিয়ে বলল।

: কেন?

: 'জানার জন্য।' জিবরিল সরলভাবে বলল। ইমামা কতক্ষণ
তাকে দেখতে থাকল। তারপর চোখ সরিয়ে হ্যান্ড ব্যাগে কিছু
খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হলো, জিবরিল তার দিকে
তাকিয়ে আছে। একদম এক ধ্যানে। ইমামা মাথা তুলে এক
পলক তাকে দেখল। সে সত্যিই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

: 'কী হলো?' সে জিবরিলকে প্রশ্ন করল। প্রত্যুত্তরে সে তার কানের কাছে দৃশ্যমান একটি সাদা চুল হাত দিয়ে ধরতে ধরতে বলল, 'আপনার অনেক চুল পেকে গিয়েছে।'

ইমামা নিশ্চুপ তাকে দেখতে থাকল। তার পাকা চুল হাতে নিতে নিতে জিবরিলকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ইমামা অপলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিবরিলের জন্মের আগের সময়টা ইমামার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল। অন্তত তখন পর্যন্ত পাওয়া তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করতে সে সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করত। সালার যখনই তিলাওয়াত করত, ইমামা তার পাশে গিয়ে বসে পড়ত। এই কিতাব যেন কোনো অদৃশ্য স্পঞ্জের মতো তার সমস্ত বেদনা শুষে নিত। তার মনে হতো, সে শুধু একা নয়, বরং তার ভেতর নড়তে থাকা প্রাণটিও তিলাওয়াতের সময় চুপচাপ তার তিলাওয়াত শুনছে। যেন সেও মনোযোগ দিয়ে

তার বাবার তিলাওয়াত শুনতে শুনতে তিলাওয়াতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। কুরআনের যে সুর তার মায়ের প্রশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল, সেটি যেন তার জন্যও শান্তির উৎস হয়েছিল। সে যখন কান্না করত, তার ভেতরকার প্রাণটিও তখন অস্থিরতায় ছটফট করত। যেন সে তার মায়ের কান্না দেখে অস্থির হচ্ছে। মায়ের যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তা উপলব্ধি করতে পারছে।

আজ দশ বছর পর জিবরিল তেমনই আছে। সে তার মায়ের কালো চুলের মাঝে পাকা চুল দেখে অস্থির হচ্ছে। ইমামা তার হাত থেকে চুল সরিয়ে, সে হাতে চুমু খেলো।

: 'এখন আবার সাদা চুল নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিয়ো না।' ভেজা চোখে মুচকি হেসে তাকে উত্ত্যক্ত করল ইমামা। সে লজ্জা পেল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'আমি আগেই এ নিয়ে পড়ে ফেলেছি। স্ট্রেস এবং ইন হেলদি ডায়েট এর মূল কারণ।'

এ হামিন নয়, জিবরিল। প্রশ্নের আগেই উত্তর খুঁজে ফেলে সে। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা সময় ছিল, যখন তার কেউ ছিল না। আর এখন এমন একটা সময় এসেছে, যখন তার সন্তান তার সাদা চুল দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ছে। এটি তার জীবনের হাসেল-মাহসুলের সবচেয়ে সফল ও সার্থক অংশ।

২৭

সাড়ে তিন কোটি টাকার চেকটি দেখে কিছুক্ষণের জন্য নড়তে পারল না সালার। এই খামটি একটু আগেই ইমামা তাকে দিয়েছে। তখন সে ফোনে কথা বলছিল, আর খাম খুলতে খুলতে ইমামাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'এতে কী আছে?' প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই তার নামের চেকটি সে দেখতে পেল। সে মাথা তুলে ইমামার দিকে তাকাল। ইমামা চায়ের দুটি কাপ সেন্টার টেবিলে রেখে সোফায় বসে, চায়ের উঠন্ত

ভাপের দিকে তাকিয়ে আছে। সালার চুপচাপ তার পাশে এসে বসে পড়ল।

: 'আমি চাই তুমি এ টাকাটা নাও। নিজের কাছে রাখো অথবা SIF-এ ইনভেস্ট করো।' সালার পাশে বসতেই চায়ের কাপ ওঠাতে ওঠাতে ইমামা বলল।

: 'তুমি ওই আংটি বিক্রি করে দিয়েছ?' সালার সহসাই প্রশ্ন করল। মুহূর্তের জন্য ইমামা বলতে পারল না। তারপর মৃদু স্বরে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার ছিল, বিক্রি করতেই পারি আমি।'

: 'বিক্রির জন্য দেইনি তোমাকে।' সালার অভিমানী হয়ে আছে কিংবা ব্যথিত। 'তুমি জিনিসের মূল্যায়ন করো না।' না বলে থাকতে পারল না সে।

চায়ের ঢোক গিলতে গিলতে ইমামা মাথা নাড়ল, 'ঠিক বলেছ, আমি জিনিসের মূল্যায়ন করি না। মানুষের করি।'

: 'মানুষেরও করো না।' সালার বিরক্ত হলো।

: 'কেবল তোমার করিনি, তাই হয়তো শাস্তি পাচ্ছি।' চোখে অশ্রু এলো। স্বরের সঙ্গে হাতও কেঁপে উঠল। নীরবতা এলো। থামল। আবার ভেঙে গেল।

: 'তুমি একটা বোকা।' সালার এখন আর বিরক্ত হয়ে নেই। চেকটি সে খামে ভরে ওভাবেই টেবিলের উপর রেখে দিল।

: 'আগে ছিলাম।' ইমামা বলল।

: 'এখনো আছ।' সালার পীড়াপীড়ি করল।

: 'চালাকি দিয়ে এখন আর কী করব আমি?' প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করল ইমামা।

: 'এই টাকা এখন তোমার কাছে রাখো। অনেক কাজে প্রয়োজন হবে তোমার।' তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকে বলল সালার।

: 'আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে। অ্যাকাউন্ট ফাঁকা তো নয়! আমি কেবল SIF-এ খানিক অবদান রাখতে চাচ্ছি।' ইমামা বলে চলল।

: অলংকার বিক্রি করে তোমাকে অবদান রাখাতে চাইনি। তুমি কেবল দোয়া করো। অলংকার বেচে কেবল টাকা পাওয়া যাবে, দোয়া নয়।

: তাছাড়া এগুলো আমি পরি না। বছরের পর বছর ধরে লকারে পড়ে আছে। ভাবছি যে, ওগুলোও...।

সালার তার কথা পূর্ণ হতে দিল না। অত্যন্ত কঠোরভাবে তাকে বলল, 'ওসব অলংকার তুমি কিছুই করবে না। ওগুলো

বাচ্চাদের জন্য রেখেছি। থাকতে দাও। ওগুলো বিক্রি করে ফেললেও, এরপর থেকে আমি আর তোমার থেকে এক পয়সাও নেব না।"

ইমামা নিশ্চুপ হয়ে গেল। চায়ের ঢোক গিলে সালার কাপ রেখে দিল। অতঃপর তার দিকে ফিরে যেন খানিক অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'কেন করছ এসব?'

কোনো উত্তর না করে ইমামা চুপচাপ তার বাহুতে মাথা রেখে, তাকে জড়িয়ে ধরল। এই প্রথম সালারের উপলব্ধি হলো, অপারেশনের সময় যতই কাছে আসছে, ইমামা ততই দিশেহারা হয়ে পড়ছে। দিশেহারা হয়তো অনেক ছোট একটি শব্দ-তার এই দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, আশঙ্কা ও অলীক ভীতি প্রকাশের জন্য। সালারও চিন্তিত। কিন্তু ইমামার দিশেহারা অবস্থা যেন তার নিজের দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দিয়েছে।

: 'তুমি আমার সঙ্গে যেয়ো না, ইমামা! এখানেই থাকো।
বাচ্চাদের পাশে।' সালার আবারও তাকে বলল। ইমামা তার
সঙ্গে আমেরিকায় যেতে চাচ্ছে, অথচ সালারের ইচ্ছে, সে না
যাক। তার জেদের কাছে তো হার মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাকে
এখন এমন চিন্তিত, দিশেহারা দেখে তার মনে হচ্ছে,
অপারেশনের সময় ইমামার তার পাশে থাকা উচিত নয়।
ওখানে কোনো বড় অঘটন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে, একা
একা কীভাবে সামলাবে সে?

: 'বাচ্চারা এখনো অনেক ছোট, তাদেরকে রেখে তুমি আমার
সাথে কীভাবে থাকবে? তারা দুশ্চিন্তা করবে।' সালার এখন
তাকে নতুন এক ওজর দেখাচ্ছে।

না। : 'করবে না। তাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি।' ইমামার
কোনো পরিবর্তন হলো

: 'ওখানে আমার সঙ্গে ফোরকান থাকবে, পাপা থাকবে। তোমার এখানে বাচ্চাদের পাশে থাকা উচিত।' সালার পুনরায় পীড়াপীড়ি করল।

: 'আমার প্রয়োজন নেই তোমার?' ইমামা মনঃক্ষুণ্ণ হলো

: 'সবসময়।' সালার তার মাথায় চুমু খেতে খেতে বলল।

: 'সবসময়?' তার কাঁধে জড়িয়ে ধরে এই প্রথম ইমামা এই শব্দটি নিয়ে ভাবল, যা মূলত মিথ্যা।

: 'এই ব্যাগে আমি সবকিছু পুরে রেখেছি।' সালার হুট করে প্রসঙ্গ বদলাল। যেন সে তাকে ও নিজেকে আরও একটি যন্ত্রণার খাদ থেকে বাঁচাতে চাচ্ছে। সালার এখন রুমের একপাশে পড়ে থাকা এক ব্রিফকেসের দিকে ইশারা করছে।

: 'সঙ্গে নেওয়ার জন্য?' ইমামা না বুঝে ওভাবেই তাকে জড়িয়ে বলল।

: 'না, আমার সব জিনিস। চাবি, কাগজপত্র, ব্যাংকের পেপার এবং বাচ্চাদের সম্পূর্ণ সকল জিনিস। অ্যাকাউন্টে যে টাকা আছে, সব চেকবুকে সাইন করে রেখে দিয়েছি। সেই সঙ্গে আমার একটি উইলও।' সালার অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে বলে চলল। ইমামা চুপচাপ শুনতে থাকল।

: আল্লাহ না করুক, অপারেশনে যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায়, তাহলে এটা তোমাদের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

: 'সালার...!' ইমামা যেন তাকে আর কিছু বলতে নিষেধ করছে।

: তোমার নামে একটি চিঠিও আছে ওতে।

: 'আমি সেটা পড়ব না।' ইমামার গলায় যেন কান্না জমাট বেঁধে আছে।

: 'আচ্ছা! তাহলে এভাবেই তোমাকে শুনিয়ে দেই যা লেখা আছে।' সালার এখন তাকে জিজ্ঞেস করছে।

: 'না।' ইমামা আবারও তাকে থামিয়ে দিল।

: 'তুমি বই পড়তে চাও না, চিঠি পড়তে চাও না, আমার মুখে শুনতেও চাও না, তাহলে তুমি কী চাও?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করছে।

: 'বই আমি পড়ে ফেলেছি।' অবশেষে সে স্বীকারোক্তি দিল।
সালার চমকাল না।

: 'আমি জানি।' সালারের উত্তরে ইমামাও চমকাল না।

: 'কেউ কি তার সন্তানদের জন্য এমন পরিচয় রেখে যায়?'
ইমামা যেন অভিযোগ

করল।

: 'তাহলে কি সত্য লিখব না?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: আল্লাহ যা মাফ করে দিয়েছেন, তা ভুলে যাওয়া উচিত।

: জানি না, মাফ করেছেন কি না। এ তো আল্লাহই জানেন।

: 'আল্লাহ তো গোপন রেখেছেন, তাই না?' ইমামা তার কথায়
জোর দিল। 'আমি চাই না আমার সন্তানরা জানুক যে, তাদের
বাবা জীবনে অনেক ভুল করেছে। যে ভুলগুলো তাদের চোখে
তোমার সম্মান ও শ্রদ্ধা নিঃশেষ করে দেবে।' ইমামা তাকে বলে
চলল।

: তাহলে কি মিথ্যা বলব যে, আমি পবিত্র হয়ে জন্মেছি, আর ফেরেশতাদের মতো

জীবন কাটিয়েছি?

: না। বলবে, ব্যস স্বাভাবিক মানুষের মতোই কাটিয়েছি।

সালার অনাকাঙ্ক্ষিত হাসল। 'এই বইয়ে কি শয়তান মনে হয়েছে আমাকে?'

: 'এটি আমি সম্পাদনা করব।' ইমামা উত্তর না করে অন্য কথা বলল। সালার যেন আরও কিছুটা প্রফুল্ল হলো।

: তার মানে আমাকে মুমিন বান্দা বানিয়ে দিবে?

: 'সেটা তোমাকে জীবনে বানাতে পারলাম না, তাহলে বইয়ে বানাব কীভাবে?'

ইমামা না বলে থাকতে পারল না। সালার আবারও হাসল।

: এও ঠিক বলেছ।

সে মাথা খোঁজালো। বহুদিন পর তারা এভাবে কথা বলছে। এমন যেন জীবনে আগে কখনো কোনো সমস্যা ছিল না। সব ঠিক ছিল। কোথাও কোনো কষ্ট ছিল না।

: তারপর কী নাম রাখবে আমার আত্মজীবনীর?

: 'আবে হায়াত।' ইমামা অজান্তেই বলল। সালারের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। চেহারা বিবর্ণ হলো। তারপর আবার হাসল।

: 'ও তো কেউ পান করে পৃথিবীতে আসে না।' ইমামার চোখে চোখ রেখে সে

বলল।

: 'খুঁজতে তো পারে।' ইমামাও তার চোখে চোখ রেখে বলল।

: লা হাসিল। নিষ্ফল।

: ও তো জীবনও। নিষ্ফল।

সালার নিরুত্তর হয়ে চুপ হয়ে গেল।

: 'তুমি জীবনকে একটি তাসের খেলা মনে করে কাটাচ্ছ। আর এই বইটিও তুমি ওভাবেই লিখেছ।' ইমামা বলে চলল। সালার শুনতে থাকল। 'জীবন ৫২ পাতার খেলা তো নয়। তোমার লেখা বইটির ২৫০ পাতাজুড়ে কেবল স্বীকারোক্তি রয়েছে। তোমার অতীত-জীবনের সত্য সব স্বীকারোক্তি। কিন্তু এমন কোনো বিষয় নেই, যা পড়ে তোমার সন্তান তোমার মতো হতে চাইবে। আমি চাই, জীবনকে তুমি আবে হায়াত মনে করে লেখো। যেটা

পড়ে তোমার সন্তান তোমার মতো হতে চাইবে। কেবল তোমার সন্তানই নয়, যে-কেউই সেটা পড়ে তোমার মতো হতে চাইবে।" ইমামা তাকে বলে চলল।

: 'আমার কাছে এখন হয়তো এতটা সময় নেই।' সালার মৃদু স্বরে বলল।

: 'তাহলে সময় চাও আল্লাহর কাছে। তোমার সকল দোয়াই তো আল্লাহ কবুল করেন।' ইমামা ব্যথিত মনে বলল।

: 'তুমি চাও, যে জিনিস আমি চাইলে আল্লাহ দেন না, সেটা তুমি চাইলে তিনি দিয়ে দেন।' সালার তার চেয়েও অদ্ভুত স্বরে বলল।

: 'আমার বিশ্বাস তোমার কিছু হবে না। প্রচণ্ড হতাশা, দুশ্চিন্তা এবং তোমার মেডিকেল রিপোর্ট দেখার পরও, কেন জানি আমার মনে হয় সালার! তোমার আর আমার পথচলা এখানেই

শেষ নয়। এভাবেই কি শেষ হয়ে যাবে আমার যুগ্মতা।
সালারের হাত ধরে বলল সে। : 'আমারও মনে হয় না।' সালারও
অদ্ভুত ব্যথায় মুচকি হাসল। 'এখনো তো

আমাদের একসঙ্গে অনেক কিছু করা বাকি। একসঙ্গে হজ করা,
তোমার জন্য একটি বাড়ি করা। অনেক কিছু বাকি।' সালার এখন
অপূর্ণ কাজগুলো হিসেব করছে। যেন অন্ধকারে জোনাক
পোকা খুঁজছে। ইমামা মাথা নুইয়ে ফেলল। সেও অন্ধকারে
কেবল জোনাক পোকাই খুঁজতে চায়; অন্ধকার নয়।

২৮

অপারেশন টেবিলে শুয়ে, অ্যানেসথেসিয়া নিয়ে অবচেতন
হতে চলেছে সালার। তার আগেই, সে তাদের সবাইকে নিয়ে
ভাবতে লাগল, যাদেরকে সে ভালোবাসে। ইমামা, যে
অপারেশন থিয়েটারের বাইরে বসে আছে। সিকান্দার উসমান,
যিনি এই বয়সেও তার নিষেধ সত্ত্বেও নিজের চোখে ছেলের

অপারেশন দেখবেন বলে, এখানে চলে এসেছেন। তার মা, যিনি পাকিস্তানে তার বাচ্চাদের সামলাচ্ছেন। আর তার সন্তানেরা, জিবরিল, হামিন, ইনায়া, রাইসা... একে একে সবার চেহারা তার সামনে ভেসে উঠছে। জিবরিল ছাড়া বাকি সবাই জানে, পাপার একটি ছোট্ট অপারেশন হবে। আর অপারেশন করলেই তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। আমেরিকায় আসার আগে ইনায়া এটি শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সালারের সান্ত্বনা সত্ত্বেও অপারেশন শব্দের মানে সে বুঝতে পেরেছিল। 'Baba is a boy, and boys are brave. বাবা একজন পুরুষ, আর পুরুষেরা সাহসী।' এ বলে হামিন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

আর রাইসা, যে তার জন্য সবসময় লনের গাছ থেকে কোনো সুন্দর ফুল বা পাতা এনে রেখে দেয়। এটি ছিল তার অভ্যাস। সে ইমামাকে, সালারকে সবসময় ফুল এনে দেয়। আমেরিকায় আসার সময় হলুদ রঙের একটি প্যানজি ফুল দিয়েছিল সালারকে।

সেটি ছিল বসন্তের প্রথম প্যানজি। সিকান্দার উসমানের লনে এটি ফুটেছিল। সেই ফুলটি এখনো তার ব্যাগে আছে। স্নান হয়ে। গত রাতে ব্যাগ খুলতেই সালার সেটি দেখতে পেয়েছিল।

অবচেতনে যেতে যেতে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ভাবতে শুরু করেছে সে। যেন নিজের মানসিকতার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। আয়াত পড়তে পড়তে তার জিহ্বা এখন ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। বেঁধে যাচ্ছে সে। যা পড়ছিল, তা আর মনে করতে পারছে না। সমস্ত মুখ, শোরগোল, ভাবনা, সবকিছু ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে। অতঃপর অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল।



চার ঘন্টার অপারেশন, চার অতিক্রম করে পাঁচ, ছয়-সাত এবং আট ঘন্টায় চলে গেল। এই আট ঘন্টা ছিল ইমামার জীবনের কঠিনতম আট ঘন্টা। সিকান্দার উসমান, ফোরকান, সালারের

দুই বড় ভাই এখানে উপস্থিত আছে। সবাই তাকে সাহস ও সাহস দিচ্ছে। কিন্তু সে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে আধাঘন্টা যাবৎ কেবল দোয়া করতে থাকল। আল্লাহ যেন সালারের বুদ্ধিমত্তা ও সক্ষমতার নিয়ামত বহাল রাখেন। তার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন যেন অটুট থাকে। সবার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ওই সময়টাতে সে কিছুই খেতে পারল না।

অপারেশনের আগের রাতেও সে সারা রাত জেগে ছিল। জেগে ছিল সালারও। তারা তেমন কোনো কথাও বলেনি। কেবল চুপচাপ বসে ছিল। তারপর কফি পান করতে চলে গিয়েছিল। ওখান থেকে হোটেলে ফেরার পথে, কফির কাপ হাতে নিয়ে আসতে আসতেও কোনো কথা বলেনি। কিছু বলে থাকলেও, আমেরিকার আবহাওয়া, কফির ব্যাপারে মন্তব্য, বাচ্চাদের ব্যাপারে আলোচনা, এছাড়া আর কিছু নয়।

অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে সালার তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। যেভাবে সবসময় জড়িয়ে ধরে। সালার যখনই তার

থেকে দূরে যায়, ইমামা সব সময়ই তাকে একটি কথাই বলে, উইল বি ওয়েটিং, অপেক্ষায় থাকবা। আর উত্তরে সালার মাথা নেড়ে মুচকি হাসে। এবারও তা-ই করেছিল। কিন্তু চোখে চোখ রাখেনি। দৃষ্টি বিনিময় করে সে হয়তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে চায়নি। ইমামও কাঁদতে চায়নি। অন্তত ওই সময়ে। ইমামা কান্নাও করেনি, অন্তত সালারকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানোর পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু ঢোকানোর পর সে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তার আশা ছিল এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসও ছিল। তা সত্ত্বেও সে নিজেকে ভয়ংকর কল্পনা, আশঙ্কা, কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছিল না। এগুলো যেন এখন তার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে।

ওই আট ঘণ্টায় না জানি কত দোয়া, কত অজিফা পড়েছে সে। আল্লাহর রহমত চেয়ে কত যে প্রার্থনা করেছে। ইমামা তা গুনেও রাখেনি। অপারেশনের সময় যতই যাচ্ছিল, তার কষ্ট, যন্ত্রণা, ভয়ও বেড়েই চলছিল। আধাঘণ্টা পর অবশেষে অপারেশন সাকসেসের সংবাদ শুনল। ডাক্তাররা সালারের

একটি টিউমার অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। অপরটি পারেনি। সার্জারির মাধ্যমে সেটি সরানো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। সেটি অনেক স্পর্শকাতর জায়গায়। শতভাগ সফল অপারেশনের মাধ্যমে সেটি অপসারণ করলেও, ডাক্তারদের আশঙ্কা, তা সালারের মস্তিষ্কের ক্ষতি করবে। তাই অপারেশন ব্যতীত ওষুধ ও অন্যান্য মাধ্যমে ওই টিউমারটি নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে উত্তম। এতে করে আপাতত সালারের মস্তিষ্ক ও জীবনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

সাড়ে আট ঘণ্টা পর ইমামা ও সিকান্দার উসমান অবশেষে তাকে দেখতে পেল। সালারের এখনো জ্ঞান ফেরেনি। কয়েক ঘণ্টা পর তার জ্ঞান ফিরবে। জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তাররা সঠিকভাবে তার অপারেশনের সফলতা নির্ণয় করতে পারবে। জ্ঞান ফিরে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে, আপনজনকে চিনতে পারলে, তারপরই ডাক্তাররা সঠিক কিছু বলতে পারবে।

ইমামা একটি সমুদ্র পার করে এসেছে। এখন আরেকটি সমুদ্রে ডুবে আছে। সে বেশিক্ষণ সালারের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। জীবনে দ্বিতীয়বার সালারকে সে এমন অবস্থায় দেখছে; অসহায়ের মতো জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ঝুলতে। প্রথমবার বিয়ের আগে যখন কবজি কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, তখন। এত বছর পর আজ আবার তাকে এই অবস্থায় দেখছে। তার ও টিউবে আবদ্ধ হয়ে। তাকে দেখতে চাওয়া সত্ত্বেও ইমামা তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ডাক্তার তাদের এখানে থাকতে নিষেধ করল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসতে হলো। সিকান্দার উসমান তার সঙ্গেই অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছেন। সালারের দুই ভাই ও ফোরকান হসপিটালের কাছেই বন্ধুদের বাসায় থাকছে। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে সিকান্দার উসমানকে উনার রুমে দিয়ে, ইমামা তার রুমে চলে এলো। এখানে অদ্ভুত নীরবতা ছেয়ে আছে, কিংবা গভীর আতঙ্ক। প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে

আছে সে। ঘুমাতে চাচ্ছে। কিন্তু ঘুমাতে পারছে না। যেন
অনিদ্রার শিকার হয়ে পড়েছে।

স্মার্টফোনের স্ক্রাইপে সে জিবরিলকে অ্যাক্টিভ দেখতে পেয়ে,
অবচেতনেই তাকে কল করতে লাগল।

: 'বাবা কেমন আছেন?' জিবরিল সালাম-কালামের পর প্রথম
প্রশ্ন করল।

: 'সে ঠিক আছে। অপারেশন সফল হয়েছে। ডাক্তাররা এখন
তার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করছে।' ইমামা তাকে বলতে
থাকল।

: 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। বাবা ঠিক হয়ে যাবেন।' সে সব
সময়ের মতো মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

: 'জিবরিল, তুমি এমন কোনো সুরা তিলাওয়াত করো, যাতে আমার ঘুম চলে আসে।' সন্তানের সামনে এতটা অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না সে, কিন্তু প্রকাশ করে ফেলল। জিবরিল ল্যাপটপের স্ক্রিনে তার ক্লান্ত চেহারার দিকে তাকাল। তারপর যেন মায়ের কষ্ট কমানোর চেষ্টা করল।

: আপনাকে সুরায়ে রহমান শোনাই?

: হ্যাঁ।

: ওকে, আমি অজু করে আসছি। আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

গত দুদিনে এই প্রথম ইমামা মুচকি হাসল। জিবরিল অজু ছাড়া মুখস্থও কোনো ছোট-বড় আয়াতও তিলাওয়াত করে না। কুরআনের প্রতি এই সম্মান তাকে কেউ শেখায়নি। এটি তার মধ্যেই ছিল। জন্মগত। কুরআন পাক হেফজের ইচ্ছে তার বাবা-মা প্রকাশ করার বহু আগেই, জিবরিল নিজেই প্রকাশ করেছিল।

তখন সে মাত্র তিন বছরের শিশু। সালারকে তখন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখত। তারপর একদিন ইমামাকে সে বলল, 'বাবা কী পড়েন?'

: 'সে আল্লাহর কিতাব পড়ে। যেমন করে তুমি কায়দা পড়ো।' ইমামা তাকে উত্তর করেছিল।

: 'কিন্তু কায়দা তো অনেক ছোট!' জিবরিল যেন তার হতাশা প্রকাশ করে।

: যখন তুমি কায়দা পড়া শেষ করে ফেলবে, তখন কুরআন পাক পড়বে।

: কিন্তু কায়দা তো অনেকবার পড়ে ফেলেছি।

সে সত্যিই তার কায়দা অনেকবার করে ফেলেছিল। তাকে সবক দেওয়া, পুনরাবৃত্তি করানো এবং পরের দিন সবক শোনার

কোনো প্রয়োজন হতো না ইমামার। কায়েদার কোনো হরফ, শব্দ সে ভুলত না। কায়দা পড়ার প্রথম দিন থেকেই এমন ছিল সে। তা সত্ত্বেও ইমামা ও সালার তাকে তৎক্ষণাৎ সিপারা দিয়ে দেয়নি। তারা তাকে ছোট ছোট সুরা ও কুরআনের দোয়া শেখাতে থাকে। জিবরিল সেগুলোও দ্রুতগতিতে মুখস্থ করতে থাকে। সালার তাকে আরেকটু বড় হলে কুরআন হেফজ করাতে চাচ্ছিল, যাতে করে সে আয়াতের অর্থও বুঝতে পারে।

: 'বাবার কি এই পুরো কিতাব মুখস্থ?' জিবরিল কুরআনের বিশাল মুসহাফখানা তার কচি হাতের আঙুল চেপে মাপার চেষ্টা করল। সেটি একটু আগেই সালার তিলাওয়াত করে টেবিলে রেখে গিয়েছিল।

: 'হ্যাঁ।' ইমামা তার কৌতূহল দেখে খুশি হয়েছিল।

: 'পুরোটা?' জিবরিল যেন খানিক সন্দিহান হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

: 'হ্যাঁ, পুরোটা।' ইমামা তার কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।
জিবরিল পুনরায় টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে কুরআন
পাকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে শুরু করেছিল। তারপর মাপামাপি
শেষ করে ইমামাকে সে বলেছিল, 'ওয়াওও!'

ইমামা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হাসে। পুরো মাপজোখ শেষে, সে
যেন তার বাবাকে বাহবা দিল।

: 'আমিও কুরআন পাক মুখস্থ করতে চাই। আমি করতে পারব
কি?' ইমামার হাসিতে খানিক লজ্জা পেয়েও মাকে সে বলে।

: হ্যাঁ অবশ্যই। করতে পারবে। আর ইনশাআল্লাহ করবে।

: কখন?

: যখন তুমি বড় হবে।

: 'বাবার মতো?' জিবরিল তেমন সন্তুষ্ট হলো না।

: 'না, ব্যস আরেকটু বড়।' ইমামা তাকে আশ্বস্ত করে।

: ওকে, আমি যখন কুরআন পাক হেফজ করব, তখন বাবার মতো আমিও কুরআন না খুলে পড়ব।

: 'অবশ্যই পড়বে।' ইমামা যেন তাকে উৎসাহিত করে।

: 'আর আপনাকেও শোনাও। তখন আপনিও চোখ বন্ধ করে শুনবেন, যেভাবে বাবার তিলাওয়াত শোনেন।' জিবরিল তখন মাকে বলেছিল। ইমামা ভাবেনি, এত জলদি সেই সময় চলে আসবে। সে নিজে জিবরিলকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানোর কথা বলবে।

: মান্নি, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?



জিবরিলের ডাকে হড়বড় করে চোখ মেলল সে। পাশের টেবিল থেকে ফোন তুলে স্কাইপের দিকে তাকাল।

: 'না।' ইমামা জবাব দিল।

: 'আমি শুরু করব?' জিবরিল বলল।

: হ্যাঁ।

মাথায় টুপি পরে, দুই হাত বুকে বেঁধে, জিবরিল তার মধুর সুরে সুরায়ে রহমান তিলাওয়াত করছে। ইমামার হঠাৎ সালারের কথা মনে পড়ে গেল। সে তার মুখে এই সুরাই শুনত। জিবরিলেরও যেন এ কথাটি মনে আছে।

এই প্রথম সে উপলব্ধি করতে পারছে, কেবল সালার সিকান্দারের তিলাওয়াতই তাকে মুগ্ধ করে না, বরং দশ বছর

বয়সি তার সন্তানও সেই সুরাটি তিলাওয়াত করতে করতে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ও স্তম্ভিত করে দিচ্ছে। তার গলায় বিষাদের সুর। ইমামার হৃদয় যেন গলে গলে পড়ছে। এমন যেন শীতল বরফখণ্ড তার দেহের ক্ষত মুছে দিচ্ছে।

[فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ] তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

জিবরিল প্রতিবার পড়ছে, আর প্রতিবারই ইমামার হৃদয় ভরে উঠছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিয়ামত অগণিত। শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো এই সন্তান, যার কণ্ঠে সে আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা শুনছে। একবার এবং বারবার শুনছে।

'মাম্মি!' জিবরিল তার তিলাওয়াত শেষ করে একদম মৃদু স্বরে তাকে ডাকল। এমন যেন, তার চোখ বন্ধ দেখে সে ভেবেছে, ইমামা হয়তো তিলাওয়াত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে তাকে জাগাতে চাচ্ছে না। কিন্তু ইমামা ঘুমায়নি;

প্রশান্তির ঘোরে আছে। যেন কেউ তার মাথা ও কাঁধের বোঝা হালকা করে দিয়েছে।

: 'জিবরিল! তুমি আলেম হয়ো।' চোখ বন্ধ করে করেই ইমামা তাকে বলল। 'তোমার গলায় অনেক প্রভাব।'

: 'মান্নি, আমি নিউরোসার্জন হতে চাই।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে জিবরিল, শান্ত গলায় মাকে তার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে দিল। ইমামা চোখ মেলে উঠল। জিবরিল অসম্ভব গম্ভীর হয়ে আছে।

: 'আমার ইচ্ছে তুমি আলেম হও।' ইমামা এবার জোর দিয়ে বলল। সে জানে, জিবরিল কেন নিউরোসার্জন হতে চায়।

: 'হামিন অনেক ভালো আলেম হতে পারবে। আমি নই।' জিবরিল দ্বিধাশ্রিত হলো, থমকাল।

: তুমি অধিক উপযুক্ত ও যোগ্য বেটা!

: 'ভেবে দেখব। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।' সে মায়ের সঙ্গে বিতর্ক করল না। প্রসঙ্গ পালটে ফেলল।

পঞ্চম অধ্যায়

আবাদান আবাদা

০১

গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের বিশাল হলরুম এই মুহূর্তে কানায় কানায় পূর্ণ। ৯২তম স্ক্রিপস ন্যাশনাল স্পেলিং বি প্রতিযোগিতার দুই ফাইনালিস্ট, বাদ পড়া অন্যান্য প্রতিযোগী, তাদের বাবা-মা, ভাই-বোন এবং অসংখ্য দর্শকে ভরপুর। এত এত মানুষের জমায়েতেও চারপাশে বিরাজ করছে পিনপতন নীরবতা।

উভয় প্রতিযোগীর মধ্যে চলছে ফাইনালের ১৪তম রাউন্ড।
মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে ১৩ বছরের ন্যাস্পি। প্রশ্নোত্তর শব্দ বানান
করতে তার নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। টানা ৯২ বছর ধরে
এই হলরুমেই বিশ্বের সেরা বানানবিদদের মাথায় মুকুট পরানো
হচ্ছে। আমেরিকার নানা রাজ্য এবং স্পেলিং-বির বিভিন্ন
বৈদেশিক শাখার আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে, অনূর্ধ্ব
ষোলো ক্যাটাগরির প্রতিযোগীরা এখানে এসেছে। তাদের মধ্যে
এখন হাড্ডাহাড়ি লড়াই বিরাজমান। আজও চলছে এই দুই
প্রতিযোগীর

মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই।

'Sassafras.' প্রোনাউন্সার শব্দটি উচ্চারণ করলেন, ন্যাস্পি
শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শুনল। শব্দটি আবার শোনানোর অনুরোধ করল।
এবার সাথে সাথে নিজেও শব্দটি পুনরাবৃত্তি করল সে। এটি
চ্যাম্পিয়নশিপের কঠিন শব্দগুলোর একটি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে



পড়ল না, তবে শুনে খুব জটিলও মনে হলো না। শুনতে সহজ মানেই ভেতরে খুব জটিল, এটা সে ভালো করেই জানে।

দর্শকের সারিতে নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে নয় বছরে অপার ফাইনালিস্ট। সে তার গলায় ঝোলানো নম্বর কার্ডের পেছনে আঙুল ঘুরিয়ে শব্দটি বানানের চেষ্টা করছে। সেটা তার শব্দ নয়, তবু বাদ পড়া অন্য সব প্রতিযোগীর মতো সেও অজান্তেই বানানটা মেলাচ্ছে মনে মনে।

ন্যাপ্সির নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এলো। সে বানান শুরু করল, S.A.S.S. প্রথম চার অক্ষর বলার পর এক মুহূর্ত থামল। ঠোঁট নেড়ে বাকি পাঁচ অক্ষর মনে মনে আওড়াল। তারপর উচ্চারণ করল-A.F.R. আবারও থামল। এদিকে ছোট্ট ফাইনালিস্ট চুপিসারে শেষ দুটো অক্ষর উচ্চারণ করল-U.S। ঠিক তখনই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানো ন্যাপ্সিও উচ্চারণ করল-U.S। আর তারপরই বানান ভুলের সাংকেতিক সাইরেন বেজে উঠল। অবিশ্বাসের ছায়া ফুটে উঠল ন্যাপ্সির মুখে। একই অবস্থা

সেই নয় বছরের প্রতিদ্বন্দ্বীরও। প্রোনাউন্সার এখন সঠিক বানান পুনরাবৃত্তি করলেন-Sassafras। ন্যাপ্সি অজান্তেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। শেষ অক্ষরের আগে A হওয়ার কথা ছিল, কী ভেবে আমি U বসালাম! নিজেকে তিরস্কার করল সে।

প্রায় বিবর্ণ মুখে ন্যাপ্সি গ্রাহাম ধীরে ধীরে প্রতিযোগীদের জন্য রাখা আসনের দিকে এগিয়ে গেল। হল তুমুল করতালিতে গুঞ্জনিত হলো। রানার-আপকে দাঁড়িয়ে তারা অভিবাদন জানাল। নয় বছরের ফাইনালিস্টও উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল। ন্যাপ্সি তার কাছে আসতেই সে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল। ন্যাপ্সিও মৃদু হেসে তাকে প্রত্যুত্তরমূলক শুভ কামনা জানিয়ে নিজের আসন গ্রহণ করল। দর্শকরা আবারও নিশ্চুপ হয়ে নিজেদের আসনে বসে পড়েছে। এবার নয় বছরের ফাইনালিস্টের পালা। সে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ন্যাপ্সি কোনো এক অলীক আশায় তার দিকে তাকিয়ে রইল। যদি সেও ভুল করে, তবে আবারও সে ফিরতে পারবে ফাইনাল রাউন্ডে।

: 'That was a catch ২২, সেটি ছিল এক ফাঁদ।' ছেলেটি করমর্দন করতে করতে কথাটি বলছিল। ন্যাসি বুঝে উঠতে পারছে না, এটি কি সে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল? নাকি সে নিজেও ওই শব্দটির ফাঁদে পড়েছিল বোঝাল? ন্যাসি মনে মনে এটাই চাচ্ছে, ছেলেটিও যেন ফাঁদে পড়ে। যেকোনো প্রতিযোগী হলে এটাই চাইত।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন সেই নয় বছরে ফাইনালিস্ট। মুখে দুট্ট হাসি, চোখে গভীর কালো দৃষ্টি। মঞ্চ দাঁড়িয়ে সে প্রধান অতিথির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। প্রত্যুত্তরে প্রধান অতিথি জনাথনও মৃদু হাসল। তবে সেই হাসি কেবল জনাথনের মুখেই নয়, উপস্থিত সকল ব্যক্তির মুখে ছড়িয়ে আছে। কারণ, এই ক্ষুদ্রে ফাইনালিস্ট ইতিমধ্যেই পুরো হলরুমের সবার প্রিয়মুখে পরিণত হয়েছে।

তার চেহারাজুড়ে এক অসম্ভব সরলতা। চকচকে গোলগাল চোখ, যেন কোনো কার্টুন চরিত্রের প্রাণবন্ত মুখাবয়ব। ক্ষণে ক্ষণে জিভ বোলানো গোলাপি ঠোঁট, ঠোঁটের ইতিউতি বাঁক; যেন সকলের অকারণ হাসির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ এক নিষ্পাপ ফাঁদ; মাসুম ফিতনা, এটা কেবল তার বাবা-মা-ই জানে। মঞ্চের বাঁ পাশে প্রথম সারিতে বসে আছে তারা। অন্যান্য অভিভাবকের বিপরীতে তারা অত্যন্ত নিশ্চিত্ত মনে বসে আছেন ওখানে। তাদের সন্তান চূড়ান্ত রাউন্ডের জন্য মঞ্চে উঠেছে, তবু তাদের মধ্যে কোনো চিন্তার ছাপ নেই। তবে তার সাত বছরে ছোট বোনের চেহারা য ফুটে আছে চিন্তা ও দুশ্চিন্তার ভাপ। পুরো প্রতিযোগিতার দুদিন সে প্রায় দম বন্ধ করে কাটিয়েছে। চশমা পরা চোখে, অদম্য মনোযোগে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ভাই চাতক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রোনাউন্সারের মুখে প্রশ্ন শোনার অপেক্ষায়।

'Cappelletti' জনাথন উচ্চারণ করল শব্দটি।



ছেলেটির ঠোঁটে এক চাপা হাসি ফুটল, যেন খুব কষ্ট করে হাসিটা সামলাচ্ছে। চোখদুটি একবার ঘড়ির কাঁটার মতো সামনের দিকে ঘুরল, তারপর উলটো দিকে। হলঘরে হালকা খিলখিল শোর ছড়িয়ে পড়ল। পুরো চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতাজুড়েই ছিল তার এই প্রতিক্রিয়া। প্রতিটি শব্দ শুনেই প্রথমে চাপা হাসি, ঘূর্ণায়মান চোখ আর অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। কিছু দর্শক হাততালি দিয়ে তার প্রশংসা করেছে। অন্যদের তুলনায় তার প্রশ্নগুলো ছিল তুলনামূলক কঠিন। কিন্তু অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিচলিত কিংবা আতঙ্কিত না হয়ে, হাসি মুখে উতরে গেছে প্রতিটি পাহাড়। আর এখন সে দাঁড়িয়ে আছে সাফল্যের সর্বশেষ চূড়ায়।

: 'Definition please. একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ!' হেল্প নিয়ে ছেলেটি তার নির্ধারিত সময় ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রোনাউন্সার তার প্রশ্নের উত্তর দিল। এবার সে আরেকটি প্রশ্ন করল,



: Language of origin? এটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

: ইতালিয়ান।

প্রোনাউন্সারের উত্তরটি বিড়বিড় করতে করতে ভাবুক ভঙ্গিতে
ঠোঁট নাড়াল ডানে-বায়ে। তার বোন আরও বেশি অস্থির হয়ে
পড়ল। কিন্তু বাবা-মা অদ্ভুত নিশ্চিন্ত। ছেলেটির চেহারাই বলছে,
এই শব্দটি তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আগের প্রতিটি শব্দও
সে এমন ভাব করেই দিয়েছিল।

: Use in a sentence please. এটি কোনো বাক্যে ব্যবহার
করে দেখান।

প্রোনাউন্সার শব্দটি এবার বাক্যে ব্যবহার করে দেখাল। ছেলেটি
তার গলায় ঝোলানো নম্বর কার্ডের পেছনে আঙুল চালিয়ে
শব্দটির বানান রিভাইস করে নিল।

Your Finish Time starts. তোমার সময় শুরু।

তার হাতে এখন ৩০ সেকেন্ড আছে, এর মধ্যেই সঠিক উত্তর দিতে হবে। তার চোখগুলো এবার ঘূর্ণন বন্ধ করে থমকে গেল। 'Cappelletti' শব্দটি আবার উচ্চারণ করল সে। তারপর বানান করতে লাগল-C.a.p.p.e.1.1। এতটুকু বলে এক মুহূর্ত থামল। তারপর একটি দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে পুনরায় বানান শুরু করল-c-t.t.il পুরো হল করতালিতে গর্জে হয়ে উঠল। দীর্ঘক্ষণ সেই তালি বেজেই চলল।

স্পেলিং বি-এর এই নতুন চ্যাম্পিয়ন এখন কেবল এক শব্দ দূরত্বে অবস্থান করছে। তালির গর্জন থেমে যেতেই জনাথন তাকে অতিরিক্ত একটি শব্দ বানান করার কথা জানাল। সে মাথা নাড়ল। যদি সে এই শব্দটি বানান করতে না পারে, তাহলে ন্যাপ্সি আবারও প্রতিযোগিতায় ফিরে এসে যাবে।



'weissnichtwo' শব্দটি তার দিকে ছুড়ে দেওয়া হলো। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের হাসি উধাও হয়ে চোখগুলো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।

'ওহ মাই গড!' অজান্তেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পুরো চ্যাম্পিয়নশিপে এই প্রথম তার চোখ ও সত্তা; দুটোই স্থির হয়ে গেল। ন্যাপ্সি অবচেতনেই বৈঠক ভেঙে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। অবশেষে এই শব্দটিই তাকে চ্যাম্পিয়নশিপ ফিরিয়ে দিতে পারে।

ছেলেটির অভিব্যক্তি এই প্রথম তার বাবা-মাকেও চিন্তিত করে দিল। কী এক চরম সংকটে পড়ে গেছে তাদের সন্তান! নম্বর কার্ড দিয়ে সে তার চেহারা ঢেকে ফেলছে। দর্শকরা তার হাতের কাঁপুনি, আঙুলের ইতস্ততা স্ক্রিনে অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছে। অনেকেই তার প্রতি সহানুভূতি অনুভব করছে। ওখানকার অধিকাংশ মানুষই চাচ্ছে সে জিতে যাক। হলের একমাত্র ব্যক্তি তার ছোট বোন, যাকে অত্যন্ত প্রশান্ত মনে

হচ্ছে। সে কি সত্যিই প্রশান্ত নাকি অশান্ত? কিছুই বলা যাচ্ছে না।

মেয়েটি তার বাবা-মায়ের মাঝে বসে, মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে ভাইয়ের দিকে দুই হাত উঁচিয়ে নাড়াচ্ছে। তার বাবা-মা প্রথমে হাত নাড়ানো ছোট্ট মেয়েটির দিকে তাকাল, তারপর তাকাল মঞ্চে দাঁড়ানো তাদের ছেলের দিকে। নম্বর কার্ডের পেছনে সে তার মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। কার্ডের পেছনে আঙুল দিয়ে কিছু লিখছে আর বিড়বিড় করে কিছু আওড়াচ্ছে। এবার ধীরে ধীরে হাততালি বাজতে শুরু করেছে। সে কার্ড মুখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছে, যেন পুরোপুরি প্রস্তুত। ৯২তম স্পেলিং বি প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রথমবারের মতো উঠে আসা এই ফাইনালিস্ট ভাগ্যপরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে গেছে।

সেই ফাইনালিস্ট হামিন সিকান্দার এক নিশ্বাসে, একটুও না থেমে, রোবটের মতো করে বানান করল-w-e-i-s-s-n-i-c-h-tw-o। তার চোখ দূরে কোথাও স্থির, যেন সেসব অক্ষর



শূন্যের স্লেটে ঝুলে আছে, আর সে সেগুলো পড়ে যাচ্ছে। সাধারণত প্রতিটি অক্ষর ভেবে ভেবে, মেনে মেনে বলত সে। কিন্তু এবার আলাদা। এবার যেন এক অদ্ভুত তাড়নায় ঝটপট উচ্চারণ করে ফেলল। শব্দটা শেষ করেই তার মানে বলল, An unknown place-এক অজানা স্থান।

হলের সবার চোখ তখন প্রোনাউসারের দিকে। তার ঠোঁট থেকে একটি শব্দই বেরোল, 'Correct-সঠিক'।

সঙ্গে সঙ্গে গোটা হল হাততালির গর্জনে ভরে উঠল। দর্শক, অভিভাবক আর বাচ্চারা সবাই দাঁড়িয়ে গেল তাকে সম্মান জানাতে। স্পেলিং বি-এর ৯২তম চ্যাম্পিয়নকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তারা। মঞ্চার চারপাশ ঝলসে যাচ্ছে ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। নয় বছরের সেই ছেলেটি নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে আছে, চোখের পলক ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। মনে হচ্ছে, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না, সে সত্যিই জিতে গেছে।



হামিন সিকান্দার, হ্যাঁ তার পক্ষে এটা সম্ভব। কানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হাততালির আওয়াজ আর ঝলমলে আলোয় দাঁড়িয়ে সে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল। স্নায়ু আর অনুভূতিকে একসাথে নিয়ন্ত্রণে আনার লড়াই করছে সে। অবশেষে মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে তার মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটা বেরোল, তাতেই হল আবার ফেটে পড়ল হাসি ও হাততালিতে, 'ওহ মাই গড!' সে শুধু এটুকুই বলতে পারল।

শ্রোতাদের হাসি তাকে আরও একটু নার্ভাস করল। তারপর আবার উচ্ছ্বসিত করল। মাথা নিচু করে সে হাততালির জবাব দিল। এক পা এগিয়ে সেসব বিচারকের দিকে তাকাল, যারা এখন দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তারপর ঘুরে দেখল, দর্শকসারিতে তার বাবা-মা আর রাইসা। তারাও উঠে দাঁড়িয়ে, গর্বভরে তালি দিচ্ছে। হামিন প্রায় দৌড়ে চলে গেল তাদের দিকে। স্পটলাইটও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলল। সেখানে বসা ইমামা, হাততালি দিতে দিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছে,

তাকেও আলো ঘিরে ফেলল। হামিন গিয়ে মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই মায়ের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু দু-হাতে মুছে দিল। তারপর সেই হাত নিজের শাটে মুছে, ছুটে গিয়ে সালারকে জড়িয়ে ধরল।

: 'Did I make you proud? আমি কি আপনাকে গর্বিত করতে পেরেছি?' তার চিরচেনা প্রশ্ন বাবার উদ্দেশে।

: 'Very proud! অবশ্যই, অনেক গর্বিত আমি!' বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে জবাব দিলেন।

তার চোখ চকচক করে উঠল, হাসিটা আরও গভীর হলো। তারপর সে রাইসার দিকে এগিয়ে গেল। দুই হাত ছড়িয়ে, বাতাসে উঁচু করে তুলে রাইসার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের সঙ্গে হাই-ফাইভ করল। এরপর নিজের গলায় ঝোলানো নম্বর কার্ড খুলে সেটা রাইসার গলায় পরিয়ে দিল। একটু ঝুঁকে তাকে কোলে তুলে ধরল, রাইসা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। আবার

নামিয়ে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল সেই ভিড়ের মাঝে, যেখানে প্রোনাউন্সার আবার তার সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

: 'শেষ শব্দটি কেমন কঠিন মনে হয়েছে?' প্রাথমিক কথাবার্তার পরই অতিথি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড আগেই সে অন্যান্য ফাইনালিস্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, অভিনন্দন গ্রহণ করে মঞ্চে উঠেছে। হলরুমে সবাই আবার আসনে বসে পড়েছে। এখন পুরস্কার বিতরণী পর্ব শুরু হচ্ছে।

: 'শেষ শব্দ তো একদমই সহজ ছিল।' হামিন নিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। চারদিক হাসিতে খিলখিল করে উঠল।

: 'তাহলে কঠিনটা কী ছিল?' অতিথি মজা করে জিজ্ঞেস করলেন।

: 'যেগুলো এর আগে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।' হামিন গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিল। হাসির রোল এবার আরও জোরে ছড়িয়ে পড়ল।

: কেন?

: 'কারণ আমি প্রতিটা শব্দ ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু আন্দাজে বলে যাচ্ছিলাম। শেষ শব্দটাই ছিল এমন, যেটা আমি চোখ-কান-নাক সব বন্ধ করেও ঠিকঠাক বলতে পারতাম।' সে সাবলীলভাবে বলে যাচ্ছে। আর হলরুম হাততালি ও হাসিতে কেঁপে উঠছে। সবাই তার বুদ্ধিদীপ্ততা, সরলতা আর হাস্যরসের প্রশংসা করছে। যদিও কথাগুলো কেউ পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। শুধু রাইসাই জানে, সে একেবারে সত্য বলছে। শেষ শব্দটি ছাড়া সত্যিই সে আগের সব শব্দ ভুলে গিয়েছিল। আর সেটা রাইসা বুঝতে পারত তার মুখের ভঙ্গি দেখেই। তাই প্রতিবার যখন সে হকচকিয়ে যেত, তখনই রাইসা তার আঙুলের ডগা গুনে তার জন্য মনে মনে দোয়া করতে থাকত।

: 'শেষ শব্দটা এত সহজ লাগল কেন তোমার কাছে?' অতিথি
আবার জানতে

চাইল।

বুকের ওপর এক হাত রেখে, অন্য হাত দিয়ে রাইসার দিকে
ইশারা করে হামিন গর্বভরা কণ্ঠে বলল, 'কারণ আমি আর
আমার বোন এসেছি weissnichtwo বা অজানা এক স্থান
থেকে।'

হলরুম আবারও হাততালি আর হাসিতে ফেটে পড়ল। বড়
স্ক্রিনে দেখা গেল চশমা পরা, লাজুক হাসিতে ভরা রাইসার মুখ।
তার দু-পাশে বসা ইমামা আর সালারও হামিনের কথায় হেসে
উঠল। হামিন যা বলেছে, তা একেবারেই ঠিক বলেছে। গত
কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা দুজন এই বিশেষ শব্দটিকে এতবার

ব্যবহার করেছে যে, তা যেন তাদের নিত্যদিনের ভাষার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাইসা আর হামিন বিশ্বাস করত, তারা কোনো অজানা কল্পলোক থেকে এসেছে, একটা দুনিয়া যা শুধু তাদের চোখেই ধরা দিত, অন্য কারও কাছে নয়। তারা মনে করত, তারা- 'আলাদা, অনন্য'। এটি ছিল তাদের নিজেদের দেওয়া একটি নাম। তাদের সাম্প্রতিক কল্পনার জগতের সম্বোধন। সেই নাম ভুলে যাওয়া তো হামিন সিকান্দারের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আজ সেই কল্পনাই তো তার সামনে বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাইসা গর্বভরে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গীর দিকে, যে নাকি তার মতোই সেই weissnichtwo থেকে এসেছে। এই শব্দটি সে চোখ, কান, নাক বন্ধ করেও নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে পারে-ঠিক যেমনভাবে মঞ্চে প্রোনাউন্সার একটু আগেই উচ্চারণ করে শুনিয়েছে।

গত দুই বছর ধরে ইনায়া আর জিবরিল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয়েছে। আজ তাদের পথ ধরে হামিনও সেই কৃতিত্ব অর্জন করল।

স্পেলিং বি-এর সূচনা হয়েছিল ইমামার বাড়িতে, রাইসাকে নিয়ে। নতুন শব্দ শেখা, তাদের সঠিক উচ্চারণ অনুশীলন করা, অর্থ বোঝা আর প্রতিদিনের কথোপকথনে ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই ছোট্ট খেলা ধীরে ধীরে তাদের রুটিনে পরিণত হয়ে যায়। আর সেই রুটিনই সমৃদ্ধ করেছে তাদের শব্দভান্ডার, গড়েছে আলাদা যোগ্যতা। স্কুলে ভোকাবুলারির জন্যই ছিল তারা খ্যাত। এটিই ছিল তাদের আলাদা পরিচয়। সেখান থেকেই জন্ম নেয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা।

হামিন তার প্রস্তুতি ও প্র্যাকটিসের গল্প বলার সময় ক্যামেরায় বারবার হলভরতি বড় স্ক্রিনে ইমামা আর সালারকে দেখাচ্ছে। কারণ, তারা হলো মঞ্চে দাঁড়ানো আজকের বিজয়ীর বাবা-মা। আশপাশের অন্য প্রতিযোগীর বাবা-মায়েরা মাঝে মাঝে তাদের

কাছে এসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। তারা শান্তভাবে, মৃদু হেসে সেই অভিনন্দন গ্রহণ করছে, যেন সবটাই স্বাভাবিক, প্রতিদিনকার ব্যাপার, এটা আর তেমন বিশেষ কিছু নয়। সত্যিই, তাদের কাছে বিষয়টা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাদের প্রতিভাবান সন্তানরা জীবনে একের পর এক এমন গর্বের মুহূর্ত এনে দিয়েছে, যেগুলো সারা জীবন স্মৃতিতে রাখার মতো।

: 'আমি আগামী বছর অংশ নেব।' পাশে বসা রাইসা ফিসফিসিয়ে ইমামাকে জানাল, গলায় ঝোলানো হামিনের কার্ডটা দোলাতে দোলাতে। ইমামা তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, যেন স্নেহে আশ্বাস দিল।

এদিকে মঞ্চে হামিন ট্রফি হাতে নিচ্ছে। হাততালি, সিটি, ফ্ল্যাশ লাইট আর সংগীতের ভিড়ে উপস্থিত সবাই আবার দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেই মুহূর্তে ওখান থেকে বহু মাইল দূরে, ওয়াশিংটনের এক শহরতলির বাড়িতে বসে জিবরিল আর ইনায়াও টিভি লাইভ কভারেজে একই আনন্দ

ভাগ করে নিচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেই ইনায়া তার পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করে টিভির সামনে বসেছে।

পরীক্ষার জন্য সে ইমামা আর সালাবের সঙ্গে যেতে পারেনি। জিবরিলও তাই বাড়িতেই ছিল। টেস্টের প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে বারবার টিভি লাউঞ্জে এসে হামিনকে দেওয়া শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। তারা দুজনও চুপচাপ শব্দগুলোর বানান মিলিয়ে নিত, তারপর দম বন্ধ করে হামিনের বানান শোনার অপেক্ষা করত। আর হামিন যখন সঠিক অক্ষরে বানান শেষ করত, দুজনের বুক থেকে একসঙ্গে যেন স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসত। তারপর ইনায়া আবার পড়ার ঘরে ফিরে যেত।

তৃতীয়বারের মতো ট্রফিটা এবারও তাদের বাড়িতে আসতে চলেছে, তাই আনন্দ ছিল আরও গভীর। তাদের চারজনের মধ্যে সবসময়ই প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্তু হিংসা বা ঈর্ষা কখনো ছিল না। ঠিক তখনই টিভি দেখার মাঝে ডোরবেলের আওয়াজ শোনা গেল। জিবরিল তখন দুধ দিয়ে মিল্কশেক বানাচ্ছিল। তাই



ইনায়াই দরজার কাছে গেল। ছিদ্র দিয়ে বাইরে উঁকি দিতেই দেখতে পেল, এগারো বছরের এরিক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত সে থমকে রইল। এরিক তাদের সহপাঠী, প্রতিবেশী আবার তাদের পরিবারের বন্ধুও।

সাধারণত জিবরিল না থাকলে ইনায়া দরজা খোলে না। মা-বাবার নির্দেশ, একা বাড়িতে থাকলে কখনো দরজা খোলা যাবে না। কিন্তু আজ ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। এরিক দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে জানে, ভেতর থেকে কেউ তাকে দেখছে।

: 'বাইরে কে?' হঠাৎ জিবরিল এসে তার পেছনে দাঁড়াল। ইনায়া চমকে ঘুরে

তাকাল। তারপর বলল, এরিক। দুই ভাই-বোন চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হুটহাট কাউকে ঘরে ডাকার অভ্যাস তাদের নেই, না বন্ধু, না পরিচিত কেউ। কিন্তু এরিকের ব্যাপার

আলাদা। ওর জন্য সবার ভেতরে একধরনের মমতা কাজ করে।
: 'আসুক না, হয়তো টেস্ট নিয়ে কিছু জানতে এসেছে।' বলে
জিবরিল দরজা

খুলে দিল। দুই হাত জিন্সের পকেটে ঢুকিয়ে এরিক ভেতরে
ঢুকল। দরজা খোলার পর তার স্বভাবসিদ্ধ আমেরিকান টানটান
উচ্চারণে কষ্ট করে বলল, আসসালামু আলাইকুম। তারা কথাটা
বুঝল বেশ কষ্ট করে।

: 'কংগ্র্যাচুলেশন।' দাঁড়িয়ে থেকেই বলল এরিক, তার চোখ
জিবরিলের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া ইনায়ার দিকে।

: 'থ্যাঙ্ক ইউ।' জিবরিলও সংক্ষেপে জবাব দিল। এরপর সরে
দাঁড়াতেই এরিক একই ভঙ্গিতে পকেটে হাত গুঁজেই ভেতরে
ঢুকল।

: 'টেষ্টের পড়া শেষ করেছ?' ইনায়া জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: 'না।' বলতে বলতে সে লিভিং রুমে ঢুকে পড়ল। টিভিতে এখনো সেই একই প্রোগ্রামের লাইভ কভারেজ চলছে।

: কেন?

: 'এমনিই।' ইনায়ার দিকে না তাকিয়েই স্ক্রিনে চোখ রেখে উত্তর দিল সে।

: 'বসো।' ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইনায়া বলল। এদিকে জিবরিল রান্নাঘরের কোণে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল।

: 'এরিক, তোমার মা জানেন তুমি এখানে?' ফ্রিজ থেকে দুধ বের করতে গিয়েই হঠাৎ প্রশ্ন ছুড়ল জিবরিল।

: 'মনে হয়।' এরিক অবহেলা-ভরে বলল।

: 'মানে জানেন না?' দুধের বোতল কাউন্টারে রাখতে রাখতে জিবরিল হঠাৎ থেমে গেল। গত সপ্তাহের কথা তার মনে পড়ে গেল। সেদিন এরিকের মা খুঁজতে খুঁজতে তাদের বাসায় এসে হাজির হয়েছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, এরিক বিনা অনুমতিতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সেদিনও অনেক খুঁজে অবশেষে এখানে এসেই ছেলেকে পেয়েছিলেন।

: 'মা বাসায় নেই।' কড়া প্রশ্নের আভাস টের পেয়ে আগেই বলে ফেলল এরিক।

: 'কোথায় গেছেন?' জিবরিল সাধারণত এভাবে খুঁটিনাটি বিষয়ে কখনো খোঁজখবর নেয় না। কিন্তু সবাই জানে, এরিক মাঝে মাঝে অবলীলায় মিথ্যে বলে দেয়। অথচ এই স্বভাবটা ঠিক এক বছর আগেও তার মধ্যে ছিল না, যখন তার বাবা জীবিত ছিল।

: 'এক বন্ধুর কাছে গেছেন। সাবিল আর মার্কও সাথে গেছে।'
শান্ত ভঙ্গিতেই জানাল এরিক। টিভির পর্দায় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে
ক্রেডিট চলছে।

: 'তুমি যাওনি সঙ্গে?' ইনায়া জিজ্ঞেস করল।

: 'আমার তো টেস্টের প্রস্তুতি নিতে হবে।' সে দ্রুত জবাব দিল।
ইনায়া তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এদিকে সে রিমোট
হাতে নিয়ে এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখছিল, যেন জীবনে প্রথমবার
কোনো রিমোট কন্ট্রোল পেয়েছে। ইনায়ার দিকে সরাসরি
তাকাচ্ছে না, কিন্তু সে জানে, ইনায়া ওর জবাব শুনে তাকিয়ে
আছে।

: 'চলো তবে, টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করি।' ইনায়া বলল। তার
ভেতরে সত্যিই একধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করছে। এরিক

এখনো কিছুই পড়েনি। এর মানে, আগের মতো এবারও টেস্টে
থারাপ করবে।

এরিক কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গেল। পড়াশোনার চিন্তা তার কাছে
কোনো সমস্যা না, তার জীবনের ঝামেলাগুলো একদমই
অন্যরকম।

: 'হামিনরা কবে ফিরবে?' এরিক হঠাৎ প্রশঙ্গ ঘোরাল।

: 'খুব শিগগিরই ফিরবে।' ইনায়া শান্তভাবে বলল। সে বুঝে
ফেলেছে, এরিক এখন এভাবে ফালতু প্রশ্ন করে, এখানে বসে
থাকার অজুহাত খুঁজবে। যতক্ষণ না সে নিজেই বিরক্ত হয়ে
উঠে যাবে।

ইনায়ার মনে তার প্রতি একধরনের মায়া জাগল। গত এক বছর
ধরে এরিককে দেখলেই এমন অনুভূতি হয় তার। আগে এরিক

একেবারেই অন্যরকম ছিল। ক্লাসের সেরা ছাত্রদের মধ্যে ছিল।
কিন্তু এখন? একেবারে গড়ের নিচে নেমে গেছে।

: 'তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে না?' ইনায়া আবার জিজ্ঞেস
করল। তারপর তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এরিক কিছুক্ষণ
আগে জিবরিলের দেওয়া মিল্কশেকের প্রস্তাবও ফিরিয়ে
দিয়েছে।

: 'যেতে পারতাম, কিন্তু যাইনি। আমি কি একটা গেম খেলতে
পারি?' এক নিশ্বাসে বলল এরিক। ইনায়া দ্বিধায় পড়ে গেল।

: 'না।' ইনায়ার হয়ে এবার জিবরিল উত্তর দিল। সে এগিয়ে এসে
এরিকের হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে নিল। 'আমাদের বাড়িতে
এই সময়ে গেম খেলা হয় না। অনেক রাত হয়ে গেছে।' বলতে
বলতে জিবরিল পাশের সোফায় বসল। তাকে নরম গলায়
বুঝিয়ে দিল, তাদের বাড়ির কিছু নিয়ম আছে। প্রতিদিন গেম
খেলার অনুমতি নেই, রাতেও নয়। সাধারণত তারা এরই মধ্যে

ডিনার সেরে নেয়। কিন্তু আজ হামিনের প্রতিযোগিতার কারণে সব দেরি হয়ে গেছে।

: 'কিন্তু আমি তো আউটসাইডার, আর অতিথিও। নিয়ম তো আমার জন্য না।' কিছুক্ষণ ভেবে এরিক বলল। কিন্তু ততক্ষণে জিবরিল টিভি চালিয়ে সিএনএন দেখতে বসে গেছে।

: 'না, তুমি বাইরের কেউ নও।' জিবরিল সোজাসুজি জবাব দিল। এরিক চুপ করে গেল। যেন ভেতর থেকে এমনই একটি উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ইনায়া উঠে দাঁড়াল।

: 'আমি ডিনারের টেবিলটা সাজিয়ে দেই। সবাই এখন চলে আসবো।' সে লাউঞ্জের কোণে রাখা ডাইনিং টেবিলে প্লেট সাজাতে শুরু করল। এরিক কিছুক্ষণ পরপর ইনায়া আর জিবরিলের দিকে তাকাতে থাকল। তারপর যেন তার মনে হলো, এখানে বসে থাকার কোনো মানে নেই। জিবরিল তখন সংবাদ বুলেটিনে ডুবে আছে, আর ইনায়া ব্যস্ত টেবিল

সাজাতে। তবু সেখান থেকে সে নড়ল না। কারণ, এই বাড়িটায় একটা প্রাণ আছে, শান্তি আছে, যা তার নিজের ঘরে নেই।

কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎ সে উঠে ইনায়ার পাশে চলে এলো। কিছু না বলেই টেবিল সাজাতে সাহায্য করতে লাগল। ছয় জনের পরিবারের বসার টেবিলে ইনায়া সাতটি প্লেট রাখল, আর এরিক সেটা খেয়াল করল। কথা না বলেই সে বুঝে গেল, আজকেও সে এখানেই খেয়ে যাবে। প্রায়ই সে এদের বাড়িতে খায়। পাকিস্তানি খাবারও তার ভালো লাগে। তবে তার চেয়েও বেশি যেটা ভালো লাগে, তা হলো তাদের সঙ্গ।

তার নিজের বাড়িতে মা ক্যারোলিন সপ্তাহান্তে রান্না করে ফ্রিজে রেখে দেয়। তারপর সারাটা সপ্তাহ সেই খাবার বারবার গরম করে খেতে হয়। আগে এমনটা ছিল না। এক বছরের মতো হলো এভাবে চলছে, যেদিন থেকে তার বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।



ক্যারোলিন একজন নামকরা, ব্যস্ত আইনজীবী। স্বামীকে হারিয়ে তিনটা সন্তানের একা দায়িত্ব নেওয়া আর পাশাপাশি নিজের ক্যারিয়ার সামলানো তার জন্য ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। চাকরি পালটানোর সুযোগ ছিল না, আর ঘরে বসে শুধু মা হয়ে থাকা তার স্বপ্নও ছিল না। হঠাৎ স্বামীর মৃত্যু অবশ্যই একটা আঘাত ছিল। এরিকের বাবা জেমস আর সে পনেরো বছর ধরে একসঙ্গে ছিল। আদর্শ দম্পতি বলা হতো তাদের। পনেরো বছরের সঙ্গ হারিয়ে একদিনে একা হয়ে যাওয়া যেমন বেদনাদায়ক, তেমনি ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তাও জটিল এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

তবে ক্যারোলিন পূর্বদেশীয় নারীদের মতো নয়, যারা শুধু সন্তানকে কেন্দ্র করে জীবন কাটিয়ে দেয়। তার নিজেরও সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। তাই জেমসের মৃত্যুর ছয় মাস পরই এক সহকর্মীর মধ্যে সে নতুন আশ্রয় খুঁজে নেয়। জীবনে আগের মতো না হলেও কিছুটা ভারসাম্য ফিরে আসে। তখন তার

যমজ দুই ছেলে সাবিল আর মার্কের বয়স প্রায় ছয়, আর এরিকের দশ। ছোটরা বাবা হারানোর শোক তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিলেও এরিক কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। সে বাবার সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে ছিল।

তাদের যে এলাকায় বাস, সেখানে পনেরোটা বাড়ির প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী। ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকজনও আছে সেখানে। ওদের পাশের বাড়িতেই থাকে সালার আর ইমামা পরিবার। ওদের বাগান আর এদের বাগান পাশাপাশি মিশে গেছে। এরিক জন্মানোর আগেই জেমস কিস্তিতে এই বাড়ি কিনেছিল, আর সালাররা প্রায় আড়াই বছর হলো এখানে এসেছে।

সালার আর জেমস আগে একই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। তাই তারা পুরোনো পরিচিত ছিল। দুই পরিবারের মেলামেশা আরও ঘনিষ্ঠ হলো, যখন এরিকের স্কুলে সালারের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করা হলো। ইনায়া আর এরিক একই ক্লাসে

পড়ত। সেখান থেকেই তাদের বন্ধুত্বের শুরু। যদি একে বন্ধুত্ব বলা যায়, তবেই।

ইনায়া অন্যদের থেকে একদম আলাদা। শান্ত, ভদ্র, নরম স্বভাবের মেয়ে। কথা বলে খুব ভেবেচিন্তে, মেপে মেপে। এরিক খুব বেশি কথা বলত না। তবে ছিল নির্ভার আর দুষ্টুমি-ভরা প্রাণবন্ত একটা ছেলে। মিশুক স্বভাবের সেই আমেরিকান বাচ্চাটি ইনায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল মূলত তার অস্বাভাবিক মেধার জন্য। কয়েক দিনেই নতুন ক্লাসে সে তার উপস্থিতি জানান দিয়ে ফেলেছিল। ক্লাসে সে ছিল কালো চুল আর কালো চোখের দুধে-আলতা গায়ের রঙের একমাত্র মেয়ে, আর তার লম্বা বাঁকানো চোখের পাপড়ি তাকে সহজেই আলাদা করে চিনিয়ে দিত। এরিকের কাছে সে ছিল খুব কিউট। তার অন্যতম কারণ, সে ক্লাসের অন্য মেয়েদের মতো সারাক্ষণ কথা বলে না, কারও সঙ্গে তর্কেও জড়ায় না।

প্রথমত বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল এরিকই। তারপর এক বছর যাবৎ সেই প্রচেষ্টাই চলছিল। সে ইনায়ার বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। তবে সবকিছু ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতার মতো। তার পরিবারও অন্য প্রতিবেশীদের মতোই ইনায়াকে ভদ্রভাবে গ্রহণ করত, তবে এতটুকুই। কখনোই তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, যাকে অবলীলায় 'গার্লফ্রেন্ড' বলা যায়।

'তারা মুসলিম পরিবার, আর মুসলিমরা সাধারণত নিজেদের গণ্ডির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে।' এরিক একাধিকবার তার বাবাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তার বাবা তাকে এই কথা বলে বুঝিয়ে দিতেন।

দেড় বছর পর হঠাৎ করেই সবকিছু বদলে গেল। বাবার মৃত্যুর পর আগ বাড়িয়ে ইনায়াই এগিয়ে এলো কথা বলতে। প্রায় দুই সপ্তাহ পর যখন এরিক আবার স্কুলে ফিরল, কখনো সে প্রতিটি ক্লাসে শূন্য দৃষ্টিতে বসে থাকত। কোনো কাজে মন দিত না, তখন সহপাঠীরা একে একে এসে তাকে সান্ত্বনা দিলেও, অল্প

সময়ের মধ্যেই তারা সবাই আবার নিজেদের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু এরিক সেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারত না। ঠিক সেই সময় ইনায়া তার পাশে দাঁড়াল, ক্লাসওয়ার্কে সাহায্য করতে শুরু করল। এরিক টের পেত, এটা নিছক সহানুভূতি, যা ইনায়া আর তার পরিবার তার প্রতি দেখাত। অথচ সেই সহানুভূতিই অদ্ভুত এক টানে তাকে তাদের কাছে বেঁধে ফেলেছে।

এরিক একমাত্র সালারের পরিবারেই শুধু যাতায়াত করে না। বরং আশেপাশের যেসব বাড়িতে ওর বয়সি ছেলে-মেয়ে আছে, সেসব বাড়িতেও সে ঘুরে বেড়ায়। ওরা যে এলাকায় থাকে, সেখানে নানা ধর্ম আর জাতির মানুষ বাস করে, কয়েকজন ভারতীয়, কিছু চীনা, এক-আধজন আরব, একজন ইহুদি, আর তারপর সালার ও ইমামার বাড়ি। অথচ এত ঘরের ভিড়ে এই শেষ বাড়িটাই তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

তার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় নিজের ঘরটা তার কাছে যেমন মনে হতো, এই ঘরটাকে এখন ঠিক তেমন মনে হয়। তার মা-বাবা দুজনই ভীষণ ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে বাবা, যিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র সন্তান। আর ক্যারোলিন এখন যতই চেষ্টা করে, এরিককে সেই আগের মতো যত্ন দিতে পারে না। সাবিল আর মার্ক অনেক ছোট, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মনোযোগ বেশি ওদের দিকেই। এতে দোষের কিছু নেই হয়তো, কিন্তু এরিকের মনে হয়, সে যেন নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া একাকী কোনো গ্রহ একা ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার এই নতুন পরিবারের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে। আর চুপিচুপি তাদের অংশ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

অনুষ্ঠান শেষে হামিন আর রাইসারা যখন বাড়িতে ফিরল, তখন ভীষণ উচ্ছ্বাসের সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হলো। সেই অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে এরিকও ছিল। কিছুক্ষণ হামিনের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে সে যেন ভুলেই গিয়েছে, কোথায় আছে সে।



ডাইনিং টেবিলে সবাই খাবার নিয়ে বসা, প্রাণখোলা গল্প হচ্ছে, মুহূর্তটা একেবারে পরিবারের মতো। এমনকি দরজার ঘন্টা বাজলেও কারও মাথায় আসেনি, হয়তো ক্যারোলিন হতে পারে। কিন্তু এসেছে সে-ই। ঢুকেই কোনো সৌজন্য বিনিময় না করে সরাসরি এরিকের খোঁজ করল। যখন জানল এরিক ভেতরে আছে, তখন আর দেরি না করে সোজা লিভিং রুমে গিয়ে বকাঝকা শুরু করে দিল।

আসলে ক্যারোলিন সাবিল আর মার্ককে রেখে এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনারে গিয়েছিল। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পর এরিক সেখান থেকে চুপিসারে বেরিয়ে আসে। আর ফেরার পর যখন ক্যারোলিন দেখল, দুই শিশু ঘরে কাঁদছে আর এরিক নেই, তখনই রাগে ফেটে পড়ল। এরিক কোনো প্রতিবাদ না করে চুপচাপ মায়ের বকুনি শুনল। লজ্জা লাগছে কেবল এজন্য যে, সাবিল আর মার্ক সম্পর্কে বলা মিথ্যাটা সবার সামনে ফাঁস হয়ে গেল দেখে।

ক্যারোলিন মূলত কঠোর মনের মানুষ নয়। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে তার আর এরিকের মধ্যে অদ্ভুত এক শীতলতা জমে উঠেছে। সে বুঝত, এরিক বাবার মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙে পড়েছে। সেই সঙ্গে ক্যারোলিন তার এই কান্নাকাটি আর ভঙ্গুর মনোভাবের প্রতি বিরক্তও হয়ে উঠেছে।

এরিক এখন এগারো বছরের ছেলে। ক্যারোলিন চায় সে অন্তত কিছুটা দায়িত্বশীল হোক। যদি পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে না-ও পারে, তবে অন্তত নতুন কোনো ঝামেলা যেন তৈরি না করে। প্রথমদিকে এরিকের তার মায়ের প্রতি সহানুভূতি ছিল, কিন্তু সেটা শেষ হয়ে যায়-যেদিন সে তার মায়ের নতুন সঙ্গীকে দেখল। অন্য আরেকজন তার বাবার জায়গা দখল করা, এটা তাকে বাবার মৃত্যুর চেয়েও বেশি আঘাত করেছে।

এরিক আর ক্যারোলিনের মধ্যে জমা শীতলতা আর টানাপোড়েনের মূল কারণ ছিল এটিই, অথচ ক্যারোলিন তা বুঝতেই পারেনি।

এরিক চলে যাওয়ার পরও ঘরটা বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। যেন কেউই বুঝে উঠতে পারছে না, এই পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবো। এরিকের জন্য সবার ভেতরেই একধরনের মায়া কাজ করছে, অথচ একই সঙ্গে এ-ও ভেবে পাচ্ছে না. ওকে কীভাবে তাদের বাড়ি ছাড়ানো যায়। বিশেষত এখানে যাতায়াতে যখন ক্যারোলিনেরই কোনো আপত্তি নেই। উলটো সে নিজেও অনেক সময় জরুরি প্রয়োজনে সাবিল আর মার্ককে তাদের এখানে রেখে যায়।

: 'এত ভালো একটা ছেলে, আগে কখনো ওকে মিথ্যে বলতে দেখিনি। হঠাৎ কী হলো ওর?' টেবিল থেকে বাসন ওঠাতে ওঠাতে ইমামা কথাটা বলল।

: 'জেমসের মৃত্যু ওকে এমন করেছে' চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে সালার উত্তর দিল। বাসনগুলো সিন্ধে রাখার সময় ইমামার ভেতরটা যেন হঠাৎ বরফের মতো জমে গেল। দুদিন পর সালারের চেকআপ। আগে প্রতি তিন মাস পরপর পরীক্ষা হতো, এখন ছয় মাস পরপর। মস্তিষ্কের টিউমারটা কী অবস্থায় আছে-বাড়ছে, কমছে, নাকি নতুন আরেকটা তৈরি হয়েছে, সেটাই জানার জন্য। টিউমার আশেপাশের সেলগুলোতেও কোনো ক্ষতি করছে কি না, সেই ভয়েই পরীক্ষা। CTS, TMT, BPT, LP, CBC, MRI-কত নাম, কত রিপোর্ট! প্রতিটি 'ক্লিয়ার' রিপোর্টে ইমামার বুক হালকা হয়ে আসে, নিশ্বাসে ফিরে আসে প্রাণ। আর সামান্য কোনো অস্বাভাবিকতা দেখলেই ভেঙে পড়ে মন। জীবনটা যেন তিন মাসের গোলকধাঁধায় আটকে গেছে। প্রতি তিন মাস পর নতুন পরীক্ষা, আর তারপর তিন মাস বেঁচে থাকার নতুন অনুমতি।

চেকআপের তারিখ যত কাছে আসে, ইমামার অস্থিরতা ততই বেড়ে ওঠে। এভাবেই চলছে টানা তিন বছর। তিন বছর ধরে

সব রিপোর্ট ভালো আসছে। অপারেশন সফল হয়েছিল, জ্ঞান ফেরার পর তার মানসিক সক্ষমতাও আগের মতোই আছে। কিছু সামান্য পরিবর্তন এসেছে বটে, কিন্তু তা ভয়ের কিছু নয়। তবু ইমামা অনুভব করে, তাদের জীবন আর আগের জায়গায় নেই, সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে। আর এখন সালারের মুখে যখন জেমসের মৃত্যুর কথা শুনল-আর সেই মৃত্যু কীভাবে তার ছেলেকে প্রভাবিত করেছে, তখন সে আবার ভেতর থেকে জমে গেল। কয়েক ঘণ্টা আগের আয়োজন যেন মুহূর্তেই মন থেকে মুছে গেল। সামনে যে পরীক্ষাটা দুদিন পর হওয়ার কথা, যদি তার রিপোর্ট ঠিক থাকে, তাহলে আর তিন মাস নয়, ছয় মাস পর হবে পরবর্তী পরীক্ষা। সালারের নয়, যেন তার নিজের জীবনকালই তিন থেকে ছয় মাস বাড়তে চলেছে।

রান্নাঘরে সিন্ধের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামা তাকিয়ে আছে লাউঞ্জে বসা সালারের দিকে। চারপাশে তার ছেলে-মেয়েরা বাবার সঙ্গে আড্ডায় মগ্ন, খোশগল্পে মজে আছে।

সে মনে মনে ভাবল, তারা কত ভাগ্যবান যে, সালার এখনো তাদের জীবনে আছে, জীবন্ত, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, সুস্থ-স্বাভাবিক। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই, সে কখনো এমন এক ভয়ংকর রোগের সঙ্গে লড়াই করেছে। শুধু অপারেশনের পর কিছুদিন, সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টাতে অসুস্থতার চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। তখন মাথার চুল মুক্তিযে দিতে হয়েছিল, চিকিৎসার কষ্ট আর নানা ওষুধের প্রভাবে মুখে ক্লান্তির ছাপ নেমে এসেছিল। হঠাৎ করেই তার মুখে ঝুলে গিয়েছিল বয়সের রেখা। অল্প সময়েই ওজন কমে গিয়েছিল অনেকটা। প্রায় ছয়-সাত মাস একটার পর একটা ইনফেকশনে ভুগতে হয়েছে তাকে।

অপারেশনের পর ইমামা চেয়েছিল পাকিস্তানে ফিরে আসতে, কিন্তু পারেনি। সালারকে একা ছেড়ে সে ফিরতে পারেনি। অথচ সালার কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্রামে বসে থাকার মানুষ নয়। এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার SIF-এর প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল সে। ইমামা শুধু নীরবে তাকিয়ে দেখেছে।

দেখাশোনা, সেবা, যত্ন-এসব শব্দ যেন সালার সিকান্দারের কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। সারা জীবনের মতো এবারও চেষ্টা করেছে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে। কিন্তু ইমামা কখনোই তাকে একা ফেলে যেতে প্রস্তুত হয়নি। প্রায় ছয়-সাত মাস পর অবশেষে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। নতুন ঢুল গজাল, শরীরে আগের মতো শক্তি ফিরল। মুখের ঝুলে যাওয়া রেখা মিলিয়ে গেল, চোখের নিচের কালি আর পাণ্ডুর চেহারাও উধাও হলো। সালার আবার আগের মতো হয়ে উঠল, যেমন ছিল অসুখ ধরা পড়ার আগে।

ডাক্তাররা পর্যন্ত অবাক হয়ে বললেন, তার আরোগ্য সত্যিই অবিশ্বাস্য এবং ঈশণীয়। তবু ইমামা হাশিম নিশ্চিত হতে পারছিল না। বিয়ের প্রথম দশ বছরে সালারের সঙ্গে সে পৃথিবীর প্রায় সব সুখ-সুবিধা ভোগ করেছে। বিলাসবহুল গাড়ি থেকে শুরু করে প্রাইভেট প্লেন ভ্রমণ, সোনা-হীরের অলংকার-সব পেয়েছে। অর্ধেক পৃথিবী তারা একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। এমন কিছু নেই, যা ইমামা চেয়েছে আর সালার তাকে তা দেয়নি।



সে চাইলে এই দশ বছরের জীবন নিয়েই রূপকথার মতো একটি গল্প লিখে ফেলতে পারত।

কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে ইমামার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি, সালারের জীবন, তার অস্তিত্ব। সে পাশে থাকলেই যেন পৃথিবীর আর কিছু না থাকলেও সে বেঁচে থাকতে পারবে, হাসতে পারবে, জীবন্ত থাকতে পারবে। বিলাসবহুল পোশাক, গয়না, আরাম-আয়েশ, কিছু না থাকলেও শুধু যদি সালার পাশে থাকে, তবে জীবন তার কাছে পূর্ণ মনে হবে। আর এখন আবার তার মেডিকেল চেকআপের তারিখ ঘনিয়ে এসেছে। আরেকবার ইমামার রাতের ঘুম উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে।

লাউঞ্জে হামিনের কোনো কথায় হাস্যরত সালারের মুখের দিকে তাকিয়ে ইমামার হঠাৎ সেই দৃশ্য মনে পড়ল, অপারেশনের পর যখন প্রথমবার তাকে দেখেছিল। আট ঘণ্টার দীর্ঘ অপারেশনের পর তাকে দেখা, পরের সকালে আবারও

হাসপাতালে গিয়ে দেখা করা। সবকিছু মনে রাখতে না চাইলেও ভুলতে পারেনি। সেই সময়ও সালারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার হাত ধরে বসেছিল সে, যখন সালারের ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে। তার ফোলা চোখের পাতাগুলো কেঁপে উঠছিল, চোখ খোলার চেষ্টা করছিল সে। 'সালার! সালার!' ইমামা অজান্তেই ডাকতে শুরু করেছিল, একবার, দুবার, বারবার। অবশেষ সে চোখ খুলেছিল, লালচে, ভারী চোখ। তন্দ্রার সাথে লড়াই করতে থাকা ক্লান্ত মুখ। ইমামা কাঁপা হাতে তার মুখ ছুঁয়ে আবারও নাম ধরে ডেকেছিল। ততক্ষণে সালার তার দিকে তাকিয়েছিল। ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে দেখেছিল। কিন্তু চোখে কোনো পরিচয়ের ছাপ নেই, কোনো অনুভূতি নেই। যেন সে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষকে দেখেছিল।

ইমামার বুকটা কেঁপে ওঠে তখন। সত্যিই কি সালার আর তাকে চিনতে পারছে না? ডাক্তাররা অপারেশনের আগে সতর্ক করে দিয়েছিল, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যেতে পারে, এটা ঝুঁকির মধ্যে আছে। তবু এমনটা হবে, সেটা কল্পনাও করতে পারেনি সে।



স্তব্ধ, অবশ্য হয়ে শুধু তাকিয়ে ছিল সেই চোখগুলোর দিকে, যেখানে সে নিজেকে এক অচেনা রূপে দেখছে।

তখন হঠাৎ সেই চোখে আলো ফুটতে শুরু করে। যেন তার প্রতিচ্ছবি ধীরে ধীরে ভেসে উঠল সেখানে। পলক ঝাপটাতে শুরু করল সালার। পরিচিতির এক উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। বিছানায় তার হাতের নিচে সালারের হাত নড়ল। সে নাম উচ্চারণ করতে পারছিল না তখনো, কিন্তু হাতের ছোঁয়ায় চিনে নিল তাকে।

তিন বছর কেটে গেলেও ইমামা সেই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিখুঁতভাবে গুনে বলতে পারবে। যেন মস্তিষ্কের ভেতর অমোচনীয়ভাবে খোদাই হয়ে আছে সব।

সালারের ঠোঁট থেকে যে প্রথম শব্দ বের হয়েছিল তা তার নাম নয়, তা ছিল 'আলহামদুলিল্লাহ'। আর ইমামা সেদিন প্রথমবারের মতো গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিল এই শব্দের আসল মানে।

এরপরের বাক্যে সে ইমামার নাম নিল। আর ইমামার মনে হলো, জীবনে এই প্রথমবার তার নিজের নামকে এত সুন্দর, এত প্রিয় শোনাল।

তারপর সে পানি চাইল। ইমামার কাছে মনে হলো, দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জিনিস আসলে পানিই তো। তারপর সে কালিমা পড়ল। সাধারণত মৃত্যুশয্যায় মানুষ কালিমা পড়ে, কিন্তু নতুন জীবনের শুরুতে কেউ কালিমা পড়ছে, এ দৃশ্য ইমামা প্রথমবার দেখল।

এই পুরো সময় সালার ইমামার হাত এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়েনি। সেই স্পর্শ শুধু স্পর্শ নয়, যেন স্বর্গের ছোঁয়া, এক টুকরো জান্নাত।

ছেলেমেয়েদের সাথে গল্প করতে করতে, সালার হঠাৎই লাউঞ্জ থেকে তাকে ডেকে উঠল, 'তুমিও এখানে এসো!' ইমামা তখনো রান্নাঘরের সিন্কে'র পাশে দাঁড়িয়ে অতীত

ভাবনায় ডুবে আছে। একটু দূরে থাকার কারণে নিজেকে সামলে নিতে পারল সে। চোখের পানিও আড়াল করে ফেলল।

: 'হ্যাঁ, আমি আসছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বাকি থালাবাসন সিন্ধে রাখল। 'বলো সমস্যা নেই, আমি এখান থেকেও তোমাদের সব কথা শুনছিলাম।'

: 'মাম্মি! আগামী বছর রাইসা স্পেলিং বি-তে যাবো।' লিভিং রুমে বসেই হামিন এই ঘোষণা দিল। যদিও এই সংবাদ রাইসা আরও আগেই ইমামাকে জানিয়েছে।

টেপ বন্ধ করতে করতে ইমামা পেছন ফিরে তাকাল। নিজেকে সামলে নিলেও হামিনের কথাটা তার পুরোপুরি বোধগম্য হলো না। 'রাইসা কী করবে?' সে শুধু রাইসার নামটাই শুনেছিল, বাকিটা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ভাবনার আড়ালে।

: 'মান্নি! আমিও এই ট্রফি জিতে আনব।' এবার রাইসা সরাসরি ইমামাকে তার উদ্দেশ্য জানাল।

০২

আয়েশা আবেদিন জন্মেছিল তার বাবার মৃত্যুর সাত মাস পর।
তিন বোনের মধ্যে সে সবচেয়ে ছোট। বোনদের সঙ্গে তার
বয়সের ব্যবধানও খুব বেশি না। তার বাবা-মা দুজনই ছিলেন
ডাক্তার। শুধু তা-ই নয়, তাদের পরিবারও একটি নামকরা
ডাক্তার পরিবার।

আয়েশার মা, নওরীন এলাহি। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর দুই
কন্যা আর এই সদ্যোজাত সন্তানকে একা সামলাতে
পারছিলেন না। তাই তিনি আয়েশাকে কিছুদিনের জন্য
পাকিস্তানে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পাঁচ বছর আয়েশা
সেখানেই থাকে। নওরীন চেয়েছিলেন এক বা দেড় বছর পর
মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু নানা-নানির সঙ্গে আয়েশার

গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠায়, ইচ্ছে সত্ত্বেও তিনি আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

তাছাড়া আমেরিকায় তিনি একজন অর্থোপেডিক্স সার্জন হিসেবে খুব ব্যস্ত জীবন পার করছিলেন। তার ওপর স্বামীহীন একাকী দুই মেয়ে সামলে, আয়েশাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবলেও তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে গুলিয়ে যেতেন। তবু পাঁচ বছর পর অবশেষে তাকে তিনি আমেরিকায় নিয়ে এলেন। কিন্তু আয়েশার মন সেখানে বসল না। সে তার দুই বড় বোনকে চিনত না, তাদের সঙ্গে তার কোনো সখ্য ছিল না। তিনি নিজে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতেন, এদিকে আয়েশাকে সময় দেওয়ার মতো আমেরিকায় আর কেউ ছিলও না। কোনোমতে সে দুই বছর ওখানে কাটাল। কিন্তু সাত বছর বয়সে আয়েশার প্রচণ্ড জেদের কারণে তাকে আবারও পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হলো।

নওরীন অবশ্য এবার মেয়ের জীবনযাপন নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন। কারণ, তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য, এমনকি তাদের নিজেদের পরিবারের প্রায় অর্ধেক সদস্যই আমেরিকায় বাস করত। নওরীন চাইতেন আয়েশাও স্থায়ীভাবে সেখানেই থাকুক। কিন্তু তার বাবা-মা কিছুতেই পাকিস্তান ছেড়ে আমেরিকায় এসে থাকতে রাজি না।

সাত বছর বয়সে আয়েশাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলেও, প্রতি বছর অন্তত দুবার তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসতেন। যাতে করে আয়েশা তার অপর দুই বোন নরিমান ও রাইমার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তার এই চেষ্টা সফল হয়েছিল। ধীরে ধীরে তিন বোন একে অপরের কাছাকাছি আসতে শুরু করে। আর আয়েশার কাছেও আমেরিকা চেনা হতে শুরু করে।

দশ বছর বয়সে আয়েশা যখন আবার আমেরিকায় এলো, তখন আর তার আগের মতো সমস্যা হয়নি। কিন্তু নতুন একটি সমস্যা দেখা দেয়। স্কুলে গিয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। পাকিস্তানেও সে

কো-এডুকেশনে পড়ত। কিন্তু পাকিস্তান আর এখানকার পরিবেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক। স্কুলের ব্যাপারে নওরীনের কিছু করার ছিল না। নওরীনের বড় দুই মেয়েকে অবশ্য এই সমস্যায় পড়তে হয়নি। তারা আয়েশার মতো ক্লাসের ছোটখাটো বিষয়ে বিচলিত হতো না। স্কুল আয়েশার মোটেই ভালো লাগত না। নওরীনের কাছে অবশ্য একটা পথ খোলা ছিল-তাকে কোনো ইসলামিক স্কুলে পাঠানো। কিন্তু তিনি সেই পথ ধরতে চাননি। তিনি মনে করতেন, এত অল্প বয়সে মেয়েকে এত চাপ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে ঢেলে দেওয়া ঠিক হবে না। তার বিশ্বাস ছিল, কিছুদিন এখানে থাকলে আয়েশা নিজেই স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। কিন্তু এক বছর পরও যখন আয়েশার অবস্থা ভালোর বদলে আরও বেশি খারাপ হতে লাগল, রেজাল্টের হাল বেহাল হতে শুরু করল, তখন নওরীনকে বাধ্য হয়ে আবারও তাকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হলো।

তিনি স্থির করলেন, আয়েশা 'ও লেভেল' শেষ করার পর আবার তাকে এখানে নিয়ে আসবেন। ততদিনে সে বুদ্ধমান হয়ে

উঠবে, এখানকার পরিবেশ সহজে বুঝতে পারবো। সে-মতে তেরো বছর বয়সে আয়েশা আবেদিনকে আবারও আমেরিকায় আসতে হলো। কিন্তু এবার তার সামনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল-আমেরিকাকে তার কাছে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে মনে হচ্ছিল না। সেখানকার ব্যক্তি স্বাধীনতা আবারও তাকে বিচলিত করে তুলল। পোশাক ও ভাষার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা তাকে যেন আতঙ্কিত করল। হিজাব পরেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করছিল না; এটি সে পাকিস্তানে থাকতে পরা শুরু করেছিল। এ নিয়ে নওরীনও ছিলেন সবিশেষ অখুশি। ফলে এটাই আয়েশার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

অবশেষে, নওরীন এবার হার মানলেন। তিনি স্বীকার করলেন, আমেরিকায় আয়েশার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সে পাকিস্তানেই থাকতে চায়। এবং সেখানে তার ছোট-বড় যত সমস্যাই থাকুক না কেন, তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট। আয়েশাকে তিনি আবারও পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশাও চাচ্ছিল, তার জীবনটা নানা-নানির দেখানো পথে একটি ইসলামিক

দেশেই কাটাতে। একজন কিশোরী হয়েও আমেরিকার উন্নতিতে মুগ্ধ না হয়ে, সেখানকার উন্নত জীবন ছেড়ে একটি শান্তিপূর্ণ-সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আবারও পাকিস্তানে ফিরে আসে সে। সেখানে তার মতো মানুষদের সঙ্গে জীবন কাটাতে থাকে।

আয়েশার নানা-নানি তাকে কনভেন্ট স্কুলে পড়ালেও, তারা তাকে বেপরোয়া হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ দেননি। বাড়িতে তাকে একজন উদারমনস্ক হুজুর রেখে কুরআন পড়ান। সেই হুজুর একটি নামকরা ইসলামিক প্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষক ছিলেন।

আয়েশার নানা-নানি নিজেরাও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। দীন-দুনিয়া উভয় সম্পর্কে ছিল গভীর জ্ঞান। অভিজাত শ্রেণি এবং সামাজিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের দিক থেকে তারা ছিলেন রক্ষণশীল। তাদের এই রক্ষণশীলতা আবার গোঁড়ামি ছিল না, তা ছিল যৌক্তিক দীনের রূপায়ণ। সেই পরিবেশে থেকেই আয়েশা আবেদিনের মাঝে দীনের গভীর

জ্ঞান ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সেখানে শুধু এটা হালাল, করো; ওটা হারাম, করো না; এই ভয়ই দেখানো হয়নি। বরং যুক্তির মাধ্যমে হালাল কেন হালাল এবং হারাম কেন হারাম, তাও বুঝিয়ে দেওয়া হতো। এজন্যই হয়তো দীনের প্রতি আয়েশার হৃদয়ে জাগে এক আবেগপূর্ণ টান ও মখমলি প্রেম।

সে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত, হিজাব করত এবং রোজা রাখত। এমনকি নানা-নানির সঙ্গে গিয়ে একবার হজও করে আসে। এর পাশাপাশি ফাইন আর্টসের প্রতিও ছিল তার প্রবল টান। পেইন্টিং করত, পরিপূর্ণ পোশাকে সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিত। যে কাজই তার ভালো লাগত, নানা-নানি অনুমতি দেওয়া মাত্রই তা সে করে ফেলত। আমেরিকান সমাজের অংশ হতে না পারলেও, নওরীন স্বীকার করতেন, তার মেয়ের উত্তম তরবিয়ত হয়েছে। এর পেছনে পরিবারের সবাই আয়েশার নানা-নানির কৃতিত্ব স্বীকার করে তাদের প্রশংসা করত।

নওরীনও তার বড় দুই মেয়েকে অত্যন্ত আদর-যত্ন ও মেহনত করে মানুষ করেছেন। তারা আমেরিকায় বড় হলেও, তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন তাদেরকে আপন সংস্কৃতি ও ধর্মের কাছাকাছি রাখতে। তবে তারা ছিল অনেক স্বাধীন। নওরীন কখনো তাদের এতে বাধা দেননি। কারণ, তার মেয়েরা কখনো তার বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করেনি, যার জন্য তাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়। শিক্ষাদীক্ষায় তারা ছিল যথেষ্ট ভালো। আমেরিকায় বেড়ে ওঠা অন্যান্য পাকিস্তানি মেয়ের তুলনায় যথেষ্ট অনুগত ও সংযত। এতটুকুতেই নওরীন ছিলেন সন্তুষ্ট। তবে বড় দুই মেয়ে ও আয়েশার তরবিরতের তফাত তখনই বুঝতে পারতেন, যখন সব মেয়ে একত্রিত হতো; পাকিস্তানে কিংবা আমেরিকায়।

নওরীনের মনে হতো, তিনি সত্যিই একটি মেয়ের মা। আয়েশা তার আগে-পিছে ঘুরত, কাছে এসে বসে থাকত, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনত, তার জন্য রান্না করত। আর এর বিনিময়ে নওরীনের কাছে কিছুই চাইত না সে। সে এটা স্বাভাবিক

অভ্যাসবশতই করত। আর এসবই শিখেছিল তার নানা-নানির কাছ থেকে। নওরীন এ নিয়ে তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ ছিলেন। আয়েশাকে তারা শুধু উত্তম তরবিয়তই দেননি, তাকে খুব ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাকাডেমিক শিক্ষাও দিচ্ছিলেন।

নওরীনের ইচ্ছা ছিল আয়েশা ডাক্তার হোক। কারণ, তার বড় দুই মেয়ের কারোরই মেডিকেলের কোনো আগ্রহ ছিল না, তারা ডাক্তার হতেও চায়নি। আয়েশারও মেডিকেলের খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। মায়ের ইচ্ছা না থাকলে সেও হয়তো মেডিকেলের বদলে আর্কিটেক্ট হতে চাইত। কিন্তু মায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে সে জীবনের অনেক লক্ষ্য পরিবর্তন করে ফেলেছিল। হয়তো সে এর মাধ্যমে, বারবার আমেরিকায় গিয়েও মানিয়ে নিতে না পারার দুঃখটুকু তার মায়ের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। নওরীনও তাকে মেডিকেলের পড়াতে চাচ্ছিলেন এই জন্য যে, আয়েশার কাছে ডাক্তারি ডিগ্রি থাকলে পরে যেকোনো সময় সে আমেরিকায় এসে সেটেল হতে

পারবে। কিন্তু নওরীন তার জন্য মেডিকেল পড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নই আয়েশার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন প্রমাণিত হয়েছিল!

০৩

পরদিন সকালে আবারও এরিক তাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চারা স্কুলে গিয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা হলো। ইমামা কেবল লন্ড্রি থেকে কাপড় বের করে কয়েক মিনিট আগেই ড্রায়ারে দিয়েছে। আজ তার গ্যারেজ পরিষ্কার করার কথা। কলিং বেলের শব্দে সেটা ভাবতে ভাবতেই দরজা খুলতে গেল। খুলে দেখল এরিক। ইমামা দরজা থেকে সরল না, পথ আগলে দাঁড়িয়ে রইল। এরিক বরাবরের মতো তার নিজস্ব ভঙ্গিতে সালাম করল। সেটি সে তাদের থেকেই শিখেছিল। ইমামা সালামের উত্তর দিল। তবে সে তখনো ওভাবেই পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইল, এরিকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে।

'আপনি কি ভেতরে আসতে বলবেন না?' এরিক অবশেষে জিজ্ঞেস করল।

: 'তুমি স্কুলে যাওনি?' ইমামা তার প্রশ্ন এড়িয়ে পালটা প্রশ্ন করল।

: 'নো... আসলে...' কয়েক মুহূর্ত এরিক কোনো উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল। তারপর সে ইমামার অনুমান করা উত্তরটিই দিল।

: কেন?

: আমার শরীর খারাপ।

'কী হয়েছে?' অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইমামা হঠাৎ নরম হয়ে গেল।

: 'আমার মনে হচ্ছে, আমার ক্যানসার হয়েছে।' এরিক ভীষণ শান্ত মনে কথাটি বলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইমামা হতভম্ব হয়ে গেল।

: 'ফর গড সেইক!' অবশেষে ইমামা নিজেকে সামলে বলল। 'মুখে যা আসে তা-ই বলে দাও! কোনটা বলা উচিত, আর কোনটা না, একটুও ভাব না। ক্যানসার কি বললেই হয়ে যায়!' ইমামা তাকে বকা দিতে লাগল। এরিক হতাশ হলো। ইমামার কাছে সে সব সময়ের মতো সহানুভূতির আশা করেছিল।

: 'আপনি কী করে জানেন যে, আমার ক্যানসার হয়নি?' অবশেষে সে ইমামাকে বলল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। তার চেহারায় ছেয়ে আছে রাজ্যের নিষ্পাপতা। চকলেট বাদামি রঙের উজ্জ্বল রেশমি চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। গাঢ় বাদামি চোখ দুটিতে এখন দুষ্টিমির বদলে ভর করেছে এক বিপন্ন বিষণ্ণতা। ইমামা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। উত্তর সে দিতে পারত, কিন্তু এগারো বছরের

এই শিশুটিকে কী উত্তর দেবে? যে কিনা বাবাহীন জীবনের পাঠই এখনো আয়ত্ত করতে পারছে না! ইমামা নীরবে পথ ছেড়ে, কোমরে অ্যাপ্রনের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে ভেতরে চলে গেল। ভেতরে এসে দরজা এরিকই বন্ধ করল। এমনভাবে ধরাম করে দরজা লাগাল, যেন এটা তার নিজের বাড়ি। এরপর সেও লাউঞ্জে চলে এলো।

ইমামা কিচেন কাউন্টারে বেকিংয়ের জিনিসপত্র ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটা-ওটা করছে। পাশেই সেলফোনে কুরআন তিলাওয়াত চলছে। ইমামা কাজ করছে আর তা শুনছে। এরিকও লাউঞ্জে এসে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল। মুহূর্তের জন্য সে বুঝতে পারল না, কী করবে। দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি বসবে? কথা বলবে? নাকি বলবে না? জিবরিলকে সে এর আগেও বহুবার তিলাওয়াত করতে শুনছে। জিবরিল যখনই তিলাওয়াত করত, সে চুপ হয়ে যেত। এমনকি জিবরিলের আশেপাশে অন্য কেউও জোরে কথা বলত না। তাই এই

মুহূর্তে তার কী করা উচিত, তা ঠিক বুঝতে পারল না। ইমামা বিষয়টি খেয়াল করে, তিলাওয়াত বন্ধ করে দিল।

: 'জিবরিলের গলা?' এরিক যেন নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল।

: হ্যাঁ।

: খুব মিষ্টি।

ইমামা এবার হাসল।

: 'আমিও শিখতে চাই এই কুরআন।' এরিক যেন শ্রুত তিলাওয়াতের জন্য সঠিক কোনো শব্দ খুঁজে পেল। ইমামা নীরব রইল।

: 'আমি কি শিখতে পারি?' ইমামাকে নীরব দেখে সে আবারও প্রশ্ন করল। আরও একটি অদ্ভুত প্রশ্ন, ইমামা ভাবল। মাঝে মাঝে

ওর প্রশ্নগুলো তাকে বিপাকে ফেলে দেয়। আগে ভাবত, তাকে বিপাকে ফেলার সব প্রশ্ন বুঝি হামিনের কাছেই আছে। কিন্তু না। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে এরিকও।

: 'আগ্রহ থাকলে সবকিছুই শেখা যায়।' উত্তরটিকে ইমামা তার মতো করেই পেশ করল।

: 'আপনি শেখাবেন?' এই প্রশ্নটি ছিল আরও জটিল।

: 'না, আমি তা পারব না।' সোজাসুজি বলল ইমামা। এরিক এর মানেটা বুঝল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা বুঝল না।

: 'তাহলে জিবরিল কি শেখাতে পারবে?' সে একটি বিকল্প পেশ করল।

: 'আসলে সে খুব ব্যস্ত। এই বছর তাকে হাইস্কুল শেষ করতে হবে।' ইমামা যেন একটি অজুহাত দেখাল।

: 'তাহলে আমি অপেক্ষা করব।' এরিকও বিকল্প দেখাল। ইমামা এবার এই প্রসঙ্গ এড়াতে, কেবিনেট খুলে কিছু বের করতে লাগল। এরিকও তার অনাগ্রহ বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা করল।

: 'হামিন তার ট্রফিটা বেডরুমে নিয়ে যায়নি কেন?' এরিক সেন্টার টেবিলের উপরের ট্রফির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

: 'সে আজ তার কিছু বন্ধুকে ইনভাইট করেছে, তাদেরকে দেখানোর জন্যই এটা এখানে রেখেছে।' ঝুড়ি থেকে ডিম বের করতে করতে ইমামা উত্তর করল।

: 'ওহ! পাটি...!' এরিক প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কিংবা প্রফুল্লতা জাহিরের চেষ্টা করল।

'আমি কি ইনভাইটেড?' এরিক ভিন্ন প্রশ্ন তুলল। ইমামা ডিম ভেঙে বাটিতে রাখতে রাখতে বলল, তুমি তো তার আগেই এসে গেছ। লাগল।

মজা করে বলা কথাটিতে খারাপ লাগার মতো কিছু ছিল না, তবু তার খারাপ লাগল।

: 'আমার এখানে আসা আপনার পছন্দ না?' মিডল লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল সে।

: মিথ্যা কথা বলে আসাটা পছন্দ না।

তার উত্তর এবার এরিককে নিরুত্তর করে দিল। সে ঠোঁট কামড়ে ইমামার দিকে তাকাল। তারপর তাকাল সেন্টার টেবিলে রাখা ট্রফির দিকে। সে বুঝতে পারল, ইমামা তাকে কোন মিথ্যার কথা বলছে। গত রাতের ঘটনার পর ইমামা তাকে এ কথা বলবে, এও সে জানত। ইমামার ব্যাপারে এতটুকু অন্তত

সে জানে। ডিম ফাটাতে ফাটাতে ইমামা ঝটপট এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল তার দিকে। লাল টি-শার্ট আর নীল জিন্সের সাথে জগারস পরেছে সে। মাথায় ফেঁসো চুল। অবনত দৃষ্টি। দুই হাত জিন্সের পকেটে ঢুকিয়ে, ডান পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে মেঝে ঘষছে। সে গভীর চিন্তায় আছে, নাকি ভীষণ লজ্জায়? বোঝা যাচ্ছে না তা। অবচেতনেই ইমামার ভেতর তার জন্য একরাশ মায়া জেগে উঠল।

: 'তুমি নাশতা করেছ?' সে জিজ্ঞেস না করে পারল না। এরিক ভদ্রভাবে মাথা নাড়ল। ইমামা তাকে আর জিজ্ঞেস করল না, সে নাশতা করবে কি না। চুপচাপ তার জন্য নাশতা বানাতে লাগল। এরিকও বুঝতে পারল, ইমামা কী করছে।

: আপনি আমাকে পরোটার পেটি বানিয়ে দিন।

ইমামা জানে, এরিক পরোটা খেতে চায়। এর আগেও সে বহুবার এখানে পরোটা খেয়েছে।

: 'আমি এটা ওখানে লাগিয়ে দিচ্ছি।' এরিক ট্রফির পাশ থেকে সাটিফিকেটটি হাতে নিয়ে বলল। এটি করে সে যেন ইমামা ও তার মাঝের জড়তা দূর করতে চাচ্ছে।

: 'না, লাগিয়ো না।' ইমামা তাকে বারণ করল।

: 'কেন?' সে হতবুদ্ধি হলো। 'হামিনকে নিয়ে আপনার গর্ব হয় না?'

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে ইমামা হাসল। এরিককে সে বলতে পারল না, তার সব ছেলে-মেয়ের সকল সাটিফিকেট, ট্রফি ও সম্মাননা যদি দেওয়াতে লাগাতে শুরু করে, তাহলে ঘরে আর কোনো জায়গা বাকি থাকবে না। আল্লাহ তাকে এমন এমন যোগ্য সন্তানই দিয়েছেন।

: 'হামিনের বাবা এটা পছন্দ করে না' আটা গুলতে গুলতে ইমামা বলল।

: 'কেন?' সে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

: 'তাদের সাফল্যের পদক যদি সবসময় এভাবে দেওয়ালে ঝুলে থাকে, তাহলে তাদের গর্বের মাথা আসমান থেকে জমিনে নামাব কীভাবে?' জিবরিলের সাটিফিকেট দেওয়ালে ঝোলানোর সময় সালার এটা বলেছিল। 'তা ছাড়া, সাফল্য যত বড়ই হোক না কেন, চব্বিশ ঘণ্টা পর তা অতীত হয়ে যায়। আর অতীতের ঢাকঢোল পেটানো মানুষ কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না।' সালারের কথাটি ইমামা হুবহু তাকে বলল। এরিক কথাটা বুঝল কি না, ইমামা তা বুঝতে পারল না। তবে সে আর কোনো প্রশ্ন না করে সাটিফিকেটটি চুপচাপ টেবিলের উপর রেখে দিল।

: 'মিসেস সালার! আপনি কি আমাকে পছন্দ করেন না?' তার পরের প্রশ্নে ইমামা ভীষণ চমকে উঠল।

: 'সবাই তোমাকে খুব পছন্দ করে, তাহলে আমি কেন করব না?' ইমামা ধীরেসুস্থে তাকে বোঝাল।

: আপনি কি আমাকে দত্তক নিবেন?"

প্রশ্নটি এতটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে, ইমামা পরোটার কথা ভুলে তার দিকে ঘুরে তাকাল। এরিক প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ইমামা বুঝতে পারল না, সে কী বলবে। তারপর সে হেসে উঠল। এভাবে তার হেসে ওঠা এরিকের ভালো লাগল না।

: এরিক! তোমার মাম্মি আছে। তোমার দুই ভাই-বোন আছে। একটা পরিবার আছে।

: 'প্লিজ...!' এরিক কেমন অস্থির হয়ে তাকে থামিয়ে, মিনতির সুরে বলল।

: 'তোমার মা তোমাকে খুব ভালোবাসে এরিক। সে তোমাকে কখনোই অন্য কারও হাতে তুলে দিবে না। তোমার মা থাকতে অন্য কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই তোমার।' ইমামা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

: 'মাম্মির এক বয়ফ্রেন্ড আছে। খুব তাড়াতাড়ি তারা বিয়েও করে ফেলবে। তখন কি আপনি আমাকে দত্তক নিবেন?' এরিক যেন সমাধান খুঁজে বের করল।

: 'তুমি কেন আমাদের কাছে আসতে চাও?' সে জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: কারণ, একে আমার নিজের বাড়ি মনে হয়।

এই নাতিদীর্ঘ বাক্যটির মধ্যেই তার সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে। সে কীসের আশায় কোথায় কোথায় ঘুরছে! ইমামার মন আরও খানিক মোম হলো। কিছু কিছু বিষয় আছে, যার কোনো সমাধান নেই। যুক্তির সমস্ত চাবিতেও তার তালা খোলে না।

: 'তুমি তোমার মাকে ছেড়ে আমাদের কাছে আসতে চাও-এটা তো ভালো কথা নয় বাবা!' ইমামা তাকে আবেগপ্রবণ করার চেষ্টা করল।

: 'মান্নি আমাকে ছেড়ে দেবেন। আমি তো আপনাকে বললামই, তার বয়ফ্রেন্ড আছে।' এরিকেও আবেগের উত্তর আবেগ ভবেই দিল।

: 'সে বিয়ে করুক, বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকুক, যা-ই হোক না কেন-তুমি তো তার ছেলেই। তোমার প্রতি তার ভালোবাসার কমতি হবে না। সে তোমাকে এবং তোমার দুই ভাই-বোনকে

তার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিবে না।" এরিকের মান্নি ক্যারোলিনের পক্ষ হয়ে কথা বলে ইমামা যেন তার হতাশা আরও বাড়িয়ে দিল।

: ইনাযাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

তার কথাটি যেন ইমামার মাথা ঘুরিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত সে কিছুই বলতে পারল না। এরিক যে তাদের প্রতি আকৃষ্ট, তাদেরকে পছন্দ করে-এটা সে জানে। তাই বলে এভাবে সে তাদের পরিবারের অংশ হতে চাইবে, ইমামা তা ভাবতেও পারেনি।

: 'এও হতে পারে না।' ইমামা অবশেষে বলল।

: 'কেন?' এরিক উন্মুখ হয়ে উঠল।

: 'এসব বিষয়ে কথা বলার বয়স হয়নি তোমার। তুমি এখনো ছোট।' ইমামা এর চেয়ে ভালো কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

: আমি যখন বড় হব, তখন কি তাকে বিয়ে করতে পারব?

: 'না।' ইমামা এবার স্পষ্টভাষী হলো।

: 'কেন?' সে এত সহজে হার মানার পাত্র নয়।

: 'তুমি কেন তাকে বিয়ে করতে চাও?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: কারণ, আমি তাকে পছন্দ করি।

: কিন্তু হয়তো সে তোমাকে বিয়ে করার মতো পছন্দ করে না।

এরিকের চেহারা য ধূসরতা এসে মিলিয়ে গেল।



: 'সে কি আপনাকে এমন কিছু বলেছে?' এরিক একটি বাচ্চামো প্রশ্ন করল।

: 'না, সে আমাকে কিছু বলেনি। সে খুব ছোট। তোমাকে পছন্দ করা না-করার মতো তার এখনো বুদ্ধি হয়নি। তবে আমি তোমাকে বলছি এরিক! এসব ভাবা বন্ধ করো। এসব নিয়ে আর কখনো কথা বলো না। নয়তো তোমার সঙ্গে হয়তো আমাদের আর মেলামেশাও হবে না।' না চাইতেও ইমামা কঠোর হয়ে পড়ল। এটা জরুরিও ছিল। কারণ, ইনাযাকে কেউ এসব কথা বলুক, তা সে চায় না।

: 'আপনি আমার ওপর রাগবেন না। আপনি না চাইলে, ইনাযাকে আমি বিয়ে করব না। তবে আমি তাকে ভালোবাসি।' ইমামাকে বিচলিত হতে দেখে এরিক বলল। ইমামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিশ্চুপ রইল। এটি সেই চ্যালেঞ্জ, যা দেখে এই সমাজের প্রতিটি মুসলিম মা ভয় পায়।

: 'ইনায়ার জন্য তুমি কী করতে পারবে?' ইমামা এবার বেশ গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করল।

: সবকিছু।

ইমামা তার প্রত্যাশিত উত্তরই পেল।

: ঠিক আছে। তাহলে নিয়মিত স্কুলে যাও, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো, নিজের একটা ক্যারিয়ার গড়ো। ইনায়া এমন ছেলেকে কখনোই পছন্দ করবে না, যে নিয়মিত স্কুলে যায় না, তার মায়ের কথা শোনে না, ছোট ভাই-বোনদের খেয়াল রাখে না এবং মিথ্যা কথা বলে।

এরিকের চেহারা লাল হয়ে উঠল। ইমামা যেন নিমিষেই তার জীবনের প্রথম ভালোবাসা ভেঙে চুরমার করে দিল। সেখানে এক গভীর নীরবতা নেমে এলো। ইমামা তখনো কিচেনে রান্না

নিয়েই ব্যস্ত। এরিকের নাশতা তৈরি করে সে টেবিলে রাখল।
দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে অবশেষে এরিক বলল, নিজেকে আমি
শুধরে নেব।

: 'এটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত এরিক! কিন্তু এর সঙ্গে আমাকে
তোমার আরও একটি কথা দিতে হবে।

: 'কী?' সে বিভ্রান্ত হলো।

: হাইস্কুল পাস করে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত,
ইনার্সার সঙ্গে তুমি এ ধরনের কোনো কথা বলবে না। আমি চাই
না সে তোমার প্রতি একদম বিরক্ত হয়ে উঠুক।

: 'এমনটাই হবে, কথা দিচ্ছি আমি।' এরিকও ইমামার মতোই
গম্ভীর হয়ে বলল। এক হাতে ছুরি আর অপর হাতে কাঁটা চামচ
নিয়ে সে এখন পরোটা খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

: 'আর তুমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরাও এ বিষয়ে আর কোনো কথা বলব না। ভালোবাসা, বিয়ে, ইনায়া-এসব নিয়ে।' ইমামা যেন এই তিনটি বিষয়ের চারপাশে লাল মার্ক করে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করল। এরিক শান্ত মনে এই শর্তও মেনে নিল। ইমামা ভেবেছিল, সে একটি সুরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলেছে। এরিক আর ইনায়াকে নিয়ে কখনো এসব বলবে না। কিছুদিন পর সবকিছু ভুলে যাবে। ইমামা তার কথাগুলোকে একজন আমেরিকান বাচ্চার শিশুসুলভ কথার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়নি। সে বুঝতে পারেনি, এরিক কোনো সাধারণ আমেরিকান শিশু নয়।

8

আহসান সাদের বাবা সবসময় গর্ব করে বলেন, আজকের দিনে পাকিস্তানের সেরা ইংরেজি মাধ্যম ও কো-এডুকেশন প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়া সত্ত্বেও, আমার ছেলে একজন সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমান। সে দাড়ি রাখে, মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াত্



নামাজ পড়ে। নিজ আগ্রহে হজ ও উমরা করে এসেছে। মেয়েদের থেকে শত হাত দূরে থাকে। কোনো হারাম কার্যকলাপে জড়িত নেই, মা-বাবার একান্ত অনুগত। তারা যদি দিনকে রাত, আর রাতকে দিন বলে, তাহলে আহসানের কাছেও তা তা-ই। সেই সঙ্গে পড়াশোনায় এখন অবধি স্কলারশিপ ধরে রেখেছে। শুধু সেই নয়, তার দুই ছোট বোনও বড় ভাইয়ের মতোই আমলদার হওয়ার পাশাপাশি প্রথম সারির শিক্ষার্থী।

এ নিয়ে সাদ ও তার স্ত্রী যতই গর্ব করে, তা যেন কম হয়ে যায়। এগুলো তারা খোলামেলাভাবে অন্যদের কাছে বলেও বেড়ায়। তাদের বন্ধুমহলের বেশিরভাগই তাদের মতো রক্ষণশীল ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম। কিন্তু তাদের সন্তানদের মতো এত যোগ্য সন্তান গুটিকয়েক জনেরই ছিল। তার চেয়েও বড় কথা হলো, সাদের সন্তানরা ছিল বাবা-মায়ের অত্যন্ত অনুগত। তাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে সাদের পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এমন একটি পরিবার গড়ার স্বপ্ন

সবাই দেখত। কিন্তু এই আদর্শ পরিবারের ফাঁপা ভিত্তি সম্পর্কে শুধু আহসানের নানার বংশই অবগত ছিল। সাদকে তারা দেখতেই পারতেন না।

সাদ বিয়ে করেছিল একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এরপর সে তার স্ত্রীকে একজন ভালো ও নেককার নারী বানানোর জন্য যা যা করেছিল, সেসব তার পরিবারের কারও অজানা নয়। যদি বিয়ের প্রথম বছরেই আহসানের জন্ম না হতো, তবে তার বাবা-মায়ের ডিভোর্স বহু আগেই হয়ে যেত। আহসানের জন্মের পরেও পরিস্থিতি বহুবার তালাকের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার বাবা ও দাদাদের শোরগোল সবসময় বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে দিত। সাদ তার স্ত্রীকে সবসময় একজন পর্দানশিন, অনুগত, ধর্মভীরু, দুনিয়াবিমুখ একজন স্ত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে চাইত। ধর্মের নাম ব্যবহার করেই সে এই দাবি তুলত। এছাড়া আর সাদের মধ্যে খারাপ কিছু ছিল না। তবে এই ভালো মানুষটি তার স্ত্রীকে নিজের মতো গড়ে তুলতে

গালিগালাজ থেকে শুরু করে মারধর পর্যন্ত করত। এমনকি বাপের বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ করে তাকে ঘরবন্দি করে রাখত।

এই সমস্যাগুলো নিয়ে যখনই পরিবারের বড়রা একত্রিত হতো, সাদ কুরআন-হাদিস থেকে যুক্তি দিয়ে তাদের দমিয়ে দিত। সে ছিল তার স্বামী। তাই সে তার স্ত্রীকে তার কথামতো চলতে বাধ্য করত, ইসলামমতে রাখতে চাইত। তার স্বশুর-শাশুড়ি কোনো আপত্তি করলে, তাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসত, আপনারা কি চান আপনাদের মেয়ে গোমরাহ হয়ে যাক? তাদের কাছে হাজারটা অজুহাত থাকা সত্ত্বেও, সাদের কুরআন-হাদিসের যুক্তির মুখে কোনো জবাব দিতে পারত না। তারা ছিল জেনারেল শিক্ষিত ও উদারমনা। দীনি জ্ঞান তাদের ছিল না। যদি থাকত, তাহলে তারা সাদকে দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারত। সে কুরআন-হাদিসের যেসব উদ্ধৃতি দিত, সেগুলোর প্রেক্ষাপট বুঝিয়ে দিত।

সাদের স্ত্রী ছিল বয়সে তার থেকে ছোট। তাই পরিবারের লোকেরা তাকে আরও কয়েকটা দিন ঐর্ষ্য ধরে থাকতে বলত। বেশি বেশি সাদের আনুগত্য করতে বলত। তাদের ধারণা ছিল, সময় গড়ালে এবং একটা সন্তান হয়ে গেলেই সাদ বদলে যাবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও সাদ আর বদলাল না। উলটো তার স্ত্রীই বদলে যেতে থাকল। সে মানসিকভাবে মেনেও নিল, এটাই তার নিয়তি। সে আসলেই দীন থেকে দূরে। ইসলামের জ্ঞান তার শূন্য। তাই সাদ যা বলে, তা-ই ইসলাম। তাই স্বামীর কথামতো কঠোর পর্দা, জানতোড় খেদমত, একান্ত অনুগত হওয়া উচিত। একসময় ধীরে ধীরে সাদের স্ত্রী পালটে হুবহু সাদের মতোই হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী তখন একই চিন্তাধারার মালিক। তার স্ত্রীও তার মতোই যখন-তখন, যাকে-তাকে ফতোয়া দিতে শুরু করল। কারও কোনোকিছু একটু এদিক-সেদিক দেখলেই, মুখের ওপর তাকে এটা-সেটা বলে দিত। দীনের জ্ঞান ঝেড়ে খুল্লামখুল্লা অপদস্থ করত। যুক্তি হিসেবে তাদের বলত, নিজে যা জানো, তা অন্যের কাছে পৌঁছে

দেওয়াও ইসলামের নির্দেশ। তাই আমরা তোমাদের সতর্ক করছি।

যে কাজ ইসলামবিরোধী, তা ঠেকানোর সামর্থ্য থাকলে, তারা তাকে শুধু খারাপ না বলে বরং প্রকাশ্যে এমনভাবে তিরস্কার করে যে, লোকটি লজ্জায় লাল হয়ে যায়। অথচ এটা ইসলাম নয়। ইসলামে কেবল হুকুমই নয়; হেকমত বা প্রজ্ঞা বলেও একটা জিনিস আছে। সে ব্যাপারে তারা ছিল একদম অজ্ঞ।

এভাবে মানুষকে খোলাখুলি লজ্জায় ফেলে, ধর্মের বুলি আওড়িয়ে, তারা আবার আল্লাহর কাছে শুকরিয়াও আদায় করত, আল্লাহ তাদের এই কাজের তাওফিক দিয়েছেন। তারা মানুষকে টেনে টেনে দীনের পথে আনছে, হেদায়তের পথ দেখাচ্ছে। দাম্পত্যজীবনে তারা কেবল এই একটি বিষয়েই একমত ছিল। বাকি সব বিষয়েই তাদের মধ্যে ছিল মতানৈক্য ও ঝগড়া। তবে সাদের স্ত্রী তার অপছন্দনীয় বিষয়গুলোতে চুপ থাকতে শিখে গিয়েছিল। কারণ, চুপ না থেকে তর্ক করার ফলে

দাম্পত্যজীবনের অশান্তি সে বিয়ের শুরুর সময়টাতে দেখে এসেছে। এত বছর পরও তাদের মধ্যে কোনো আন্তরিক ভালোবাসা ছিল না। তবু পাকিস্তানের আশি শতাংশ দম্পতির মতো, ভালোবাসা ছাড়াই সংসার করে যাচ্ছিল। ভালোবাসাবিহীন সংসার-জীবনকে টিকিয়ে রেখেছিল তাদের যৌথ ঘৃণা। কোনো মুসলিমের মাঝে আমলের কমতি দেখলেই তারা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করত। পরিবার-পরিমণ্ডল ও বন্ধুমহলে তাদের দুজনকে কেউ পছন্দ করত না। যদিও তারা নিজে নিজে মনে করত, তারা দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র ও বিপদের বন্ধু। কিন্তু ইসলামের নামে কট্টর মতবাদ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে, মানুষ তাদের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তারা অনবগত ছিল না। তারাও এসব জানত। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা নেকের কাজ করছে। এর জন্য যদি মানুষ তাদের থেকে দূরেও সরে যায়, তবু আল্লাহ পাক তাদের পুরস্কৃত করবেন।

আহসানও এমন একটি পরিবেশে বড় হয়েছে, যেখানে তার মা-বাবা তাকে সেই মানদণ্ডেই মানুষকে বিচার করতে শিখিয়েছে, যে মানদণ্ডে তারা নিজেরা অন্যদের বিচার করত। ছোটবেলা থেকেই সে মা-বাবার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ঝগড়া দেখে আসছে। তা দেখে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কেবল ঝগড়াই হয়, এটাই সে শিখেছিল। সে শিখেছিল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো-শাসক ও শাসিতের, উন্নত ও নিকৃষ্টের, দায়ী ও দায়িত্বপ্রাপ্তের। এতে কোনো সম্মান ও শ্রদ্ধার লেশ থাকবে না, স্নেহ ও ভালোবাসার রেশও থাকবে না।

পুরুষের ইজ্জত ও গায়রতের ভরাডুবি হয় স্ত্রীর চরিত্র ও আমল খারাপ হলেই। পুরুষ নিজে খারাপ হলে তার ইজ্জতের ভরাডুবি হয় না, এটাই ছিল আহসানের প্রতি তার বাবার পয়লা সবক। অথচ তার বাবা তথাকথিত সভ্যতম দেশ আমেরিকান নাগরিক এবং সেখান থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত!

আহসান সাদ কিছু জিনিস অত্যন্ত অপছন্দ করত। 'অপছন্দ' বললে কম হয়ে যায়, সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়- তীব্র ঘৃণা করত। আর সেই তালিকার শীর্ষে ছিল মর্ডান নারী ও আমেরিকা। বাবার মতোই আহসানও এই দুটিকেই, পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও অশান্তির কারণ হিসেবে দায়ী করত।

সে একটি লিবারেল স্কুলে কো-এডুকেশনে 'এ লেভেল' করছিল। সেখানে হিজাব না-করা, তার সহপাঠী প্রতিটি মেয়েকেই সে চরিত্রহীন মনে করত। মা-বাবার মতো সেও মনে করত, এই মেয়েগুলোই ছেলেদেরকে পাপের পথে আহ্বান করে। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেলেদের আকৃষ্ট করে। তবে তার নিজের দুই বোন কো-এডুকেশনে পড়েনি। অথচ সাদ আহসানকে শুরু থেকেই কো-এডুকেশনে পড়িয়েছে। সেখানে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ হতো। এদিকে তার বাবাও তাকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার জন্য আরও একটি উদাহরণ পেয়ে গিয়েছিল-তার ছেলে কো-এডুকেশনে পড়েও গার্লফ্রেন্ডের

অর্থও জানে না। এটা ছিল সাদের ভেতর ধর্মের নামে মুনাফিকি কার্যকরের আরও একটি ঝলক।

আহসান এবং তার দুই বোনকেও সবসময় সীমাবদ্ধ সামাজিক গণ্ডির ভেতর রাখা হতো। স্বাধীনতা বলতে কোনো শব্দই ছিল না তাদের জীবনে। তাদের একমাত্র বিনোদন ছিল পড়ালেখা করা। একমাত্র আনন্দ ছিল ভালো ফলাফল পাওয়া। একমাত্র আগ্রহ ছিল ধর্মীয় বই পড়া। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আখেরাতে সফলতা লাভ করা। একমাত্র শখ ছিল পিতা-মাতার সেবা করা। এগুলো ছাড়া দুনিয়াকে তারা অভিশাপ মনে করত। যা কিছু দুনিয়ার দিকে মনকে আকর্ষণ করে, তাকে শয়তানি মনে করত।

এটি ছিল একটি Perfect Dysfunctional Family বা নিখুঁত অকার্যকর পরিবার। সেখানে মা-বাবা তাদের বিপর্যস্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ত্রুটিগুলো, ধর্মের চাদরে ঢেকে, নিজেদের পবিত্র করে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল-কেউ যেন তাদের ইবাদত ও

ইলমকে তাচ্ছিল্য করে, তাদের সমালোচনা করতে না পারে। তাদের সমস্ত মানবীয় দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো যেন নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ইবাদতের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ছিল, এই বাড়ির কোনো সদস্যের মধ্যেই নিজেদের ত্রুটিময় জীবনের উপলব্ধি ছিল না। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের নিখুঁত ভাবত। অন্যদের কাছে তারা ছিল এক-একটি রোল মডেল এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

আহসান সাদও নিজেকে নিষ্কলঙ্ক, কামেল পুরুষ মনে করত। সমস্ত খারাবি থেকে মুক্ত, সমস্ত ভালোর আধার। তার ওপর তার বাবার চিন্তা ও চরিত্রের গভীর ছাপ ভর করে ছিল। কারণ, সে-ই ছিল তার বাবার একমাত্র স্নেহের পুত্র। আহসান তার বাবার কাছ থেকে অনেক কিছুই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে: রূপ-সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, মেজাজ, অভ্যাস। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যে জিনিসটি আহসান তার বাবার থেকে গ্রহণ করেছিল, তা হলো মুনাফিকি। যদিও সে এই মুনাফিকির পরিচয় জানত না। মর্ডান নারী ও আধুনিক আমেরিকার প্রতি

ছিল তার বিপুল ঘৃণা। এগুলোকে সে দুনিয়ার সমস্ত পাপ ও নষ্টের গোড়া মনে করত। অথচ সে এমন একটি মর্ডান মেয়েকেই বিয়ে করতে চাইত, যার আবার আমেরিকান নাগরিকত্বও থাকতে হবে। ঘৃণিত আমেরিকায় আবার উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করতে চাইত। তার বাবা ঠিকই বলতেন, আহসান যা চায়, তাই-ই পেয়ে যায়। সে বড় সৌভাগ্যবান। এই দুটি জিনিসও সে পেতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সৌভাগ্য অন্য একটি পরিবারের দুর্ভাগ্যে পরিণত হতে চলেছিল।

০৫

: 'তুমি জানো JB, মেয়েরা তোমাকে হট মনে করে?'

এক মুহূর্তের জন্য ডিনার টেবিলে নীরবতা ছেয়ে গেল। পাস্তা খেতে খেতে হামিন তার তেরো বছরে বড় ভাইকে, এই অপ্রত্যাশিত বাক্যটি শোনালা। ইমামা, সালার, ইনায়া এবং রাইসা; একসঙ্গে হামিনের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল



জিবরিলের দিকে। জিবরিলের মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। তবে সেটা লজ্জায় নয়, রাগে। হামিনের এমন খোলামেলা মত্তব্যের কারণে প্রায়ই এমন হয়।

'তারা আমাকেও বলে। তবে কুল বলে, কিন্তু তোমাকে বলে হট, কী দুঃখজনক, তাই না?' সে মা-বাবার চোখ কিংবা জিবরিলের রক্তিম মুখ, কোনো দিকে খেয়াল না করেই বলতে থাকল।

: 'Will you please shut up? দয়া করে তুমি কি একটু চুপ করবে?' জিবরিল তাকে ধমক দিল। বাবা-মা পাশে থাকায় সরাসরি 'শাট আপ' না বলে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাকে বারণ করল।

: 'oh, one more twister. আবারও প্যাঁচালো কথা!' হামিন এমনভাবে ভাব দেখাল, যেন জিবরিল কঠিন কিছু বলে ফেলেছে, আর সে তা বুঝতেই পারছে না।

: 'হামিন...!'এবার ইমামা তাকে ডাক দিল। সারা দুপুরজুড়ে ইমামা হামিনের ক্লাসমেটদের পাটির ঝঙ্কি সামলে, এখন একটু খেতে বসেছে।

: 'আমি ভুল বলছি না মাম্মি!' ইমামার সতর্কতাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে, তার কথা বলেই চলল, আমার পরিচিত সব মেয়েই জিবরিলের ওপর ক্রাশ।' জিবরিল এবার হাতের কাঁটা চামচ প্লেটে রাখল। এটা যেন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ইঙ্গিত। 'এমনকি আমার গালফ্রেন্ডদেরও।'

: 'ফ্রেন্ডস...!' সালার তাকে মাঝপথে থামাল।

: 'সে যা-ই হোক।' হামিন তার কথা চালিয়ে গেল। 'ম্যান! ইউ আর সো লাকি।' হামিন এবার ঈর্ষাভরা চোখে জিবরিলের দিকে তাকাল। ইমামা বেহদ্দ চেষ্টা করেও তার হাসি সামলাতে পারল না। হামিনের কথার চেয়ে, জিবরিলের প্রতিক্রিয়া দেখে তার

বেশি হাসি পাচ্ছিল। জিবরিলের কানের লতিও এখন লাল হতে শুরু করেছে। মায়ের হাসি দেখে সে আরও বিরক্ত হলো।

: 'তো তোমার কী মনে হয়? মেয়েরা কেন তার প্রতি এত আকৃষ্ট?' সালার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল। সে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে হামিনকে প্রশ্ন করল, যেন এটা কোনো দার্শনিক প্রশ্ন।

: 'এই বিষয়ে আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছি।' হামিন তার কাঁটা চামচের ভগা পান্তার মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে সালারের দার্শনিক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করল। 'এর অনেক কারণ আছে। বেশি কথা বলা ছেলেদের পছন্দ করে না মেয়েরা। আর জেবিও একদম কথা বলে না।'

: 'আর...?' সালার সালাদের টুকরো মুখে পুরে তাকে সামনে এগোতে উৎসাহ দিল।

: 'আর মেয়েরা নিজেকে গুটিয়ে রাখা ছেলেদের পছন্দ করে। জেবির মধ্যে এই বিষয়টিও আছে।' সে এখন তার ভাইয়ের বিশ্লেষণ শুরু করেছে। 'মেয়েরা সেই ছেলেদেরও পছন্দ করে, যারা তাদের অনর্গল বকবক শুনতে পারে। সেসব বকবক যতই ফালতু হোক না কেন।'

এবার সালারেরও হাসি পেল। গলা খাঁকারি দিয়ে সে সেটা লুকিয়ে ফেলল। ইনায়া ও রাইসা চুপচাপ খেতে খেতে হামিনের কথা শুনছে আর জিবরিলের ভাবভঙ্গি দেখছে। একজন বড় ভাই, অন্যজন ছোট ভাই। তারা বুঝতে পারছিল না এই আপত্তিকর আলোচনায় তারাও কীভাবে অংশ নেবে।

: 'মেয়েরা সেইসব ছেলেকেও পছন্দ করে, যারা গুড লুকিং।' কথা বলতে বলতে হামিন একটু আটকালো। 'আর এখানে যদি আমার ও জেবির মধ্যে তুলনা করা হয়, তাহলে আমরা দুজনেই সমান গুড লুকিং।' সে আবার কথা ঘুরিয়ে নিল।

জিবরিল এবার তাকে থামাল, 'তুমি কি জানো হামিন! মেয়েরা
সেইসব ছেলেকে পছন্দ করে, যারা ইডিয়ট নয়।'

তার ইঙ্গিত হামিন বুঝতে পারল।

: হ্যাঁ, বোকা মেয়েরাই ইডিয়টদের পছন্দ করে না।

: 'পাপা...!' এবার ইনায়া সালারকে ডেকে উঠল। হামিনের
মন্তব্যের প্রতিবাদ করল সে।

'তুমি এই দুটি মেয়ের ব্যাপারে কী বলবে?' সালার ভীষণ
গম্ভীরভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'তিনটি বলুন বাবা! মান্নিকে আপনি মেয়েদের তালিকা থেকে
কেন বাদ দিচ্ছেন?' হামিন প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে, ভীষণ
সরলভাবে সালারকে জিজ্ঞেস করল। সে শুধু স্মার্ট নয়, সুপার

স্মার্ট। চতুর এবং সুযোগসন্ধানীও। কথা বলা, ঘুরিয়ে ফেলা, সামাল দেওয়া, এই বয়সেই সব তার রপ্ত।

: 'হামিন। এবার থামো।' ইমামা এবার তার হাসি সামলে বলল। সে সত্যিই বুঝতে পারছে না, হামিনকে কি বকা দিবে? নাকি তার কথায় হাসবে? তার কথাগুলো ভুল নয়। তেরো বছর বয়সেই জিবরিলকে তার দীর্ঘ গঠনের জন্য বড় দেখায়। হামিনের মতো রোগা-পাতলা নয় সে। হামিন ঠিকই বলছিল, মেয়েরা সত্যিই তাকে হট মনে করে। তবে তাকে পছন্দ করার আরেকটি বিশেষ কারণ হামিন বলেনি। তা হলো তার সুন্দর কণ্ঠস্বর, যা এখন ধীরে ধীরে ভারী পুরুষালি স্বরে পরিণত হতে শুরু করেছে। তার চোখ ছিল সালারের চোখ-বড়, কালো এবং ভীষণ গভীর। সে সালারের মতোই অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের। হামিনের মতো তার অকারণ কথা বলার অভ্যাস নেই। মেয়েদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার কারণ হলো, সে সবার কাছে একটি ধাঁধা।

এদিকে হামিনের ব্যক্তিত্ব চৌম্বকীয়। হামিন তার আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন। সঠিক সময়ে তা ব্যবহার করতে জানে। অপরদিকে জিবরিল তার আকর্ষণ সম্পর্কে জানে না, আর সেটা ব্যবহার করার প্রতিও তার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে কেউ যদি জিবরিলের এই মৌনতা ও শান্ত স্বভাবের পাহাড়ে ফাটল ধরিয়ে তাকে বিরক্ত করতে পারে, তবে সে একমাত্র হামিন। জেবিকে খ্যাপানো তার জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও প্রিয় কাজ। এক বছর আগে সে তাকে 'ভাই' বলা ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, তার মনে হয়েছে 'জেবি' বলাটা কুল, 'ভাই' বলাটা কুল নয়। আর হামিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুলনেসকেই প্রাধান্য দেয়।

: 'বাবা! স্পেলিং-বিতে জিতে আমিও আমার সব ক্লাসমেটকে ইনভাইট করব।' রাইসা এই প্রথম কথোপকথনে অংশ নিয়ে সালারকে নিজের দিকে মনোযোগী করল। গত সন্ধ্যা থেকে তার মন সেই একটি ট্রফি জেতার মধ্যেই আটকে আছে। সেই ট্রফিটি এই বাড়িতে পরপর তিনবার এসেছে। এখন নিয়ম



অনুযায়ী চতুর্থবার সেটি আনার দায়িত্ব আপনা-আপনি তার কাঁধে এসে পড়েছে। জিবরিলের পর এই বাড়িতে সে-ই সবচেয়ে দায়িত্বশীল শিশু। এবং প্রয়োজনের চেয়েও একটু বেশিই দায়িত্বশীল। জিবরিলের মতো সেও সব কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করত, তারপর একান্ত মনে সেটি আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করত। বাকি তিনজনের মতো সে অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান ছিল না, তবে সে আর সেই দেড় বছর আগেকার শিশুটিও নেই, যে বোবা না হয়েও কথা বলতে পারে না। তারা সবাই মিলে কম বুদ্ধিমান রাইসাকে বুদ্ধিমতা করার জন্য অনেক মেহনত করেছে। রাইসা এখন সেই কাতি অর্জন করার জন্যই উন্মুখ হয়ে আছে, যা ইতিমধ্যে বাকি তিনজন অর্জন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা জিতে চতুর্থবারের মতো ট্রফিটি এই বাড়িতে আনতে চাচ্ছে। বিশাল সমাবেশে লাইম লাইট হতে চাচ্ছে, যেমন লাইম লাইট হয়েছিল বাকি তিনজন, বিজয়ের পর। রাইসা সালার জীবনে বড় কিছু করতে চায়।



: 'বাবা! হামিনের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে চাই।' রাইসা ফিসফিস করে সালারকে বলল। তার ফিসফিসানির স্বরে সালার বাসা থেকে বের হতে হতে থমকাল। ফ্রকের প্লিটগুলো মোচড়াতে মোচড়াতে রাইসা তার পেছনে দাঁড়াল। সালার ওয়াকিং-এ বের হচ্ছিল, আর রাইসা তাকে এগিয়ে দিতে গেইট পর্যন্ত এসেছিল। কিন্তু বিদায় জানিয়ে দরজা বন্ধ না করে, ফিসফিস করে তাকে বলল। সালার বিস্মিত হলো। রাইসা কখনো কারও নামে অভিযোগ করে না। আর হামিনের নামে অভিযোগ? এ তো অবিশ্বাস্য! সে তো হামিনের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসপাত্রী। রাইসার ব্যাপারে এটা সবাই জানত, সে হলো হামিনের গোপন কথার সুইস ব্যাংক।

দরজার নবে হাত রেখে সালার খানিক বিস্ময়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, কী বলতে চাও? রাইসা উত্তর না করে ঘুরে লাউঞ্জের



দিকে তাকাল। সেখান থেকে হামিনের গলা ভেসে আসছে।
ইমামার সঙ্গে কথা বলছে সে।

: 'একটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই।' রাইসা সেই আগের
মতোই ফিসফিস করে বলল। এবার সালার তার হাত ধরে,
গেইট খুলে বাইরে যেতে যেতে তাকে বলল, 'এসো, আমরা
হাঁটতে যাই।' সালার বুঝতে পারছে, বাড়ির ভেতরে হামিনকে
নিয়ে কথা বলতে সে দ্বিধাশ্রিত হচ্ছে। রাইসা চুপচাপ তার সাথে
বাইরে চলে এলো।

বাইরে আজ শিথল আবহাওয়া। মেঘমুক্ত ঝলমলে দিন।
প্রতিবেশী কয়েকজন মানুষও পাশেই হাঁটছে। তারাও রাস্তার
পাড় ঘেঁষে হাঁটতে লাগল।

: 'তা, হামিনের ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও?' পাঁচ-দশ মিনিট
হেঁটে, ইতিউতি গল্প করে অবশেষে সালার তাকে জিজ্ঞেস

করল। রাইসা সাথে সাথে কোনো উত্তর করল না। যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন।

: 'আই অ্যাম নট শিওর। বাট, একটা বিষয় আপনাকে বলতে চাই। সেটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।' রাইসা বরাবরই এমন। কিছু বলার আগে দশবার ভেবে নেয়।

: 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।' সালার যেন তাকে আশ্বাস দিল।

: 'আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমি হামিনকেও কষ্ট দিতে চাই না। এটা তার গোপন কথা। আর গোপন কথা কাউকে বলে দেওয়া ভালো কাজ নয়। হয়তো আমার বলাটা উচিত হবে না। তাছাড়া আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। আমি এখনো ভাবছি।' সালারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এমনভাবে বিড়বিড় করে কথা বলছে, যেন সে স্বগতোক্তি করছে, দ্বিধাম্বিত হচ্ছে কিংবা নিজের সঙ্গে লড়াই করছে।

সালারও মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ করছে, রাইসা কিছু একটা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু দ্বিধাশ্রিত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিতে না পারাটা ছিল রাইসার একটি সমস্যা।

কিন্তু সালার ভাবছে অন্য কথা। হামিনের গোপন বিষয়টি যাইহোক না কেন, সেটি তাকে কেন বলতে চাচ্ছে রাইসা? সে কি আশঙ্কা করছে যে, বিষয়টি না জানালে হামিনের কোনো ক্ষতি হতে পারে? নাকি ভয় করছে, বিষয়টি পরে জানতে পারলে হামিনের ওপর তারা রাগ করবে?

: 'কী এমন হয়েছে রাইসা, বলো। আমি কথা দিচ্ছি, বিষয় যাই হোক না কেন, কাউকে বলব না।' রাইসা তার নরম কথায় প্রভাবিত হলো না।

: 'বাবা! হামিনের প্রতি আপনি ভীষণ রেগে যাবেন। আমি তা চাই না।' রাইসা এবার সরাসরি তার আশঙ্কা প্রকাশ করল। সালারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সংকেত দিতে শুরু করল।

'আপনাকে আমি দুয়েকদিন পরে বলব। ততক্ষণ আমি এই বিষয়ে একটু ভাবতে চাই।' অবশেষে রাইসা তাকে বলল।

: 'দেখো রাইসা, এটা মোটেও ভালো কথা নয়। হামিন যদি এমন কিছু করে থাকে, যা আমাদেরকে জানানো দরকার, তাহলে সেটা তোমার জানানো উচিত। এভাবে লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়।' সালার এবার সত্যিই সিরিয়াস হয়ে উঠল। যদিও সে জানে, হামিন এমন কিছু করবে না, যা তাদেরকে বড় কোনো বিপাকে ফেলবে। কিন্তু রাইসার এই লুকোছাপায় তার ভীষণ খারাপ লাগছে।

: 'আমাকে একটা দিন সময় দিন।' রাইসা সালারের বিরক্তি টের পেয়ে তাকে আশ্বস্ত করল। 'কাল আপনাকে সবকিছু বলব। আজকের দিনটা আমি একটু ভাবতে চাই।'

সালার অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারা তাদের সন্তানদের জোর-জুলুম করে মানুষ করেনি। বকাঝকা করেও তাদের নিয়ন্ত্রণ করেনি। তাই সে এখন তাকে জোর করে সেই কথা উগরাতে বাধ্য করতে চাচ্ছে না। এই বিষয়ে সংশয়ে ভুগছে যেহেতু তাহলে একদিন সময় নিক।

: 'ঠিক আছে। এক দিন ভাব। তারপর আমাকে জানাও।' সালার কথা শেষ করল।



পরদিন দিন রাইসাকে তা আর বলতে হলো না। তার আগেই স্কুল থেকে ইমামাকে কল করা হলো। হামিনের শিক্ষক একটা

জরুরি বিষয়ে কথা বলতে তাদেরকে যেতে বলল। বিষয়টিকে তারা অত তোয়াক্কা করল না। হামিনের ব্যাপারে এমন কল প্রায়ই আসে। তার দুষ্টুমি, পড়াশোনার ফাঁকির নালিশ এখন সব পুরোনো হয়ে গেছে। আগে থেকেই সে জিবরিলের মতো ভদ্রসদ্র ছাত্র নয়। কিন্তু পরের দিন স্কুলে গিয়ে হামিন সম্পর্কে যা শুনতে পেল, তা যেন তাদের দিকশূন্য করে দিল।

হামিন জুনিয়র উইং-এ একটি ছোটখাটো বিজনেস রান করছে। সেই বিজনেস ডিলের আওতায় একটি বাচ্চা তার খুব দামি একটি গেম হেরে যায়। সে তার বাবা-মায়ের কাছে এই লেনদেনের বিস্তারিত জানালে, প্রথমবারের মতো তা শিক্ষকদের কানে আসে। ফলে স্কুল তদন্ত করে এবং হামিন সিকান্দারের নামে এই প্রথম ওয়ার্নিং লেটার ইস্যু করা হয়। হামিন যদি স্কুলের ছাত্র না হতো, তাহলে এ বিষয়ে স্কুলের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরও কঠোর হতো। কিন্তু সালার ও ইমামার জন্য এই ওয়ার্নিং লেটারটিই যথেষ্ট।

তাদের চার সন্তানের মধ্যে এই প্রথম কেউ এমন ওয়ার্নিং লেটার পেল, সেটাও আবার মাত্র কয়েকদিন আগে সে স্কুলে হিরোর মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পরই। সেই হিরো এখন মাথানত করে তাদের সামনে বসে আছে। কিছুক্ষণের জন্য সালারের মাথা সত্যিই ঘুরে গেল। হামিনের ব্যাপারে কখনো এই আশঙ্কা করেনি। অথচ এখন সেটির মুখোমুখি তারা।

খুব বেশিদিন হয়নি বিজনেসটি শুরু হয়েছে। হামিন প্রথম থেকেই রাইসাকে এর কথা জানিয়ে রেখেছিল। এটি শুরু হয়েছিল ছুট করেই। তার সহপাঠীর এক উন্নত, আকর্ষণীয় স্টিকার্স দেখে হামিন আর লোভ সামলাতে পারেনি। বাসায় এসে ইমামাকে তা কিনে দিতে বলে। কিন্তু ইমামা তাকে না করে দেয়। কারণ, কয়েকদিন আগেই সে স্টিকার্স নিয়েছে, সেগুলো পুরোনো না হতেই আরেক জোড়া জুতোর প্রশ্নই আসে না! হামিন প্রতিদিন খেলার সময় সেই ছেলেটির স্টিকার্সের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, এগুলো কীভাবে হাতানো যায়। অবশেষে সে বাটার ট্রেড বা বিনিময় বাণিজ্যের

মাধ্যমে সেই স্নিকার্সগুলো পেতে চেষ্টা শুরু করে। ছেলেটি প্রথমে তার এমন প্রস্তাবে কিছুটা বিচলিত হয়েছিল। এমন প্রস্তাব আর তার স্নিকার্সের প্রতি এমন শ্রদ্ধা, এর আগে কেউ কখনো জানায়নি।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ছেলেটি হামিনকে জানাল, সে অন্য এক ক্লাসমেটের ঘড়িটা খুব পছন্দ করে। ওই ঘড়িটি পেলে, এই স্নিকার্সগুলো দিতে সে রাজি। যে ক্লাসমেটের ঘড়ি সে চেয়েছিল, তার আবার অন্য এক ক্লাসমেটের সাইকেলে ভীষণ আগ্রহ। সেই সাইকেলওয়ালা আবার অন্য এক ক্লাসমেটের ব্যাগের প্রতি আকৃষ্ট। এই চেইনটি চলতে চলতে হামিনের এক কিবোর্ডে এসে থামল। সেটি সে মাঝেমধ্যেই স্কুলে নিয়ে গিয়ে বাজাত। হামিন সঙ্গে সঙ্গে সেই কিবোর্ডের বিনিময়ে স্নিকার্সগুলো আদায় করার সিদ্ধান্ত নিল। শুধু সিদ্ধান্তই নিল না, পরের দিনই সেটিকে বাস্তবায়নও করল।

ব্যবসার প্রথম মূলনীতি হলো কার্যকর কৌশল, আর দ্বিতীয়টি হলো সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহার। সালারের মুখ থেকে শোনা এই কথাগুলো তার নয় বছর বয়সি এই ছেলে, কী নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছে, তা যদি সালার দেখত, তাহলে সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যেত।

পরের দিন স্কুল মাঠে হামিন সিকান্দারের ক্লাসের বারো জন শিক্ষার্থী তাদের সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটি পাওয়ার জন্য, তুলনামূলক কম পছন্দের জিনিসটি বিনিময় করল। ফলে হামিন সিকান্দার তার কাজক্ষিত স্নিকার্সগুলো পেতে সক্ষম হলো। তার মন আনন্দে নেচে উঠল। বাকি এগারো জনেরও একই অবস্থা। তারাও আনন্দে আত্মহারা। অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে ছিল পছন্দের জিনিসটির দিকে। কত সহজেই না

তারা পেয়ে গেল তা!



গ্রাহকের সন্তুষ্টি হলো ব্যবসার তৃতীয় মূলনীতি। সালার সিকান্দারের নয় বছরে ছেলেটি এই তিনটি বিষয়ই মাথায় রেখেছিল। সে তখন এগারো জন সন্তুষ্ট ক্রেতার মাঝে সম্রাট আকবরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। তারা তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারছিল না।

সেদিন হামিন সিকান্দার স্পোর্টস আওয়ারে নতুন স্নিকার্স পরে প্র্যাকটিস করল। সবার প্রথমে তার স্নিকার্সগুলো চোখে পড়ল রাইসার। ছেলেটির পায়ে প্রথম যেদিন স্নিকার্সগুলো দেখেছিল, সেদিনও হামিন তাকে সেগুলোর কথা বলেছিল। ইমামা যখন কিনে দিতে না করে দিল, সেটাও সে রাইসাকে বলেছিল। এমনকি সেই স্নিকার্সগুলো হাতানোর জন্য এখন সে একটি বিজনেস প্ল্যান করছে, তাও তাকে জানিয়েছিল। তার প্ল্যানটি অবশ্য তখন সাত বছরে রাইসার মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছিল। তবে রাইসা এতটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিল-অন্য কারও জিনিস কোনোভাবেই নেওয়া হয়তো ঠিক নয়। কিন্তু হামিন



সিকান্দারের কাছে তার এই প্রশ্নেরও উত্তর ছিল। শুধু উত্তর নয়, এক অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর।

তার চার দিন পর রাইসা সেই স্নিকার্সগুলো হামিনের পায়ে দেখতে পেল। হামিন তাকে বিজয়ীর ভঙ্গিতে জানাচ্ছিল যে, কোন কোন ক্লাসমেটের সহযোগিতায় এই বিনিময় চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

: 'তাদের কেউ যদি তার জিনিসটি ফেরত চেয়ে বসে, তবে?'
তার কথা শুনে রাইসা তার প্রথম আশঙ্কাটি প্রকাশ করল।

: 'তা হতেই পারে না।' হামিন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

: কেন?

হামিন তার এই 'কেন'-এর জবাবে পকেট থেকে একটি চুক্তিপত্র বের করে তাকে দেখাল, তাতে হামিনসহ মোট বারো

জনেরই স্বাক্ষর রয়েছে। সেই চুক্তিপত্রে এই লেনদেন বিষয়ক, নিয়ম আর শর্তাবলিও লেখা ছিল। তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল, একবার বস্তুটির বিনিময় হয়ে গেলে, তা আর ফেরত নেওয়া যাবে না। রাইসাকে সে সেই চুক্তির শর্তগুলো পড়ে পড়ে শোনাতে লাগল। রাইসা চুপচাপ শুনতে থাকল।

তারপর বলল, 'যদি বাবা তোমার এই স্নিকার্সগুলো দেখে ফেলেন, তবে?

: 'Now that's a tricky part. এবার এটাই হলো গোলমালের জায়গা।' চুক্তিপত্রটি ভাঁজ করতে করতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল সে। 'আমি এগুলো তাদের দেখাব না, তাদের সামনে পরবও না। তুমিও তাদের বলো না।' হামিন এবার

মাথা চুলকানো বন্ধ করে দিল।

: 'আমরা কি তাদেরকে মিথ্যা বলব?' সমাধানটি রাইসার মনঃপূত হলো না।

বিষয়টি এড়িয়ে গেল। : 'একদম না। আমরা কেন মিথ্যা বলব? আমরা শুধু তাদের জানাব না।' হামিন

: 'কেন?' রাইসা তবু সন্তুষ্ট হলো না।

: 'গার্ডিয়ানরা অনেক কথা বোঝেন না।' পাকনা মুরুবিবর মতো দর্শন ঝাড়ল। 'তাই তাদের সবকিছু জানানো জরুরি নয়। তাছাড়া আমি তো কোনো ভুল কাজ করিনি। আমি বিজনেস করেছি। আমরা সবাই নিজেদের ইচ্ছায় সমস্ত জিনিস বিনিময় করেছি। তাই মা-বাবা যদি জেনেও যান, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।' হামিন তাকে বলল। রাইসা সন্তুষ্ট হলো কি না বোঝা গেল না, তবে চুপ করে গেল। এটি ছিল হামিনের গোপন কথা, তা কারও সঙ্গে শেয়ার করার অনুমতি নেই। তখনই শেষবারের মতো এ বিষয়ে তাদের আলোচনা হয়।

রাইসা ভেবেছিল, এটাই হয়তো তার শেষ বিজনেস ডিল। এর পরে সে এমন কিছু করবে না। হামিন নিজেও এটাই ভেবেছিল। কিন্তু এই বিজনেস ডিলের এক সপ্তাহ পর, সেই এগারো জনের একজন এসে তার কাছে হাজির। এসেই বলল, ওই ক্লাসেরই একটি ছেলের চশমা লাগবে তার। তোমাকে এই ডিলটি করে দিতে হবে। বিনিময়ে তোমাকে পাঁচ ডলার দেওয়া হবে। অঙ্কটা বড় ছিল না। কিন্তু হামিন এই প্রলোভনের সামনে টিকতে পারল না। আবারও সে একটি পূর্ণাঙ্গ বিনিময় চেইনের মাধ্যমে সেই ব্র্যান্ডেড সানগ্লাসটি তার ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করে দিল। এবং হাতে পেল পাঁচ ডলার। এটি ছিল তার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই বিষয়টিও রাইসা জানত। এবারও সে এই কাজে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু হামিনের তাতে কোনো লজ্জার অনুভূতি ছিল না। বিজনেসটি ধীরে ধীরে তার ক্লাসের গাঙি পেরিয়ে পুরো স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল। স্কুলে সবাই এটি পছন্দও করল। কয়েক মাসের মধ্যেই সবাই জেনে গেল, কারও কোনো জিনিস পছন্দ হলে, সেটা পাওয়ার একমাত্র ডিলার হামিন সিকান্দার।



হামিন সিকান্দার নিজেও বুঝতে পারেনি, এক জোড়া স্নিকার্সের জন্য শুরু করা এই বিজনেস কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে হামিন এই বিজনেস থেকে প্রায় ১৭৫ ডলার উপার্জন করে ফেলল। এর সঙ্গে কয়েকটি জিনিসও হস্তগত হলো। রাইসা তার প্রতিটি লেনদেন সম্পর্কে জানত। এবং প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্টচিন্তাও বেড়ে চলছিল। হামিনের কাছে এখন টাকা আছে। নিজের উপার্জিত টাকা। বাবা-মায়ের থেকে নিতে হয়নি। সেই সাথে তার হাতে এমন কিছু জিনিসও ছিল, যেগুলোর মালিক অন্য কেউ। এই বিষয়টি রাইসাকে বেশ চিন্তিত করছিল। হামিনের মুখে এসবের যথাযথ উত্তর শোনার পরেও রাইসা সন্তুষ্ট হয়নি। বাবা-মায়ের অলঙ্কে এই 'বিজনেসটি' সে হজম করতে পারছিল না। আবার অন্যের জিনিস হামিন কবজা করে বসেছিল, এও সে মানতে পারছিল না।

তারপর একদিন একটি দামি গেম বিনিময় হলো। রাইসা তখন সিদ্ধান্ত নিল, হামিন কোনো বিপদে পড়ার আগেই বাবা-মাকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে আর তা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। অবশেষে তা স্কুলের শিক্ষকের মাধ্যমেই প্রকাশ্যে এলো।

অভিযোগ শুনে, সালার কিংবা ইমামা কেউই তাকে স্কুলেই কিছু বলল না। বাড়িতে বসে এ নিয়ে আলোচনা হবে বলে বিদায় নিয়ে চলে এলো। কিন্তু হামিন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে আর রাইসা এক স্কুলে; জিবরিল ও ইনায়া অন্য স্কুলে। তাই এই গোপন কথা কেবল রাইসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আর নয়তো স্কুলের কোনো না কোনো ছাত্রের মাধ্যমে এই কথা জিবরিল বা ইনায়ার কানেও পৌঁছে যেত। ছুটির পর হামিন রাইসাকে তার আসন্ন বিপদের কথা বলল। রাইসা ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল, ওয়ার্নিং লেটার! তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, হামিনের এমন কোনো বিপদ হতে পারে!

: আমি তোমাকে কতবার বারণ করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনোনি।

: 'এমনটা হবে আমি ভাবিনি।' তারা এখন স্কুল বাসে না চড়ে সেই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত হয়ে আছে।

: 'মান্নি-পাপা কি খুব খেপে আছেন?' রাইসা তাকে জিজ্ঞেস করল। 'তোমাকে কি খুব বকেছেন?'

: 'না, এখানে তো বকেননি, কিন্তু বাড়ি গিয়ে বকবেন। বাবা বলেছেন, বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে জরুরি কথা বলবেন।' হামিনের চেহারায় দুশ্চিন্তা ফুটে আছে।

: 'তারা কি তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেবেন?' রাইসা উদ্বেগে হলো।

: 'না, এমনটা হবে না। বাবা তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা মেনেও নিয়েছেন।' হামিন তাকে জানাল।

: 'কী দুঃখজনক ব্যাপার! বাবার কত খারাপ লেগেছে। তিনি খুব লজ্জা পেয়েছেন, আর মান্নিও পাচ্ছেন, আমি জানি।' রাইসার আফসোস আরও বেড়ে গেল। হামিন কিছুটা বিচলিত হলো। নিজের মা-বাবাকে এমন অস্বস্তিতে পড়তে এই প্রথম দেখল সে। তাও আবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে। এটি তার কাছেও মোটেও ভালো লাগছিল না।

: তোমার এটা করা উচিত হয়নি, হামিন!

: 'জানি, কিন্তু এখন কী হবে?' সে যেন রাইসার কাছে পরামর্শ চাইল। যখন তার সব উপায় শেষ হয়ে যায়, তখন সে রাইসার মতামত নেয়। সেই মতামত তার বোধগম্য হোক বা না হোক, সে সেটার ওপর আমল করুক বা না করুক-তবু সে নেয়। খুব ছোট থেকেই সে তার কাছে এভাবে মতামত জিজ্ঞেস করে।

রাইসার মুখে বুলি ফোটানোর জন্য তারা সব ভাই-বোনই এটা করত। তাকে কথা বলতে উৎসাহিত করত।

: 'মান্নি-পাপার কাছে তোমার সরি বলা উচিত।' রাইসা তাকে পরামর্শ দিল। 'কোনো ভুল হয়ে গেলে সবার আগে এটাই করা উচিত।' এবার সে তার বাবা-মায়ের উপদেশ পুনরাবৃত্তি করল।

: 'এক্কিউজ তো আমি আগেই চেয়েছি। কিন্তু বাড়ি যেতে যেতে কি তাদের রাগ ঠান্ডা হবে?' হামিন এবার কিছুটা সাবধানি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমার মনে হয় না এমন হবে।' রাইসা একেবারে সঠিক অনুমান করল।

: 'আচ্ছা।' হামিনের নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও একই কথা বলল। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, এই সমস্যার সমাধান কী হবে।

ইমামা ও সালার সেই ওয়ার্নিং লেটার নিয়ে বাড়ি ফিরল। তাদেরকে এখন সেই ওয়ার্নিং লেটারের জবাব দিতে হবে। স্কুল প্রশাসন হামিনের অতীত ও বর্তমান কৃতিত্বের জন্য তার এই প্রথম বড় 'অপরাধ' ক্ষমা করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে আছে। তাদের কোনো সন্তানের কখনো যদি ছোটখাটো কোনো অভিযোগ এসে থাকে, তবে সে ছিল হামিন। তা সত্ত্বেও, হামিন কখনো এমন কোনো কাণ্ড করেনি, যার জন্য তাদেরকে এভাবে স্কুলে ডেকে ওয়ার্নিং লেটার ধরিয়ে দিবে। কিন্তু এখন যে কাণ্ডটি করেছে, তা তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। হামিন যদি ওখানে তাদের সামনে স্বীকার না করত, তবে তারা কখনো বিশ্বাসই করত না, হামিন স্কুলে বিজনেস টাইপের কিছু করতে পারে-তাও আবার এই ধরনের বিজনেস!

তার কী দরকার পড়েছিল এটা করার? এর উদ্দেশ্যই-বা কী ছিল? তারা সত্যিই তা বুঝতে পারছে না।

: 'জিবরিল ও ইনাযাকে এই বিষয়ে জানানো যাবে না।' সালার ইমামাকে বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিল।

: 'আর রাইসাকে?' ইমামা বিড়বিড় করে দ্বিতীয় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।

: তার সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

স্কুল থেকে ফিরে হামিন যতটা গম্ভীর হয়ে আছে, তার চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে আছে ইমামা। প্রতিদিনের উৎসাহী সালামের জবাব সালামে পেল না। হামিনও প্রতিদিনের মতো তার কাছে গিয়ে শোয়নি। ইমামাও তাকে কাছে ডাকেনি। এই শীতল ব্যবহার হামিনের সাথে সাথে রাইসার সঙ্গেও করা হচ্ছে। খাবার খাওয়ার সময় ইমামা তাদের কিছু বলল না। তারা দুজনেই এখন চিন্তিত। সালার বাসায় নেই। হামিন বুঝতে পারছিল, সালার বাসায় ফেরার পর এই নীরবতা আর নীরব থাকবে না।

রাতের খাবার শেষ হয়েছে। বাকিদের রুমে পাঠিয়ে দিয়ে, হামিন ও রাইসাকে সেখানে বসতে বলল সালার। দুজনেই সালারের সামনে সোফায় বসে আছে, মাথা নিচু করে নিজেদের হাতের দিকে তাকিয়ে। অন্য কোনো সময় হলে হামিনকে এতটা নীরব ও গম্ভীর দেখতে পেত না।

: 'তুমি এসব জানতে, তাই না রাইসা?' সালার রাইসাকে লক্ষ করে বলল। সে মাথা তুলল। হামিনের দিকে তাকাল, তারপর কিছুটা লজ্জাবনত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

: 'তুমি আমাকে এটাই বলতে চেয়েছিলে?' এই প্রশ্নে এবার হামিন চমকে রাইসার দিকে তাকাল। রাইসা তার দৃষ্টি উপেক্ষা করে আবারও মাথা নাড়ল।

: 'তুমি আমাকে খুব হতাশ করলে।' উত্তরে সালার রাইসাকে বলল।

: 'বাবা, আই অ্যাম সরি।' রাইসা কিছুটা কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলল।

: 'এটা ক্ষমাযোগ্য নয়।' সালার উত্তর দিল।

: 'বাবা! এতে রাইসার কোনো দোষ নেই।' হামিন তার পক্ষ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল। সালার তাকে কঠোরভাবে ধমক দিল, 'শাট আপ!'

হামিন ও রাইসা দুজনেই নির্বাক হয়ে গেল। সালারের মুখ থেকে এমন শব্দ এবং এমন প্রতিক্রিয়া এই প্রথম তারা দেখল।

: 'তুমি এবার এখান থেকে যাও।' সালার আদেশের ভঙ্গিতে রাইসাকে বলল। তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠছে। সালার বুঝতে

পারছে, এখনই সে কেঁদে ফেলবে। তবু সালার এখন তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে চাইল না। রাইসা চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল। ওখানে এখন শুধু বাপ-বেটা দুজন বসে আছে।

: 'তোমাকে কি স্কুলে বিজনেস করতে পাঠানো হয়েছে?'
সালার তার সাথে কথা শুরু করল।

: 'না।' হামিন অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে, চোখ লুকিয়ে জবাব দিল।

: 'তাহলে কী কাজে পাঠানো হয়েছে?' সালার তাকে পরের প্রশ্ন করল।

: 'পড়াশোনা করতে।' হামিনের মাথা এখনো নিচু।

: 'এটাই তোমার পড়াশোনা?' সালার ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বলল।

: 'বাবা, আমি যা করেছি, আপনাকে জিজ্ঞেস করেই করেছি।'
হামিন হুট করে বলে উঠল।

: 'বিজনেসের ব্যাপারে তুমি আমাকে কী জিজ্ঞেস করেছিলে?'
সালারের হঠাৎ কয়েক মাস আগের সেই কথোপকথনটি মনে
পড়ে গেল। হামিন তখন এক রাতে বেশ সিরিয়াস হয়ে তার
সঙ্গে বিজনেস নিয়ে আলোচনা শুরু করে। সালার তখন তার
কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হামিনের প্রশ্নগুলোকে
সে নিছক শিশুমনের কৌতূহল মনে করেছিল। সে সব বিষয়েই
এমন কৌতূহল দেখায়।

: 'বাবা! আমরা যদি কোনো জিনিস পেতে চাই, তাহলে সেটা
কীভাবে পাব?' প্রশ্নটি এত সাধারণ ছিল যে, সালার অবাক না
হয়ে পারল না। হামিন সাধারণত এত সহজ প্রশ্ন করে না।

: 'যেমন, কী পেতে চাও?' উত্তরে সালার জিজ্ঞেস করল।

: যেকোনো জিনিস। এমন জিনিস যা অন্যের কাছে আছে, কিন্তু আমাদের ভালো লাগে। সেটা কীভাবে নেব?

: 'নেওয়াটা কি জরুরি?' সালার ল্যাপটপে কাজ করতে করতে জিজ্ঞেস করল।

: 'বহুত জরুরি।' সে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

: 'পরিশ্রম করে সেই জিনিস কিনে নাও।' এই উত্তর দেওয়ার সময় সালার বুঝতে পারেনি যে, সে তাকে পথ দেখাচ্ছে। হামিন চিন্তা করতে লাগল।

: 'মানে, বিজনেস করতে হবে?' সালারকে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'স্পষ্টতই।' সালার জবাব দিল।

: 'আর বিজনেস কীভাবে করে?' হামিন পালটা জিজ্ঞেস করল।

: 'বিজনেস করে প্ল্যান করে।' সালার আপন কাজে ব্যস্ত হয়েই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগল। সেগুলোর ধরন বা উদ্দেশ্য নিয়ে মাথা ঘামাল না।

: সেটা কীভাবে তৈরি করে?

: সবার আগে ঠিক করতে হয়, কীসের বিজনেস করবে।

: এরপর?

: এরপর এতে পুঁজি খাটাতে হয়।

: 'যদি সেটা না থাকে?' হামিন জিজ্ঞেস করল।

: তাহলে এমন কৌশল তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে কোনো অংশীদারকে যুক্ত করে পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা যায়।

: 'ওকে। তাহলে বিজনেসে কৌশল দরকার, তারপর অংশীদার। এরপর?' সে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল।

: 'যা পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা যেন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং সময়মতো হয়।' একটি বিজনেস প্ল্যান যতটা সরলভাবে তাকে বোঝানো সম্ভব, ততটা বোঝাল। 'আর সবশেষে ক্লায়েন্টকে সন্তুষ্ট করতে হয়, যাতে তুমি আরও ক্লায়েন্ট পেতে পারো।'

: 'ওকে।' হামিন এই নীতিটিও বুঝতে পারল।

সালার কল্পনাও করেনি, যা কিছু সে বলল, তা সে কোথায় এবং কীভাবে প্রয়োগ করবে। সালার অনেকক্ষণ তার এই নয় বছরের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইল, যার চেহারার নিষ্পাপতা দেখে এখনো অনুমান করা কঠিন যে, সে কখনো কোনো ভুল কাজ করতে পারে! : 'আমি খুশি হইনি।' সালার তাকে বলল।



সরিতে কোনো লজ্জা নেই। আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা সবসময়
পছন্দনায় নয়। এই মুহূর্তে : 'আই অ্যাম সরি।' উত্তর খুব দ্রুত
এলো। কিন্তু সালার উপলব্ধি করল, এই সালারের সঙ্গেও সেটিই
ঘটছে।

: এসব করার প্রয়োজন কেন হলো তোমার?

হামিন অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি গভীর শ্বাস নিল। তারপর সে
স্নিকার্সের জন্য শুরু করা সেই বিজনেসের ইতিবৃত্ত বিস্তারিত
বলতে শুরু করল।

সালার তাকে বাধা দিল না। চুপচাপ তার কথা শুনতে থাকল।
হামিনও কিছুই লুকাল না। স্কুলে বাবা-মা'কে লজ্জিত হতে
দেখে সবকিছু সত্যি সত্যি বলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে।
হামিন তার কথা শেষ করল। সালার এবার তাকে জিজ্ঞেস

করল, 'সবার থেকে স্বাক্ষর নেওয়া সেই চুক্তিপত্রগুলো কোথায়?'

হামিন উঠে রুমে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি ফাইল নিয়ে ফিরে এলো। ফাইলটি সে সালারের দিকে এগিয়ে দিল। সালার ফাইলটি খুলে তার ভেতরের চুক্তির ধারাগুলোতে চোখ বোলাল।

: 'কে লিখেছে এগুলো?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি নিজে।' হামিন জবাব দিল।

সালার চুক্তিপত্রটি পড়তে শুরু করল। নয় বছর বয়সি একটি শিশু, এই চুক্তিতে সেই সকল ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছে-যা তার মাথায় এসেছে এবং তার কাছে জরুরি মনে হয়েছে। সালার মুগ্ধ না হয়ে পারল না। চুক্তির ভাষা শিশুসুলভ, কিন্তু এর ধারাগুলো পূর্ণবয়স্ক। এই চুক্তির মাধ্যমে হামিন নিজেকে

সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করে নিয়েছিল। তবে তার দুর্ভাগ্য হলো, সে শিশুদের সঙ্গে ডিল করেছে। এবং শিশুদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। তাদের মন যেকোনো সময় পালটে যায়। চুক্তিতে কিছু যায়-আসে না।

সালার ফাইল বন্ধ করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সবার কাছে থেকে যে টাকা নিয়েছ, তা কোথায়?'

: 'আমার কাছে।' হামিন উত্তর দিল।

: 'কিছু কি খরচ করেছ?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'না।' সে বলল।

এরপর সালার মাথা নাড়ল। তারপর ফাইলটি তার হাতে দিতে দিতে বলল, এবার তুমি আরেকটি চিঠি লিখবে। সেই চিঠিতে তুমি তোমার সব ক্লায়েন্টের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এবং

তোমার কাছে থাকা তাদের টাকা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেবে।
এরপর তোমরা সেই সব জিনিসও একে অপরকে ফিরিয়ে
দেবে, যা তোমরা বিনিময় করেছ।

হামিন কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল। তারপর মাথা নাড়ল।

: 'ওকে। কিন্তু আমি এটা কীভাবে করব?' সালারকে সে
জিজ্ঞেস করল।

: 'তুমি একজন বিসজেনম্যান। এই বিজনেস যেহেতু করতে
পেরেছ, তাহলে এটাও তোমাকে পারতে হবে।' সালার উঠে
দাঁড়াল। 'তোমার এই কাজ সম্পন্ন হলে, আমরা আবার কথা
বলব। এর জন্য তোমার কাছে এক সপ্তাহ সময় আছে।'

হামিন চলে-যাওয়া বাবার পিঠের দিকে তাকাল। বাবা তাকে যে
কাজটি করতে বলে গেল, তা ছিল ভীষণ লজ্জাজনক। প্রতিটি
ছাত্রের কাছে গিয়ে সরি বলে, তাদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়াটা

কঠিন কিছু নয়। সে জানে, সবাই যার যার টাকা খুশিমনে ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, যার যার জিনিস তার তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। বাসায় বসেই সে আন্দাজ করতে পারছে, কোনো ছেলেই খুশিমনে তাদের কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো হাতে পেয়ে পুনরায় ফেরত দিবে না। আবার সবাই সেই জিনিসগুলো ঠিকঠাক রেখেছে কি না, তা নিয়েও রয়েছে তুমুল সন্দেহ। এমনকি তার নেওয়া স্নিকার্সগুলোও খেলাধুলা করে এখন পুরোনো হয়ে গেছে। এখানে বসে বসেই তার মনে হচ্ছে, বাবা তাকে এক মহাবিপদে ফেলে গেছে।

: 'বাবার কাছে তুমি আমার ব্যাপারে কেন কথা বলেছিলে?'
পরের দিন সকালে স্কুল বাসে হামিন রাইসাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি কিছু বলিনি, কিন্তু তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম।'
রাইসা উত্তরে

বলল।



: 'যদি তুমি বলে দিতে, তাহলে আমি আর তোমার সঙ্গে কথাই বলতাম না।' হামিন তাকে বলল।

: 'বাবা কি তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন?' রাইসা তার দুশ্চিন্তার বিষয়টি বলল।

: 'বাবা আমাকে সবার জিনিসপত্র এবং টাকা ফেরত দিয়ে দিতে বলেছেন। এরপর তিনি আমার সঙ্গে আবার কথা বলবেন।' রাইসার কাছে হামিনকে বেশ গম্ভীর এবং কিছুটা চিন্তিত মনে হলো।

: 'আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' হামিনকে সে প্রস্তাব দিল।

: 'না, আমি ম্যানেজ করে নিব।' উত্তরে সে বলল। এই বিজনেসের পরের অভিজ্ঞতাটি ছিল হামিন সিকান্দারের

জীবনের সবচেয়ে পছন্দের জিনিস নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং সেই পরিমাণে তাদের লোভী করে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। একজন সেরা ছাত্র হিসেবে স্কুলের বাচ্চাদেরকে, তাদের জিনিস। কিন্তু খুশিমনে তাদের প্রিয় জিনিসটি ফেরত দিয়ে দেওয়া-তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক জিনিস। সেই প্রিয় জিনিসটি ফেরত দিতে হামিন সিকান্দার বলুক বা তোলা যে, তারা চোখ বন্ধ করে তাদের পছন্দের জিনিসের পিছু ছুটবে- এটা এক অন্য কেউ তাতে তাদের কিছু যায়-আসে না। কারও কথায় তারা সেটা ফেরত দিবেও না। এটা বলাতে সেই সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল ক্লায়েন্টরাই এখন তাকে সাত আসমান থেকে টেনে আবার নিচে নামিয়ে ফেলল।

হামিন এক সপ্তাহের জায়গায় একদিনে কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরের দিনই সে বুঝতে পারল, সালার কেন তাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিল। একদিন কেন নয়। পরের দিন স্কুলে, হামিন সিকান্দার সেই বিজনেসের চুক্তিগুণে শেষ করতে গিয়ে এই প্রথম স্কুলের সবার কাছে অপছন্দনীয় ছাত্রের



মর্যাদা পেল। সাফল্য মানুষকে একটি শিক্ষা দেয়, আর ব্যর্থতা দেয় দশটি। হামিন সিকান্দার পেয়েছিল পনেরোটি।

: বাবা, আই অ্যাম সরি!

রাইসা সাইকেল চালাচ্ছিল। গাড়ি থেকে সালারকে নামতে দেখে সে তার কাছে ছুটে এলো। রাইসা সালারের দেওয়া সেই বকা, এখনো হজম করতে পারছিল না।

গাড়ির দরজা খুলে সিটে বসেই সালার তার এই পালিত কন্যাটির দিকে তাকাল। যে মেয়েটি বিড়াল ছানার মতো তার মা-বাবার চারপাশে ঘুরঘুর করত।

: 'তুমি জানো তুমি কী ভুল করেছ?' একদিন চুপ থাকার পর সালার তাকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিল।

: 'ইয়েস... আমার উচিত ছিল আপনাকে আর মাকে সবকিছু বলে দেওয়া।' রাইসা তার চশমা ঠিক করতে করতে মাথা নিচু করে বলল।

: 'আর?' সালার আরও জানতে চাইল।

: 'আর আমার উচিত হয়নি হামিনকে সাপোর্ট করা। কিন্তু বাবা, আমি তো তাকে কখনো সাপোর্ট করিনি।' রাইসা প্রথম বাক্যটি বলার পরই নিজেকে সংশোধন করল।

: 'তুমি চুপ থেকে তাকে সাপোর্ট করেছ।' সালার বলল।

: 'বাবা, আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে কনভেন্স করে ফেলেছিল।' রাইসা তার অপারগতার বিশদ ব্যাখ্যা দিল।

: সে যদি তোমাকে কনভেন্স করেই ফেলে, তবে তুমি কেন আমাকে হামিনের ব্যাপারে বলতে চেয়েছিলে?

এবার রাইসা কোনো উত্তর করল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। সালার তার হাত নিজের হাতে নিল। তারপর বলল, তুমি কনভেন্সই হওনি। তোমার মনে হয়েছিল, হামিন ঠিক কাজ করছে না।

রাইসা মাথা নিচু করেই সালারের কথায় সাঁয় দিল।

'এটা আরও খারাপ করেছে। তুমি জানতে সে ভুল কাজ করেছে, তবু তুমি তাকে করতে দিয়েছ, গোপন রেখেছ।'

: 'বাবা! আমি বলে দিলে সে আমার ওপর রাগ করত।' রাইসা বলল।

: 'তাতে কী হতো?' সালার একই গম্ভীরতায় বলল।

: 'আমি তাকে নারাজ করতে পারি না।' সে এবার খানিক অসহায়ভাবে বলল।

: 'সে রাগ করলে এখনে চেয়ে বেশি ভালো হতো। এখন তো তাকে বিড়ম্বনা পোহাতে হবে। তা কি তুমি বুঝতে পারছ? স্কুলে তাকে কতটা লজ্জা পেতে হবে?'

রাইসা আবারও মাথা নাড়ল।

'সে তোমার ভাই, তোমার বন্ধু। আমি জানি, তুমি তাকে খুব ভালোবাসো। কিন্তু কেউ যদি আমাদের প্রিয় হয়, তবে তার ভুল আমাদের প্রিয় হওয়া উচিত নয়।' রাইসাকে সে সহজ ও সরল ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করল। সে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনছিল, আর কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছিল। সালার চুপ করলে রাইসা মাথা তুলে তার দিকে তাকাল।

: আমি কি এখনো আপনার ভালো মেয়ে আছি, বাবা?



সালার তাকে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিল। তার মাথায় চুমু খেলো।

: হ্যাঁ।

রাইসা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সে এমনই-ছোট কোনো কথায় অস্থির হয়ে যায়, আবার ছোট কোনো কথাতেই খুশি হয়ে ওঠে। রাইসা এবার গাড়ির পেছনের সিট থেকে সালারের ব্রিফকেস বের করতে লাগল। জানালা দিয়ে ইনায়া এরিককে দেখতে পেল। তারপর দেখতেই থাকল। দিনটি ছিল ছুটির দিন। একটু আগে ইনায়া রান্নাঘরের সিঙ্ক থেকে কিছু ছোট ইনডোর প্ল্যাণ্টে পানি দিয়ে, সেগুলো এখন এনে এনে জানালায় রাখছিল। ঠিক তখনই সে এরিককে তার বাসা থেকে বের হতে দেখল। ইনায়া যেন স্থবির হয়ে গেল।

সে একাই এভাবে এরিকের দিকে তাকিয়ে নেই। আরও অনেকেই তাকিয়ে আছে তার দিকে। এরিক এতক্ষণে কলোনির চিপা গলিতে চলে এসেছে। এ পথে কদাচিৎ দুয়েকটি গাড়ি যাচ্ছে আর ফুটপাথে কিছু মানুষ তাদের কুকুর-বিড়াল হাঁটাচ্ছে। তারা সবাই এরিকের দিকে তাকিয়ে আছে। ইনায়াকে এতক্ষণ জানালায় ঊঁকি দিতে দেখে, রান্নাঘর থেকে ইমামা তাকে ডাকল। ইনায়া গভীর মগ্নতায় মায়ের ডাক শুনতে পেল না। ফলে ইমামা নিজেই রান্নাঘর থেকে বসার ঘরের জানালায় চলে এলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই, সেও ইনায়ার মতো থমকে গেল।

এরিক তার চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কাঁকড়ার মতো করে হাঁটছে। চতুষ্পদ জন্তুর মতো সে হাঁটছে না; সে হাঁটছে পিঠে ভর করে, পেটখানা ঊঁচু করে। দুই হাতের উপর শরীরের উপরের অংশ আর পা দুটো উপরে তুলে, হাঁটতে ভর করে। প্রচণ্ড কষ্টে সে হাঁটছে, বরং বলা ভালো হামাগুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু থামছে না। অত্যন্ত সাবলীলভাবে এদিক থেকে ওদিকে আহ্লাদি

পদচারণা করছে। যেন এটাই তার হাঁটার স্বাভাবিক পদ্ধতি।
ক্লান্ত হতেই সে একটু শ্বাস নিয়ে আবারও হাঁটা শুরু করছে।

: 'এ কী করছে?' ইনায়া এবার কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে ইমামাকে
জিজ্ঞেস করল। ইমামাও হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে
আছে।

: জানি না।

: 'এ কি হাঁটতে পারে না?' ইনায়া চিন্তিত হলো।

: 'জানি না।' ইমামা এছাড়া আর কী উত্তর দিবে!

: 'জিবরিল! তুমি একটু গিয়ে ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'
জিবরিল উপরের তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল। ইমামা
তার পায়ের শব্দ শুনে ঘোরে তাকে দেখে বলল।

: 'কাকে?' জিবরিল জবাবে জানালার কাছে আসতে আসতে বলল। ইমামাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো না। এরিককে দেখেই সে উত্তর পেয়ে গেল। তারপর না দাঁড়িয়ে বাইরে চলে গেল। এরিক এখনো কাঁকড়া সেজে তাদের বাড়ির সামনে এদিক থেকে ওদিক পদচারণা করছে। জিবরিলকে দেখেও সে খামল না। তাকে উপেক্ষা করে আগের মতোই হাঁটতে থাকল।

: 'হ্যালো!' জিবরিল তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তাকে বলল। তার লাল বর্ণ, ঘন নিশ্বাস আর কপালে চমকানো ঘাম দেখে জিবরিল বুঝতে পারছে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হেঁটেই চলছে। নিজের ওপর জুলুম করছে।

: 'হ্যালো...!' সেও জিবরিলের 'হ্যালো'র উত্তর তেমনই উৎসাহী, কিন্তু ক্লান্ত ভঙ্গিতে দিল।

: 'এটা কি কোনো নতুন ব্যায়াম?' জিবরিল তার সাথে হালকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

: 'না' এরিক জবাব দিল। 'আমি একটা কাঁকড়া, আর কাঁকড়ারা এভাবেই হাঁটে।' এরিক এবার তার দিকে না তাকিয়ে বলল।

: 'ওহ! আই সি!' জিবরিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল। 'আর এই পরিবর্তন কখন এলো? শেষবার যখন আমি তোমাকে দেখেছিলাম, তখন তো তুমি মানুষ ছিলে।' জিবরিল তার সাথে এমনভাবে কথা বলছিল, যেন সে তার কথা বিশ্বাস করেছে।

: 'এটা আজ রাতে এসেছে।' এরিক বড় বড় নিশ্বাস ফেলে বলল।

: 'কাঁকড়ারা মাঝে মাঝে থেমে আরামও করে, তুমি করবে না?' জিবরিল অবশেষে তাকে পরামর্শের ভঙ্গিতে বলল। এরিকের কাছে এটা দুবস্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো মনে

হলো। সে ধসে পড়ার মতো করে ফুটপাথের ওপর চিৎ হয়ে
শুয়ে পড়ল।

: 'ওহ! ইয়েস... আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ভালো হলো
তুমি মনে করিয়ে দিলো।' সে জিবরিলের পায়ের কাছে শুয়ে
শুয়ে বলল।

: 'ডোন্ট মাইন্ড, কাঁকড়ারা এত পরিশ্রম করার পর খাওয়া-
দাওয়াও করে।' জিবরিল তাকে পরের কথাটি মনে করিয়ে দিল।

: 'আ...হ্যাঁ... আমারও কিছু খেতে হবে।' তার মুখে শুনে
এরিকের ক্ষুধা যেন চাগাড় দিয়ে উঠল। তার হাত-পা-কোমর
যেন অবশ্য হয়ে আসছে।

: 'আমাদের বাড়িতে কাঁকড়াদের জন্য কিছু খাবার আছে। যদি
তোমার আগ্রহ থাকে, তবে তুমি গিয়ে খেতে পারো।' জিবরিল
অবশেষে তাকে বলল। ইমামা তাকে ডাকছে, এ কথা সে

সরাসরি বলল না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।' এরিক চিন্তায় মগ্ন হলো। জিবরিল মাথা তুলে বাসার জানালার দিকে তাকাল। ইমামা এবং ইনায়া এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

: 'তবে বাধ্যবাধকতার কোনো ব্যাপার নেই। যদি তুমি না আসতে চাও, তাতেও ঠিক আছে।' এই বলে জিবরিল পা বাড়াল। এরিক সঙ্গে সঙ্গে আবারও কাঁকড়ার মতো হয়ে, তার সাথে হাঁটতে শুরু করল। জিবরিল থামল, অত্যন্ত মার্জিতভাবে বলল, তুমি যদি কিছুক্ষণে জন্য আবার মানুষ হও, আমার ভালো লাগবে। আমার মা আর বোন কাঁকড়াদের খুব ভয় পান। তাদের ভয় দূর করতে যে কাঁকড়াই আমার চোখে পড়ে, তা মেরে ফেলতে হয়।' মজার কথাটি সে গুরুত্বসহকারে বলল। এরিকও ঠিক বুঝে ফেলল সে মূলত কী বলতে চাচ্ছে। তাই সে থেমে, উঠে বসল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

জিবরিলের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় সে ইমামা ও ইনায়ার বিস্মিত দৃষ্টি অনুভব করল। তবু সে নিশ্চিত হয়ে আছে।



: 'এরিকা তুমি বাইরে কী করছিলে?' সে ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইনায়া তাকে প্রশ্ন করল। উত্তরে সে হাসল, বিজয়ীর ভঙ্গিতে। যেন যা চেয়েছিল, তা-ই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

: 'এ এরিক নয়, এ কাঁকড়া।' জিবরিল তার পরিচয় করাল। 'তাকে এ নামে ডাকলেই সে খুশি হবে।' সে জিবরিলের পরিচয় করানোকেও উপেক্ষা করল। সোজা কিচেন কাউন্টারের কাছের একটি টুলে গিয়ে বসে পড়ল।

: 'এতদিন তুমি আসোনি কেন?' ইমামা আলোচনার মোড় ঘোরানোর চেষ্টা করল। ইমামা বুঝতে পারছিল, এমনকি ইনায়া আর জিবরিলও যে-সে কেন তাদের বাড়ির বাইরে কাঁকড়া সেজে ঘোরাঘুরি করছিল।

: 'ব্যস্ত ছিলাম।' এরিক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। সে এখন তার ব্যথাতুর হাত ও কবজি মালিশ করছে। জিবরিল ও ইনায়া ইশারায় ইমামাকে থামাল। তারা বুঝতে পারছিল, কাঁকড়া সেজে পনেরো মিনিট হাঁটাহাঁটির ফল এখন কী হতে চলেছে।

: 'তুমি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বোকাদের মতো কাজ করো।' ইনায়া তাকে বলল।

: 'তুমি কি সত্যিই এমনটা মনে করো?' এরিক তার মন্তব্যে যেন কিছুটা অস্থির হলো।

: হ্যাঁ, একদম।

এরিকের চেহারায় এবার খানিক হতাশা দেখা গেল।

'আমাদের বাসায় আসতে চাইলে, দরজায় এসে নক করলেই তো হতো! কাঁকড়া সেজে ঘোরাঘুরির কী দরকার ছিল। এভাবে

ঘুরতে দেখে আমরা তোমাকে গিয়ে টেনেবাসায় নিয়ে আসব,
এটাই তুমি চেয়েছিলে?' ইনায়া কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলল।
এরিকের মুখ লাল হয়ে গেল এবং এটি লজ্জায়।

: 'মিসেস সালার আমাকে পছন্দ করেন না।' তার কথার জবাবে
ইমামার দিকে তাকিয়ে বলল এরিক।

ইমামা যেন থমকে গেল। সে বুঝতে পারেনি, সেদিন তার
বোঝানোর ফলে এরিক এমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে!

: 'খুব ভালো কথা। সেটা তো আমাদের কেউই করে না। বিশেষ
করে আমি। But you are still welcome.' ইমামা উত্তর
করার আগেই, জিবরিল উত্তর দিয়ে বসল।

: 'তোমার ব্যাপারে আমারও একই ধারণা।' এরিকও তাকে কড়া
জবাব দিল।

: 'ওহ, সত্যিই?' জিবরিল এবার তাকে জ্বালাতন করার চেষ্টা করছে। সে জানে, কথাটি এরিকের খারাপ লেগেছে। এরিক সেই অভিমানী ভঙ্গিতেই বসে রইল। তবে এখানে, এই মানুষগুলোর কাছে এসে সে আবারও বরাবরের মতোই আনন্দিত ও প্রশান্ত। এই বাড়িতে একটি অদ্ভুত উষ্ণতা রয়েছে, যা সবার জন্য। এরিকও সেই কোমল উষ্ণতা অনুভব করে। সে এবার টুল ছেড়ে উঠে ইমামাকে বলল, মিসেস সালার! আমি কি ফ্রিজ থেকে কোনো ড্রিংকস নিতে পারি?

: 'না, শেষমেশ একটাই ছিল, সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি। চাইলে তুমি আমার এটা পান করতে পারো।' ইমামার আগে জিবরিল বলে উঠল। সে তার এক-দুই চুমুক খাওয়া ক্যানটি কিচেন কাউন্টারে রেখে, ভেতর ঘরের দিকে চলে গেল। ইনায়া লাউঞ্জ পরিষ্কারে ইমামাকে সাহায্য করছে। এরিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ক্যানটি তুলে এক নিশ্বাসে ঢকঢক করে শেষ করে ফেলল।

: 'যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আমি করতে পারি।' তাদেরকে বিভিন্ন জিনিস এদিক-ওদিক সরাতে দেখে এরিক প্রস্তাব করল।

: 'তোমার এই হাতে অন্তত দুদিন আর কিছু ওঠাতে পারবে না, সেই পরিস্থিতিতে নেই। তাই বিশ্রাম নাও। আমরা নিজেরাই করছি এরিক!' ইমামা উত্তরে বলল।

: 'আমার নাম এরিক নয়।' এরিক বেশ গম্ভীর হয়ে ইমামাকে বলল।

: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। তোমার নাম এখন ক্র্যাভ। মানে কাঁকড়া।' ইনায়া ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালাতে চালাতে ঠাট্টার সুরে বলল।

: আমার নাম আবদুল্লাহ।

ইমামা ও ইনায়া দুজনেই একসঙ্গে প্রথমে এরিকের দিকে, তারপর একে অপরের দিকে তাকাল। 'মানে কী?' ইমামা যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

: 'এখন আমার নাম এরিক নয়, আবদুল্লাহ।' এরিক তার বাক্যটি সেই একই গাভীরে পুনরাবৃত্তি করল।

: 'আবদুল্লাহ? কে পরিবর্তন করেছে তোমার নাম?' ইনায়াও মায়ের মতোই হতভম্ব।

: 'আমি নিজে।' এরিক গর্ব ভরে খালি ক্যানটি ডাস্টবিনে ছুড়ে দিতে দিতে বলল।

: 'এরিক খুব সুন্দর একটি নাম।' ইমামা বেশ গুরুত্বসহকারে বলল। 'কী বলো ইনায়া?' সেই সাথে সে ইনায়াকেও জিজ্ঞেস করল।

: 'আবদুল্লাহ আরও সুন্দর নাম, মান্নি!' ইনায়া মায়ের কথার সমর্থন করল না। বরং এমনভাবে বলল যে, আবদুল্লাহ শব্দের অর্থটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত সব নামই সুন্দর; এসব সে এরিকের সামনে ইমামাকে বলতে পারল না।

ইমামা ও সালার আমেরিকায় থাকলেও, ছেলেমেয়েকে দীন থেকে দূরে রাখেনি। বাবা-মায়ের চেয়েও এই কাজটি জিবরিল বেশি করে। সে বাকি তিনজনকে কুরআনের অনেক অনেক কথা বলে। গল্প শোনায়ে। দীনের ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি ও আমলদার হওয়া সত্ত্বেও, ইমামা তাদেরকে অন্যান্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে নিষেধ করে। সবাই তাদের মুসলিম হিসেবেই জানে। তাই তাদের আচরণে কাউকে কষ্ট দিয়ে নিজের মুসলিম পরিচয় ও ইসলামকে খাটো করতে চায় না।

: 'কিন্তু এরিকের আবদুল্লাহ হওয়ার প্রয়োজন কী?' ইমামা তার উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছে। তবু তাকে জিজ্ঞেস না করে পারল না। সেদিন যে বিষয়টি সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, আলোচনা আজ আবার সেখানে এসেই ঠেকল।

: 'কেন প্রয়োজন নেই?' এরিকও একই সুরে ইমামাকে জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ইমামার কাছে নেই।

: 'তোমার মা কি জানেন, তুমি নাম বদলে ফেলেছ?' ইনায়া তাকে এবার সহজ একটি প্রশ্ন করল।

: 'এখনো জানেন না, তবে আমি জানিয়ে দেব।' এরিক স্বাভাবিকভাবে বলল।

: 'এই নাম তুমি রাখলে কীভাবে?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: 'ইন্টারনেট থেকে খুঁজেছি।' এরিক নিশ্চিতভাবে বলল।

: 'এর মানে জানো?' ইমামা পরের প্রশ্ন করল।

: 'হ্যাঁ, আল্লাহর বান্দা।' সে ইমামাকে আবারও নিরুত্তর করে দিল। 'আমি চাই আপনারা এখন থেকে আমাকে আবদুল্লাহ বলেই ডাকেন।' এরিক তার পরের দাবিটি জানাল।

: 'এতে কী হবে?' এবার সে ইমামার প্রশ্নে চুপ হয়ে গেল। সত্যিই, এতে আর কী হবে? সে কিছুক্ষণ ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চুপচাপ দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। ইমামার এক অদ্ভুত কষ্ট হলো। সে জানালার ধারে গিয়ে বাইরে তাকাল। সে ভেবেছিল, এরিক হয়তো আবারও কাঁকড়া সেজে ফুটপাতে ঘোরাঘুরি করবে। কিন্তু না। সে আর এখন বাইরে নেই।

: 'আবদুল্লাহ খারাপ না।' ইনাযার গলা শুনে সে চমকে তাকাল। ইনাযা আবারও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালাতে শুরু করেছে। কিন্তু ইমামা এখন বিষণ্ণ।

: 'ইনাযা! সে এরিক। শুধু নাম বদলালেই আবদুল্লাহ হতে পারে না, বেটা।' ইমামা কথাটি বলা জরুরি মনে করল; কিন্তু এই বাক্যটির প্রতিধ্বনি তার মনে এক অদ্ভুত ভয় জোগাল। ইনাযা নীরব রইল।

০৯

সালার একে একে ফাইলের সবগুলো কাগজ দেখল। শেষ কাগজটি ফাইলে রেখে সামনে বসা হামিনের দিকে তাকাল। ফাইল বন্ধ করে সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল।

: তো, এই পুরো অভিজ্ঞতা থেকে তুমি কী শিখলে?



: 'অনেক কিছু।' হামিন গভীর শ্বাস নিয়ে বলল। সালার হাসি সংবরণ করল।

: মাত্র দুটো বলো।

: 'বাচ্চারা কখনো ভালো ক্লায়েন্ট হয় না।' সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল।

: 'আর?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: 'বিজনেস সহজ নয়।' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল।

: 'ঠিক বলেছ।' সালার সমর্থন করল। তারপর বলল, 'যে জিনিসই ভালো লাগুক না কেন, তা যদি অন্যের সম্পত্তি হয়, তাহলে সেটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং মোস্ট ফেভারিট হতে পারে না।'

সালার এবার ইচ্ছে করেই হামিনের চুক্তিপত্রে লেখা ব্যবসায়িক স্লোগানটি পুনরাবৃত্তি করল-'নিজের পছন্দের জিনিস অর্জন করুন!' এক মুহূর্তের জন্য এই স্লোগানটি তাকে চমকে দিয়েছিল। নয় বছর বয়সি একটা ছেলের এমন ব্যবসায়িক স্লোগান কীভাবে হতে পারে! 'আমাদের মোস্ট ফেভারিট জিনিস তা-ই, যা আমাদের কাছে আছে। এবং থাকা উচিত। অন্যের মোস্ট ফেভারিট জিনিস কেড়ে নেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই।' সে তার নয় বছরের ছেলেকে ব্যবসার কৌশল শেখাতে গিয়ে এখন নৈতিকতার পাঠ দিতে শুরু করেছে। এটা ভুল হচ্ছে, নাকি ঠিক? তা সে জানে না। তবে সে একজন বাবা। আর বাবা হয়ে তার নয় বছরের সন্তানকে এই শিক্ষা দিতে পারে না যে, ব্যবসায় কোনো নৈতিকতা নেই, কেবল টাকাই মুখ্য। বাকি সবকিছু তুচ্ছ।

: 'তুমি জানো, মানুষের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী জিনিস কী?'
সে হামিনকে জিজ্ঞেস করল।



: 'কী?' হামিন বলল।

: 'বুদ্ধি। যদি এর সঠিক ব্যবহার জানা থাকে।' সালার বলল। 'আর তুমি কি জানো, মানুষের কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক জিনিস কী?' সে আবার জিজ্ঞেস করল।

: 'কী?' হামিন আবার একই ভঙ্গিতে সাড়া দিল।

: বুদ্ধি! যদি এর সঠিক ব্যবহার না জানা থাকে। এর অপব্যবহার শুধু অন্যের নয়, নিজের ধ্বংসও ডেকে আনে।

হামিন জানে সালার কার বুদ্ধির কথা বলছে। সে মূলত নিজের কথাই বলছে। তারা পৃথিবীর অসম্ভব বুদ্ধিমান দুই মস্তিষ্ক। কেবল বাপ-বেটাই নয়। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সে সুদমুগ্ধ ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করেছিল। এখন সেই কাঠামোর ভিত্তি মজবুত করে, তার ইমারত নির্মাণ করছে। সে ঝুঁকি নিয়েছে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। সে অভিনব পথ

আবিষ্কার করতে এবং গঠন করতে জানে। ব্রেইন টিউমারের সঙ্গে লড়াই করেও, সে তার জীবনের প্রতিটি দিনকে ক্রমাগত উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলছে। পুরো একটি জগৎ তাকে চেনে। একটি দুনিয়া তাকে মানে। সে যখন মঞ্চে কথা বলে, ফিনান্স জগতের গুরুরাও নীরব-নিশ্চুপ হয়ে তার কথা শোনে। জীবনে সে আর কোনো বড় সাফল্য অর্জন না করলেও, ফিনান্স-জগতে কিংবদন্তির মর্যাদা অর্জন করেছে।

হামিন সিকান্দার নয় বছরে একটি শিশু, যার প্রথম ব্যবসা কোনো বিনিয়োগ ছাড়াই কেবল Interpersonal Skills বা আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ঈর্ষণীয় সফলতার পরও, তিন মাসের মধ্যেই তা শুধু ভয়ংকরভাবে সলিলসমাধিই হলো না, সেই সঙ্গে স্কুলে তার পূর্ববর্তী নামডাকেরও জানাজা হলো। ১৭৫ ডলারের প্রতিটি পয়সা সবাইকে ফেরত দিয়ে দিল। শুধু মৌখিকভাবেই নয়; লিখিতভাবেও সবার কাছে ক্ষমা চাইল। এগুলো হামিন সিকান্দারের জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক মুহূর্ত। কয়েক দিন

আগের জাতীয় স্তরের স্টারডম মর্যাদা সে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খুইয়ে ফেলল। তবে এই পুরো অভিজ্ঞতা হামিন সিকান্দারকে প্রথমবারের মতো খানিক সচেতন করে দিল। তাকে ভাবতে বাধ্য করল।

সেই রাতে সে তার বাবাকে একটি কথা বলেনি, তা হলো- জীবনে সে ব্যবসাই করবে। বাবার চেয়েও বড় এবং সফল নামডাক গড়বে। সে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনী। হামিন সিকান্দার এই স্বপ্ন জেগে জেগেই দেখেছিল, ক্লাসমেটদেরকে তাদের টাকা ফেরত দিতে দিতে। এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সে কীভাবে করবে, তা এখন তাকে ভাবতে হবে।

: মান্নি! আমি কুরআন পড়তে চাই।

অনেক দিন পর এরিক আজ তার পরিবারের সঙ্গে ডিনার করতে বসেছে। ক্যারোলিনের বয়ফ্রেন্ড রালফও তাদের সঙ্গেই। তখন এরিক হঠাৎ এই বিষয়টি তুলল।

: 'সেটা কী?' হুট করে ক্যারোলিন বুঝে উঠতে পারল না, এরিক মূলত কী পড়তে চাইছে।

: 'মুসলিমদের পবিত্র কিতাব। ইনায়ারা যেটা পড়ে।' মাকে বুঝিয়ে বলল সে। ক্যারোলিনের বয়স্ফ্রেন্ড রালফ, খাওয়া থামিয়ে তাদের দিকে তাকাল। গত তিন মাস ধরে সে ক্যারোলিনের সঙ্গে এই বাড়িতে লিভ-ইন-এ রয়েছে। এরিক যে তাকে পছন্দ করে না, রালফ তা ভালো করেই জানে। তবে এরিক কখনো তার সঙ্গে অভদ্রতা করেনি। তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আনুষ্ঠানিক। আজ এই প্রথম রালফ এরিকের কোনো কথায় মন্তব্য করতে চাইল। তবু কিছুটা সংশয় বোধ করছে। মন্তব্য করে তার প্রতি এরিকের অপছন্দের মাত্রা সে বাড়াতে চাচ্ছিল না।

: 'তুমি কি অনুবাদ পড়তে চাও?' ক্যারোলিন বলল।

: 'না, আমি আরবি পড়তে চাই, যেমনটা তারা পড়ে।' এরিক ভীষণ সিরিয়াস।

: 'কিন্তু তুমি তো আরবি জানো না।' ক্যারোলিনও এবার সিরিয়াস হলো। এটি এক অদ্ভুত আবদার।

: 'হ্যাঁ, জানি না। কিন্তু জিবরিল আমাকে শিখিয়ে দেবে। সে আরবি জানে!' এরিক মাকে বলল। সাথে সাথে ক্যারোলিন বুঝে উঠতে পারল না, কী উত্তর দেবে। সে এমনভাবে একটি নতুন ভাষার কথা বলছে, যেন দুদিনেই তা শিখে ফেলবে, এত সহজ।

: 'এর প্রয়োজন কী?' ক্যারোলিনকে চুপ থাকতে দেখে রালফ আর না বলে পারল না। 'এটা মুসলিমদের পবিত্র কিতাব। এটা পড়ার জন্য তোমার নতুন ভাষা শেখার দরকার নেই। তুমি এর অনুবাদ পড়তে পারো। যদি একটি বই হিসেবে এটা পড়তে চাও, তবেই।' রালফ ক্যারোলিনের পক্ষ হয়ে খুব উপযুক্ত

একটি পরামর্শ দিল। এরিক সেটি এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দিল। রালফের কথার উত্তর দেওয়ার কষ্টটুকুও করল না।

: 'মাম্মি...!' রালফকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে ক্যারোলিনের দিকে তাকাল। ক্যারোলিন একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। তার আর এরিকের সম্পর্ক আজকাল খুব ভালো যাচ্ছে না। ক্রমাগত ভঙ্গুর। তারপরও সে যে অনুমতি চাচ্ছে এটাই বেশি।

: 'তোমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে, এরিক।' ক্যারোলিন তার একমাত্র সমস্যা উল্লেখ করল।

: 'এমনটা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। প্রমিস!' সে সঙ্গে সঙ্গে মাকে আশ্বস্ত করল। রালফ এক অদ্ভুত অপমান বোধ করল। এভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় সে আর কোনো কথা না বলে, খাওয়ায় মনোযোগ দিল।

: ঠিক আছে। কিন্তু তোমার পড়াশোনায় কোনো প্রভাব পড়লে,
আমি সেটা বন্ধ করে দেব।

এরিকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ওকে!' সে যেন মাকে আশ্বস্ত করে বলল।

: 'তুমি কবে জিবরিলের কাছে কুরআন পড়তে যাবে?'
ক্যারোলিন জিজ্ঞেস করল।

: 'সপ্তাহে দুদিন।' এরিক বলল।

: 'ঠিক আছে।' সে যেন সন্তুষ্ট হলো।

: 'আপনি জিবরিলের মাকে ফোন করে জানিয়ে দিন, আমাকে
অনুমতি দিয়েছেন, এতে আপনার কোনো আপত্তি নেই।'

এরিক বলল। ক্যারোলিন মুহূর্তেই বুঝে গেল, অনুমতির চাওয়ার আসল রহস্য কী। রালফ সামনে থাকায় ক্যারোলিন আর সেটা ভেঙে বলল না।

: 'ঠিক আছে, আমি ফোন করে বলব।' ক্যারোলিন বলল। এরিক ধন্যবাদ জানিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

: 'তুমি বোকামি করছ।' সে চলে যেতেই রালফ ভীষণ নাখোশ হয়ে ক্যারোলিনকে বলল।

: 'কেমন বোকামি?' সে বুঝেও না বোঝার ভান করল।

: তোমার ছেলে আগে থেকেই তোমার জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে আছে। সে এমনিতেই টেম্পারামেন্টাল। অল্পতেই তার মেজাজ বদলে যায়। আর তুমি তাকে কুরআন শরিফ আর আরবি শেখাতে পাঠাচ্ছ-যেন সে উগ্রপন্থি হয়ে যায়? তাও এক মুসলিম পরিবারের কাছে!

ক্যারোলিন হেসে উঠল।

: 'তুমি ওই পরিবারকে চেনো না রালফ! আমি সাড়ে তিন বছর ধরে চিনি। জেমস মারা যাওয়ার পর তারা আমাদের অনেক খেয়াল রেখেছেন।' ক্যারোলিন বলল। 'আমি মার্ক ও ইসাবেলকে প্রায়ই তাদের কাছে রেখে যেতাম। তারা এরিককে খারাপ কিছু শেখাবে না। শেখাতে চাইলে তারা আমার অনুমতি ছাড়াই শেখাতে পারত। আমি তো সেটা জানতেও পারতাম না। এরিক অন্তত কোনো কাজ করার আগে আমার অনুমতির তোয়াক্কা করে না।'

: 'তবু তুমি ভেবে দেখো। আমার মনে হয় না এটা কোনো ভালো সিদ্ধান্ত। একটি অশান্ত শিশুকে কুরআন পড়তে পাঠানো...! যদি সে মুসলিমদের মতোই ভায়োলেন্ট (হিংস্র) হয়ে যায়?' এটি ছিল রালফের আশঙ্কা। ক্যারোলিন এতে বিশেষ গুরুত্ব দিল না।



: 'আমি এরিকের ব্যাপারে জানি। কোনো কিছুর প্রতি তার শখ জাগলে, তা আর শুধু শখ থাকে না, নেশায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু সেটা বেশিদিন টেকে না। খুব দ্রুতই বিরক্ত হয়ে ফিরে আসে সে। সেখানে এটা তো নতুন একটি ভাষা শেখার মতো জটিল বিষয়। তুমি দেখবে, এক-দুই সপ্তাহ পর সে নিজেই তা ছেড়ে দেবে।' ক্যারোলিন অত্যন্ত নিশ্চিত ভঙ্গিতে রালফের আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা করল। সে যা বলল, তা সে বিশ্বাসও করে। তবু সে খুশি এই ভেবে যে, বহুদিন পর তার ও এরিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত হলো।

অনুমতির পরের দিনই এরিক ইনাযাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। জিবরিলের কাছে কুরআন পড়বে সে। আগের দিনও সে জিবরিলের কাছে গিয়েছিল। জিবরিল তখন তিলাওয়াতে ব্যস্ত। এরিক দীর্ঘ সময় তার পাশে বসে রইল। এত দীর্ঘ সময় যে, অবশেষে তাকে তিলাওয়াত থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হলো, কোনো কাজে এসেছে কি না।

: 'আমিও তোমার মতো কুরআন পড়া শিখতে চাই।'
জিবরিলকে সে উত্তর দিয়েছিল। জিবরিল তার মুখের দিকে
তাকিয়ে থমকে গিয়েছিল। তার দাবিটি ছিল অদ্ভুত।

: 'এটা তো আমার ধর্মীয় কিতাব, তাই আমি পড়ছি।' সে
এরিককে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'তুমি পড়ে কী করবে?'

: 'আমার শিখতে ইচ্ছে করছে। তুমি যখন তিলাওয়াত করো,
তখন আমার খুব ভালো লাগে।' এরিক উত্তরে বলল।

: 'তুমি ইন্টারনেটে অনুবাদ পড়তে পারো, নয়তো আমি
তোমাকে একটি ইংরেজি অনুবাদ দেই, সেটা পড়ো। আর যদি
তোমার তিলাওয়াত শুনতে ভালো লাগে, তাহলে সেটাও তুমি
ওখান থেকে ডাউনলোড করে শুনতে পারো। এর জন্য
তোমার কুরআন পড়তে শেখার দরকার কী।' জিবরিল
মার্জিতভাবে তাকে পথ দেখাল।

: 'কিন্তু আমি কেবল অনুবাদ পড়তে কিংবা তিলাওয়াত শুনতেই চাই না। আমি তোমার মতো দেখে দেখেও পড়তে চাই।' এরিক তখনো অটল।

: 'এটা খুব দীর্ঘ সময়ের কাজ এরিক! একদিনে হয় না।' জিবরিল তাকে টলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে টলল না।

: 'কতটা দীর্ঘ সময়ের?' এরিক জিজ্ঞেস করল।

: তোমার তো কয়েক বছর লেগে যাবে।

: 'ওহ! তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আমার অনেক সময় আছে।' এরিক বেশ নিশ্চিত মনে তাকে বলল। জিবরিল এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়ে গেল। এরিক অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা-সংক্রান্ত কিছু জানতে চাইলে, সে তাকে বহুবার বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা এখন তাদের পবিত্র কিতাবের বিষয়। একটি এগারো বছর বয়সি খ্রিষ্টান শিশু অনুরোধ করছে, তাও আবার

আমেরিকায় বসে। এ বিষয়ে সে না ভেবেচিন্তে, অন্ধের মতো ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী হয়ে তাকে কুরআন শেখানো শুরু করে দিতে পারে না।

: 'তুমি সবার আগে তোমার মান্নিকে জিজ্ঞেস করো।' জিবরিল শেষমেশ তাকে বলল।

: 'এতে মান্নির কোনো আপত্তি হবে না, আমি জানি।' জিবরিলকে সে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল।

: 'তার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সে আমাকে কিংবা মান্নিকে নিজ মুখে বললেই শেখাব আমি।' জিবরিল তার আশ্বাসে প্রভাবিত না হয়ে বলল।: 'আমি নিজের ব্যাপারে সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিই। সব কাজের জন্য মান্নিকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।' এরিক তাকে বলল।

: 'তুমি এখনো ছোট এরিক, খুব বেশি বুঝমানও নও। তাই যতদিন না তুমি আঠারো বছরের হচ্ছ, ততদিন প্রতিটি কাজ তোমার মাম্মিকে জিজ্ঞেস করেই করা উচিত। যেমন আমরা আমাদের বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে করি। আর এটা কোনো বিষয় নয়।' জিবরিল তাকে বোঝাল। এরিক আধা ঘণ্টা তর্ক করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করা ভুল নয়। কিন্তু জিবরিল তাতে সম্মত হলো না। শেষপর্যন্ত এরিক হার মেনে, পরের দিন মায়ের অনুমতি নিয়ে আসার আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিল।

ইমামার জন্য ক্যারোলিনের ফোনকলটি ছিল এক সারপ্রাইজ। ক্যারোলিন খুব উৎফুল্লভাবে ইমামাকে এরিকের অনুমতির কথা বলল। ইমামা হতভম্ব হয়ে গেল। এরিক ও জিবরিলের মধ্যে যে এ বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে, তা সে জানত না।

: 'মাম্মি! আমার বিশ্বাস ছিল, এরিক তার মাম্মির সঙ্গে এ বিষয়ে কথাই বলবে না। আর বললেও তার মাম্মি কখনো অনুমতিই

দেবে না।" ইমামা জিবরিলকে ক্যারোলিনের ফোনের কথা জিজ্ঞেস করতেই জিবরিল বলল।

: 'কিন্তু এখন তার মাস্মি আমাকে ফোন করে বলল যে, এতে তার কোনো আপত্তি নেই। তাহলে এখন কী করব?' ইমামা জিজ্ঞেস করল।

: 'আর কী করব?' জিবরিল হেসে উঠল। 'কুরআন শেখাব এখন তাকে।' জিবরিল মাকে বলল। তার উত্তরে ইমামার চেহারা য কোনো খুশি দেখতে পেল না।

: 'কী নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন? আগে সমস্যা ছিল, তার পরিবারের আপত্তি হতে পারে। কিন্তু এখন তো তার পরিবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। তাহলে তো আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।' জিবরিল যেন মাকে ঘাঁটানোর চেষ্টা করল। ইমামা তাকে বলতে পারল না, তার মূল সমস্যাটা হচ্ছে ইনাযার কারণে। বিয়ের প্রসঙ্গ আসার আগেই, এরিক যদি

কুরআন শেখার এই ইচ্ছা প্রকাশ করত, তাহলে হয়তো ইমামা এমন দ্বিধান্বিত হতো না। খুশিমনে সে তাকে কুরআন শিখতে দিত।

: 'আমার কোনো সমস্যা নেই। যা কিছু হয় আল্লাহর মর্জিতেই হয়। আমাদের পক্ষে কিছু বদলানো সম্ভব নয়। ঠিক আছে, সে যদি তোমার কাছে কুরআন শিখতে চায়, তবে তুমি তাকে শেখাও।' অবশেষে ইমামা যেন আত্মসমর্পণ করল। এগারো বছর বয়সে কুরআনে সঙ্গে এরিকের এই প্রথম পরিচয়। এর আগে সে কেবল সাধারণ জ্ঞান হিসেবে এই কিতাবটির নাম জানত। ইনাযাদের বাসায় যাতায়াতের মাধ্যমে সে মুসলমানদের কাছাকাছি আসে। তারপর জিবরিলের তিলাওয়াত শুনতে শুনতে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। সেই ভাষা আর সেই তিলাওয়াত তাকে যেন কোনো অলৌকিক জগতে নিয়ে যায়। সে হয়তো 'ফ্যান্টাসি' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়, পরিচিত থাকলে সম্ভবত এটিই ব্যবহার করত, সেই অনুভূতি প্রকাশে।

জিবরিলের কণ্ঠস্বর মনোমুগ্ধকর। হৃদয় মোম করে, গুম করে
অতলে হারিয়ে দেওয়ার মতো সম্মোহনী। তার কণ্ঠ কেবল
সুললিত নয়, উচ্চাঙ্গের সুললিত। মধুর, সুমধুর, মাধুর্য; সবকিছু
এসে যায় তার কণ্ঠের প্রশংসায়। এগারো বছরের এরিক এই
মহান গ্রন্থের ভাষা ও মর্ম না বুঝেও, কেবল সেই কণ্ঠের মোহে
আবদ্ধ ছিল। যেদিন সে জিবরিলের কাছে কুরআনি কায়দার
প্রথম পাঠ নিল, সেই রাতেই সে অনলাইনে কুরআন শরিফের
পুরো ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ফেলল। সে ছিল জ্ঞানপিপাসু এবং
বইপোকা। কুরআন শরিফকে সে একটি সাধারণ বইয়ের মতো
করেই পড়েছিল। কোথাও বোঝে; কোথাও না বোঝে। বহু
আয়াতের নিগূঢ়তায় প্রভাবিত হয়ে, আবার অনেক বিধানের
ব্যাপারে দ্বিধাশ্রিত হয়ে। মনে গেঁথে নিয়েছে বহু কথা,
বাইবেলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে বহু ঘটনা। বাইবেল তার
আগে থেকেই পড়া ছিল। এবার একই একাগ্রতায় কুরআনও
পড়ল।

তার মা ঠিকই বলেছিল, এরিকের শখগুলো নিছক শখ থাকে না, তা প্রবল নেশায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু এক-দুই সপ্তাহ পরেই বিরক্ত হয়ে তা থেকে সরে আসবে, এটি ঠিক ছিল না। পরের দিন এরিক তাকে কায়দার পাঠ ঠিকঠাক শোনালা। জিবরিল এতে বিস্মিত হলো না। কারণ, সে জানে এরিক বেশ মেধাবী। এত বছর একসঙ্গে থেকে এতটুকু তো জেনেই গিয়েছে। কিন্তু এক রাতেই পুরো কুরআনের অনুবাদ পড়ে ফেলেছে জেনে সে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এতে কী ফায়দা হলো?

: 'কীসের? কুরআনের অনুবাদ পড়ার?' এরিক তার প্রশ্নের ব্যাখ্যা চাইল।

: 'হ্যাঁ' জিবরিল উত্তর দিল।

এরিকের মনে কোনো উত্তর জোগাল না। সে ভেবেছিল, এটা শুনে জিবরিল খুব প্রভাবিত হবে। কিন্তু সে প্রভাবিত হলো না।

উলটো তাকে প্রশ্ন করল। 'ফায়দার কথা তো ভাবিনি, আমি তো কেবল কৌতূহলী হয়ে কুরআন পাড়েছি।' এরিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

: 'তাহলে কুরআনের ব্যাপারে এখন তোমার কী ধারণা? এখনো শিখতে চাও?' জিবরিল তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, এখন আরও বেশি।' এরিক বলল। 'আমার কাছে এটি প্রচণ্ড আগ্রহোদ্দীপক লেগেছে।'

জিবরিল তার কথায় হাসল। সে এমনভাবে কথা বলছে, যেন একটি গোপন এনসাইক্লোপিডিয়া বা আকর্ষণীয় কোনো বইয়ের সন্ধান পেয়েছে, যা শেষ না করে সে থাকতে পারেনি।

: 'পবিত্র কিতাবগুলো শুধু পড়ে ফেলাই কোনো বড় কিছু নয়। এর পাশাপাশি তার ওপর আমল করাও জরুরি।' জিবরিল তাকে বলল। এরিক মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনল।

: 'এ আমি জানি।' এরিক বলল।

আজ জিবরিল তাকে কায়দার দ্বিতীয় পাঠ দিল না। সে তাকে পাঠ দিল একজন ভালো মানুষ হওয়ার।

: 'যখন আমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো জিনিস শিখব, তখন যেন আমাদের আচার-ব্যবহারে তা প্রতিফলিত হয়। আমাদের ব্যবহারে যেন উত্তমতা আসে। এতে মানুষ বুঝতে পারবে, আমরা সত্যিই বিশেষ কিছু শিখছি।' জিবরিল তাকে বোঝাল। সে তাবলিগ করতে চাচ্ছে না। এটি একটি কঠিন কাজও বটে। তবে অযৌক্তিক বুলি না আওড়িয়ে, যুক্তি দিয়ে অবশ্যই ধর্মের কথা তুলে ধরা উচিত। ইসলাম কেন শেষ এবং সর্বাধিক নিখুঁত ধর্ম তা বলা উচিত।

'স্কুলে আমরা যেসব বিষয় পড়ি এবং শিখি, তা আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে না। সেগুলো কেবল আমাদের



পরীক্ষার সময় কাজে আসে। কাজে আসে চাকরি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে। বই আমাদের জ্ঞানী করে তোলে, কিন্তু আমলদার নয়। আমলদার কেবল সেই কিতাবই বানাতে পারে, যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধু আমলদার বানানোর জন্যই নাজিল করেছেন।"

এরিক সব সময়ের মতোই তার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে এবং মনে গেঁথে নিচ্ছে।

'বাবা আমাকে বলেছেন, আমরা যদি ভালো মানুষ হতে না পারি এবং আমাদের পরিবার ও সমাজের কষ্টের কারণ হই, তবে ইবাদত ও দীনি ইলম অর্জনের কোনো ফায়দা নেই। কারণ, দীন ও দীনি কিতাবগুলো আল্লাহ তা আলা কেবল আমাদেরকেকরি। আমাদের আত্মীয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। যেমন তোমার ছোট ভাই, বোন, তোমার মান্নি-এরা তোমার দায়িত্বে। তোমার নিজের শরীর আর মনও তোমার দায়িত্বে।' জিবরিল অত্যন্ত কৌশলে এরিকের প্রয়োজনীয়

বিষয়ের দিকে আলোচনা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ, এরিক আগে থেকেই তার ভাই-বোন ও মায়ের ব্যাপারে উদাসীন। এরিক সেটা বুঝতেও পারছে। সে ছোট, কিন্তু বোকা নয়। এখানে ছাড়া অন্য কোথাও, কেউ যদি তাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইত, সে তা বলতেই দিত না। এই বিষয়গুলো নিয়ে সে খুবই সংবেদনশীল। কিন্তু এই বাড়ির বিষয় ভিন্ন। এখানে এসে সে, এই বাড়ির প্রতিটি সদস্যের, যেকোনো কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনত।

'তাহলে এখন তোমার খেয়াল রাখতে হবে, যেদিন তুমি কুরআন পড়ে বাসায় যাবে, সেদিন তোমার মধ্যে কী পরিবর্তন আসে। সেদিন তুমি তোমার পরিবার ও অন্যদের জন্য কী ভালো কাজ করো।' জিবরিল যেন তাকে একটি চ্যালেঞ্জ দিল।

: 'আমি চেষ্টা করব।' এরিক সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। তারপর সে যেন তার সাহায্য চাইল। 'তাহলে আজ আমি বাড়ি গিয়ে কী করব?'

: 'আজ তুমি এমন কোনো কাজ করবে না, যা করলে তোমার মান্নি আপসেট হন।' জিবরিল তাকে বলল। এরিক কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। সে ভাবেনি যে, জিবরিল এত খোলামেলাভাবে তার ব্যাপারে এমন কথা বলবে।

: 'তুমি আমাকে আবদুল্লাহ বলে ডেকো।' এরিক ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ পালটে তাকে বলল।

: 'আবদুল্লাহ তো আল্লাহর বান্দা। আর আল্লাহর বান্দা হয় সবচেয়ে দয়ালু, Kind. অধিক যত্নবান ও অনুগ্রহশীল। যেদিন থেকে তুমি তোমার মান্নিকে কষ্ট দেওয়া বন্ধ করবে, সেদিন থেকে আমি তোমাকে আবদুল্লাহ বলে ডাকব।' জিবরিল এবারও তার এই প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা সফল হতে দিল না। ঘুরেফিরে সে তার উদ্দিষ্ট বিষয়েই চলে এলো। এরিক আরও কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো, জিবরিল

হয়তো এসব তার মান্নির বলে দেওয়া কথামতো বলছে। কিন্তু সে কোনো বিতর্কে জড়াল না। চুপচাপ তার কথা মেনে নিল।

বাড়ি ফিরে আজ প্রথম এরিক, রালফের সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করল। ক্যারোলিন ও রালফ দুজনে লাউঞ্জে বসে ফুটবল ম্যাচ দেখছিল। তার আন্তরিক ব্যবহার দেখে এক মুহূর্তের জন্য রালফ ও ক্যারোলিনের মনে হলো, এরিক হয়তো ভুল করছে। কিংবা তাদের ভ্রম হচ্ছে। ভুল ও ভ্রমে বিভ্রান্ত হয়ে তারা তাকিয়ে রইল। ক্যারোলিন তাকে এ নিয়ে বহুবার বকাঝকা করে অবশেষে বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। এরপর তাকে শাসন করা ছেড়েই দিয়েছে। এরিক ও রালফের মধ্যে বাহ্যত কোনো ঝগড়া হয়নি। তবে রালফ জানত যে, এরিক তাকে পছন্দ করে না। আর সেও এরিকের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করেনি। তার ধারণা ছিল তাদের মধ্যে দরত্ব বজায় থাকাই ভালো, যাতে সম্মান নষ্ট না হয়। তবে রালফ ব্যক্তিগতভাবে একজন ভালো ও শান্ত মেজাজের মানুষ। এরিককে নিয়ে ক্যারোলিনের দুশ্চিন্তাও সে বুঝতে পারে।

কথা বলে এরিক সেখানে না থেমে রুমে চলে গেল। রালফ ও ক্যারোলিন একে অপরের দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল।

'এর কী হলো?' রালফ কিছুটা মুগ্ধকর-বিস্ময়ে বলল।

'জানি না।' ক্যারোলিন কাঁধ ঝাকিয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করল।

এটিই এরিকের মধ্যে আগত শেষ পরিবর্তন নয়। সে ধীরে ধীরে আরও পরিবর্তিত হতে লাগল। যেমনটা সে আগে ছিল। কুরআন পড়তে সে এখন সপ্তাহে দুদিনের বদলে, প্রতিদিন যেতে থাকে। জিবরিল কখনো ব্যস্ততায় পড়াতে না পারলে, তখন হামিন বা ইমামা তাকে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু এরিক সবসময় নিঃসংকোচে নির্দিধায় এই স্বীকারোক্তি দেয় যে, জিবরিলের মতো করে এত ভালো কেউ আর 'তাকে পড়াতে পারে না। তার কণ্ঠে ছিল প্রভাব, লাহানে আছর। তার প্রতি এরিক আগে থেকেই প্রভাবিত। কুরআন পড়া শুরু করার পর

থেকে সেই প্রভাবে যেন দ্বিগুণ হাওয়া লাগে। এভাবেই ইমামার সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও, এই ঘর ও ঘরের বাসিন্দাদের মাঝে তার শেকড় আরও প্রোথিত ও গ্রথিত হয়ে যায়। বিস্তৃত শাখায় হয় জোরালো বিস্তরণ।

জিবরিল মানুষকে এমনভাবে প্রভাবিত করে, যা সহজে বোঝা যায় না। তেরো বছর বয়সেও তার মধ্যে যে স্থিরতা ছিল, তা ছিল তার বয়সের আর দশটা সাধারণ শিশুর থেকেও আলাদা। দশ বছর বয়সে সালারের অসুস্থতা, ইমামার পাশাপাশি তাকেও বদলে দিয়েছিল। প্রয়োজনের তুলনায় সে অতিরিক্ত সংবেদনশীল এবং নিজের পরিবারের প্রতি অধিক দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছিল, যেন এই দায়িত্ব তারই। সালার ও ইমামা অবশ্যই ভাগ্যবান যে, তাদের বড় সন্তানের মধ্যে এমন দায়িত্ববোধ জন্মেছিল বলে।

আমেরিকায় সালারের সার্জারি এবং ইমামার অনুপস্থিতিতে, সে তার ছোট তিন ভাই বোনের দেখভাল একজন দায়িত্বশীল

বাবার মতোই করেছিল। সিকান্দার উসমান ও তাইয়েবা, সালারের সন্তানদের তরবিত্তে আগেও মুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাদের অনুপস্থিতিতে জিবরিল যেভাবে তার ভাই-বোনদের দেখভাল করেছিল, তা তাদেরকে আরও মুক্ত করে তোলে। দ্বিমুক্ত ও বিমুক্ত।

ইমামা তার সন্তানদের বলেছিল, 'এটা আমাদের বাড়ি নয়, আমরা এখানে মেহমান। আর মেহমানরা কখনো মেজবানকে অভিযোগ করার সুযোগ দেয় না।' তারা চার ভাই-বোন সে-মতোই চলেছিল। তাইয়েবা আর সিকান্দারকেও তাদের নিয়ে কোনো ঝামেলা পোহাতে হয়নি। বড় তিনজন যার যার কাজ নিজেরাই করে ফেলত, আর রাইসার দায়িত্ব তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। কারণ, সে ছিল সবার ছোট। স্বভাবতই অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

ভাই-বোনদের দায়িত্বের আবেশ ও রেশ, জিবরিলকে অনেক বদলে দিয়েছিল। দশ বছর বয়সি শিশুটি তখন কয়েক মাসের

জন্য তার খেলাধুলা এবং ব্যস্ততা ভুলে গিয়েছিল। তখন থেকেই জিবরিল মানসিকভাবেও পরিবর্তিত হতে শুরু করে।

সে যে স্কুলে পড়ত, সে ছিল ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া, সেই স্কুলের প্রথম ছাত্র। তখন তার বয়স মাত্র তেরো। সে শুধু ডিস্টিংশন নিয়েই ইউনিভার্সিটিতে যায়নি, সে সেখানে ফুল-ফি- স্কলারশিপেও ভর্তি হয়েছিল। সেটি ছিল তার জীবনের প্রথম বড় সাফল্য; সালার সিকান্দারের পরিবারের প্রথম পাখিটির ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছার আলোকিত পয়গাম।

গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের হলরুম এখন কানায় কানায় পূর্ণ। চারদিকে গমগম আমেজ। ৯৩তম ন্যাশনাল স্পেলিং বি প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডের প্রথম দিন আজ। মঞ্চের একদিকে হামিন সিকান্দার তার খেতাব ধরে রাখার জন্য লড়ছে, অন্যদিকে রাইসা সালার এই প্রতিযোগিতায় প্রথমবার অংশ নিচ্ছে। সালার সিকান্দারের ঘরে চতুর্থ ট্রফি নিয়ে আসার

জন্য রাইসা ছিল তুমুল উৎসাহী। উৎসাহী আসলে কেবল সেই ছিল। পরিবারের বাকি সদস্যরা তো ছিল উদবিগ্ন। আর এই উদবেগের কারণ ছিল দুটি-যদি সে না জিততে পারে? যদি হামিন জিতে যায়?

মঞ্চে রাইসা তার প্রথম শব্দের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রোনাউন্সার শব্দটি বললেন। রাইসা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনল। শব্দটি তার কাছে অপরিচিত নয়। তার পড়ে আসা শব্দগুলোর মধ্য থেকেই।

'Crustaceology.

সে ফিসফিস করে শব্দটি উচ্চারণ করল, তারপর নিঃশব্দে সেটিকে ভেঙে বানান করার মহড়া দিল। অবশেষে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে বানান করতে শুরু করল-C-R-U-S-T-A-C-O-L-O-G-Y



ভুল বানানের ঘন্টা বেজে ডাল। রাইসা অবিশ্বাসভরে স্থির হয়ে গেল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তবু সে হামিন সিকান্দারের দিকে তাকাল না। হামিন ফাইনালিস্টসে একজন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ে আজ সেও। সামনের সারিতে বসে আছে সে। রাইসা বানান করার মাঝেই যে বুঝে গিয়েছিল, কোথায় ভুল করেছে সে।

হলে, ইমামা-সালার, জিবরিল-ইনায়া এক অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে বসে আছে। এটি অপ্রত্যাশিত নয়। তারা আগে থেকেই এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। রাইসার ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছানোটাই তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। সে তার মেধাগত যোগ্যতার চেয়েও ভালো পারফর্ম করেছে। রাইসার হেরে যাওয়ার ভয় নিয়ে এই পর্যন্ত এসেছে। এখন হেরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। সে এখনো প্রতিযোগিতা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়েনি। ফিরে আসার সুযোগ এখনো আছে। কিন্তু এটি তার প্রথম ধাক্কা। এটি সামলে

স্বাভাবিক হতে তার কিছুটা সময় লাগবে। Crustaceology শব্দটির সঠিক বানান হলো—C-r-u-s-t-a-c-e-o-l-o-g-y রাইসা 'E' এর জায়গায় 'O' ব্যবহার করে ভুল করেছিল।

তার থেকে কয়েক চেয়ার দূরেই হামিন। তাদের মাঝে আরও কয়েকজন ফাইনালিস্টের আসন। হামিন সেগুলো মাড়িয়ে গিয়ে রাইসার কাঁধে হাত রাখল। তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করল।

: 'বানানটা আমি জানতাম।' রাইসা ফিসফিস করে যেন হামিনকে বোঝানোর চেষ্টা করল। এর বেশি কিছু সে তখন বলতেও পারল না। সে জানে, কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে লাভ নেই।

: 'এটা একটা খেলা, রাইসা। একে খেলা মনে করেই খেলবে।' প্রতিযোগিতার একদিন আগে সালার তাকে বুঝিয়েছিল। রাইসাকে সে ভেঙে না পড়ে উঠে দাঁড়াবার সবক দিচ্ছিল। রাইসাও সব সময়ের মতোই মনোযোগ দিয়ে বাবার কথা

শুনছিল। কিন্তু সে যা-ই হোক না কেন, সে আট বছরের একটি মেয়ে। তার তিন ভাই-বোনই এই ট্রফি জিতেছে। আজ সে এসেছে এটা জিততে। তার প্রত্যাশা সে-ও জিতবে। আট বছর বয়সে হার-জিতের কারণ বোঝার বুদ্ধি তার এখনো হয়নি। যে জিবরিল, ইনায়া আর হামিনের মতো প্রখর মেধাবী নয়। সে এক সাধারণ শিশু। আর সাধারণের মতো তারও মনে হয়, অন্যরা আকাশ ছুঁতে পারলে, আমিও পারব। নিজের আর অন্যদের মধ্যে পার্থক্যটা তার মাথায় ঢুকছিল না।

হামিন সিকান্দার এখন মঞ্চে দাঁড়িয়েছে। তার প্রথম শব্দের জন্য অপেক্ষা করছে। সবাই করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল। গত বছর সে জনপ্রিয় হলে, এ বছর সে দ্বিগুণ জনপ্রিয় ও 'হট ফেভারিট' হিসেবে প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে। আগের সব রাউন্ডে সে কঠিনতম শব্দগুলোকে জলের মতো বানান করেছিল। এই রাউন্ডেও তার কাছে সবাই সেটাই কামনা করছে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন সে। সে তার খেতাব রক্ষা করে

চলছে। অন্য ফাইনালিস্টদের চোখে তার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নয়, আছে একধরনের আতঙ্ক।

'Vignette' তার শব্দটি বলা হলো। এটি হামিন সিকান্দারের কাছে আরেকটি জলবৎ তরলং সহজ ও স্বচ্ছ শব্দ। এর চেয়েও কঠিন ও দীর্ঘ শব্দের বানান সে করেছে। রাইসাও, অন্য ফাইনালিস্টদের মতো, ঠোঁটে ঠোঁটে নির্ভুলভাবে শব্দটির বানান আওড়ালো। হামিন এবার বলতে শুরু করল-V-i-g-n-e-t-t-। তারপর হঠাৎ থামল। রাইসার মনে হলো সে হয়তো শেষ অক্ষরের আগে একবার চিন্তা করতে থেমেছে। এটা শুধু সে নয়, সব ফাইনালিস্টরাও এটাই ভেবেছে। সবাই যেন তাকে চিন্তা করতে সময় দিচ্ছিল। এক মুহূর্তের বিরতির পর হামিন শব্দটি সেই একই ভুল বানানেই উচ্চারণ করল। ঘন্টা বেজে উঠল। প্রথমে হলজুড়ে নেমে এলো নীরবতা, তারপর শুরু হলো ফিসফিস। এরপর প্রোনাউন্সার সঠিক বানানটি উচ্চারণ করলেন। হামিন মাথা নিচু করে যেন নিজের ভুল স্বীকার করে নিজের আসনের দিকে হাঁটা শুরু করল।

এটিই তার প্রতিযোগিতার প্রথম অঘটন। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন এবার তার প্রথম শব্দের বানান করতে ব্যর্থ হলো। হলে বসা সালার, ইমামা, জিবরিল এবং ইনায়া; একইসঙ্গে স্বস্তি ও উদ্বেগ, দুটোই উপলব্ধি করল। স্বস্তি এজন্য যে, সে পারেনি মানেই রাইসার জন্য সুযোগ আছে। আর উদ্বেগ হলো তার পরাজয় দেখে। কিন্তু হামিন এই শব্দে ভুল করবে, তা বিশ্বাস করার মতো নয়।

এভাবে রাইসা তার পরের দুটি শব্দও বানান করতে পারল না, এবং কাকতালীয়ভাবে হামিন সিকান্দারও পারল না। তারা দুজনেই ফাইনাল প্রতিযোগিতার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেল। রাইসার এই পারফরম্যান্স অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু হামিন সিকান্দার...? তার তো এমন খারাপ পারফরম্যান্স হওয়ার কথা নয়! অবশেষে এটিই আজ রাতের ব্রেকিং নিউজ হয়ে গেল। 'গত বছরের চ্যাম্পিয়ন, এ বছরের শুরুতেই প্রতিযোগিতা থেকে আউট হয়ে গেল।' অথচ

হামিন সিকান্দারের কোনো বিকার নেই। সে আগের মতোই প্রশান্ত।

রাইসার পেছন পেছন সে-ও মঞ্চ থেকে নেমে বাবা-মায়ের কাছে বসল। বাবা-মা দুজনেই তাদেরকে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল। জিবরিল আর ইনায়াও একই কাজ করল।

'খুব ভালো খেলেছ।' তারা তাদের ছোট উৎসাহ দিল। জিবরিল ও ইনায়া একবার ট্রফি জিতে পরে আর এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি। হামিনকে তারা সান্ত্বনা দিতে লাগল। আর রাইসা যেন বাকি অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে একদম পেছনের দৃশ্যে চলে গেল।

প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। নতুন চ্যাম্পিয়ন নির্বাচিত হয়ে গেছে। তাকে পুরস্কার দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। এই পুরস্কার ও বরণমালা গত বছর হামিন সিকান্দার ঘরে এনেছিল। ভাবতেই

রাইসার মন খারাপি যেন আরও বেড়ে গেল। তার বড় ভাই বোনদের মতো সে তার বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেনি। সে তাদের মতো নয়। এই প্রথম রাইসার মধ্যে এক তীব্র হীনম্মন্যতা জন্মাল। তাও মাত্র আট বছর বয়সে। সে জানত, সে পোষ্য। একটি দুর্ঘটনায় তার বাবা-মায়েরা মৃত্যুর পর সালার তাকে নিজের মেয়ে করে নিয়েছে। রাইসাকে এই গল্পই বলা হয়েছে। এই গল্প নিয়ে তার মধ্যে কখনো সন্দেহ কিংবা দুশ্চিন্তা জাগেনি। এই প্রশ্নও কখনো তার মাথায় আসেনি। কারণ, যে দেশে সে বসবাস করছে, সেখানে বেশিরভাগ পরিবারের তৃতীয় ও চতুর্থ শিশুটি হয় দত্তক নেওয়া শিশু, অথবা সিঙ্গেল প্যারেন্টের সন্তান। বাইরের সমাজ তাকে কখনো হীনম্মন্যতায় ভোগাতে পারেনি, আর বাড়িতেও কখনো পরের বাড়ির অনুভূতি পায়নি।

কিন্তু এই প্রথম রাইসা নিজেকে তাদের চেয়ে তুচ্ছ মনে করছে। তারা সবাই গায়ের রং ও চেহারায়, তার চেয়ে বেশি সুন্দর। তারা অনেক মেধাবী। সে কোনোভাবেই তাদের সঙ্গে

পাল্লা দিতে পারবে না। এমনকি বাইরের দুনিয়ার সঙ্গেও না। তাদের বাড়িতে থাকা ট্রফি, মেডেল, সাটিফিকেট এবং সম্মাননা-লিপির মধ্যে তার অর্জন যৎসামান্যই। এই উপলব্ধি তার আগেও ছিল। কিন্তু এ নিয়ে আজ এই প্রথম সে ব্যথিত হলো। এই ব্যথায় ডুবে সে হামিম সিকান্দারের হেরে যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতে সুযোগ পেল না। এমনকি, বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতে চলমান কথাতেও তার কোনো মনোযোগ ছিল না।

: 'তোমার কি মন খারাপ?' গাড়িতে বসে হামিম তার কানে কানে বলল।

: 'না।' রাইসাও একইভাবে জবাব দিল।

: 'আমি জানি তোমার মন খারাপ।' হামিম আবারও ফিসফিসিয়ে বলল।

রাইসা জানে, হামিম তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করবে না।

: 'তুমি আগামী বছর জিততে পারবে।' সে যেন তাকে এক
চিলতে আশার আলো দেখাল।

কিন্তু আগামী বছর তো অনেক দেরি। রাইসাও ফিসফিসিয়ে
বলল। হামিন তার কোমরে সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করল।
রাইসা গুটিয়ে গিয়ে পিছু হটল। এই মুহূর্তে আর হাসি পাচ্ছে
না, আর সে হাসতেও চাচ্ছে না।

'আমিও তো হারলাম।' হামিন তার মন বুঝতে পেরে বলল।

"কিন্তু তুমি জিতেও তো ছিলে।" রাইসা উত্তর দিল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হামিন যেন কোনো জবাব খুজে পেল না।
তারপর সে বলল, 'ওটা তো এমনিই আন্দাজে টিল লেগে
জিতে গিয়েছিলাম।' হামিন নিজেকে উপহাস করে বলল। রাইসা
কোনো উত্তর না দিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে

রইল। এটা যেন এই বিষয়ে আর কোনো কথা না বলার ইঙ্গিতময় ঘোষণা।

: 'রাইসা খুব আপসেট।' রাতে শোবার আগে সালার ইমামাকে বলল।

: 'আমি জানি। আর সে জন্যই আমি চাইনি যে, ও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিক। যেখানে তার তিন বড় ভাই-বোন ট্রফি জিতেছে। কিন্তু তুমি তো তাকে নিষেধ করলে না।' ইমামা উত্তর করল।

: আমি কীভাবে তাকে নিষেধ করতাম? বলতাম যে তুমি জিততে পারবে না, তাই অংশ নিয়ো না? আর দেখো, সে ফাইনাল রাউন্ড পর্যন্ত পৌঁছেছে। খুব ভালো খেলেছে। এটাই অনেক কিছু।' বলতে বলতে সালার হাতঘড়ি খুলে বেডসাইড টেবিলে রাখল।

: "সে খুব বুদ্ধিমান, দুয়েক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি তাকে বোঝালেই হবে, এই দেখো হামিনও তো হেরেছে, সে তো তোমার মতো মন খারাপ করছে না।" ইমামা বলল। সে এখন একটি বইয়ের শেষ কয়েকটা পাতা উলটাচ্ছে।

: 'হামিনের মন খারাপ হবে কেন, সে তো ইচ্ছে করেই হেরেছে।' সালার অত্যন্ত শান্ত মনে বলল। পাতা উলটাতে উলটাতে ইমামা থমকে গেল।

: এর মানে কী?

সালার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। তারপর হাসল।

: তুমি আন্দাজ করতে পারোনি?

: 'কী? হামিন যে ইচ্ছে করে হেরেছে? নাহ, এমনটা হতে পারে না।' ইমামা নিজেই প্রশ্ন করল, নিজেই উত্তর দিল, আবার নিজেই সেই উত্তর স্বীকার করল।

: তাহলে তুমিই তাকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো, এমনটা হতে পারে কি না।' সালার আর কথা বাড়াল না। ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ল। ইমামা হতভম্ব হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমরা বাপ-বেটা দুজনই অদ্ভুত। তোমাদের জন্য 'অদ্ভুত' তো একটা ভদ্র শব্দ। এর চেয়ে জঘন্য কিছু ডিজার্ড করো তোমরা।'

'তুমি প্রতিবার জিবরিলকে টেনে কথা বলো কেন?? সালার তাকে খেপানোর জন্য বলল।

‘আল্লাহর শুকরিয়া, সে হামিন আর তোমার মতো নয়। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না, হামিন...সে কেন এমনটা করবে?’ ইমামা এখনো বিভ্রান্ত হয়ে আছে।

: ‘জিজ্ঞেস করে নিয়ো কেন এমন করেছে। এতে এত চিন্তিত হওয়ার কী আছে। এটা তো কোনো দার্শনিক প্রশ্ন নয় যে, উত্তর পাওয়া যাবে না।’ সালার এখনো আগের মতোই শান্ত মনে বলল।

তুমি যেহেতু এই গোপন তথ্য ফাঁস করেছ, তাহলে এর পেছনের কারণটাও বলে দাও।’ ইমামা কৌতূহলী না হয়ে পারল না।

: ‘রাইসার জন্য।’ সালার উত্তর করল। ‘এজন্য তাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে।’ সালার চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে, টেবিল ল্যাম্প অফ করে দিল। অন্ধকারে ইনামা তার পাশ ফেরা পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আসলেই ভুল বলেনি। তারা বাপ-

বেটা দুজনেই অদ্ভুত। বরং 'অদ্ভুত' তাদের জন্য একটি মার্জিত শব্দ।

: 'রাইসা, তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?' ইনায়া তাকে স্টাডি টেবিলের সামনে বই খুলে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল।

: 'আমি না পারা শব্দগুলো মুখস্থ করতে চাচ্ছি।' রাইসা পেছনে না ফিরেই উত্তর দিল। ইনায়া তাকে দেখে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সবেমাত্র বাসায় ফিরেছে। আর সে এখনই বই নিয়ে বসে গেছে। রাইসা ইনায়ার রুমেই ঘুমায়। জিবরিল ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পর, তাকে পড়ানোর দায়িত্বও এখন ইনায়ার।

'তুমি তো অনেক পরিশ্রম করেছে, রাইসা। এটা তোমার ভাগ্যে ছিল না।' ইনায়া বুঝতে পারল না, সে ভুল শব্দে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে। এই শব্দগুলো যেন রাইসার মস্তিষ্কে গিয়ে বিঁধল। 'এখন শুয়ে পড়ো। There's always a next time.'



পরের বারের সুযোগ তো রয়েছেই।' ইনায়া বড়দের মতো তার পিঠ চাপড়ে দিল।

'আমি ঘুমাতে পারছি না।' নিভুনিভু স্বরে রাইসা তাকে বলল। সে এখনো আগের মতোই বসে আছে, ইনায়ার দিকে পিঠ করে। সামনে খোলা বই। বইটিতে তার ভুল করা শব্দটি জ্বলজ্বল করছে। ইনায়ার মনে হলো রাইসার কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছে। পরক্ষণেই ভাবল, এটা হয়তো তার ভুল ধারণা। কিন্তু না। একটু পরই বই বন্ধ করে রাইসা বিছানায় এলো। উপুড় হয়ে শুয়ে সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রাইসা, রাইসা, প্লিজ?' ইনায়া নিজেও প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল। রাইসা ছোটখাটো বিষয়ে কান্নাকাটি করার মতো মেয়ে নয়। এমনকি প্রতিযোগিতায় হেরে মঞ্চ থেকে নামার সময়ও অন্যদের মতো কাদেনি। তাহলে এখন কেন? ইনায়া বুঝতে পারল না, রাইসা কি তার দুর্ভাগ্য নিয়ে কাঁদছে!

'তুমি এখানে কী করছ এখন লাউঞ্জের ঘটঘট শব্দে ইমামা বাইরে বেরিয়ে এলো। সে এখন তাহাজ্জুদ পড়তে উঠেছে। জিবরিল এই উইকেন্ডে বাসায় এসেছে। সেও মাঝেমধ্যে তাহাজ্জুদের জন্য জাগে। তখন কিছু খেতে রান্নাঘরে যায়। কিন্তু এখানে এসে দেখল হামিন। কিচেন কাউন্টারের সামনের একটি টুলে বসে আছে সে। পরনে স্লিপিং সুট। এক লিটারের একটি আইসক্রিম-ক্যান খুলে সেখান থেকে আইসক্রিম খাচ্ছে। ইমামা বিরক্ত হয়ে কাউন্টারের সামনে এসে বলল, 'হামিন এটা কি আইসক্রিম খাওয়ার সময়? আর এভাবে?' 'তার ইঙ্গিত ছিল ক্যানের দিকে।

: আমি তো কেবল একটা স্কুপ খেতে চাচ্ছিলাম, পুরো ক্যান নয়।

হঠাৎ মায়ের আগমনে সে ঘাবড়ে গেল।

: কিন্তু এটা খাওয়ার কোনো সময় নয়। ইমামা তার হাত থেকে ক্যানটি নিয়ে ঢাকনা লাগতে লাগাতে বলল।

: 'আমি সত্যিই কেবল একটা স্কুপই খেয়েছি।' সে যেন অসহায়ভাবে মিনতি করল।

: 'দাঁত মেজে শুয়ে পড়ো।' ইমামা তার কথা উপেক্ষা করে ক্যানটি আবার ফ্রিজে রাখল। হামিন যেন প্রতিবাদ করার মতো একইভাবে টুলে বসে রইল।

: 'একে তো আজ আমি হারলাম, আমার খেতাব খোয়ালাম। এদিকে এখন আপনি দুই স্কুপ আইসক্রিমও খেতে দিচ্ছেন না।' মাকে সে অভিযোগের সুরে বলল। ইমামা কিছুক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, খেতাব তুমি নিজের ইচ্ছায় খুইয়েছ। সেটা তোমার চয়েস ছিল।

"আপনাকে কে বলেছে এটা?"



হামিন যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো। সে মায়ের দিকে তাকিয়েই রইল।
তারপর বলল-

: "তা জানা তোমার জরুরি নয়।" ইমামা বলল।

ঠিক আছে, আমি জানি।" সে মায়ের থেকে চোখ আড়াল করে
বলল।

'কে?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'বাবা।' উত্তর এসো সঙ্গে সঙ্গে। তারা দুই বাপ-বেটা একে
অপরকে হাতের তালুর মতোই চেনে।

এটা ভুল করেছ। এটা করা উচিত হয়নি তোমার। কিন্তু এটা
কেন করলে।।

সেটা আপনিও জানেন।" বলতে বলতে হামিন টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

রাইসার জন্য? ইমামা তার উদ্দেশ্যিত উত্তরটির নাম নিল।

'পরিবারের জন্য।' ঝটপট উত্তর এলো। 'আপনি শিখিয়েছিলেন, ভাই বোনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় না। আমি জিতে গেলে তাকে হারিয়েই তো জিততাম, তাই না? ওর খুব কষ্ট হতো।

ইমামার মুখে যেন কোনো কথা সরল না। তার বয়স এখন দশ। অথচ মাঝে মাঝে এমন কথা বলে মনে হয় শতবর্ষী অভিজ্ঞ পুরুষ। ইমামা বুঝতে পারল না তাকে কী বলবে। বকবে? প্রশংসা করবে? নাকি উপদেশ দেবে? হামিন সিকান্দার কাউকে নিরুত্তর করে না, বরং অসহায় করে দেয়।

: 'গুড নাইট।' বলেই সে চলে গেল। ইমামা তাকে চলে যেতে দেখল। হামিনের ব্যাপারে তাদের সবার ধারণা ছিল, সে কেবল



নিজের কথাই ভাবে। সে বেপরোয়া, তার মধ্যে আবেগ নেই, কারও মন বোঝে না সে। কিন্তু তা আজ অসত্য প্রমাণিত হলো। বড়দের কিছু ধারণা, এই বাচ্চারাই চরম ভুলের মাঝে ভুল প্রমাণ করে দেয়। ইমামা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাকে হলে যেতে দেখল। সালার ঠিকই বলেছিল, নিজের সন্তানের জন্য তার গর্ব হচ্ছে।

: 'বাবা, আপনি কি একটু রাইসার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন?' দুয়েক দিন পর ইনায়া এসে সালারকে বলল। সালার সবেমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে। একটু পরই আবার বাইরে চলে যাবে। ইনায়া তার কাছে এসে কোনো ভূমিকা ছাড়াই কথাটা বলল। : 'কী বিষয়ে?' সালার যেন কিছুটা অবাক হলো। রাইসার সঙ্গে কথা বলার কোনো প্রয়োজন তার মনে এলো না।

: 'সে খুব আপসেট। সেই স্পেলিং বি থেকে আসার পরই।' ইনায়া তাকে খুলে বলল। 'আমি নিজেও তাকে বোঝাচ্ছি, কিন্তু

আমার কোনো কথাই তার কোনো কাজে আসছে না। সে আবার স্পেলিং বি-তে অংশ নিতে চায়। প্রতিদিন রাতে বসে পড়ে। আমাকেও বলে, আমি যেন তাকে পড়াই।" ইনায়া এবার বিস্তারিতভাবে সমস্যাটি খুলে বলল।

আগে তো হামিন তাকে পড়াচ্ছিল।" সালারের হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'হ্যাঁ, হামিন আর আমি, দুজনেই পড়িয়েছিলাম। কিন্তু এখন সে আর হামিনের কাছ থেকে কিছুই শিখতে চায় না। শুধু আমার কাছেই পড়তে চায়। আমার পড়াতে তো কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না এতে তার আবারও অংশগ্রহণ করা উচিত।' প্রতিযোগিতার এখনো এক বছর বাকি। এখন তার ক্লাসের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া দরকার।" ইনায়া ধীরে ধীরে বাবাকে সব বলতে লাগল। সালার তার ভুল বুঝতে পারল। তার উচিত ছিল রাইসার সঙ্গে আরও আগেই

কথা বলা। সে ভেবেছিল, দুয়েক দিন পর সে ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু তা ভুল।

"তাকে আমার কাছে পাঠাও।" সালার ইনায়াকে বলল। ইনায়া চলে গেল। সালার ঘড়িতে সময় দেখল। হাতে কেবল দশ মিনিট সময় আছে। সালার আগেই স্যুট পরে রেডি হয়ে আছে। এখন বসে বসে কিছু ফাইল দেখছিল। রাইসা ও ইনায়া, দুজনেই মায়ের থেকে বেশি, বাবার সঙ্গে মিল। তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ কথা মায়ের আগে এসে বাবাকে বলে।

: 'বাবা...।' দরজায় নক করে রাইসা ভেতরে ঢুকল।

'এসো, সোফায় বসো।' এক হাত বাড়িয়ে সালার তাকে অভ্যর্থনা জানাল। রাইসা এসে তার পাশে, সোফায় বসল। সালার তাকে সোফা থেকে তুলে সামনের সেন্টার টেবিলে বসিয়ে দিল। রাইসা খানিক বিচলিত হলো, কিন্তু প্রতিবাদ করল না। তারা দুজন এখন একদম মুখোমুখি। সালার কিছুক্ষণ

চুপচাপ তাকে দেখতে থাকল। গোলাকার চশমার কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে রাইসা। তার কথা শোনার অপেক্ষা করছে। তার ঘন কালো চুলে বাঁধা রিবনটা একটু ঢিলে হয়ে আছে। তাতে লম্বা চুলগুলো খোঁপার মতো খাটো হয়ে আছে। তবে একপাশে ঝুকুলে। কপালের চুল আটকানোর জন্য নানা রঙের হেয়ার পিন দিয়ে মাথা ভারতি করে রেখেছে-এটা নিশ্চয় ইনায়ার কারিগরি। পিন রাইসার খুব পছন্দ। সালার কত কত পিন এনে দিয়েছে। তাকে, সেসব এখন হিসাবেও নেই। তবে প্রতিদিন জামার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে রিবন আর পিন পরে। তা দেখে সালার বুঝতে পারে, এই ব্যাপারে সে কতটা স্বাবলম্বী। সালার তার চুলের রিবনের গিঁট ঠিক করে দিয়ে, আঙুলের চিরুনিতে চুল আঁচড়ে দিল।

: 'ইনায়া আমাকে বলেছে তুমি আপসেট।' সালার অবশেষে কথা শুরু করল। রাইসা হঠাৎ লজ্জায় নুয়ে পড়ল।



না, না, আমি তো না।" সে ঘাবড়ে গেল। সালার তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাইসা কয়েক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে ফেলল। এরপর পরাজিত ভঙ্গিতে বলল- 'আমি আপসেট নই, এটা তো খুব ছোট একটা ব্যাপার।' আবারও সে মাথা নিচু করে ফেলল।

তাহলে আপসেট কেন?" সালার পালটা জিজ্ঞেস কনাল।

- 'কারণ আমি দুর্ভাগা।' সে খুব ধীর কণ্ঠে বলল। সালার কথা বলতে পারল না।

এমন উত্তরের আশা ছিল না।

'এমন কথা বলো না, রাইসা।' সালার সোজা হয়ে সামনে ঝুঁকল। হাঁটুতে ভর করে রাইসার দু-হাত মুঠোয় পুরে নিল। অমনিই

সালারের হাতে জল গড়িয়ে পড়ল। মাথা নিচু কবে, রাইসা কাঁদছে। তার চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে উঠল। সালারের খুব কষ্ট লাগল। এই প্রথম সে রাইসাকে এভাবে কাঁদতে দেখছে। ইনায়া কথায় কথায় কেঁদে ফেলে, কিন্তু রাইসা তো এমন না।

'আমি দুর্ভাগা।' সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

: 'না, তুমি দুর্ভাগা নও।' বলতে বলতে সালার তার চশমা খুলে টেবিলে রেখে, তাকে কোলে তুলে নিল।

সে বাবার গলায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। যেন সে স্পেলিং বি-তে দুদিন আগে নয়, আজই হেরেছে। সালার চুপচাপ তার পিঠে সান্ত্বনার চাপড় দিতে থাকল।

: 'আমি আপনাকে লজ্জিত করেছি, বাবা।' কান্নার মাঝে সে বলল।

'একটুও না, রাইসা। তোমাকে নিয়ে তো আমার গর্ব হয়।' সালার বলল। ঠিক ওই মুহূর্তেই ইমামা দরজা খুলে ভেতরে এলো। এসেই থমকে গেল। সালার ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে চুপ থাকার ইশারা করল।

: 'আমি এত মেহনত করেছিলাম, কিন্তু আমি কখনো হামিন, জিবরিল ভাইয়া আর ইনায়া আপুর মতো কিছু জিততে পারব না। কারণ, আমি তাদের মতো নই।' সে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বুকে চাপা যন্ত্রণা প্রকাশ করছে। তার এই কথায় ইমামারও অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভূত হলো। সেও সোফায় সালারের পাশে এসে বসে পড়ল। হাতে করে আনা কফির মগটি টেবিলে রেখে দিল। সালার তো বাইরে বাইরেই থাকে, ইমামাই তার পেছনে জানতোড় মেহনত করেছিল। তাকে কথা বলা শেখানো, পড়তে ও লিখতে শেখানো, উত্তম তরবিয়ত দান-সবই করেছিল ইমামা। সালার তাকে কেবল দত্তক নিয়েছিল। ইমামা তার জীবন বদলে দিয়েছিল। সে ভেবেওছিল, সবকিছু এখন ঠিক আছে। কিন্তু রাইসা নিজেকে বাকিদের সঙ্গে তুলনা করে

যে পার্থক্য দেখছিল, তা তাদের দুজনকেই উদবিগ্ন করে তুলল।

কান্নার পর এখন সে শান্ত হয়ে গেছে। সালার তাকে কোল থেকে আলাগা করে বলল— “এবার থামো”

ভিজে চোখে-মুখে রাইসা মাথা নাড়ল। আর চুলগুলো আবারও এলোমেলো হয়ে গেছে। রিবনটা আরো টিল হয়েছে। কোল থেকে নামতে নামতে তার চোখ ইমামার দিকে পড়ল। যেন আরও কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেল। সালার তাকে আবারও টেবিলে বসাল।

'তোমার কেন মনে হয় ওরা ভাগ্যবান আর তুমি নও?' তাকে বসিয়ে সালার চশমাটা খুলে ভেজা কাচ টিস্যু দিয়ে মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল।

তারা যাতেই অংশ নেয়, তাতেই জিতে। আমি তো জিততে পারিনি।' সে আবার মন খারাপ করল। 'তারা পরীক্ষায় আমার চেয়ে অনেক ভালো গ্রেড পায়। আমি কখনো এ+ পাই না। আমি এমন কোনো কাজ পারি না, যা তারা পারে না। কিন্তু তারা এমন অনেক কাজ পারে, যা আমি পারি না।' আবার

আট বছরের এই মেয়েটির হয়তো গড়পড়তা বুদ্ধি। কিন্তু তার বিশ্লেষণ চমৎকার।

'প্রতিটি প্রতিযোগিতায় যারা জিতে, পৃথিবীতে তারাই কেবল ভাগ্যবান নয়। সবকিছুই যারা করতে পারে তারাই কেবল খোশকিসমত নয়।' সালার এবার তাকে বোঝাতে লাগল। 'ভাগ্যবান তারাই, যারা বুঝতে পারে সে কোন কাজে পারদর্শী, তারপর সেটাই করে। অযথা অন্য কাজে নিজেদের শক্তি নষ্ট করে না।' রাইসার কান্না থেমে গেছে। সে বাবার মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে।

তুমি খুব ভালো চেষ্টা করেছ। স্পেলিং বি-তে এর চেয়ে ভালো পারফর্ম তুমি করতে পারতে না। সেখানে গুটিকয়েক বাচ্চা তোমার চেয়েও ভালো ছিল, তারা তোমাকে হারিয়েছে। কিন্তু সেই ডজনখানেক বাচ্চার কথা ভাবো, যাদেরকে হারিয়ে তুমি ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছেছ। তারাও কি দুর্ভাগা? তারা কি ভেবে নিবে যে, সব সময়ই তারা হারবে?" সালার তাকে জিজ্ঞেস করল। রাইসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাথা নেড়ে না করল।

: 'হামিন, জিবরিল, ইনায়া তারা তো খেলাধুলায় পারদর্শী নয়। তাদের চেয়ে কত পারদর্শী ছেলে-মেয়ে আছে। তারা তো তাদের সঙ্গে পারবে না। সুতরাং এটা বলা যাবে না, হামিনরা সবকিছু পারে।' এবার ইমামা তাকে বোঝাতে লাগল। রাইসা মাথা নাড়ল। সত্যিই তা-ই। তারা তিনজন খেলায় ভালো ছিল, তবে সবচেয়ে ভালো নয়।

: 'তাই তোমাকে এখন দেখতে হবে, কোন বিষয়ে তুমি খুব ভালো পারো। তারপর সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। জিবরিল,

হামিন আর ইনায়া করেছে, তাই আমিও করব, এমনটা কখনো ভেবো না।" সালার ভীষণ গুরুত্বসহকারে তাকে বোঝাল।

'এ প্লাস পাওয়া ছাত্রই জীবনে বড় কিছু হবে, এমনটা নয়। বড় কিছু ও সফলতা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই তুমি দোয়া করো, আল্লাহ যেন তোমাকে দিয়ে অনেক বড় কাজ করান। অনেক বড় করেন এবং অনেক অনেক সফলতা দেন। রাইসা আঙুলের ডগা ঠেলে তার চশমা ঠিক করল।

তুমি রাইসা, তুমি হামিন, জিবরিল কিংবা ইনায়া নও। তুমি ওদের থেকে আলাদা। ভিন্ন। এটাই সবচেয়ে বড় গুণ। আলাদা ও অনন্য হওয়াটাই সবচেয়ে ভালো বেশিই, রাইসা। স্পেলিং বি-র প্রতিযোগিতায় কিছু শব্দের বানান করে, খেতাব জেতাই ভাগ্যবানের সংজ্ঞা নয়।" সালার এবার তার চুলের রিবন ঠিক করে আবার বেঁধে নিল।



শব্দের বানান করার চেয়েও জীবনে আরও অনেক যোগ্যতা প্রয়োজন। একটা দুটো নয়। অনেক অনেক যোগ্যতা। আর তোমার মধ্যে অনেক যোগ্যতা আছে, আরও আসবে। তুমি একদিন তারকার মতো হবে। যেখানেই যাবে, যা-ই করবে চমকাতে থাকবে।"

রাইসার চোখ, মুখ আর ঠোঁট, একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আর জানো তো, প্রকৃত ভাগ্যবান কে?' সালার প্রশ্ন করল। 'সে, যার ভালো ব্যবহার ও নৈতিকতা মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। আর তুমি তো আমার খুব খুব এবং খুউব ভালো আখলাকওয়ালি মেয়ে।' সে এবার টেবিল থেকে নেমে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সে বুঝতে পারল, বাবা তাকে কী বলতে চাচ্ছেন।

: 'হ্যাঁ, আমি তা-ই, অনেক ভালো আমি।' ভালোবাসার বুলিতে সায় দিল সে। সালারের থেকে আলাদা হয়ে সে এবার ইমামার কাছে গেল। ইমামা তার হেয়ার রিবন খুলে আবার ঠিক করে

দিল। সালার কফিতে দুটো চুমুক দিয়ে, সেটা আধখাওয়া রেখেই সেখান থেকে চলে গেল। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

: 'বাবা আমার ওপর রাগ করেননি তো?' সালার চলে যাওয়ার পর বাইসা ইমামাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, রাগ করেননি, কিন্তু তোমার কান্না দেখে আমাদের মন খারাপ হয়েছে।

ইমামা উত্তর দিল।

: 'আই অ্যাম সরি, মাম্মি! আমি আর কখনো কাঁদব না।' সে ইমামার কাছে প্রতিজ্ঞা করল। ইমামা তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল-'তুমি আমার বাহাদুর মেয়ে।'

বাইসা উচ্ছ্বসিত হয়ে মাথা নাড়ল। তার বাবা-মা তাকে এত সাহসী এবং ভদ্র মনে করে-তা সে জানতই না। আজকের এই

কথোপকথনটি আট বছরের রাইসার মনে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। এরপর আর কখনো তাকে এমন কোনো বিষয়ে বোঝাতে হয়নি।

তাকে এখন স্থির করতে হবে, সে কোন কাজে ভালো, কোন কাজে এগিয়ে যেতে পারবে। তার বাবা তাকে বলেছে, ভাগ্যবান সে-ই, যে এই রহস্য ভেদ করে, নিজেকে সেই কাজে নিয়োজিত করে। রাইসাও এখন ভাগ্যের এই নতুন সংজ্ঞার ওপর নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সংগ্রামে ব্যস্ত।

১৬

হামিন সিকান্দার এমআইটি-র SPLASH প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয়েছে। তার স্কুল থেকে এই প্রোগ্রামের জন্য সে-ই এই প্রথম নির্বাচিত হলো। এই প্রোগ্রামের অধীনে এমআইটি প্রতি বছর অসাধারণ মেধাবী কিছু ছাত্রদের নির্বাচন করে। তাদেরকে বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কয়েক সপ্তাহ কাটানোর

সুযোগ দেয়। সেখানে তারা বিশ্বের সেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পায়।

এটি ছিল একেবারে কম বয়সি সেরা মস্তিষ্কগুলোকে আবিষ্কার, যাচাই এবং নির্বাচন করার জন্য এমআইটি-র একটি নিজস্ব প্রক্রিয়া। এই সংবাদটি ইমামা ও সালারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও সম্মানের সংবাদ। তবু তারা উদবিগ্ন হয়ে পড়ল। জিবরিলকে তারা একা একা যেকোনো জায়গায় পাঠাতে পারে, কিন্তু হামিনকে নয়। এই বয়সে, এত দীর্ঘদিনের জন্য তাকে কোথাও পাঠানোটা খুব জটিল সিদ্ধান্ত। বিশেষ করে ইমামার কাছে। সে কোনোমতে তাকে একা পাঠাতে তৈরি নয়। কিন্তু স্কুলের জোর ও হামিনের জেদ তাকে হার মানতে বাধ্য করল।

: 'আমরা তো তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। কাল কী হবে, কীভাবে হবে-এসব কিছুই আমাদের হাতে নেই। তাই আমি বিপদের ভয়ে তাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখব না।' সালার স্পষ্ট ভাষায় বলল। 'সে যাক। দুনিয়া দেখুক। বুঝুক।

আমরা যদি তাকে উত্তম তরবিয়ত দিয়ে থাকি, তাহলে সে সবখানে মানিয়ে নিতে পারবে। ইমামাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। ইমামা ভারী মনে সম্মত হলো।

সাড়ে দশ বছর বয়সে হামিন এই প্রথম এমআইটি-র দুনিয়া আবিষ্কার করতে গেল-এক অদ্ভুত কৌতূহল ও উচ্ছ্বসিত উত্তেজনা নিয়ে। সে বড় মানুষের মতো একা কোথাও ঘুরতে যাচ্ছে, এ নিয়েই ছিল তার বেশি উত্তেজনা। বাড়ি থেকে পাঠানোর সময় সবাই ভেবেছিল, ওখানে গিয়ে কয়েকদিনের বেশি সে থাকতে পারবে না। অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না, হোমসিক হয়ে যাবে এবং ফিরে আসার জন্য জেদ করবে। তাদের সব ধারণা একেবারে ভুল প্রমাণিত হলো। সে একদমই হোমসিক হলো না। হামিন সিকান্দার সাময়িকভাবে হলেও সেখানে গিয়ে সবকিছু ভুলে গেল। ওটা এক অন্য দুনিয়া, সেই দুনিয়া এই সাড়ে দশ বছরের ছেলেটিকে দারুণভাবে আকর্ষণ করল। সেই দুনিয়ায় বুদ্ধিমত্তার জয়গান গাওয়া হয়। হামিনও ছিল সেই বুদ্ধিমানদের একজন।

সেখান গিয়ে সে SPLASH-এর ঘোষণাকৃত, বিশ্বের সেরা বৃদ্ধিমানদের তালিকায় গণ্য হয়। সেখানে গুটিকয়েক শিশুই ছিল, যাদের আইকিউ লেভেল ১৫০।

তাদের মধ্যে হামিন শীর্ষে। এমআইটি হামিনকে শুধু সেরা মস্তিষ্ক ঘোষণাই দেয়নি; বরং তাদের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের সেরা মস্তিষ্ক হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও দেয়। এতে হামিন ছিল প্রচণ্ড খুশি। এ সবার উদ্দেশ্য নিয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হলেও, এখন থেকে বারবার এমআইটি-তে যাওয়ার সুযোগ পাবে, এটা নিয়েই ছিল সে বেশি উচ্ছ্বসিত। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান কিছু নির্বাচিত শিশুদের জন্য, প্রতি বছর এমআইটি-র কিছু প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এটি ছিল তাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মেধার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সুবিধা অর্পণ।

: 'আমাকে প্রতি বছর সেখানে যেতে হবে।' বাড়ি ফিরেই সে ডিনারে বসে বাবা-মাকে জানাল। তারা এ কথায় মনোযোগ দিল না। তাদের মনোযোগ ছিল, এতদিন বাড়ি থেকে দূরে থাকার পরও, হামিনকে এত হাসিখুশি দেখে।

: 'না, আমি কাউকে মিস করিনি। সেখানে আমি খুব এনজয় করেছি।' তার চিরাচরিত স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়ে সে ইমামাকে উত্তর দিল। তারা তার কথা শুনে থমকে গেল। সে বড় হলে, তারা এত চিন্তা করত না। কিন্তু সে এখন ছোট। এই ছোট বয়সে অন্য কোথাও গিয়ে যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে, বাড়ির কথা মনেও না পড়ে, তাহলে তো চিন্তার বিষয়।

: 'বাবা, আপনি জানেন? আগামী বছর আমি যখন সেখানে যাব, তখন অনেক সুযোগ-সুবিধা পাব। তার পরের বছর আরও বেশি, তার পরের বছর আরও বেশি.... তার পরের বছর আরও বেশি।' সে প্রচণ্ড এক্সাইটেড হয়ে বলে যাচ্ছে। যেন প্রতি বছর ওখানে যাওয়ার এই পরিকল্পনা সে নিজেই করে এসেছে।

'আপনি জানেন? আমি এমআইটি-র যেকোনো সামার প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করলেই তারা আমাকে ভর্তি করে নেবে, আর আমার কাছ থেকে কোনো ফিসও নেবে না। উলটো আমাকে ওখান থেকে অনেক কিছু ফ্রিও দেবে।' সে ভাবল তার বাবা-মা এই খবরে তার মতো খুশি হবে। অথচ তারা চিন্তায় পড়ে গেছে।

'তো বাবা, আপনি আমাকে প্রতি বছর সেখানে যেতে দিবেন তো?' অবশেষে সালারকে সে জিজ্ঞেস করল। যেন সে এসেই আবার যাওয়ার অনুমতি নিয়ে রেখে দিতে চাচ্ছে।

: 'পরের বছর অনেক দূরে হামিন। পরের বছর যখন আসবে তখন দেখা যাবে।' সালার গুলিয়ে গিয়ে তাকে উত্তর দিল।

'কিন্তু আমাদের প্ল্যানিং তো এখন থেকেই করা উচিত।' সালার তাকে দেখে অবাক হলো। জীবনে এই প্রথম সে পরিকল্পনা

করে কাজ করার কথা বলছে। এটি হলো এই ছোট মস্তিষ্কের ওপর এমআইটি-র প্রথম প্রভাব। সালার ভাবল।

'আমি ভাবছি, আমি এমআইটি থেকেই পড়ব।' বাবাকে সে জানাল। তার কথায় তারা খুব মজা পেল। ওখানে যাওয়ার আগে সবসময় সে পড়াশোনা না করার কথা বলত। তার মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো সে-ই, যে কেবল হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ে। আর সে যেহেতু নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাইত, তাই সেও কেবল হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ার কথাই বলত।

: 'তারপর?' সালার তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'তারপর আমি নোবেল জিতব।' সে ভীষণ শান্ত মনে বলল। এমন যেন সে স্পেলিং বি জেতার কথা বলছে।

তারা দুজনই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা আনন্দিত হলো না, হলো চিন্তিত।



: আপনি কী খুঁজছেন পাপা? সালার অত্যন্ত শান্ত স্বরে সিকান্দার উসমানকে জিজ্ঞেস করল। দুই ঘণ্টা যাবৎ বাবার পাশে বসে আছে সে। নিজে বলার চেয়ে, উনার কথা শুনতে বেশি উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। উনার কথায় আলঝেইমারের প্রভাব স্পষ্ট। বলতে বলতে তিনি বারবার থমকে যাচ্ছিলেন, আমতা-আমতা করছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি পূর্বাপর ভুলে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে, আবারও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে তিনি কামরার সব জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলেন। মনে হচ্ছে তিনি কিছু গভীরভাবে খুঁজছেন। অবশেষে সালার তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেই বসল, পাপা! আপনি কী খুঁজছেন?

: এখানেই তো ছিল! সিকান্দার উসমান সালারের জিজ্ঞাসার জবাবে বললেন। তিনি বেডসাইড টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, সালার একটু দূরে সোফায় বসে।

: 'কী এখানেই ছিল?' সালার একটু বিরক্ত হলো।

: 'কামরান একটা সুগার বক্স পাঠিয়েছিল। সেটাই তোমাকে দেখাতে চাচ্ছি।' তিনি বিপুল আগ্রহ নিয়ে আবারও খুঁজতে শুরু করলেন।

সুগার বক্স তো একদম ছোটখাটো কোনো জিনিস না। তারপরও তিনি বালিশ উঠিয়ে উঠিয়ে তা খুঁজছিলেন। সে সময় তার মস্তিষ্কে এই অনুসন্ধানকৃত জিনিসটার

কোনো ছবিও ছিল কি না, কে জানে। সালার এই আলঝেইমারের রোগীকে প্রথমবার প্রভাবিত অবস্থায় দেখেছিল, যিনি মূলত তার বাবা।

: 'কাজের ছেলেটা হয়তো কোথাও রেখেছে। আমি তাকে ডাকছি।' তিনি ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বললেন। তারপর ফিরে এসে সালারের পাশে বসে চাকরকে হাঁক ছেড়ে ডাকতে লাগলেন। সালার তাকে নিবৃত্ত করল।

: 'পাপা, ইন্টারকম আছে তো, এতে ডাকুন।' সালার সাইড টেবিলে পড়ে থাকা ইন্টারকমের রিসিভার ওঠাতে ওঠাতে বাবাকে বলল।

: 'ইন্টারকমে ডাকলে নবাবজাদা আসে না।' এক অদ্ভুত উত্তর করে তিনি, আবারও তাকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। তিনি এক নিশ্বাসে যে চাকরকে চিৎকার করে ডাকছিলেন, সে মূলত এ সময় বাড়িতে নেই। তার ছুটি চলছিল। সালার এটা জানত। তাই ভাবল, বাবাকে সাহায্য করা দরকার।

: 'ওর নম্বর দিন। আমি ডাকছি।' সালার আবারও সিকান্দার উসমানকে থামানোর চেষ্টা করল।

: 'নম্বর তো মনে নেই। দাঁড়াও, আমি ফোন থেকে দিচ্ছি।' এ বলে তিনি জামার পকেট হাতাতে লাগলেন। সালার অদ্ভুত হতাশায় ইন্টারকমের রিসিভার হাতে নিয়ে রইল। যে সেলফোনটা তিনি খুঁজছিলেন, তা সামনে মেঝেতেই পড়ে আছে। ইন্টারকমের নম্বরটা তিনি ফোনের মেমোরি ঘেঁটে বের করতে চাচ্ছিলেন। পরিচারকের ইন্টারকম নম্বরের একটা সংখ্যাও তার মনে নেই। আলঝেইমারের হাতে সালার তার বাবাকে এভাবেই ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে দেখছিল। তার তখনকার অনুভূতি বোঝাতে 'কষ্ট' শব্দটা নেহায়েত তুচ্ছ।

অনেক বছর পর ইমামাসহ সালার পাকিস্তানে এসেছে। তাও মোটে দুই সপ্তাহের জন্য। তায়েবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। কয়েক মাস হলো তার সাথে সালারের দেখা নেই। তার পীড়াপীড়িতেই সপরিবারে সালারকে এখন পাকিস্তানে আসতে

হলো। এখানে এসে বাবা-মায়ের এই অবস্থা দেখে সে ভীষণ মনঃক্ষুব্ধ হয়ে গেল। বিশেষ করে সিকান্দার উসমানকে দেখে। এর আগে সে বাবাকে কী ভীষণ সুস্থসবল, কর্মচঞ্চল দেখেছে। মেশিনের মতো তিনি সারাটা জীবন খেটে গেছেন। কাজকর্মই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিনোদন। অথচ সেই তিনি আজ কতদিন যাবৎ গৃহবন্দি হয়ে আছেন! কয়েকজন চাকর-বাকরে তার জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সালারের বড় ভাই ইসলামাবাদেই নিজের বাড়িতে পরিবারসহ থাকেন। সে সিকান্দার উসমান ও তাইয়েবার সঙ্গে থাকতে তো রাজি, কিন্তু তার বিবি-বাচ্চারা এই পুরাতন বাড়িতে আসতে রাজি নয়। ওদিকে তাইয়েবা ও সিকান্দার উসমানের মনও সায় দিচ্ছিল না, নিজেদের ভিটেবাড়ি ছেড়ে ছেলের ঘরে ওঠার।

সালারসহ সিকান্দারের তিন ছেলেই বিদেশে থাকে। মেয়ে করাচি। যে বাড়ি একসময় বুড়ো-বাচ্চাদের কলরবে মুখরিত ছিল, আজ তা নিশুত ও শূন্যকায়া। আব্বার যখন প্রথমবার আলঝেইমার ধরা পড়লো, সালার শোনার সাথে সাথেই

ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল। একদম আকস্মিক রোগটা ধরা পড়ল। সিকান্দার উসমান একটা দরকারি পরামর্শের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন, সেখানেই অন্যান্য চেকআপ করতে গিয়ে কাকতালীয়ভাবে ধরা পড়ো আলঝেইমার। তার অনেকদিন পরে সালার ব্যাপারটা জানতে পারল।

'আপনি আমাকে তখন বলেননি কেন পাপা?' সিকান্দারকে অভিযোগের সুরে বলল। জবাবে তিনি এক রহস্যময় হাসি দিয়ে বলেছিলেন-'কী বলব ইয়ার। নিজের অসুস্থতার চেয়েও তোমার অসুস্থতা নিয়ে আমার চিন্তা বেশি। বয়স তো আর কম হয়নি। সত্তর হলো। কোনো রোগ-বালাই না হলেও আর কতদিনই-বা বাঁচব। আলঝেইমার না হলেও এই বয়সে এমনিতেই মানুষের কিছু মনে থাকে না।' নিজেও অসুস্থতাকে তিনি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলেন। কেমন যেন কিছুই হয়নি। অথচ সেই রোগই চোখের সামনে তার বাবার স্মৃতিশক্তিকে ঘুন পোকায় মতো খেয়ে চলেছে। জীবন এক অদ্ভুত জিনিস। মানুষ তার দীর্ঘতার দোয়া করে, আবার দীর্ঘ হলে তার প্রভাবকেও ভয় পায়।

সিকান্দার উসমান এখনো তার সেলফোনটা খুঁজে চলেছেন।
সালার ফ্লোর থেকে ফোনটা উঠিয়ে বাবার হাতে দিল।

: 'ওহ আচ্ছা, এখানেই তো ছিল।' তিনি ফোনটা হাতে নিলেন।
পরক্ষণেই

ভাবতে লাগলেন, কেন ফোনটা নিলেন।

'ফোনটা কেন দিলে বলো তো? আমি কি তোমার কাছে
চেয়েছিলাম?' তিনি ঋকুঁচকে সালারকে জিজ্ঞেস করলেন।
এই প্রশ্ন শুনে সালার যেন গলায় কিছু আটকে যেতে অনুভব
করল। জমাট কান্নার কিছু।

- 'না। এমনিতেই দিলাম আমি।' এটা বলেই সে উঠে গেল।
বাবার সামনে বাচ্চাদের মতো কাঁদতে চাচ্ছিল না।

: 'তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ? আরেকটু বসবে না?' তিনি কিছুটা হতাশ হলেন।

: 'বসব তো। একটু পরে আবারও আসছি।' সালার তার থেকে দৃষ্টি লুকিয়ে, ধরা গলায় কথাটা বলেই সে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

বেডরুম লাগোয়া বাথরুমের বাথটাবের পাশে বসে, সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হুঁই করে কেঁদে ফেলল। সিকান্দার উসমান তার আত্মার নিকটতম মানুষ। এই নৈকট্যই আজ তাকে কষ্ট দিচ্ছে। জীবনযুদ্ধে সে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, বাবার ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করতে পারেনি। করবে কিভাবে? দেখাসাক্ষাৎই তো হয় কালেভদ্রে।

SIP তার জীবনকে একটি ঘূর্ণাবর্তে আটকে ফেলেছে। সারা দিন দৌড়ের ওপর থাকতে হয়। আজ এখানে তো কাল সেখানে। চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ও দুনিয়ার বড় বড়

ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে আলাদা একটা ভ্যালু দাঁড় করিয়ে ফেলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। এই গতিময় কর্মজীবন সালারকে জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বেখবর করে দিয়েছে। সে তা অস্বীকার করছে না। যাইহোক, এখন সমাধান খোঁজার পালা। কিন্তু কোনো সমাধানই তো মিলছে না। বাবা-মা তার সাথে আমেরিকায় শিফট হতে কখনোই রাজি হবেন না। সালার এটা ভালো করেই জানে। আবার তার নিজেরও সবকিছু ছেড়েছুড়ে, এখানে এসে থাকাও সম্ভব নয়। তারপরও একটি সমাধান আছে। যদিও তা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

১৮

- 'ইমামা, তুমি বাচ্চাদের নিয়ে পাকিস্তানে শিফট হয়ে যাও।' দেরি না করে সালার সেই রাতেই ইমামার সামনে সমাধানটা পেশ করল। হুট করেই ইমামা কথাটি বুঝে উঠতে পারল না।

মানে কী?



'আমি চাচ্ছি, তুমি হামিন, ইনায়া ও রাইসাকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে আসো। এই শেষ বয়সে বাবা-মায়ের আমাকে খুব প্রয়োজন। আমি তাদের সাথে থাকতে পারছি না। আবার তাদেরকে এ অবস্থায় একাকী ছেড়ে যেতেও পারছি না। তুমি তো বাবাকে দেখেছই...' সালারকে ভীষণ বিমর্ষ দেখাল।

: 'আমরা তো তাদেরকে আমেরিকায় আমাদের সঙ্গেও রাখতে পারি। ইমামা একটা উপায় বের করতে চেষ্টা করল।

: 'তারা এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমিও শেষ বয়সে তাদেরকে আপসেট করতে চাচ্ছি না। তাই তোমরাই এখানে শিফট হয়ে যাও। আমি তো আসা-যাওয়ার মধ্যেই থাকব। বাকি থাকল জিবরিল। সে এমনিতেও ইউনিভার্সিটিতে থাকে। তার অত বাড়ির প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আমি তো আমেরিকাতেও অধিকাংশ সময় দৌড়ের ওপরই থাকি। সেখানে ফ্যামিলি থাকা না-থাকা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হবে না।' সালার

অন্যদিকে ফিরে কথাগুলো বলল। ইমামা তার চেহারা পড়ার চেষ্টা করল। কি সহজেই না কথাগুলো বলে ফেলল সে! যেন এটা কোনো বিষয়ই নয়। দুই মিনিটের কাজ। 'তোমার বাবা-মাও তো এখানেই। তারাও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তুমি এখানে থাকলে তাদেরও দেখাশোনা করতে পারবে।' সালার ইমামাকে বলল। ইমামা কিছুটা রেগে গেল, 'তুমি এসব আমার বাবা-মায়ের জন্য করছ না সালার। তাই তাদের দোহাই দিয়ো না।'

তুমি কি তাদের কাছে থাকতে চাও না?' সালার তাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করল। 'তাদেরকে নিয়ে কি তুমি টেনশনে থাকো না? এই বয়সে তাদের দেখভালের প্রয়োজন। চব্বিশ ঘন্টা না হলেও, অন্তত কয়েক ঘন্টা কেউ তাদের সঙ্গে থাকুক। তবু তো তাদের হালপুরসি করার কেউ

থাকল।" সালার একনাগাড়ে বদে যাচ্ছিল। নিজের বাবা-মায়ের চেয়েও ইমামার বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ টানছিল বেশি। ব্যাপারটি ইমামার খারাপ লাগল। তার এমন আবেগী ব্লাক মেইলিংয়ের দরকার ছিল না।

'সালার। এত বছরে যখন আমার বাবা মায়ের বিষয়কে ইস্যু বানিয়ে পাকিস্তানে থাকার কথা বলোনি, আজকেও অযথা তা ইস্যু বানিয়ে না।' ইমামা না বলে থাকতে পারল না।

হ্যাঁ, বলিনি। আজকের আগে তো আমি আমার বাবা মায়ের এমন দুরবস্থা দেখিনি।' জবাবে সালার বলল।

: 'আমাকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করো না।' ইমামা আগের মতোই বলল। 'তুমি কি তাদের সঙ্গে থাকতে চাও না? এখানে, এই বাড়িতে?' সালার এবার স্পষ্টভাবে জানতে চাইল।

: 'আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।' ইমামা উত্তরে বলল।
সালার দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল।

তাদের সবারই তোমাকে দরকার ইমামা।

: 'আর তোমার? তোমার কি আমার কোনো দরকার নেই?
ইমামার কণ্ঠে অভিমান ঝরে পড়ল।

: 'তারা আর কয়দিনই-বা বাঁচবেন? শেষ বয়সে তাদের কোনো
খেয়াল রাখিনি, এই ভার আমি বইতে পারব না। ইমামা তাকে
বলতে পারল না, ঠিক একই কারণে আমিও তোমার সঙ্গে
ছায়ার মতো পাশে থাকতে চাই। তোমার জীবনেরই-বা আর
কয়দিন বাকি আছে। ডাক্তার বলেছে পাঁচ-সাত বছর। বেশির
চেয়ে বেশি দশ বছর। অথচ সালার এর আগেই বিচ্ছেদ চাচ্ছে।
সে এসব কথা মুখে আনতে পারছে না। আসলে এগুলো নিয়ে
সে ভাবতেই চায় না-জীবনের ভয়াবহ কোনো দুঃস্বপ্নের
ব্যাপারে; ভবিষ্যতের খারাপ দিনগুলোর ব্যাপারে। সে বর্তমান

নিয়ে ভাবতেই উদ্গ্রীব। এখন যা আছে তা আঁকড়ে ধরেই সে বাঁচতে চায়।

: 'আমাকে তোমার দরকার সালার। আমাকে ছাড়া একাকী তুমি কীভাবে থাকবে?' ইমামা তাকে বলল।

: আমি মানিয়ে নেব ইমামা! তুমি জানোই তো, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সবকিছু ভুলে যাই আমি।

এটা যদিও সত্য কথা। কিন্তু ইমামার মুখের ওপর সালারের এভাবে বলা উচিত হয়নি। ইমামা খুবই হাট হলো। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তেই তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। সালার তার সামনে সোফায় আছে। সে ইমামার থেকে দৃষ্টি লুকাতে চাইল, কিন্তু পারল না।

: 'জীবনে যদি মানুষ শুধু নিজের প্রয়োজন নিয়েই ভাবে, তাহলে সে স্বার্থপর হয়ে যায়।' সালার দর্শনের মোড়কে ইমামাকে নিজের অবস্থান বোঝাতে চাইল।

: 'আমি জানি, আমার কিংবা বাচ্চাদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। কাজই তোমার সব। কাজই তোমার ফ্যামিলি। তোমার আনন্দ-বিনোদন সবকিছু এই কাজই। কিন্তু আমার জীবনে তুমি আর বাচ্চারা ছাড়া আর কারও কোনো অস্তিত্ব নেই। আমার কাজবাজ, ধ্যানমগ্নতা ও হাসিখুশি সবই তোমাদেরকে ঘিরেই।' ইমামা ভেজা কঠে অভিযোগ করল। সালারের উদাসীনতা এবং নিজের অপারগতার কথাও শোনাল। 'তুমিও তো চিকিৎসাধীন, এ নিয়ে কেন ভাবছ না? তোমারও তো কোনো দেখভালকারী দরকার।' ইমামা রোগের নাম মুখে না এনেই সালারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইল, তারও একজন সেবিকার প্রয়োজন।

: 'এসব পুরোনো কথা ইমামা। আমি ঠিক আছি। পাঁচটা বছর এই রোগ নিয়েই তো জীবন চলছে দিব্যি। আমার কিছুই হবে না।'



কেমন যেন সে বালিতে আঁকা ইমামার আশঙ্কাগুলো পড়ে, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল।

: 'কেবল পরিচারকদের ভরসায় পাপাকে আমি এই অবস্থায় রেখে যেতে পারি না। হামিনকে আমি পাপার সঙ্গে রেখে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সেও তো আর একা থাকতে পারবে না। তাই এই বাড়িতে তোমার প্রয়োজন। তুমি একে রিকোয়েস্ট ভাবতে পারো বা স্বার্থপরতা কিংবা পীড়াপীড়ি। যাইহোক, আমি চাচ্ছি যেভাবেই হোক তুমি পাকিস্তানে চলে আসো। এখানে। এই ঘরে।' ইমামা সালারের কণ্ঠে ও চোখে অনুনয় দেখতে পেল।

'তুমিবিহীন আমার জীবন মরুভূমি। আমি তোমাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বাচ্চাদের কোলাহল, ঘরের সুকুন আমার জীবনের রংয়ে মিশে গিয়েছে। কিন্তু আমার প্রতি পাপার অনুগ্রহও তো সীমাহীন। শুধু আমার প্রতিই নয়, আমাদের দুজনের প্রতিই। আমি তার শান্তির জন্য নিজের শান্তি কুরবানি করতে প্রস্তুত। এটা আমার দায়িত্ব।' সালার ইমামাকে যা কিছু

বলছিল, তা কোনো পরামর্শ কিংবা মতামত নয়, কোনো অনুরোধও নয়। তা ছিল এক চূড়ান্ত ফায়সালা। তা শুধু ইমামাকে শোনাচ্ছিল। ইনামা সালারের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। সে ভুল কিছু বলছে না। কিন্তু ভুল সময়ে বলছে। সে তার কাছে কুরবানি চাচ্ছে, অনেক বড় কুরবানি। ইমামা কিছু না বলেই সেখান থেকে উঠে গেল। সে তো আর ফেরেশতা নয়, সালার কেন এটা বুঝছে না?

১৯

দুই সপ্তাহ পর আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার আগে সালার, সিকান্দার উসমানকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল। তিনি খুশি হলেন না।

'না, ইমামা ও বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসা নিরেট বোকামি। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন। 'তাদের পড়াশোনার ক্ষতি

হবে। তাছাড়া তুমি এখানে তাদেরকে কেনই-বা আনতে চাচ্ছ?
এখানে আসার ফায়দা কী?

সালার উনাকে একটুও বুঝতে দিল না যে, এসবকিছু সে তার
জন্যই করছে।

: 'এমনিতেই পাপা! ওখানে আর্থিকভাবে সবকিছু ম্যানেজ
করাটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' সালার বাবাকে মিথ্যা বলল। সে তাকে
অনুগ্রহের ইহসাস দিতে চাইল না। 'জীবনযাপন সেখানে খুবই
ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। মোটেও সেভিংস করতে পারছি না।
এখানে কিছুদিন থাকলে এই মন্দাটা কাটিয়ে উঠতে পারব।'
সালার খুব সাবলীলভাবে বলল।

। 'কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে, SIF এখন দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে
চলছে। প্যাকেজগুলোর কাটতি খুব' সিকান্দার উসমান কিছুটা
বিভ্রান্ত হলেন।



'হ্যাঁ, তা তো ভালো চলছে। এ নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই।
ব্যস, সেভিংসটা ঠিকমতো হচ্ছে না। এদিকে বাচ্চারাও বড়
হচ্ছে। আমি চাচ্ছি, কয়েকটা বছর তারা পাকিস্তানে থাকুক।
নিজেদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুক। তারপর আবার
নিয়ে যাব।' সালার তার অজুহাতে আরেকটু রং চড়াল।
সিকান্দার উসমান পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

: 'তুমি সেখানে একা কীভাবে থাকবে। তোমার আবার চিকিৎসা
চলছে। বিবি-বাচ্চারা ছাড়া সেখানে তোমার কে খেয়াল
রাখবে?' তিনি নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

: তোমার আর্থিক সমস্যা হলে আমার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা
জমানো আছে, সেগুলো তোমাকে দেই?

সালার কথা কেড়ে নিল। "আমার জন্য : 'না পাপা, এখন লাগবে
না।' বলতে বলতে সালার বাবার হাতটা মুঠোয় পুরে নিল।
আমার জন্য আপনি আর কত করবেন। আমাকেও আপনার

জন্য কিছু করে দিন। অনুগ্রহ না করতে পারলেও অন্তত হকটা আদায় করতে দিন।" সালার বাবাকে এক অদ্ভুত অসহায়ত্ব নিয়ে বলল।

: তোমাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হবে।

সালার আবারও বাবার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'আমিও আপনাকে নিয়ে উদবিগ্ন থাকি।'

: 'এজন্যই তুমি এখানে সবাইকে রাখতে চাচ্ছ?' সিকান্দার উসমান এবার রহস্য উন্মোচন করে ফেললেন।

: আপনি যা ভাবার ভাবুন।

: আমি আর তাইয়েবা এখানে বিলকুল ঠিক আছি। পুরোনো কাজের লোকেরাও সবসময় সাথে থাকে। সবকিছুই তো ঠিকঠাক চলছে। তুমি আমার কারণে এমনটা করো না।

সিকান্দার এখনো মেনে নিতে পারছেন না। সন্তানদের ওপর তিনি সবসময় অনুগ্রহ করেছেন। অন্যের অনুগ্রহে চলার অভ্যাস তার কখনোই ছিল না। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসেও তিনি এই অভ্যাসের ব্যত্যয় ঘটাতে চাচ্ছেন না। যদিও তার প্রচণ্ড ইচ্ছা, অপারগতা; তবু তিনি চান না, সন্তানরা তার কারণে কোনো অসুবিধায় পড়ুক।

: 'এমনিতেই আমি বেশি বেশি দুশ্চিন্তা করি। ফ্যাক্টুরিতেও যাই মাঝেমধ্যে, কাজকাম একদম ছেড়ে দিছি তো; তাই একটু-আধটু ভুলে যাই।' তিনি আলঝেইমারের প্রভাব ঢাকতে চাচ্ছিলেন। 'স্ত্রী-সন্তানদেরকে তোমার কাছে রাখা উচিত সালার! তুমি কেবল আমার আর তাইয়েবার জন্য তাদেরকে জোর করে এখানে রেখো না।' তিনি সালারকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। 'আমি তো তাদেরকে জোর করে রাখছি না পাপা। তারা স্বেচ্ছায় এখানে থাকতে চাচ্ছে। এখানে এলেই তারা সবসময় খুশি হয়। এখনো খুশি হবে।' সালার বাবাকে আশ্বস্ত

করল। কিন্তু তার কল্পনায়ও আসেনি, বাবার মতামত শীঘ্রই সঠিক হতে চলেছে।

২০

- 'আমি পাকিস্তানে যাব না।' পাকিস্তানে শিফট হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে প্রবল বিরোধিতা এলো হামিন সিকান্দারের পক্ষ থেকে। তার এই বিরোধিতা কেবল সালারের কাছে নয়, ইমামার কাছেও ছিল অপ্রত্যাশিত। পাকিস্তানে যাওয়ার কথা শুনলেই তার মন নেচে উঠত। দাদার সাথেও তার ভালো জমত। দাদিরও চোখের মণি ছিল। পাকিস্তান তার কাছে কত প্রিয় জায়গা ছিল, অথচ আজ সেই পাকিস্তানে থাকার কথা উঠতে সে-ই সবার আগে বিরোধিতা করে বসল।

। 'বেটা, তোমার দাদা-দাদি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। তুমি তো দেখেছই তারা কত অসুস্থ তাদের এখন দেখভালের প্রয়োজন।' ইমামা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

: 'তাদের পাশে তো সবসময়ই সার্ভেন্টরা থাকে। তারাই তো তাদের দেখভাল করতে পারে।' সে কোনোভাবেই সম্মত নয়।

: 'সার্ভেন্টরা তাদের ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারবে না।' ইমামা উত্তরে বলল।

: তাহলে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিন।

হামিন আমেরিকান সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা ছেলো। ও সেই সংস্কৃতির নির্দয় অথচ বাস্তবসম্মত সমাধানটাই দিল।

: 'কাল যদি আমরাও বৃদ্ধ হয়ে যাই, তবে কি তুমি আমাদেরকেও বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিবে?' ইমামা তার কথায় নাখোশ হয়ে বলল।

: 'তাহলে তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।' হামিন মায়ের অসন্তুষ্টি বুঝতে পারল। :

'তারা নিজেদের দেশ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে আসতে চান না।' ইমামা বলল।

: 'তাহলে আমরাও কেন আমাদের বাড়ি ছেড়ে পাকিস্তানে যাব? কেন আমি আমার স্কুল ছেড়ে যাব?' হামিন দুনিয়ার সবচেয়ে মেধাবী ছেলেদের একজন। ভুল কিছু তো বলেনি। যৌক্তিক কথাই বলেছে। কিন্তু মেধাবীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা সবকিছু মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে, হৃদয় দিয়ে নয়।

। 'এটা তো আমাদের নিজস্ব বাড়ি নয় হামিন। আমরা এখানে ভাড়া থাকি। আমরা পাকিস্তানে চলে গেলে তোমার বাবা আর জিবরিলও এই বাসা ছেড়ে দিবেন। তখন তাদের এত বড় বাসা লাগবে না। জিবরিল তো এমনিতেই ইউনিভার্সিটিতে থাকে। তোমার বাবাও নিউইয়র্কে শিফট হওয়ার চিন্তা করছেন।' ইমামা ছেলেকে বলল।

: 'জিবরিল পাকিস্তানে যাবে না?' হামিন জিজ্ঞেস করল।

না। সে এখানেই থাকবে। সে তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। পাকিস্তানে চলে গেলে তার পড়াশোনায় ক্ষতি হবে। ইমামা তাকে বোঝাল। 'আমার পড়ালেখায়ও তো ক্ষতি হবে। আমারও তো প্রতি বছর MTT 'যেতে হয়? আমি কীভাবে যাব? হামিন মন খারাপ করে ফেলল। অস্থিরও হলো। তার সামার প্রোগ্রাম এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

: "জিবরিল তো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তুমি তো সবেমাত্র স্কুলে। পাকিস্তানে অনেক ভালো ভালো স্কুল আছে, তুমি



সবকিছু মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু জিবরিল পারবে না। সামনে তাকে মেডিকেল নিয়ে পড়তে হবে।" ইমামা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হামিনের মাথায় এসবের কিছুই ঢুকল না।

: 'ইটস নট ফেয়ার মান্নি। এটা কিন্তু অন্যায়।' হামিন মুখের ওপর বলে দিল। 'জিবরিল পাকিস্তানে না গেলে আমিও যাব না। আমাকে MTT যেতে হবে।' সে বিদ্রোহ করে বসলো।

: 'ঠিক আছে। যেতে হবে না। আমি, ইনায়া এবং রাইসা যাব। তুমি এখানে বাবার সঙ্গে থেকো।' ইমামা তার সঙ্গে আর বিতর্ক করতে চাইল না। 'এটা তোমার বাবার হুকুম। আমরা সবাই তার হুকুম মানব। তুমি অবাধ্য হতে চাইলে হও, তোমার মর্জি। আমি তোমাকে বাধ্য করব না।' বলতে বলতে ইমামা চলে গেল।

- 'তুমি কি পাকিস্তানে যেতে চাও না, হামিন?' রাতে সালার এসে তাকে জিজ্ঞেস করল। ইমামা আগেই তাকে হামিনের আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

'না...।' হামিন বাবার চোখে চোখ রেখে বলল। 'শুধু আমি না, কেউই যেতে চায় না।' সে একটু বাড়িয়ে বলল।

: 'আমি অন্য কারোর না, শুধু তোমার মতামত জানতে চাচ্ছি।' সালার খানিক কঠিন গলায় বলল। হামিন মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বইল। তারপর মাথা উঠিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে না সূচক মাথা নাড়াল।

: 'কারণ?' সালার আগের মতোই কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল।

: 'অনেক কারণ আছে।' হামিন দৃঢ়ভাবে বলল।

'কোনো কাজ করা বা না-করার কারণ একটাই হয়, বাকি সব হয় বাহানা। তুমি শুধু কারণ বলো, বাহানা নয়।' সালার তার শব্দচয়ন প্রত্যাখ্যান করে বলল। হামিন এই সাক্ষাতের জন্য

আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাই অনেকগুলো কারণও সে রেডি করে রেখেছে।

: 'পাকিস্তানে আমি অ্যাডজাস্ট হতে পারব না।' সে বুড়ি থেকে অবশেষে একটি কারণ হাতড়ে বের করল।

তুমি যদি কঙ্গোতে অ্যাডজাস্ট হতে পারো, তবে পাকিস্তানেও পারবে। অন্তত পাকিস্তান আফ্রিকার থেকেও খারাপ নয়। "আমি তখন ছোট ছিলাম।" হামিন পিঠাপিঠি উত্তর করল। তুমি এখনো ছোট।" সালার তার কথা কেটে দিল। - 'কিন্তু আমি এখন বড় হচ্ছি।' হামিন যেন আপত্তি করল। 'তোমার বড় হতে এখনো অনেক সময় লাগবে। কমসে কম পাঁচিশ বছর।' সালার খানিক গম্ভীরভাবে জবাব দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে হামিন কিছুটা নরম হলো। 'আই এ্যাম স্যরি বাবা।' তবে বাবার কথায় পুরোপুরি না গলে বলল। 'আমি পাকিস্তানে যেতে চাই না। মাম্মির জন্যও এটা ভালো হবে না।' হামিন বড়দের মতো বাবার ফায়সালা পর্যালোচনা করতে লাগল। সালার চুপ করে তার কথা শুনতে

লাগল। 'এখানে থেকেই আমার পড়াশোনা করা উচিত। বড়জোর ছুটিছাটায় পাকিস্তানে যেতে পারি। কিন্তু একেবারের জন্য না।' হামিন একদম 'আমেরিকান স্টাইলে' সালারকে তার সাধ্যাতীত ও সাধ্যাধীন বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বলতে লাগল। : 'কয়েকটা বছরই তো, হামিন। তারপর তুমি আবারও আমেরিকায় এসে যেকোনো স্কুলে পড়তে পারবে।' সালার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। : 'কয়েক বছরে অনেক কিছুই পালটে যায়। এমনকি এক বছরেই তো কত কী পালটে যায়।' এগারো বছরের এক বালক, বাবাকে পালটা যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছে। : 'তাহলে কি তুমি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করবে না?' সালার কথা পালটাল। : 'জিবরিলও তো ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, আপনিও তো পারেন। শুধু আমিই কেন করব?' হামিন উত্তর করল। পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানি ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সামনে বসে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ডিল করা, তাদের প্রশ্ন ও আপত্তির জবাব দেওয়া সহজ; কিন্তু নিজের এগারো বছরের ছেলের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। যে ত্যাগ তার ভাই দিচ্ছে না, বাবা দিচ্ছে না, তাহলে সে কেন

দিবে? এই 'কেন' এর উত্তর কোনো উপমা বা যুক্তির আদলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর উত্তর শুধু নৈতিক মূল্যবোধে পাওয়া সম্ভব; যে নৈতিক মূল্যবোধের মাঝে সে তার সন্তানদের লালনপালন করেছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয়, এরপরও তার সন্তান তাকে এই প্রশ্ন করছে! : 'তুমি জানোই তো, তোমার দাদা আলঝেইমারে আক্রান্ত। তিনি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এই সময়ে তার পাশে কারও থাকা দরকার। সবার মধ্যে তোমাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই আমি চাচ্ছি, তুমিই তার পাশে থাকো।' অবশেষে

সালার হামিনকে বোঝানোর মতো একটি উত্তর খুঁজে পেল। তাছাড়া তোমার মান্নি ইনায়া ও রাইসাকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলে এখানে তুমি কার কাছে থাকবে? তোমাকে দেখাশোনার জন্য তখন বাসায় কেউ থাকবে না।

'আমি নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে পারব।' বাবার কথা শেষ হতেই হামিন বলল। 'আমি এতটাও ছোট নই বাবা। আমি একা একা থাকতে পারব। আপনি আমাকে কোনো বোর্ডিংয়েও

অথবা কোনো আত্মীয়ের বাসায়ও রাখতে পারেন। হামিন সালারের সামনে একের পর এক সমাধান পেশ করতে লাগাল।

'এগুলোর একটিও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সবার সঙ্গে তুমি পাকিস্তানেই যাবো।' সালার স্পষ্টভাবে হামিনকে জানিয়ে দিল।

বাবা, আপনি আমাকে ও জিবরিলকে, দুজনকে দুই চোখে দেখেন কেন?

ছেলের এই বাক্য সালারের মাথা ঘুরিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে বিস্ফোরিত চোখে সে তার এগারো বছরের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এই দুই চোখে দেখার বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করতে পারবে?' সালার এবার আগের চেয়েও বেশি গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সে ভেবেছিল, পাঁচ মিনিটেই হামিনকে মানিয়ে ফেলবে। কিন্তু এখন তো পুরো প্যাণ্ডোরার বাক্স খুলে বসেছে সে।

'জিবরিলকে আপনি আমার চেয়েও উত্তম মনে করেন।' এই মন্তব্যটি ছিল আগের চেয়েও ভয়াবহ। দুজন একে অপরের চোখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ধাতস্থ হয়ে বলল, 'আমি কেন তাকে উত্তম মনে করব?' সালার যেন তার ওপর আরোপিত অপবাদের ব্যাখ্যা চাইল।

: কারণ, সে তো হাফেজ কুরআন। আমি তা নই। সরলভাবে বলা এই বাক্যটি সালারকে ঝুঁক করে দিল। সে আসলেই প্যাভোরার বাক্স খুলে বসেছে। তবে সূত্রটা ভুল। সে অবাধ্য নয়, অভদ্রও নয়। তবে স্পষ্টভাষী। মনে যা ভাবে, মুখে তা-ই বলে দেয়া

জীবনে এই প্রথম সালারের মনে হলো, সে যেন সিকান্দার উসমান, আর তার সামনে বসে আছে ছোট সালার। নিরুত্তর। অসহায়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে তা ইতিহাসের যখন মনে চায়।

: 'জিবরিলকে কি তোমার ভালো লাগে না?' সালার নরম গলায় তাকে জিজ্ঞেস করল।

: সে তো আমার ভাই, তাকে কেন খারাপ লাগবে আমার। তবে আপনাদের এমন দু-রকম আচরণে আমি কষ্ট পাই।

সালার ভেবে কুল পেল না, হামিনের মনে এই অভিযোগ কবে থেকে বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

: 'তুমি যা ভাবছ তা নয় হামিন।' সালার তাকে বলল।

: 'বাবা আসতে পারি?' জিবরিল দরজায় এসে অনুমতি চাইল। আলোচনার এক অদ্ভুত মোড়ে তার আগমন ঘটল। তার আভাস পেয়ে সালার এবং হামিন দুজনই একটু নড়েচড়ে বসলো।

: 'হ্যাঁ আসো।' সালার বলল।

সে এসে সোজা হামিনের বরাবর সোফাটাতে বসল। বসেই মাথানত হামিনের দিকে একবার তাকাল। তারপর বাবাকে বলল, 'আমিই পাকিস্তানে দাদার কাছে যাই। আমি খুব ভালো খেয়াল রাখতে পারব উনার।' রুমে এক অদ্ভুত নীরবতা হেয়ে গেল। সালার কিংবা হামিন, কেউই কিছু বলতে পারল না। এতক্ষণ তারা খুব আন্তে আন্তেই কথা বলছিল। তবু জিবরিল নিশ্চয় তাদের কথা শুনেই এখানে এসেছে।

- 'মান্নি এবং হামিন এখানেই আপনার সঙ্গে থাকুক। আমি একাই ওদিকটা সামলে নেব।' সে বরাবরের মতোই দৃঢ় অথচ নরম স্বরে কথাটি বলল। 'তাছাড়া পাকিস্তানে মেডিকেলে সময় একটু কমই লাগে। তাই এখন ভার্শিটির দুয়েক বছর নষ্ট হলেও, তেমন কোনো সমস্যা হবে না।' এত স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বলল, এটর যেন কোনো বিষয়ই নয়। জিবরিল আসলে এমনই। নিঃসংকোচে সরাসরি সমাধান বের কবে ফেলে।

। 'আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, জিবরিল'
সালার মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিল।

: 'আমি পরিবারে সবার বড়। তাই আমার ওপর দায়িত্বও বর্তায়
সবচেয়ে বেশি। হামিনকে আপনি এখানেই থাকতে দিন।
আমিই যাই পাকিস্তানে। খুশি মনেই এসব বলছি আমি, এ নিয়ে
আমার কোনো অসন্তুষ্টি নেই।' সালার থামিয়ে দেওয়ার পরও
জিবরিল তার কথাগুলো বলল। তারপর উঠে রুম থেকে বের
হয়ে গেল। সালার ও হামিন নিশ্চুপ বসে রইল। তারা দুজনেই
এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিল।

: "আমাদের চোখে তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সে
কুরআনের হাফেজ, সেজন্য তাকে অবশ্যই সম্মান করি। কিন্তু
সবার ওপরে প্রাধান্য দেই না। তাই এটা কখনোই ভাববে না,
আমরা তোমাদের চারজনের মধ্যে বৈষম্য করি বা করব।'
সালার একটা লম্বা সময় চুপ থেকে কথা বলতে শুরু করল।

'তোমাদের দাদার দেখভালের দায়িত্ব আমার। আমি ভেবেছিলাম, এই দায়িত্ব আমি তোমার ও জিবরিলের সঙ্গে ভাগ করে নিব। তাই তোমাকে মানাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন আর তোমাকে জোর করব না। তুমি যেহেতু যেতে চাচ্ছ না, যেয়ো না।'

কথাটি বলেই সালার উঠে চলে গেল। ওখানে কেরল হামিনই বসে রইল। অবনত মস্তকে। এক গভীর ভাবনায় ডুবে।

'আশা করি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট নও।' হামিন দরজা খুলে জিবরিলের রুমে ঢুকল। দেখল, জিবরিল স্টাডি টেবিলে বসে এক ধ্যানে পড়ছে। দুজনের মাঝে এক নিঃশব্দ চোখাচোখি হলো। জিবরিল আবারও পড়তে লাগল। হামিন বিছানায় শুয়ে

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবারও জিজ্ঞেস করল, 'অসন্তুষ্ট।' জিবরিল পেছন ফিরে অবাক চোখে তার দিকে তাকাল।

কেন অসন্তুষ্ট হবো?

শোয়া থেকে উঠে বসল হামিন। তারপর ভীষণ সতর্কভাবে আলাপ শুরু করল 'তুমি আমাদের কথা শুনে ফেলেছিলে, না??' হামিন আগে বিষয়টি নিশ্চিত হতে চাচ্ছে। জিবরিল এক পলক তার দিকে তাকাল। তারপর মাথা বেঁকে বলল- 'হ্যাঁ।'

এবার হামিনের চেহারা মলিন হয়ে গেল। খানিক লজ্জাবোধ করল।

: 'তাই তো জিজ্ঞেস করলাম, আমার কথায় কষ্ট পেয়েছ কি না।' হামিন এবার তার প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে করল।

: 'না।' জিবরিল আগের মতোই বলল। হামিন এবার বিছানা ছেড়ে উঠে একদম ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। 'তবে আমি হতাশ হয়েছি।' কাছাকাছি আসতেই জিবরিল তার বাকি কথা সম্পূর্ণ করল।

: 'কিন্তু আমি এটা উদ্দেশ্য করিনি। তুমি আমার ভাই। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। বিশ্বাস করো, আমি তোমার বিপক্ষে নই।' হামিন নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার চেষ্টা করল।

: 'আমি জানি।' জিবরিল খুব নরম গলায় বলল। হামিনের বাহুতে হালকা চাপড়ে দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল। 'কিন্তু বাবার সঙ্গে তোমার এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। তিনি খুব শকড হয়েছেন।' জিবরিল এখন তাকে বোঝাচ্ছে।

: 'তুমি কি সত্যিই মনে করো, তিনি আমাকে তোমার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন? আমাদের আলাদা চোখে দেখেন? অথচ

একটা সময় আমারই মনে হতো, তিনি তোমাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। বেশ কয়েক বছর এমনই মনে হয়েছিল...।

জিবরিল ইচ্ছে করেই কথাটা অপূর্ণ রাখল

'তারপর?' হামিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আমি বন্ধ হয়ে গেলাম।' জিবরিল খানিক মুচকি হাসল।
আর আমার মনে হলো, আসলে এমন কিছুই নয়।' জিবরিল বলেই চলল। 'কিছু গুণ তিনি আমার মধ্যে বেশি পছন্দ করেন, আর কিছু গুণ তোমার মধ্যে। তবে তিনি আমাদের মধ্যে কখনোই বৈষম্য করেননি। যদি কখনো বৈষম্য করেও থাকেন, তবে তার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ আছে।' জিবরিল তার বড় তাই। এবং বড় ভাইয়ের মতোই সে তাকে বোঝাচ্ছে। হামিন চুপচাপ তার কথা শুনছে। জিবরিলের কথা শেষ হওয়ার পর সে বলল, 'আমি চাই না তুমি তোমার ইউনিভার্সিটি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাও! আমি এতটা স্বার্থপর নই।' হামিন

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করল। 'ব্যস, আমি শুধু এখানে থাকতে চাই।' জিবরিলকে সে বলল।

তোমাকে কেউ স্বার্থপর ভাবছেও না, হামিন তোমার নিজস্ব চয়েস থাকতেই পারে। বাবা এজন্যই তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, তুমি এখনো ছোট। এখানে একা থাকতে পারবে না। বাবা সবসময় বিজি থাকেন। মাঝেমাঝেই দুয়েকদিন গ্যাপ দিয়ে তিনি বাসায় ফেরেন। তুমি একা কীভাবে তার সঙ্গে থাকবে? শুধু এই কারনেই তিনি তোমাকে পাকিস্তানে পাঠাতে চাইছেন।

হামিন তার কথার মধ্যেই বলে উঠল, 'আমি চাই না তুমি পাকিস্তানে যাও! তোমার পড়াশোনায় এর প্রভাব পড়বে। বরং আমিই পাকিস্তানে যাব। যদিও আমার মন মানছে না, কিন্তু সবাইকে অসন্তুষ্ট করে আমি এখানে থাকতেও পারব না।' বলতে বলতে হামিন বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। জিবরিলের মনে হলো, ও কিছুটা অস্থির। হামিন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।



'এই তো কয়েকটা বছর। তারপরই তো বাবা তোমাদের আবার আমেরিকায় নিয়ে আসবেন। তখন তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।' জিবরিল তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

: 'আমার কোনো স্বপ্ন নেই।' বলেই হামিন মুখের ওপর চাদর টেনে নিল। জিবরিলও এই পরিস্থিতিতে আর কিছু বলার সাহস পেল না। হামিনের মাথায় এখন কী চলছে, তা বোঝা মুশকিল। শুধু অন্যরাই নয়, সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারছে না। জিবরিল আবারও পড়তে শুরু করল। উইকেন্ডে বাসায় এসেছে সে, কাল আবারও ফিরে যেতে হবে ভাসিটিতে। পরবর্তী সেমিস্টার একেবারে মাথার ওপর।

: বাবার সঙ্গে কে থাকবে?

জিবরিল কাগজে কিছু লিখছিল। প্রশ্নটা শুনে তার কলম থেমে গেল। সে আবারও পিছন ফিরে বিছানায় শোয়া হামিনের দিকে

তাকাল। প্রায় দশ মিনিট পর হামিন আবারও কথা বলল। জিবরিল ভেবেছিল, ও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ সে এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল। পলকেই জিবরিল তার দুশ্চিন্তা ধরে ফেলল। আসলেই তা গভীর। MIT কিংবা আমেরিকা নয়, হামিনকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছিল তার বাবা সালার সিকান্দারের অসুস্থতা। সে বাবাকে একা রেখে যেতে শঙ্কিত বোধ করছিল। বাবার সঙ্গে এখানে থাকতে চাচ্ছে। কিন্তু সেটা তাকে বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। সালার সিকান্দারের মতো সেও তার বাবাকে নিয়ে উদবিগ্ন। নিজের অসুবিধার কথা বলে তা ঢেকে রাখতে চাচ্ছে।

- "তার মানে তুমি বাবার জন্যই এখানে থাকতে চাচ্ছ?" জিবরিল যেন তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিল। আপাদমস্তক চাদরে মোড়ানো হামিনের গায়ে এক অস্থিরতা ভর করল। এত তাড়াতাড়ি তার রাজ ফাঁস হয়ে যাবে, তা হয়তো সে কল্পনাও করেনি। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। মুখের উপর থেকে চাদরও সরাল না। জিবরিল তবু তার দিকে অপলক তাকিয়ে

রইল। হামিন খরগোশের মতো সুড়ঙ্গ বানাতে পারদর্শী। চোখের পলকে ইতিউতি খুঁড়ে, এখান থেকে ওখানে ছুটে চলা তার নেশা। পলকেই সে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়। আবার পরক্ষণে এসেই হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। জিবরিল সিকান্দার অপলক তাকিয়ে রইল তার ছোট ভাইটির দিকে-যাকে সে কোনোদিন ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। কখনো বুঝতে পারলেও, তখন সেই বোঝাপড়া নিয়েই সন্দেহ হতো-সত্যিই কি বুঝতে পেরেছি?

: 'তোমরা চলে যাচ্ছ?' এরিক বারবার জিজ্ঞেস করছে, আর ইনায়া প্রতিবার 'হ্যাঁ' বলছে। তবু যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা কি সত্যিই সম্ভব। কখনো হওয়ার মতো বিষয়।

'কিন্তু কেন?' অনেকক্ষণ পর এরিকের মাথায় পরবর্তী প্রশ্নটা এলো। যদিও প্রশ্ন করার আগেই ইনায়া বহুবার এর উত্তর দিয়েছে।



: 'পাপা চাইছেন, আমরা কয়েক বছর দাদা-দাদিদের কাছে থাকব। তারা ওখানে একা থাকেন।' বরাবরের মতো ইনায়া আবারও অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে উত্তর দিল।

: 'কয়েক বছর? কয় বছর?' এরিককে ভীষণ দেখাতে লাগল।

: 'জানি না।' ইনায়া উত্তর দিল। আসলেই এই প্রশ্নের উত্তর তার জানা ছিল না। 'কিন্তু তোমরা এই বাসা ছেড়ে দিচ্ছ কেন? তোমার বাবা আর জিবরিল তো যাচ্ছেন না?' এরিক একই অস্থিরতায় আবারও জিজ্ঞেস করল।

: 'বাবা নিউইয়র্কে শিফট হচ্ছেন। জিবরিল ভাইয়া তো এমনিতেই ভাসিটিতে থাকেন। তাই আপাতত আমাদের এত বড় বাসার দরকার নেই।' ইনায়া ব্যাখ্যা করল।

তবে তুমি চিন্তা করো না। আমরা তো আমেরিকায় আসা-যাওয়া করবই। আর তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে চলে আসবো।" ইনায়া জানে, এরিকের সাথে তার পরিবারের আত্মিক শেকড় কতটা গভীর, তাদেরকে ছাড়া সে কতটা নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। এরিক আর ইনায়া এখন ক্লাসের বিরতিতে স্কুলের মাঠের এক বেঞ্চে বসে আছে।

এরিক কোনো জবাব দিল না। নিশ্চুপ বসে রইল। মনে হচ্ছে সে এই ধাক্কাটা হজম করার চেষ্টা করছে।

। আমি কি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি না?" অনেকক্ষণ পর এরিক জানতে চাইল। প্রশ্নটি ইনায়াকে জটিলতায় ফেলে দিল। উত্তরটা সে জানে, কিন্তু বলতে পারছে না।

: 'তোমার মাস্মি ও ফ্যামিলিকে তোমার দরকার। তাদের ছেড়ে তুমি আমাদের সাথে কীভাবে যাবে?' ইনায়া 'না' বোঝাতে খুবই মার্জিত শব্দ ব্যবহার করল।

- 'মাস্মি কোনো আপত্তি করবেন না। আমি তার থেকে অনুমতি নিতে পারব। কিন্তু তোমরা কি আমাকে তোমাদের সাথে রাখবে?' আরেকটা প্রশ্ন। ইনায়া আবারও সেই জানি না-তেই চলে গেল।

: 'এরিক, আমি জানি না। মাস্মি-পাপাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। তবে নিজের পরিবার ছেড়ে এভাবে অন্যের পরিবারের সাথে যাওয়া ঠিক নয়।' ইনায়া বলল। তার বয়স মাত্র তেরো। বড়দের মতো করে তো আর সে বোঝাতে পারবে না। তবু সে চেষ্টা করল।

: 'কয়েক বছর পর তো আমি এমনিতেও ভাসিটিতে চলে যাব।
তখন তো আমার ঘর ছাড়তেই হবে।' এরিক কিছু না ভেবেই
বলল।

: 'তাহলে তো এখন তোমার পরিবারের কাছে থাকা আরও
বেশি জরুরি।' নরমভাবে বলল ইনায়া।

। 'আমি নিজেকে তোমাদের পরিবারের অংশ মনে করি।
তোমরা কি আমাকে তেমনটা মনে করো না?' এরিক আবারও
প্রশ্ন করল। ইনায়া এবারও মুশকিলে পড়ল। : 'আমি মাম্মির
সাথে কথা বলে দেখব, এরিক।' ইনায়া অবশেষে এই প্রশ্নের
ঘূর্ণি থেকে বের হতে একটা পথ খুঁজে পেল।

: 'যদি তোমরা চলে যাও, তবে আমার ঘর আবারও ভেঙে
যাবে।' এরিকের কণ্ঠে কষ্ট ঝরে পড়ল। 'আমার যাওয়ার মতো
আর কোনো জায়গা থাকবে না।' সে মিনতির সুরে বলল, যেন

সবকিছু ইনায়ার হাতে। সে বললেই সবাই থেকে যাবে। ইনায়ার মন একদম গলে গেল।

। এমন করে বলো না, এরিক! দূরে চলে যাওয়ার মানে এই নয় যে, তোমার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। আমাদের তো মাঝেমাঝেই দেখা হবে, কথা হবে, মেইল হবে। তাছাড়া ছুটিতে তুমি পাকিস্তানে আসতে পারবে, আমরাও আমেরিকায়। কিছুই শেষ হচ্ছে না।" ইনায়া তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ভালো করেই জানে, এরিকের কথাই ঠিক। দূরত্ব এক রাক্ষসের মতো। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা সব সম্পর্ক নিমিষেই গ্রাস করে নেয়।

কেউ না থাকলেও, তুমি থেকে যাও!" এরিক একেবারেই ভেঙে পড়ল।

- "আমি কীভাবে থাকব? এ নিয়ে শুরু থেকেই হামিন জেদ ধরে বসে আছে, কেউ তার কথা শোনেনি। সেখানে আমার থাকার মতো তো বিশদ কারণও নেই, আমার কথা কীভাবে রাখবে? তাছাড়া দাদা-দাদির দেখাশোনায় আমি মাস্মিকে হেল্প করতে চাই।" ইনায়া বলল। এরিক অজান্তেই তাকে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। এত বছর ইনায়ার সঙ্গে পড়াশোনা করছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, প্রায় প্রতিদিনই তাদের ঘরে আসা-যাওয়া করেছে; তবু তাদের মাঝে এমন কোনো আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি যে. এরিক তাকে যা খুশি বলতে পারে। এটি ইনায়ার দূরত্ব বজায় রেখে চলার কারণেই। ইনায়া এই দূরত্ব, ভারত্ব ও শিষ্টাচার তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। কিংবা পারিবারিক আভিজাত্য থেকে। সে যেভাবেই পাক না কেন, এটা তাকে ক্লাসের অন্য ছেলেদের কাছে রহস্যময়ী আর এরিকের কাছে করে তুলেছিল অকল্পনীয়।

এরিক যেই পরিবেশে বড় হয়েছে, সেখানে আই লাভ ইউ বলাটা হাই-হ্যালো বলার মতোই স্বাভাবিক। যে-কেউ, যে-কাউকেই, যখন-তখন এটি বলতে ও শুনতে পারে। তাদের সমাজে এটা বললেই কেউ বখাটে হয়ে যায় না। একে কেউ খারাপ কিছুও মনে করে না। তবু এরিকের সংকোচবোধ হয়। তার মনে হয়, সে যদি ইনায়াকে ভালোবাসার কথা বলে, তাহলে হয়তো সে রাগ করবে, তাদের ঘরে আর যেতে দিবে না।

তাছাড়া ইমামাকে সে কথা দিয়েছে, যতদিন না সে বড় হবে, বড় কিছু না হবে, ততদিন সে ইনায়াকে এমন কোনো কথাই বলবে না। এরিক এক দোটানায় পড়ে গেল। ইনায়া চলে যাচ্ছে, হয়তো চিরদিনের জন্য। তাদের কোনোদিন আবার দেখা হবে কি না, জানা নেই। অথচ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এখন তার কী করা উচিত? ইনায়ার কাছে তার অনুভূতি প্রকাশ করে দিবে? নাকি এভাবেই চুপ থেকে চেপে রাখবে বুকের ভেতর? এই প্রথম ইনায়াকে ঘিরে তার মধ্যে এক অদ্ভুত অস্থিরতা তৈরি

হলো। তার মনে হচ্ছে না যে, ইনায়া শুধু চলে যাচ্ছে; তার মনে হচ্ছে, সে ইনায়াকে হারিয়ে ফেলছে। তৎক্ষণাৎ তার মাথায় কোনো সমাধান এলো

না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর যা এলো, তা যে কতটা নিবুদ্ধিতা-সেটা ও কল্পনাও করতে পারেনি।

'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই!'

এটি দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি চিঠির হেডলাইন। চিঠিটি পাঠিয়েছে এরিক, সালারের কাছে। সালার খুবই স্বাভাবিকভাবে চিঠিটি পড়েছে। এরিকের কাছ থেকে এমন কোনো চিঠির প্রত্যাশা করেনি, এটা ভেবে সে অবাক হচ্ছে না। সে অবাক হচ্ছে, তার মেয়ে এত বড় হয়ে গিয়েছে যে, সেজন্য কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে এক্ষেত্রে সালারও সেই প্রথাগত পিতাদেরই

একজন, যার চোখে নিজের মেয়ে সবসময় ছোটই থাকে।
কখনো বড় হয় না।

ইমামা বেডরুমে সালারকে চা দিতে এসেছে। এসে দেখল,
সালার একটা কাগজ হাতে চিন্তায় ডুবে আছে। চায়ের কাপ
টেবিলে রেখে ইমামা চলেই যাচ্ছিল, সালার তখন তাকে
ডেকে উঠল। তার সামনে কাগজটি বাড়িয়ে দিল। ইমামা ভ্রু
কুঁচকে সেটা হাতে নিল। প্রথম লাইনে চোখ পড়তেই সে
হতভম্ব হয়ে গেল। দ্বিতীয় লাইন না পড়েও সে বুঝে গেল,
চিঠিটা কে পাঠিয়েছে। ক্রোধের এক অগ্নিশিখা তার ভিতরে দপ
করে জ্বলে উঠল। রক্তিম চেহারায় সালারকে সে বলল, এরিক?
সালার মাথা নেড়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, আগে
পুরো চিঠিটা পড়ো। ইমামা একনজর চিঠির দিকে তাকিয়ে
বলল, না পড়েও আমি বলতে পারব, সে কী লিখেছে।

তারপরও সে চিঠিটা পড়তে লাগল। এরিক চিঠিতে সর্বোচ্চ
মার্জিত ভাষায় সালার সিকান্দারের কাছে ইনায়ার প্রতি তার

ভালো লাগার কথা ব্যক্ত করেছে। ইনায়ার প্রতি তার ভালোবাসা কতটা গভীর, কেন জীবনসঙ্গিনী হিসেবে ইনাযাকেই তার দরকার, সে তাকে পাওয়ার জন্য কী কী করতে পারে, তাকে কতটা সুখে রাখবে সব ফুটিয়ে তুলেছে গভীর আবেগে। এই চিঠিটা যদি নিজের মেয়ে প্রসঙ্গে না হতো, তবে সালার পড়ে খুব বিনোদন পেত, কিছুক্ষণ হাসত, হয়তো এরিকের সঙ্গে এ নিয়ে মশকরাও করত।

কিন্তু চিঠিটা যখন নিজের মেয়েকে কেন্দ্র করে, তখন তা শিশুসুলভ হলেও আর শিশুসুলভ রইল না।

: 'ইনায়াও কি এরিককে পছন্দ করে?' সালারের মাথায় সর্বপ্রথম এই খেয়ালই এলো।

তুমি কেমন কথা বলছ সালার। বেচারি ইনায়া জানেও না, এরিক মনে মনে তাকে নিয়ে কী আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখছে। এমন কোনো বিষয় হলে তো সে আমাকে বলত। এরিক তার কাছে

কেবলই একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। কোনো বয়ফ্রেন্ড নয়। ইমামা শ্রেফ বিরক্তি ভরে সালারের প্রশ্ন উত্তর দিল।

ইমামা, এ জরুরি নয় যে, সন্তানদের মনের সব কথাও আমরা জানব।

ইমামা তার কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, 'আমি জানি।' সালার হেসে ফেলল। আমি দিনরাত ২৪ ঘণ্টা তার সঙ্গে থাকি সালার তুমি বাপ হিসেবে সন্তানদের একভাবে জানো। আর আমি মা হয়ে তাদেরকে অন্যভাবে দেখি। সে সালারকে হাসতে দেখে ব্যাখ্যা পেশ করল।

: তোমার কথা ঠিক আছে। তারপরও ২৪ ঘণ্টা চোখের সামনে থাকার মানে এই নয় যে, তাদের মনের খবরও তুমি জানবে। তাদের প্রতি আমি সুধারণা বা খারাপ ধারণা; কোনোটাই পোষণ করি না ইমামা। আমি পিতা। তাই বাস্তববাদী হয়ে চিন্তা করছি, মায়ের মতো আবেগী হয়ে নয়।



ইমামা ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল। সালার আসলেই ঠিক বলছে। এরিক ও ইনায়া বেশ কয়েক বছর একসঙ্গে চলাফেরা করেছে। এরিক তাকে পছন্দ করে, এটা সে মোটেও জানে না, তা বলা যাবে না। ইমামা মনে মনে দোয়া করছিল এমনটা না হোক। কিন্তু সালার তো বলছে যৌক্তিক কথা।

- 'ঠিক আছে, আমি ইনায়াকে জিজ্ঞেস করব।' ইমামা বলল।

: 'কী?' সালার চায়ে চুমুক দেওয়া বন্ধ করল।

: 'এরিকের প্রসঙ্গে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে শুরু করব।' ইমামা এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে পড়ল। 'সে তো এখনো বাচ্চা।'

তার কথাটি শুনে সালার হাসল।

: 'হ্যাঁ। এই চিঠিটা পড়ার সময় আমিও অবাক হচ্ছিলাম, কেউ আমার মেয়েকে নিয়েও এভাবে ভাবতে পারে? সে তো এখনো বাচ্চা। কিন্তু এটাই জীবন। আমরা আমেরিকায় বসবাস করছি। এখানে আট-নয় বছরের বাচ্চা ছেলে-মেয়েরাও বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কী, সেসব বোঝে। তাই আমাদেরকেও বাস্তবতা মেনে বিষয়টির সমাধান করতে হবে। তুমি এখনই ইনাযাকে কিছু বলো না। আমি আগে এরিকের সঙ্গে কথা বলে দেখি।' সালার চিন্তাভাবনা করে একটা সমাধান বের করল।

। 'তার সঙ্গে দেখা করে তুমি কী করবে?' সমাধানটা ইমামার পছন্দ হলো না।

: 'এ ব্যাপারে কথা বলব। তাকে বোঝাব, এগুলো নিছক বাচ্চামি এবং সম্ভব নয় কেন।' সালার উত্তরে বলল। 'কয়েক বছর আগেও সে ইনাযার ব্যাপারে একই কথা বলেছিল। তখনো আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম। তাছাড়া সে এখনো অনেক ছোট। তার ওপর সে মুসলিমও নয়। কিন্তু আমি কঠোরভাবে তাকে

বারণ করতে পারিনি। কারণ, সে তখন তার বাবার মৃত্যুতে অনেক আপসেট ছিল। কঠোর কিছু বলে, তাকে আরও আপসেট করতে চাইনি। ইমামা সালারকে এরিকের সঙ্গে বলা কথাগুলো তুলে ধরল। সালার হতভম্ব হয়ে গেল।

: তখন তুমি তাকে কী বলেছিলে?

আমি তাকে ভালো করে পড়াশোনা করতে বলেছিলাম। তাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, যতদিন সে ভাসিটিতে প্রবেশ না করবে, ততদিন এ ব্যাপারে ইনায়াকে কিছুই বলবে না।

: 'আর সে মেনেও নিয়েছিল?' প্রত্যুত্তরে সালার তাকে প্রশ্ন করল। ইমামা মাথা নাড়ল।

'আর আমি নিশ্চিত, সে তার কথা রেখেছে। ইনায়ার সঙ্গে কখনো এমন কোনো কথা বলেনি। বললে ইনায়া অবশ্যই আমাকে বলত।' ইমামা বলল।

: আচ্ছা, এজন্যই তাহলে চিঠিতে সে উল্লেখ করেছে, ওয়াদা মোতাবেক ইনাযার বদলে আমি আপনার কাছেই মনের কথাগুলো বলছি। তাই তো আমি বুঝতে পারছিলাম না, কোন ওয়াদার কথা সে বলছে?" এই প্রথম সালার প্রভাবিত হলো। ইমামার চেহারায়ে এখনো বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

: আমার মনে হয়, এরিকের সঙ্গে দেখা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ঘটনাগুলো বেশ আকর্ষণীয়।

: 'কীসের আকর্ষণীয়? সারা জীবন তোমার শুধু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আর অদ্ভুত মানুষদেরই ভালো লেগে যায়।' ইমামা না বলে থাকতে পারল না।

: 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তোমার সাথে আমার বিয়ে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তারপরও দেখো, এই বিয়েতে আমরা ভালো আছি।' সালার তাকে খোঁচা দিয়ে বলল। এ ধরনের রসিকতা

সালারের ব্যক্তিত্বেরই অংশ। জীবনের এতগুলো বসন্ত পার করার পরও সালার আজও তাকে নিরুত্তর করে দিতে পারে যখন-তখন। মাঝে মাঝে সেটা প্রকাশ করেও দেখায়।

: 'এরিকের সঙ্গে দেখা করে তুমি কী বলবে?' ইমামা সালারের রসিকতাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল।

: আমি তার সঙ্গে কথা বলব। প্রপোজাল নিয়ে সে কতটা আন্তরিক, তা যাচাই করব।

ইমামা একদম শুদ্ধ হয়ে গেল।

তোমার উদ্দেশ্য কী সালার? তুমি ১৩ বছরের এক বালকের প্রপোজাল নিয়ে কথা বলবে? তাও আবার অমুসলিম। তুমি নিজের মেয়ের জন্য তাকে কনসিডার করার কথা ভাব? তোমার মাথা ঠিক আছে, সালার? এসব দুষ্টুমির বিষয় নয়। ইমামা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়ে বলল।

'আমি জানি এসব দুষ্টমির বিষয় নয়। সে তেরো বছরের বালক, এও জানি। সে অমুসলিম, তাও জানি। কিন্তু এই তেরো বছরের বাচ্চা যদি দশ-এগারো বছর বয়সেও এই একই প্রপোজাল দিয়ে থাকে এবং নিজের ওয়াদার ওপর অটল থাকে, তাহলে একে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।' সালার এতটা সিরিয়াস হয়ে গেল। ইমামা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে এক পৃথিবী অবিশ্বাস নিয়ে সালারের দিকে তাকিয়ে রইল।

তুমি ইনায়ার জন্য তাকে কনসিডার করতে পারো না। এখন এটা বলো না যে, তুমি এমনটাই ভাবছ।

"আমি আমার মেয়ের জন্য আসা প্রথম প্রস্তাবটিকে যাচাই করার কথা ভাবছি।" উত্তরে সালার বলল।

'সালার। আমি কখনোই কোনো অমুসলিমকে আমার মেয়ের জন্য বিবেচনায় রাখব না।' ইমামা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল।



: 'দুষ্টুমি করেও না?' সালার ইমামার চেহারা পড়তে পড়তে বলল। 'আমিও কোনো অমুসলিমকে বিবেচনায় রাখব না। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তার কথা ভিন্ন।' সালারও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল।

। 'আমি এমন কাউকেও গণ্য করব না। আমি কল্লবিলাসী বা ফ্যান্টাসিস্ট, কোনোটাই নই। এমন কোনো সম্ভাব্য সম্পর্কে জড়িয়ে আমার মেয়েকে জটিলতায় ফেলব না।' উত্তরে ইমামা বলল। 'আমরা অন্যের জন্য ঝুঁকি নিতে পারি। অন্যকে উপদেশ দিতে পারি। এমন মহৎ কাজে তাদেরকে সাহায্যও করতে পারি, তাদের সাহস জোগাতে পারি; কিন্তু আমরা নিজেদের সন্তানের ক্ষেত্রে এমন ঝুঁকি নিতে পারি না। তা ঠিক হবে না।' ইমামা বলেই চলল। 'আমিও তোমাকে বিয়ে করে একটি ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমার সামনে অনেক বাধা এসেছে। আমার মনেও অনেক আশঙ্কা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ এমন ঝুঁকি নেয়। তাদের নিতে হয়।' সালারের উত্তরটি

ইমামাকে নিরুত্তর করে দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে বোবা হয়ে গেল। তার সব কথা ঠিক আছে, কিন্তু এরিকের সঙ্গে এভাবে তার তুলনা দেওয়াটা তার ভালো লাগল না।

: 'এরিক আর আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য। হ্যাঁ, তোমার-আমার ধর্ম ভিন্ন ছিল। কিন্তু সংস্কৃতি তো একই ছিল। আমরা সমপর্যায়ে ছিলাম, আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। শৈশব থেকেই আমরা একে অপরকে জানতাম।' ইমামা তার যুক্তি দিতে দিতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তার মনে হলো, সে মূলত এরিক ও তার মধ্যকার মিলগুলোই খুঁজে বের করছে। এরিকও তাদের সমপর্যায়ের এবং প্রতিবেশী ছিল। ছোটবেলা থেকে তাকেও তারা চেনে।

: 'আমি এরিকের প্রপোজাল নিয়ে ভাবছি না। আমি আবদুল্লাহর প্রপোজাল নিয়ে ভাবছি। ১৩ বছরের এক বালকের সঙ্গে তো আমি আর আমার মেয়েকে বিয়ে দেব না। এখন ১৩ বছরের একটি ছেলে যদি আমার মেয়ের জন্য আমার ধর্মের অনুরাগী

হয়, তাহলে তো সামাজিক লজ্জার ভয়ে, তাকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। দিনশেষে সমাজকে নয়, বরং আল্লাহকে আমার মুখ দেখাতে হবে।" এখানেই সালার এই আলাপচারিতার ইতি টানল।

সালার ঠিকই বলছে। তারা দুজনেই নিজের মতো করে ভাবছে। এই প্রথম পাকিস্তানে যেতে ইমামা ভীষণ আগ্রহী হলো। সে শুকরিয়া আদায় করল। তার মনে হলো, ইনায়া ও এরিক যদি একে অপর থেকে দূরে চলে যায়, তাহলে হয়তো এরিকের মাথা থেকে ইনায়ার ভূত নেমে যাবে। সে সালারের মতো এখনো ভাবতে সম্মত নয় যে, শুধু ইনায়ার জন্যই এরিক ইসলামের প্রতি ধাবিত হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তেরো বছরের এই বালক যখন জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চব্বিশ-পাঁচিশ বছরে উপনীত হবে, তখন সে সমস্ত অতীত ভুলে যাবে। জীবনের নানা রং তার মন থেকে ইনায়া ও ইনায়ার পরিবারের সমস্ত স্মৃতি মুছে দেবে। আর মনে থাকলেও, ইনায়ার জন্য সে নিজের ধর্ম ছেড়ে, তার পিছু ছুটে আসবে না। ইমামা আল্লাহর

শুকরিয়া আদায় করল যে, তা একপাক্ষিক ছিল। এতে যদি ইনায়াও জড়িত থাকত, তাহলে তার দুশ্চিন্তার কোনো অন্ত থাকত না।

যাকে দেখতে আয়েশার মনে তীব্র তৃষ্ণা জমেছিল। সেই একমাত্র পুরুষ যাকে আয়েশা আগামী কয়েক বছরেও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।

ছবি কখনো কখনো মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ফুটিয়ে তোলে। কারও কারও ক্ষেত্রে আরও অধিক সুন্দর করে তোলে। যেমন জিবরিল। মুহাম্মদ জিবরিল সিকান্দার বাস্তবে এক আনুকরী ও ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যুবক। এক প্রভাবক ও অবাক করা চরিত্র। সে সালারের ঘন কালো চোখ, মায়ের মতো তীক্ষ্ণ মুখ ও গমগম গভীর কণ্ঠের মিশেলে মিল এক অদ্ভুত স্থিরতার উৎস।

একেবারে সিম্পল ডার্ক ব্লু জিন্স, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টি-শার্ট পরিহিত জিবরিল সিকান্দার, ঠোঁটে এক চিলতে হাসি রেখে আয়েশাকে সম্বোধন করল। আয়েশার তখন বাজে রকমের নার্ভাস ফিল হচ্ছিল। যদিও সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। জিবরিলের এক সম্বোধনই তার ভিতরে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিল। সে মনে মনে স্বীকার করল, শুধু নিসা নয়, জিবরিল যেকোনো বয়সের যেকোনো নারীকে পাগল করতে সক্ষম।

'কেন? আপনার কি আমেরিকায় এসে ঘুরতে ফিরতে ভালো লাগে না?' নিসার কোনো এক মন্তব্যের জেরে জিবরিল আয়েশাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'না, আমার ভালো লাগে, তবে অতটা বেশি নয়।' আয়েশা হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জিবরিলের প্রশ্নের উত্তর দিল। আর তখনই দুজনের প্রথম চোখাচোখি। আয়েশার জবাব শুনে জিবরিল মৃদু হাসল। তারপর ফাংশনের পর আয়েশাসহ নিসাকে এক রেস্টুরেন্টে কফির আমন্ত্রণ জানাল। নিসা গ্রহণ করল।

তারপর তারা দুজন অন্যান্য বন্ধুর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আয়েশা আবারও নিজেকে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় আবিস্কার করল। নিসা ছিল এক দাপুটে স্বভাবের মেয়ে। ঘরে সব কাজ সে নিজের মর্জিমতো করতে পছন্দ করত। কিন্তু আয়েশা লক্ষ করল, জিবরিলের সঙ্গে সে এমন আচরণ করছে না। কোনো দাপট দেখাচ্ছে না। বরং জিবরিলের পুরো কথা

মনোযোগ দিয়ে শুনছে, আর অধিকাংশ কথায়ই সায় দিচ্ছে।
আয়েশার চোখে দুজনকে পাশাপাশি খুব ভালো মানাচ্ছিল।
যেন তারা এক নিখুঁত কাপল। তা দেখে আয়েশার ঈর্ষ্যাও
হচ্ছিল। জিবরিলের প্রতি তার বেহন্দ ভালোলাগা থাকা সত্ত্বেও,
নিসাকে সে ওর জীবনসঙ্গী হিসেবে কল্পনা করছে। প্রতিটি
ক্ষেত্রেই নিসার চয়েজ ও পছন্দ ছিল আকর্ষণীয়। জিবরিল ছিল
তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ফাংশন শেষ হলে আয়েশা, জিবরিল ও নিসার সঙ্গে একটি
ক্যাফেতে কফি খেতে গেল। তাদের সাথে আরও কয়েকজন
বন্ধুও ছিল। ঘটনাক্রমে ছয়জনের গ্রুপে জিবরিল এবং আয়েশার
চেয়ার পড়ল একদম পাশাপাশি। নিসা বসল জিবরিলের
বিপরীত



পাশে। আয়েশার অপর পাশে বসল নিসার অন্য এক বান্ধবী।
আয়েশার সংকোচ এবার চরম পর্যায়ে পৌঁছিল। সে জিবরিলের
এতটা কাছে ছিল যে, তার পারফিউমের তার নাকে লাগছিল।
মেনু দেখতে দেখতে আয়েশার উপলব্ধি হলো, সে ভুল
জায়গায় বসেছে। জিবরিল যেহেতু মেজবান, তাই সে
সবাইকেই জিজ্ঞেস করছিল, কে কী খাবে।

আয়েশাকেও জিজ্ঞেস করল, 'কী অর্ডার করবে?' কিন্তু আয়েশা
চোখে মেনুতে শুধু সরষে ফুল দেখতে লাগল। পাশ ফিরে
জিবরিল তার দিকে তাকাতেই সে যেন এক নিঃশব্দ
অনুভূতিশূন্য মানুষে পরিণত হলো।

'সবাই যা নিবে, আমিও তা-ই।' আয়েশা অন্যদের মধ্যে সমাধান
খুঁজল। জিবরিল মুচকি হেসে তার চয়েজ করা খাবার আয়েশার
জন্যও বলল-একটি ভেজিটেবল গিদ্ধা ও ড্রিন্‌কস। তারপর

সবশেষে কফি ও চকলেট। নিসা আগেই নিজের পছন্দমতো অর্ডার দিয়ে ফেলেছে। অন্যরাও দিচ্ছিল-বাগার, শাওর্মা, স্টাফড টার্কি। এগুলো ছিল মূলত আমেরিকান বন্ধুদের অর্ডার। নিসা একটি সালমন স্যান্ডউইচ অর্ডার করেছিল

: 'আমি এ বছর মেডিকেলে যাচ্ছি। অ্যাডমিশন হয়ে গেছে আমার।'

আলাপচারিতার ফাঁকে জিবরিলের এক প্রশ্নের উত্তরে আয়েশা তাকে বলল। : 'ফ্যান্টাস্টিক!' উত্তরে জিবরিল মুচকি হেসে বলল। কিন্তু সে বলল না যে, সেও মেডিকেলেই যাচ্ছে।

সবাই আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিল। কেবল আয়েশাই চুপ। নীরব। মাঝে মাঝে জিবরিলই এটা-ওটা প্রশ্ন করে তার নীরবতায় যুক্ত করছিল রা ও রব। সে মূলত তাকে বিরক্তি থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিল। আয়েশা বিষয়টা বুঝতে পারল। সে যে সমস্ত টিনেজারকে চিনত, জিবরিল তাদের মতো নয়।

খাবার আসার পরও জিবরিল তার সঙ্গে ওভাবেই কথা বলছে। নিজে খাওয়ার পাশাপাশি তাকেও খাবার সার্ভ করছে। জিবরিল সিকান্দারের সাথে হওয়া এটি তার প্রথম সাক্ষাত। এই সাক্ষাতের প্রতিটি ঘটনাই তার মন ও মগজে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে রইল। 'ছেলেটা যার ভাগ্যে জুটবে, সে অসম্ভব ভাগ্যবান।' হৃদয়ের গভীর থেকে তার প্রতি দোয়া ও ধারণা ভেসে উঠল। আয়েশা এখনো তার নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করেনি। যদি করত, তবে জিবরিলের মতোই কামনা করত। প্রথম সাক্ষাতে জিবরিল তাকে এতটাই প্রভাবিত ও মুগ্ধ করেছে।

'আমি মন থেকে তোমার জন্য দোয়া করি, নিসা। তোমার বিয়ে যেন জিবরিলের সঙ্গেই হয়। সে অসম্ভব ভালো ছেলে।' ক্যাফে থেকে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে, আয়েশা নিসাকে কথাটি বলল। প্রতিক্রিয়ায় নিসা হাসল।



'খামো তো, আপাতত আমার আর তার জীবনে বিয়ের কোনো দৃশ্য নেই। সে অনেক ইয়ং। আমারও ক্যারিয়ার গড়তে হবে। তবে তাকে আমি খুব পছন্দ করি। যদি সে কোনোদিন আমাকে এমন কোনো প্রস্তাব দেয়, আমি কিছুতেই না করব না। কারই-বা না করার ক্ষমতা আছে জিবরিলকে। বেডরুমে এসে ড্রেস চেনজ করতে করতে নিসা বলল। 'তার মা-বাবা তাকে উত্তম তরবিয়ত নিয়ে বড় করেছেন। তুমি কি দেখেছ, সে তোমাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছিল? তোমার খেয়াল রাখছিল। আমি যতবার আমার কোনো না কোনো গেস্ট নিয়ে গিয়েছি, প্রতিবার সে এমনই সদ্ব্যবহার করেছে।'

আয়েশার মন অদ্ভুত ভারী হয়ে উঠল। তার মানে, জিবরিল এমন গুরুত্ব সবাইকেই দেয়? এটা তার অভ্যাস, মেহেরবানি নয়? আয়েশা হতাশ হয়ে ভাবল।

: তুমি কি জানো, কেন তাকে আমার এত ভালো লাগে?' নিসা আবারও বলছিল। 'সে হাফেজে কুরআন, অনেক আমলদার।



তুমি যদি কখনো তার তিলাওয়াত শোনো, তবে বুঝবে। কিন্তু এতটা ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু অনেক লিবারেল। সংকীর্ণমনা নয়। যেমন অনেক মুসলমান হয়ে থাকে। আমি কখনোই তাকে অন্যের বিষয়ে কঠোর হতে দেখিনি। আমার মনে পড়ে না, সে কোনোদিন আমার অথবা তার ক্লাসমেটদের পোশাক নিয়ে কোনো কটুক্তি করেছে, বা এমন কিছু বলেছে, কখনোই না।" নিসা বলেই যাচ্ছিল। নিসা ছিল পোশাকের ব্যাপারে খুবই মর্ডান। কেউ এ ব্যাপারে সমালোচনা করলে তার সহ্য হতো না। জিবরিলের এই গুণটি তাই তার আলাদাভাবে নজর কেড়েছিল। আয়েশা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সব কথা শুনছিল। নিসার এসব বিশ্লেষণ যেন আয়েশার জীবনের আদর্শ জীবনসঙ্গীর মাঝে বিদ্যমান গুণাবলির সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছিল।

ভোরে আয়েশা ফজরের নামাজে উঠল। নামাজের পর সে ফেসবুকে একটা টু মারল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে এক অদ্ভুত তরঙ্গ বয়ে গেল, জিবরিল তার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করেছে! আয়েশা সর্বপ্রথম যে কাজটি করল, তা হলো সে



জিবরিলের ফ্যামিলি ফটোগুলো খুঁজতে শুরু করল। এবার ব্যর্থ হলো না। জিবরিলের ওয়ালে তার অনেক ফ্যামিলি ফটোই আছে, সালার সিকান্দারের, হিজাবাবুতা ইমামার, তার নয় বছরের বোন ইনায়ার, হামিন ও রাইসার। জিবরিলের আঙ্গেল এবং কাজিনদের কিছু ছবিও দেখতে পেল। তবে তারা জিবরিলদের পরিবারের তুলনায় কিছুটা মডার্ন। তবু তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল লক্ষ করা গেল। সে জিবরিল সিকান্দারের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছিল, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। জিবরিল ও তার পরিবার, তার চোখে একটা আদর্শ পরিবারের উপমা হয়ে উঠল। এমন একটি পরিবার, সে যার অংশ হতে চায়। কিন্তু সে এর অংশ হতে পারেনি। তবে আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে আহসান সাদ ও তার পরিবারের প্রথম সাক্ষাৎ হলো, প্রথম দেখাতেই তার মনে হলো, এই পরিবারও জিবরিল সিকান্দারের পরিবারের মতোই। আহসান সাদ সেন অবিকল জিবরিল যোগ্য, আমলদার, মুসলিম এবং হাফেজে কুরআন।

একটি বই ছাপানো হচ্ছে। বইটি ভীষণ অদ্ভুত। অর্থাৎ বইয়ের লেখাগুলো। এর প্রথম অধ্যায়টি পরের অধ্যায়গুলো থেকে ভিন্ন। যে-ই পড়বে, সে-ই এই ভিন্নতা ধরে ফেলতে পারবে। ভেজা চোখে সে প্রিন্টারের বোতাম চাপল। আর অমনিই প্রিন্টার বিদ্যুৎবেগে বইয়ের সংশোধিত প্রথম অধ্যায়টি বের করতে লাগল। সেই প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চাশটি পাতা।

টেবিলের উপর একটি ডিস্ক পড়ে আছে। সেটি তুলে সে, ভীষণ ক্লান্ত চেহারায়া। একপলক তাকাল। তারপর দু-টুকরো করে ভেঙে ফেলল, এরপর আরও কয়েক টুকরো। টুকরোগুলো হাতের তালুতে নিয়ে, নেড়েচেড়ে আরেকবার দেখে ডাস্টবিনে ফেলে দিল। এবার ডিস্কের কভারটি সে হাতে নিল। তাতে লেখা অনেক বাক্য। বিড়বিড় করে সে তার কয়েকটা পড়ল। তারপর ল্যাপটপ থেকে কিছুক্ষণ আগে বের করা নতুন ডিস্কটি, সেই কভারের মধ্যে রাখল। ততক্ষণে প্রিন্টার তার কাজ শেষ করে ফেলেছে। সংশোধিত প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চাশ পাতা ছাপা শেষ। সে ট্রে থেকে সেই পাতাগুলো বের করল।

তারপর খুব সাবধানে সেগুলো ফাইল কভারের ভেতর পুরে ফেলল। সেই ফাইলেই এই বইয়ের বাকি অধ্যায়গুলোও রাখা হয়েছে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সে ল্যাপটপের শ্রিয়মাণ স্ক্রিনের দিকে তাকাল। স্ক্রিনটি অন্ধকার হওয়ার আগে তার ওপর একটি লেখা ফুটে উঠল। 'উইল বি ওয়েটিং অপেক্ষা করবা' তার চোখে জমা জল হঠাৎ ছলকে উঠল। সে মুচকি হাসল। স্ক্রিনটি এবার অন্ধকার হতে শুরু করল। সে ঘুরে একবার রুমের দিকে তাকাল, তারপর বিছানার দিকে হেঁটে গেল। এক অদ্ভুত ক্লান্তি যেন তার অস্তিত্বে ছেয়ে যাচ্ছিল। তার অস্তিত্বে নাকি প্রতিটি জিনিসের ওপর?

বিছানায় বসে কয়েক মুহূর্ত সে বেডসাইড টেবিলে রাখা জিনিসগুলোর দিকে চোখ বোলাল। তার মনে নেই, তার স্বামী কখন ওখানে তার রিস্টওয়াচ ফেলে গিয়েছে। হয়তো রাতে,

যখন সে এখানে ছিল, অজু করতে গিয়ে। হয়তো তারপর আর তার মনে ছিল না এটি নিতে। সে ভাবল ঘড়িটি তুলে সে দেখতে লাগল। সেকেন্ডের কাঁটা কখনো থামে না। শুধু মিনিট আর ঘন্টাই যেন থেমে আছে মনে হয়। যাত্রা শেষ হয়, আবার যাত্রা শুরু হয়ে যায়।

সেকেন্ডের পর সেকেন্ডের সেই যাত্রা।

অনেকক্ষণ সে ঘড়িটিতে আঙুল বোলাতে লাগল, যেন তাতে তার স্বামীর স্পর্শ খুঁজছে। কিন্তু সেই স্পর্শ সেখানে নেই। এটিই এই বাড়ির একমাত্র সঠিক ঘড়ি, যার সময় একদম নির্ভুল। কেবল মিনিটের কাটাই নয়, সেকেন্ডের কাটাতেও কোনো হেরফের নেই। কিন্তু এই অসাধারণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘড়ির নয়, এই ঘড়ি পরিধানকারী মানুষটির।

সে ভেজা চোখ মুছে ঘড়িটি আবার সাইড টেবিলে রেখে দিল। গায়ে কম্বল টেনে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে আজ লাইট বন্ধ করেনি। দরজাও লক করেনি। তার জন্য অপেক্ষা করছে।

অপেক্ষা কখনো কখনো খুব দীর্ঘ হয়। কখনো কখনো আবার খুব সংক্ষিপ্তও হয়। তার চোখে চোখে ঘুম নেমে আসতে লাগল। সব সময়ের মতো আয়াতুল কুরসি পাঠ করে গায়ে ফুঁক দিল। তখন 'তার হঠাৎ মনে পড়ল, তার স্বামী যদি এখন ওখানে থাকত, তাহলে তার গায়েও সে আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁকে দেওয়ার ফরমায়েশ করত।

বেডসাইড টেবিলে রাখা স্বামীর একটি ফটোফ্রেম সে হাতে ভালোবাসায় তাতে ফুঁকে দিল। তারপর ফ্রেমের কাচে লাগা অদৃশ্য ধুলো বুলিয়ে মুছে দিল। কিছুক্ষণ ফ্রেমের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফ্রেমটি আবারও বেডসাইড টেবিলে রেখে দিল। সবকিছু যেন আবারও মনে পড়তে লাগল। তার অস্তিত্ব যেন আবারও বালি হতে শুরু করল। আঙুল গলে যেন সবকিছু খরে পড়তে লাগল। চোখে আবারও ভিজে উঠতে লাগল। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অশ্রু ইতিমধ্যে বরতে শুরু করেছে।

ইমামা ধড়ফড় করে চোখ খুলল। ঘরে ঈষৎ অন্ধকার। সালার তার পাশেই ঘুমাচ্ছে। সে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল রাতের শেষ প্রহর। অদ্ভুত এক স্বপ্ন ছিল এটি। সে কার অপেক্ষা করছিল, স্বপ্নেও তা বুঝতে পারেনি। বইয়ের সেই দশটি অধ্যায় সালারেরই। সেই বইটি সালারই লিখছিল। এখন পর্যন্ত তার নয়টি অধ্যায় লেখা হয়েছে। দশমটি নেই। সেই ঘড়িটিও সালারের। হামিনের গত জন্মদিনে সালার তাকে এটি, তার জেদ ও অনুরোধে তাকে দিয়েছিল। এখন সেই ঘড়ি হামিন পরে।

আর সে নিজেকে বৃদ্ধা দেখেছিল। ওটা ছিল তার ভবিষ্যৎ। সে কাউকে স্মরণ করছিল, কারও জন্য উদাস হয়ে ছিল। কিন্তু কার জন্য? সে কারও অপেক্ষা করছিল, কিন্তু কেউ আসছিল না। কিন্তু কার...? তারপর সেই লেখাটি 'উইল বি ওয়েটিং'।

স্বপ্নের প্রতিটি কথা, খুঁটিনাটি সে পুনরাবৃত্তি করতে পারবে। এতটাই স্পষ্ট হয়ে আছে মনে! সে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। মনে উদবেগ। তাদের প্যাকিং শেষ হয়ে গিয়েছে। এই বাড়িতে

এটি তাদের শেষ রাত। এরপর সে সবাইকে নিয়ে পাকিস্তান চলে যাবে। আর সালার ও জিবরিল এখানেই থাকবে। তার ঘর যেন আবারও ভেঙে যাচ্ছে। এটা যেন তার জীবনেরই একটি ধারা হয়ে গিয়েছে। গড়া, 'ভাঙা, আবারও গড়া, আবারও ভাঙা। এই হিজরতের বেড়াজালে, তার আপন একটা ঘরের সেই স্বপ্ন, না জানি কোথায় হারিয়ে গেল।

স্বপ্ন থেকে জেগে সে খুব উদাস হয়ে পড়ল। আগে সে সালারের প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে, তাকে ছাড়া থাকতে অভ্যাস করে ফেলেছিল। আর এখন তাকে জিবরিলকে ছাড়াও থাকার অভ্যাস করতে হবে। হেঁটে হেঁটে সে সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। তার মনে হচ্ছে যেন মাথা ধরেছে। সোফায় বসতে বসতে তার আবার সেই স্বপ্নের কথা মনে আসতে লাগল। সেই স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। বইয়ের দশটি অধ্যায়... তার দুঃখ... তার বার্ষিক্য... কাউকে স্মরণ করা...। তার মনে পড়ল, সেই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় সালারের জীবনের পাঁচ-পাঁচটি বছর নিয়ে রচিত। ডাক্তাররা সালারকে

সাত থেকে দশ বছরের জীবনকাল দিয়েছিল। এখন বইয়ের দশম অধ্যায়টি পঞ্চাশ বছর পর শেষ হচ্ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাবারাকাল্লাজি

০১

ওভাল অফিস লাগোয়া ছোট একটি রুমে প্রবেশ করছে সালার সিকান্দার। প্রটোকল অফিসার তাকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তার ভঙ্গি বলছে, এখানে কারও পথ দেখানোর প্রয়োজন নেই, আগে থেকেই সে এই জায়গাটি খুব ভালো করে চেনে। সে তার চিরচেনা ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে এখানে এলো। এখানকার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কেও সে অবগত। এখানে বহুবার

এসেছে। বহু প্রতিনিধি দলের অংশ হয়ে। কিন্তু এই প্রথম তাকে একা ডাকা হয়েছে। তাকে কমে বসিয়ে প্রটোকল অফিসার ভেতবের দরজা ভেজিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এটি পনেরো মিনিটের একটি সাক্ষাৎ। বসে বসে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো সে মনে মনে একবার ঝালাই করে নিচ্ছে। সালার আমেরিকার বহু প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু আজ যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বহু কারণে তিনি বিশেষ কেউ। দেওয়াল ঘড়িতে সময় এখন ৯টা বেজে ৫৬ মিনিট।

প্রেসিডেন্টের আগমনের এখনো পাঁচ মিনিট বাকি। তার আগেই ১টা ৫৬-তে এক ওয়েটার তাকে পানি পরিবেশন করে গেল। সালার গ্লাস তুলে একপাশে রেখে দিল। ১টা ৫৭-তে আরেকজন অ্যাটেনডেন্ট কফি পরিবেশন করতে এলো, সে বিনীতভাবে না করে দিল। ৯টা ৫৯-এ ওভাল অফিসের দরজা খুলল, আর প্রেসিডেন্টের আগমনের ঘোষণা হলো। সালার উঠে দাঁড়িয়ে

পড়ল। অফিসের দরজা পেরিয়ে আগত প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্বল প্রেসিডেন্ট।

এটি ২০৩০ সালের আমেরিকা। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অগণিত সংকটে জর্জরিত এক নড়বড়ে দেশ। কিছু অঙ্গরাজ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে, আর কিছু রাজ্যে তীব্র জাতিগত দাঙ্গা। এই সবকিছুর মধ্যে তিনি আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট, যেখানে মত্বিসভা ও বিশ্ব ট্রাঙ্কে মুসলিম-ইহুদিদের সংখ্যা এখন সমান। তার নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম যেমন টালমাটাল, তেমনি সরকারও ভেতরে ভেতরে অস্থিরতায় ভুগছে। এসবের জন্য প্রেসিডেন্ট সালারের সঙ্গে দেখা করছেন না, তিনি দেখা করছেন অন্য কারণে। মূলত এ সময়ে আমেরিকা তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ আর্থিক সংকট অতিক্রম করছে। এই মুহূর্তে তারা তাদের আন্তর্জাতিক অবস্থান ও সুনাম গড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। SIF এর প্রধান সালার সিকান্দাদের সঙ্গে এখন প্রেসিডেন্ট সেই উদ্দেশ্যেই সাক্ষাৎ করছেন। সাংবিধানিক সংশোধনীও আনতে হয়েছে দেশটিকে রক্ষা করার জন্য।



আমেরিকার ইতিহাসের এই ভয়াবহ আর্থিক সংকটের সময়, যখন তাদের স্টক এক্সচেঞ্জ ভেঙে পড়েছে, বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান একে একে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, ডলারের মান এক জায়গায় ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং ক্রমাগত ভেঙে পড়া মুদ্রাকে স্থিতিশীল করতে খোদ আমেরিকাকেই মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনবার তাদের ডলারের মান কমাতে হয়েছে। এই তাগুবের মধ্যেও মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান সিনা টান করে দাঁড়িয়েছিল। টালমাটাল পরিস্থিতিতেও আমেরিকার অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো ভেঙে পড়েনি; ডাউনসাইজিং করেনি, আর না সরকারের কাছে কোনো বেইলআউট প্যাকেজ চেয়েছে। সেই একমাত্র প্রতিষ্ঠানটি হলো সালারের SIF.

মাত্র পনেরো বছরে এটি আন্তর্জাতিক এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে দুর্দান্ত গতিতে, স্বমহিমায়। আমেরিকা ছাড়া আরও অনেক ছোট-বড় দেশের অসংগা

প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ছাতার নিয়ে টেনে এনেছে সততার চুম্বকে। পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং পশ্চিমা সরকারগুলোর কঠিন বৈষম্যমূলক আইন সত্ত্বেও সেই ছাতার বিস্তার ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে।

পনেরো বছরে নিজেদের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির জন্য SIF অসংখ্য লড়াই লড়েছে। প্রতিটি লড়াই ছিল চতুর্মুখী। কিন্তু SIF আর এর সঙ্গে জড়িত মানুষগুলো মোটেও হাল ছাড়েনি। পনেরো বছরের এই অল্প সময়েই তারা আর্থিক জগতের এক বিশাল 'মান্ডরমাছ'-এ রূপ নিয়েছে। এক বিশাল শক্তি ও ব্যাপ্ত অবস্থান তৈরি করেছে। প্রতিটি লড়াই যেন তাদেরকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে।

ইউরোপ ও এশিয়া ছিল তার বড় বাজার। তবে আসল দখল ছিল আফ্রিকায়। সেই আফ্রিকা-যেখানে এখন কোনো শ্বেতাঙ্গ কল্পনাও করতে পারে না, SIF ছাড়া আর্থিক কোনো লেনদেন সম্ভব। অথচ আফ্রিকা SIF-এর মুঠোয় নয়, বরং সাধারণ

সিকান্দারের হাতের মুঠোয় পুরো আফ্রিকা। যার নাম ও চেহারা; দুটো সম্পর্কেই অবগত আফ্রিকার জনগণ ও তাদের নেতারা। গত পনেরো বছর ধরে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গৃহযুদ্ধ চলাকালীনও একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান সগর্বে তাদের কাজ চালিয়ে গিয়েছিল, আর সেটি হলো সালারের প্রতিষ্ঠান। তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধিকাংশ কর্মকর্তাই মিল আফ্রিকান-গাবা SIF-এর মিশন স্টেটমেন্টে বিশ্বাস রাখে এবং জানে, SIF তাদের জন্য যা করছে আর যা করতে পারবে, তা আর পৃথিবীর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারবে না।

প্রথম প্রথম বহু ক্ষতির সম্মুখীন হলেও SIF আফ্রিকা মেয়ে সোয়া সেখানেই দৃঢ়ভাবে অটল থাকে। তাদের এই দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বের মূল কারণ হলো, সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থ্যা শুধু ওখানকার শিল্প ও শিল্পোদ্যোগ্তাদের সুদবিহীন ঋণই দেয়নি; তাদের শিল্পকে দাঁড় করাতে বরং প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের যোগানও দিয়েছিল। গত পনেরো বছরে আফ্রিকায় SIF-এ অগ্রগতি এত উচ্চে পৌঁছে গিয়েছে যে, বহু

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আফ্রিকায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে SIF-এর আশ্রয় নিতে হয়েছে। শালার সিকান্দার কৃষ্ণাঙ্গ দুনিয়ার মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে এক মুকুয়হীন সম্রাট। তার এই পরিচিত ছড়িয়ে পড়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। বর্তমানে আফ্রিকার আর্থিক ব্যবস্থার চাবিকাঠি SIF-এর হাতে। আও হোয়াইট হাউসে শালারকে ডাকার এটিও একটি কারণ।

আমেরিকা এখন বিশ্বব্যাংকের তহবিলের অর্থও আদায় করতে পারছে না। তহবিল সরবরাহে ব্যর্থ হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক পৃথক হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংক এর আগে থেকেই একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভীষণভাবে টলতে শুরু করেছে। এর ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। শুধু আমেরিকাই এখন আর্থিক সংকটে নয়, পৃথিবীর বহু দেশ এখন একই মন্দার শিকার। সবাই কেবল নিজের আখের ও অর্থনীতি গোছাতে ব্যস্ত। জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের

অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করা এখন শুধু অসম্ভবই নয়, বরং ওই সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক ওঠা নামার ফলে তাদের কাছে বিশ্বব্যাংক এক দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

বিশ্বব্যাংক এখন এক 'সাদা হাতি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার থেকে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো মুক্তি পেতে চাচ্ছে। আর ইতিমধ্যে অনেকেই তাদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করেও ফেলেছে। জাতিসংঘের যেই চার্টার অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো থেকে বিশ্বব্যাংকের জন্য তহবিল জোগানো হতো, সেই চার্টার এখন নিছক এক কাগজের টুকরোয় পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ এখন আর সেই আগের মতো, শত শত বছরের গড়ে ওঠা একই আর্থিক কাঠামোতে বিশ্বকে বেঁধে রাখতে পারছে না। পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে এবং ঘড়ির কাঁটার মতো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের সেই গতি থামানোর এক শেষ প্রচেষ্টা হিসেবেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট SIF-এর প্রধানকে আজ এখানে ডেকেছেন।

ইভান হকিন্স ভেতরে প্রবেশ করলেন। মুখে ফুটিয়ে তুললেন তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য এক স্বাগত হাসি। যে প্রতিদ্বন্দ্বী এখন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে মার্জিত ও নিজস্ব আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। রাজনীতিতে আসার আগে ইভান এক বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। সালার সিকান্দারের সঙ্গে তার পরিচয়ও বহু বছরের, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও। আমেরিকায় SIF তার নতুন অর্জনটা করেছিল তার প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেই। এর ফলে ইভানকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু এখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেও, সেই ব্যর্থতা ও অসম্মানের দাগ আজও তার রেকর্ডে ঝলসে আছে। ইভানের দুর্ভাগ্য যে, এত বছর পর আবারও তাকে সেই পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীরই দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আর সালার আজ তারই প্রেসিডেন্সি-কালে তাকে পুনরায় হারাতে চলে এসেছে। এটা সালার না ভাবলেও, ইভান অন্তত তা-ই উপলব্ধি করছেন। সালার এসেছে অন্য এক অ্যাজেন্ডা নিয়ে। তার মন ব্যস্ত ভিন্নয় কোনো চিন্তায়।

: 'সালার সিকান্দার...!' মুখে এক উষ্ণ হাসির মুখোশ এঁটে, ইভান দ্রুত এগিয়ে এসে সালারকে অভ্যর্থনা জানালেন। যেন তারা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং বহুদিনের পুরোনো বন্ধু। তাদের এই সাক্ষাৎ যেন হোয়াইট হাউসে নয়, কোনো খোলামেলা গলফ কোর্সে হচ্ছে। সালারও করমর্দন করতে করতে তার মতো একই আন্তরিকতায় হাসির উত্তর হাসিতে দিল। তারপর দুজনের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কিছু কথা হলো। আবহাওয়া নিয়েও দুয়েক বাক্য বিনিময় হলো। এরপর তারা নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসে পড়ল। এটি একটি ওয়ান-অন-ওয়ান সাক্ষাৎ। তাই রুমের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেল, ভেতরে আর কোনো স্টাফ রইল না। এই ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পরই তারা একটি যৌথ প্রেস কনফারেন্স করবে। এর জন্য পাশের রুমে দুনিয়াজোড়া সাংবাদিকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাদের এই সাক্ষাতের পূর্বে দুজনের টিম সদস্যরা বহুবার বৈঠকে বসেছে। একটি খসড়া কাঠামোও তারা নির্দিষ্ট করে রেখেছে। এবং প্রস্তুত করেও। এখন এই বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে তারা সেই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিবে। তার আভাস ইতিমধ্যেই

মিডিয়ার কানেও পৌঁছে গিয়েছে। আমেরিকা এখন আর বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে নয়; এবার তারা SIF-এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রবেশ করতে চায়। বিশেষত আফ্রিকায়। আর এ জন্যই তারা বিশ্বব্যাংক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তবে তাদের সামনে এখন একটাই সমস্যা আর তা হলো, আমেরিকার অ্যাজেন্ডা আর SIF-এর অ্যাজেন্ডা এক নয়। আমেরিকার উদ্দেশ্য এক, আর SIF-এর উদ্দেশ্য আরেক। তাই এই ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সালার সিকান্দারকে তাবা অনানুষ্ঠানিকভাবে শেষবারের মতো, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই SIF-এর বহু শর্ত মেনে নিয়ে এই কাঠামোতে রাজি হয়েছে। কারণ, এটি আর এখন সেই ক্ষমতাস্বত্ব আমেরিকা নয়, যে বন্দুকের নলের জোরে যে-কাউকে দিয়ে, যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে। এটি এখন ভেতর ফাঁপা, অক্ষম এক দেশ-যে এখন অন্যের কথা শোনে, শর্ত মেনে নেয়, প্রয়োজনে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসে। অথবা শেষ অস্ত্র হিসেবে

নিজের আর্থ রক্ষায় বিদ্রোহ কিংবা সমঝোতা, যেকোনোটাই করতে পারে। তার ফলাফল ভালো কিংবা মন্দ যা-ই হোক।

সাক্ষাতের ফলাফল ইভানের প্রত্যাশামাফিক হলো। SIF ও আমেরিকার অ্যাজেন্ডা, কোনো অ্যাজেন্ডা নিয়েই সালার সিকান্দারের কোনো সংশয় নেই। সবকিছু সে জানে। আর জেনেই আমেরিকান সরকারের সাহায্য করতে প্রস্তুত সে। তবে যে অবকাঠামো তাদের টিম তৈরি করেছে, সেই অবকাঠামোর আলোকে। কিন্তু SIF-কে আমেরিকার মুখপাত্র বানাতে সালার বাজি নয়। ইভানের এই প্রস্তাবকে সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। দুই রাঘববোয়ালের মধ্যে শত্রুতা হতে পারে; বন্ধুত্ব নয়। বন্ধু না হয়ে, শত্রু হয়েও তারা একই পানিতে থাকতে পারে, অত্যন্ত সতর্ক এবং শান্তিপূর্ণভাবে, নিজেদের সীমার ভেতরে। সালার সিকান্দারও ইভানকে একই পরামর্শ দিল। এবং ইভান সেটি গ্রহণও করল। তার কাছে সালার যে উত্তর প্রত্যাশা করেছিল, অবশেষে তা-ই পেল।

SIF-এর এখন একজন নতুন প্রধানের প্রয়োজন, যে হবে আরও নমনীয় এবং আরও বুদ্ধিমান। সালার সিকান্দারের মধ্যে এ দুটি গুণের বেশ কমতি রয়েছে, এটি ইভানের ধারণা। বৈঠকের আগে সিআইএ ইভানকে SIF-এর পুরোনো প্রধান সালারকে সরিয়ে নতুন প্রধান নিয়োগ করার নির্দেশনা দিয়েছে। বৈঠকের পর সেই নির্দেশনা কার্যকরও হয়েছে।

এর আগে ইভান SIF-এর প্রধান সালার সিকান্দারের সঙ্গে এক প্রেস কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিল। সেখানে সে আমেরিকার চলমান আর্থিক সংকটে SIF-এর সহায়তা নেওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিল। এমনকি প্রচণ্ড চাপে পড়ে প্রেসিডেন্ট SIF-এর সেই ফ্রেমওয়ার্কটিও কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিল। আজও সেই ঘোষণা দিতে গিয়ে ইভান হকিন্সের ঠিক সেই তুচ্ছতা অনুভূত হচ্ছে, যে তুচ্ছতা অনুভূত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে সালারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যাওয়ার সময়। তবু ইভানের বিশ্বাস, ইতিহাস এবার

একটু ভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি হবে। এবার পরাজয়ের মালা অন্য কেউ পরবে। এবার দৃশ্য থেকে ছিটকে পড়বে তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী; সে নয়।

মেয়েটিকে হিশাম প্রথমবার সুদানেই দেখছে; ইউএনএইচসিআর-এর আশ্রয়কেন্দ্রে এক বোবা শরণার্থী মহিলার সঙ্গে ইশারায় কথা বলতে। মহিলাটিকে সে কিছু একটা বোঝাচ্ছে। তার গায়ের রং ও চেহারার গড়ন দেখে হিশাম অনুমান করছে, সে হয়তো পাকিস্তানি কিংবা ভারতীয় হবে। তার গলায় ঝোলানো কার্ডে সে তার নাম টাও পড়ে ফেলল।

খুব সাধারণ চেহারা-সুরত, হালকা-পাতলা গড়ন আর শ্যাম বর্ণের একটি মেয়ে। মাথা ভারতি ঘন কালো চুল। দীর্ঘ দেহ। প্রথম দেখায় মেয়েটির পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতাই হিশামের কাছে তার একমাত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হলো। এছাড়া বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে না তার। মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মেয়েটি তার দিকে মনোযোগী হলো।

একজন সহকর্মী হিসেবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হাসল। তাকে হাতের ইশারায় 'হ্যালো' বলে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করল। মেয়েটিও ইশারার ভাষায় তাকে উত্তর করল। দুজনেই একসঙ্গে গলায় ঝোলানো কার্ড তুলে, তাতে আঙুল ঘুরিয়ে নিজেকে যেন পরিচয় করাল। মেয়েটি CARE-এর কর্মী, আর হিশাম RED-এর। দুজনই যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। পরিচয় দিয়ে, ইশারায় ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আরও কয়েক কথা বলে, দুজনই সামনে আগাল।

তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎটি হলো পরের দিন। কাঠের অস্থায়ী বাথরুম নির্মাণের জায়গায়। মেয়েটি আজও তার আগে এখানে এসে পড়েছে। এসে ছবি তুলছে। হিশাম একটি লোডার গাড়িতে করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এখানে এসেছে। দুজন আবারও হাতের ইশারায় সালাম বিনিময় করল।

তাদের তৃতীয় সাক্ষাৎটি হলো দীর্ঘ। ত্রাণকর্মীদের এক ডিনারে দেখা হলো। ডিনার হলের বাইরে, করিডরে তারা মুখোমুখি।

দশ মিনিট ধরে তারা ইশারায় ভাষায় কথা বলছে। মেয়েটি পাকিস্তানের, আর সে বাহরাইনের। হিশাম নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। আর মেয়েটি সিটি ইউনিভার্সিটিতে। হিশাম ফাইন্যান্সের স্টুডেন্ট। মেয়েটি সমাজবিজ্ঞানের। তাদের দুজনের মধ্যে কেবল একটি দিকের মিল রয়েছে আর তা হলো, সেবামূলক কাজ। এই কাজে তারা দুজনই কৈশোর থেকে যুক্ত। তাদের অ্যাকাডেমিক সিভিল চেয়ে নন-অ্যাকাডেমিক সিভিলই অধিক দীর্ঘ।

করিডরে কাটানো এই দশ মিনিট তারা একে অপরের কথাই বলল এবং পরিচিত হলো। ইশারার শব্দে খুব বেশি প্রশ্ন করা হলো না। কিন্তু হিশামের ইচ্ছে করল, তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে। মেয়েটি কথা বলতে পারলে, করেই ফেলত, তার পাশে দাঁড়িয়ে হিশাম ভাবল। এই সন্ধ্যায় মেয়েটিকে এতটাই আকর্ষণীয় লাগছে তার! কথা শেষে, আগের মতোই তারা একসাথে সামনে এগিয়ে যেতে চাইল। পাশ দিয়ে অতিক্রমরত এক ব্রাণকর্মী ছেলে দূর থেকেই তাদের হ্যালো বলল। সে

তাদের চিন্তা পাশাপাশি ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করল। তারা দুজনই একসঙ্গে ছেলেটির দিকে মনোযোগী হলো। দুজনই একসঙ্গে মুখ ফুটে ছেলেটির হ্যালোর জবাব দিয়ে, তার ভালো-মন্দও জিজ্ঞেস করল। দুজনেই হতভম্ব হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। অতঃপর দুজনেই হো হো করে হাসতে লাগল। এবং হাসতেই থাকল। লজ্জা ঢাকার জন্য এছাড়া তাদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না।

তাদের প্রথম পরিচয় করিয়েছিল নীরবতা। আর সেই নীরবতা চিরকাল তাদের অনুভূতির ভাষা হয়ে রইল। এটি যেন তাদের কাছে এক হৃদয়গ্রাহী খেলা। যখনই একে অপরকে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন হয়, তখন ইশারায় কথা বলতে থাকে। হাসাহাসি, বিভ্রান্তি, বোঝাপড়া, সবকিছু যেন এতেই হয়। কী এক অদ্ভুত খেলা!

তারা তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। হিশামের অবাক লাগছে, তাহলে আগে কেন তাদের দেখা হলো না? দুজনেই

তো একই ধরনের জনসেবামূলক সংস্থায় যুক্ত আছে। তবে এর আগে তারা শুধু আমেরিকার মধ্যেই ঝড়-তুফান ও বন্যায় ত্রাণকাজে সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রথম তারা আমেরিকার বাইরে কোথাও শরণার্থী শিবিরে অংশ নিয়েছে।

নিউইয়র্কে ফিরেও তাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সত্ত্বেও একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা করতে থাকে। এমনকি এর বাইরে গিয়েও তাদের পরিবারের সঙ্গেও দেখা হতে থাকে। আর এখন তারা নিয়মিত দেখা করে। দুজনের বাবাই একে অপরকে খুব ভালো করেই চেনেন।

হিশাম আমেরিকায় নিযুক্ত বাহরাইনের রাষ্ট্রদূতের ছেলো। বাহরাইন দূতাবাসে আয়োজিত প্রায় সব অনুষ্ঠানে তাকেও আমন্ত্রণ করা হয়। তার মা ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত এক ডাক্তার। তার বাবা আমেরিকা ছাড়াও বহু ইউরোপীয় দেশে বাহরাইনের

প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দুই ভাই-বোনের মধ্যে হিশাম বড়। তার ছোট বোন এখনো হাই স্কুলে পড়ে।

সেবামূলক কাজের আগ্রহ হিশাম মায়ের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। তার মা বিয়ের আগে রেডক্রসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমেরিকা থেকে পাঠানো ত্রাণকর্মীদের সঙ্গে প্রায়ই তিনি ফিলিস্তিনের শরণার্থী শিবিরে যেতেন। বিয়ের পর তার এই কাজ কেবল ফান্ড সংগ্রহ আর অনুদানেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু হিশাম তার মায়ের কাছ থেকে এই আগ্রহ উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করে। এবং কালক্রমে সেটা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার পর, হিশামের নিজের আগ্রহ ও উন্মাদনা খুব কম মনে হতে থাকে। এই অল্প বয়সে মেয়েটির কাজের পরিমাণ দেখে সে হতভম্ব। এ কাজের জন্য নিঃসন্দেহে সে শ্রেষ্ঠ সেবাকর্মীর সনদ লাভের যোগ্য।



তার সঙ্গে ক্রমশ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর হিশামের উপলব্ধি হচ্ছে, মানবসেবার আগ্রহ ছাড়াও তাদের মধ্যে আরও অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে। কেবল আগ্রহ ও কাজেরই মিল নয়; বরং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যেরও মিল রয়েছে। দুজনেই বইপোকা। ইতিহাসের প্রতি দুজনেরই প্রচণ্ড ঝোঁক। ভ্রমণপিপাসু তারা। স্বল্পভাষী এবং ভেবেচিন্তে পরিমিত কথা বলতেও অভ্যস্ত দুজনেই।

হিশামের পুরো জীবন কেটেছে সহশিক্ষার পরিবেশ ও প্রতিবেশে। মেয়েরা তার কাছে নতুন কিছু নয়; আর না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাও অভিনব কিছু। তবে জীবনে এই প্রথম সে কোনো মেয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তার জীবনে অনুসরণীয় ব্যক্তি বলতে কেউ কখনো ছিল না। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তাকে প্রভাবিত করত। কিন্তু সেসব বৈশিষ্ট্যের কোনোটিই এই মেয়েটির মধ্যে নেই। না সে সুন্দরী, না স্টাইলিশ, আর না এমন চতুর যে, প্রতিপক্ষকে চিতপটাং

করে দিবে মুহূর্তেই। তা সত্ত্বেও মেয়েটি তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

একটি আধুনিক চশমা, সাধারণ জিন্স ও কুর্তা পরেই হিশামের কাছে তাকে অন্যান্য আধুনিক পোশাক, সাজসজ্জা ও স্টাইলিশ জুতা পরিহিত মেয়েদের তুলনায় অধিক মনোমুগ্ধকর লাগে। আত্মমগ্ন, অন্যের প্রতি উদাসীন, রঙিন জামা ও শাটে, চুলগুলো বেণির মতো করে বেঁধে, লম্বা চিকন ঘাড়ে যেন রাজহাঁসের মতো হেলেদুলে চলে। সব সময়ই তাকে ফোন বা ইলেকট্রিক ট্যাবলেট হাতে আপন জগতে মগ্ন পাওয়া যায়। অন্যান্য মেয়ের মতো তাকে দেখলেই সে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে না।

হিশাম একজন আরব। মেয়েদের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে খুব ভালো জানাশোনা আছে তার। তাদেরকে আকৃষ্ট করতে সেভাবেই চলে সে। সবাই হয়ও। কিন্তু এই মেয়েটি কোনোভাবেই তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না।



: 'আমাদের সমাজে যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে খেতে যায়, তাহলে বিল পুরুষ দেয়; নারী নয়।' হিশাম এই প্রথম তাকে বাইরে খেতে দাওয়াত করেছে। বিল দেওয়ার সময় মেয়েটিকে পার্স বের করতে দেখে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথাটি তাকে বলল। প্রত্যুত্তরে মেয়েটি মুচকি হেসে পার্স থেকে কিছু নোট বের করতে করতে বলল, 'আর আমার বাবা আমাকে বলেছেন, নিজের বাবা ও ভাই ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে খাবার খেলে নিজের বিল নিজেই পরিশোধ করবে। এটি তোমাকে ও তাকে সকল ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে। তাই এই হলো আমার অংশের বিল।'

মেয়েটি নোট টেবিলে রাখতে রাখতে হিশামকে বলল। এখনো তার মুখে মুচকি হাসি ফুটে আছে। হিশাম কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেল। এটি অনেক দামি একটি রেস্টুরেন্ট। তাছাড়া যে যখনই কোনো মেয়েকে নিয়ে আসে, তখন বিল সে নিজেই পরিশোধ করে। এর বিনিময়ে সেই মেয়েটি তার খুব প্রশংসা

করে। অবাক ও বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।
কিন্তু আজ প্রত্যাশার বিপরীত হলো।

'রেস্টুরেন্টটি অনেক দামি, তাই আমি বলছিলাম।' হিশাম
কখনো কোনো নারীর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়নি।

'শুকরিয়া, কিন্তু আমি অনেক বড়লোক।' জবাবে মেয়েটি মুচকি
হেসে বলল।

: 'তার মানে আমার বিলও তুমি দিতে পারবে?' কী জনি হিশাম
এটি কেন বলল। : বিল দিতে পারব না, কিন্তু বিল দেওয়ার জন্য
ধার দিতে পারব।' জবাবে মেয়েটি বলল।

: 'তাহলে দয়া করে দিয়ে দাও।' হিশামও একই ঢঙে বলল।
মেয়েটি এই প্রথম বিভ্রান্ত হলো। তার দিকে তাকাল। অতঃপর
সে তার পার্স থেকে হিশামের ভাগের বিল বের করে তার দিকে

এগিয়ে দিল। হিশাম সেটা ভাঁজ করে ওয়েটারের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

মেয়েটি ততক্ষণে তার ব্যাগ খুলে তাতে কিছু খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি শেষে একটি ডায়েরি বের করল। তারপর কলম। ডায়েরিতে হিশামকে দেওয়া ধারের অঙ্ক লিখে সেটি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। হিশাম খানিক অবাক হয়ে ডায়েরি হাতে নিয়ে বলল, 'এটা কী?' কিন্তু ডায়েরির দিকে তাকাতেই সে উত্তর পেয়ে গেল। মেয়েটি মূলত তার কাছে তার নেওয়া টাকার পাশে স্বাক্ষর চাচ্ছে। হিশাম কয়েক মুহূর্ত ভুঙ্ক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি এখন চশমা খুলে সেটি মুছে পুনরায় চোখে পরছে। স্বভাবগতভাবে নিজের কাজে মগ্ন হয়ে তাকে উপেক্ষা করছে। বোঝাতে চাচ্ছে, এসব স্বাক্ষর নিয়ে ধার দেওয়া যেন তার দৈনন্দিন কাজ। হিশাম কলম সামলে স্বাক্ষর করার আগে ডায়েরির আগের পৃষ্ঠাটি উলটে তা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে দেখল। ওখানে ছোট-বড় বহু সংখ্যার সারি। সেসব ধার গ্রহণকারী কেবল একজনই। কিন্তু তার নাম

ওখানে লেখা নেই। বিভিন্ন তারিখ লিখে কেবল স্বাক্ষর। কিন্তু আদায় করার জায়গায় কোনো এক পয়সা আদায়েরও চিহ্ন নেই।

: 'আমি বুঝতে পারিনি, তুমি এত হিসেবি। সবকিছুর হিসাব রাখো। ডায়েরিতে স্বাক্ষর করতে করতে না বলে থাকতে পারল না হিশাম।

আমি যদি না লিখে রাখি, তাহলে তো ভুলে যাব। কিছু লেনদেনে তো স্বাক্ষর জরুরি।' প্রতুত্তরে মেয়েটি অত্যন্ত নিশ্চিত মনে বলল। আরপর ডায়েরি ও কলম নিয়ে তার ব্যাগে ভরে রাখল।

'ডায়েরি দেখে তো মনে হয়, তুমি সত্যিই অনেক বড়লোক, এত উদার মনে কাকে ধার দাও?' টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে হিশাম তাকে ঘাঁটাল। কিন্তু মেয়েটি তা এড়িয়ে গেল। তাদের মধ্যে এতটাও আন্তরিকতা হয়নি যে, সে তাকে এত বেশি

ঘাঁটাঘাঁটি করবে। কিন্তু ওই ডায়েরিতে দেখা সাক্ষরটি তার স্মৃতিতে রয়ে গেল। সেটি দেখে এতটুকু অনুমান করতে পারছে যে, তা কোনো পুরুষেরই স্বাক্ষর।

এক সপ্তাহ পর মেয়েটিকে সে ধার ফিরিয়ে দিতে তার ডায়েরির পরিশোধ পাশে স্বাক্ষর করল। 'পরিশোধ করা হয়েছে' বাক্যটি লিখতে লিখতে আগের মতো সে এবারো ডায়েরিটি উলটে পালটে দেখল। ডায়েরিটি এ বছরেরই। বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোনো সাক্ষর নেই। কিন্তু ধার নেওয়া লোকদের সারি বেড়েই চলছে। ছোট-বড় পরিমাণের অসংখ্য ধার।

'এই বছর একমাত্র আমিই তোমার ধার পরিশোধ করলাম। হিশাম যেন গর্ব করে বলল। মেয়েটি মৃদু হেসে ডায়েরি ও নোট পুনরায় ফিরিয়ে নিল। নোট সে হিশামের সামনে গুনল। তারপর পাশ থেকে কিছু ভাংতি নোট নিয়ে বাড়তি তাকে ফিরিয়ে দিল। নাটেগুলো বাড়তি টাকা।

'বাদ দাও, ওটা থাকুক।' হিশাম নোট ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। 'অত বেশি টাকাও নয়।' সে যেন গুরুত্ব দিল না।

: 'এটি দিয়ে এক কাপ কফি ও একটি ডোনাট পাওয়া যাবে। একটি ভেফেল আইসক্রিম অথবা একটি বার্গার কেনা যাবে।' মেয়েটি একেবারে নিশ্চিত মনে বলল হিশাম হাসল।

তুমি আসলেই একটু বেশি হিসাবনিকাশ

'আমার মা বলেন, টাকা অনেক কষ্টে উপার্জন করতে হয়। তাই এর মূল্যায়ন করা উচিত।' সে যেন আবারও হিশামকে নিরুত্তর করে দিল।

: 'এমন হলে তো তুমি সত্যিই অনেক বড়লোক হয়ে যাবে।' হিশাম তাকে জ্বালাতন করল।

: 'ইনশাআল্লাহ'। জবাবে মেয়েটি এতটা নিশ্চিত মনে বলল যে, হিশাম হেসে ফেলল। হাসার পর সে বুঝতে পারল, এটা ঠিক হয়নি। কারণ, মেয়েটি সিরিয়াস হয়েই বলেছে।

'তোমার খারাপ লাগেনি তো?' হিশাম খানিক সামনে নিয়ে তাতে জিজ্ঞেস করল।

কী?

আমার হাসা।

না, আমার কেন খারাপ লাগবে? তুমি কি আমাকে নিয়ে হেসেছ?

হিশাম মাথা ঢুলকাল। মেয়েটি সরল। কিন্তু প্রশ্নটা জটিল।

"এই যাকে এত ধার দিচ্ছ, এ কে?" সেও তাকে একটি জটিল প্রশ্ন করল।

"আছে একজন।" মেয়েটি আবারও নাম এড়িয়ে গেল।

'তুমি নাম বলতে চাও না?' হিশাম না বলে থাকতে পারল না।

হিশাম কিছুক্ষণ চুপ রইল, তারপর বলল, 'তার ঋণের বোঝা কি একটু বেশিই হয়ে গেল না?' হিশামের সুই এখনো ওখানেই আটকে আছে।

: আমি তাকে না করতে পারি না।

হিশাম অদ্ভুত অস্থির হলো।

: 'টাকার ব্যাপারে কারও ওপর ভরসা করা ঠিক নয়।' হিশাম হয়তো জীবনে এই প্রথম কাউকে এমন পরামর্শ দিল।

: 'কেবল টাকাই নয়, সব ব্যাপারেই তার ওপর ভরসা করি আমি।' মেয়েটি ভীষণ শান্ত মনে বলল। হিশাম বুঝতে পারল না, সে তাকে কী বলবে। এটি তাদের বন্ধুত্বের সূচনা। এখনই তারা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তাদের মধ্যে অতটাও আন্তরিকতা নেই। অবশেষে স্বাক্ষরকারী ওই লোকটির সঙ্গে হিশামের পরিচয় খুব জলদিই হয়ে গিয়েছিল।

তালির গর্জন হামিন সিকান্দারের বক্তৃতার ধারাবাহিকতা পুনরায় ভেঙে দিল। বোস্ট্রামের পেছনে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে, তালির গর্জন থামার অপেক্ষা করল। এটি এমআইটির স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সমাবেশ। তাকে এখানে সূচনা বক্তব্যের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। গত বছর সে এমআইটির স্নাতককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেলিয়ন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে অসাধারণ সাফল্য নিয়ে সে বের হয়েছে। এ বছর নতুন স্নাতক অর্জনকারী ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছে সে। কেবল এমআইই বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, লিগ আইডিওগ্রাই-এর আরও কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাকে এই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

চব্বিশ বছর বয়সে হামিন সিকান্দার, গত তিন বছরে বিশ্বের সেরা উদ্যোক্তাদের একজন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। মাত্র একটি আইডিয়ার মাধ্যমে, যা বিগত কয়েক বছরে একটি সুপ্ত বীজ থেকে বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। 'ট্রেড অ্যান আইডিয়া। নামে তার ডিজিটাল ফাইন্যান্স কোম্পানি, গত তিন বছরে গ্লোবাল মার্কেটে ধুম ফেলে রেখেছে। নিম্নের ১২৫টি সেরা আর্থিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সরাসরি এই কোম্পানির ক্লায়েন্ট। দেড় হাজার ছোট প্রতিষ্ঠান অগ্রপ্রত্যক্ষভাবে এর সেবা নিচ্ছে। এই সবকিছু কেবল তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়েই হয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে তখন এই কোম্পানি শুরু করেছিল।

'ট্রেড অ্যান আইডিয়া'-র ধারণা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং অনন্য। একজন সাধারণ ব্যবহারকারীর কাছে তা প্রাথমিকভাবে সংখ্যার খেলার মতো মনে হতো। এর শুরুও হামিন সিকান্দার অত্যন্ত ছোট পরিসরে করেছিল। একটি ওয়েবসাইটে সে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মুখে একটি অনলাইন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। চ্যালেঞ্জে সে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে গোষণা করে, 'তোমাদের কারও কাছে কোনো আইডিয়া থাকলে, তা বিক্রি করতে পারো। যেকোনো ধরনের আইডিয়া হতে পারে এবং সেই আইডিয়া সফল করার জন্য পুঁজির প্রয়োজন হোক, কোনো কোম্পানির সমর্থন প্রয়োজন হোক, সমস্যা নেই। যেকোনো প্রকার আইডিয়া হলেই হবে। আইডিয়া বিক্রি করলেই যে তুমি স্টুডেন্ট থেকে ব্যবসায়ী হয়ে যাবে, তাও নয়। কারণ, ব্যবসা ও ব্যবসায়ী দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।"

সেই ওয়েবসাইটে তিনটি কুইজ ছিল-এ ক্যাটাগরি, বি ক্যাটাগরি এবং সি। প্রতিটি কুইজে ছিল বিশটি করে প্রশ্ন। ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি আবশ্যকীয় পাসওয়ার্ড ছিল। কুইজে সফল হলেই এই পাসওয়ার্ড দেওয়া হতো। এই নম্বরটিই ছিল ব্যবসা পরিচালনাকারীর আইডি নম্বর। এ ক্যাটাগরির প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত জটিল। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর উত্তর দিতে না পারলে লগ-আউট হয়ে যেত। ক্যাটাগরি বি ও সি ছিল তার চেয়ে তুলনামূলক সহজ। তাতে নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। আর না তাতে লগ-আউট হতো। এটি ছিল সেই তিন ক্যাটাগরির শ্রেণিবিন্যাস, যা আগত ট্রেডারদের পারফরম্যান্স অনুযায়ী তাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলত। যে এ ক্যাটাগরি অতিক্রম করতে পারত না, সে বি কুইজে অংশ নিত। আর যে বি-তে টিকতে পারত না, সে যেত সি-তে। আর যে সি-ও অতিক্রম করতে পারত না, তাকে ট্রেড অ্যান আইডিয়ার পক্ষ থেকে একটি মেসেজ দিয়ে আউট করে দেওয়া হতো, 'আপনার এখনো আরও শেখার বাকি। ট্রেড আপনার কাজ নয়।'



'এ' ক্যাটাগরির উত্তীর্ণদের অসাধারণ মেধাবী বিবেচনা করে তাদেরকে একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেত। এমন একটি ট্রেড সেন্টারে নিয়ে যেত, যেখানে বিশ্বের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেরা মাথাগুলো তাদের আইডিয়া নিবন্ধন করিয়ে, অনলাইনে উপস্থিত ট্রেডারদের সঙ্গে সেই আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করত। তা কখনো হতো গ্রুপ ডিসকাশন, আবার কখনো-বা ট্রেডারদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপচারিতা।

প্রথম ধাপেই হামিন পাঁচটি বড় কোম্পানিকে রাজি করায়। অতঃপর এই ট্রেড রুমে আইডিয়া নিয়ে আসা ব্যক্তিদের আইডিয়া শোনার এবং তা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেয় সেই পাঁচটি কোম্পানিকে। আগতদের মধ্য থেকে কারও আইডিয়া যদি পছন্দ হয়, তাহলে ওই কোম্পানিগুলোকে সেটি কিনে নিতে বলে আর কোম্পানিগুলো সেই আইডিয়াটি হামিনের 'ট্রেড অ্যান

আইডিয়া' কে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিয়ে কিনে নেয়। এমনকি তারা চাইলে সেই আইডিয়া না কিনে, তাতে বিনিয়োগ করতে কিংবা পার্টনারশিপ হতে পারত।

বি ক্যাটাগরিতে উপস্থাপিত আইডিয়াগুলোর বেচাকেনাও এভাবেই হতো। তবে সেখানে বাড়তি একটি বিষয় ছিল আইডিয়া নিয়ে আসা ভিন্ন ভিন্ন তরুণ একে অপরের সঙ্গে কথা বলে, একে অপরের পছন্দমতো আইডিয়ায় অংশীদার হয়ে কাজ করতে পারত। ট্রেড অ্যান আইডিয়ার মাধ্যমে এমন কেউ যদি বাস্তব ক্ষেত্রে বিজনেস করে সফল হতে পারত, তাহলে ট্রেড তাদের থেকে ফি নিত।

সি ক্যাটাগরি ছিল আরও সহজ। সেখানে ব্যবসার জন্য আসা ট্রেডাররা তাদের আইডিয়া একে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদানও করতে পারত। অর্থাৎ কোনো ট্রেডারের যদি অন্য কারও আইডিয়া ভালো লাগত, কিন্তু সেটি নগদ অর্থে কেনার সামর্থ্য নেই, তাহলে সে ওই আইডিয়ার বিনিময়ে অন্য কোনো

সেবা, দক্ষতা বা প্রকল্পের বিনিময়ে তা কিনে ফেলতে পারত। এটি ছিল একেবারেই একটি মৌলিক সূত্র। এর মাধ্যমে হামিন সিকান্দার মেধাকে টাকায় রূপান্তর করেছিল।

প্রথমবারেই তার ক্লায়েন্ট সেই পাঁচটি কোম্পানি, তাদের তিনটি আইডিয়া পছন্দ করে। এবং সেই তিন জনকে হায়ার করে নেয়। এভাবেই তিন বছর আগে অল্পসংখ্যক ক্লায়েন্ট ও ট্রেডার দিয়ে শুরু হওয়া হামিনের কোম্পানিটি এখন উন্নতির শিখরে অবস্থান করছে।

ট্রেড অ্যান্ড আইডিয়া গত তিন বছরে ৩০০টি এমন নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি বিনিয়োগও করেছে। ট্রেডার মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াগুলো নব্বই শতাংশই সফল হয়। বিশ্বের সেরা ১০০টি প্রতিষ্ঠানের সেরা শিক্ষার্থীদেরকে একটি প্ল্যাটফরমে নিয়ে এসেছে এই প্রতিষ্ঠান। এখন এতে বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ শিক্ষার্থী তাদের আইডিয়া শেয়ার

করে। আর এই প্ল্যাটফরম তাদের সেসব আইডিয়াকে বিভিন্ন সফল কোম্পানির লোকদের সামনে উপস্থাপন করে তা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিচ্ছে। এই প্ল্যাটফরম এখন নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য স্বপ্নের একটি জায়গা।

'ট্রেড অ্যান্ড আইডিয়া' এখন একই ক্যাটাগরিতে নতুন একটি ক্যাটাগরিও যোগ করেছে। যেখানে যে-কেউ তাদের দেউলিয়া হতে চলা কোম্পানি, বিজনেস বা সেটআপ প্রজেক্ট বিক্রি করতে পারবে। এবং অনলাইনে এর মূল্যায়নও করাতে পারবে।

হামিন সিকান্দারের নাম এখন বিশ্বের কোনো বড় আর্থিক কোম্পানির কাছে নতুন কিছু নয়। তারা সবাই তাকে এক নামে চেনে। তার কোম্পানি ব্যবসার জগতে নতুন নতুন নিয়ম ও সূত্র নিয়ে এসেছে এবং সেসব সূত্রের ওপর কাজ করেছে।

: 'বেশিরভাগ মানুষের ধারণা, আমি একজন রোল মডেল। হয়তো অনেকের জন্য তাই। কিন্তু আমি নিজে কখনো রোল

মডেলের অনুসন্ধান করিনি। রোল মডেল এবং আদর্শ পুরুষ সাধারণত বইতে বেশি পাওয়া যায়। এদিকে আমার বাবা-মা সবসময় অভিযোগ করতেন, আমি বই পড়ি না।" সামনে উপবিষ্ট শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। 'আমি আমার জীবনে কেবল একটিমাত্র বই আগ্রহ নিয়ে পড়েছি, আর তা আমার বাবার আত্মজীবনী। আর সেটাও আমার বারো বছর বয়সে মায়ের ল্যাপটপে। এটি একমাত্র বই, যা আমি বারবার পড়েছি। এটি একমাত্র বই, যেটি আমার ল্যাপটপেও রয়েছে। আমার বাবার আত্মজীবনীর সবচেয়ে সেরা দিক হলো, এতে কোনো নায়ক, কোনো আদর্শ, কোনো রোল মডেল নেই।

এটি পড়তে গিয়ে আমি সর্বদা অনুভব করেছি, আমার বাবা কত সৌভাগ্যবান যে, কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মতো হতে হয়নি। জীবনে চলার পথে তার নিজস্ব নীতি ও সূত্র ছিল। সেসব নীতি ও সূত্রই তাকে তার শৈশব ও যৌবনে পথ দেখিয়ে চলেছে।' হামিন বলে চলল। 'এই বইটি পড়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কারও দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মতো সহজ কাজ

করব না; বরং প্রভাবিত করার মতো কঠিন কাজ করবা" সে বলেই চলল।

"আমার পরিচয় করানোর সময় সেইসব বিষয় বলা হয়েছে, যেগুলো শুনে আপনারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যান। অপলক তাকিয়ে থাকেন, বিস্ময়ে হা করে থাকেন। আমি কোন বয়সে কী করেছি, আর কোন বয়সে কী। এই বছর আমার কোম্পানির টার্নওভার কত ছিল। বিশ্বের শীর্ষ দশজন সেরা ব্যবস্থাপকের মধ্যে আমি কততম স্থানে আছি। বিশ্বের কোন কোন কোম্পানি আমার ক্লায়েন্ট। আমাকে দেখে এবং আমার সফলতার গল্প শুনে, আপনাদের কেউ যদি প্রভাবিত না হয়, তাহলে তাতে আমি অবাক হব।" হামিন বিরতি নিল। যেন সমাবেশের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো তাদেরকে বলছে। 'কিন্তু এই পরিচয়ে এমন অনেক কিছুই নেই, যা শুনে আপনারা আমার মাকে আপনাদের, কিংবা আপনাদের নিজের মধ্যে আমাকে দেখতে পারেন।

আমার সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও যদি আমাকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় রাখা হয়, তবে এটি ভয়ংকর। ভয়ংকর এজন্য যে, আমরা এমন এক সময়ে প্রবেশ করেছি, যেখানে শুধুমাত্র সফলতা আমাদের সম্মানিত ও ঈর্ষণীয় করে তুলছে, আমাদের মানবিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নয়। হাততালির শোরগোল আবারও তাকে থামতে বাধ্য করল। উপস্থিত শ্রোতাগণ এখন তার রসবোধকে নয়, বরং তার এই কথাগুলোর জন্য বাহবা দিচ্ছে।

এমআইটির স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের কাছে এই কথা বললে আমাকে বোকা মনে হতে পারে যে, কোন জিনিসগুলো আমাদের জন্য প্রভাবিতকারী হতে পারে, তা আমাদের পুনরায় ভাবা উচিত। আমার বয়স যখন দশ, আমার বাবা তখন আমাকে জোরপূর্বক পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে আমার পরিবারকেও। কারণ, আমার দাদার আলঝেইমার ছিল। আমার বাবার বিশ্বাস ছিল, ওখানে তাদেরকে আমাদের প্রয়োজন। পরবর্তী ছয় বছর আমি আমার দাদার সঙ্গে

কাটিয়েছি। পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সেই তরবীয়ত ও শিক্ষা দিতে পারেনি, যে শিক্ষা ও তরবীয়ত দিয়েছিলেন আমার পাঁচাত্তর বছর বয়সি স্মৃতি-হারানো দাদা। এমআইটি-ও তা শেখায়নি।' আবারও তালির গর্জন নীরবতা ভাঙল। অতঃপর তাকে অভিবাদন জানাতে উঠে দাঁড়ানো সমাবেশ, একাধারে কয়েক মিনিট হাততালি দিতে থাকল।

'আমি সবসময় ভাবতাম, এসবের কী লাভ? আমার আমেরিকায় থাকা উচিত ছিল, দাদার কাছে নয়। কিন্তু ধীরে ধীরে সবকিছু বদলাতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, কথা বলা, তাদের গল্প শোনা এবং তাদের সাহায্য করা আমার ভালো লাগতে শুরু করল। একটা দশ বছরের শিশু কখনো বুঝতে পারে না, কেউ সামনের জিনিসটির নামও কীভাবে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু সেসব আমি নিজের চোখে দেখছিলাম। এসব আমাকে একটি জিনিস শিখিয়েছে-কাল কখনো আসে না, যা আছে তা আজ এবং আজকের দিনটির সদ্যবহার করতে হবে। 'কাল' একটি সম্ভাবনা, হতে পারে। হলেও আপনি তা নাও

পেতে পারেনা" হামিন সিকান্দার তার বক্তব্য শেষ করল। পুরো সমাবেশ আবারও তার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাতে হাতে হাততালি গুঞ্জরিত হচ্ছে।

ডাক্তার ভিজেল বার্নার্ডের সঙ্গে এটি জিবরিল সিকান্দারের সর্বশেষ সার্জারি। এরপর থেকে তিনি অবসরে যাবেন। উনার সহকারী হিসেবে এই সার্জারিটি জিবরিলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সার্জারি।

এটি একটি পাঁচ বছর বয়সি বাচ্চা। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সে কোমায় চলে গিয়েছিল। এখন তাকে ইমার্জেন্সি সার্জারি করতে হচ্ছে। তার মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হচ্ছে। গত দুই বছর ধরে জিবরিল ডক্টর ভিজেলের সঙ্গে কাজ করছে। তিনি আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে সফল সার্জনদের একজন এবং জিবরিল তার প্রিয় অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডাক্তারদের পরিমণ্ডলে

ডক্টর ডিজেল বার্নার্ডকে দেবতা মনে করা হয়। তিনি একজন ইহুদি বংশোদ্ভূত। তার সঙ্গে কাজ করাই আলাদা একটি সম্মান। স্বভাবত তিনি অতি গম্ভীর ও কঠোর মেজাজের একজন মানুষ। খুব কম মানুষের সঙ্গে কাজ করে তিনি সন্তুষ্ট হন। বিশেষ করে কোনো মুসলমানের সঙ্গে, আর সেটাও কোনো এশীয় হলে। তা সত্ত্বেও জিবরিল সিকান্দার তার পছন্দতম অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার মধ্যে তিনি নিজেকে দেখতে পেতেন। তার একাগ্রতা, তার দক্ষতায় তিনি মুগ্ধ হতেন। এই হাসপিটালের সবাই জানে, ডক্টর ডিজেলকে শান্ত রাখার কাজ জিবরিল সিকান্দারের চেয়ে ভালো কেউ করতে পারে না।

ডক্টর ডিজেল যতটা কোমল জিবরিলের সঙ্গে, জিবরিলও ঠিক ততটাই প্রভাবিত ডক্টর ডিজেলের দ্বারা। নিউরোসার্জন হিসেবে যদি পৃথিবীতে তার খ্যাতির জয়জয়কার হতো, তাহলে তিনি এর যোগ্য। রক্ষ স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন তিনি বিয়ে করেননি। দুটি কুকুর ও দুটি বিড়াল পোষেন তিনি। সারাটা

জীবন এদের নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন। জিবরিলকেও তিনি প্রথম সাক্ষাতে প্রথম পরামর্শ এটাই দিয়েছিলেন।

: 'এই ফিল্ডে তুমি অনেক দূরে যাবে, তাই বিয়ে করো না। তোমার পেশা ও ক্যারিয়ারে ফোকাস করো। পৃথিবীর সব মানুষই নিজের সুখী জীবনের জন্য বিয়ে করতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে না।' জিবরিলকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। সে তা ম্যাকি হেসে শুনেছিল। আজ এত দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে কাটিয়ে, জিবরিল তার মানসিকতা খুব ভালো করে বুঝতে ও পড়তে পারে।

: 'তোমার হাত, মাসিহার হাত। কারণ, তোমার শিরায় উত্তম বাবা-মায়ের বরু। সেই সঙ্গে তুমি কুরআনের হাফেজ। তোমার এই মাসিহীয় গুণের হেফাজত করো।' কয়েক দিন আগে তিনি জিবরিলের অ্যাপার্টমেন্টে, তার সঙ্গে বসে ডিনার খেতে খেতে বলেছিলেন। এটি ছিল জিবরিলের পক্ষ থেকে উনার অন্য এক

বিদায়ি ডিনার। জিবরিল উনার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ, চিনি একজন চরম একরোখা, কটুর ইহুদি। তার মুখ থেকে কুরআনের হাফিজকে মাসিহীয়তা বলায় সে যারপরনাই অবাক হলো। তার চেহারা ও চোখের ভাব যেন তার সেই বিস্ময়কে ভিজেল পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

'খারাপ মুসলমানকে খারাপই লাগে, ভালো না।' এটি বলে তিনি নিজেই নিজের কথায় হাসছিলেন।

'আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি।' জিবরিলও তার প্রশংসা করতে চাইল। কিন্তু তিনি থামিয়ে দিয়ে বলবেন, 'আমি না থাকলেও তুমি শিখতে। তবে আমি খুশি যে, জীবনের শেষ বছরগুলোতে তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার।' উত্তরে তিনি বললেন।

ডক্টর ভিজেলের বাস্তবত্বের এই ঝলক কেবল জিবরিলই দেখেছিল। অন্য কেউ কখনো বিশ্বাসই করতে পারবে না যে,

তিনি কারও প্রতি এতটা সদয় হয়েছেন। উনার সঙ্গে কাজ করা জিবরিলের কখনো জটিল মনে হয়নি। তবে উনার বিদায়ের পর জিবরিল নিজেই এখন একজন সার্জন হিসেবে তার ক্যারিয়ারের সূচনা করতে যাচ্ছে।

অপারেশন টেবিলে শোয়ানো শিশুর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে জিবরিল। অপারেশন করতে করতে ডক্টর ডিজেল সব সময়ের মতো গল্পগুজব করছেন। তার দীর্ঘ মেডিকেল জীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। ডিজেল হঠাৎ খানিক উদাসীন হয়ে পড়লেন। শিশুটির মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ থামাতে হঠাৎ একটি যন্ত্র নিয়ে অন্য আরেকটি জায়গায় কেটে দিলেন। এক ন্যানো সেকেন্ডেই জিবরিলের মনে কিছু একটা ঘটকা লাগল। জিবরিল উনার হাতের চন্দন লক্ষ করল। তার মনে হলো, কিছু একটা ভুল হয়েছে। তার ধারণাই ঠিক হলো। শিশুটির আর জ্ঞান ফিরল না। ডাক্তার ডিজেলের পেশাগত জীবনের শেষ অপারেশনটি ব্যর্থ হলো। আয়েশা আবেদিন হারালেন তার একমাত্র সন্তানকে।

: 'আমরা কি কোথাও দেখা করতে পারি?' ফ্রিন চমকাতে লাগল।

: 'কোথায়?' উত্তর ভেসে এলো।

: 'যেখানে তোমার সুবিধা, সেখানেই।' প্রত্যুত্তর হলো।

'আচ্ছা, ভাবছি।' শব্দে রা বলল।

'কখন জানাবে?' আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করা হলো।

'কয়েক দিনের মধ্যে।' সংশয়ে বলা হলো।

"আমি অপেক্ষা করব।" প্রতিশ্রুতির মতো পুনরাবৃত্তি করা হলো।

'আমি জানি।' আশ্বাস ভেসে এলো।

আর তারপর সামনে আর কিছুই নেই। যেন কোনো পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে কিংবা কোনো খাদ। যেখানে না আছে কোনো শব্দ, আর না সময়। ইনায়া তার ফোনে আঙুল বুলিয়ে সেই মেসেজগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল, পড়ল। যেন এই প্রথম মেসেজগুলো পড়ছে। যেন এই প্রথম এই কথোপকথনটি হয়েছে। তার শূঁচড়ালো সুন্দনা মুৎসাদা আঙুলগুলো যেন ফোনের স্ক্রিনে নয়, বরং সেই শব্দগুলোর ওপরেই গড়িয়ে যাচ্ছে।।

বহু বছর ধরে তারা প্রশ্নোত্তর করে আসছে। ঠিক এভাবেই। একই ধারাবাহিকতায়। প্রতিবার কথোপকথন এসে এখানেই থেমে যায়, যেখানে থামল এবারও। এর পরের প্রশ্ন কিংবা উত্তর যেন তাদের কারও কাছেই নেই। কিংবা সামনে কিছু বলার হিম্মাতই নেই। তবে অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথনের ফাঁকে

মাসে অন্তত একবার তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কথা চালাচালি অবশ্যই হয়। এই প্রশ্নোত্তর যেন কোনো পুরোনো স্মৃতি বা সংগীতের মতো ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলে। যেমন এখন হচ্ছে। তারা অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলছিল, আর আলোচনা ঘুরে এখানেই চলে এসেছে। এখানে এসে, থেমেও গেছে। এই প্রসঙ্গ পালটাতে তাদের খানিক সময় লাগবে এখন।

এরিককে সে ভালোবাসে না। ইনায়ার ধারণা সেও তাকে বাসে না। এ নিয়ে অসংখ্য অনুভূতি, সন্দেহ ও সুধারণাও তো হতে পারে। আবার এও সত্যি যে, এত বছরে এরিক ছাড়া তার সার্কোলে অন্য কোনো ছেলে বন্ধু নেই। আমেরিকা, পাকিস্তান; কোনোখানে নেই। স্কুল, কলেজ, প্রতিবেশী কোথাও সে কোনো বন্ধু বানাতে পারেনি। কারও সঙ্গে সে এতটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারেনি। আর না তার কখনো এর প্রয়োজন অনুভব হয়েছে। এরিকও এমনই। এটি আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, সে আমেরিকায় থাকে। ওখানকার জীবনপদ্ধতি ভিন্ন। তা সত্ত্বেও সেও ছিল ইনায়ার মতো বেজ বোড।

ইনাযাকে যখন সে বলে, তার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই, ইনাযারও তা-ই বিশ্বাস হয়। সে যদি বলে, গত কয়েক বছরে তুমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি, তাহলে ইনাযা তাও বিশ্বাস করবে।

এমন বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এর কারণ হয়তো দূরত্ব। অথবা সংস্কৃতি বা ইনাযার সেই মানসিকতা, যার সম্পর্কে এরিক খুব ভালো করেই অবগত। এত বছরে, প্রতিদিন এত এত ইমেইল, মেসেজ ও ফোনকলে কথা বলা সত্ত্বেও তাদের আলোচনা ঘুরেফিরে সেই নির্দিষ্ট দু'চারটি বিষয়েই ঘুরপাক খায়।

তারা কখনো আমি ও তুমি'র সম্পর্কে আগায়নি। এটি হয়তো তাদের উভয়ের

সচেতন প্রচেষ্টার ফলাফল।

এক মাস আগে ইনায়া আমেরিকায় থাকতে চলে এসে এসেছে।
ইচ্ছে সত্ত্বেও এরিককে তা জানায়নি। বললেও বিশেষ কোনো
লাভ হতাে না, হতো ক্ষতি। কী জানি কেন তার এই ভয়
হয়েছে যে, এরিক তার আমেরিকা আগমনের কথা জানতে
পারলে, তার সঙ্গে দেখা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এরিকের
জন্য এটি আরও সহজ। কারণ, জামিন ও জিবরিলের সঙ্গে তার
নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ইনায়া তাদের দুজনকে বলে
রেখেছে, তার আমেরিকায় আসার কথা যেন এরিককে না
বলে। এর কারণ জানতে তারা কেউই ইনায়াকে পালটা কোনো
প্রশ্ন করেনি। এরিক যেন তাদের পরিবারের কাছে এমন এক
প্রকাশ্য বাস্তবতা, যা থেকে সবাই দৃষ্টি লুকাতে চায়। কিন্তু
লুকাতে পারে না। বহু আগে ইনায়া ও ইমামার আলোচনায়
এরিকের প্রসঙ্গ এসেছিল। ইনায়া বুঝতে পেরেছে, এরিকের
সঙ্গে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাদের বিয়ের ক্ষেত্রে কী কী
সমস্যা, কী কী আশঙ্কা, সংশয়, রোবটের মতো হড়বড় করে

সব বলে দিতে পারবে ইনায়া। অসংখ্যবার ইমামার মুখে শুনে শুনে এসব মুখস্থ হয়ে গেছে তার। ইমামার অমতকে সে সম্মানও করছে। ধীরে ধীরে সে এরিক থেকে দূরে সরার চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও ইমামা কখনো তাকে এরিকের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে বলেনি। কিন্তু ইনায়ার ধারণা, তার এই অভ্যাস পালটানো প্রয়োজন। নয়তো এই যোগাযোগের অভ্যাস একটি পর্যায়ে এসে দুজনের জন্যই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তারা বেশিরভাগ ইমেইল ও মেসেজে কথা বলে। ইনায়া এই যোগাযোগ কমাতে চেষ্টা করেছিল। পড়াশোনার ব্যস্ততা, পেশাগত দায়িত্ব, বাহানা হিসেবে এই দুটো ছিল তার সর্বোত্তম বাহানা। তা সত্ত্বেও এরিকের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর এটি এরিকেরই কৃতিত্ব। সে লেগে ছিল। ইনায়ার ইগনোর, উদাসীনতা, অবহেলা আর শীতলতা সত্ত্বেও পিছু হটেনি। এমনকি ইনায়ার নিজেরই এতে লজ্জা হতে লাগে। কে জানে এত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সে কোথায় পেয়েছিল! অবহেলা,

অবজ্ঞা পেয়েও সে ইনায়ার প্রতি কোনো আপত্তি, প্রতিবাদ করেনি। এমনকি তাকে এটাও জিজ্ঞেস করেনি যে, শুধু শুধু এখন তোমার এত কাজের কথা কোথেকে মনে পড়ে। এমনকি এটাও বলেনি যে, আমি নিজেও একজন ডাক্তার। আমি নিজেই তোমার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত। তাই অন্তত এসব ব্যস্ততার বাহানা আমাকে দেখিয়ো না।

ইনায়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার ইমেইল ও মেসেজের উত্তর না দিয়ে গায়েব হয়ে থাকত। তা সত্ত্বেও এরিক মেসেজ করে নিয়মিত তার অবস্থা, দৈনন্দিন ব্যস্ততা জানান দিত। ফলে বহুদিন পর ইনায়া তার এত মেসেজ দেখে কোনো না কোনো রিপ্লাই দিতে বাধ্য হয়ে পড়ত। এতদিন না থাকার যেই কারণই সে বলত, এরিক বিনা তর্কে তা মেনে নিত, সেই কারণ যত দুর্বল আর অবিশ্বাস্যই হোক না কেন। এরিকের এই মেনে নেওয়া তার অপরাধবোধ যেন আরও বাড়িয়ে তুলত। ছোটবেলায় সে এমন ছিল না বড় হয়ে এমন হয়েছে। এত বছরে ইনায়ার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি, অথচ এরিকের

মধ্যে এসেছে বহু পরিবর্তন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো, তার ইসলাম গ্রহণ।

আঠারো বছর বয়সে এরিক থেকে সে আবদুল্লাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো যে সবার কাছে এরিক নামে পরিচিত। অথবা এরিক আবদুল্লাহ। ইনাযারা আমেরিকা থেকে চলে আসার পরও এরিক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। ইনাযাকে সে নিয়মিত ইমেইল করেছে। ইমামাকেও করেছে। তার প্রতিটি ইমেইল যেন ইমামার কাছে স্মৃতিচারণ মনে হতে থাকে। যদিও তার নেইলে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

এরিকও ইনাযার মতো মেডিসিনে রেসিডেন্সি করছে। তাদের পেশা যেন ভিন্ন দুটি দেশে বসবাস সত্ত্বেও, তাদের দুজনকে এক অদ্ভুত বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। ইনাযা কিং অ্যাডওয়ার্ডে পড়েছে আর এরিক অ্যারিজোনায়া। ইনাযা আই সার্জন হতে চেয়েছিল আর এরিক হাট বিশেষজ্ঞ। তাদের একই

পেশা যেন তাদেরকে আলোচনায় হাজারো বিষয়বয় তৈরি করে দিয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের পর, বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন চলাকালীন টানা কয়েক বছর গ্রীষ্মকালে এরিক পাকিস্তানে আসত। কিন্তু মেডিকেলের চোকার পর তার সেই আসা-যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ইমামা এতে খুশি হয়েছিল, কারণ সে কখনোই তাকে সরাসরি পাকিস্তান আসতে নিষেধ করতে পারত না। সালারসহ পরিবারের কারোই এরিকের পাকিস্তান আসা নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। সেখানে ইমামা নিষেধ করে তার মন ভাঙতেও চাইত না। কিন্তু এভাবে প্রতি বছর তার কাছে আসা ইমামার আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলছিল। আর যে বছর প্রথমবার এরিক পাকিস্তানে না আসার খবর দিয়েছিল, ইমামা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। তার বিশ্বাস ছিল, এরিক এবার নতুন জীবনের ব্যস্ততায় সব ভুলে যাবে। ইনায়াও খানিকটা এমনই ভেবেছিল। তারও মনে হয়েছিল, এরিক বদলে যাবে, আর সে মানসিকভাবে সে জন্য প্রস্তুতও ছিল। মেডিকেলের

পড়াশোনা কঠিন, তাছাড়া তার জীবনে এখন নতুন নতুন মানুষ আসবে। এইসব পরিস্থিতিতে যদি এরিক তার পরিবারকে, তাকে ভুলে যেত, তবে সেটাও স্বাভাবিক ব্যাপারই হতো। খানিক কষ্ট আর মর্মপীড়ায় ভোগে সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু এমনটা ঘটেনি। এরিক পাকিস্তান আসা বন্ধ করলেও, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করেনি। আর এই সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে কখনোই স্বীকারোক্তি বা প্রকাশের কোনো দুর্বল মুহূর্ত আসেনি। বারবারই ইনায়ার মনে হতো, তার কাছে সে বিশেষ কেউ। কিন্তু এই বাক্যটি এরিকের মুখে সে কোনোদিন শোনেনি। আর এটি হয়তো ভালোই ছিল। এতে করে, কখনো সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে অভিযোগ ও অনুযোগের পরিমাণ কিছুটা কম হতো। সেই সঙ্গে কষ্টও। এমনটাই ছিল ইনায়া সিকান্দারের ভাবনা।

ইনায়ার জন্য এখন পাত্র দেখা হচ্ছে। যোগ্য পাত্রদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। ইনায়ার মনে হচ্ছে, প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালেই তার বিয়ে বা বাগদান হয়ে যাবে। তাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি

নিয়ে সম্ভাব্য পাত্র ও তাদের পরিবারের সঙ্গে একে একে দেখাও করছে। এই সবকিছুর মাঝেও এরিক আবদুল্লাহ আগের জায়গাতেই স্থির। না সে তার জীবন থেকে সরে যাচ্ছে, না তার মন কিংবা মস্তিষ্ক থেকে।

সেদিনও তাদের মাঝে মেসেজে কথা হয়েছে। এরিক তাকে তার হাসপাতালের কোনো সমস্যার কথা বলছিল। উত্তরে ইনায়াও তার আমেরিকার হাসপাতালের একটি সমস্যার কথা শেয়ার করল। 'সেন্ড' বাটন চেপে উত্তরটি দেওয়ার সাথে সাথেই ইনায়া তার ভুল বুঝতে পারল। মেসেজটি ইতিমধ্যে এরিকের কাছে চলে গিয়েছে। যেটি দেখে এরিক যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর রিপ্লাই করে, 'ইনায়া। তুমি কি এখন আমেরিকায়?'

ইনায়ার বলতে ইচ্ছে করল, স্মার্ট ফোন ভুল করে এই হাসপাতালের নাম লিখে ফেলেছে। আমি আমেরিকায় নেই। অথবা অন্য কোনো মিথ্যা বা অজুহাত দেখাতে। বললেই তো

এরিক বিশ্বাস করে নিত। ঘাঁটাঘাঁটি জেরা-জিজ্ঞাসা কবে করে সে? কিন্তু সে মিথ্যা বলতে পারল না। তাকে হ্যাঁ বলে দিল।

ইনায়ার মনে হলো, তার 'হ্যাঁ' যেন আবদুল্লাহকে নাড়িয়ে দিল। হাতে ফোন রেখে ইনায়া ওপাশ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। আনন্দ, বিস্ময়, অবিশ্বাস্যতা, রাগ, যেকোনো প্রকার উত্তর। এরিক অনলাইনে আছে, অথচ চুপচাপ। কোনো উত্তর আসছে না ওদিক থেকে। এমন বিরতি ও নীরবতায় ইনায়া ক্ষণিকের জন্য ভয় পেল। সে পুনরায় 'হ্যালো' লিখে সেই নীরবতাকে যেন চুরমার করতে চেষ্টা করল।

'তুমি আমাকে বললে না?' অপর পাশ থেকে এরিকের উত্তরা ভেসে এলো। নীরবতা এবার ইনায়ার দিকে ছেয়ে গেল। সে চাইলে একশ একটা বাহানা দিতে পারত। কিন্তু কোনো বাহানাই সে দিতে চাইল না। এখন হয়তো খোলাখুলি সবকিছু বলার সময় চলে এসেছে।

: বললে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতে। আর আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলাম না।

নীৰবতা এবাৰ এৰিকের পাশে ছেয়ে গেল। এবং সেটি দীৰ্ঘ থেকে দীৰ্ঘতর নীৰবতা।

'অল রাইট। ঠিক আছে।' বহুক্ষণ পর উত্তর এলো। এৰিক এমনটাই করে। বিতৰ্ক করেই না। রাগ দেখায়ই না। ঝগড়া করা তার সাধ্যের বাইরে। এভাবেই পরাজিত ভঙ্গিতে কথা বলে সে। মুহূর্তেই ইনায়ার নিজের প্রতি রাগ হলো। শুধু শুধুই সে অপরাধবোধে ভুগছে। সরাসরি বলে দিয়েছে, এটাই তো ভালো হয়েছে। আর দেখা না করলেই এৰিকের কী যায়-আসে তাতে? তাছাড়া তারা অনেক দূরে দূরে অবস্থান করছে। দুজন দুই প্রদেশে। দেখা করতে চাইলেও ছুটির জন্য অপেক্ষা করতে হতো তাদের, ইনায়া এসব ভাবতে থাকল্যে সেই সঙ্গে নিজেই নিজেকে যুক্তি দেখাতে লাগল।

আমি পাকিস্তানে যাচ্ছি।

তার কথায় ইনায়া হঠাৎ চমকে উঠল।।।

: 'কবে?' সে অজান্তেই জিজ্ঞেস করল।

১৭ তারিখ।

: 'কেন?' এরিক এখন তাই জিজ্ঞেস করছে, ইনায়া যা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। কিন্তু কোনো উত্তর সে পেল না। এমনকি কয়েকদিন অপেক্ষা করেও না।

আসফান্দের মৃত্যুসংবাদ আয়েশা আবেদিনের কাছে পৌঁছানো জিবরিল সিকান্দারের দায়িত্ব ছিল না। তবু সে সেই শিশুটির

মাযের সঙ্গে দেখা করতে এলো। আর আয়েশা আবেদিনকে দেখামাত্রই কিছুক্ষণের জন্য সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। আয়েশা আবেদিনও খানিকটা তার মতোই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। বহু বছর পর তাদের দেখা হচ্ছে। দেখামাত্রই একে অপরকে চিনে ফেলল। আর এই চেনাটাই যেন তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াল।

আয়েশার বিশ্বাসই হচ্ছে না-আমেরিকার সেরা হাসপাতালের সেরা চিকিৎসকের হাতেও তার সন্তানের জীবন যেতে পারে! আয়েশা নিজেও একজন ডাক্তার। আসফান্দের আঘাতের ধরন ও তার গুরুতরতা সম্পর্কে সেও অবগত। এমনকি যে হাসপাতালে সে নিজে কাজ করে, সেখানে এর চেয়ে আরও জটিল ও ভয়াবহ অপারেশনের পরও রোগীদের সুস্থ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছে। তবে তার সন্তান কেন সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারল না? এই প্রশ্নের উত্তর আয়েশা খুঁজে পেয়েছিল, আর সেই উত্তর যেন একটি দীর্ঘ সময় অবধি তাকে ভূত হয়ে আঁকড়ে রেখেছিল। আয়েশা এই প্রথম শোককে

শরীরী রূপে দেখতে পেল। ওই মানুষটির রূপে যে মানুষটি তার দুনিয়ার একমাত্র সম্বল আসফান্দকে হারানোর সংবাদ নিয়ে এসেছে। এটি সেই মানুষ, মরিচীকা হয়ে যে আজ তাকে এই আজাবে নিমজ্জিত করেছে।

একজন ডাক্তার হিসেবে জিবরিল তাকে বলতে এসেছে, তার অপারেশন কেন ব্যর্থ হলো। আসফান্দের অবস্থা কেন খারাপ হলো, কেন তাকে সামলানো গেল না। এই সমস্ত ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে করতে, জিবরিল সিকান্দারের চোখে ডাক্তার ভিজেলের হাতের নড়াচড়া ভেসে উঠতে লাগল। বারবার মাথা ঝাঁকানো সত্ত্বেও তা গেল না। আয়েশা মূর্তির মতো নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে তার কথা শুনতে থাকল। যেন সে তার সন্তানের মৃত্যুর বর্ণনা শুনছে না, শুনছে অন্য কারও সন্তানের বর্ণনা।।

: 'আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে? এতো দীর্ঘ কথার পরও আয়েশাকে নিশ্চুপ দেখে জিবরিল তাকে প্রশ্নটি না করে থাকতে পারল না। আয়েশাকে তার এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে

না। তার মনে হলো, এ ব্যাপারে আয়েশার পরিবারের অন্য কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তার কথার জবাবে আয়েশা আবেদিন 'না' বলে মাথা নাড়াল। জিবরিল ভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পারল না, তাকে সে পরবর্তী প্রশ্নটি কীভাবে করবে? পরিবারের কেউ এখানে না থাকলে, কোথায় তারা? তিনি কি তাকে সিঙ্গেল প্যারেন্ট হয়ে লালনপালন করছেন? স্বামী না থাকলেও, পরিবারের অন্য কোনো সদস্যও তো থাকার কথা। তার মা-বাবা, ভাই-বোন; যে-কেউ। জিবরিল এর বেশি ভাবতে পারল না। আয়েশা হুট করে তাকে বলল, 'আপনি যান, এসব আমি সামলে নেব।' তার কণ্ঠস্বর যেন কোনো গভীর কূপ থেকে ভেসে আসছে। আয়েশা জানে এই 'এসব'-এর অর্থ কী। জিবরিলও বুঝতে পারছে, সে মূলত কী উদ্দেশ্য করেছে।

একজন কান্নারত, আর্তনাদ মগ্ন মাকে সান্ত্বনা দেওয়া সহজ, কিন্তু বাহ্যত স্বাভাবিক মনে হওয়া নীরব-নিঃশব্দ এক মাকে



কীভাবে সান্ত্বনা দিবে, তা তার বুঝে আসছে না। জিবরিল কেবল কয়েক মিনিটের জন্য এই শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আর এখন এই সাক্ষাৎ শেষ করা যেন তার কাছে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন অতিক্রম করতেই পারছে না। জীবনে আজ প্রথম সে কোনো রোগীকে মরতে দেখেনি, কিন্তু কোনো শিশুকে এই প্রথম মরতে দেখল। আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে দেখা করে তার মনঃকষ্ট আরও কিছুটা বেড়ে গেল। এই অপারেশন সে পরিচালনা করেনি। আর না সে আসফান্দের মৃত্যুর জন্য দায়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অনুভূতি তার মন থেকে কিছুতেই দূর হচ্ছে না যে, এখানে ডাক্তার ভিজেলের কিছু ভুল হয়েছে। অপারেশন শেষ করেই ডাক্তার ভিজেলের সঙ্গে তার কথা হতে পারেনি। তিনি অদ্ভুত অস্থিরতা ও চিন্তিত মনে ওখান থেকে চলে গিয়েছেন। সবাই বুঝতে পারছিল, তিনি তার সর্বশেষ অপারেশনের ব্যর্থতায় চিন্তিত। কেবল জিবরিলই বুঝতে পেরেছে যে, তিনি তার ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু বিবেকের দংশন ও মানবিক সহানুভূতির ফলে, জিবরিল এদিকে এই পরিস্থিতিতে আটকে পড়েছে। তার চেয়ে বড়

টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, তার ও আয়েশা আবেদিনের পুরোনো পরিচয় উদ্ভাসিত হওয়ায়।

: 'এখানে আপনার কোনো বন্ধু আছে?' জিবরিল এখন তার পাশে এসে বসে পড়েছে। সে এখনো বুঝতে পারছে না, আয়েশা আবেদিন তাকে চিনতে পেরেছে কি না। এই মুহূর্তে তার কাছে নিজের পরিচয় দেওয়া উচিত কি না।

'না।' আয়েশা মাথা নিচু করে, তার দিকে না তাকিয়েই বলল। আয়েশা তার উভয় হাত কোলে রেখে, তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। জিবরিল বসে আছে তার পাশের চেয়ারে।

- "আমার মনে হয়, আমরা একে অপরকে চিনি।" চেয়ারের হাতলে হাত রাখতে রাখতে জিবরিল তাকে বলল। সে তাকে কাঁদাতে চাচ্ছে না। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিবরিলের মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে তার হাউমাউ করে কান্না করা উচিত। এমন নীরব-নিস্তব্ধ থাকা, অস্বাভাবিকতার লক্ষণ।

: 'আমি জিবরিল সিকান্দার। নিসার সহপাঠী ও বন্ধু। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, আসফান্দকে আমরা বাঁচাতে পারিনি।' জিবরিল তার হাতে সান্ত্বনার চাপড় দিয়ে শান্তভাবে বলে চলল। আয়েশা ঘাড় ফিরিয়েও তাকে দেখল না। এই মুহূর্তে সে কাউকে চিনতে চাচ্ছে না। বিশেষ করে পাশে বসা মানুষটিকে। 'আমাকে বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?' জিবরিল তার হাতে শীতলতা অনুভব করল। এমন যেন সে এক বরফখণ্ড হাতে নিয়েছে। রুমের এসির শীতলতাও আয়েশা আবেদিনের অস্তিত্বের শীতলতাকে দূর করতে অক্ষম হচ্ছে।

: 'প্লিজ আমাকে একা থাকতে দিন। আমার জন্য আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আপনি ডাক্তার, অন্য কারও হয়তো আপনার প্রয়োজন হচ্ছে।' আয়েশা থেমে থেমে থেকে বলল। সে এখন তার হাত দুটো হাঁটুর ভাঁজে চেপে নিয়েছে। যেন তার হাত কাউকে ধরতে দিতে চাচ্ছে না। কারও সান্ত্বনা শুনতে চাচ্ছে না। চেয়ারের কোলে বসে জুতায় ভর করে সে সামনে-পেছনে

দুলছে। যেন কোনো গভীর চিন্তায়, মানসিক বিক্ষিপ্ততায় দোল
খাচ্ছে।

এই প্রথম জিবরিল আয়েশাকে গভীরভাবে লক্ষ করল। প্রচণ্ড
বিস্ময়ে, কালো জিন্স ও কালো জ্যাকেট পরে, গলায় এক গ্রে
কালার মাফলার পেঁচিয়ে বসে থাকা, তার সমবয়সি মেয়েটিকে
এখন আর সমবয়সি মনে হচ্ছে না। কাঁধ বেয়ে নিচ পর্যন্ত ঝুলন্ত
ঝলমলে কালো চুলের মাঝে সাদা সাদা কিছু চুলও ফুটে আছে।
গায়ের রং হলদেটে আর চোখ লাল হয়ে আছে। যেন কান্নায়
অভ্যস্ত মানবী কিংবা অনিদ্রায় ভুগছে, এমন কেউ। তার মাথায়
এখন সেই হিজাবটিও নেই, বহু বছর পূর্বে যা তাকে
আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দিত।

ডাক্তার নওরীন এলাহির পরিবাবে সে-ই একমাত্র হিজাব
পরিহিতা মেয়ে। তাদের মধ্যে অসাধারণ পারিবারিক মূল্যবোধ
থাকলেও, জিবরিল জানে, ধর্মের প্রতি তাদের তেমন কোনো
ঝোঁক নেই। কেবল আয়েশা আবেদিনই এমন ছিল। যে তার

চলাফেরা আর পোশাকেও ধর্মের পরিচয় বহন করত। এর কারণ হয়তো পাকিস্তানে তার বসবাস। এটি জিবরিলের অনুমান। কেননা, আয়েশার সঙ্গে তার এত দীর্ঘ কোনো সাক্ষাৎ হয়নি যে, তার ব্যক্তিত্বের সঠিক ধারণা করতে পারে।

জিবরিল যখন তার সঙ্গে দেখা করেছিল, তখন সে ছিল কিশোরী। সেই বয়সে কথায় কথায় হাসি ও লাজুক ভঙ্গির ফলে তার কাছে তাকে ইনায়া ও রাইসার মতোই মনে হয়েছিল। তার প্রতি এর চেয়ে বেশি খেয়াল আর করেনি জিবরিল। যদিও যে তার ফেসবুকে অ্যাড ছিল। মাঝে মাঝে তার ছবিতে লাইক-কমেন্টও করত। তারপর হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায়।

জিবরিল পরে নিসার কাছে জানতে পারে, মেডিসিনে পড়াশোনার সময়ই তার বিয়ে হয়ে গেছে। জিবরিল তাকে মুবারকবাদ জানাতে গিয়ে দেখতে পায়, যে আর তার সঙ্গে অ্যাড নেই। আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ছিল এতটুকুই।



নিসা ও সে কিছুদিন পরেই দুই ভিন্ন প্রদেশের হাসপাতালে চলে যায়। ফলে তাদের বন্ধুত্ব ও সহপাঠীর সম্পর্কেও দূরত্ব ছেয়ে যায়। কার সাথে যেন নিসার বাগদান হয়ে যায়। এদিকে জিবরিল তখন নিজের কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত। তার এই দ্রুততর ধাবমান জীবনে আয়েশা আবেদিন যেন স্পিড ব্রেকার হয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

জিবরিল তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে, চুপচাপ ফোন বের করে নিসার নম্বর খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই সে তা পেয়ে গেল।

: 'আমি কি কল করে নিসাকে আসতে বলব?' আয়েশাকে সে বলল।

না।

জিবরিল তার মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে রইল। সে কি আগে থেকেই এমন অদ্ভুত, নাকি এখন হয়ে পড়েছে? জিবরিল কিছুই বুঝতে পারছে না। নাকি এই আঘাত তাকে এমন করে দিয়েছে?

জিবরিল সবসময় মানুষের কষ্টে আবেগী হয়ে পড়ে। সহমর্মিতা তার হৃদয় ভরা। তা সত্ত্বেও সে একজন ব্যস্ত ডাক্তার। প্রতিটি মিনিট হিসাব করে চলতে হয়। সে ভাবতে লাগল, আয়েশাকে সাহায্য করতে হাসপাতালের অন্য কাউকে পাঠানো উচিত। জিবরিল উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় সে আয়েশার গলা শুনতে পেল, 'আপনি কি জানেন আমার সঙ্গে এসব কেন হলো?' জিবরিলের চলন থেমে গেল। স্থবির হয়ে সে তাকে দেখতে লাগল। কিন্তু আয়েশা অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে। কারণ আমি আল্লাহর নাফরমান বান্দি। আল্লাহ আমাকে শান্তি দিয়েছেন। আহসান সাদ ঠিকই বলত। 'জিবরিল তার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে রইল। আয়েশা আবেদিন যেন তার মনের যন্ত্রণাদায়ক বোঝাটি ছুড়ে

ফেলতে চেষ্টা করছে। আহসান সাদ কে? জিবরিল তা জানে না। আয়েশা তার সম্পর্কে এখন যত যা-ই বলবে, জিবরিল তাও বুঝতে সক্ষম হবে না। কিন্তু আয়েশার এই বাক্য দুটি যেন তার পায়ের শেকল হয়ে গেল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হিশাম চায়ের কাপ শেষ করল। মেয়েটি তার থেকে একটু দূরে ইশারায় কিছু মহিলা ও শিশুদেরকে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বোঝাচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যাগ থেকে পরিচ্ছন্নতার জিনিসাদি বের করে করে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, টুথলিক, নেইল কাটার, তুলার গাদা, শ্যাম্পু, ফাস্ট এইড কিট এবং তাতে থাকা অন্যান্য সামগ্রী। এ সবই সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস। এগুলোর ব্যবহার কোনো উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের কাউকে, হাতে-কলমে শেখানোর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এটি দাদাব। কেনিয়া সীমান্তে UNHCR-আফ্রিকার বড় শরণার্থী শিবিরের একটি।

এখানে আফ্রিকার খরা ও গৃহযুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিপুলসংখ্যক মানুষ বসবাস করছে।

এক সপ্তাহ হলো তারা দুজন এখানে এসেছে। দাদাবে তাদের এই প্রথম আসা। তবে তারা গত চার বছরে UNHCR-এর বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়েছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায়। এটি তাদের প্রমোদভ্রমণ, পাগলামি ও কাজ; সবকিছুই।

কাঠের একটি খালি পেটি উলটো করে, তাতে বসে, আরেকটি পেটিকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে তার ওপর চায়ের মগ রেখে হিশাম চায়ে বিস্কুট ভিজাল। চায়ে ভেজা বিস্কুট খেতে খেতে প্রচণ্ড ক্লান্ত দেহেও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল সে। সকাল থেকে তারা নতুন আগত শরণার্থীদের জন্য আরও একটি ক্যাম্প তৈরি করেছে। এখানে এটি তাদের পাঁচশতম ক্যাম্প। গ্রুপ গ্রুপ করে ভাগ হয়ে তারা এসব করছে।

এখন দুজন দুজন করে টিম বানিয়ে, নতুন বানানো তাঁবুগুলোতে গিয়ে শরণার্থীদের নামের তালিকা করছে। সেই সঙ্গে তাদেরকে পরিচ্ছন্নতার জিনিসপত্র বিতরণ করছে। এসব করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হিশাম তার কাজ শেষ করে ফেলেছে। গরম পানির ক্লান্ত ও পিঠের ব্যাগ থেকে ফয়ের সরঞ্জাম বের করে সঙ্গীদের আগমনের অপেক্ষা করছে। মেয়েটি এখনো ওখানেই তার কাজে মগ্ন হয়ে আছে। হিশাম পুনরায় তার কাপে চা ঢালল।

মেয়েটির সঙ্গে সে পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছে। মানুষ যেমনই হোক, ভাষা যা ই হোক, তার সঙ্গী মেয়েটিকে সে কখনো ব্যর্থ হতে দেখেনি। যে সাইন ল্যান্ডুয়েজ বা ইশারার ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী। তা সত্ত্বেও হিশাম জানে, মেয়েটি ইশারা ব্যতীতই কোনো বোল্ড মানুষের মনের অবস্থা বের করে ফেলতে পারে। এক অদ্ভুত উষ্ণতা রয়েছে তার মধ্যে, যা যে-কারও হৃদয় মোমের মতো গলিয়ে ফেলে। আর মেয়েটি এখন তা-ই করছে।

এই সব নোংরা, দুর্বল, অসুস্থ, খরায় আক্রান্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষের মাঝে বসে সে পেশাদার দক্ষতায় তার কাজ করছে। ইশারার ভাষা ও ভাঙাচোরা স্থানীয় ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলছে। শিশুদের সঙ্গে হালকা হাসি মজা ও মহিলাদের সঙ্গে মন খুলে গল্প করছে, গলায় জড়াচ্ছে। শেষের দিকে এসে তার ব্যাগের জিনিসপত্র শেষ হয়ে গেল। খালি ব্যাগটি পাঁচ বছরের এক বাচ্চা নেওয়ার জন্য বারবার হাত বাড়াতে লাগল, সে সেটি তার মাথায় তুলে দিল। হিশাম দেখল একটি বাচ্চা তার পেছনদিক থেকে গিয়ে, তার মাথার হেয়ার পিন খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটি পেছন ফিরে ওই বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিল। তারপর তার মাথার হেয়ার পিনটি খুলে বাচ্চাটির কুঁচকানো চুলে লাগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এখন সে হিশামের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। হিশাম প্রায় চায়ের দ্বিতীয় মগও শেষ করে ফেলছে। এখান থেকে তাদেরকে এখন আরও অনেক দূরে যেতে হবে। যেখানে

UNHCR-এর সমস্ত কর্মীরা অবস্থান করছে। অবশেষে হিশাম তাকে আসতে দেখল। সে দূর থেকে মুচকি হাসল। হিশামও তার হাসির জবাব হাসিতেই দিল।

'সব কাজই তুমি দ্রুত করে ফেলো।' মেয়েটি তার কাছে এসে কাঠের উলটে রাখা এক পেটিতে বসতে বসতে যেন তার প্রশংসা করল। হিশাম সত্যিই তার অর্পিত দায়িত্ব খুব দ্রুতই সেরে ফেলো।

: 'বুদ্ধিমান আমি, তাই।' উত্তর দিতে দিতে হিশাম তার জন্য বানানো নতুন চায়ের মগ বাড়িয়ে দিল।

: 'আমার চেয়েও বেশি।' মেয়েটি চায়ের মগ হাতে নিতে নিতে বিজয়ের ভঙ্গিতে বলল।

'তোমার চেয়ে তো সত্যিই বেশি।' হিশাম কৃত্রিম গান্ধীর্ষ মিশিয়ে উত্তর করল।

সন্ধ্যা এখন ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে। শরণার্থী শিবিরের ভিড় এখন ক্রমে ক্রমে তাদের তাঁবুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা জানে, আজ যা পাওয়ার তা তারা পেয়ে গিয়েছে। এখানে বসে থেকে আর লাভ নেই।

এদিকে এক সরু রাস্তার ধারে কাঠের পেটিতে বসে, পা সোজা করে তারা দুজন তাদের ক্লান্তি দূর করছে।

: 'তোমার জন্য একটা জিনিস আছে।' হিশাম চায়ের শেষ ঢোক পান করে, পকেট থেকে কিছু একটা বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি তার সামনে বাড়িয়ে দেওয়া আংটিটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একটি অসম্ভব সুন্দর সবুজে মোড়ানো বক্সে, চোখ ধাঁধানো এক হীরের আংটি। মেয়েটি চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। সে যেন ক্ষণিকের জন্য চা পান করতে ভুলে গেল।

: 'এটা কোথায় পেয়েছ?' দাদাবের এই বিরান ভূমিতে এই আংটিটি দেখে যে প্রশ্ন যে-কারও মনে আসা উচিত, সেটি তার মনেও এলো।

: 'কোথায় পেয়েছি, মানে কী?' হিশাম প্রচণ্ড চমকাল। 'আমি কিনেছি।' শব্দ দুটিতে জোর দিয়ে বলল সে।

: 'কোথেকে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: 'নাইরোবি থেকে।' হিশাম উত্তর করল।

: 'এখন আমাকে কেন দিচ্ছ?' সে পুনরায় চা পান করতে করতে বলল। খানিক ভীতও হলো। ছুট করে সে বুঝতে পারছে না, এসব কী হচ্ছে।

: 'তোমাকে প্রপোজ করছি।' হিশাম আবারও সেই আংটিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল। মেয়েটি এক পলক তার দিকে

তাকাল; এক পলক সেই আংটির দিকে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পুরো এলাকাটিতে। ঘন ঝোপঝাড় আর শরণার্থী শিবিরের মাঝে বসে ডায়মন্ড রিং তুলে ধরে তাকে প্রপোজ করছে। এটি যেকোনো মেয়ের জন্য একটি রোমান্টিক মুহূর্ত। তার জন্যও হতো, হুট করে যদি তার হাসি না চলে আসত। চায়ের মগ কাঠের এক পেটিতে রাখতে রাখতে অজান্তেই অটুহাসিতে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। হিশাম প্রচণ্ড লজ্জিত হয়ে বক্স বক্স করে ফেলল।

: 'এখানে এভাবে হাসার মানে কী?' মেয়েটিকে সে জিজ্ঞেস করল। সে এখন তার হাসি খামিয়ে ফেলেছে।

: 'আমরা এখানে ত্রাণের কাজে এসেছি। এসব ভাবার সময় পেলো কখন?' মেয়েটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো করে বলল।

: 'কেন, ভাবতে পারি না?' হিশাম বিতর্কের ভঙ্গিতে বলল। 'শুরু থেকেই ভাবছি, আর আমার মন চাইল তোমাকে প্রপোজ করতে। তাই করে ফেললাম।'

মেয়েটি চায়ের মগ পুনরায় ঠোঁটে ছোঁয়াল। সে এখন গম্ভীর হয়ে গেছে। হিশাম বক্স হাতে নিয়ে চুপচাপ তার চা পানের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর সে বলল, 'তুমি কি কিছু বলবে না?'

'এ ব্যাপারে সত্যিই আমি কিছু বলতে পারব না।'

মেয়েটি অবশেষে চায়ের মগ রেখে ব্যাগ থেকে রেডিয়ো বের করতে লাগল। এটি যেন আলোচনার প্রসঙ্গ পালটানোর চেষ্টা।

: 'কেন? তুমি আমাকে পছন্দ করো না?' হিশামও পুরোপুরি গম্ভীর হয়ে গেল।

: 'করি। তোমাকে কেউই অপছন্দ করতে পারবে না। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্ত অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত। এটি আমি নিজে করতে পারব না। আমাকে প্রপোজ করার আগে তোমাকে আমার পরিবারের মত নিতে হবে।' রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি সেট করতে করতে হিশামের দিকে না তাকিয়েই বলল সে।

: 'ঠিক আছে।' হিশাম অনাকাঙ্ক্ষিত স্বস্তির শ্বাস নিল। 'আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। এটা তো তেমন কোনো বিষয় নয়।'

এই প্রথম রাইসা সিকান্দার মুখ ফুটে তাকে বলতে পারল না যে, হিশামের জাতীয়তা নিয়ে তার পরিবার আপত্তি করতে পারে। এরিক ও ইনায়ার ব্যাপারে ইমামার মতামত সম্পর্কেও সে খুব ভালোভাবে অবগত। উনি পাকিস্তানিদের সঙ্গেই তার সকল সন্তানের বিয়ে দিতে চান।

: 'এই আংটি তুমি তোমার কাছে রাখো। আমি তোমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে নেব। তারপর তুমি এটা পরো।' হিশাম পুনরায় বক্সটি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু রাইসা হাত বাড়াল না। সে তার হাঁটুতে রাখা রেডিয়ো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। কিংবা অন্তত ব্যস্ততা বোঝাতে চাইল।

: 'তাতে কোনো লাভ নেই। আমি যদি আংটি নিয়ে নিই, তারপর আমার পরিবার না করে দেয়, তাহলে?' রাইসা ধীরে আওয়াজে খবর শুনতে শুনতে বলল। হিশাম অবিশ্বাস্য চোখে তার দিকে তাকাল।

: 'তোমার পরিবার না কীভাবে করতে পারে?' হিশাম এই প্রথম খানিক অস্থির হলো।

: 'সমস্ত সম্ভাবনা সামনে রাখা উচিত আমাদের।' রাইসা শান্তভাবে যেন তাকে বোঝাল।

'তারা যদি না করে দেয়, তাহলে?' হিশাম জিজ্ঞেস করল।

: 'তাহলে আর কী।' রাইসা বলল।

: 'তার মানে শেষ, খতম?' হিশামের যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।
'এটা তুমি কীভাবে হতে দিতে পারো? আমার প্রতি তোমার
কোনো অনুভূতিই নেই?' হিশাম যেন বিষয়টি মানতেই পারছে
না।

'তোমার জন্য অনুভূতি আছে, কিন্তু তা আমার পরিবারের
অনুভূতির চেয়ে কম। অন্তত এই মুহূর্তে। তুমি কি তোমার
পরিবারের মতের বাইরে কিছু করতে পারবে?' রাইসা প্রচণ্ড
গম্ভীর হয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আমি করতে পারব। অন্তত তোমাকে বিয়ে।' উত্তরে সে
বলল। রাইসা যেন এই উত্তর প্রত্যাশা করেনি। রেডিয়ো

নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল, 'তাছাড়া এই আংটির ডায়মন্ড নকলা'

হিশাম প্রচণ্ড চমকে উঠল। রাইসা প্রসঙ্গ কোথেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। হিশাম অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বক্স খুলে আংটিটি চোখের সামনে ধরে বলল, 'তুমি কীভাবে বুঝলে?'

: 'কারণ এটি আমি ভালো করে দেখেছি। আমার মান্নির কাছে অনেক ডায়মন্ড আছে। ডায়মন্ড আমি চিনি।' রাইসা একই ভঙ্গিতে বলল।

এক উইকেন্ডে তারা নাইরোবিতে গিয়েছিল। সেখানে এক দোকানে এই আংটিটি রাইসার পছন্দ হয়। হিশাম তাকে না বলেই এটি কিনে নেয়। আর এই আংটি দিয়েই সে তাকে প্রপোজ করতে চাচ্ছে।

: 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! আমাকে তখন কেন তুমি বলোনি?
আমি তো একে ডায়মন্ড মনে করে অনেক দাম দিয়ে কিনেছি।'
হিশাম আশ্চর্যের চেয়ে বেশি লজ্জিত হলো।

: 'আমি কি জানতাম নাকি যে তুমি এটা কিনবে? আমার তো
কেবল ভালো লেগেছিল। দোকানদার বলছিল এটি ডায়মন্ড,
তাই তাকে লজ্জা দিতে চাইনি।' রাইসা তাকে বলল। হিশাম
খানিক অবাক হয়ে আংটিটি বক্সে রেখে, তা বন্ধ করে দিল।
রাইসা তার চেহারা দেখে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে
বক্সটি হাতে নিল।

: 'তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে।' হিশামকে সে যেন সান্ত্বনা
দিল।

: না, অতটাও ক্ষতি হয়নি, যতটা লজ্জা পাচ্ছি তোমাকে একটি
নকল ডায়মন্ড দিয়ে প্রপোজ করে।



রাইসা তাকে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'চিন্তা করো না। এটা আমি রেখে দিচ্ছি। আমার পরিবার যদি রাজি হয়, তাহলে আমি এই আংটিটিই পরব।

হিশাম অনাকান্ক্ষিত হেসে উঠল। যে আংটিটি ভালোবেসে দেওয়াতে নিতে চায়নি, সেটি এখন সহমর্মিতা দেখিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। সে সত্যিই একজন কল্যাণকর্মী।

: 'হাসছ কেন?' রাইসা অবাক হলো।

: খুশি। তাই।' হিশাম উত্তর করল। 'আমি পাথর আর ডায়মন্ডের তফাত করতে না পারলেও, মানুষ চিনতে পারি। আর আমি এখন একটি নকল ডায়মন্ড একজন খাঁটি মানুষকে দিচ্ছি। অন্তত এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

এত বছরের সঙ্গতায় এই প্রথম হিশাম রাইসাকে লজ্জায় লাল হতে দেখেছে। এখানে এখন নীরবতা ছেয়ে আছে। ঝিরিঝির

হাওয়া, নেমে আসা সন্ধ্যা আর রেডিয়োতে চলমান নিউজ
বুলেটিনে বাহরাইনের এক বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ গুঞ্জনিত
হচ্ছে।

০৮

গাড়িটি পোর্চে এসে থামল। ভেতর থেকে ইমামা দ্রুত বেরিয়ে
এলো। ততক্ষণে গাড়িটি স্থির হয়ে পড়েছে, সামনের সিট
থেকে নেমে আসছে এরিক। প্রথম দেখায় ইমামা তাকে চিনতে
পারল না। সে সত্যিই বদলে গেছে। লম্বা তো সে আগে

থেকেই। কিন্তু স্বাস্থ্য আগের মতো এখন আর হালকা-পাতলা নেই।

তার হাতে গোলাপের দুটি কুড়ি আর কয়েকটি সবুজ ডালপালায় মোড়ানো ছোট একটি বুকে। ইমামার মনে আছে, শৈশবেও এরিক যখন কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, তখনো তার জন্য এমন গোলাপ-কুড়ি ও ডালপালায় মোড়ানো বুকে নিয়ে আসত। এরিক তাকে সালাম করে গলা মেলাতে আপনা আপনিই সামনে এগিয়ে এলো। তারপর লজ্জা পেয়ে নিজেই থমকে গেল। হয়তো তার কিছু মনে পড়ে গেছে। ইমামা সামনে এগিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মতো করে গলায় জড়াল।

: 'আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি। বড় হয়ে গেছ তুমি। অনেক বদলেও গেছ।' ইমামা এরিককে বলল। এরিক মুচকি হাসল।

: কিন্তু আপনি একদম বদলাননি। যেমনটা তেমনই আছেন।



ইমামা হাসতে লাগল।

'শুনে অনেক ভালো লাগল যে, একটুও বদলাইনি। যদিও সরকিছু বদলে গিয়েছে। আমিও বুড়ি হয়ে গেছি।' ইমামা হেসে চলল।

'বুড়ি হওয়ার সংজ্ঞাই হয়তো বদলে গেছে।' এরিক জোড়ালোভাবে বলল। ইমামা আবারও হাসতে লাগল। 'এটা আপনার জন্য।' ফুলের তোড়াটি সে তার হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল।

। 'তোমার অভ্যাস বদলেনি। কিন্তু বোল বদলে গিয়েছে।' ফুলের তোড়া হারে নিতে নিতে ইমামা বলল।

। 'কারণ দেশ বদলে গিয়েছে।' এবারও সে জোরালোভাবে বলল।



: হ্যাঁ, এও ঠিক বলেছ তুমি। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?" ইমামার হঠাৎ খেয়াল হলো। এরিক গাড়ি থেকে কেবল ফুলের তোড়া আর ছোট একটি ব্যাগ নিয়ে বেবিয়েছে।

'হোটেলে। আমি সেখানেই থাকব। ব্যস, আপনার সঙ্গে জরুরি দেখা করতে এসেছি।' এরিক তার সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে বলল।

: "আগে তুমি সবসময় আমাদের কাছে আসতে। এখানেই থাকতে। এখন কি অন্য কারও কাছে এসেছ?" ইমামার মনে হলো এরিক হয়তো তার পেশাগত কোনো কাজে এসেছে।

: 'না, অন্য কারও কাছে তো আসিনি। এই তো আমার মনে চাইল, এবার কোনো হোটেলে থেকে দেখি।' এরিক কথা এড়িয়ে গেল।

এখন লাঞ্ছের সময়। সকালে ফোন করে এরিক এখানে আসার কথা বলেছিল।

ইমামা তাই তার জন্য লাঞ্ছ বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। এরিকের পছন্দের খাবার বানিয়েছে। গল্প করতে করতে এরিক প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে খাবারও খেলো।

খেতে খেতে ইমামার সঙ্গে সবার ব্যাপারেই কথা বলল। কেবল ইনায়া ছাড়া। এরিক তার নাম পর্যন্ত নিল না। বিষয়টি ইমামা লক্ষ করল। বিষয়টি উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। তবে ইমামার কাছে কেন জানি অস্বাভাবিক মনে হলো। ইমামার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে যে সংকেত দিচ্ছিল, অবশেষে তা সত্য প্রমাণিত হলো।

খাওয়া শেষে চায়ের শেষ ঢোক পান করে এরিক তার ব্যাগ থেকে একটি খাম বের করে ইমামার সামনে রাখল। ইমামা এখনো চা পান করছে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সে প্রচণ্ড থমকাল।

‘এটা কী?’

‘আপনি দেখে নিম।’ ইমামাকে সে বলল। খামটি খুলে দেখার আগেই, এক মুহূর্তেই ইমামার মুখের হাসি নিলিয়ে গেল। এই মুহূর্তটি থেকে সে বাঁচতে চাচ্ছিল, কিন্তু ঘুরেফিরে তা-ই তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার আশঙ্কার বিষয়টি এই খামের ভেতর চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি ইনায়ার জন্য তার পক্ষ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনামা। তাতে ইনায়াকে সুখে রাখার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এর জন্য সে যেকোনো শর্ত মানতেও রাজি।

ইমামার দৃষ্টি কিছুক্ষণ সেই কাগজে আটকে রইল। তারপর কাগজটি ইমামা খামে পুরে টেবিলে রেখে দিল। এরিকের চোখাচোখি হওয়া, তার সঙ্গে কথা বলা যেন কঠিন হয়ে পড়ল। এরিক দেখল, ইমামা গম্ভীর হয়ে আছে। তাই সে নিজেই কথা শুরু করল।

'অনেক বছর আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন, লেখাপড়া করে কিছু হওয়ার পর যেন এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলি। আর ততদিন আমি যেন ইনায়ার সঙ্গেও এ বিষয়ে কোনো আলোচনা না করি। দেখুন, আমি আপনার উভয় শর্তই পূরণ করেছি।' এরিক বলল। তার কথা দুটি ইমামার জবাব আরও খানিকটা জটিল করে দিল। 'আমি জানি মিসেস সালার। আপনার জন্য আমি জটিল নির্বাচন। কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার কাছে আমি কোনো খারাপ নির্বাচন সাব্যস্ত হব না। নিশ্চিত্তে আমাকে বেছে নিতে পারেন।' এরিক যেন ইমামার অবস্থা টের পেয়ে নিজেই তাকে আশ্বস্ত করতে লাগল। ইমামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এরিক ভালো ছেলো। খারাপ হলে, তাকে ভালো-মন্দ বলতে পারত। ইমামা মনে মনে ভাবল।

এরিক তার দিক থেকে অস্বীকারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে। মুসলিমও হয়ে গিয়েছে। ভালো একটি পেশাতেও



রয়েছে। বংশগতভাবেও ভালো। ইমামা বুঝতে পারছে না, এরপরও তাকে কীভাবে, কী বলে না করবো। এটা বলবে যে, তার মনে ভয় ও আশঙ্কা কাজ করে? সে ননমুসলিম তাই? নাকি এটা বলবে যে, সে কেবল পাকিস্তানি ছেলের সঙ্গেই ইনায়ার বিয়ে দিবে? যে ছেলে তাদের প্রথা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত। তার মাথায় এখন যে বাহানাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, তার একটিও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। তা সত্ত্বেও কোনো উত্তর তো তাকে দিতে হবে।

‘তুমি অনেক ভালো এরিক।’ ইমামা তার গলা সাফ করে বলতে লাগল।

: ‘আবদুল্লাহ।’ এরিক যেন তার নতুন নাম মনে করিয়ে ইমামাকে সংশোধন করে দিল। ইমানা এক মুহূর্ত থামল। তারপর যেন বহু কষ্টে তাকে বলল, ‘আবদুল্লাহ, তুমি অনেক ভালো একটি ছেলে। আমি তোমাকে পছন্দ করি। কিন্তু ইনায়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এখনো কঠিন। আমি জানি না, তোমার

প্রস্তাবের ব্যাপারে ইনায়া কী ভাববে। তার পছন্দ-অপছন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" কথাগুলো বলতে বলতে ইমামা নিজেও বুঝতে পারছে, সে প্রচণ্ড অনর্থক কথা বলছে। বিষয়টি যদি ইনায়ার পছন্দ-অপছন্দের হয়ে থাকে, তাহলে সম্বন্ধ পাকা। ইনায়ার পছন্দ এরিকের কাছে খুব স্পষ্ট।

'ইনায়ার সঙ্গে আমি আগেই কথা বলিনি, কারণ আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, এ বিষয়ে যখনই আমি কথা বলব, আপনার সঙ্গেই বলব।' এরিক ইমামার কথা থামিয়ে তাকে যেন মনে করিয়ে দিল।

: 'আমি সালারের সঙ্গে কথা বলব। তুমি দুই সপ্তাহ আগে এলেই তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত। এখানেই ছিল সে কিছুদিন।' উত্তরে ইমামা বলল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ করে দেওয়ার চেয়ে এটাই উত্তম।

: 'তিনি যেখানেই থাকুক, আমি উনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারব। আমি জানি তিনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু তবু' এরিক তাকে বলল। 'আমার প্রস্তাবে আপনার তো কোনো আপত্তি নেই, না?' এরিক একেবারে প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তার চেহারা উদ্ভাসিত আনন্দ ও স্বস্তি ইমামাকে যেন অপরাধবোধে ডুবিয়ে দিল।

: 'আমি তোমাকে বলেছি আবদুল্লাহ, তুমি অনেক ভালো। কিন্তু আমার ইচ্ছে, ইনাযার বিয়ে যার সঙ্গেই হোক, সে যেন কেবল নামমাত্র মুসলিম না হয়। নেক হবে, দীনদার হবে, জ্ঞান-বুদ্ধির পাশাপাশি দীনি শিক্ষার ওপর আমলও করবে।' ইমামা গম্ভীর হয়ে তাকে বলতে শুরু করল। এরিক প্রচণ্ড মনোযোগী হয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

'পুরুষের দীনি ইলম না থাকলে নারীর জন্য তা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এটি একটি পুরো প্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপার। আমরা উদারপন্থি মুসলিম, তবে বেদীন আর বেআমল নই। আর না এমনটা হতে চাই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এমন হোক,।

তাও চাই না। আমি জানি না তুমি কতটা আমলদার এবং ইসলাম সম্পর্কে তোমার ধারণাগুলো কতটা পরিষ্কার। কিন্তু ইনায়া অনেক ধার্মিক। আমি চাই না এমন জায়গায় ইনায়ার বিয়ে হোক, যেখানে ধর্মীয় আকিদা ও আমল নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে।" ইমামা বলে চলল।

'তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমিও একজন নওমুসলিম। নিজের ধর্ম ছেড়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করেছি আমি। পরিবার, ঘর-বাড়ি সবকিছু ছেড়েছি। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এই যাত্রা সহজ ছিল না।' ইমামার গলা ধরে এলো। খানিক থামল। চোখ মুছতে মুছতে হেসে ফেলল। যেন হাসিতে অশ্রু ঢাকতে চাচ্ছে। 'এই যাত্রা সহজ ছিল না।' সে পুনরায় বলতে শুরু করল। 'কিন্তু সালার আমার জন্য তা অনেক সহজ করে দিয়েছে। সে আমলদার মুসলমান। আর আমি আমার মেয়েদের জন্যও তার বাবার মতো আমলদার মুসলমানই চাই। জীবনে এত কষ্ট সয়ে, এত দীর্ঘ চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর আমি আমার প্রজন্মকে পুনরায় বেদীন ও বেআমল দেখতে চাই না। তুমি

হয়তো মুসলমান, কিন্তু দীনি ইলমের প্রতি তোমার আগ্রহ
হয়তো নেই। কারণ, তোমার ইসলাম কবুলের কারণ হলো,
এক মেয়েকে বিয়ে করা। এখন বিয়ে হয়ে গেলেই, দীনের প্রতি
তোমার আগ্রহও শেষ হয়ে যাবে। কিছুদিন পর হয়তো তুমি
এটাও ভুলে যাবে, তুমি একজন মুসলিম। হালাল ও হারামের
মাঝে যে দেওয়াল আমরা তুলে রেখেছি, তা হয়তো তুমি তুলে
রাখতে পারবে না। বেদীনের মতো তাতে সংমিশ্রণ ঘটাবে।
ভালোবাসা খুব দীর্ঘস্থায়ী কিছু নয়। দুজন মানুষের মধ্যে যদি
অভ্যাস, বিশ্বাস ও চিন্তা ধারার পার্থক্য থাকে, তাহলে তা খুব
বেশি চলতে পারে না।

এরিক তার কথা বলার মাঝে, তাকে একবারও থামাল না।
চুপচাপ সে তার কথা শুনতে থাকল।

'তুমি কোনো ওয়েস্টার্ন মেয়েকে বিয়ে করে নাও। তাহলে
তোমার জীবন খুব ভালো কাটবে।' ইমামা এখন যেন তাকে
পরামর্শ দিয়ে পথ দেখানোর চেষ্টা করছে। এরিক মুচকি হাসল।



'ওখানকার কোনো ভালো মুসলিম মেয়েকেই না হয় বিয়ে করলো'

: 'সে যে-ই হোক, আপনার মেয়ে তো হবে না মিসেস সালার!'
এত দীর্ঘ আলোচনায় এরিক এই প্রথম কথা বলল। ইমামা নিশ্চুপ হয়ে গেল। 'অনেক ভালো করেছেন আপনি আমাকে এসব বলে। যেসব আশঙ্কা আপনার রয়েছে, সেগুলো এখন আমি বুঝতে পারছি এবং তার বিস্তারিত বর্ণনাও দিতে পারব। নয় বছর হলো আমি আবদুল্লাহ হয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয়, বহু আগে থেকেই আমি মুসলিম। যখন থেকে আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছি, তখন থেকেই।' এরিক অনেক ভেবেচিন্তে থেমে থেমে বলে চলছে। 'আমি খুব বেশি আমলি ও চরিত্রবান মুসলমান নই। আপনার মেয়েদের মতো তো একদমই নই। কিন্তু আমার চারপাশের অনেক মুসলমানের চেয়ে উত্তম। নয় বছরে দীনের ব্যাপারে আমি কেবল হালাল-হারামই চিনি; আরও অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করেছি। আমি জানি আপনি খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করতেন না। রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবি মানতেন না। অতঃপর আপনি তাওবা করে মুসলমান হয়েছেন। আমাকে এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে, এ আমাকে কে বলেছে। কিন্তু আমি এটি জানি। আর তাই আপনার কাছে আশা রাখি, আপনি সবার চেয়ে বেশি সহমর্মিতা দেখাবেন আমার প্রতি। আপনার মতোই আমিও আমার পরবর্তী প্রজন্মকে ভালো মানুষ ও ভালো মুসলিম হিসেবে দেখতে চাই। আপনার মেয়ে একজন মুসলিম বলেই তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি না। একজন দীনদার নারীকে পাওয়ার জন্য তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। কারণ, একজন ভালো দীনদার নারীই একটি ভালো পরিবারের ভিত্তি। দীনই আমাকে এটা বলেছে।

ইমামা তার কথা শুনছে। তার অস্বীকারকে আবদুল্লাহ জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। সে যা বলছে, কোনো ঘোরপ্যাঁচ ছাড়াই সব বলছে।

'ইনাযাকে আমার অনেক ভালো লাগে। ভালোবাসি তাকে। কিন্তু ভালোবাসি বলেই তাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিইনি। আর না বিয়ের জন্যই ইসলাম কবুল করেছি।। আমার জীবনে আপনি ও আপনার পরিবারের অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। আমি আগে আপনাদের মানবতা ও দয়ার প্রতি প্রভাবিত হয়েছি। তারপর প্রভাবিত হয়েছি আপনাদের দীনের প্রতি। জীবনের একটি জটিল পর্যায়ে আপনাদের সদব্যবহারের কথা আমার মনে আছে। প্রতিটি জিনিস অবিকল সুরণে আছে। আপনি বললে তা পুনরাবৃত্তিও করতে পারি। আপনাদেরকে দেখে ভেবেছি, যে ধর্ম এমন সুন্দর মানুষ তৈরি করতে পারে, সেই ধর্মের বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ হতে হবে। তখন আমি খুব ছোট। আপনাদের ব্যাপারে যা অনুভব করতাম, তা তখন আপনাদের বলতে পারতাম না। এত বছর পর যখন সুযোগ পেয়েছি, তাহলে বলেই ফেলি।' এরিক থামলা মাথা ঝুঁকিয়ে দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ রইল।

'আপনারা আমার জীবনে না এলে, আমি খুব খারাপ একজন মানুষ হতাম। পাপার মৃত্যুর পর আমি তেমনই ছিলাম, যেমন দরিয়ার মাঝে এক ছোট নৌকা, যার কোনো দিশা নেই। ডুবে গেলে ডুবে যেতাম। তখন আমি অনেক অনেক দোয়া করতাম, মিস্টার সিকান্দারের যেন কিছু না হয়, উনার চিকিৎসা যেন সফল হয়। কারণ, আমি চাইতাম না, আপনাদের পরিবারে সেই কষ্ট আসুক, যে কষ্টে আমি ও আমার পরিবার কাটাচ্ছিলাম।' এরিক চুপ হয়ে গেল। ইমামাও বলতে পারল না। অশ্রু দুজনের চোখেই; এবং যন্ত্রণাও। আর দুজনেই এ দুটো জিনিস লুকাতে চেষ্টা করছে। 'আমি পাকিস্তানে কেবল আপনার সঙ্গে কথা বলতে এবং এটা বলতে এসেছি যে, আপনি আপনার মেয়েকে উত্তম তরবিয়ত দিয়েছেন। সে অনেক সম্মানিতা ও লজ্জাশীল। এত বছর তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা সত্ত্বেও আমি তার সম্মান ও লজ্জাশীলতার মান রেখেছি; যে মান সে ধরে রেখেছে। এবং কখনো ভাঙেনি। আমি আপনার মেয়েকে ততটাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার জীবন ও ঘরের অংশ করতে চাই।'

আবদুল্লাহ তার ব্যাগ থেকে ছোট একটি বক্স বের করে সেই খামের উপর রাখল। সেই সুন্দর খামের উপর একটি মনোরম সুন্দর লাল বক্সে ইনায়া সিকান্দারের ভাগ্য রাখা আছে। যা এই বক্সের মতোই এতটাই সুন্দর। ভেজা চোখে ইমামা সেই বক্স থেকে চোখ সরাতে পারল না। তার ইচ্ছেয় কখনো কিছু হয় না, কিন্তু যাই হয়, তা খুব ভালোই হয়।

৯

: 'রংটা অনেক সুন্দর, কিন্তু নকল।' ডিনার টেবিলে বসে ফিশ অ্যান্ড চিপস খেতে খেতে হামিন বাক্সটা রাইসার দিকে সরিয়ে দিল। রাইসা বাটি থেকে সালাদ খেতে খেতে তার কথা শুনছে।



খোলা বাক্সটা বন্ধ করতে করতে, একই হাতে তার চশমা ঠিক করে, ভীষণ ধীরস্থিরভাবে বলল, 'আমি জানি।'

হামিন ফিশ অ্যান্ড চিপস যেন গিলে গিলে খাচ্ছে আর টিভিতে রাগবি খেলার একটা ম্যাচ দেখছে। রাইসা উইকেন্ড কাটাতে এখানে এসেছে। আগামীকাল ইনায়াও এখানে আসছে। ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট থেকে আনা খাবার খাচ্ছে হামিন। সেই মুহূর্তে রাইসা তাকে এই আংটিটি দেখাল।

: 'কাউকে দিবে এটি? নাকি কেউ তোমাকে দিয়েছে?' ম্যাচ দেখতে দেখতে হামিন, চিলি সসের বোতল প্রায় শেষ করতে করতে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'হিশাম দিয়েছে।' রাইসা কোনো ভূমিকা ছাড়াই গম্ভীরভাবে বলল। হামিন এবার স্ক্রিন থেকে তার চোখ সরাল। 'সে ফিরে এলেই তাকে দিয়ে দেব।' রাইসা এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে একই শ্বাসে বলল।

: 'মানে?' হামিন এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

: 'সে আমাকে প্রপোজ করেছে। কিন্তু আমি তার প্রপোজাল গ্রহণ করিনি। আমি চাই, দুই পরিবার আগে কথা বলে নিকা' রাইসা তাকে সংক্ষিপ্তভাবে বলল।

: 'কিন্তু হিশাম তো এখন তার পরিবারের সঙ্গে বাহরাইনে হয়তো। তার পরিবার কি ওখান থেকে এসে কথা বলবে?' উত্তরে হামিন তাকে জিজ্ঞেস করল। তারা এখন হিশাম ও তার পরিবারের প্রসঙ্গে কথা বলছে।

তিন দিন আগে বাহরাইনে বিমান দুর্ঘটনায় সেখানকার শাসক ও রাজপরিবারের ছয়জন সদস্য নিহত হয়েছে। বাহরাইনের শাসক ছিল হিশামের চাচা। দুর্ঘটনার সংবাদ শুনেই হিশাম বাহরাইনে চলে গিয়েছে। রাইসাও তখন তার সঙ্গে শরণার্থী শিবির থেকে আমেরিকায় ফিরেছিল।

: 'হিশাম তো চলে আসবে আগামী সপ্তাহে। কিন্তু তার পরিবার কিছুদিন থাকবে ওখানে।' রাইসা তাকে বলল।

: 'এখন তাহলে কী হবে?' হামিন পুনরায় চিপস খেতে খেতে বলল। :

'এজন্যই তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি বলো।' জবাবে রাইসা তাকে বলল।

: 'মান্নি তো সরাসরি না করে দেবো।' চিলি সঙ্গে মাছের টুকরো যোগাতে ডোবাতে, দুই বাক্যে হামিন যেন আগাম বলে দিল।

: 'হ্যাঁ, আমি জানি।' রাইসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।।

: 'ও তোমার পছন্দ তো না, তাই না?' হামিন তাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে যেন এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়।

: 'হ্যাঁ' রাইসা এক শব্দে উত্তর দিল। তারপর গোটা একটি জলপাই মুখে পুরে নিল।

'টু ব্যাড। খুবই দুঃখজনক।' হামিন যেন আফসোস করে বলল।
'ইনায়া ও আবদুল্লাহর কথা তুমি জানো, তারপরও তুমি...।'

রাইসা তার কথা থামিয়ে দিল, 'হিশাম জন্মসূত্রে মুসলিম।'

: 'কিন্তু বাহরাইনি, বরং আরব।' হামিন তার কথা পূর্ণ করতে দিল না।

'এমনিতে তো সে আমেরিকান।' রাইসা যেন প্রতিরোধ করল।

: 'আমেরিকান তো মাস্মি এমনি দেখতে পারেন না।' হামিন অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে দৃশ্যের অন্ধকার দিকটি দেখাল।

: 'তাই তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি।' রাইসা এখন সালাদ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

: 'একটা কথা বলো, তাকে কি শুধু পছন্দ করো, নাকি ভালোবাসা ইত্যাদিও আছে?' জবাবে রাইসা তার দিকে ঘুরঘুর করে তাকাল। 'কেবল জেনারেল নলেজের জন্য জিজ্ঞেস করছি।' হামিন আত্মপক্ষ সমর্থন করে ব্যাখ্যা করল।

: 'এটা জেনারেল নলেজের প্রশ্ন নয়।' রাইসা তাকে হারানোর ভঙ্গিতে বলল।

: 'তাহলে কমন সেন্সের হবে, সেটা তো আমার এমনিতেই খারাপ।' প্লেট পরিষ্কার করতে করতে হামিন অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলল।

: 'তুমি কিছু করতে পারবে কি না?' হামিন কিছু বলার আগেই রাইসা প্রশ্ন করে

বসল।

: আমি কেবল চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তার কোনো ফায়দা নেই। তার আগে জরুরি হলো, হিশামের সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে দাও। আমি দেখতে চাই, তোমাকে নিয়ে সে কতটা সিরিয়াস।

: 'সেটা আমি করিয়ে দেব, তা কোনো সমস্যা নয়।' রাইসা খানিক আশ্বস্ত হতে হতে বলল।

-কিন্তু মাম্মি-পাপা যদি না মানে, তাহলে?' হামিন আট করে তাকে বলল। রাইসা চুপচাপ বসে রইল। তারপর বলল, 'তাকে আমার ভালো লাগে। তাই বলে এটাং মানাসকভাবে জড়িয়ে নেই যে, তাকে ছাড়তে পারব না।'

ভালোর আশা রাখতে হয়, সেই সঙ্গে মন্দের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। বাবা আপত্তি করবেন না। কিন্তু মাশ্বির কথা বলতে পারছি না। চেষ্টা করব। কিছু তোমাকে প্রপোজ করার আগে হিসাম কি তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে? কারণ, তার পরিবারের কারও যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে মাশ্বি-পাপা কখনোই এই প্রপোজালকে গুরুত্ব দিবেন না।" কথা বলতে বলতে হামিনের হঠাৎ মনে পড়ল।

: 'তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই সে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের কোনো আপত্তি নেই।' রাইসা যেন তাকে বিশ্বাস দিল। হামিম তার কথা শুনতে শুনতে টেবিলে পড়া ফোনে কিছু দেখছে আর স্কুল করে নিচে নামছে। রাইসার মনে হলো, তার কথা হামিম খেয়াল করে শুনছে না। 'আমার কথা তুমি শুনছ?' রাইসা তাকে মনোযোগী করল।

: 'হ্যাঁ, আমি হিশামের ব্যাপারে সার্চ করছি।' উত্তরে সে বলল।

: 'কী?' রাইসা চমকাল।

: 'হিসাম ও তার পরিবার কি জানে যে তুমি দত্তক?' হামিন
ওভাবেই স্ক্রিন স্কুল

করতে করতে বলল।

: 'হিশাম যেহেতু জানে, তাহলে স্পষ্টতই তার পরিবারও
জানো।' রাইসা এক

মুহূর্ত থমকে পুনরায় বলল।

: 'ওহা' হামিন ফোনে কিছু পড়তে পড়তে অবচেতনেই
চমকাল।

: 'কী হয়েছে?' রাইসা চমকে উঠল।

: 'তোমার জন্য একটি সুসংবাদ, কিংবা দুঃসংবাদ।' হামিন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে, ফোনটি তার সামনে মেলে ধরল।

লোকটি দেওয়ালে ঝোলানো রাইসার ছবির সামনে বিগত পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপলক দৃষ্টিতে, চোখ নিবন্ধ করে মেয়েটির চেহারা দেখছে। তাতে যেন কোনো সন্দেহ খুঁজে ফিরেছে। সালার সিকান্দারের বংশে লুকানো আগ্নেয়গিরির সূচনা খুঁজতে খুঁজতে। সালারকে যদি ওই লোকটি ঘায়েল করতে চায়, তাহলে ঠিক এ দিকটাতে পারবে। ঠোঁট কামড়ে লোকটি বিড়বিড় করে কিছু বলছেও। যেন আত্মকালাম বা নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছে। ষড়যন্ত্রের জাল বোনার জন্য একের পর এক চক্রান্ত ও ধোঁকার জাল গাঁথছে। একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে লোকটি এখন পেছনে ঘুরে তাকাল। ওখানে বসা লোকদের কিছু নির্দেশনা দিতে চাচ্ছে সে।

সিআইএ হেডকোয়ার্টারের এই রুমের দেওয়ালটি বোর্ড, ছোট-বড় নোটিশ, ফটোগ্রাফ এবং অ্যাড্রেস লেখা কাগজপত্রে ভরপুর। রুমে থাকা গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে তিনজন এখনো কম্পিউটারে বিভিন্ন ডেটা খুঁজতে ব্যস্ত। গত দেড় মাস ধরে তারা এই কাজটি করছে। রুমের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় বাক্স খুলে পড়ে আছে। সেগুলো বিভিন্ন ফাইল, হ্যাম্পস, ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্রের ছাঁটা ও কাটা রেকর্ডে ভরপুর। রুমের রেকর্ড কেবিনেটগুলো আগে থেকেই পূর্ণ। এসবের সমস্ত তথ্য কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কেও সংরক্ষিত।

রুমের এই দুজন ব্যক্তি গত দেড় মাস ধরে সালাব সিকান্দারের ব্যাপারে অনলাইনে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য ও ডকুমেন্ট একত্র করছে। রুমের তৃতীয় একজন ব্যক্তি সালাবের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ইমেইল রেকর্ড খুঁজে দেখছে। চতুর্থ ব্যক্তিটি তার পারিবারিক ও আর্থিক তথ্যাবলি চেক করছে। এই সমস্ত পরিশ্রমের ফলাফলস্বরূপ প্রাপ্ত তথ্যগুলো এখন দেওয়ালের বোর্ডে ঝুলছে।

এই চারজন ব্যক্তি এখন দাবি করতে পারবে যে, সালার ও তার পরিবারের গোটা জীবনের রেকর্ড যদি খোদার কাছে থেকে থাকে, তাহলে তার এক কপি এখন এই রুমেও আছে। সালারের জীবনের এমন কিছু নেই, যা তারা জানে না কিংবা সে ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। সিআইএ-এর সিটিং অপারেশন থেকে শুরু করে তার প্রাপ্তবয়স্কের গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কেও তারা জানে। সেই সঙ্গে তার আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে, সন্তানদের প্রাইভেট এমনকি পার্সোনাল লাইফ অবধি অবগত।

কিন্তু সমস্যা হলো, দেড়-দুই মাসের কঠোর পরিশ্রমে জমানো তথ্য থেকে এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না, যা সালারের চরিত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই দলটি গত পনেরো বছর যাবৎ, বিভিন্ন জনের চরিত্রহননের এসব কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রথম তারা ব্যর্থ হচ্ছে। তারা সালার সিকান্দারের দুশোটি পয়েন্ট একত্র করেছে। প্রতিটি পয়েন্ট চেক করে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এতে তারা

তেমন কিছুই বুঝে পায়নি। এমন ব্যর্থ তারা এই প্রথম হলো।
এমন পরিচ্ছন্ন রেকর্ডও ইতিপূর্বে তারা কখনো দেখেনি।

সালারের প্রতি সুপ্ত প্রশংসা রাখা সত্ত্বেও, ভুল খোঁজার সর্বশেষ
চেষ্টাটি করতে শুরু করল সে। রুমের এক বোর্ড থেকে আরেক
বোর্ডে, আরেক থেকে আরেক, এভাবে প্রতিটি বোর্ডে গভীর
দৃষ্টি ফেলে অবশেষে সালারের বংশ-বৃক্ষের ছবিটির কাছে
এসে থেমে গেল। এই ছবিটির সামনে আরও কিছু ছবি রয়েছে।
সেগুলোর সঙ্গে কিছু বুলেট পয়েন্ট। সে যেন একদম জোরালো
ধাক্কা খেলো। সে ওই মেয়েটির ছবির নিচে তার জন্ম তারিখ
দেখল। তারপর কম্পিউটারের সামনে বসা লোকটিকে সেই
তারিখ বলতে বলতে নির্দেশ দিল, 'দেখো ওই বছর ওই
তারিখগুলোতে সে কোথায় ছিল?' কম্পিউটারে বসা লোকটি
সার্চ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে উত্তর করল,
পাকিস্তান। প্রশ্নকারী ব্যক্তির মুখে অজান্তেই হাসি ফুটে উঠল।

: 'কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত?' লোকটি তার পরবর্তী প্রশ্ন করল। কম্পিউটারের সামনে বসা লোকটি কিবোর্ডে আঙুল ঘুরিয়ে, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তাকে তারিখ বলল।

'অবশেষে আমরা কিছু পেয়েই গেলাম।' লোকটি সহসাই সিটি বাজাতে বাজাতে বলল। তারা এখন জাহাজ ডোবানোর জন্য টর্পেডো পেয়ে গিয়েছে। এই হলো বিগত পনেরো মিনিটের খোঁজাখুঁজির ফলাফল। তারা এখন জেনে গিয়েছে, সালার নামক সেই আগ্নেয়গিরির মুখ খোলার জন্য তাদের কী করতে হবে।



ঘুমের মধ্যে ফোনের শব্দে হড়বড় করে জেগে উঠল জিবরিল। তার মাথায় প্রথম হসপিটালের খেয়াল এলো। কিন্তু এটি হসপিটাল থেকে নয়। স্ক্রিনে নিসার নাম ঝলমল করছে। এটি অপ্রত্যাশিত। এক সপ্তাহ আগে আসফান্দের দাফনের সময় নিশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। দীর্ঘ একটি সময় পর দেখা। আর এখন এভাবে এত রাতে কল...!

কল রিসিভ করার পরই, এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্য নিসা তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। অতঃপর প্রচণ্ড অস্থির হয়ে জিবরিলকে বলল, 'আয়েশার জন্য তুমি কিছু করতে পারবে?' জিবরিল খানিক হতভম্ব হলো, 'আয়েশার জন্য? কী?'

: সে এখন পুলিশ কাস্টডিতে।

: 'হোয়াট? কেন?' জিবরিল স্তম্ভিত হয়ে গেল।

: 'হত্যা মামলায়।' নিসা অপর পাশ থেকে বলল। জিবরিল নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

: কার হত্যা?

নিসা এখন কাঁদতে শুরু করেছে।

: আসফান্দের।

জিবরিলের মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে লকআপে বসে আয়েশা আবেদিন তার অতীত জীবন নিয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু তার জীবনে এত কিছু ঘটেছে যে, সব মনে করতে ব্যর্থ হলো। এটি যেন তার আটাইশ বছরের জীবন নয়, একশত বছরের জীবন। ধারাবাহিকভাবে কোনো ঘটনাই তার মনে আসছে না, যে ধারাবাহিকতায় সে মনে করতে চাচ্ছে। লকআপের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে, ছাদের

দিকে ঘুরঘুর করে তাকিয়ে সে ভাবতে চেষ্টা করছে, তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা কোনটি? কোনটি তার সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ও জীবনের পর্যায়? বাবা ছাড়া জীবন কাটানো? আহসান সাদকে বিয়ে করা? তার সঙ্গে যাপিত জীবন? একটি অক্ষম-প্রতিবন্ধী ছেলের জন্ম? আহসান সাদের তালাক? আসফান্দের মৃত্যু? নাকি নিজের সন্তানকে হত্যার দায়ে দিন-দুপুরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া? এই সমস্ত ঘটনার মাঝে আরও কিছু যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা আছে। সেগুলো যেন এই মুহূর্তে তার স্মৃতিচারণে উঠে আসতে অস্থির হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আয়েশা ঠিক বলতে পারল না। প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি দুর্ঘটনা নিজের মতো করে গভীর যন্ত্রণার স্মৃতি মেখে আছে। এসব ভাবতে ভাবতে যেন সে এখন সেই অতীত যন্ত্রণার সময় পার করছে। আর ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় আসতেই সে অনুমান করতে চেষ্টা করছে, অতীতের ঘটনাগুলো বেশি কষ্টদায়ক ছিল, নাকি ভবিষ্যৎ হতে চলেছে?

মাঝে মাঝে আয়েশা আবেদিনের মনে হয়, সে এক নির্লজ্জ মানুষ। কষ্ট, অপমান সহিতে সহিতে সে এখন লজ্জিত হওয়া আর আত্ননাদ করতেও ভুলে গিয়েছে। জীবনে সে এত বেশি অপমানিত হয়েছে যে, লজ্জা ও লজ্জাশীলতা শব্দ দুটো যেন তার জীবন থেকে নাই হয়ে গেছে। এতটাই নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছে যে, মরতেও ভুলে গেছে সে। কোনো যন্ত্রণাই আর তাকে কষ্ট দিতে পারে না। হৃদয় থাকলেও, সেটা এত টুকরো হয়েছে, এখন আর তা ভাঙার মতো নেই। আর মস্তিষ্ক থেকে থাকলে, তা দুশ্চিন্তার জালে জালে জটলা। আত্মসম্মান, অপমান, সম্মানের মতো শব্দগুলোকে আড়াল করার মতো জালা। এসব তার সঙ্গেই কেন হচ্ছে, এটা ভাবা সে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সে তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি। তাছাড়া এই প্রশ্নের উত্তর আহসান সাদ তাকে শোনাতে শোনাতে মুখস্থ করিয়ে ফেলেছে। 'এই কাগজে লেখো, তুমি অপরাধী। আল্লাহর কাছে মাফ চাও। তারপর আমার কাছে। তারপর আমার পরিবারের সবার কাছে ক্ষমা চাও, নির্লজ্জ মহিলা কোথাকার!' কে জানে সাদের বলা এই কথাগুলো তার

কানে বাজা বন্ধ হয় না কেন! দিনে, রাতে, হাজারবার এই বাক্যগুলোর প্রতিধ্বনি তাকে সর্বদা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে।

সে এক অপরাধী নারী। এই বাক্যটি সে নিজ হাতে এতবার কাগজে লিখে আহসান সাদকে দিয়েছে যে, এখন তার নিজেরই বিশ্বাস হয়ে গেছে, কথাটি সত্য। তার অপরাধ কী? তা তার মনে পড়ে না। তা সত্ত্বেও তার বিশ্বাস, জীবনে সে যে অপরাধই করেছে, হয়তো তা খুব বড়ই করেছে। এত বড় যে, আল্লাহ পাক তাকে এভাবে বারবার শাস্তি দিচ্ছেন। 'শাস্তি' শব্দটিও সে আহসান সাদের পরিবারে গিয়েই শুনেছে এবং শিখেছে। যেখানে 'অপরাধ ও শাস্তি' এই শব্দ দুটি মন্ত্রের মতো বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। অন্যথায় আয়েশা আবেদিন তো আহসান সাদের জীবনে প্রবেশ করার আগে আল্লাহ তাআলাকে কেবল 'মেহেরবান' হিসেবেই পেয়েছে।

'নির্লজ্জ নারী...!' এই গালিটি তার জন্যই। মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল সে। যেন অজগর শুঁকে গিয়েছে তাকে। আদর-যত্ন আর অটেল উপকরণে মানুষ হয়েছে সে। গালি তো দূরের কথা, সে তো কখনো তার নানা-নানি কিংবা মায়ের কাছ থেকে শত্রু কোন কথাও শোনেনি। এমন কোনো শব্দ, যাতে তাকে ছোট বা তাচ্ছিল্য করা হয়। আর এখন সে তার স্বামীর মুখে এমন শব্দ শুনছে, যা গালি হওয়ার পাশাপাশি অপবাদ এবং মিছে কালিমা লেপনও বটে।

সেই 'নির্লজ্জ' শব্দটি শুনে আয়েশা আবেদিন নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। শত ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে বোঝাল, এই গালি তার জন্য নয়। তাকে কেউ এটা কীভাবে বলতে পারে! সে হয়তো ভুল শুনেছে। কিংবা এই শব্দগুলোর অর্থ তা নয়, যা সে মনে করছে। তখনকার মনের ওই অবস্থা নিয়ে সে একটি দীর্ঘ বই লিখতে পারত। কত কী উদয় হয়েছিল তার মনে! প্রথমবার গালি শুনে আয়েশা আবেদিন কতশত ব্যাখ্যা দিয়েছিল নিজেকে; কেবল নিজের আত্মসম্মানকে রক্ষা করার জন্য। এত

খারাপ লাগা ও ব্যাখ্যা টেনে আনা কেবল প্রথমবার হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেসব দাফন করে দিয়েছিল। তারপর সে গালি দিলে, চুপচাপ শুনে যেত। অনেক ভয়ংকর ভয়ংকর গালি। তার তখন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সে সত্যিই এসবের উপযুক্ত। কারণ, আহসান সাদ তাকে নিজেই এটা বলত। নিজের আত্মসম্মানকে আবারও সান্ত্বনা দিতে দিতে, তারপর গালির মতো করে মার খাওয়াও শিখে গিয়েছিল সে।

পাঁচ সদস্যের সেই বাড়ির প্রতিটি সদস্য তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, সে সত্যিই এর উপযুক্ত। সে তখন মুমিনদের এক দলে আটকে গিয়েছিল, যেখানে সকল মুমিনরা কথার পাথরে তাকেও মুমিন বানাতে চেষ্টা করছিল। কারণ তাদের মতে, সে ছিল গুনাহগার।

আহসান সাদ কীভাবে তার জীবনে এসেছিল? কেন এসেছিল? একসময় তার মনে হতো, সাদ তার জীবনে সৌভাগ্য হয়ে আগমন করেছে। আর একটা সময়ে এসে তাকে এক ভয়ংকর

দুঃস্বপ্ন মনে হয়েছে। প্রবল আগ্রহে যে দুঃস্বপ্ন শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিল সে। আর এখন তার মনে হয়, সাদ সেই আজাব, যা আল্লাহ তাআলা তাকে তার করা, না-করা সমস্ত গুনাহের জন্য দুনিয়াতেই দিয়ে দিয়েছেন।

আয়েশা তখন হাউস জব করছিল। হঠাৎ আহসান সাদের প্রস্তাব আসে। আয়েশার। জন্য সেটা কোনো বিরল বিষয় ছিল না। তার জন্য ডজন ডজন প্রস্তাব আগেও এসেছিল। তার নানা-নানিরা সেগুলো ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। আয়েশা ভেবেছিল সাদের প্রস্তাবও কোনোরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ, তার নানা-নানি পড়াশোনা শেষ করার আগে কোনো সম্বন্ধে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু এবার এমনটা হয়নি। সাদের বাবা-মায়ের মিষ্টি কথায় আয়েশা আবেদিনের পরিবার প্রভাবিত হয়ে পড়ে। 'আমরা শুধু একটি নেক ও ভালো মেয়ে চাই আমাদের ছেলের জন্য। বাদবাকি সবকিছু আছে আমাদের। কোনো কিছুর অভাব নেই। এদিকে আপনাদের মেয়ের এত প্রশংসা শুনেছি যে, আমরা

আপনাদের কাছে আঁচল না পেতে থাকতে পারলাম না। আহসানের বাবা আয়েশার নানাকে বলেছিল। আয়েশা আবেদিন তখন জানতে পারে, আহসানের এক বোন তার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়ে। তাদের মধ্যে কেবল আনুষ্ঠানিক পরিচয় ছিল। আয়েশা অবাক হয়, যেই মেয়ে কিনা কলেজে চুপচাপ গুটিগুটি মেরে থাকে, সামান্য পরিচয়েই তার পরিবারের কাছে এত প্রশংসা কীভাবে করতে পারে!

কারও মুখে প্রশংসা শোনা আয়েশার কাছে অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না। সে কলেজের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের একজন। প্রতিটি শাখাতেই তার সফল পদচারণা। অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা, পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্য সকল কার্যক্রমেই সে বিদ্যমান। তাছাড়া নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যও সুপরিচিত। তার ব্যাচের মধ্যে সে কেবল সুন্দরীই নয়, সেই সঙ্গে অত্যন্ত স্টাইলিশ মেয়েদের মধ্যে একজন। ভীষণ আমলি মুসলমান হয়ে, হিজাব পরিধান সত্ত্বেও তাকে স্টাইলিশ মনে হতো। হিজাব তার গায়ে মানাতও বেশ। এটি তাকে আরও

আকর্ষণীয় করে তুলত। এটি যে তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, এ ব্যাপারে সকল ছেলে-মেয়ে ছিল ঐকমত্য। আর এখন সেই মেয়ের জন্য আহসান সাদের প্রস্তাব এসেছে। যে প্রস্তাবকে তার নানা-নানি প্রথম সাক্ষাতেই 'হ্যাঁ'-ও বলে দিয়েছেন।

কে জানে কে 'সরল' ছিল! তার নানা-নানি? যারা আহসানের বাবা-মাকে অত্যন্ত ভদ্র ও সরল মনে করেছিলেন? নাকি আয়েশা নিজেই, যে তাদের বাহ্যিক দীনদারি দেখে সায় দিয়েছিল? তা সত্ত্বেও তারা বিয়ের আগে তার ও আহসানের দেখা করা জরুরি মনে করেছিলেন। আহসান তখন আমেরিকায় রেসিডেন্সি করছিল। ছুটিতে সে পাকিস্তানে এসেছিল।

আহসান সাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দীর্ঘদিন পর জিবরিলের কথা মনে পড়েছিল তারা। তার কাছে সাদকে জিবরিলের মতো কেন মনে হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর আয়েশা কখনোই

পায়নি। সাদ ছিল মানানসই চেহারা, ঈষণীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর কথাবার্তায় সংযত এক পুরুষ। তার পছন্দের বিষয় ছিল কেবল একটি-ধর্ম। এ বিষয়ে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে পারত। আর আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে বন্ধনের শেকলও ছিল এটিই। প্রথম সাক্ষাতেই তারা ধর্ম নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। আয়েশা তাতে মুগ্ধও হয়। সে ছিল হাফেজে কুরআন। তাকে এও বলেছিল, জীবনে সে কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বও করেনি। আর দশ জন ছেলের মতো উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জড়ায়নি। ধর্মের ব্যাপারে ছিল তার বিভূত জানাশোনা। সেই জানাশোনাটি ছিল, আয়েশার চেয়ে অনেক বেশি। আহসান একটি সাধারণ জীবনযাপন করতে চায়। আর আয়েশাও এমনটি চাইত।

একটি আমলি মুসলিম পরিবারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আয়েশা আহসান সাদের প্রতি মুগ্ধ হয়। তার তখন মনে হয়, আহসান তার সমবয়সি অন্যান্য ছেলের তুলনায় প্রচণ্ড ম্যাচিউর এবং ভিন্ন। সে যদি কখনো বিয়ের কথা ভেবেও থাকে, তাহলে এমন

ছেলেকেই বিয়ের কথা ভেবেছিল। আহসান প্রথম সাক্ষাতেই তাকে প্রভাবিত করতে সফল হয়। আর তার পরিবার তো আহসানের পরিবার দ্বারা আগে থেকেই প্রভাবিত হয়ে ছিল।

বিয়ে খুব জলদিই হয়ে গেল। এবং অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে। এটা ছিল আহসান সাদের বাবা-মায়ের চাওয়া। আয়েশা এবং তার নানা-নানিও এই সাদাসিধে বিয়ের ব্যাপারে খুব সন্তুষ্ট ছিল। এমন বিয়েই কামনা করত আয়েশা। আর তার সৌভাগ্য ছিল যে, তার কামনা-মাফিক স্বশুর-শাশুড়িও পেয়ে গিয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে উপটৌকনের কোনো চাওয়াও আসেনি। তারা খুব কঠোরভাবে আয়েশার নানা-নানিকে এসব আনুষ্ঠানিক কষ্ট পোহাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তবু আয়েশার পরিবারের জন্য তা মানা কষ্টকর ছিল। কারণ, তার নানা-নানি তার বিয়েতে উপটৌকন হিসেবে দেওয়ার জন্য আগে থেকেই বহু কিছু কিনে রেখেছিলেন। তাছাড়া সমাজে তারা যে শ্রেণিতে বসবাস করতেন, সেখানে কনের বাবার দেওয়া উপটৌকনের চেয়ে, কনের আত্মীয়স্বজনের দেওয়া

উপহার আরও বেশি জমা হয়ে যেত। আয়েশার বিয়েতেও এমনটাই হয়েছিল। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে করা অনুষ্ঠানটিও শহরের এক জমকালো হোটেলে আয়োজন করা হয়েছিল। আয়েশার আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে বিয়েতে পাওয়া উপহারসামগ্রীর মূল্য নিঃসন্দেহে কয়েক লাখ টাকা। অথচ আয়েশাকে দেওয়া আহসানদের পোশাক ও অলংকার কোনোভাবেই আয়েশাদের শানশওকতের সঙ্গে খাপ খায়নি। বাস চলনসই হয়েছিল।

আয়েশার পরিবার আরও ভালো কিছু এবং বেশি কিছু প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু আয়েশা তাদের বুঝিয়েছে। সে ভেবেছিল, আহসানরা সত্যিই কম খরচে সাদাসিধেভাবে বিয়েটা করাতে চাচ্ছে। তাই তারা কনের পোশাক ও দামি অলংকারের পেছনে খুব বেশি খরচ করেনি। আয়েশা অন্তত এসব ছোটখাটো বিষয়ে মন খারাপ করেনি। বাসর রাতে আহসান তার প্রশংসা না করে, সে তার মায়ের ব্যাপারে যখন নিন্দা করেছিল, তখনো আয়েশা মন খারাপ করেনি।

'তোমার মায়ের লজ্জা করে না, এই বয়সে নির্লজ্জের মতো স্লিভলেস পোশাক পরে পুরুষদের সঙ্গে হাসাহাসি করতে? তোমার বোনেরা ও বংশের অন্যান্য নারীরা খোদা জানে কীসব পোশাক পরে বিয়েতে এসেছে!'

শুনে আয়েশার যেন দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। এসব তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। আহসানের ভাষা ও বলার ভঙ্গি এতটাই নতুন ও অপরিচিত ছিল যে, তার বিশ্বাস হওয়ারও কথা নয়। সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পর তাদের মাঝেমাঝে কথাবার্তা হতো। আহসান সবসময় খোশ মেজাজে, মার্জিতভাবে কথা বলত। এমন রুক্ষ ভাষা ওই প্রথম সে শুনছিল। তার মা ও বোনদের নিয়ে যেসব শব্দ ব্যবহার করছিল, আয়েশার কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল।

'তোমার মায়ের কি আখেরাতের ভয় নেই? মুসলিম পরিবারের নারীরা এমন হয়?' আয়েশা বিস্ফোরিত চোখে তার দিকে

তাকিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না, আহসান তাকে এসব কেন বলছে। সে মাত্র এক দিনের নববধূ। এসব তো সেই কথা নয়, যা শোনার জন্য সে জীবনের এই বিশেষ দিনটির অপেক্ষায় ছিল।

আধা ঘন্টা যাবৎ সে এমন নারীদের অভিশাপ-মালামাত করতে থাকল। তাকে এও বলে চলল, তোমার মা ও বোনেরা এতটা স্বাধীনচেতা আর আমেরিকায় তাদের এমন চালচলন হবে, তা আমি ভাবিনি। অথচ তারা তো আয়েশার নানা-নানি এবং স্বয়ং তাকে দেখেই এই সম্পর্ক ঠিক করেছিল।

আয়েশা আহসান সাদকে এটা বলার সাহস করতে পারল না যে, বিয়ে পাকা হওয়ার আগে দু-তিনবার সে নিজেই আমেরিকায় তার মা-বোনদের সঙ্গে দেখা করেছে। সম্বন্ধ পাকা হওয়ার সময়ও তার পরিবার এই পরিবারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছে। তারা স্বাধীনচেতা হয়ে থাকলে, তা তো গোপন কিছু ছিল না। এখন এমনভাবে বলছে, যেন কিছুই জানত না।

আহসান সাদের কাছে ধর্ম এমন এক অস্ত্র, যার সামনে আয়েশা আবেদিন কথা বলার সাহস করতে পারেনি। মনে মনে সে স্বীকার করে নিল, ভুল তার মা-বোনেরই। তারা ইসলামসম্মত পোশাকে ছিল না। এ নিয়ে আহসান ও তার পরিবার যদি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, তাহলে তা ঠিক। সেই রাতে আহসান একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তার মর্যাদা ও অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছিল। বুঝিয়ে দিয়েছিল সমাজ ও সংসারে তার গুরুত্ব কতটুক। আয়েশা কেবল মাথা নাড়তে থাকল। মনে হচ্ছিল আজ রাতের জন্যই সে সমস্ত হাদিস ও আয়াত মুখস্থ করে এসেছে। আয়েশা একদম চুপচাপ সব শুনতে থাকল। সেটি সাদের সাময়িক রাগ ছিল না, সেটি ছিল পরিকল্পিত কাজ। সে তাকে মানসিকভাবে আঘাত করতে চেয়েছিল, এবং তাতে সফলও হয়েছিল। এই আত্মবিশ্বাসী মেয়েটির ব্যক্তিত্বে এটিই ছিল তার প্রথম আঘাত। সাদ তাকে বলেছিল, এই ঘরে এবং তার জীবনে তার জায়গা তার বাবা-মা ও বোনের পরে। আর হ্যাঁ সেই তালিকায় আল্লাহকেও সে এক নম্বরে রেখেছিল। আয়েশা

আবেদিনকে সে যেন সেই বৃত্তের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যাতে তার জীবন আবর্তিত হতো। এই পরিস্থিতিতে একুশ বছর বয়সি একজন তরুণী যতটা হয়রান ও দিশেহারা হতে পারে, সে ঠিক ততটাই হচ্ছিল।

আহসান সাদ তাকে বলেছিল, তাদের মধ্যে যা কথা হবে, আয়েশা তা অন্য কারও কাছে শেয়ার করবে না। আয়েশা তাতেও সম্মতি দিয়েছিল। সে ভেবেছিল, এটি একটি সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যেমনটা প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে থাকে। কিন্তু এটি কোনো সাধারণ প্রতিশ্রুতি ছিল না। আহসান তাকে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ করিয়েছিল। সে যা-ই বলবে, তা-ই তাকে মেনে চলতে হবে। স্বামী হিসেবে এটা নাকি তার অধিকার। একুশ বছরের জীবনে, সেটি ছিল আয়েশা আবেদিনের জীবনের সবচেয়ে খারাপ রাত। কিন্তু সে জানত না, এরপর সে আরও কত কত খারাপ রাতের সম্মুখীন হতে চলেছে।

রাতের রাগ ও আচরণ তো ছিল আহসান সাদের। কিন্তু সকাল হতেই একই রাগ ও আচরণ করতে শুরু করে তার পুরো পরিবার। অত্যন্ত শীতল ও রুক্ষ তাদের আচরণ। আয়েশার অপরাধবোধ এতে আরও বেড়ে যায়। তাই সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, সামনের অলিমা অনুষ্ঠানে তার মা-বোন যেন আবারও এমন কোনো পোশাক না পরে, যার জন্য তার ওপর দিয়ে আরেকটি ঝড় বয়ে যায়।

কিন্তু বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই সে বুঝে যায়, তাদের মনঃক্ষুণ্ণতা তার পরিবারের স্বাধীন-মনস্ক হওয়া নয়; বরং তাদের কাছে মনে মনে যা যা পাওয়ার আশা করেছিল, সেসব না পাওয়া। তাদের মতে, সাদাসিধেভাবে বিয়ে দেওয়া আর কোনো যৌতুক না চাওয়ার মান এই নয় যে, মেয়েপক্ষ কিছুই দেবে না। তাদের প্রত্যাশা ছিল, তাদের একমাত্র এবং যোগ্য সন্তানকে আয়েশার পরিবার অন্তত একটি গাড়ি অবশ্যই দিবে। আয়েশার নামে কোনো বাড়ি, কোনো প্লট, কোনো ব্যাংক

ব্যালেন্স অবশ্যই করে দেওয়া হবে। যেমনটা সাদের অন্যান্য ভাবির নামে তাদের বাবারা করে দিয়েছে।

তাদের কাছে বিয়ে সাদাসিধেভাবে হওয়ার মানে হলো, কেবল বিয়ের অনুষ্ঠান সাধারণভাবে হওয়া। বিয়ের পরের দিনই তারা তাদের এসব অভিযোগ আয়েশার কাছে উপস্থাপন করে। আয়েশাও সেসব আবদার তার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। এখন অবাক হওয়ার পালা আয়েশার পরিবারের।

বিয়ের তিনদিন পর এই প্রথম নওরীন তার মেয়ে আয়েশাকে সুযোগ দেয়, এই সম্পর্কের ব্যাপারে তুমি ভালো করে ভেবে নাও। বিয়ের তৃতীয় দিনই যারা এমন আবদার করতে পারে, ভবিষ্যতে তারা তোমাকে আরও বেশি যন্ত্রণা দিতে পারে। বন্ধুবান্ধব ও কাজিনদের আনন্দঘন মেসেজ ও কল দেখে দেখে, আয়েশা সাহস করে বলতে পারেনি যে, সে তালাক চায়। সে ওই পথই বেছে নিয়েছিল, যে পথ এই সমাজে প্রতিটি

নারীই বেছে নেয়। সমঝোতার পথ এবং ভালো সময়ের
অপেক্ষার

পথ। সে ভেবেছিল, এসব সাময়িক। তাদের আবদার পূরণ
হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তাছাড়া আহসানের সঙ্গে একবার আমেরিকায় চলে গেলে
সেখানে তারা নিজের মতো

করে জীবন কাটাবে।

অবশেষে আহসানের পরিবারের সমস্ত অভিযোগ পূরণ করা
হয়। এক সপ্তাহ পর তাকে বড় একটি গাড়ি দেওয়া হয়।
আয়েশার নামে একটি প্লট লিখে দেয়। আয়েশার নানা কিছু
টাকাও দেন। ওগুলো আহসানের কথামতো আহসানের
অ্যাকাউন্টেই জমা করা হয়। এরপর তারা হানিমুনের উদ্দেশ্যে
দুই সপ্তাহের জন্য দেশের বাইরে চলে যায়।

হানিমুনে গিয়ে কোনো একটা বিষয়ে রেগে গিয়ে আহসান এই প্রথম তার গায়ে হাত তোলে। ইতিপূর্বে শুধু গালিই দিত। ততদিনে জীবনের সিদ্ধান্তে আয়েশা আবেদিনের অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। আয়েশা বুঝে গিয়েছে, তার স্বামী অনেক ভালো মুসলমান হতে পারে, কিন্তু ভালো মানুষ নয়। আর আয়েশা তাকে ভালো মুসলমান মনে করেই বেছে নিয়েছিল। অথচ সে ছিল মুনাফিক ও দ্বিমুখী মানুষ।

এক মাস পর তারা আমেরিকায় চলে যায়। কিন্তু সেই এক মাসে আয়েশা একদম বদলে যায়। সে এমন এক অদ্ভুত পরিবারে এসে পড়েছে, যারা বাহ্যত শিক্ষিত মনে হলেও, ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড জাহিল। সেই জাহিলি ও মুনাফিকির মূল হোতা ছিল আহসানের বাবা। আয়েশা এটি খুব জলদিই বুঝে গিয়েছিল। আহসানও ছিল একদম তার বাবার মতোই। আর তাই আয়েশাকে সে তার মায়ের মতো বানাতে চাইত, যে মাকে সে একজন আদর্শ মুসলিম নারী মনে করত। সে আর তার বোনেরা

মিলে আয়েশাকে তাদের মায়ের মতো বানাতে চাইত। ততদিনে আয়েশা আবেদিন এও বুঝে যায়, তাদের আদর্শ মাতা মূলত এক মানসিক রোগী। এদিকে সাদের আচরণের ফলে তার বোনদের জন্য তখন পাত্র দেখা শুরু হয়েছে। কিন্তু আয়েশা জানে, যেসব শর্ত নিয়ে তারা পাত্র খুঁজছে, এভাবে পাত্র পাওয়া অসম্ভব!

বিয়ের দুই মাসের মধ্যেই আয়েশা সেই পরিবেশে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এসবে অতিষ্ঠ হয়ে কসম ভেঙে নানা-নানিকে তালাকের কথা বলার আগেই সে জানতে পারে, সে মা হতে চলেছে। এটি তার কাছে তখন সৌভাগ্য মনে হয়। কিন্তু এটিই তার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আয়েশা আবেদিন আবারও সব মানিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। বাচ্চা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে এই আশায় বুক বাঁধে। সবার সঙ্গে না হোক, অন্তত তার ও আহসান সাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এটিও ছিল তার ভুল ধারণা। সেই গর্ভধারণ তার জন্য আরও একটি ফাঁদ

প্রমাণিত হয়। আহসান ও তার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয়, বাচ্চা জন্ম হওয়া পর্যন্ত আয়েশা পাকিস্তানেই থাকবে।

নয়টি মাস আয়েশা যে ধৈর্য ও কষ্টে কাটিয়েছে, তা শুধু সে-ই জানে। হাউস জবের পর সে জব করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও আহসানের তা পছন্দ ছিল না। আয়েশা তাই এ নিয়ে আর জোরাজুরি করেনি। মাঝেমধ্যে বাপের বাড়ি যাওয়া, তার নানা-নানির এখানে আসা, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসব পছন্দ করত না। এটাও আয়েশা চুপচাপ মেনে নিয়েছিল। সে আর তখন কোনো স্যোশাল মিডিয়াতেও ছিল না। আহসান নিজে সবখানে থাকা সত্ত্বেও তাকে এসব থেকে নিষেধ করত। কোনো পুরুষের সঙ্গে আয়েশার যোগাযোগ থাকুক, তা সে চাইত না। হোক সেই পুরুষটি তার কোনো আত্মীয় বা ক্লাসফেলো। বোনদের আপত্তি সত্ত্বেও অবশেষে আয়েশা তার আইডিও ডিলেট করে দিয়েছিল। এমনিতেও তার জীবনে এমন কোনো সুখের কিছু

ছিল না, যা প্রকাশ করার জন্য ফেসবুক আইডির প্রয়োজন ছিল।

রুমে একা একা বসে থাকা, সকালে ঘুম থেকে দেহে ওঠা, আহসানের মা এসব পছন্দ করত না। আয়েশা ভোর সকালে ফজর পড়েই যেকোনো পরিস্থিতিতে লাউঞ্জে চলে আসত। ঘরে পরিচারক ছিল, তবু শ্বশুর-শাশুড়ির সব খেদমত তাকেই করতে হতো। এতে তার কোনো আপত্তিও ছিল না। রান্নাবান্নার দায়িত্ব তখন সব আয়েশার উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতেও আয়েশা কষ্ট মনে করেনি। কাজে অনেক চালু ছিল সে। নানা-নানির বাড়িতেও সে খুব আত্মহুত্রে এটা-ওটা রান্না করত। দায়িত্ব দেখে সে ভয় পেত না; ভয় পেত অপমানকে। অথচ এই ঘরের সব মানুষ প্রশংসা ও উৎসাহ নামের শব্দগুলো চিনেই না। তারা কেবল সমালোচনা করতে পারে, প্রশংসা করতে নয়।

রান্না কেমন হয়েছে? এই প্রশ্ন করলে নিজেকে তার বোকা মনে হতে থাকে। কারণ, প্রথম প্রথম দুয়েকবার এই প্রশ্ন করে যে বিদ্রোহপূর্ণ উত্তর সে পেয়েছিল, এরপর আর এই প্রশ্ন করা যায় না। মাঝে মাঝে তার মনে হতে থাকে, সে নিজেও মানসিক রোগী হতে শুরু করেছে।

আহসান সাদ তার জন্য একটি নিয়ম তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল। যদি সে কোনো ভুল করে, তাহলে কাগজে লিখে নিজের ভুল স্বীকার করবে। স্বামীর হুকুম অমান্য করায় আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে। তারপর সেই ব্যক্তির কাছে মাফ চাইবে, যার অবাধ্যতা করেছে। এভাবে সপ্তাহে একবার কারও না কারও কাছে ক্ষমা চাইতেই হতো। পরে সে বুঝতে পারে, এই মাফি-নামার পদ্ধতিটি আহসানেরই তৈরি। আহসান সাদ সারা জীবন তার ভুলের জন্য বাবা-মাকে এমন মাফিনামা লিখেই দিত। এখন নিজের স্ত্রীর গলায় সে একই রশি পরাচ্ছে।

আয়েশা আগে শুধু হিজাব পরত, এখন তাকে নিকাব আর হাত মোজাও পরতে হচ্ছে। চুল কাটা ছেড়ে দিয়েছে। মেকআপ, ফেসিয়াল, মুখের লোম পরিষ্কার, সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। কেননা, ওই ঘরের কেউ এসব করে না। তারা ছিল আদর্শবান নারী। আর তাই আয়েশা আবেদিনকেও তাদের মতো করে গড়ে উঠতে হবে। নিজের বাহিরকে অন্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে তুলতে, সে যেন তার ভেতরের সব ছাঁচ ভাঙতে শুরু করেছিল।

তার নানা-নানি ও পরিবারের লোকেরা জানত যে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ভালো নয়। কিন্তু ওই বাড়িতে সে কীসব যন্ত্রণা সয়ে যাচ্ছে, তা তাদের ধারণাও ছিল না। এদিকে আয়েশা চুপচাপ বাসর রাতে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলছে। যে-কেউ সরাসরি দেখা করলে, ফোনে কথা বললে তাকে খোঁচাতে থাকত, কিন্তু সে কখনো তাদের কাছে সত্যিটা বলত না। এটাই বলত, জীবন নিয়ে সে সুখী ও ভালো আছে। গর্ভধারণের সেই নয় মাস অহসানের সঙ্গে তার কোনো

যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। আমেরিকায় যাওয়ার পর সন্তান জন্ম হওয়া অবধি আহসান একবারও দেশে আসেনি। তাদের মাঝে ফোনে এবং স্কাইপেও খুব কম কথা হতো। আহসানের পরিবারের কেউ তার প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হলে, তখন আহসান ফোনেও তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিত। আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও ঘরের প্রতিটি বিষয়ে তাকে জানানো হতো। বিশেষ করে আয়েশার ব্যাপারে।

আয়েশার মাঝেমধ্যে মনে হতো, এটা যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়; বাদশা ও বাঁদির সম্পর্ক। আহসানও তার কাছে এমনই আনুগত্য কামনা করত। আয়েশা বুক চেপে তার মনের মতো স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করত। আসফান্দের জন্ম হওয়া পর্যন্ত সে পুরোপুরি পালটে গিয়েছিল। যে দমবন্ধ পরিবেশে সে থেকেছে, সেই দমবন্ধতার প্রভাব তার সন্তানের ওপরও পড়ে। তার সন্তান আসফান্দ স্বাভাবিক শিশু হয়ে জন্মায়নি। এটি ছিল আয়েশা আবেদিনের আরও একটি বড় পাপ।

সালার দু-হাত মুঠোর মতো শক্ত করে বন্ধ করে আবার খুলল, একবার, দুবার। তারপর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে চোখ কচলাল। লম্বা পা দুটি স্টাডি টেবিলের নিচের ফুটহোল্ডারে সোজা করে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে, নতুন করে কাজ শুরু করতে যেন সতেজ হয়ে উঠল। গত চার ঘণ্টা একটানা ল্যাপটপে কাজ করেও, এখনো সেটি তার সামনে খোলা পড়ে আছে। তার এক কোণে ভেসে থাকা উজ্জ্বল ঘড়িটি এখন সুইজারল্যান্ডে রাত আড়াইটার সংকেত দেখাচ্ছে। আগামীকাল সে ডেভোস-এ অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম'-এর প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে। তার বক্তৃতা কাল সারা বিশ্বের বড় বড় চ্যানেল ও

সংবাদপত্রের শিরোনাম হতে যাচ্ছে। তিনটা চল্লিশে অবশেষে সে তার কাজ শেষ করল। ল্যাপটপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখন শীতকাল। ডেভোস-এ সূর্য উঠতে এখনো অনেক দেরি। এতটা দেরি যে, সে চাইলে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েও নিতে পারে। তাছাড়া ফজরের আগে কয়েক ঘন্টার ঘুমই তার জন্য যথেষ্ট। এটি তার জীবনের রুটিন। এত বছরে এটি এখন রুটিন থেকে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সোফার সামনে সেন্টার টেবিলে সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার কিছু আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন পড়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে একটির প্রচ্ছদে হামিন সিকান্দারের ছবিও আছে। 'ইয়ং গ্লোবাল লিডার্স ৫০০'-এর তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করা হামিন, তার বিশেষ দুট্টু হাসি এবং উজ্জ্বল চোখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য সালারের মনে হলো, সে যেন তার নিজের চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে। হামিনের ওই চোখে তার মতোই আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা ও গান্ধীর্ষ ফুটে আছে। সালার সিকান্দারের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। ঝুঁকে ম্যাগাজিনটি হাতে নিল। হামিন এই প্রথম ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তালিকায়

এসেছে। সে যেন বিশ্বনন্দিত এই ফোরামের নতুন পোস্টারবয় হয়ে উঠেছে। টেবিলে রাখা প্রতিটি ম্যাগাজিনেই হামিন সিকান্দার ও তার কোম্পানি নিয়ে কিছু না কিছু লেখা হয়েছে।

'Devilishly, Handsome, Dangerously, Meticulous.'

সালার সিকান্দারের ঠোঁটের হাসি আরও চওড়া হলো। ইংরেজি এই শিরোনামটি হামিন সিকান্দারের সম্পর্কেই করা হয়েছে। আগামীকাল সেখানেই হামিনের সঙ্গে তার দেখা হতে চলেছে। কারণ, হামিনকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ম্যাগাজিনগুলো সালার পুনরায় সেন্টার টেবিলের রেখে দিল। তার বিছানার পাশে সেলফোন টুং করে উঠল। বসতে বসতে সালার সেটি হাতে নিয়ে দেখল। হামিন সত্যিই এক শয়তান, যার কথা মনে করতেই সামনে চলে আসে।

: 'জেগে আছেন?' মেসেজে হামিন সিকান্দার জিজ্ঞেস করছিল। বাবার রুটিন সে জানে। সে নিজেও অনিদ্রার শিকার।



: 'ইয়েস!' সালার ফিরতি মেসেজ করল।

: 'অনেক সুন্দর মুভি হচ্ছে, ভাবলাম আপনাকেও জানাই।' ওপাশ থেকে উত্তর এলো। সালার তার কাছে এমন কোনো উত্তরই আশা করছিল। পরের মেসেজে সে মুভির চ্যানেলের নম্বর লিখে পাঠাল। তাতে অভিনেতাদের নামও লেখা। চার্লিজ থেরনের নামটি সেখানে বিশেষভাবে মোটা হরফে লেখা। সে এখন বাবাকে বিরক্ত করার মোড়ে আছে, সালার তা বুঝে গেল।

: 'জানানোর জন্য ধন্যবাদ।' সালার মুচকি হেসে তার মেসেজের উত্তর দিল। তার মেসেজের উত্তর না দেওয়াই বেশি ভালো ছিল।

: 'আমি বেশ গুরুত্বসহকারেই বিয়ের কথা ভাবছি।' হামিনের পরের বাক্যটি ছিল অনর্থক। সিকান্দার দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। হামিন আগামীকাল ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের

একজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তা। সে এখন বক্তৃতার আগের রাতে বাবার সঙ্গে এমন অনর্থক কথা বলছে।

: 'বাহ! কী দারুণ ব্যাপার! ওটাকেও 'TAI'-এর মধ্যে চালিয়ে দাও।' সালার তাকে উত্তর দিয়ে, গুড নাইট লিখে পাঠাল। খট করে দাঁত বের করা একটি মুচকি হাসির ইমুজি তার স্ক্রিনে ফুটে উঠল।

: আই অ্যাম সিরিয়াস।

সালার ফোন রেখে দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল।

: 'অপশন লাগবে নাকি অনুমোদন?' সালার এবার তাকে গুরুত্ব দিয়ে রিপ্লাই করল।

'পরামর্শ।' উত্তর একই দ্রুততায় এলো।

: 'টিভি অফ করে ঘুমিয়ে পড়ো।' জবাবে সালার তাকে টেক্সট করল।

: বাবা! আমি ভাবছি রাইসা ও ইনায়ার বিয়ের আগে আমার বিয়ে করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে আপাতত যেহেতু জিবরিলের বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

সালার তার এই কথায় চমকাল। তার কথা অতটাও অনর্থক নয়, যতটা সে ভাবছিল। রাতের এই সময়ে মুভি, মুভি থেকে নিজের বিয়ে আর নিজের বিয়ে থেকে ইনায়া ও রাইসার বিয়ের আলাপ তুলে বসেছে। তার মানে কিছু হয়েছে। কিন্তু কী? সালারকে এখন তা খুঁজে বের করতে হবে।

: 'তো?' পরের টেক্সটে সালার তার মুখ থেকে আরও কিছু বের করার জন্য যেন টোপ ফেলল। উত্তর বেশ দেরি করেই এলো। তার মানে হামিন এখন ভেবেচিন্তে টেক্সট করছে। তারা দুই বাপবেটা যেন দাবার ঘর সাজিয়ে বসে পড়েছে।

: 'তাহলে এখন আমাদের ইনায়া ও রাইসার ব্যাপারে কিছু ভাবতে হবে।' উত্তর ভেবেচিন্তে এলো। কিন্তু অস্পষ্ট।

: 'রাইসার ব্যাপারে নাকি ইনায়ার ব্যাপারে?' সালার একদম সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করল। হামিন হয়তো বাবার কাছে এমন সরাসরি প্রশ্নের আশা করেনি। এ ইমামা নয় যে, যাকে সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলবে। এ সালার সিকান্দার, যে তার মতোই মুহূর্তেই কথার গভীরে পৌঁছে যায়।

: 'রাইসার ব্যাপারে।' অবশেষে তাকে হার মেনে খোলাখুলি বলতে হলো। উত্তরটি সালারের জন্য অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অবাক হচ্ছে এই আলোচনার টাইমিং দেখে।

:* তুমি কি নিজেই রাইসার জন্য কথা বলছ, নাকি রাইসা তোমাকে কথা বলতে বলেছে?' সালারের পরের মেসেজটি

আগের চেয়েও ডিরেক্ট। হামিনের উত্তর এবার আরও দেরিতে এলো।

: আমি নিজেই করছি।

তার উত্তর সালারের বিশ্বাস হলো না।

: 'রাইসা কি কোথাও ইনভলভড?' সালার পরের টেক্সটটি করল। উত্তর আবারও দেরিতে এলো। হঠাৎ সালারের মনে হলো, এই কথোপকথনটি দুজনের মধ্যে হচ্ছে না, তিনজনের মধ্যে হচ্ছে। রাইসাও তাদের সঙ্গে যুক্ত। আর এই দেরির কারণ হলো, টেক্সটগুলো রাইসাকে পাঠিয়ে, তার থেকে উত্তর শুনে এরপর হামিন সালারকে বলছে। এটা তাদের ছোট থেকেই অভ্যাস। একে অপরের জন্য দোভাষীর ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা বেশিরভাগ রাইসাই তার জন্য পালন করত।

: 'কেউ কি তাকে পছন্দ করে?' উত্তর দেৱিতে এলো। কিন্তু তার ডাইৱেক্ট প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে তা ডিপ্লোমেট্ৰিক ভঙ্গিতে এলো। কথা বলার এই ভঙ্গি হামিনেৰ নয়, ৱাইসাৰ।

: 'কে পছন্দ করে? হিশাম?' সালার অত্যন্ত শান্তভাবে টেক্সট কৰল। সে বুঝতে পাৰছে, তার এই পালটা প্ৰশ্নটি তাদের দুই ভাই-বোনের পায়েৰ নিচ থেকে কিছুক্ষণেৰ জন্য মাটি সৰিয়ে দিয়েছে। তারা ধারণা কৰতে পাৰেনি, তাদের ব্যাপারে সালার এতটা অবগত। আশানুৰূপ একটি দীৰ্ঘ বিৱতিৰ পৰ পুৰো মুখ খোলা একটি হাসিৰ ইমুজি এলো। 'গুড শট।' এটা ছিল হামিনেৰ উত্তৰ।

: 'ৱাইসাকে বলো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে। হিশামেৰ ব্যাপারে সামনাসামনি বসে কথা হবো। আমি এখন বিশ্রাম নেব। তোমরা এখন আমাকে আৰ কোনো টেক্সট কৰো না।' সালার হামিনকে একটি ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে ফোন রেখে দিল। সালার জানে,

এরপর তারা সত্যিই ভূতের মতো গায়েব হয়ে যাবে, বিশেষ করে রাইসা।

১৩

রাইসা যদি তার জীবনী লিখতে বসে, তাহলে সে এটা অবশ্যই লিখবে যে, সে অনেক সৌভাগ্যবান। যার জীবনেই তার আগমন ঘটে, তার জীবনই বদলে যায়। সে যেন পরশ পাথর, যে-ই তাকে ছোঁয়, সে-ই সোনা হয়ে যায়।

সালার সিকান্দারের পরিবারের অংশ হওয়ার পর সে তাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এখন হিশামের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর, সৌভাগ্যের বাতাস হিশামকেও ছুঁয়ে

যাচ্ছে। বাহরাইনের সেই বিমান দুর্ঘটনায় যুবরাজসহ রাজপরিবারের যে সদস্যদের মৃত্যু হয়েছে, তারা মূলত ছিল বাহরাইনের সিংহাসনের পরবর্তী যোগ্য দাবিদার। আর যে যুবরাজটি বেঁচে আছে, সে একদম তরুণ, অনভিজ্ঞ এবং জনসাধারণের থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া নিহত আমিরের বিশেষ মহল এই তরুণকে আগে থেকেই ভীষণ অপছন্দ করে। হিশামের বাবা সাবাহ বিন জাররাহ স্বপ্নেও ভাবেননি যে, যুবরাজ ও রাজপরিবারের সদস্যদের দাফন করতে এসে, রাজত্বের 'হুমা' পাখিটি তার মাথায় এভাবে এসে বসবে!

বাহরাইন কাউন্সিলের এক জরুরি অধিবেশনে যুবরাজকে পদ থেকে অপসারণ করে, সিংহাসনের দাবিদারদের তালিকা করা হলো। সেই তালিকার একদম নিচের সারিতে থাকা সাবাহকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বাহরাইনের নতুন আমির হিসেবে মনোনীত করা হলো। এই পদে তাকে সাময়িকভাবে অধিষ্ঠিত করা হলো। কিন্তু পরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কাউন্সিল তাকে চূড়ান্তভাবে আমির হিসেবে ঘোষণা করে।

যুবরাজের মনোনয়ন কাউন্সিলের পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। এই সংবাদটি হামিন রাইসাকে শোনালা। সংবাদটি এতটাই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ছিল যে, রাইসা প্রথমে তা বিশ্বাসই করতে পারেনি। আর বিশ্বাস হতেই সে প্রচণ্ড উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

: 'আর দুঃসংবাদটি কী? সেটাও বলে দাও।' হামিনকে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'হিশাম ও তোমার বিয়েতে এখন অনেক বাধা আসবে। কেবল তার পরিবার থেকে নয়, বরং পুরো রাজপরিবার থেকেই।' হামিন কোনো ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি বলল। চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও রাইসা চুপ হয়ে গেল।

: তাদের আপত্তি তো হবে না যে, আমি দত্তক?

: 'আপত্তি কেন হবে? আমার মনে হয় না আমার বাবা-মা এতটা সংকীর্ণমনা যে, এসব ব্যাপারে আপত্তি করবে।' হিশাম নির্দ্বিধায় বলল। 'আমি আমার বাবা-মাকে খুব ভালো করেই জানি।'

দুই সপ্তাহ পর হামিনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ নির্ধারিত হলো। কিন্তু তার আগেই জরুরি ভিত্তিতে হিশামকে পুনরায় বাহরাইনে চলে যেতে হলো। তার বাবাকে কাউন্সিলের একমত্যে আমির পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর হিশামকে বাহরাইনের নতুন যুবরাজ ঘোষণা করা হয়েছে। একটি বিশেষ ফ্লাইটে হিশামকে ওখানে তলব করা হলো। সেখানে পৌঁছে এই সংবাদ পেতেই সে, সবার আগে রাইসাকে ফোন করল। হিশাম ভীষণ খুশি। কিন্তু রাইসা চেয়েও খুশি হতে পারল না। হিশাম একজন সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ মানুষ হয়ে গিয়েছে। হামিনের কথাগুলো এখন রাইসার কানে গুঞ্জনিত হচ্ছে।

হিশাম খুব ব্যস্ত। তাদের মধ্যে কেবল এক-দেড় মিনিট কথা হলো। কল কাটতেই রাইসার মাথায় অসংখ্য চিন্তা এসে ভিড়

করল। পরিদের গল্পে সে বিশ্বাসী নয়, কারণ যে পরিবারে তার জন্ম, সেখানে পরিদের কোনো গল্প ছিল না। সেখানে ঐক্য ও বিপ্লবের কোনো চিহ্ন ছিল না। ক্যারিয়ার, জীবন, পরিচয়; সবকিছু পরিশ্রম করে গড়ে তুলতে হয়। আর এখন রাইসার সামনে ভেসে ওঠা পরিদের গল্পটিও মরীচিকা মনে হচ্ছে।

সে একজন আরব আমেরিকানকে বিয়ে করতে চাচ্ছে। একজন আরব বাদশাকে নয়। ঐশ্বর্যের কোনো লালসা তার নেই। তার জীবনের লক্ষ্যও ভিন্ন কিছু। কিছুদিন আগেও তার ও হিশামের জীবনের লক্ষ্য একই ছিল। এখন সেটি মুহূর্তে রেললাইনের দুটি বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে। দুদিকে বেঁকে গেছে দুজন। সে এখন প্রচণ্ড বাস্তবসম্মত হয়ে হামিনের কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল। কথাগুলো সে তখন বলেছিল, যখন সে যুবরাজ হয়নি। আর এখন যুবরাজ হওয়ার পর হামিন হিশামের ব্যাপারে কী ভাবছে, রাইসা তা জানে।

সে রাতে হিশামের ব্যাপারে এই সংবাদও হামিনই তাকে দিয়েছিল। রাইসা তখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর হামিন তখন একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে মন্ট্রিয়ালে ছিল।

: 'আমি জানি।' উত্তরে হামিন তাকে টেক্সট করেছিল।

: 'তোমাকে আমার মুবারকবাদ দেওয়া উচিত নাকি আফসোস করা?' উত্তরে টেক্সট এসেছিল। হামিন তার মেজাজ সম্পর্কে জানে। রাইসা হেসে ফেলল।

: 'তোমার মতামত কী?' জবাবে রাইসা জিজ্ঞেস করল।

দুঃখজনক।

: জানি।

হামিন এবার তাকে কল করতে লাগল।

: 'এতটাও দুঃখ পাওয়ার মতো বিষয় নয়।' রাইসার গলা শুনতেই হামিন হাসি মুখে বলল। সে তার গলা শুনেই মন পড়ে ফেলতে পারে।

: 'না, দুঃখী তো নই। ব্যস এসব অপ্ৰত্যাশিত, তাই...' রাইসা তার কথা অর্ধেক ফেলে রাখল।

: 'আমার জন্য অপ্ৰত্যাশিত নয়, আমার ধারণা ছিল আগে থেকেই।' হামিন উত্তরে বলল।

: 'তো এখন...?' রাইসা আবারও অর্ধেক প্রশ্নে তার কাছে সমস্যার সমাধান

চাইল।

: 'তুমি বলেছিলে, এই প্রস্তাব নিয়ে তুমি অতটা উচ্ছ্বসিত নও।'
হামিন শান্তভাবে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে দৃশ্যের অন্ধকারতম
দিকটি দেখাল। অর্থাৎ হিশামকে ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

: 'তুমি সত্যিই এমনটা ভাবছ?' রাইসার যেন বিশ্বাস হলো না।
'তোমার কি মনে হয়, আমাদের বিয়ে হতে পারে না?'

: 'হতে পারে। কিন্তু তার বিয়ে শুধু তোমার সঙ্গেই হবে এবং
তোমার সঙ্গেই থাকবে, এ নিয়েই আমার বড় সমস্যা। আরব
বাদশা, হেরেমের মালিক।' হামিন যেন তার কথা দিয়ে রাইসার
সামনে কল্পনার আরও একটি দিক মেলে ধরল।

: 'আমি জানি।' রাইসা শান্ত স্বরে বলল। তারপর পরবর্তী বাক্যেই
যেন তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল, 'কিন্তু হিশামের বাবা
রাজপরিবারের হওয়া সত্ত্বেও কখনো দ্বিতীয় বিয়ে করেনি।'

: 'তিনি আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে ছিলেন, যুবরাজ হয়ে কখনো ছিলেন না।' হামিন পিঠাপিঠি উত্তর করল। দুজনের মাঝে নীরবতার এক দীর্ঘ বিরতি এলো।

: 'so it's all over? তাহলে সব শেষ?' অবশেষে সে হামিনকে জিজ্ঞেস করল। হামিনের হৃদয়ে কেমন এক অনুভূতি হলো। এটি রাইসার প্রথম ভালোবাসা। এর আগে সে কখনো ভালোবাসেনি। কিন্তু হামিন প্রথম ভালোবাসার পরিণতি বহুবার দেখেছে। এখন রাইসাকে সেই পরিণতির মুখোমুখি দেখে কষ্ট অনুভব করছে।

: 'তোমার মন তো ভাঙবে না?' হামিন ভীষণ চিন্তিত স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করল।

রাইসার বুক ফেটে কান্না এলো।

: 'ভেঙে যাবে, তবে আমি তা সয়ে নেব।' ধরা গলায় রাইসা তার অশ্রু মুছতে মুছতে বলল। হামিনের হৃদয় আরও বিগলিত হলো।

: 'সারা দুনিয়ায় তুমি একেই পেয়েছিলে?' হামিন দাঁতে দাঁত চেপে রাইসাকে বলল। 'বিয়ে কোনো সমস্যা নয় রাইসা! সমস্যা হলো, সামনের জীবন নিয়ে। এই সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই।' হামিন হার মানা সত্ত্বেও পুনরায় তাকে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। রাইসা চুপ হয়ে গেল। কল কেটে গেল। কিন্তু হিশাম না রাইসার মাথা থেকে মুছে গেল, আর না হামিনের।

পরের দিনের সংবাদপত্র কেবল বাহরাইনের নতুন আমির আর নতুন যুবরাজের ছবি ও সংবাদে ভরে ফেলেনি; বরং তাতে নতুন যুবরাজ হিশাম বিন সাবাহের বাগদানেরও সংবাদ ছিল। সদ্য দুর্ঘটনায় নিহত বাহরাইনের আমিরের নাতনির সঙ্গে তার

বিয়ের এলান। সংবাদটি বাইসা ও হামিন দুজনেই পড়ল। কিন্তু।
বলল না। একে অপরকে

১৪

'কেউ একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।' পরের দিন
ভোরে অফিসার এসে তাকে বলল।

সারা রাত লকআপে বিনিদ্রায় কাটিয়ে, সকালে নাশতার পর
এক কাপ কফি হাতে নিয়ে বসে আছে সে। এমন সময়
লকআপের দরজা খুলে তার হাতে একটি কার্ড ধরিয়ে দিল।
কার্ডে লেখা নামটি দেখে আয়েশা আবেদিনের ইচ্ছে করল,
হায়! এখানে যদি কোনো জায়গা হতো, তাহলে নিজেকে



সেখানে লুকিয়ে ফেলতাম। না জানি ওই মানুষটির সামনে তাকে আর কত অপদস্থ হতে হবে! দুনিয়া থেকে গায়েব হওয়ার ইচ্ছে জীবনে সে বহুবার করেছে। কিন্তু লজ্জায় ডুবে যাওয়ার এই প্রথম করছে।

একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে জিবরিল এখানে এসেছে। এখন একজন উকিলের সঙ্গে বসে আছে। তাদের হাতে জামিনের কাগজপত্র। তাতে তার স্বাক্ষর প্রয়োজন। জিবরিল ও তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক দুয়েক বাক্য বিনিময়ে হলো। কেউ কারও চোখাচোখি হলো না। তারপর উকিলের সঙ্গে আয়েশা কথা বলতে লাগল। কাগজপত্র, স্বাক্ষর, আর তারপর তার মুক্তির সংবাদ দেওয়া হলো। প্রচণ্ড নীরবতা ও হালকা বৃষ্টি ফোঁটার মাঝে পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে, পার্কিংয়ে গাড়ির দিকে এলো।

: 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার জন্য আপনাকে বারবার সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনাকে ফোন করা উচিত

হয়নি নিসার। আমি কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে নিতাম। এটা এত বড় কোনো সমস্যা ছিল না।" গাড়ির সামনের সিটে তার পাশে

বসে আয়েশা এই প্রথম নীরবতা ভাঙল। কথাগুলো সে তার দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলে চলল। জিবরিল ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। আয়েশা যদি শেষ বাক্যটি না বলত, তাহলে জিবরিল কখনো বিশ্বাস করত না যে, আয়েশা সত্যিই মানসিক চাপে আছে। আয়েশা তার বিরুদ্ধে আনীত পেরেন্টাল নেগ্লিজেন্স, পিতা-মাতার অবহেলার অভিযোগে হত্যা মামলাকে মামুলি বিষয় বলছে।

: 'আপনি কিছু খেয়েছেন?' প্রত্যুত্তরে জিবরিল তাকে জিজ্ঞেস করল। আয়েশা মাথা নাড়ল। আয়েশা এখন তাকে কাছাকাছি কোনো বাস স্টপ বা ট্রেন স্টেশনে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলছে। জিবরিল গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে তার নির্দেশনা শুনল এবং 'ঠিক আছে' বলে উত্তর করল। কিন্তু আয়েশা

যেখানে নামিয়ে দিতে বলেছিল, সেখানে সে থামল না। সোজা তার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে চলে গেল।

আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করল না যে, তার অ্যাড্রেস কীভাবে জানল। বরং ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নামতে লাগল। জিবরিল তখন বলল, 'এক কাপ কফি হবে?'

আয়েশা থমকাল। এবং এই প্রথম তার মুখের দিকে তাকাল।

: 'বাসার কফি শেষ হয়ে গিয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে আমি বাজার-সদাই করতে পারিনি।' বলতে বলতে আয়েশা নেমে পড়ল।

: 'আমি চাও পান করি।' জিবরিল তাকে আবারও আটকাল।

: 'আমি চা পান করি না, তাই আনিওনি।' আয়েশা এবার তার দিকে না তাকিয়েই

বলল।

: 'পানি তো আছে আপনার বাসায়?' জিবরিল তার পাশের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে, গাড়ির ছাদের উপরে ঝুঁকে তাকে বলল। এবার আয়েশা কেবল তার দিকে তাকিয়ে রইল।

অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসেছে তারা। তার অ্যাপার্টমেন্ট এতটা পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে গোছানো যে, ভেতরে ঢুকতেই জিবরিল কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। গত কয়েকদিন আয়েশা যে পরিস্থিতির শিকার ছিল, তাতে অ্যাপার্টমেন্টের দৃশ্য অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল। এলোমেলো, অগোছালো।

: 'আপনার রুচি ভীষণ উন্নত।' আয়েশাকে সে না বলে থাকতে পারল না। উত্তরে আয়েশা কিছুই বলল না। লং কোর্ট খুলে তা দরজার পেছনে ঝোলাতে ঝোলাতে সোজা কিচেন এরিয়ায় চলে গেল। সেখানে এক কেবিনেট খুলে কফির বয়াম বের করল। তারপর পানি গরম করতে লাগল।

জিবরিল লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে জায়গাটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এখানে আগত যে-কেউই এই জায়গাটি দেখে বলতে পারবে, এই বাড়িতে একটা বাচ্চা ছিল। যে ছিল এই ঘরে বসবাসকারী মানুষগুলোর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

লাউঞ্জে বানানো প্লে এরিয়াতে আসফান্দের খেলনা পড়ে আছে। দেওয়ালের এখানে-সেখানে আয়েশা ও তার ছবি লেগে আছে। জিবরিল সেগুলো থেকে চোখ লুকাল। জানে না, এই অপরাধবোধকে সে কী বলবে? আয়েশার সন্তানকে ঘিরে মনে জাগ্রত এই পরিতাপের অনুভূতিকে কী করবে? জিবরিল পেছন ফিরে আয়েশার দিকে তাকাল। সে ভীষণ যান্ত্রিকভাবে তার জন্য কফি বানাচ্ছে। যেন সে কোনো ওয়েটার। পরিপূর্ণ ধ্যানমগ্ন হয়ে এক একটি জিনিস ট্রেতে সাজাতে সাজাতে পরিপার্শ্ব থেকে বেখবর হয়ে আছে। এমনকি জিবরিল যে ওখানে আছে, সেটাও।

কফির ট্রে নিয়ে সে লাউঞ্জে চলে এলো। সেন্টার টেবিলে তা রেখে, চুপচাপ সোফায় বসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'সুগার?'

: 'কফি আমার কাছে তেতো লাগে না।' জিবরিল তার থেকে কিছুটা দূরে বসে পড়ল।

: 'ক্রিম, মিল্ক?' আয়েশা এখন সুগারপট রেখে ট্রেতে বিদ্যমান বাকি দুটি জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে।

: 'এটাও না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে হসপিটালের জন্য বের হতে হবে।' জিবরিল এখন বেশি কিছু না বলে কফির কাপ তুলে নিল। পিনপতন নীরবতায় কফি পান করল। তারপর কাপ পুনরায় টেবিলে রেখে পকেট থেকে একটি খাম বের করল। সেটি তার হাতে দিতে দিতে বলল, 'আমি যাওয়ার পর এটি আপনি খুলবেন। তারপর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে এই হলো আমার নম্বর।' জিবরিল দাঁড়াতে দাঁড়াতে, পকেট থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে, টেবিলের উপর

সেই খামের পাশেই রাখল। 'যদিও আমি জানি যে আপনি প্রশ্ন করেন না, আমাকে ফোনও করবেন না। তারপরও এটি পড়ার পর আপনার যেকোনো প্রশ্নের অপেক্ষা থাকবে।'

আয়েশা চুপচাপ টেবিলে পড়া সেই খাম ও কার্ডের দিকে তাকাল। তারপর তাকাল, দাঁড়ানো জিবরিলের দিকে। পৃথিবীতে এমন ভদ্র-মার্জিত পুরুষ কোথায় পাওয়া যায়! সামনের পুরুষটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল। আর যদি পাওয়া যেয়ে থাকে, তাহলে তাদের কেউ কেন তার ভাগ্যে এলো না? আয়েশা নিজেও এখন

দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিবরিলকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, ফিরে এসে জানালার কাচ গলে পার্কিংয়ের দিকে তাকাল। খানিক পর সেখানে জিবরিলকে উদয় হতে দেখল। গাড়িতে না বসা পর্যন্ত আয়েশা তার দিকে তাকিয়েই রইল। তারপর টেবিলে পড়া

সেই খামটির দিকে এলো। সাদা খামটি হাতে নিয়ে তাতে জিবরিলের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা নিজের নামটি পড়ল, 'মিস আয়েশা আবেদিন।' অতঃপর খামটি খুলে ফেলল।

১৫

জিবরিল টেবিলের অপর পাশে বসা লোকটিকে গভীরভাবে লক্ষ করল। তাকে নিজের চেয়ে কয়েক বছরের বড় মনে হচ্ছে। অসম্ভব মানসম্মত চেহারা-সুরতের গান্ধীর্ষপূর্ণ এক পুরুষ। একদম ক্লিন সেভ। যদিও জিবরিলের কল্পনায় সে ছিল শ্মশ্রুমণ্ডিত এক পুরুষ। ওয়েটার তাদের সামনে কফি রেখে চলে যেতেই আহসান সাদ কথা বলতে শুরু করল।

: 'আমার ব্যাপারে আপনি হয়তো অনেক কিছুই শুনেছেন, আমার সাবেক স্ত্রীর কাছে।' তার কথার সুরে এক অদ্ভুত তুচ্ছতা ও বিশ্বাস মিশে আছে। সেই সঙ্গে ঠোঁটজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এক বিদ্রূপমাখা শীতল হাসি। দেখা করার আগে আহসান সাদ কলে জিবরিলকে না পেয়ে, এমনই একটি মেসেজ কাগজে লিখে রেখে গিয়েছিল। 'আমার সাবেক স্ত্রীর ব্যাপারে তোমাকে কিছু বলতে চাই।' ছয় ঘণ্টা অপারেশন থিয়েটারে দাঁড়িয়ে থেকে, কাগজে লেখা এই বাক্যটি পড়তেই জিবরিলের মাথা মুহূর্তের জন্য ঘুরে গিয়েছিল। যে রিসেপশনিস্ট আহসান সাদের ওই বার্তাটি লিখেছিল, সে চিরকুটটি জিবরিলের হাতে দেওয়ার সময় ভীষণ অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। সেটি ছিল এক প্রচণ্ড অবমাননাকর বাক্য। ওই বাক্যটি পড়ে যেকেউই জিবরিলের ব্যাপারে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভাবতে পারে। জিবরিল ও সাদের সাবেক স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে সংশয়মূলক কল্পনা করতে পারে-এই হসপিটালের স্টাফদের মধ্যে জিবরিল সিকান্দার অসম্ভব স্বচ্ছ চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও।

: 'আর ইউ শিওর দিস ইজ ফর মি? তুমি কি নিশ্চিত এটি আমার জন্য?' একটি পাকিস্তানি নাম দেখেও বার্তাটি পড়ে রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস না করে পারল না। সেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি না আহসান সাদকে চেনে, আর না তার সাবেক স্ত্রীকে। চিরকুটে আহসান জিবরিলের সঙ্গে ইমারজেন্সি দেখা করতেও চাচ্ছে। জিবরিল ভেবেছিল রিসেপশনিস্ট মেয়েটির হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে।

: 'ওহ ইয়াহ আই এম প্রিটি শিওর।' মেয়েটি জবাবে বলল। দ্বিধাশ্রিত মনে চিরকুটটি নিয়ে জিবরিল কাপড় বদলাতে গেল। কাপড় বদলে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিরকুটে লেখা নম্বর তুলে আহসান সাদকে কল করল। সাথে সাথেই কল রিসিভ হলো। যেন সে এর অপেক্ষায় বসে ছিল। জিবরিল কিছু বলার আগেই সে জিবরিলের নাম উচ্চারণ করল। এক মুহূর্ত বিরতির পর তাকে সত্যায়ন করে জিবরিল 'ইয়েস' বলল।



: 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।
কয়েকদিনের জন্য আমি এখানে আছি। তারপর চলে যাব।'
আহসান সাদ দ্রুত বলল।

: 'কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা বলতে চান?
আমি আপনাকে চিনি না।' চিরকুটের বার্তাটি পড়া সত্ত্বেও
জিবরিল জিজ্ঞেস না করে পারল না।

: আমি আয়েশার ব্যাপারে কথা বলতে চাই।

আহসান সাদের উত্তরে জিবরিল স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার
জল্পনা-কল্পনাতেও ছিল না, আয়েশার স্বামী তার সঙ্গে
যোগাযোগ করবে। আহসান সাদের নাম সে নিসা কিংবা
আয়েশা, কারও কাছেই শোনেনি। আর না আসফান্দের দাফন
কার্যের সময় অন্য কারও কাছে। জিবরিল তখন দশ-পনেরো
মিনিট থেকে, নিসা ও ডাক্তার নওরীনের কাছেই সমবেদনা
জানিয়ে চলে এসেছিল। আহসান সাদ ওখানে থেকে

থাকলেও, তাদের দুজনের কোনো দেখা হয়নি। আর এখন হুট করে, শুধু শুধুই তাকে কেবল কলই করছে না, বরং দেখা করে আয়েশার ব্যাপারে কথাও বলতে চাচ্ছে। কিন্তু কী কথা?

: 'আয়েশা আবেদিন?' জিবরিল অত্যন্ত সংযত স্বরে তাকে জিজ্ঞেস করল; এটি আয়েশা আবেদিনের স্বামী নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও। কেননা, এই মুহূর্তে অন্য কোনো আয়েশার কথা তার মনে পড়ছে না, যার স্বামী তার সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন অনুভব করবে। যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা তো সে আয়েশা আবেদিনের স্বামীর কাছেও প্রত্যাশা করেনি।

: 'হ্যাঁ, ডাক্তার আয়েশা আবেদিন।' অপর পাশ থেকে আহসান সাদ প্রচণ্ড রুদ্ধ গলায় বলল।

: 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাচ্ছেন?' জিবরিল জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না। 'আমি আপনাকে ভালো করে চিনিও না।'

: 'আপনি আমাকে ভালো করে চিনতে না-ই পারেন। কিন্তু আমার সাবেক স্ত্রীকে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই চেনেন। এজন্যই তো তার জন্য উকিলের ব্যবস্থা করছেন। তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনছেন।'

জিবরিল চুপ রইল। আহসান সাদের বিদ্রূপে কেবল অপমানই নয়, অবগতিও রয়েছে। সম্পূর্ণ খোঁজখবর নিয়েই সে তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

'আমি আপনার হসপিটাল থেকে খুব দূরে নই। তাছাড়া আপনার খুব বেশি সময়ও নেব না। কারণ, আপনিও ব্যস্ত, ফালতু সময় আমার কাছেও নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করার জরুরি, একজন মুসলমান হিসেবে আপনাকে বিপদ সম্পর্কে অবগত করাতে চাই। আমার ভুলটি যেন আপনিও করে না বসেন, তাই।' আহসান সাদ অনেক দীর্ঘ কথা বলছে, তার কথা শুনতে শুনতে জিবরিল ভাবল।

কিন্তু তার আগেই জিবরিল তার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। আহসানের সঙ্গে দেখা করে সে তাকে, কেইস তুলে নিতে বলতে চাচ্ছে। মনে মনে সে আহসানকে বুঝিয়ে সমাধানে নিয়ে আসার কথা ভাবছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হতেই পারে, তবে একতরফা ভুল তো শুধু স্বামীর হয় না। একজন পুরুষ হিসেবে জিবরিলেরও ধারণা, সমস্ত ভুল আহসানের নয়। কিছু ভ্রুটি আয়েশা আবেদিনেরও আছে হয়তো। আহসানের পরিবার কঠোর ধার্মিক হওয়ায়, জিবরিলের মন তাদের পক্ষ নিচ্ছে। জিবরিলের বিশ্বাস, সবার কাছে যেমন শুনছে, তেমন কঠোর আহসান হতে পারে না। ভেতরে ভেতরে একটু পক্ষপাতিত্ব সে আহসানের প্রতিও করছে। কারণ, আহসান তো তার মতোই হাফেজে কুরআন। যার হৃদয়ে কুরআন আছে, সে এতটা কঠোর ও নির্দয় হতে পারে না। তার বিশ্বাস, ভুলের চেয়ে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটাই ছিল বেশি।

আহসানকে বুঝিয়ে, তাদের মধ্যে মীমাংসা করার নিয়তে সে অবশেষে তার সঙ্গে দেখা করল। মুসাফাহা করে, কফি পান করতে টেবিলে বসল। আর ধীরে ধীরে তার সুধারণা হাওয়া হতে লাগল।

: 'আপনার ব্যাপারে আয়েশা কখনো আমাকে কিছু বলেনি।' জিবরিল তার দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বলল। আহসান সাদ হো হো করে হেসে উঠল। জিবরিল তার কথা শেষ করতে পারল না। তার বুঝে এলো না, তার কথায় হাসার মতো কী আছে!

: 'বোকা কিংবা বাচ্চা, কোনোটাই নই আমি।' হাসি শেষে আহসান তাকে বলল।

: 'আমি বিশ্বাস করি, তুমি বোকা কিংবা বাচ্চা কোনোটাই নও। আমি এমনটা মনে ও করি না।' উত্তরে জিবরিল অত্যন্ত সংযত স্বরে বলল।

: 'তাহলে আমার সঙ্গে বাচ্চাদের মতো ব্যবহার করবেন না' আহসান সাদ তার কথায় হস্তক্ষেপ করে বলল। তার গলা এখন উঁচু হয়ে উঠেছে। কপালে ভাঁজ ও ঠোঁটে কঠোরতার আভাস। কফির কাপটি সে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। এতে কিছুটা কফি ছলকে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল। তার দুই হাত এখন মুষ্টিবদ্ধ হয়ে, টেবিলে পড়ে আছে। মুহূর্তেই আহসান গিরগিটির মতো রং বদলাতে শুরু করেছে। এখন তাকে প্রচণ্ড রাগান্বিত দেখাচ্ছে। কিন্তু জিবরিল বুঝতে পারছে না, এই কয়েকটি বাক্যে কী এমন ছিল যে, সে এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে!

: 'তুমি ওই নারীর জামিন হয়েছ, আর আমাকে বলছ, সে তোমাকে আমার ব্যাপারে কখনো কিছু বলেনি।' তার আওয়াজ এখন আগের চেয়ে উঁচু হয়ে পড়েছে। আশেপাশের টেবিলে বসা লোকেরা ঘাড় ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকাল। জিবরিল এক পলক আশেপাশের চোখগুলোকে দেখল। তারপর অত্যন্ত শীতল গলায় তাকে বলল, 'তুমি যদি আমার সাথে এই ভাষা ও ভঙ্গিতে কথা বলো, তাহলে আমি আর অতিরিক্ত এক মিনিটও

নষ্ট করতে চাইব না।" বলতে বলতে জিবরিল এক হাতে তার ওয়ালেট বের করল। অপর হাত শূন্যে উঁচিয়ে ওয়েটারকে ইশারা করল। আহসান সাদ হুট করে বুঝতে পারল, সামনের মানুষটিকে সে ভুলভাবে হ্যাণ্ডেল করার চেষ্টা করছে।

: 'আমি আমার সন্তানের মৃত্যুর ফলে এতটা ফ্রাস্টেটেড যে... আই এম সরি।' আহসান পর মুহূর্তেই গিরগিটির মতো পুনরায় রং বদলাল। এখন তার গলা নরম। মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে পড়েছে। এক হাতে মাথা ও কানের গোড়া রগড়াচ্ছে।

জিবরিল তার এই পরিবর্তন, প্রথম পরিবর্তনের মতোই গভীরভাবে খেয়াল করল। তার এক্সকিউজ গ্রহণ করল।

: 'তুমি আমার মুসলিম ভাই, তাই যে ধোঁকা আমি খেয়েছি, তা থেকে তোমাকেও বাঁচাতে চাচ্ছি।' তারপর পরবর্তী বাক্যটি জিবরিলের মাথার ওপর দিয়ে গেল। আহসান সাদ এখন প্রচণ্ড

কোমল ও শান্ত স্বরে কথা বলছে। জিবরিল তাকে না থামিয়ে বলতে দিল।

'আমার স্ত্রী একজন বদকার মহিলা। তোমাকে যেভাবে দুঃখের কাহিনি বলে বোকা বানিয়েছে, তেমনিভাবে তোমার আগেও বহু লোককে বানিয়েছে। যেকোনো পুরুষকে সে কয়েক মিনিটে মুঠোয় পুরে, আঙুলের ডগায় নাচাতে পারে।'

তার কথায় আয়েশার প্রতি এতটা বিষ মিশে আছে যে, জিবরিল স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পরিচিত পরিমণ্ডলে তালাক হয়, ব্রেকআপ হয়, কিন্তু কেউ তার স্ত্রীর ব্যাপারে এভাবে কথা বলে না; আহসানের মতো এত জঘন্যভাবে।

: 'আয়েশার সঙ্গে আমার কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিল না। আর আমি বুঝতে পারছি না, তোমার কথাগুলোকে আমি অপবাদ বলব নাকি ভুল বোঝাবুঝি? জিবরিল হস্তক্ষেপ না করে পারল না।

: 'এটা বাস্তবতা।' আহসান উত্তরে বলল।

: যাই হোক, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আয়েশা অনেক ভালো একটি মেয়ে। আর তাকে আমি সাহায্য করেছি, কারণ তার বোন আমার ক্লাসমেট।

আহসান তাকে থামিয়ে দিল।

: তুমি তার বোনকে চিনো হয়তো, কিন্তু এই মহিলাকে নয়। এই দুশ্চরিত্রা, চতুর নারীকে নয় : 'মুখে লাগাম দাও।' জিবরিলের চেহারা ও কানের লতি একসঙ্গে লাল হয়ে উঠল। আহসানের কাছে সে এমন শব্দের প্রত্যাশা করেনি।

: 'তুমি যদি ওই মহিলাকে চিনে থাকতে, তাহলে এসব শব্দে তোমার কোনো আপত্তি থাকত না। সে এরচেয়ে জঘন্য শব্দের উপযুক্ত।' আহসানের জবান ওভাবেই চলতে থাকল।

: 'সে যদি তোমার স্ত্রী হয়ে থাকে, তাহলে তোমার এক বাচ্চার মাও। সে অন্তত তোমার কাছে এসব শব্দ ডিজার্ড করে না। স্ত্রী খারাপ হতে পারে, মা-ও খারাপ হতে পারে, কিন্তু নারীর একটা সম্মান থাকে, অন্তত সেই সম্মানটুকু দেখাও তাকে।' জিবরিল অত্যন্ত শান্ত মেজাজের মানুষ। কিন্তু যেসব কথা সে শুনছে, তা একজন শান্ত মেজাজের মানুষকেও উত্তেজিত করতে যথেষ্ট। 'যে নারী স্ত্রী হয়ে ছিল, তার সম্মান কতটুকু?'

আহসান কোনো উত্তর দিল না। তার নিকৃষ্ট মন-মানসিকতা জিবরিলের সামনে উলঙ্গ করে দিল।

'তোমার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে। করুণা হচ্ছে সেই নারীটির প্রতি, যে তোমার স্ত্রী ছিল।' জিবরিল অত্যন্ত শীতল গলায় তাকে বলল। এদিকে আহসান এখন বুঝতে পারছে, ভুল মানুষকে বোঝাতে এসেছে সে।



: 'তার সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ নেই, তাহলে তোমার কেন কষ্ট হচ্ছে?' জবাবে আহসান সাদ এক বলসানো মুচকি হেসে বলল। 'তাছাড়া তুমি তাকে কতটাই-বা জানো যে, একজন স্বামীর মতামতকে অস্বীকার করছ?'

: আমি তাকে তার ষোলো বছর বয়স থেকে জানি। তাকে এবং তার পরিবারকেও। সে খুব ভালো মেয়ে ছিল এবং আছে।

এক মুহূর্তের জন্য আহসান সাদের চেহারার রং পালটে গেল।

: সো আই ওয়াজ রাইট, ইট ওয়াজ অ্যা ওল্ড অ্যাফেয়ার। তার মানে আমি ঠিকই ধরেছিলাম, এটি একটি পুরোনো সম্পর্ক।

: শাট আপ। ইউ আর সিক। বাজে বকা বন্ধ করো। তুমি একটা উন্মাদ।

জিবরিলের এখন মাথাব্যথা অনুভব হচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সেও আহসানের মতো গালাগালি শুরু করে দেবে। এই লোক যে-কাউকে উত্তেজিত করতে সক্ষম। যে-কাউকে সে পাগল বানিয়ে ফেলতে পারবে।

: 'তুমি আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছ?' বিল জ্যাকেটে বিল রাখতে রাখতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল জিবরিল। সে এখান থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছে, এটা যেন তারই ইঙ্গিত।

: আমি তোমাকে শুধু ওই নারীর ব্যাপারে বলতে এসেছি যে...।

জিবরিল অত্যন্ত রুঢ়ভাবে তার কথা থামিয়ে দিল।

: আমি তার সত্তা কিংবা চরিত্রের ব্যাপারে কথা শুনতে আগ্রহী নই। একদমই নই। কারণ সে কী, কেমন, এসব আমার সমস্যা নয়।

: 'তাহলে তুমি ওই নারীকে সাপোর্ট করা বন্ধ করো।' উত্তরে
আহসান সাদ তাকে

বলল।

: 'আমি তাকে সাপোর্ট করছি কারণ, কোনো মা তার সন্তানকে
মারতে পারে না। উদাসীন হলেও না। উদাসীনতার মানে এই
নয় যে, সে তার সন্তানকে মেরে ফেলবে।

এজন্য তার বিরুদ্ধে হত্যামামলা করা হবে।' জিবরিল এখন
প্রচণ্ড রুঢ় হয়ে উঠছে। এটি হয়তো আহসানের আচরণের
ফলেই। আহসান মুহূর্তেই তার সমস্ত সম্মানবোধ গায়েব করে
দিয়েছে।

: 'আগে তুমি ঠিক করো, আয়েশাকে তুমি ঘৃণা করো কেন? সে
নারী, তাই? নাকি তোমার সন্তানকে হত্যার সন্দেহে? তুমি বসে

আগে ঠিক করো এই গভীর ঘৃণার কারণ কী?' জিবরিল তাকে বলে চলল।

: 'এটা তোমার সমস্যা নয়।' আহসান সাদ রুক্ষ স্বরে বলল।
'আমি তোমার কাছে সাইকোলজি পড়তে আসিনি।' জিবরিল মাথা নাড়াল।

: এক্সাক্টলি। আমিও তোমার কাছে নৈতিকতা শিখতে আসিনি।
তুমি মুসলমান। তুমি ভালো করে জানো, একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর প্রতি তোমার দায়িত্ব কী। তোমার অন্তত এই দায়িত্ব নেই যে, পরপুরুষের সামনে বসে তার চরিত্রে কাদা ছুড়বে।

: 'তুমি আমাকে আমার দীন শেখানোর চেষ্টা করো না।' আহসান সাদ তার কথা থামিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা ভরে বলল। 'আমি হাফেজে কুরআন। তাবলিগও করি। ডজন ডজন অমুসলিমকে মুসলিম করেছি। তুমি আমাকে শেখাতে এসো না, আমার দীন নারীর প্রতি আমাকে কী দায়িত্ব দিয়েছে, আর কী না। তুমি

তোমার দীন নিয়ে চিন্তা করো। এক গায়রে মাহরাম নারীর সঙ্গে অ্যাফেয়ার চালাচ্ছ। আর আমাকে বলছ, আমি যেন আমার সাবেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর শানে কাসিদা পড়ি। তার গুণগান গাই।

আহসান কথা বলছে না, বিষ উগড়াচ্ছে। জিবরিলের জীবনে দেখা এটাই প্রথম মুবাল্লিগ, যার জবানে সে মিষ্টতার বদলে তিক্ততা দেখছে।

'তোমাদের ছবি আমি বিয়ের পরও তার ল্যাপটপে দেখেছি। তখন সে আমাকে বলেছিল, তুমি তার বোনের বন্ধু। তোমার আর তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। আমার সন্দেহ ঠিকই ছিল। কোনো মেয়ে তার বোনের বয়ফ্রেন্ডের ছবি ল্যাপটপে জমিয়ে রাখে না।' আহসান সাদ বলে চলছে। আর জিবরিল নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে। 'অবশেষে আজ তুমি বলেই দিলে, তোমাদের এই সম্পর্ক কতটা পুরোনো। এজন্যই তো এই নারী আমার ছেলেকে মেরে নিজেকে মুক্ত করেছে।'

তার মানসিক অবস্থা দেখে জিবরিলের এই মুহূর্তে তার প্রতি করুণা হচ্ছে। এতটাই করুণা যে, অবচেতনে সে তাকে বলতে বাধ্য হলো, 'আহসান! সে তোমার ছেলেকে মারেনি। অপারেশনের এক ভুলে তার মৃত্যু হয়েছে।' জিবরিল এমন কথা বলে ফেলেছে, যা তার অবচেতন মনে বেরিয়ে পড়েছে। যার জন্য সে নিজেই এখন চোখ লুকাতে শুরু করেছে। তার কথা শুনে আহসানের যেন এক ধাক্কা লাগল। আর জিবরিল আফসোস করল। এটি তার জীবনের এক খারাপ দিন। আর এই খারাপ দিনের সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তটি হলো এটি।

: 'তুমি কীভাবে জানো?' আহসান যেন ফিসফিসিয়ে বলল।

: 'কারণ, আমি সেই অপারেশন টিমের অংশ ছিলাম।' জিবরিল এবার ভেবেচিন্তে বলল। নিকৃষ্ট সত্য যা ছিল, তা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এখন বাকি বর্ণনা গোপন করা, না-করা অনর্থক। আহসান দম বন্ধ হয়ে তার মুখ দেখতে থাকল। নিস্তব্ধ,

অপলক। তার মুখের রং শ্যামলা, লাল নাকি হলুদ, মুহূর্তের জন্য তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে গেল।

: 'ওই অপারেশন আমি করেছিলাম আহসান! ডাক্তার ভিজেলের সহকারী ছিলাম। তাছাড়া আমি নিশ্চিত বলতে পারছি না, অপারেশনে সত্যিই কোনো ভুল হয়েছিল, নাকি সেটা আমার মতিভ্রম।' জিবরিল যেন তাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল। আহসান সাদ আয়েশার ব্যাপারে জিবরিলের মনে খারাপ ধারণা দিতে এসেছিল। সেই কল্পনাও করেনি, এখানে এসে জিবরিলের কাছে কী গোপন তথ্য জানতে পারবে। আহসান হুট করে দাঁড়িয়ে পড়ে, দ্রুত পায়ে উধাও হয়ে গেল। জিবরিল সিকান্দার ওখানে একাই বসে রইল।



: 'হ্যালো! ব্যাক অন ইউএসএ' সকাল সকাল ফোনের স্ক্রিনে মেসেজটি ঝলমল করতে দেখল রাইসা। প্রেরকের নামটি দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য ঝুঙ্ক হয়ে গেল সে। যদিও তার প্রত্যাশা ছিল, আমেরিকায় ফিরে হিশাম তার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। পরিস্থিতি যা-ই হোক, তাদের মধ্যে এমন কিছু হয়নি যে, একে অপরের থেকে সবে থাকতে হবে।

: 'ওয়েলকাম ব্যাক' মেসেজটি সেভ করতে করতে রাইসা নিজেকে মনে করিয়ে দিল, জীবনের এই প্রথম ব্রেকআপকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। নিজেকে এটি বারবার মনে করিয়ে দেওয়াও জরুরি ছিল। কারণ, এতে যন্ত্রণা শেষ না হলেও, কমে অবশ্যই। ক্ষণিকের জন্য থামে নিশ্চয়।

: ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ?



রাইসা গোসল সেরে এসে হিশামের পরবর্তী মেসেজটি দেখল।
'হ্যাঁ' বলে রিপ্লাই দিতে দিতে আবারও তাকে মাথা থেকে
ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল।

: 'দেখা করবে?' হিশামের পরবর্তী মেসেজ জলদি এলো।
রাইসা কর্নফ্লেক্স খেতে খেতে ফোনে জ্বলজ্বলে প্রশ্নটির দিকে
তাকিয়ে রইল। বলতে চাচ্ছিল, 'এখন কীভাবে?' কিন্তু লিখল,
'না আমি ব্যস্ত।' কর্নফ্লেক্স তার গলায় আটকাতে লাগল। সে
এখন হিশামের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে না। মনকে সামলানোর
সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখোমুখি হওয়াটা অনেক জটিল।
গতানুগতিক মেয়েদের মতো হতে চাচ্ছে না সে। আর না
অভিযোগ-অনুযোগ, বিদ্রূপ, ঝগড়া কিংবা তার সামনে
কান্নাকাটি করতে চাচ্ছে। তাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য হিশাম
বাহরাইনে যায়নি।

উত্তরে হিশাম ভেংচি কাটা মুখের একটি ছবি পাঠাল। যেন তার
ঠুনকো বাহানায় ঠাট্টা করল। রাইসা এটি উপেক্ষা করল।

কোনো উত্তর দিল না। পনেরো মিনিট পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে নিচে নামতেই রাইসা তাকে ওখানে দেখতে পেল। হিশাম গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হয়তো এখানে বসেই মেসেজ করছিল। আর নয়তো এত জলদি এখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সারপ্রাইজ দিতে খুব ভালো লাগে হিশামের। রাইসার ভালো লাগে তার সারপ্রাইজ পেতে। কিন্তু তা ছিল কিছুদিন আগের ব্যাপার। এখন পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে।

রাইসা তার দিকে এগিয়ে গেল। দুজনের মুখে স্বাগত হাসি ফুটে উঠল। ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করা হলো। তারপর রাইসা তাকে বলল, 'আজ আমাকে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি যেতে হবে। কিছু কাজ আছে।' জবাবে হিশাম বলল, 'আমি নামিয়ে দিচ্ছি। যেতে যেতে কিছু গল্পস্বল্প হবে। অনেকদিন হয় আমাদের দেখা হয় না, কথা হয় না।'

রাইসা তার থেকে দৃষ্টি লুকাল। চুপচাপ দরজা খুলে গাড়িতে বসে পড়ল।

: 'কী হলো?' ড্রাইভিং সিটে বসেই হিশাম তার দিকে ফিরে গম্ভীর হয়ে বলল।

: 'কী?' রাইসা না বোঝার ভান করল। 'আমি রেগে আছি, হৃদয় ভেঙে গেছে, কারণ তুমি আমাকে আশা দিয়ে এখন অন্য কাউকে জীবনে জড়িয়ে নিয়েছ।' এসব অন্তত রাইসার মুখ থেকে বের হবে না।

: 'তোমার মুড অফ?' হিশাম এখন গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞেস করছে।

: 'না। মুড কেন অফ হবে?' জবাবে রাইসা তার চোখে চোখ রেখে বলল।

: 'জানি না, এটাই তো জানতে চাচ্ছি।' হিশাম বিভ্রান্ত হয়ে আছে। 'কিছুদিন ধরে তুমি আমার জীবন থেকে একেবারে

অদৃশ্য। বাহরাইন থেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি কল রিসিভ করছ না, মেসেজের রিপ্লাই দিচ্ছ না; হয়েছে কী?'

: 'তোমার কী মনে হয়, কী কারণ হতে পারে এর পেছনে?'
জবাবে রাইসা তাকে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে হিশাম বলল।

: 'আমি এখন এসব শেষ করতে চাচ্ছি।' রাইসা তাকে বলল।
হিশাম চমকাল না, মুড সত্যিই অফ।' তাকে দেখতে থাকল।
তারপর মাথা ঝেকে বলল, 'অর্থাৎ আমার ধারণা ঠিক। তোমার

জবাবে রাইসা চুপচাপ ব্যাগ থেকে আংটির বক্স বের করে
গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রাখল। হিশাম কিছু বলতে পারল না।
গাড়িতে নীরবতা ছেয়ে গেল। তারপর হিশাম বলল, 'তুমি
এনগেজমেন্টের সংবাদ পড়ে ফেলেছ?'

: 'আগে থেকেই আমার এই আশঙ্কা ছিল। তাই এই সংবাদে আমি অবাক হইনি।' রাইসা মৃদুস্বরে তাকে বলল। আগের সেই চিরচেনা শান্ত স্বরে।

: 'আমি তোমার সঙ্গে একটা কমিটমেন্ট করেছিলাম রাইসা! আর আমি আমার ওয়াদা ভঙ্গ করব না। সংবাদপত্রে ছাপা একটি সংবাদ আমাদের মাঝে প্রাচীর হতে পারে না। এতটা ভঙ্গুর নয় এই সম্পর্ক।' হিশাম অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে চলল।

: এটা সংবাদপত্রের সংবাদের বিষয় নয় হিশাম! এটা তোমার পরিবারের সিদ্ধান্তের বিষয়। তুমি এখন যুবরাজ। তোমার দায়িত্ব এবং তোমার কাছে সকলের প্রত্যাশা ভিন্ন।

হিশাম তার কথায় হাসল।

: 'যুবরাজ? আমি এখনো আমার কর্তব্য বুঝতে পারছি না। আর না বুঝতে পারছি, এই পদের জন্য সত্যিই আমি যোগ্য কি না। এটা ক্ষমতার রাজনীতি, আজ যেখানে আছি, কাল সেখানে নাও থাকতে পারি। কোনো নিশ্চয়তা নেই। সিদ্ধান্তের দায়িত্ব যদি আমার হাতে থাকত, তাহলে আমি কখনোই এই পদ গ্রহণ করতাম না। কিন্তু এটি আমার বাবার ইচ্ছে।' হিশাম এখন গম্ভীরভাবে বলে চলছে। রাইসা তার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ভুল ইচ্ছে নয়। কোন বাবা-মা তার সন্তানের জন্য এটা চাইবে না? তুমি সৌভাগ্যবান। এমন সুযোগ তুমি পেয়েছ।' রাইসা মৃদুস্বরে বলে চলল।

: 'প্রথমে আমিও এমনটাই ভাবতাম।' জবাবে হিশাম বলল। 'কিন্তু এখন এমনটা নয়। সব জিনিসের একটা মূল্য থাকে। লটারিতে কিছুই মেলে না। যুবরাজের জন্য রাজপরিবারে প্রথম বিয়ে করাটা জরুরি। আমাদের বিয়েটা যদি আগেই হয়ে যেত, তাহলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু এখন আর আমার পক্ষে রাজপরিবারে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। যারা

আমার বাবার রাজত্ব নির্ধারণ করেছে, তারাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো মতামত চাওয়া হয়নি, আমাকে শুধু জানানো হয়েছে।"

: 'তা আমি বুঝতে পারছি। আর তাই তোমার প্রতি কোনো অভিযোগ করছি না। আমাদের মধ্যে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও ছিল না, যার জন্য আমি তোমাকে দোষারোপ করব। তাই আমি নিজে থেকেই এসব শেষ করতে চাই। যাতে তুমি নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে না করো। আর আমিও কষ্ট না পাই।' রাইসা তার কথা শেষ করে একটু থামল। তারপর শেষ বাক্যটি বলল।

: 'তুমিই সেই মেয়ে, আমি জানি এবং আমি অনুতপ্তও।' হিশাম তার কথা শেষ হওয়ার পর বলল। 'এসব শেষ করতে চাই না। এসবের জন্য আমি এখানে আসিনি। রাইসা! আমি তোমাকেও বিয়ে করব। এ কথা আমি আমার পরিবারকেও জানিয়ে দিয়েছি। তাদেরও কোনো আপত্তি নেই এতে।'

তার কথায় রাইসা অনিচ্ছাকৃতভাবে হেসে উঠল। এবং হাসতেই থাকল। হাসতে হাসতে চোখে জল চলে এলো।

: 'হামিন একদম ঠিকই বলেছিল। কে জানে, তার কথাতেই কালি নাকি সে একটু বেশিই বুদ্ধিমান?' চোখ মুছতে মুছতে বলল রাইসা। হিশাম না জিজ্ঞেস করে পারল না, সে কী বলত?

: এটাই, যা তুমি এখন বলছ। দ্বিতীয় বিয়ে। সে বলে, রাজারা হেরেমের মালিক। আর হেরেমের রানিরাও একপ্রকার দাসী।

হিশাম কতক্ষণ কিছু বলতে পারল না। যেন শব্দ খুঁজছিল, তারপর যেন প্রতিরোধ করে বলল, 'আরবদের মধ্যে এমনটা হয় না, রাজাদের চার স্ত্রী হলেও না।' রাইসা

খুব শান্তভাবে তার কথা থামিয়ে দিল।

: কোনো রাজাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি কেবল হিশামকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। একাধিক বিয়ে করাটা তোমার বাধ্যবাধকতা হতে পারে, কিন্তু আমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, তোমাকেই বিয়ে করতে হবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু হৃদয়ের কাছে আমি এতটাও দুর্বল নই যে, তোমাকে ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবতেই পারব না।

তার কথায় সেই বাস্তববাদিতা ঠিকরে পড়ছে, যার জন্য হিশাম তাকে পছন্দ করত। কিন্তু আজ প্রথম তার সেই বুদ্ধি ও সেই ভাবনা তার কাছে খারাপ লাগছে।

: 'আমাদের সম্পর্ক এতটা দুর্বল নয় তো, রাইসা।' রাইসার কথার জবাবে সে বলল।

: 'আমিও ভাবতাম, আমাদের সম্পর্ক খুব মজবুত। কিন্তু আমার সেই ভাবনা ভুল। মাস্মি কখনোই এমন বিয়ের পক্ষে নন। আমি ভাবতাম এটা তার ব্যক্তিগত পক্ষপাত। কিন্তু আজ আমি

উপলব্ধি করছি, তিনি ঠিকই বলতেন, সংস্কৃতির পার্থক্য অনেক বড় কিছু।" রাইসা বলে চলছে। 'এটি যেকোনো সময় বড় কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমনটা এখন হয়েছে। তবে আমি খুশি যে, এটা আগেই হয়ে গেল। পরে হলে...'। সে থামল। হিশাম তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

: আমি তোমার মায়ের সঙ্গে একমত নই। ভালোবাসার সম্পর্ক সবকিছুর চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী।

: 'তা আমি মানি। কিন্তু সেটা তখনই হয়, যখন পুরুষের ভালোবাসা আমার বাবার মতো খাঁটি এবং সেই সিদ্ধান্তে অটল হয়।' রাইসা বলল। সে সালার সিকান্দারের উপমা দিচ্ছে। ভালোবাসা নিয়ে তার কোনো উপমা জানা থাকলে, সে কেবল তার বাবা-মায়ের ভালোবাসাই। সেই উপমা হিশাম অনেকবার শুনেছে। কিন্তু আজ এই প্রথম রাইসা হিশামের সঙ্গে সালার সিকান্দারের তুলনা করছে। এবং তা সরাসরিই করছে।

: 'আমিও আমার ভালোবাসায় খাঁটি। তোমার জন্য আমি লড়তেও পারি।' রাইসাকে সে বলল। রাইসার সেই উপমা ও তুলনা হিশামের এই প্রথম খুব খারাপ লাগল। কয়দিন আগেও বাহরাইনে তাকে সবাই মাথায় তুলে রেখেছে, আর রাইসা এখানে একজন 'সাধারণ মানুষের' সঙ্গে তুলনা করে তাকে ছোট করে তুলছে।

: 'হ্যাঁ, তুমি ভালোবাসায় খাঁটি, কিন্তু লড়তে পারবে না, হিশাম! আমাকে না তোমার করতে পারবে, আর না ধরে রাখতে পারবে।' রাইসা এখন গাড়ির দরজা খুলে ফেলেছে।

: আমি তবু আমার বাবা-মাকে তোমাদের কাছে পাঠাব। আর সময়ই বলে দেবে, আমি তোমার জন্য লড়তে পারি কি না।

গাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে রাইসা তাকে বলতে শুনল। সে আর ফিরে তাকাল না। সামনে যেতে যেতে ভাবল, 'পেছনে আর কিছুই নেই।'

এক সপ্তাহ ধরে জিবরিল সিকান্দারের মনে এক অদ্ভুত অস্থিরতা বিরাজ করছে।

আহসান সাদ অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যক্তি। তাকে সে বিরক্তই করে গেছে। সে এখন বুঝতে পারছে না, আসফান্দের অপারেশনের বিষয়টি নিয়ে আহসান এখন কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। জিবরিল মূলত এই কেইসে জড়িয়ে পড়াকে ভয় করছে।

একজন ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে, কোনো কেলেক্সারি বা মামলায় জড়িয়ে পড়ার মানে হলো, শুরু হওয়ার আগেই নিজের ক্যারিয়ার ধ্বংস করা। কিন্তু এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। যা হওয়ার, তা হয়ে গেছে। এই এক সপ্তাহ অনেক চিন্তাভাবনা করে সে সিদ্ধান্ত নিল, অপারেশনের ব্যাপারে সত্যিটা সব আয়েশাকে বলে দিবে। এই পরিস্থিতিতে এসব বলা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

সপ্তাহান্তে রাতে আয়েশাকে সে ফোন করল। কিন্তু ফোন বন্ধ। তাই জিবরিল তাকে কল ব্যাক করার একটি মেসেজ দিয়ে রাখল। আধা ঘণ্টা পর আয়েশা ফিরতি কল করল। কল ধরে কয়েক সেকেন্ড কুশল বিনিময় হলো। এরপর জিবরিল তাকে আগামীকাল দেখা করার কথা বলল।

: 'কেন দেখা করতে চান আপনি?' আয়েশা ভাবলেশহীনভাবে তাকে জিজ্ঞেস করল।



: 'তা আমি আপনার সামনে বসেই বলতে পারব।' জিবরিল উত্তরে বলল। আয়েশা কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনি কখন দেখা করতে চান?

: যেকোনো সময়, যখন আপনার সুযোগ হয়।

: 'এগারোটা, বারোটা বাজে?' আয়েশা খানিক ভেবে বলল।

: 'ডান।' সে উত্তরে বলল আর আয়েশা আবেদিন খোদা হাফেজ বলে ফোন রেখে

দিল।

জিবরিল হাতে ফোন নিয়ে পরবর্তী বাক্য কী হবে তা ভাবতে থাকল। সেদিন আহসান সাদ তাকে বলেছিল, আয়েশা আবেদিনের ল্যাপটপে সে তার ছবি দেখেছে। তাদের মধ্যে কখনো ছবির আদান-প্রদান হয়েছে, জিবরিলের তা মনে

পড়ছে না। এমনকি তার আর নিসার মধ্যেও কখনো কোনো ছবির আদান-প্রদান হয়নি। কিন্তু নিসার কাছে যদি কোনো গ্রুপ ফটো থাকত, তাহলে সেখান থেকে আহসান সাদ শুধু জিবরিলকে চিহ্নিত করে, তার ব্যাপারে আপত্তি জানাত না। গ্রুপ ফটোতে কেউ আপত্তি করবেও না। আয়েশার কাছে নিশ্চয় তার আলাদা কিছু ছবিও ছিল। কিন্তু সেগুলো সে কোথায় পেল? নিশ্চয় ফেসবুকে। জিবরিল যখন নিয়মিত ছবি আপলোড করত। এর চেয়েও বড় কথা, হামিন...। আয়েশার ব্যাপারে সে বেশি কিছু ভাবতে চাচ্ছে না, কিন্তু ভেবেই চলছে। আহসান সাদের সাথে দেখা করার পর, আয়েশার

প্রতি তার সহানুভূতি দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে।

পরের দিন সে যথাসময়ে আয়েশার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এসে উপস্থিত হলো। আর প্রথম বেলেই আয়েশা দরজা খুলে দিল। সে হয়তো আগে থেকেই তার অপেক্ষা করছিল। কালো টিলেঢালা পায়জামা, নীল টি-শার্ট আর পায়ে ফ্লিপ-ফ্লপ,

চুলগুলো আলগা খোঁপা করে বেঁধে, জিবরিলের কাছে তাকে আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে। চোখের নিচে কালিও কমে গিয়েছে। সে ছিল খুব সুন্দরী। যোলো বছর বয়সে তো তার থেকে চোখ সরানো কঠিন হয়ে পড়ত। তার চেহারা এখনো যে-কারও দৃষ্টি কাড়তে পারে। তাকে দেখতে দেখতে জিবরিলের এই অনুভূতি হলো।

: 'ওয়ালাইকুম আসসালাম' আয়েশা সালামের জবাব দিতে দিতে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। জিবরিলের হাতে সে ছোট্ট একটি ফুলের তোড়া দেখতে পেল। তাতে কয়েকটি সাদা ও গোলাপি ফুল মেলে আছে। সাথেই একটি কুকিজের প্যাকেট। আয়েশা ভেবেছিল জিনিস দুটো জিবরিল তার হাতে তুলে দিবে। কিন্তু সে নিজেই ওগুলো হাতে নিয়ে ভেতরে চলে এলো।

কিচেন কাউন্টারে প্রথমে সে ফুল রাখল, তারপর রাখল কুকিজের প্যাকেটটি। তারপর ওখানে পড়ে থাকা ধূমায়িত

কফির মগটির দিকে তাকাল। আয়েশা নিশ্চয়ই তার আসার আগে এটি পান করছিল। একটি প্লেটে পড়ে আছে আধখাওয়া অমলেট ও কয়েকটি চিকেন সসেজ। আয়েশা নিশ্চয় নাশতা থেকে উঠে দরজা খুলতে গিয়েছিল।

: 'আমি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি?' জিবরিল ঘুরে আয়েশার দিকে তাকাল, সে ততক্ষণে ভেতরে চলে এসেছে।

: 'না, আমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি। আজ সানডে তাই। এদিকে রাতে হসপিটালে ডিউটি ছিল।' আয়েশা উত্তরে জিবরিলকে বলল।

: 'আপনার সানডে-টা তবে নষ্ট করে দিলাম।' জিবরিল মৃদু হেসে দুঃখিত ভঙ্গিতে বলল। সে ততক্ষণে লাউঞ্জে রাখা সোফায় এসে বসে পড়েছে। আয়েশার বলতে ইচ্ছে করল, তার জীবনের প্রতিটি দিন আগে থেকেই নষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু সে কিছু বলল না, চুপচাপ কিচেন কাউন্টারের দিকে চলে গেল।

: 'এসব আপনি আমার জন্য এনেছেন?' আয়েশা ফুল হাতে নিতে নিতে বলল।

: 'জি।' জিবরিল বলল।

: 'এর দরকার ছিল না।' আয়েশা জিবরিলের দিকে তাকাল। তারপর সেগুলো একটি ফুলদানিতে রাখতে লাগল।

: 'এও জানি।' জিবরিল বলল। ফুলগুলো ফুলদানিতে সাজাতে গিয়ে আয়েশার মনে পড়ল, সে হয়তো দুই-আড়াই বছর পর কারও দেওয়া ফুল স্পর্শ করছে। শেষবার তার ঘরে যে ফুল এসেছিল, আসফান্দের জন্য। সেগুলোও তার কিছু আত্মীয়স্বজনের আনা। মাথা নেড়ে সে যেন কষ্টদায়ক স্মৃতিগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল।

: 'আপনি ব্রেকফাস্ট সেরে নিন, আমরা পরে কথা বলছি।' জিবরিলের কথায় সে চমকে উঠল। জিবরিল সেন্টার টেবিলে পড়ে থাকা উলের কাঁটাগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে তুলে দেখছে। 'বাহ, এটা আপনার শখ?' তারপর সে স্কার্ফের অসম্পূর্ণ অংশটি হাতে ছুঁয়ে বলল।

: 'সময় কাটানোর চেষ্টা করি।' আয়েশা উত্তর করল। জিবরিল হেসে উলের কাঁটাগুলো আবার সেই বাক্সেই রেখে দিল, যেখানে সেগুলো ছিল।

: 'এই কফিটা আপনি নিতে পারেন। আমি এখনই বানিয়েছিলাম, খাইনি। আমি বরং নিজের জন্য আরেক কাপ বানিয়ে নিচ্ছি।' আয়েশা কফির মগ এনে তার সামনের টেবিলে রাখল। তারপর সে নাশতা করতে কিচেন কাউন্টারের পাশে রাখা টুলের উপর গিয়ে বসে পড়ল।

: 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে নাশতারও অফার করবেন।' জিবরিল হেসে বলল।

: 'আমি অফার করিনি কারণ, আপনি তা গ্রহণ করেন না।' আয়েশা সসেজ টুকরো করতে করতে উত্তর করল।

: 'এখনো যে করব না, তা তো জরুরি নয়।' জিবরিল জোর দিয়ে বলল।

: 'আপনি নাশতা করবেন?' আয়েশা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

: 'না।' জিবরিল বলেই অকস্মাৎ হেসে উঠল। 'আমি নাশতা করেই এসেছি। যদি জানতাম আপনি করাবেন, তাহলে না করেই আসতাম। ধারণাগুলো খুব ক্ষতিকর হয়।' সে বলল। আয়েশা চুপচাপ তার কথা শুনতে শুনতে নাশতা করতে থাকল।

: 'আপনি কল করবেন না, এই প্রত্যাশা সত্ত্বেও আপনার কলের অপেক্ষায় ছিলাম।' কফিতে চুমুক দিতে দিতে জিবরিল তাকে বলল। আয়েশা চিকেন সসেজের শেষ টুকরোটি মুখে পুরতে পুরতে তার দিকে তাকাল। তার হঠাৎ খামের ভেতর কাগজে লেখা জিবরিলের সরি'র কথা মনে পড়ল। সেটি দেখে সে তখন ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। জিবরিল কেন দুঃখ প্রকাশ করছিল? কী জন্য সে লজ্জিত? শত চেষ্টা করেও সে কোনো ব্যাখ্যা বা কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। এ নিয়ে এত দ্বিধাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও জিবরিলকে ফোন করে সে এক শব্দের ব্যাখ্যাও চায়নি।

এই মানুষটির সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক বাড়াতে চাচ্ছে না। বারবার তার সঙ্গে কথা বলা, দেখা করা এড়িয়ে চলতে চাচ্ছে। কারণ, জিবরিলের সঙ্গে তার প্রতিটা কথায়, প্রতিবার দেখায় কত কী মনে পড়ে যায়! কতশত অনুশোচনা আর হারানোর অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে! আয়েশা তার অতীতের



সেই জায়গায় ফিরে যেতে চাচ্ছে না, যেখানে জিবরিল সিকান্দার উপস্থিত। সেই অধ্যায়টি সে বহু আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।

টুলে বসে আয়েশা ফাঁকা প্লেটের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে, যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন। জিবরিল তার এই ধ্যানমগ্নতা খেয়াল করল। তার কথার জবাবে কোনো উত্তর করল না, এমন যেন সে জিবরিলের কথা শুনতেই পায়নি। এদিকে জিবরিল বুঝতে পারছে না, যে কথাগুলো সে বলতে এসেছে, তা কীভাবে বলবে। এই মুহূর্তে অজান্তেই তার মনে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল-হায়! সার্জারির সময় ডাক্তার ভিজেলের সেই ভুলটি যদি না-ই দেখতাম!

: 'আপনার ভিজিটিং কার্ডটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। মনে নেই, সেটি কোথায় রেখেছি।' অবশেষে সে কথা বলল এবং এক অদ্ভুত অজুহাত দেখাল। তার মানে সে বোঝাতে চাচ্ছে, জিবরিলের নম্বরটি সে সেভ করেনি।

জিবরিল চুপচাপ তার পকেট থেকে একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে, উলের কাঁটা রাখার সেই বাক্সে রেখে দিল। তারপর বলল, 'এখানে রাখলে হয়তো আর হারাবে না।'

চোখ লুকিয়ে ফেলল আয়েশা। প্লেটগুলো তুলে সে সিন্ধে রেখে এলো।

: 'আপনি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।' আয়েশা নিজের জন্য কফি বানাতে বানাতে তাকে এখানে আসার কারণ মনে করিয়ে দিল।

: 'আহসান সাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিবরিল তাকে বলল। সে ভেবেছিল, আয়েশা ভীষণ চমকে যাবে।

: 'আমি জানি।' সে প্রচণ্ড অপ্রত্যাশিত উত্তর দিল। জিবরিল কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না। তার দিকে আয়েশার কোনো মনোযোগ নেই। এমনভাবে সে কফি বানাচ্ছে, যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই এক কাপ কফি বানানো। 'সে আমাকে ফোন করেছিল।' জিবরিলের নীরবতা আঁচ করে আয়েশা আরেকটু যোগ করল। জিবরিল বুঝতে পারছে না এখন তার কী বলা উচিত। তার সঙ্গে দেখা করার পর আহসান সাদ যদি আয়েশাকে ফোন করে থাকে, তাহলে আসফান্দের অপারেশনের ব্যাপারে তাকে কিছু বলেনি, এ অসম্ভব! আর যদি সে আয়েশার কাছে সেটা বলেই থাকে, তাহলে আয়েশা এত নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বসে আছে তার সামনে? আহসান সাদ জিবরিলের কঠিন কাজটি সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু এর পরের প্রশ্ন কী হবে, জিবরিলের তা বুঝে আসছে না।

আয়েশা এখন তার কফির কাপ নিয়ে তার সামনে সোফায় এসে বসে পড়েছে।

: 'এখন নিশ্চয়ই আপনি জেনে গেছেন আমি কতটা পাপী আর ঘৃণ্য?' আয়েশা আবেদিনের গলায় এক অদ্ভুত প্রশান্তি বিরাজ করছে। যেন সে নিজেকে তিরস্কার করছে না, বরং নিজের প্রশংসা করছে। জিবরিল তাকে দেখতে থাকল, আয়েশার চোখে কিছুই নেই। যে কষ্ট আর যন্ত্রণা জিবরিল প্রতিবার তার চোখে দেখেছে, যে লজ্জা আর অনুশোচনা তার চোখ থেকে ঝরে পড়ত, এখন আর তার কিছুই নেই। তার বাক্যটি যেন জিবরিলকে মূক করে দিল।

: 'আহসান কি আপনাকে বলেছে যে, অপারেশনে...।' জিবরিলের কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে, আহসান হয়তো তাকে কিছু বলেনি। নয়তো আয়েশা আবেদিনের মুখে অন্য কোনো প্রশ্ন থাকার কথা ছিল।

: হ্যাঁ!

তার এই এক শব্দের উত্তর জিবরিলকে পুনরায় নির্বাক করে দিল। আয়েশা এখন আর জিবরিলের দিকে তাকিয়ে নেই। সে এখন তাকিয়ে আছে দু-হাতের মাঝে ধোঁয়া ওঠা কফির দিকে। যেন সে কোনো জ্যোতিষীর মতো হাতে ক্রিস্টাল বল নিয়ে বসে আছে, আর তাতে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছে। অতীত এমন ছিল, যাকে সে ভুলে যেতে চাচ্ছে। আর বর্তমানের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। জীবনের ওই অংশটি সে চোখ বন্ধ করে পার করতে চাচ্ছে। আহসান সাদের চিৎকার-রত কণ্ঠস্বর তার কানে বেজে চলছে। 'গালি, গালি, গালি আর গালি'। ফোন কানে চেপে সে যন্ত্রের মতো সেই গালিগুলো শুনে চলছে, যা বহু বছর তার জীবনের দিবা-রাত্রির বীভৎস অংশ হয়ে ছিল। সেসব শুনতে শুনতে সে এখন অনুভূতিহীন হয়ে গেছে। এই খারাপ শব্দগুলোর বিষাক্ত বিষ এখন আর তাকে কোনো যাতনা দেয় না। সেগুলো শুনে লজ্জা, অপমান, অপদস্থতা, রাগ কিংবা দুশ্চিন্তা কোনো কিছুই অনুভূত হয় না।

তালাকের মামলা চলাকালে, তালাক হওয়ার পর এবং আসফান্দকে নিজের দায়িত্বে রাখার মামলার সময়েও, যখনই আহসানের ইচ্ছে হতো, সে তাকে ফোন করে এভাবেই এসব কথা বলত, যা সে এবারও বলল। চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার ফোন না ধরার সাহস পেত না। মানসিকভাবে সে এতটাই ভীত ছিল যে, তার মনে হতো, যদি সে তার ফোন না ধরে, তাহলে সে তার বাড়িতে চলে আসবে। আহসান তাকে এমনটাই হুমকি দিত। আর আয়েশা ভুলে গিয়েছিল, সে আমেরিকায় থাকে, পাকিস্তানের মতো কোনো দেশে নয়। তার একটা ফোন-কলেই পুলিশ আহসানকে তার বাড়ির আশেপাশেও ঘেঁষতে দিবে না। কিন্তু আয়েশা যদি এতই সাহসী হতো, তাহলে তার জীবন এমন হতো না। তা ছিল একধরনের শোষণ উৎপীড়ন, যা সে বিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং একজন ভালো স্ত্রী ও ভালো মুসলিম নারী হওয়ার জন্য সহ্য করেছে। দ্বিতীয় উৎপীড়ন ছিল আসফান্দের জীবনে বাবা নামের অভাব দূর করার জন্য আহসানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

আসফান্দের জন্মগত একটি ত্রুটি ছিল। সে তার হাত ঠিকমতো নাড়াতে পারত না। তার সঙ্গে সে ছিল স্নো লার্নার। তার এই ত্রুটি দুটি ছিল আহসান সাদ ও তার পরিবারের কাছে অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণযোগ্য। তাদের সাত পুরুষেও কখনো কোনো শিশু এমন মানসিক বা শারীরিক ত্রুটির শিকার হয়নি, তাহলে তাদের ঘরে আসফান্দের জন্ম কীভাবে হলো? এটাও ছিল আয়েশারই দোষ। এটাও তার জিন ও আমলের সাজা। তাহলে এই পরীক্ষায় আহসান সাদ ও তার পরিবার কেন ভুগবে? এর ফলে আয়েশার ফাঁপা কথাগুলোও তখন পুরোপুরি বোবা হয়ে যায়। তারও বিশ্বাস হয়ে যায়, তার সন্তানের এই কষ্ট তারই কোনো পাপের ফল, কিন্তু কোন পাপ? এটা এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর সে কখনো খুঁজে পায়নি। তার এই অক্ষম ছেলের জন্য সে একা তাকে কীভাবে লালনপালন করত? একজন বাবার প্রয়োজন, এটা ভেবেই সে আহসানের দুর্বিষহ উৎপীড়ন সয়ে গেছে।

আসফান্দের জন্মের পর আয়েশা আমেরিকায় আসে। আহসান তাকে এখানেই থেকে কিছু একটা করতে বলে, কারণ সে এত



টাকাপয়সা দিয়ে স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব নিতে পারবে না। আয়েশা কোনো কিছু না ভেবেই আবার তার পড়াশোনা শুরু করে দেয়। সে বুঝতে পারেনি, আহসানের হঠাৎ এমন কী প্রয়োজন দেখা দিল যে, যার জন্য তাকেও কাজ করতে বলছে। এখানে আসার এক বছর পরে আয়েশা জানতে পারে, সে আমেরিকা আসার কয়েক মাস পরেই আহসান পাকিস্তানে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়েছে। আহসান তখন প্রায়ই পাকিস্তানে যেতে শুরু করে। অথচ আয়েশার কখনো সন্দেহও জাগেনি, তার জীবনে অন্য কোনো নারী চলে এসেছে। আহসানের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আয়েশার পরিবার; দুজনকেই চেনে, এমন একজন লোক ছিল। সে-ই এই গোপন তথ্য প্রকাশ করেছিল।

আয়েশা বুঝতে পারছিল না, এই সংবাদে সে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এসব তো কেবল নাটক-সিনেমাতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে যা ঘটেছে, এরপর থেকে নাটক-সিনেমাও তার কাছে মিথ্যা মনে হতে থাকে। অবশেষে আহসান নিজেও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দ্বিতীয় বিয়ের কথা স্বীকার করে। তাকে বলে,

আমি একজন মুসলিম। তাই চার বিয়ে পর্যন্ত করতে পারি। আর সেখানে তো তার কাছে শক্তিশালী কারণও ছিল, আয়েশা তাকে একটি সুস্থ সন্তান দিতে পারেনি। দ্বিতীয় স্ত্রী সেটি তাকে দেবে।

জীবনে ওই প্রথম সে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে নিজের পরিবারের কথামতো, তার থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এই সিদ্ধান্তে আহসান সাদ হতবাক হয়ে যায়। কারণ, আয়েশার কাছে সে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেনি। আসফান্দের নামে কিছু ওয়ারিস সম্পত্তি ছিল, যা আয়েশার নানা আয়েশার নামে না করে আসফান্দের নামে করে দিয়েছিলেন। আহসানের চোখে আয়েশার যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, তাহলে তা এই সম্পত্তির লোভেই। আয়েশার চরিত্র নিয়ে তার সন্দেহ ছিল। তাকে বেআমল এবং বদ-আখলাক মনে করত। তা সত্ত্বেও আয়েশাকে তালাক দেওয়ার কথা কখনো ভাবেনি এই সম্পত্তির লোভেই। কিন্তু তার কোনো কৌশলই কাজে আসেনি। আয়েশার সঙ্গে তার তালাক হয়ে

যায়। আয়েশার সঙ্গে তালাকের প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দ্বিতীয় স্ত্রী বিয়ের আট মাস পর খুলা তালাক চেয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ফলে আহসান ও তার পরিবার মিলে কিছু পারিবারিক বন্ধুদের মাধ্যমে সমঝোতার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু আয়েশার পরিবার তাদের এমন কোনো চেষ্টা সফল হতে দেয়নি।

এই পুরোটা সময়ে আয়েশা কেঁচোর মতো অসাড় হয়ে ছিল। যা হওয়ার ছিল, তা-ই হচ্ছিল। কিন্তু যা হচ্ছিল তা সে নিজ হাতে করতে চাচ্ছিল না। সে তখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, সে ঠিক নাকি ভুল। তালাকের এই কাজটি কি আল্লাহর কাছে গুনাহ, নাকি না। যদি গুনাহ হয়ে থাকে, তাহলে সে চাচ্ছিল এই গুনাহ যেন অন্য কেউ নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। তার পরিবার তার পক্ষ হয়ে তালাকের কাজ সম্পন্ন করুক। তবু সে আহসানের থেকে মুক্তি পেতে চায়।

যেদিন তার তালাক চূড়ান্ত হয়, সেদিন সে হিজাব খুলে ফেলো। কারণ তার বিশ্বাস ছিল, এখন সে যত নেকির কাজই করুক না কেন, আল্লাহর চোখে সে পাপী বান্দি হিসেবেই গণ্য হবে। আহসান সাদ শুধু একটি মেয়ের জীবনই নষ্ট করেনি। বরং সে সেই মেয়েটিকে তার দীন থেকেও বিমুখ করে দিয়েছে, যার অনুসারী হয়ে আয়েশা আবেদিন গর্ববোধ করত।

'তোমার ইয়ারকে বলে এসেছি তোমার সব কুকীর্তি।' আহসান সাদ ফোনে গর্জন করে তাকে বলল। 'তুমি কী প্ল্যানিং করেছ যে, আমার ছেলেকে মেরে তুমি সংসার সাজাবে, রঙ্গলীলায় মেতে উঠবে? আমি শুধু তোমাকে জেলে পাঠাব না, তোমার সেই ইয়ারকেও পাঠাব, যে আমার ছেলের অপারেশন করতে গিয়ে ইচ্ছে করেই তাকে মেরে ফেলেছে। আর এ কথা সে নিজের মুখেই আমাকে বলেছে।' সে বকবক করে যেতেই থাকল, আর আয়েশা শুনতে।

: 'আয়েশা...!' জিবরিলের ডাকে সে আবারও চমকে উঠল। তার হাতের কফি থেকে এখন আর ধোঁয়া উঠছে না। তা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। আয়েশা মাথা তুলে জিবরিলের দিকে তাকাল। জিবরিল এখন তাকে বলে চলছে অপারেশনের সময় কী হয়েছিল। তবে সে নিশ্চিত নয় ডাক্তার ভিজেল ভুল করেছেন কি না। এটা হয়তো তার দেখার ভুলও হতে পারে। জিবরিল অপরাধী না হয়েও নিজেকে এখন অপরাধী মনে করছে। আহসান সাদের কাছে এই গোপন তথ্য প্রকাশ করাটা তার বোকামিই ছিল।

: 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কিছুই হবে না। আহসান আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।' তার সব কথা শোনার পর, আয়েশার মুখ নিঃসৃত এই বাক্যটি জিবরিলকে যেন হতবাক করে দিল। সে আগের মতোই শান্ত! জিবরিল যদি তার কাছে তীব্র আবেগপূর্ণ কোনো প্রতিক্রিয়ার আশা করে থাকে, তাহলে তা হয়নি। রাগ-ক্রোধ, অভিযোগ-অনুযোগ; কিছুই না। উলটো সে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আপনি চিন্তা করবেন না।

: 'আহসানকে আমি বলে দিয়েছি, আমার ওপর আনীত অভিযোগগুলো মেনে জিবরিলকে যেন ক্ষমিত করে দিল। নিয়ে আমি কোটে আসফান্দ-হত্যার কথা স্বীকার করে নেব। তার পরের এই কথাটি

১৮

: 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।' জেলের এক গার্ড খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে জুতার ঠোকরে তাকে জাগিয়ে তুলল। জেলের লম্বা ব্যারাকের দেওয়ালের পাশে চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিল সেই বৃদ্ধ। সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না, যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে মাথার

ওপর দাঁড়ানো সেই গার্ডের দিকে তাকাল। তার বিশ্বাস, গার্ডের কোথাও ভুল হচ্ছে। কারণ, তার সাথে কে দেখা করতে আসবে? গত বারো বছরে যেখানে কেউ আসেনি, তাহলে এখন কে আসবে?

: 'আরে ওঠ, মরে পড়ে আছিস নাকি! একবার বলছি যে শুনোস নাই? তোর সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছে।' গার্ড এবার একটু বেশি জোরে তাকে লাথি মারল। সে উঠে বসল।

: 'কে এসেছে?' গার্ডকে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'ওই মিডিয়ার কুত্তাগুলো।' গার্ড গালাগাল দিয়ে বলল। 'ফাঁসির আসামিদের

সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে।'

সে আবারও শুয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু গার্ডের হাতের লাঠির নড়াচড়া তাকে উঠে যেতে বাধ্য করল। এসব মিডিয়া আর এনজিও কর্মীদের প্রতি সে রীতিমতো বিরক্ত। কয়দিন পরপরই এরা সার্ভে করতে আসে। তাদের দিন কেমন কাটছে, জেলে আসার কারণ কী, জেলের পরিস্থিতি কেমন, এসব তথ্য নিতে। তারা যেন সার্কাসের প্রাণী। তারা যা করেছে, কেন করেছে, গিয়ে গিয়ে এসব বলতে হয়। অপরাধ করে কি এখন আফসোস হয়? পরিবারের কথা কি মনে পড়ে? এমন হাজারো জবাবদিহি।

বিরক্তি নিয়ে টলমল পায়ে সে ওই গার্ডের পেছনে আসতে লাগল। সে এখন তাকে ব্যারাক থেকে বের করে সাক্ষাৎকারের জায়গায় না নিয়ে, জেলারের রুমে নিয়ে এলো। বৃদ্ধ গোলাম ফরিদ রুমে ঢুকতেই তাদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর জেলার সেই গার্ডের সঙ্গে ওখান থেকে চলে গেল।

: 'গোলাম ফরিদ?' ইশারায় একজন মহিলা তাকে সামনের একটি চেয়ারে বসতে বলল। গোলাম ফরিদ কিছুটা ভীত হয়ে পড়ল। তারপর সে ইতস্তত করতে করতে, গুটিগুটি মেরে সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। সে বসতেই একজন শ্বেতাঙ্গ তার কয়েকটি ছবি তুলল। মহিলাটি এখন তাকে পাঞ্জাবি ভাষায় প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, কী অপরাধে এবং কখন সে এখানে এসেছে। গোলাম ফরিদ তোতাপাখির মতো মুখস্থ করানো সেই দশ-বারোটি প্রশ্নের উত্তর দিল। এসব প্রাথমিক জিজ্ঞাসার পর, গোলাম ফরিদ তার অপরাধ খুঁড়ে বের করার মতো জিজ্ঞাসাবাদের অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর তার জেল-জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তারপর...। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। তারা তার নাম, পিতার নাম, বাসস্থান, অপরাধের ধরন এবং জেলে আসার কত বছর, জানার পর তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জেল থেকে বাইরে আসতে চাও গোলাম ফরিদ?' লোকটি শ্বেতাঙ্গ, কিন্তু বিশুদ্ধ উর্দুতে কথা বলছে। গোলাম ফরিদের মনে হলো, সে হয়তো ভুল শুনেছে।

'জেল থেকে বাইরে আসতে চাও?' লোকটি যেন তার মুখের অভিব্যক্তি পড়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করল।

: 'জেল থেকে বাইরে...?' গোলাম ফরিদ এক মুহূর্ত ভাবল, সে কি সত্যিই জেল থেকে বাইরে আসতে চায়? তারপর সে মাথা নেড়ে 'না' বলল। লোকটি এই উত্তর আশা করেনি।

'কেন?' লোকটি আপনা-আপনিই জিজ্ঞেস করে ফেলল।

: 'বাইরে এসে কী করব?' গোলাম ফরিদ উত্তর করল। 'না আছে কোনো ঘর, না আছে পরিবার। আর এই বয়সে কামলা খাটতেও পারব না। আমার জন্য জেলই ভালো। এখানে সবই পাওয়া যায়।' গোলাম ফরিদ ভেবে বলল। কিন্তু সার্ভের প্রশ্নগুলো এখন বদলে গেল।

: 'তোমাকে যদি অনেক টাকা, সুন্দর একটা বাড়ি আর একজন স্ত্রীও দেওয়া হয়, তবু কি তুমি বাইরে আসবে না? নতুন করে

জীবন শুরু করতে চাও না?' এবার দ্বিতীয় মহিলাটি তাকে বলল।

: 'অনেক টাকা...?' গোলাম ফরিদ ভাবল। অনেক টাকার আকাঙ্ক্ষাই তো সব সমস্যা তৈরি করেছিল। না জানি তার কত কী মনে পড়তে লাগল! এত বছর পরও যখন সে ওসব চিন্তা করে, সবকিছু তার মনে পড়ে যায়। তার সেই তেতো কথার স্ত্রী, যার প্রেমে বিভোর ছিল সে। কখনো তা মধুর মতো মিষ্টি মনে হতো। এক-দুই বছর পরপর জন্ম নেওয়া সেই সন্তানগুলো। তাদের বড় কয়জন ছাড়া এখন আর কারও নাম ও চেহারা তার মনে নেই। তার সেই মৌলবি দুশমন আর অন্তহীন সুদ। সেই সুদের টাকার কথাও তার এখনো মনে আছে। মনে আছে, বাড়তে বাড়তে ফুলেফেঁপে ওঠা সেই মোটা অঙ্কের কথা, যার চিন্তায় সে হারিয়ে ফেলেছিল মানসিক ভারসাম্য।

: 'সালার সিকান্দারের কথা তোমার মনে আছে?' তাকে চুপ থাকতে দেখে সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটি গোলাম ফরিদকে জিজ্ঞেস করল। গোলাম ফরিদের চোখে এক অদ্ভুত ভয় ফুটে উঠল। কুঁচকে যাওয়া মুখ, লম্বা চুল, এলোমেলো দাড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া ও নোংরা কাপড় পরে, খালি পায়ে বসে বসেও তার সালার সিকান্দারের কথা মনে আছে। সালারের পিতার কথাও মনে আছে। মনে আছে, তাদের প্রতি হৃদয়ে জাগরিত ঘৃণার কথাও। সেইসঙ্গে আরও অনেক লোকের প্রতিও তার ঘৃণা জমে আছে, যারা তাকে ব্যবহার করেছিল। গোলাম ফরিদ মেঝেতে খুতু ছুড়ে দিল। তখন রুমের ভেতরের চারজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল।

১৯

: 'আমার শৈশবে, আমার জীবনে আপনাদের পরিবারের যে বিশাল ভূমিকা ছিল, গত পাঁচ বছরে এই মানুষটির ভূমিকাও ঠিক ততটাই ছিল।' এরিক আবদুল্লাহ ইনায়ার সঙ্গে আহসান



সাদকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। কয়েক সপ্তাহ পর তাদের বাগদান। এটি তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। ইনায়া একটি সেমিনারে যোগ দিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছে, আর সেই সুযোগে আবদুল্লাহ তাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেছে। ডাক্তার আহসান সাদ তার হসপিটালেই চাকরি করে। আবদুল্লাহ সবসময়ই তার দ্বারা প্রভাবিত।

গত কয়েক বছর ধরে ইনায়া আবদুল্লাহর মুখে অনেকবার তার কথা শুনছে। অবশেষে সেই মানুষটির সঙ্গে আজ তার দেখা হচ্ছে।

: 'মুসলিম হওয়াটা আমার জন্য সহজ ছিল। জিবরিলের পর ইনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাকে আমি রোল মডেল মনে করি। কারণ, তিনি দীন ও দুনিয়া, দুটোই একসঙ্গে নিয়ে চলেন।' আবদুল্লাহ খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে ইনায়াকে বলে চলছে, আর ইনায়া মুচকি হেসে তা শুনে যাচ্ছে। আবদুল্লাহ স্বভাবত আবেগী নয়।

ভেবেচিন্তে কথা বলার মানুষ। অনর্থক কারও প্রশংসা করার মতোও মানুষ নয় সে।

: 'তুমি একটু বেশিই প্রভাবিত হয়ে পড়েছ তার প্রতি।' ইনায়া না বলে পারল না। আবদুল্লাহ হাসতে লাগল।

: 'জেলাস হচ্ছে না তো তুমি?' ইনায়াকে সে জ্বালাতন করে বলল।

: 'হইনি তো, তবে হয়ে যাব।' জবাবে সে মুচকি হেসে বলল।

: 'আমার বিশ্বাস, তুমি যখন তার সঙ্গে দেখা করবে, তখন আমার মতো তুমিও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে যাবে। আমাদের বিয়েতে আমি তাকেও একজন সাক্ষী হিসেবে রাখব।' আবদুল্লাহ বলল। ইনায়া এবার হা হা করে হেসে উঠল।

: 'আবদুল্লাহ, তুমি তার প্রতি এতটা ইন্সপায়ার্ড? আমার কিছুটা ধারণা ছিল, কিন্তু এতটা নয়। এখন তো আমার তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

ইনায়া তাকে বলল। 'তুমি যেহেতু তাকে বিয়েতে সাক্ষীও বানাতে চাও, তাহলে তিনি নিশ্চয় স্বামী হিসেবেও ভালো মানুষ।'

আবদুল্লাহ আরও কৌতূহলী হলো।

: 'কেবল এই একটি বিষয়েই তিনি সৌভাগ্যবান নন।' আবদুল্লাহ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'উত্তম স্ত্রী একটি নিয়ামত, মন্দ স্ত্রী একটি পরীক্ষা। আর দুবার তাকে এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তার স্ত্রীরা তার কোমলতা ও সরলতার সুযোগ নিয়েছে।' আবদুল্লাহ বলে চলল।

: 'ওহ, দ্যাটস স্যাড!' ইনায়া না খুঁচিয়েই দুঃখ প্রকাশ করল।

: 'তুমি জানো? তোমাকে বিয়ের জন্য আমি তাকে দিয়েও অনেক দোয়া করিয়েছিলাম। আর দেখো, তার দোয়ায় কত প্রভাব! না হলে তোমার বাবা-মা তো এত সহজে রাজি হওয়ার ছিল না।' আবদুল্লাহ এখন খুব গর্ব ভরে বলছে।

: 'আমার বাবা-মা কারও দোয়ার চেয়ে তোমার আখলাক ও ইখলাসে প্রভাবিত হয়েছেন, আবদুল্লাহ!' ইনায়া তাকে দমাল।

হতভম্বের সেই মুহূর্তটি এখনো মনে আছে ইনায়ার। কয়েক মাস আগে আবদুল্লাহর সঙ্গে ইমামার আলোচনার পর, ইমামা তাকে ফোন করে জানায় যে, আমেরিকার একজন হাট সার্জনের সঙ্গে তারা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। ইনায়া তখন ক্ষণিকের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এর আগে তার জন্য যত প্রস্তাব এসেছে, তারা আগে ইনায়ার সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করেছে, তারপর সরাসরি ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়েছে। অথচ এই প্রথম, একদম বিয়ে ঠিক করে তারপর

তাকে জানানো হয়েছিল। এক অদ্ভুত ব্যথায় আতঁনাদ করে সে তখন ইমামাকে বলেছিল, 'কিন্তু মান্নি!

আগে তো ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখা করানো উচিত ছিল আপনার। এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করেননি।

: 'তোমার বাবা কথা পাকা করেছেন।' ইমামা জবাব দিয়েছিল। ইনায়া এতে চুপ হয়ে যায়। এক অদ্ভুত ধাক্কা খায় সে। 'তুমি কি বিয়েটা করতে চাও না?' ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করে।

: 'না, আমি তো এমন বলিনি। আগেও তো আপনারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাহলে এবারও ঠিক আছে।' ইনায়া খানিক বিষণ্ণ হয়ে বলেছিল। হুট করেই তার আবদুল্লাহর কথা মনে পড়েছিল, আর ঠিক ওই মুহূর্তেই ইমামা তাকে বলে ওঠে, 'তার নাম আবদুল্লাহ।'

নাম শুনেও কয়েক মুহূর্ত তার মনে হয়নি যে, তিনি এরিক আবদুল্লাহর কথা বলছেন। এরিক আবদুল্লাহর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে ইমামা এতটাই বিরোধী ছিল যে, ইনায়া ভাবতেও পারেনি, তিনি যে আবদুল্লাহর কথা এত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বলছেন, সে এরিক আবদুল্লাহই।

: 'ওকে।' ইনায়া কোনোমতে বলেছিল।

: 'সে তোমার সঙ্গে দেখা করতেও চায়। নিউইয়র্কে এসেছে সে। আমি তাকে তোমার অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি।' ইমামা বলে চলল। ইনায়া তখন আপনা-আপনিই বলে উঠল, 'মান্নি প্লিজ! এখন এভাবে আমার মাথায় বাড়তি চাপ দিয়েন না। আজই আমাকে বিয়ের কথা বললেন, আর আজই তার সঙ্গে দেখা করতে বলছেন। তাছাড়া সম্বন্ধ যখন ঠিক হয়েই গেছে, এখন দেখা করে আর না-করেই কী লাভ?' সে যেন তার ভেতরের রাগটা বের করে দিল।

: 'তার পরিবারও হয়তো তার সঙ্গেই আছে। তার মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, পরেরবার যখন আসবে, তখন আমিও তাদের সঙ্গে দেখা করব। বাগদানের আনুষ্ঠানিক ফাংশন তো কয়েক মাস পরেই হবে।' ইমামা এমনভাবে কথা চালিয়ে গেল, যেন ইনায়ার বিরক্তি সে খেয়ালই করেনি।

ব্যথিত মনে ইনায়া পরবর্তী এক ঘন্টা সেখানেই বসে রইল। এক ঘন্টা পর তার দরজায় বেল বাজল। দরজা খুলে সে যাকে দেখল, তার মনে হলো শীতের মৌসুমে চারিদিকে বসন্ত এসে গেছে। গোলাপের আধফোটা একটি ফুল ডালসহ তাকে ধরিয়ে দিয়ে, দরজায়ই দাঁড়িয়ে সে ইনায়ার কাছে একটি বেলচা চাইল, দরজার বাইরে জমা বরফের ভূপ সরানোর জন্য। অনেক বছর পর তাদের আবার দেখা হচ্ছে। ইনায়ার সেই এরিককেই মনে পড়ছে, যে প্রায়ই তাদের বাড়ির ফুল ছিঁড়ে এনে তাকে আর ইমামাকে দিত। যার প্রিয় কাজ ছিল শীতকালে তাদের বাড়ির বাইরের বরফ সরানো।

: 'ওই তো তিনি।' আবদুল্লাহর ডাকে সে ভাবনা থেকে বেরিয়ে এলো। রেস্টুরেন্টের দরজা দিয়ে প্রবেশরত লোকটিকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। ইনায়া ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আহসান সাদের সঙ্গে এটি তার প্রথম সাক্ষাৎ। তার ধারণা নেই, এই সাক্ষাৎ তার জীবনে কত বড় ঝড় নিয়ে আসছে।

২০

সিকান্দার উসমান নীরবে সবার জীবন থেকে চলে গিয়েছেন। হামিন যাওয়ার পরের দিন তিনি আর ঘুম থেকে জাগেননি। বাড়িতে তখন কেবল ইমামা ও হামিন। তাইয়েবা তখন আমেরিকায়। হামিন সেই রাতে সব সময়ের মতো দীর্ঘক্ষণ সিকান্দার উসমানের পাশে বসে ছিল। হামিন যখনই পাকিস্তানে



আসত, ইমামা এবং উনার জন্যই আসত। অন্যান্য ভাই বোনের মধ্যে সিকান্দার উসমানের প্রতি হামিনেরই টান ছিল বেশি। সিকান্দারও তার প্রতি তেমনই ভালোবাসা পুষতেন। আলঝেইমারের সেই চরম পর্যায়েও হামিনকে দেখলে তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। অন্তত অন্যদের কাছে এমনটাই মনে হতো। কিছু বলতে না পারলেও তিনি তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, আর সেও দাদার হাত ধরে তার পাশে বসে থাকত। একা একাই উনার সঙ্গে কথা বলত। নিজেই প্রশ্ন করত, আবার নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিত, যেমনটা শৈশবে করত। শৈশবের বলা কথাগুলোই সে বলত। সিকান্দার উসমান তখন তার কথার জবাব দিতেন।

: 'দাদা, বলুন তো উটপাখির কটা পা?' উনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হামিন জিজ্ঞেস করত। সিকান্দার উসমান বিভ্রান্ত হতেন, উটপাখির ছবি মনে করার চেষ্টা করতেন। তারপর হাল ছেড়ে দিতেন।

'মুরগির দুটো হলে উটপাখিরও তো দুটোই হবে দাদা! এটা তো এক ঝটকায় বলে ফেলার মতো উত্তর।' সিকান্দার উসমান তার কথায় মাথা নাড়তেন। সিকান্দার উসমানের স্মৃতিশক্তির প্রদীপগুলো হামিন সিকান্দার একে একে নিভে যেতে দেখছিল। ছোট্ট শিশু হিসেবে আলঝেইমারের অর্থ না বুঝলেও, সে তার দাদার সঙ্গে মিলে সেই প্রদীপগুলোর আলো ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। তিনি কোনো কিছুর নাম ভুলে গেলে সে তাকে সান্ত্বনা দিত, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার দাদা। তাছাড়া ভুলে যাওয়াও অনেক ভালো। তাই হামিন নিজেও অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার ভান করত। সেটা ছিল একটা শিশুর যুক্তি, বড়দের কাছে তা দুর্বল মনে হতে পারে। কিন্তু সিকান্দার উসমানের সেই বয়সে, ওই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে, এমন যুক্তিরই প্রয়োজন ছিল। যা তাকে বিশ্বাস দিবে, তিনি ঠিক আছেন, সবকিছু স্বাভাবিক আছে।

এভাবেই উনার অসুস্থতা বেড়ে চলছিল। আর হামিনও ধীরে ধীরে ঘরের প্রতিটি জিনিসের নাম কাগজের টুকরোয় লিখে



সেটি ওই জিনিসের গায়ে লাগিয়ে রাখত। যাতে দাদা কিছু ভুলে না যান। তিনি যে জিনিসটি দেখবেন, তার নাম মনে করতে যেন তাকে কষ্ট করতে না হয়। ওসব কাগজের টুকরো ছিল শত শত। ওই রুমে আগত ব্যক্তিকে সিকান্দারের সঙ্গে সঙ্গে হামিনের ব্যাপারে ভাবতে বাধ্য করে দিত, যে তার অসুখের অংশীদার হয়ে লড়ে চলছিল।

অবশেষে হামিন এই রোগের কাছে সেদিন প্রথম হার মেনেছিল, সিকান্দার। ওসমান যেদিন তার নামও ভুলে গিয়েছিলেন। অবিশ্বাস্য চোখে সে তার দাদার দিকে তাকিয়েছিল। তিনি কীভাবে তার নাম ভুলে যেতে পারলেন? সেই সত্তাটির নাম, যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বারো ঘন্টাই তার আশেপাশে থাকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে। সিকান্দার উসমান তার নাম মনে করার চেষ্টা করছিলেন, আটকে যাচ্ছিলেন, বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন, তোলতাচ্ছিলেন, আকুতি জানাচ্ছিলেন, আর হামিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সেই সংগ্রাম আর অসহায়ত্ব দেখছিলেন।

এরপর সে চুপচাপ সেন্টার টেবিলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। সেখানে থাকা একটি সিঁক অন চিট তুলে তাতে নিজের নাম লিখে, সেটা তার কপালে লাগিয়ে সিকান্দার উসমানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওই মুহূর্তে হামিন গলা ছেড়ে কাঁদতে চেয়েছিল এবং হয়তো জীবনে প্রথমবার, কিন্তু সে কাঁদল না। সে যেন সিকান্দার উসমানের সামনে একে ঠাটা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আলঝেইমারের সঙ্গে যুদ্ধরত সেই মানুষটির কাছে এটি ঠাটা ছিল। না। তিনি তার নামের বানান করতে করতে হেসে ফেলেছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে ওখানে দাঁড়িয়েই তিনি দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁদতে শুরু করেছিলেন। শরীরের উচ্চতা আর বয়সের তুচ্ছতায় ছোট্ট হামিন তার চেয়ে বড় ও বয়স্ক অক্ষম মানুষটিকে সান্ত্বনা দিয়েছিল পরম মমতায়। যে মানুষটি তার প্রিয় মানুষগুলোর নামও মনে রাখতে পারছিলেন না। উনার এই অসুস্থতা হামিন সিকান্দারকে সময়ের আগেই

পরিণত করে তুলেছিল। সালার সিকান্দারের অসুস্থতা সয়েছিল জিবরিল। আর হামিন সয়েছিল সিকান্দার উসমানের অসুস্থতা। হামিনকে তিনি নিজের সাথে বেড়িয়ে রাখতে তাকে এটা-সেটা দিতে শুরু করেছিলেন।

: 'দাদা, আপনার এটা করার কোনো দরকার নেই।' হামিন যেন বুঝতে পারছিল যে, তিনি কীসের জন্য এই বাটার ডিল আর বিনিময় চুক্তি করছেন।

: 'পৃথিবীতে আমার যতটুকু সময় আছে, পুরোটা আপনার জন্য।' হামিন যেন উনাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইত। তিনি তবু তাকে কিছু না কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতেন। হামিন উনার বহু গোপনীয়তা সম্পর্কেও ছিল অবগত। এমন অনেক জায়গার ব্যাপারেও জানত, যেখানে তিনি তার মূল্যবান জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতেন। তার ওপর উনার এতটাই বিশ্বাস ছিল যে, কোনো কিছু লুকানোর সময় শুধু হামিনকে বলতেন। সেটা শুধু এই ভয়ে যে, লুকানোর পর তিনি হয়তো সেই জায়গার নাম

ভুলে যাবেন। সত্যি সত্যিই এমনটাই হতো, তিনি তা ভুলে যেতেন। হামিনই উনার সেই জিনিসটি বের করে দিত। সেই ঘরটা যেন এই দুই দাদা-নাতির জন্য 'লুকোচুরি খেলার' ময়দান হয়ে গিয়েছিল।

: 'তুমি একদিন অনেক বড় মানুষ হবে।' সিকান্দার উসমান প্রায়ই তাকে বলতেন। 'তোমার বাবার চেয়েও বড়।'

সে উনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। কিন্তু মাঝখানে থামিয়ে জিজ্ঞেস করত, 'শুধু বড় মানুষ হব, নাকি ধনীও হব? বাবা তো ধনী নন।' তাকে যেন এই চিন্তা পেয়ে বসে ছিল। সিকান্দার উসমান হেসে উঠতেন।

: অনেক ধনী হবে, অ..নেক, অ...নেক।

: 'তাহলে ঠিক আছে।' এতে সে যেন আশ্বস্ত হতো। 'কিন্তু আপনি কীভাবে জানেন?' হঠাৎ তার মনে এই প্রশ্ন জাগত।

: 'কারণ আমি তোমার জন্য দোয়া করি।' সিকান্দার উসমান তার সেই বৃদ্ধ বয়সের লাঠিটির দিকে তাকালেন, যা তার সবচেয়ে প্রিয় ছেলে সালারের পক্ষ থেকে তার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার-সেই ছোট্ট হামিন সিকান্দার।

: 'ওকে।' হামিনের মনে তখন আরও অনেক প্রশ্ন এসেছিল, কিন্তু সে আর তখন দাদার সঙ্গে অত তর্কে গেল না।

: 'দুনিয়াতে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি তোমার ওপর।' তিনি প্রায়ই তাকে বলতেন, আর তা খুব গুরুত্ব দিয়েই বলতেন।

: আর আপনিই একমাত্র মানুষ, যে আমাকে বিশ্বাস করোতার উত্তরে সিকান্দার উসমান যেন বাচ্চাদের মতো হাসতে থাকেন।

: 'আমি যখন এই দুনিয়া থেকে চলে যাব, তখন এই আংটিটা তুমি ইমামাকে দিয়ে দিয়ো।' বিশ্বাসের তেমনই এক মুহূর্তে হামিনকে তিনি সেই আংটিটা দেখালেন, যেটা সে বহু বছর তার মায়ের আঙুলে দেখেছিল।

: 'এটা তো মান্নির আংটি!' হামিন যেন চিৎকার করে উঠেছিল।

: 'হ্যাঁ, তোমার মান্নিরই। সালার বিয়ের সময় তাকে গিফট করেছিল। পরে সে এটা বিক্রি করে সালারের সকল প্রকল্পে কিছু বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল। তখন আমি এটা নিজের কাছে রেখে সেই টাকা তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি যদি তাকে এটা ফিরিয়ে দিই, তাহলে সে নেবে না। আর আমি চাই না যে, এটা বিক্রি করে সে আর সালার আমার ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করুক।' সিকান্দার উসমান বলতে থাকলেন। তারপর আংটিটা তিনি একটি থলেতে ভরে ওয়ারড্রবের একটি গোপন কুঠুরিতে হামিনের সামনে রেখেছিলেন। সেই গোপন কুঠুরি হামিনও ওই প্রথমবার দেখেছিল।

: 'আপনি এটি লকারে রাখছেন না কেন?' সিকান্দার উসমানকে
সে পরামর্শ দিয়েছিল। তিনি হেসে ফেলেছিলেন।

: আমার মৃত্যুর পর লকারে যা পাওয়া যাবে, তা সবার যৌথ
সম্পত্তি হবে। ইমামাকে কেউ এটা দেবে না।

: 'তাহলে তো আপনি তা উইল করে লিখে যেতে পারেন।'
সিকান্দার এই কথায় হাসতে শুরু করেছিলেন।

: 'আমার সন্তানরা খুবই ভালো। কিন্তু আমি জীবিত
থাকাকালীনই তাদেরকে অনেক কথা মানাতে পারি না, তাহলে
মৃত্যুর পর কীভাবে মানাব? যখন তোমার সন্তান হবে, তখন
আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে।' তিনি যেন পরম মমতায়
তাকে কথাগুলো বললেন।

সিকান্দার উসমানের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর, তার সন্তানরা সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারার জন্য ওই বাড়িতে একত্রিত হয়েছিল। আর হামিন সিকান্দার তখন দাদার সেই কথাগুলো বুঝতে পারল। সিকান্দার তার জীবদ্দশাতেই সবকিছু ভাগাভাগি করে দিয়েছিলেন। নিজের কাছে তিনি কেবল কয়েকটি জিনিস রেখেছিলেন। তার মধ্যে সেই বাড়িটিও। কিন্তু এই কয়েকটি জিনিসের মালিকানা নিয়েও সবার মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এই মতভেদ আরও বৃদ্ধি পেত, সালার সিকান্দার যদি সিকান্দার উসমানের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার অংশ দাবি করত। এটি ছিল তাদের পরিবারের একটি যৌথ সিদ্ধান্ত।

সিকান্দার উসমানের অবশিষ্ট সম্পদ থেকে সালার সিকান্দার কিছুই নেয়নি। তবে সিকান্দারের সেই বাড়িটি হামিন সিকান্দার কেনার প্রস্তাব করেছিল। কারণ, তাইয়েবা আগে থেকেই বেশিরভাগ সময় তার ছেলেদের কাছে বিদেশে থাকতেন, আর এখন স্থায়ীভাবে তাদের কাছে থাকতে চাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি বিদেশে শিফট করার পর, ওই বাড়িটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্তের সময় ইমামার কথা কেউ ভাবেনি। যারা বুঝতে পেরেছিল, সিকান্দার উসমানের মৃত্যুর পর একটি পরিবার আবারও গৃহহীন হতে চলেছে। আর সেই গৃহহীন সালারের পরিবারের জন্যই কেবল হামিন সেই বাড়িটি কিনেছিল। কিনেছিল তার মমতাময়ী মায়ের জন্য। এবং তাদের সেইসব স্মৃতির জন্য, যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তাদের প্রতিটি ভাই-বোনের সঙ্গে। যে দামে সে তখন বাড়িটি কিনেছিল, তা ছিল বাজার মূল্যের চেয়েও দ্বিগুণ!

২১

: 'মাম্মি, আপনাকে একটি আমানত ফিরিয়ে দিতে চাই।' রাতে হামিন তার বাবা-মায়ের ঘরে এলো। সকালেই সে আমেরিকায় ফিরে যাবে। একে একে সবাই ফিরে যাচ্ছে। সালার ও ইমামা



দুজনেই একটু আগেই বাইরে থেকে ফিরেছে। ফিরতেই হামিন টোকা দিয়ে তাদের রুমে চলে এসেছে।

: 'আমানত?' তারা খানিক অবাক হলো। হামিন একটি থলে ইমামার হাতে দিয়ে, তার কাছেই সোফায় বসে পড়ল।

: 'এটা কী?' ইমামা খানিক অবাক হয়ে প্রথমে হামিন, তারপর সালারের দিকে তাকাল। সালার ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

: 'আপনি নিজেই দেখে নিন।' হামিন তাকে বলল। ইমামা থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ভেতরের জিনিসটা বের করে স্তবির হয়ে গেল। ফোনে ব্যস্ত সালারও তার মতোই থমকে গেল। এক মুহূর্তেই তারা সেই আংটিটি চিনে ফেলবে না, তা তো সম্ভব নয়! এটি তাদের জীবনের সেরা এবং সবচেয়ে মূল্যবান স্মৃতি বলে কথা!

: 'এটা তুমি কোথায় পেলে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল ইমামা। সালার কল কেটে দিল।

: 'শৈশবে দাদা আমার সামনে এটি একটি ড্রয়ারে রাখতে সময় বলেছিলেন, তিনি যদি ভুলে যান, তাহলে তার মৃত্যুর পর আমি যেন সেটা বের করে আপনাকে দিয়ে দিই।' হামিন বলে চলল। 'তিনি আপনাকে এটি ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার ভয় ছিল, আপনি হয়তো এটি নেবেন না। আর সম্ভবত আপনি ও বাবা তার ঋণ শোধ করার জন্য এটি বিক্রিও করে দেবেন।'

চোখের জল বন্যার মতো গড়িয়ে ইমামার চেহারা ভিজিয়ে দিচ্ছে। সিকান্দার উসমান সবসময় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি যেভাবে সেই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করলেন! ইমামাকে কিছু বলার যোগ্যই রাখলেন না। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল স্বশুর।

: 'তুমি তো আগে কখনো এই আংটির কথা বলোনি।' সালার তার সামনে বসা সেই ছেলেটিকে দেখল, যে আজও শৈশবের মতোই অদ্ভুত এবং গভীর।

: 'তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, এই আংটির কথা আমি কখনো কাউকে বলব না। এটি ছিল একটি আমানত। আমি খেয়ানত করতে তো পারতাম না।' হামিন একটা অদ্ভুত হাসি মেখে বাবাকে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। সে মসৃণ পায়ে হেঁটে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তারা দুজন তার চলে যাওয়া পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'এই আংটিটি আমি হামিনের স্ত্রীকে হাদিয়া দেব। এতে কারও হুক থেকে থাকলে, সেটা হামিনেরই রয়েছে।' সে চলে যেতেই ইমামা শান্ত স্বরে সালারকে বলল। সেই আংটিটি আবারও তার হাতে। ভেজা চোখে সে তাকিয়ে আছে সেটির দিকে। বহু বছর পর, বহু বছর আগের স্মৃতিগুলো পুনরায় সতেজ হয়ে উঠল। জবাবে সালার কিছু বলল না। সে ইমামার হাত থেকে আংটিটি

নিয়ে, অতি যতনে তার আঙুলে পরিয়ে দিল। তার সরু আঙুলে
এটি আজও একদম এঁটে গিয়েছে।

: 'তোমার প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ, ইমামা!' সালার তার দুই
হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগল। 'তুমি যেভাবে পাপার
সেবা করেছ, আমি তা কখনো করতে পারতাম না, আর
করিওনি।'

: 'সালার...!' ইমাম তাকে বাধা দিল। 'তুমি আমাকে লজ্জায়
ফেলছ।'

: 'জীবনে যদি আবার জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সুযোগ পাই,
তাহলে চোখ বন্ধ করে তোমাকেই বেছে নেব, ইমামা!' সালার
তাকে বলল আর ভেজা চোখে খিলখিল করে হেসে উঠল
ইমামা।

তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, আঙুলের পিঠে ঝলমলে আংটিটির দিকে আবারও তাকাল ইমামা। সালারের থেকে দূরে থেকে, এই বাড়িতে বসেই সে ষোলো বছরের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ভুগেছে। কয়েক বছরের জন্য যখন সে এখানে এসেছিল, তখন তার মনে হয়েছিল, সে যেন একটি তীক্ষ্ণ তরবারির ওপর খালি পায়ে হাঁটছে। রাতদিন সিকান্দার উসমানের খেদমত করতে করতে সালারের জন্য ভীত হয়ে থাকত। সালারকে সে এটা কখনো জানায়নি। কিন্তু মনে মনে সবসময় দোয়া করত, সিকান্দারের খেদমতের বিনিময়ে আল্লাহ যদি তাকে কোনো পুরস্কার দেন, তাহলে যেন তিনি সালারের নেক হায়াত ও সুস্থ জীবন দেন। আর আজ ষোলো বছর পর তার মনে হচ্ছে, আল্লাহ হয়তো তার দোয়া কবুল করেছেন। সালারের হায়াত ও সুস্থতা দান করেছেন। জীবনের এই ষোলোটি বসন্ত পার করে, অবশেষে সে আবার তার পরিবারসহ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় থাকতে পারবে। নিঃসন্দেহে সে তার রবের কোনো নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না।

: 'হিশাম আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।' জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হামিন রাইসাকে বলল। রাইসাও এখন সিকান্দার উসমানের বাড়িতেই আছে। সেও এখানে কিছুদিন থাকবে। হামিনকে সে কিছু জিনিসপত্র দিতে এসেছে। আর হামিন হঠাৎ এই প্রসঙ্গ তুলল।

: 'সে হয়তো দাদার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে চায়।' রাইসা এক মুহূর্ত থমকাল, তারপর স্বাভাবিকভাবে বলল।

: 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এমন।' হামিন একইভাবে তার কাজে ব্যস্ত হয়ে বলল। 'সমবেদনার জন্য সে তোমার সঙ্গে

দেখা করত, বা বাবার সঙ্গে। আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন ছিল না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো কথা হয়েছে?" ব্যাগের জিপার বন্ধ করতে করতে হামিন তার চিরন্তন অকপট ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। রাইসা কয়েক মুহূর্ত ভাবল, তারপর কয়েক সপ্তাহ আগে তার ও হিশামের দেখা করার কথা বলল। তাদের মধ্যকার কথোপকথন শোনাল।

: 'তাহলে এখন সে কী চায়?' পুরো আলোচনা শোনার পর হামিন শুধু এই একটি প্রশ্নই করল। কোনো মন্তব্য করল না।

: জানি না, হয়তো আমাকে বোঝানোর জন্য বলবে তোমাকে।

হামিন মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি যেন তোমাকে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজি করাই, সে কখনো এটা আমাকে বলবে না। এমন প্রস্তাব আমাকে করবে না, এতটুকু বুদ্ধিমান তো সে অবশ্যই।' হামিন কিছু ভাবতে ভাবতে বলল।

: 'রাইসা, তুমি কী চাও?' কয়েক মুহূর্ত পর হামিন রাইসাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

দেখা করার প্রয়োজন ছিল না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো কথা হয়েছে?' ব্যাগের জিপার বন্ধ করতে করতে হামিন তার চিরন্তন অকপট ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল। রাইসা কয়েক মুহূর্ত ভাবল, তারপর কয়েক সপ্তাহ আগে তার ও হিশামের দেখা করার কথা বলল। তাদের মধ্যকার কথোপকথন শোনালা।

: 'তাহলে এখন সে কী চায়?' পুরো আলোচনা শোনার পর হামিন শুধু এই একটি প্রশ্নই করল। কোনো মন্তব্য করল না।

: জানি না, হয়তো আমাকে বোঝানোর জন্য বলবে তোমাকে।

হামিন মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি যেন তোমাকে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজি করাই, সে কখনো এটা আমাকে বলবে না। এমন

প্রস্তাব আমাকে করবে না, এতটুকু বুদ্ধিমান তো সে অবশ্যই।
হামিন কিছু ভাবতে ভাবতে বলল।

: 'রাইসা, তুমি কী চাও?' কয়েক মুহূর্ত পর হামিন রাইসাকে
সরাসরি জিজ্ঞেস

করল।

: 'আমার পছন্দের কোনো ব্যাপার নেই।' সে উদাসীনভাবে
হাসল। 'তার সমস্যাটাই মূল। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ওরা
রাজপরিবার, তাদের নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। নিজস্ব চিন্তাধারা
আছে। বহু আগেই নিজেকে তার থেকে গুটিয়ে নেওয়া উচিত
ছিল আমার।'

হামিন তার দিকে তাকিয়ে রইল। হামিনের সামনে বসে সে যেন
নিজে নিজেই কথা বলে যাচ্ছে। যেন নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা
করছে।

: 'রাজারা সবসময় দুর্বলচিত্ত।' হামিন মৃদু স্বরে তাকে বলল। রাইসা কথা বলতে বলতে থেমে গেল। 'আর দুর্বলচিত্তরা না পারে ভালোবাসতে, না পারে শাসন করতে। আর না পারে প্রতিশ্রুতি রাখতে। এমনকি সম্পর্ক ধরে রাখতেও পারে না।' হামিন যেন হিশামের সমস্যাগুলো চারটি বাক্যে তাকে বুঝিয়ে দিল, যা সে বুঝতে চাচ্ছে না। 'মানুষ তো ভালোবাসার জন্য সিংহাসন এবং রাজমুকুটও ত্যাগ করে, তাহলে সেও করুক। রাজা হলে যদি তোমাকে জীবনসঙ্গী করতে না পারে, তাহলে রাজত্ব ছেড়ে দিক।'

রাইসা হেসে উঠল। 'রাজত্ব ছেড়ে দেবে...? আমার জন্য...? আমি এতটাও মূল্যবান নই হামিন! যে-কেউ আমার জন্য রাজত্ব ছেড়ে দেবে।' সে ভীষণ অকপটে বলল।

: 'হতেও পারে। হয়তো তুমি তা জানো না। আর যদি সে তোমার মূল্য বুঝতে সক্ষম না হয়...।' হামিন স্পষ্ট ভাষায় বলে

চলল। 'তাহলে সমাধান আমার কাছে আছে। এখন দেখি সে বোঝে কি না। আমেরিকায় ফিরে আমি তার সঙ্গে দেখা করব।' হামিন ঘোষণা করে বলল। রাইসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

২৩

: 'ডাক্তার আহসান সাদ আপনাকে খুব ভালো করে চেনেন। বরং তিনি বলছিলেন, উনার বাবা সাদও নাকি আববুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আবদুল্লাহই বলছিল, ডাক্তার আহসান সাদ আর তার বাবাও নাকি, দাদার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে আমেরিকায় এসে আববুর সঙ্গে দেখা করবেন।' হাঁটতে হাঁটতে ইনায়া বলে চলল।



ইনায়া ও জিবরিল লনে হাঁটছে, তখন হঠাৎ আবদুল্লাহর কথা উঠতেই আহসান সাদের কথা মনে পড়ল তার। তাদের মধ্যকার কথোপকথন জিবরিলকে বলাটা জরুরি মনে করল সে। আহসান সাদের নামটিই জিবরিলকে চমকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে আরও বেশি অবাক হলো, যখন শুনল ইনায়া যার কথা বলছে, সেই আহসান সাদ কেবল জিবরিল সিকান্দারকে চেনেই না, বরং তার বাবাও সালারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে কিছুটা বিভ্রান্ত হলো। এটি কোন আহসান? যে আহসানের সঙ্গে সে দেখা করেছিল, সে তো এমন কোনো কথা বলেনি!

আয়েশার প্রাক্তন স্বামীর ব্যাপারে সে বিস্তারিত কিছু জানে না। তার নাম, পেশা এবং এসেটট, এতটুকুই জানে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছে না, এই আহসানই কি সেই আহসান? নাকি ইনায়া অন্য কারও কথা বলছে? বিষয়টি তাকে বিভ্রান্ত করছে।

: 'আবদুল্লাহ তো তার প্রতি ভীষণ ইন্সপায়ার্ড। সে বলছিল, বিয়ের সাক্ষীতে সে আহসান সাদকেও রাখবে। আহসান সাদকে তো সে পির-মুরশিদ বানিয়ে ফেলেছে। সব কথাতেই তার উপমা টানো।' ইনায়া কথাগুলো বলছে, আর জিবরিল ভীষণ অস্থির হয়ে উঠছে। 'আবদুল্লাহ তার সঙ্গেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। আমার কাছেও ভালো লেগেছে তাকে। আলোচনা তো তার আগেও শুনেছি আবদুল্লাহর মুখে। কিন্তু দেখা করে অবাক হয়েছি যে, তিনি বেশ ইয়াং। দীনের ব্যাপারে অনেক জানাশোনা উনার। সেই সঙ্গে হাফেজে কুরআনও।'

মিল বেড়েই চলছে। জিবরিল এবার আর না বলে থাকতে পারল না।

: 'সে কি বিবাহিত?' মনে মনে সে কামনা করল, এ যেন অন্য কোনো আহসান

সাদ হয়।



: 'না, কেবল এটাই তার জীবনের ট্র্যাজেডি।' ইনায়ার এই উত্তর যেন তার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলল। তবু ইনায়া বলে চলল, 'তার স্ত্রী ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন সাইকো। চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তার। আর বেচারী আহসান সাদ তা জানতেই পারেনি। এরপর তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়, কিন্তু স্ত্রী সেই সন্তানের অভিভাবকত্ব ছাড়েনি। সে আর তার বয়ফ্রেন্ড মিলে ওই প্রতিবন্ধী ছেলেটিকে খুন করে ফেলে, যাতে তারা দুজন বিয়ে করে সংসার সাজাতে পারে। সেই সঙ্গে সন্তানের নামে লিখিত সম্পত্তিও জবরদখল করতে পারে। আহসান তার প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেছিল। তখন সেই মহিলা নাকি মীমাংসার চেষ্টা করে। ছেলের নামে থাকা সমস্ত সম্পত্তি আহসানের নামে লিখে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। অনেক ভালো মানুষ তিনি। তিনি বলছিলেন, স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিবেন। না করেই আর কী লাভ, ছেলে তো আর নেই!' ইনায়া ভীষণ সহানুভূতিশীল হয়ে সেই বিস্তারিত ঘটনা শোনাচ্ছে।

: 'তুমি কি জানো তার সেই বয়ফ্রেন্ড কে, যে আহসান সাদের স্ত্রীর সঙ্গে মিলে তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে খুন করেছিল?' জিবরিল হঠাৎ তাকে থামিয়ে বলল। ইনায়া অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জিবরিলের প্রশ্নটা যতটা অদ্ভুত, তার স্বর ও অভিব্যক্তি তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত।

: 'না, আমি কী করে জানব? তবে আবদুল্লাহ, আহসান সাদকে বলছিল, তার প্রাক্তন স্ত্রী আর তার বয়ফ্রেন্ডকে ক্ষমা করা উচিত নয়। আমারও তা-ই মনে হয়।' ইনায়া অনর্গলভাবে বলল। কিন্তু জিবরিলের পরের বাক্যটি যেন তার মাথা ঘুরিয়ে দিল।

: 'আমিই সেই বয়ফ্রেন্ড।' সে অত্যন্ত ভাবলেশহীন গলায় বলল। 'আর ইনায়া! এরিক আবদুল্লাহর সঙ্গে আমি তোমার বিয়েও হতে দেব না।'

তার পরের বাক্যটি এখন আগেরটির চেয়েও অবিশ্বাস্য!

সিকান্দার উসমানের বেডরুমের দরজা খুলে সালার তাতে প্রবেশ করল। লাইট অন করে সে সিকান্দারের বিছানার দিকে তাকাল। সেখানে এখন আর কেউ নেই। তার চোখে হালকা জলের আভা দেখা দিল। বহু বছর তার আর বাবার মধ্যে কেবল নীরবতার সম্পর্কই ছিল। তাদের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হতো না। তা সত্ত্বেও উনার অস্তিত্বে সে এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করত।

: 'তোমাকে আমি আমার চোখের সামনে হারিয়ে যেতে দেখতে পারব না, সালার! তাই শুধু এই দোয়াই করি, তোমার আগে যেন আমি চলে যাই। আল্লাহ যেন কোনোভাবেই আমাকে তোমার কষ্ট না দেখান।' সালারের মনে হচ্ছে, কথাগুলো যেন আবারও রুমজুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার অসুস্থতার সময় তিনি বহুবার এই কথাগুলো বলেছিলেন। অবশেষে তার দোয়া কবুল হয়েছিল-তিনি সালারের কষ্ট দেখে যাননি।

: 'কী আসে-যায়, বাবা? সবাইকে তো চলে যেতেই হবে। এ হলো দুনিয়া, এই মঞ্চে যার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, সে চলে যায়।' সালার বহুবার উত্তরে বাবাকে বলত।

: 'যুবক ছেলের মৃত্যুশোক আল্লাহ যেন কাউকে না দেখায়, সালার।' তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। আর সে অসুস্থ হওয়ার পরই উনার চোখে অশ্রু দেখতে শুরু করেছিল।

এর আগে কখনো কাঁদতে দেখেনি উনাকে। তারা এখন এই বাড়িটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই ঘর, এই বাড়ি এখন জনশূন্য হতে চলেছে। সে এখানে দুই সপ্তাহ ধরে আছে। এর বেশি আর থাকতে পারছে না। হামিন আগেই চলে গেছে, এখন জিবরিল আর ইনায়াও তার পিছু নেবে। এরপর ইমামা, যে সবার শেষে এখান থেকে যাবে। আর তারপর, কে জানে এই বাড়িতে তারা আবার কবে একসাথে হবে, নাকি হবেই না। একসাথে হলেও, কে জানে তা কবে! জীবন কী এক অদ্ভুত জিনিস, কীভাবে হাত ফসকে যায়! সময় কী এক বিচিত্র বস্তু-থামলে একেবারে থেমে যায়, আর চললে যেন দুর্দান্ত ছুটে চলে।

'আমি আপনার মতো বাবা কখনো হতে পারিনি না, বাবা!' সে ওখানে বসে বসে যেন স্বগতোক্তি করল। 'আমি আপনার মতো ছেলেও কখনো হতে পারিনি।' সালার থেমে পুনরায় বলল। 'কিন্তু আমার ছেলেরা যেন আপনার মতো বাবা হয়, আর আপনার মতোই ছেলে হয়, আমার মতো নয়-শুধু এইটুকুই আমার প্রার্থনা।'



ভেজা চোখে টেবিলে রাখা বাবার চশমাটি তুলে, ছুঁয়ে দেখল
সে। তারপর আবার সেটি টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল।

২৫

ইমামা জিবরিলের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। মুহূর্তের জন্য
যেন তার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না। ইনায়া, আবদুল্লাহ,
আহসান, আয়েশা এবং নিজের ব্যাপারে সে যা কিছু বলল,
সবই যেন তার মাথায় জট পাকিয়ে গেছে।

: 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, জিবরিল।' কথাটা সে না বলে
পারল না।



: 'মান্নি....আই অ্যাম স্যরি।' জিবরিল তার চেহারা দেখে বুঝতে পারল, তার মাকে সে চিন্তিত ও হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। জীবনে এই প্রথম মায়ের কাছে সে কোনো মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলছে, আর সেটাও এমন একটি বিষয়, যেখানে তার ওপর অভিযোগ আনা হচ্ছে। আয়েশা আবেদিন কে? ইমামা জীবনে কখনো এই নামই শোনেনি। আর জিবরিলের সাথে তাকে জড়িয়ে কেন এক ব্যক্তি তার ওপর অভিযোগ তুলছে? যে ব্যক্তিটি কিনা তার মেয়ের জামাইয়ের অনুপ্রেরণার উৎস? জিবরিল কেন হঠাৎ আবদুল্লাহর সঙ্গে ইনায়ার বিয়ের বিরুদ্ধে চলে গেল? অথচ আগে একমাত্র সে-ই ইমামার কাছে এসে আবদুল্লাহর পক্ষ নিয়ে কথা বলত!

: 'আমি এসব আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইনি, কিন্তু এছাড়া এখন আর কোনো উপায় দেখছি না।' জিবরিল কি এ নিয়ে লজ্জিত বেশি, নাকি চিন্তিত? তা বোঝা যাচ্ছে না।

: 'কিন্তু এসবের মধ্যে ইনায়া আর আবদুল্লাহর কী অপরাধ?'
ইমামা বলল।

: 'মাম্মি, সে যদি ওই ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে
সেও ওই ব্যক্তির মতোই ইনায়ার সঙ্গে আচরণ করবে, যে
আচরণ আমি আয়েশার সঙ্গে করতে দেখেছি। আর এমনটা
আমি আমার বোনের সঙ্গে হতে দেব না।' জিবরিল স্পষ্ট ভাষায়
বলল।

: 'তুমি কি এ বিষয়ে ইনায়ার সঙ্গে কথা বলেছ?' ইমামা ভীষণ
উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, আমি করেছি। আর সে খুব ভেঙে পড়েছে।' ইমামা এর
আগে কখনো জিবরিলকে এমন চিন্তিত হতে বা কোনো বিষয়ে
এত কঠোর হতে দেখেনি।

: 'আয়েশা আবেদিনের সমস্যাটা তো অনেক মাস ধরেই চলছে, তাহলে তুমি আমাকে এর আগে কখনো বলোনি কেন?' ইমামা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

এগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর অভিযোগ। সন্তানের ওপর অন্ধবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ইমামা যেন কেঁপে উঠেছিল। জীবনে এই প্রথম নিজের সন্তানের ব্যাপারে এমন কোনো কথা শুনতে হলো, সেটাও জিবরিলের ব্যাপারে! যদি হামিনের ব্যাপারে কিছু শুনত, তাহলে হয়তো তা তার কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু হতো না। হামিনের কাছে সে সবকিছুই আশা করতে পারে, কিন্তু জিবরিলের কাছে!

: 'বলার মতো কিছু ছিলই না, মান্নি।' জিবরিল যেন কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করল। 'সে আমার এক বন্ধুর বোন। বন্ধুটি তাকে সাহায্য করতে বলল, আর আমি তাতে আগ্রহী হলাম। তাকে সাহায্য করতে আগ্রহের কারণ ছিল আমার অপরাধবোধ। আমার মনে হয়েছিল, অপারেশনে ডাক্তার ভিজেলের হয়তো

কোথাও ভুল হয়েছে। যদিও এতে আমার কোনো দোষ ছিল না, তবু আমি তার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছিলাম। আমি কি জানতাম যে, একটা সাইকো লোক এসে অকারণে আমাকে তার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে জড়ানোর চেষ্টা করবে?' জিবরিল বলে চলল। 'That man is..... সে বলতে বলতে থেমে গেল। যেন আহসান সাদকে বর্ণনা করার মতো তার কাছে কোনো শব্দই নেই।

: 'তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে। এত বড় সিদ্ধান্ত আমরা একা নিতে পারি না।' জিবরিলের কথা শেষ হলে ইমামা বলল।

: 'সিদ্ধান্ত বড় হোক বা ছোট, মান্নি! ইনাযাকে আমি আবদুল্লাহর সঙ্গে বিয়ে দিতে দেব না।' জিবরিল সম্ভবত জীবনে এই প্রথম ইমামার কাছে কোনো বিষয়ে জেদ করল।

: 'অন্য কারও অপরাধের শাস্তি আবদুল্লাহকে দিতে পারি না আমরা।' ইমামা মৃদুস্বরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

: 'আবদুল্লাহ আমার দায়িত্বে নয়, ইনায়া আমার দায়িত্বে। আমি ঝুঁকি নিতে পারি না, আর আপনারও নেওয়া উচিত নয়।' সে যেন তার মাকে সতর্ক করেছে। ইমামা এবার সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

: 'তোমার বাবা যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা-ই উত্তম হবে। আর তুমি ঠিকই বলেছ, ইনায়ার জন্য আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। কিন্তু আমরা আবদুল্লাহর কথা না শুনেও এভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। আবদুল্লাহর সঙ্গে একবার কথা বলা উচিত।' ইমামা বলল। জিবরিল খানিক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল। চলে যেতে যেতে দরজার কাছে পৌঁছাতেই ইমামা তাকে ডাকল। সে ঘুরে তাকাল।

: সত্যি করে একটা কথা বলো আমাকে।



মায়ের প্রশ্ন ও বলার ধরন দেখে সে অবাক হলো।

: বলুন।

: তুমি কি আয়েশা আবেদিনকে পছন্দ করো?

জিবরিল যেন নড়তে পারল না।

২৬

হামিন সিকান্দরকে দেখে সে প্রভাবিত হচ্ছে বেশি, নাকি ভীত? তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না হিশাম। তবে সে যে

ঈর্ষান্বিত হচ্ছে, তা নিশ্চিত। রাইসার সঙ্গে পরিচয়ের আগে থেকেই সে হামিনকে চেনে। নিজের সমবয়সি এই যুবক সম্পর্কে তার মনে ততটাই কৌতূহল ছিল, যতটা কৌতূহল থাকতে পারে কোনো ব্যবসায়িক মানুষের মনে। কারণ, ব্যবসার পরিকল্পনার জন্য হামিন আগে থেকেই বিশ্বজুড়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে।

হিশামের বাবা আমেরিকায় কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনকালে অনেকগুলো ইনকাম ট্যাক্স অভিযান চালিয়েছিলেন। হামিন সিকান্দারের কোম্পানিও সেই অভিযানগুলোর আওতায় এসেছিল। রাইসার সঙ্গে পরিচয়ের আগে সে সরাসরি কখনো হামিনের সঙ্গে দেখা করেনি। তবে তার বাবা দেখা করেছিলেন। এবং তিনি ছিলেন তার দারুণ ভক্ত। যখন তিনি হামিনের সঙ্গে দেখা করেন, তখন তার বয়স ছিল বিশের কোঠায়। সে সময় যাদের সঙ্গে সে ব্যবসা করত, তারা তার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ তো বটেই, বরং চারগুণ বড়ও ছিল অনেকেই। তা সত্ত্বেও তার ব্যবসায়িক ও আর্থিক বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন

করার সাহস করত না। সে যখন কথা বলত, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনত। কোনো বিবৃতি দিলে তা নিয়ে আলোচনা হতো। কোনো পণ্যের পরিকল্পনা ঘোষণা করলে পুরো শেয়ার বাজারের নজর কেড়ে নিত। সে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করবে, আর তা ব্যর্থ হবে-এমনটাও কখনো হতো না।

হামিন সিকান্দারের প্রতি প্রভাবিত মানুষের তালিকায় হিশামও একজন। আবার কিছুটা ভীতও সে। তবে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা শুরু হয়েছিল রাইসার কারণে। যে মেয়েটিকে হিশাম ভীষণ ভালোবাসে, সে কেবল একজন মানুষকেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, কেবল একজন মানুষের কথাই বারবার বলে। আর দুর্ভাগ্যবশত, সেই মানুষটি এমন একজন মানুষ, যার প্রতি হিশাম আগে থেকেই কিছুটা ভীত। ফলে তার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতিই হিশাম অনুভব করতে পারছে না, এটা জানা সত্ত্বেও যে, রাইসা তাকে শুধু একজন বন্ধু এবং ভাই হিসেবেই দেখে। আর হামিনও তাকে একজন আন্তরিক বন্ধু ও বোনই মনে করে।

রাইসার সঙ্গে পরিচিতির পর হামিনের সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার স্বাভাবিক দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, তবে এই প্রথম সে তার সঙ্গে একা দেখা করতে যাচ্ছে, তাও আবার তারই বাড়িতে! সে যদি এখন বাহরাইনের যুবরাজ না হতো, তাহলে এই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রচণ্ড হীনম্মন্যতায় ভুগত। হামিন সিকান্দারের সাফল্য আর বুদ্ধিমত্তা, যে-কাউকেই এই অনুভূতিতে লিপ্ত করতে বাধ্য। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে ব্যয়বহুল একটি এলাকা এটি। এখানকার সাতান্ন-তলা ভবনের ছাদে তৈরি এক পেন্টহাউসে হামিন সিকান্দার তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। হিশামের বডি গার্ডদের ভবনের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। কারণ, প্রবেশপথে অতিথিদের তালিকায় শুধু হিশামের নাম রয়েছে। তাতে কোনো যুবরাজ বা রাজকীয় উপাধি যুক্ত নেই। গত কয়েক মাসে এই প্রথম মহামান্য যুবরাজ উপাধি রেখে, কেবল হিশাম বিন সাবাহ হিসেবেই তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এতে তার খারাপ লাগছে না, তবে কিছুটা অদ্ভুত লাগছে।

: 'তুমি সময়মতো এসেছ দেখে ভালো লাগছে, হিশাম।' কালো ট্রাউজার আর সাদা টি-শার্ট পরিহিত হামিন সিকান্দার তার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বলল।

আজ রবিবার। এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিশ্বের অন্যতম ধনী এক যুবকের বাড়িতে এসেছে সে। তার ধারণা ছিল, এই পেন্টহাউসে সে তার রাজপ্রাসাদ এবং বিলাসবহুল বাসস্থানের মতোই পরিবেশ দেখতে পাবে। যেখানে দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস থাকবে। সর্বোত্তম ইন্টেরিয়র, আসবাবপত্র, শো-পিস, বার এবং বিশ্বের সেরা সব ওয়াইন। তার ধারণা ছিল, নিউইয়র্কের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এলাকার এই পেন্টহাউসটিতে হামিন সিকান্দার হয়তো এক পার্থিব স্বর্গ গড়ে তুলেছে। কারণ, হিশাম নিজেও ছোট থেকে এমন স্বর্গই দেখে এসেছে। কিন্তু হামিন সিকান্দারের এই পেন্টহাউসে তেমন কিছুই নেই। যৎসামান্য। প্রায় নেই বললেই চলে এমন কিছু ফার্নিচার। দেওয়ালে কিছু ক্যালিগ্রাফির অনবদ্য

শিল্পকর্ম এবং কিচেন কাউন্টারে একটি রিহালের ওপর খুলে রাখা পবিত্র কুরআন। তার পাশে একটি গ্লাস এবং একটি নৈমিত্তিক কফি-মগ।

হিশাম বিন সাবাহ এই মানুষটির সামনে ভীত হয়ে পড়ছে। যাকে বিজনেস সেক্টরে গুরু নয়; অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিন মনে করা হয়। যার কোটি কোটি টাকা মূল্যের এই পেন্টহাউসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হলো পবিত্র কুরআন। আর এই মানুষটি ই সালার সিকান্দারের নয়নের মণি।

: 'এটি আমার দাদার দেওয়া কুরআন। আমি সবসময় তা সঙ্গে রাখি। বসেই ছিলাম, সময় পেয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ পড়ি।' হামিন রিহালে রাখা কুরআন বন্ধ করতে করতে বলল। 'বসো।' লাউঞ্জের সোফাগুলোর দিকে ইশারা করে হিশামকে বলল।

সমগ্র পেন্টহাউস সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। সাদা ইন্টেরিয়রের কাচ ভেদ করে আগত ঝিকিমিকি রশ্মি তার

সোফা অবধি ছড়িয়ে পড়ছে। হিশাম বিন সাবাহ রাজকীয় সিংহাসনেও বসেছে, কিন্তু তার সামনে এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে উপবিষ্ট মানুষটির মতো, এমন প্রতাপ সে কখনো দেখেনি। কথা শুরু করাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। আর সেই শুরুটা হামিনই করল, তাকে পানীয়ের অফার করে।

: চা নিবে নাকি কফি?

: 'কফি।' হিশাম অফারটি গ্রহণ করল। হামিন উঠে সামনের কিচেন এরিয়ায় গিয়ে, কফি মেকারে কফি বানাতে লাগল।

: 'রাইসার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি, আর সবসময় ভালোই শুনেছি।' কফি বানাতে বানাতে হামিন বলল।

: 'আমিও।' হিশাম না বলে পারল না। হামিন কফি ঢালতে ঢালতে মুচকি হাসল। তারপর বলল, 'আই অ্যাম নট সারপ্রাইজড।' সে এবার কফির দুটি মগ আর কিছু কুকি একটি

ট্রেতে করে পুনরায় এসে বসল। হিশাম চুপচাপ কফির মগ ওঠাল। হামিন ওঠাল একটি কুকি।

: 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে।' কুকি মুখে দেওয়ার আগে হামিন যেন তাকে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

: 'হ্যাঁ।' হিশামের হঠাৎ কফি পান করা মুশকিল হয়ে পড়ল। যে সমস্যাটির জন্য সে সেখানে এসেছে, সেটি যেন এখন গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

: 'রাইসাকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি।' সেই বাক্যটি দিয়েই সে শুরু করল, যা দিয়ে সে শুরু করতে চায়নি।

: 'গুড!' হামিন অত্যন্ত শান্ত মনে কুকি গিলতে গিলতে এমনভাবে বলল, যেন এটা তার দাবার একটি স্কোর।

: 'আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।' হিশাম তার পরের বাক্যটি বলল। এই মুহূর্তে নিজেকে তার অদ্ভুত বোকা মনে হতে লাগল।

: 'আমি জানি।' হামিন কফিতে প্রথম চুমুক দিতে দিতে বলল। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে করবে?' সে যেন হিশামকে সাহায্য করে বলল। সে সরাসরি তাকে সেই বিষয়ে নিয়ে এলো, যা নিয়ে সে কথা বলতে এসেছে। হিশাম দীর্ঘক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। এমনকি তার প্রতি হামিনের মায়া হতে লাগল।

: 'তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে, তাহলে কী করতে?' হিশাম হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করল। হামিনের মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল।

: 'আমি যা করতাম, তা করার সাহসও তোমার নেই।' জবাবে হামিন বলল। হিশামের অদ্ভুত অপমানিত বোধ হলো। হামিন তাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

: তুমি কী করতে, সেটি না বলেই আমাকে জাজ করতে পারো না।

: 'ঠিক আছে, বলছি।' হামিন কফির কাপ রাখতে রাখতে বলল।

: 'রাইসাকে ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত যেকোনো সমাধান বলো আমাকে।' হামিন উত্তর করার আগেই আবারও বলে উঠল সে। কে জানে মনে মনে কী ভয় করছে সে। হামিন এবার হাসল না, অপলক তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল।

: 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তাহলে...' হামিন কথাটি অসম্পূর্ণই রেখে দিল।

এরিক আবদুল্লাহ ইনারার কথামতো আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এক অদ্ভুত দোলাচলে দুলছে সে। ইসলামের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল শৈশবে, এবং এক শিশু হিসেবেই তাতে প্রভাবিত হয়েছিল। এমন একটি পরিবারের মাধ্যমে সে এই ধর্মের মায়ায় জড়িয়েছিল, যাদের মতো মানুষ সে আগে কখনো দেখেনি। তাদের নম্রতা, উদারতা এবং সহমর্মিতা এরিকের অস্তিত্ব নয়, বরং মনকে মুঠোয় পুরে নিয়েছিল। বহু বছর ধরে সে ইসলামের সেই আলোকিত চেতনা, সেই উদারতা আর কোমলতাকেই আদর্শ হিসেবে মেনে এসেছে। আর এখন সে তার মেন্টর ও

মুরশিদ সম্পর্কে এমন সব কথা শুনছে, যা তার কাছে
অবিশ্বাস্য।

এই কথাগুলো যদি সে ইনায়া ছাড়া অন্য কারও মুখে শুনত,
তাহলে এগুলোকে নিছক মিথ্যার গাটি ছাড়া আর কিছুই মনে
করত না। ইনায়া যা বলছে, ডাক্তার আহসান সাদ এমন মানুষ
হতে পারেন না। তিনি এমন কাজ করতে পারেন না। ইনায়া
আমেরিকায় পৌঁছেই তার সঙ্গে দেখা করে আহসান সাদের
বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। জিবরিলের ওপর আনীত
অভিযোগ ও আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে কৃত জুলুমের ব্যাপারে।
সে বিশ্বাস করতেই পারছে না, আহসান সাদ এতটা নির্মম ও
মিথ্যাবাদী হতে পারে। আর যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেই
জিবরিলের ব্যাপারেও আবদুল্লাহ হলফ করে বলতে পারে,
এমন কাজ সে কখনো করতে পারে না।

এ নিয়ে প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর তর্কবিতর্ক এবং সবশেষে জীবনের প্রথম ঝগড়াও হয়ে গেল, এই দুই শান্ত স্বভাবের মানুষের মধ্যে।

: 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না, ডাক্তার আহসান সাদ একজন আমলদার মুসলমান। নামাজে ইমামতি করেন তিনি। তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন? এসব...? কোনো কারণ ছাড়াই? আমি মানতে পারছি না। আমি এটা মানতেই পারছি না।' এখন এছাড়া আর কী-ই-বা বলতে পারে সে।

: 'তাহলে যাও, আয়েশার সঙ্গে দেখা করে তুমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করো, তার সঙ্গে কী হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।' ইনায়াও জবাবে প্রচণ্ড রেগে বলল।

তাদের এই সাক্ষাৎ এক তিক্ত মোড়ে এসে শেষ হলো। ফলে ইনায়াও এই প্রথম উপলব্ধি করল, জিবরিলের আশঙ্কাটি

অমূলক নয়। আবদুল্লাহ যদি আহসান সাদের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রভাব তাদের দুজনের সম্পর্কেও খুব দ্রুতই পড়তে শুরু করবে। আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করে এসে তার মেজাজ প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল। যে বিপদ ছিল অন্য কারও ঘরে, তা যেন অজান্তেই এসে উপস্থিত হয়েছে তাদের ঘরে ও ঘাড়ে।

তার মুখে সব শুনে আবদুল্লাহ সরাসরি জিবরিলকে ফোন করে। তাকে জিজ্ঞেস করে, আহসান সাদকে নিয়ে এসব কথা কেন বলল সে? সে কি জানে না আহসান কত ভালো মানুষ ও আমলি মুসলমান? কল করে জিবরিলের কোনো কথা না শুনেই সে একটানা অনেকক্ষণ অনেক কথা বলতে থাকে। জিবরিল শুধু শুনতেই থাকে। এটি ছিল তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোর একটি। একজন নওমুসলিমকে এ কথা বোঝানো যে, তার দেখা সবচেয়ে আমলি মুসলমানটি, মানুষ হিসেবে মোটেও উত্তম মানুষ নয়। এসব বলে আবদুল্লাহর মনে মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা তৈরি করতে চায়নি। বিশেষ

করে সেই মুসলিমদের প্রতি, যারা দীনের তাবলিগ করে। নিজে একজন হাফেজে কুরআন হয়ে, আরেকজন হাফেজে কুরআনের ব্যাপারে একজন নওমুসলিমকে বলতে চায়নি যে, দীনের দায়ি ওই মানুষটি মিথ্যাবাদী, জালিম, অপবাদকারী এক লোভী ইনসান। যদিও সে নামাজ-রোজার প্রতি অত্যধিক পাবন্দ।

জিবরিল সিকান্দার এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তার নীরবতা যদি এর চেয়ে খারাপ কিছু ডেকে আনে, তবে কথা বলাই উত্তম।

: 'আহসান সাদের ব্যাপারে আমি যা বলব, তা শুনে তুমি কষ্ট পাবে। তাই সবচেয়ে ভালো হলো, তুমি ওই মহিলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। ওখানে গিয়েই সমস্ত ডকুমেন্ট নিজ চোখে দেখে আসো।' জবাবে আবদুল্লাহকে বলেছিল।

আর আবদুল্লাহ এখন আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আয়েশা আবেদিন ইচ্ছেসত্ত্বেও তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করতে পারেনি। এখন তার অন-কল ডিউটি। সে বাসা থেকে বেরই হচ্ছিল, এমন সময় আবদুল্লাহ এসে উপস্থিত। আবদুল্লাহ তাকে বলল, ইনায়া আহসান সাদ সম্পর্কে সন্দেহমূলক কিছু কথাবার্তা বলছে, আমি সেগুলোর সত্যতা জানতে আপনার কাছে এসেছি। এটা বলার আগে আয়েশাকে সে আহসানের ব্যাপারে বলল। জানাল, আহসানকে সে কতটা সম্মান করে। তাকে মহান গুরু ও আইডিয়াল মান্য করে। সে যেন এক মূর্তি নিয়ে এখানে এসেছে, আর সেটি ভাঙা থেকে রক্ষা করতে চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করতেও প্রস্তুত। কথোপকথনের শুরুতেই তার দেওয়া এই দীর্ঘ ভূমিকাটি যেন একটি সুরক্ষা দেওয়াল। এটি শুধু সে নিজের জন্যই নয়, আয়েশা আবেদিনের জন্যও দাঁড় করাল।

জিবরিলের মতোই নীরবে আয়েশাও তার কথাগুলো শুনল। তার কথার মাঝে কোনো হস্তক্ষেপ করল না। আবদুল্লাহ অন্তত



তার কাছে এমনটা আশা করেনি। সে ভেবেছিল, আয়েশা তার কথায় ঝগড়াটে নারীদের মতো বাধ সাধবে। তাকে কিছু বলতেই দেবে না। এখানে আসার আগে আয়েশা আবেদিনের তেমনই একটি ছবি সে মনে ঐঁকে এসেছে। আহসানের মুখে তার নিন্দা শুনে শুনে কুৎসিত এক ছবি। কিংবা অতি আপত্তিকর বেশভূষাও কামনা করেছিল সে। কিন্তু হিজাব না পরা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ তার মধ্যে কোনো বেহায়াপনা দেখতে পেল না। অত্যন্ত সাধারণ পোশাক, মেকআপহীন চেহারা, অসম্ভব সুন্দরী এক মেয়ে, যার চোখে রাজ্যের বিষণ্ণতা এবং কণ্ঠস্বর ভীষণ কোমল। সে মূলত এক কঠোর, অত্যন্ত ফ্যাশনপ্রিয়, অতি আধুনিক মহিলার প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু আবদুল্লাহর তকদিরে হয়তো আরও বিস্ময় হওয়া লেখা ছিল।

ইনায়া ও জিবরিল দুজনেই তাকে বলেছিল, আয়েশা তাকে কিছু ডকুমেন্ট দেখাবে-আহসান সাদের সঙ্গে তালাক পেপারস, আদালতের রায়, সন্তানের হেফাজতের বিবরণ এবং আরও গোপন কিছু তথ্য। কিন্তু আয়েশা আবেদিন এমন কিছুই

করল না। দশ মিনিট চুপচাপ তার কথা শোনার পর, অত্যন্ত শান্ত গলায় তাকে বলল, 'আহসান সাদ খারাপ মানুষ নন, আমাদের মধ্যে কেবল ভালো বোঝাপড়া ছিল না, তাই আমাদের সংসারটা টেকেনি। সে নিশ্চয় আপনার জানা ও মানার সমান ভালো মানুষ ও একজন নেক মুসলমান। তার অনেক উত্তম বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আপনি অনেক সৌভাগ্যবান যে, তার ভালো দিকগুলোর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে। আমি হয়তো অতটা সৌভাগ্যবান ছিলাম না, কিংবা তার ভালো দিকগুলো খুঁজে পেতে আমারই ভ্রুটি ছিল।' আয়েশা বলে চলল। কিন্তু আবদুল্লাহর মন যেন এতে পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। সে যা শুনতে চাচ্ছে, এগুলো ঠিক তা নয়। আবার যা প্রত্যাশা করেছে, তাও নয়।

'তিনি আপনার জন্য একজন আদর্শ ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর। নিঃসন্দেহে তা-ই হবেন।' আয়েশা বলে চলল। 'কোনো মানুষই নিখুঁত নয়। তাই বলে কিছু ভুলের জন্য আমরা কাউকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারি না। আমার ও আহসান সাদের মধ্যে যা

কিছু হয়েছে, তাতে তার থেকে বেশি আমারই ভুল। এখন আপনার সামনে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলে, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।" আয়েশা তার কথা শেষ করল। আবদুল্লাহ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার আশ্বস্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হলো না। সে এখানে আহসান সাদ সম্পর্কে কিছু জানতে বা অনুসন্ধান করতে আসেনি, বরং আয়েশার সামনে তার পক্ষ নিতে এসেছিল। যে মহিলা তার অসম্মান, অপমান এবং হৃদয় ভঙ্গের কারণ হয়েছে, তার প্রতিরোধ করতে এসেছিল। কিন্তু ওই মহিলা যেন তার সামনে সাফাই কিংবা ব্যাখ্যাদানের কোনো সুযোগই রাখল না। সে নিঃশব্দে সমস্ত ভুল, সমস্ত গুনাহ নিজের কাঁধে তুলে নিল।

আয়েশার বসার ঘরে বসে আবদুল্লাহ তার দেওয়ালে ঝোলানো ছেলের ছবিগুলোর দিকে তাকাল, তার খেলনার ছবিগুলো দেখল। একটা ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন ঘর; সে যেমনটা কল্পনা করে এসেছিল, ঠিক তার বিপরীত। আহসান সাদ তাকে এই নারীটির অপরিচ্ছন্নতার বহু গল্প শুনিয়েছিল। যে আহসানের সংসার

সামলাতে ব্যর্থ, যার একমাত্র কাজ শুধু টিভি দেখা আর
বেপরোয়া ঘুরে বেড়ানো। যাকে ঘরের কোনো কাজ করতে
বললেই সে বিরক্ত হয়।

আবদুল্লাহর মাথার জট বেড়েই চলছে। সে এই মেয়েটিকে ঘৃণা
করতে পারল না, তাকে অপছন্দ করতে পারল না।

: 'জিবরিলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?' অবশেষে সে সেই
শেষ প্রশ্নটি করল, যেখান থেকে এই পুরো সমস্যার সূত্রপাত
হয়েছে।

জবাবে আয়েশা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা
তুলে, চোখে চোখ রেখে বলল, আমি তাকে ভালোবাসি।

: 'I met your ex-wife. আমি আপনার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি।' এটি যেন কোনো বাক্য নয়; উত্তপ্ত বোমা, যা বিস্ফোরিত হলো আহসান সাদের ওপর।

আয়েশার সঙ্গে দেখা করে, পরদিন হাসপিটালে আহসানের সঙ্গে তার দেখা হলো। শুরুতে তাকে বেশ হাসিখুশি, সতেজ, সদাচারী এবং উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এদিকে আবদুল্লাহর কানে ইনায়া ও জিবরিলের স্বর ও কথার শোর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আহসানের কাছে সে সাক্ষাতের সময় চাইল। আহসান সানন্দে তাতে রাজি হলো।

তারা দুজনে একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে থাকে। আহসানের সঙ্গে তার বাবা-মাও থাকেন। আবদুল্লাহ তাই তার অ্যাপার্টমেন্টেই দেখা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আহসানের

কিছু কাজ পড়ে যাওয়ায় আবদুল্লাহকেই এখন তার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে হলো। এসেই আহসানের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হলো। সব সময়ের মতোই হাই-হ্যালো হলো। আহসান লাউঞ্জেই তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আবদুল্লাহ তার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চাহল। তাই সে তাকে তার বেডরুমে নিয়ে গেল। কিন্তু তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। আবদুল্লাহর আচরণ বেশ অদ্ভুত। আহসান সাদের যত ইন্দ্রিয় তাকে আরও খারাপ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছিল, আর সেটা একদম সঠিক।।

বেডরুমে ঢুকেই আবদুল্লাহ তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথাটি বলল। মুহূর্তেই আহসানের গলার স্বর, কথার ভঙ্গি আর মুখের মানচিত্র পালটে গেল। আবদুল্লাহ জীবনে এই প্রথম তার এমন স্বর শুনল। সেই কণ্ঠ ছিল ভীষণ রুক্ষ ও শীতল। কর্কশ। শব্দটি দিয়ে তা আরেকটু সুন্দরভাবে বর্ণনা করা যায়। তার কপালে ভাঁজ প্রদর্শিত হলো। চোখে ফুটে উঠল হিংস্র ঘৃণা। রাগে চোঁট কামড়ে আবদুল্লাহকে সে জিজ্ঞেস করল, কেন? আবদুল্লাহ

অতি অল্প কথায় তাকে জানাল, জিবরিল ইনাযাকে আমার সঙ্গে
বিয়ে দিতে নারাজ। এর কারণ হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার
ঘনিষ্ঠতা। জিবরিল ও ইনাযা, দুজনেই আপনার প্রতি বহু
গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সেসবের সত্যতা যাচাই
করতে, তারা আমাকে আয়েশা আবেদিনের সঙ্গে দেখা করতে
বলেছে। সেটি আমার জন্য জরুরি হয়েও পড়েছিল।।

: 'তাহলে তুমি তাদের বিশ্বাস করলে, তোমার উত্তাদকে নয়?
আর তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলে, পরামর্শ না করেই সেই
কুত্তির সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলে? অথচ তুমি বলো, তুমি
নাকি আমার কাছ থেকেই সব শিখেছ!' আবদুল্লাহর কথার
মাঝেই আহসান ভীষণ ক্রুদ্ধ স্বরে তার কথা কেড়ে নিল।
আবদুল্লাহর পক্ষে যেন আর কথা বলা সম্ভব হচ্ছিল না। মাত্রই
সে আহসানের মুখে একটি গালি শুনেছে। গালিটা তাকে অবাক
করেনি, অবাক করেছে গালিদাতা মানুষটি। আহসানের মুখে
গালি! এ যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এটিই তার শেষ ধাক্কা নয়।
আজ তার জন্য আরও বহু ধাক্কা অপেক্ষা করছে। যে মূর্তিটি সে

এতদিন শ্রদ্ধার চাদরে আগলে রেখেছিল, সেটি আজ মুখ খুবড়ে পড়তে যাচ্ছে। তার খানখান দৃশ্য দেখা এখনো বাকি।

: 'আমার প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কোনো অধিকার ছিল না তোমার। আমার ব্যাপারে তদন্ত করতে তুমি ওই.....এর কাছে গিয়েছ। সে হয়তো আমার ব্যাপারে মিথ্যার পর মিথ্যা বলেছে।' আহসান সাদ এখন কথায় কথায় আয়েশাকে গালি দিচ্ছে। যেন এসব শব্দে সম্বোধন করাই তার দৈনন্দিন অভ্যাস। ক্রোধে সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আয়েশার প্রতি তার ঘৃণা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে? নাকি বহু বছরে অর্জিত তার ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার যন্ত্রণায় এমন ছটফট করছে, আবদুল্লাহ তা ঠিক বুঝতে পারছে না।

: 'সে নিশ্চয়ই তোমাকে আদালতের কাগজপত্র দেখাতে বসে গিয়েছে। বলেছে, এই দেখো আদালত আমার স্বামীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে। আমাকে মারধরের অভিযোগ মেনে নিয়েছে। সে দ্বিতীয় বিয়ে করায় তাকে প্রতারক বলেছে। আর

তাই এই জঘন্য মহিলার তালাকের আবেদনকে আদালত গ্রহণ করে তালাকের পক্ষে রায়। নিয়েছে। এবং সন্তানের দায়িত্বও তার কাছে হস্তান্তর করেছে।" সে বলেই চলছে আর আবদুল্লাহ নিশ্চল হয়ে শুধু তার কথা শুনে যাচ্ছে। যেসব সত্য জানার জন্য জিরবিল তাকে আয়েশার কাছে পাঠিয়েছিল, সেই সত্যগুলো সে এখন আহসান সাদের মুখ থেকেই শুনছে।

: এই দেশের আদালতগুলোকে আমি দুই পয়সারও দাম দিই না। এগুলো কাফিরদের আদালত, ইসলামের তারা কী বোঝে? তারা শরিয়তের খেলাফ রাখ দেখ। আমার ধর্ম আমাকে নিঃশর্তে দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে, তাহলে আদালত কে আমাকে এজন্য প্রতারণা বলার? একজন অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করে তাকে সঠিক পথে আনার আধিকার আমার আছে। আদালত কোন অধিকারে আমাকে তা থেকে বিরত রাখে? আমি পুরুষ, আমার ধর্ম আমাকে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে, তাহলে আদালত কীভাবে তাকে সমঅধিকার দিতে বাধ্য করে আমাকে?

এসবের জন্যই তো তোমাদের সমাজ আজ ধ্বংস হচ্ছে
নির্লজ্জতা, নগ্নতা, স্বামীর অবাধ্যতা। এসবই তো তোমাদের
নারীপ্রজন্মকে ধ্বংস করছে। আর তোমাদের আদালত বলছে,
তাদের সাথে সাথে আমরাও যেন বেগায়রত, বেহায়া হয়ে যাই।
তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে, তাদের পেছনেই পরে কুকুরের মতো
লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াই।

এই মানুষটি কে? আবদুল্লাহ তাকে চিনতেই পারছে না। এত
ঘৃণা, এত গোঁড়ামি, এমন শব্দ আর এমন মানসিকতায় ঘেরা
এই মানুষটিকে তো সে আগে কখনো দেখেনি। আহসান সাদ
এতদিন আমেরিকাকে নিজের দেশ বলে গর্ব বোধ করত।
নিজেকে আমেরিকান বলে পরিচয় দিত। আর আজ সে
তোমাদের দেশ, তোমাদের সমাজ, তোমাদের আদালত বলে
কথা বলছে। উম্মত ও আখাওয়াত, মুসলিম ও ভ্রাতৃত্ব বলে যে
দুটো শব্দ তার মন্ত্র ছিল, এ দুটো শব্দ যেন হঠাৎই গায়েব হয়ে
গিয়েছে।

: এবার তালাক মুখে ছুড়ে মেরে আমি সেই নষ্টাকে বিদায় করেছি। তাই এখন সে খাবি খাচ্ছে। সে আজীবন কারও রক্ষিতা আর গার্লফ্রেন্ড হয়েই থাকবে। কখনো স্ত্রী হতে পারবে না। সে এই স্বাধীনতাই চায়। তোমাদের সব নারীই এটাই কামনা করে। ঘর, পরিবার, চার দেওয়াল-এগুলো কোনো পাখির জন্য নয়। তারা শুধু পাখির মতো যেথা-সেথা উড়তে চায়। এমন নারীরা সংসারের মর্ম কী বুঝবে! পবিত্রতা ও সতীত্ব বলতে কোনো শব্দ তাদের অভিধানে নেই। এরপরও তারা স্বামীদের কঠোরতা নিয়ে অভিযোগ করে। ধিক্কার সেসব নারীর প্রতি। তার কথাগুলো এখন এলোমেলো হয়ে পড়ছে। ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারছে না। তবু সে চুপ করতে নারাজ। এই মুহূর্তে যদি তার জ্ঞান কথা বলত, তাহলে আবদুল্লাহ আরও কয়েক ঘন্টাও তার কথা শুনে যেত, যেমনটা সে সব সময়ই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। কিন্তু এখন তার অজ্ঞতা কথা বলছে। এবং তা থামছেই না। আবদুল্লাহ তাকে থামিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু এর আগেই তার বাবা-মা ভেতরে চলে এলেন।

তারা নিশ্চয়ই আহসানের চড়া গলা। শুনতে পেয়েই এখানে চলে এসেছেন।

: 'বাবা, আপনাকে আমি বলেছিলাম না, আপনার বন্ধুর ছেলে আমার শত্রু? সে আমার ক্ষতি করবে? এই দেখুন, এখন তা-ই হচ্ছে। সে যত্রতত্র আমার বদনাম করে বেড়াচ্ছে।' আহসান তার বাবাকে দেখেই বলে উঠল।

: 'কে?' তার বাবা কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললেন।

: 'জিবরিল।' আহসান উত্তর দিল। তারপর আবদুল্লাহর দিকে ইশারা করে বলল, 'এই তো একেই সে আয়েশার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছে। আর সেই মহিলা আমার সম্পর্কে তাকে সত্য-মিথ্যা যা-তা বলে দিয়েছে। বিষ উগড়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

বাচ্চাদের মতো সে অভিযোগ করছে। তার বাবা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। তার আগেই আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'আপনার ব্যাপারে আয়েশা আমাকে কিছুই বলেনি। যা বলেছেন, আপনি নিজেই বলেছেন। তিনি শুধু এতটুকু বলেছেন, আপনাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ছিল না, তাই সংসার টেকেনি। আদালতের ডকুমেন্ট, আপনার বিরুদ্ধে আদালতের রায়, এসব কিছুই দেখাননি। যা শুনেছি, তা এখন আপনার কাছেই শুনলাম।'

আবদুল্লাহ ভেবেছিল তার কথা শুনে আহসান সাদ অবাক হবে। আর তারপর লজ্জিত। কিন্তু এমন কিছুই হলো না।

: 'তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করো না।' আহসান সাদ তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়াল। এই বাড়িতে হঠাৎ করেই তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখন শুধু আহসান সাদ নয়, তার বাবা মা-ও কথা বলা শুরু করলেন। তারা তিনজন একসঙ্গে কথা বলছে আর আয়েশা আবেদিন ও

জিবরিলকে নিন্দা-মন্দ করে যাচ্ছে। সালার সিকান্দারের অতীত সম্পর্কে এখন তার অনেক কথা মনে পড়তে শুরু করেছে। ইমামা সম্পর্কেও, যে ছিল প্রথমে ভিন্ন ধর্মী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আবদুল্লাহর হঠাৎ মনে হতে লাগল, সে একটা পাগলাগারদে দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠে পড়া সত্ত্বেও তারা তাকে যেতে দিচ্ছে না। তারা চাচ্ছে, সে তাদের সব কথা শুনুক। প্রতিটি অপবাদ, বুকে চাপা প্রতিটি গোপন কথা।

ইসলামের এই রূপ আবদুল্লাহ কখনো দেখেনি। আর দেখতেও চায়নি। এই ধর্ম তাকে সর্বদা পথনির্দেশনা দিয়েছে। ব্যথার ক্ষতে মলমের প্রলেপ হয়েছে। আবদুল্লাহ এখন থেকে পালাতে চাচ্ছে। কানে আসা শব্দগুলো থামাতে চাচ্ছে। আহসানকে তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, আপনি আমার কুরআনের উস্তাদ; আমাকে কেবল কুরআনের কথাই বলুন। দয়া করে এসব ব্যক্তিগত নিন্দা-মন্দ বন্ধ করুন।

ভাই আহসান! You disappointed me. আপনি আমাকে হতাশ করেছেন।" তাদের হট্টগলের ভেতর দীর্ঘক্ষণ পর প্রথম বাক্যটি বলল আবদুল্লাহ। হট্টগোল যেন মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। 'আপনি জ্ঞানী, কুরআন সম্পর্কে আপনার অনেক জানাশোনা, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। আপনি কুরআন শরিফ মুখস্থ তো করেছেন, কিন্তু এর মর্মার্থ বোঝেননি, আর না বুঝেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শিক্ষা। আপনি সেই কিভাবে বুঝতে চান না, যে কিতাব নিজেকে বোঝার এবং চিন্তা করার আহ্বান করে। আমি একবার আপনাকে একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুরআন 'অন্তরে মোহর মেরে দেওয়ার' কথা বলে, এর অর্থ কী? তখন আমি তার অর্থ বুঝিনি, আজ বুঝেছি। আপনি আমার উদ্ভাদ, কিন্তু আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনার অন্তরের মোহর তুলে দেন। আপনাকে হিদায়ত দান করেন।' আহসানকে যেন সে ভরাবাজারে বিবস্ত্র করে দিল। তারপর সেখানে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে সোজা বেরোবার পথ ধবল।

জিবরিল আবারও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, আয়েশা যেখানে তাকে প্রত্যাশা করেছিল, তার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরের চত্বরে। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পায়চারি করছে। তার পায়ের নিচের বরফগুলো পাতলা চাদরের মতো বিছিয়ে আছে। সাধারণত, এমন বরফ রোদের তাপে নাই হয়ে যায়, কিন্তু আজ রোদ ওঠেনি। বরফের সেই পাতলা চাদরে জিবরিলের পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং পরিমিত পদছাপ। মনে হচ্ছে সে প্রতিটি কদম খুব সাবধানে ফেলেছে। আয়েশাকে সে বাইরে আসতে দেখেনি, কিন্তু আয়েশা তাকে দেখল। লং কোর্টের জোড়া পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ আগে জিবরিল তাকে ফোন করেছিল। তার সঙ্গে দেখা করার কথা বলছিল।

: 'আমি এখন গ্রোসারি করতে যাচ্ছি, ওখান থেকে সরাসরি হসপিটালে।' আয়েশা যেন পরোক্ষভাবে তাকে উপেক্ষা করল। সে এখন তার মুখোমুখি হতে সংকোচবোধ করছে। তার সামনে পড়তেই চাচ্ছে না।

: 'তাহলে তুমি কি কোর্টে স্বীকার করতে চাচ্ছ যে, আহসান সাদ সঠিক, আর তুমি তোমার ছেলের দেখভালে অবহেলা করেছ? তুমি কি তোমার জীবন নষ্ট করতে চাও?' জিবরিল অত্যন্ত রাগতস্বরে প্রত্যুত্তর করল।

জীবনের প্রতি এখন আর কোনো মায়া নেই। এই জীবনের বিনিময়ে যদি একাধিক সুন্দর জীবন রক্ষা পায়, তাহলে কেন নয়।' আয়েশা এই প্রথম এভাবে কথা বলছে।

'তুমি কি আমাকে বাঁচাতে চাও?' জিবরিল সরাসরি তাকে প্রশ্ন করল। এমন সরাসরি প্রশ্নের প্রত্যাশা সে করেনি, যার উত্তর দেওয়ার সাহস করতে পারছে না সে। কীভাবে বলবে সে, আহসানের কবল থেকে ওই মানুষটিকে বাঁচাতে চায় সে, আসফান্দের পরই সর্বাধিক প্রিয়তম মানুষ যো যদিও সে জানে, আহসানের কাছে সে ডাক্তার ডিজেলের অসতর্কতার কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছে। আয়েশা এন্দন তার চিরকুটে লেখা সরির কারণ বুঝতে পারছে। তবুও সে জিবরিলকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। তার ছেলের প্রাণনাশের পেছনে জিবরিলের হাত রয়েছে, তা কিছুতেই মানতে পারবে না সে জিবরিল কেন তাকে এত গুরুত্ব দেয়, কেন তার জন্য এত ছোট্টাছুটি করে, আয়েশা যেন এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে। এখন জিবরিলকে ক্ষমা করে দিয়ে, তাকে তার সেই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছে। তাকে বাঁচাতে এখন আহসান সাদের সামনে সে প্রাচীরের মতো দাঁড়াতেও পারে। অথচ এই

দুঃসাহসী কাজটি সে নিজের ও নিজের সন্তানের জন্যও করতে পারেনি।

: 'আমি তোমাকে কেবল আসফান্দের মৃত্যুর অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করতে চাই।' জবাবে আয়েশা বলল। জিবরিল কোনো রা করতে পারল না।।

: 'এজন্য আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই বলে তোমাকে আমি তোমার জীবন নষ্ট করতে দিতে পারি না।' দীর্ঘ নীরবতার পর জিবরিল মুখ খুলল। 'কোটে তুমি যদি আহসানের পক্ষে সাক্ষ্য দাও, তাহলে আমিও সেখানে আমার ভুলের কথা বলব।'

জিবরিল তাকে বলে চলল, 'তোমাকে বোঝানোর মতো কেউ নেই, থাকলে এসব তোমাকে করতে দিত না। আর আমি শুধু অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েই তোমার কাছে আসিনি। অপরাধবোধ হয়তো সহানুভূতি তৈরি করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা নয়।' জিবরিল তাকে কথাগুলো এমনভাবে বলে

চলল, এগুলো যেন অতি স্বাভাবিক। মাথাব্যথার জন্য ডিসপ্রিন
কিংবা জ্বরের জন্য নাপার পরামর্শের মতোই।

সে চলে যাওয়ার পরও আয়েশার মনে হচ্ছিল, সে হয়তো ভুল
শুনেছে। আবার কথাটি দ্বিতীয়বার শোনার মতো সাহস তার
নেই। কিছু ভ্রম, ভ্রম থাকাই উত্তম। কিছু ভ্রম বেঁচে থাকার
অবলম্বন। কিছু সন্দেহ জীবনের সম্বল। এমনকি সেগুলো
কখনো বিশ্বাসে পরিণত না হলেও।

আর এখন জিবরিল আবারও তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। না,
দাঁড়িয়ে নেই, বরফের উপর পায়চারি করতে করতে পায়ের
ছাপ তৈরি করছে। যেন তার হাতে পৃথিবীর সমস্ত সময়।
অবারিত ফুরসত। সে অবচেতনে জিবরিলের দিকে এগিয়ে
গেল। গলার মাফলার ঠিক থাকা সত্ত্বেও তাতে আরেক দফা
হাত বুলিয়ে নিল। জিবরিল তার পায়ের শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল। কিন্তু আয়েশা তাকাল না। তার উপেক্ষা যেন এখনো

জারি। জিবরিলের কাছে সে এমনভাবে গ্রোসারির কথা বলল, যেন গ্রোসারি সদাই করা তার জন্য খুব জরুরি।

: 'গ্রোসারিতে অনেক সময় লাগে। আমরা বরং অন্য কোনো একদিন দেখা করি।' জিবরিলের উত্তরের অপেক্ষা না করেই, আবারও সে তাকে নিজের সঙ্গে যেতে বারণ করল। যদিও জিবরিল তাকে অপেক্ষা করতে বলেনি। সে তার সঙ্গে কেনাকাটা করতেই যেতে চাচ্ছে। সে কেবল ততটুকু সময়ই চায়, যতটুকু সময় লাগে গ্রোসারি কেনাকাটায়। এই সময়টিতে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তারা কথা বলতে পারবে। সঙ্গে চলা ও কথা বলা; এটিই তো কামনা তার।

: 'আমি জানি, কিন্তু আমার হাতে তো অনেক সময় আছে, তোমার হয়তো একেবারেই নেই।' জিবরিল উত্তর দিল। 'গাড়িতে যাবে?' জিবরিলও তার উত্তরের অপেক্ষা করল না।

: 'না, এখানে কাছেই দোকান। কয়েক কদম দূরে। গাড়ির দরকার নেই। খুব বেশি কেনাকাটাও নেই।' আয়েশা তার হাঁটা অব্যাহত রেখে বলল।

: 'আবদুল্লাহকে তুমি মিথ্যা কেন বলেছ?' নীরবে কয়েক কদম অতিক্রম করেই জিবরিল তাকে জিজ্ঞেস করল। আয়েশা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই প্রশ্নটি সে আশা করেছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়। 'ভীৰুতা ভালো কিছু নয়, আয়েশা!' কয়েক মুহূর্ত তার উত্তরের অপেক্ষা করে জিবরিলই আবার বলল। এটি কোনো বিদ্রূপ নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে আয়েশার কাছে তা বিদ্রূপই মনে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা এখন ফুটপাথে উঠে এলো। কিছুক্ষণ আগে বরফের চাদরে জিবরিল যে নিঃসঙ্গ পায়ের ছাপ আঁকছিল, এখন তারা দুজন একসঙ্গে সেই পদচিহ্ন অঙ্কন করছে। জোড়া পদচিহ্ন।

: 'তোমার কি মনে হয় আমি এক ভীতু? আবদুল্লাহকে তাই সত্যিটা বলিনি?' পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এই প্রথম আয়েশা ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

: ভীৰুতা বা ভয়; এর বাইরে আর তৃতীয় কোনো কারণ থাকতে পারে না। তুমি ভয় পেয়েছিলে, আহসান সাদ তোমাকে বিরক্ত করবে, ফোন করে জ্বালাতন করবে।' জিবরিল বলল। 'কিন্তু তুমি আবদুল্লাহর কাছে মিথ্যা বলে অন্যায় করেছ। তুমি আমাকে আর ইনাযাকে মিথ্যুক বানিয়েছ।' তার কণ্ঠে এখন অভিযোগ ঝরে পড়ছে।

: 'আপনারা মিথ্যুক না হয়ে, আহসান সাদ মিথ্যুক হলে আবদুল্লাহর বেশি ক্ষতি হতো।' জবাবে আয়েশা বলল।

: সে হাফেজে কুরআন হলে, আমিও তো হাফেজে কুরআন।

: 'সে আপনাকে সেই জায়গায় রেখে দেখে না, যেখান থেকে আহসানকে দেখে।'

আয়েশা উত্তরে বলল। 'সে নও-মুসলিম না হলে আহসানের ব্যাপারে আমি তাকে সবকিছু বলে দিতাম। হয়তো আমার সঙ্গে দেখা করার পর আর কখনো আহসানের মুখও সে দেখত না। কিন্তু সে একজন নও-মুসলিম। আমি তাকে কীভাবে বলব, এত বছর ধরে সে যাকে সর্বোত্তম মুসলিম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করে আসছে, সে আসলে তা নয়? এতে আবদুল্লাহ শুধু আহসানকে মিথ্যুকই মনে করত না, বরং তার দিল আমার দীন থেকেও সরে যেত।' সে তার সেই চিরচেনা শান্ত স্বরে বলে চলল। 'আমার সঙ্গে এমনটা একবার হয়েছে। আহসান সাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি খুব ভালো একজন মুসলিমা ছিলাম। চোখ বন্ধ করে ইসলামের অনুসরণ করতাম। পাগলের মতো ধর্মের পথে চলতাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা আর ভক্তি ধারণ করতাম। কিন্তু তারপর আহসান সাদের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। আমি তার প্রকৃত রূপ দেখতে

পেলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বস্তুটি হলো, একটি খারাপ বৈবাহিক জীবন, তালাক বা আসফান্দেব মৃত্যু নয়; আমার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, সে আমাকে ধর্মবিমুখ করে দিয়েছে। এখন আমার কাছে ধর্মের বুলি আওড়ানো প্রতিটি মানুষকেই মিথ্যাবাদী ও মুনাবিক মনে হয়। দাড়ি আর হিজাব দেখলে আমার ভয় হয়। আমার হৃদয় যেন ইবাদত থেকে উঠে গেছে।

এত বছর ধরে দিনরাত আমি এত এত ইবাদত করে, এত এত অজিফা পড়ে আল্লাহর কাছে এত পরিমাণ নিজের সুন্দর জীবন প্রার্থনা করেছি যে, এখন আমার মনে হয়, আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু চাওয়া উচিত নয়। আমি মুসলমান, কিন্তু আমার হৃদয় ধীরে ধীরে অবিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই অনুভূতিতে আমার ভয় হয়, কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। এ সবকিছু হয়েছে একজন ভালো মুসলমানের প্রতি আমার অগাধ আশা ও প্রত্যাশার ফলে, যে আমি সেগুলো চূর্ণ হতে দেখেছি; পূর্ণ হতে দেখিনি। আবদুল্লাহকেও আমি এই যন্ত্রণায়

নিষ্ক্ষেপ করতে চাই না। সে যদি আহসান সাদকে ভালো মানুষ মনে করে একজন ভালো মানুষ হতে পারে, তবে তাকে হতে দিন।" বলতে বলতে আয়েশা তার হাতের উলটো পিঠে চোখ ও গাল মুছতে চেষ্টা করল।

'আমি একজন কাফির, তাই বলে আমি অন্য কাউকে কুফরির দিকে ঠেলে দিতে পারি না। আমার মধ্যে যদি কোনো ইমান থেকে থাকে, তবে তা এতটুকুই।' সে এখন পকেট থেকে টিস্যু বের করে চোখ মুছেছে।

: 'পছন্দ? পছন্দের কথা তো আমি বলতে পারি না মাম্মি! কিন্তু আয়েশা আবেদিন আমার আকল ও সমঝের উর্ধ্বে। তার প্রতি আমার তীব্র সহানুভূতি ছিল, কিন্তু এখন সহানুভূতি অনেক পেছনে পড়ে গেছে। আমি তাকে আমার মন থেকে সরাতে পারছি না। বারবার তার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করে। তার আর আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এটা জানা সত্ত্বেও। এমনকি জীবনসঙ্গী হিসেবে আমি যেমন মেয়ে চাই, আয়েশা তার

সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি খুব দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী, প্রাণবন্ত, কর্মঠ আর সদা হাস্যোজ্জ্বল মেয়েদের পছন্দ করি। যাদের রয়েছে উত্তম তরবিয়ত। এগুলো থেকে আয়েশার মধ্যে হয়তো দুই বা তিনটি গুণ আছে। তা সত্ত্বেও আমি আয়েশাকে ছেড়ে থাকতে পারি না।" আমেরিকায় আসার আগে ইমামার প্রশ্নের উত্তরে সে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছিল।

: 'এর পেছনেও হয়তো কোনো কারণ আছে। তার মধ্যে এমন কী আছে যে, তাকে তুমি ভুলতেই পারছ না?' উত্তরে ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করছিল।

: 'সে অদ্ভুত, মান্নি! শুধুই অদ্ভুত।' সে যেন ইমামাকে তার অসহায়ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছিল। সেই অসহায়ত্ব এখন পুনরায় ফিরে এলো। তার পাশের মেয়েটির যুক্তি কেবল তারই বোধগম্য, অন্য কারও বোঝার বাইরে। সে নিজেকে বেদীন কাফির বলছে, আবার সীমাহীন উদারতাও প্রদর্শন করছে।

: 'তুমি ভীষণ অদ্ভুত!' জিবরিল না বলে পারল না।

: 'হ্যাঁ, আমি তা-ই।' আয়েশা আবেদিন স্বীকার করল।

: আমি বুঝতে পারছি না, তুমি ষোলো বছর বয়সে বেশি সুন্দরী ছিলে নাকি এখন?

কথাটা অপ্রত্যাশিত ছিল। আয়েশা চমকে তার দিকে তাকাল। দেখল, জিবরিল অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। 'আবদুল্লাহ আমাকে বলেছে, তুমি আমাকে ভালোবাসো।' আয়েশার ইচ্ছে করল মাটি দু-ভাগ হয়ে যাক, আর সে তাতে ঢুকে যাক। এতটাই লজ্জিত হয়ে পড়েছে সে। কথাটি জিবরিলকে বলার জন্য বলেনি, তবু তা তার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। 'আবদুল্লাহকে আমি বলেছি, আমি জানি।' সে ওভাবেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর বলে চলছে। এই বাক্যটিও তাকে লজ্জায় ডোবালা। জিবরিল কবে থেকে তার হৃদয়ে পৌঁছে গিয়েছে!

'আবদুল্লাহর ধারণা, আমরা খুব ভালো লাইফ পার্টনার হতে পারি।'

কথাটি শুনে আয়েশা থেমে গেল। সে বুঝতে পারছে না, কে বেশি রহমদিল? যে বলেছে, নাকি যে পৌঁছে দিচ্ছে? 'আমি তাকে বলেছি, আমি এও জানি।' জিবরিলও এবার থেমে গেল। তারা দুজনেই এখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবারও বরফ পড়তে শুরু করেছে।

: 'জীবনের একটা সময় ছিল, যখন আমি ভাবতাম, আপনার মতো কারও সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, তবে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করব। সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।' আয়েশা অবশেষে বলতে শুরু করল। 'কিন্তু আজ এই পর্যায়ে এসে আমি ভাবি, বিয়ে কোনো সমাধান নয়। এটি সুন্দর জীবনের কোনো গ্যারান্টিও নয়। তাই এখন আমি সুন্দর জীবনের জন্য কোনো অবলম্বনও খুঁজছি না। ক্যারিয়ারে আমি ফোকাস

করতে চাই। নিজের জীবন নিজের মতো করে বাঁচতে চাই।
বিশ্বভ্রমণে যেতে চাই।"

: আমি তোমাকে স্পন্দর করতে পারি।

আয়েশা হেসে উঠল। গম্ভীরভাবে বলা কথাটি তাকে হাসানোর
জন্যই বলেছে সে।

: 'আপনি অদ্ভুত' আয়েশা বলল।

: 'আমি জানি।' আয়েশার মন্তব্যে অকপট উত্তর করল জিবরিল।
'আবদুল্লাহও আমাকে এটাই বলেছিল, আপনারা দুজনই
অদ্ভুত। তার মাদার তেরেসা হওয়ার শখ, আর আপনার ধারণার
বশবর্তী হয়ে অন্যের সুখ নষ্ট করার শখ। আপনারা একে
অপরের পরিপূরক।

'রাস্তা থেকে সরুন!' এক পথচারী সাইড চেয়ে তাদেরকে বলল। তারা দুজনেই একসঙ্গে রাস্তা থেকে সরে পড়ল।

: 'কখনো কোনো সুন্দর দিনে আমি তোমাকে আবারও জিজ্ঞেস করব, আমি তোমার বিশ্বভ্রমণের স্পন্সর হতে পারি কি?' পথচারী চলে যেতেই জিবরিল তাকে বলল। 'আমার মতো কাউকে না খুঁজে তুমি যদি আমার সঙ্গেই কথা বলতে, তবে ষোলো বছর বয়সেও আমি তোমাকে 'না' বলতাম না। বড়জোর অপেক্ষা করতে বলতাম।'

জিবরিলকে সে বলতে শুনল।

'আমি নিউরোসার্জন, আমি মস্তিষ্ক পড়তে পারি, কিন্তু হৃদয় নয়। তাছাড়া আমি গতানুগতিক রোমান্টিক কথাও বলতে পারি না।' সে বলে চলল। 'ষোলো বছর বয়সেও তোমাকে আমার ভালো লাগত, এখনো লাগে। আমি আমার মাকেও এই কথা বলেছি। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ যদি জিবরিল

সিকান্দারের হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা দিয়ে থাকেন, তবে সে নিশ্চয়ই খুব ভালো মেয়ে, যার কোনো গুণ আল্লাহর খুব পছন্দ। আমি আমার মায়ের কথাটিই পুনরাবৃত্তি করছি, একে আত্মপ্রশংসা ভেবো না।"

আয়েশা আবেদিনের চোখে বেয়ে একরাশ অশ্রুধারা নেমে এলো। তার পাথর হৃদয় গলতে শুরু করল।

: 'আমরা জানি না আমরা কতটা মুমিন, কতটা কাফির, কিন্তু আমরা যা-ই হই না কেন, আল্লাহ আমাদের হৃদয় সম্পর্কে অবগত।' আয়েশা আবেদিন কোথাও একবার পড়েছিল। তার নানি বলতেন, 'ভালো সময়, ভালো সময়ে আসে।' এই বাক্যগুলো অদ্ভুত। বহু বছর পর এগুলো তাদের মর্ম বোঝাচ্ছে।

: 'তুমি আমার মায়ের মতো কথায় কথায় কান্না করো। তোমাদের দুজনের বেশ জমবে।' জিবরিল এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, তার রক্তিম ভেজা চোখ ও নাকের দিকে তাকিয়ে বলল।

: 'কফি খাবে নাকি এখনো কেনাকাটা করবে?' জিবরিল এখন তাকে জ্বালাতন

করছে।

: 'কেনাকাটা বেশি জরুরি।' সে তার লজ্জা লুকিয়ে অশ্রু সামলে বলল।

: যদি এতই জরুরি হতো, তাহলে গ্রোসারি স্টোর পেছনে ফেলে আসতে না।

আয়েশা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘুরে তাকাল। দোকানটি সত্যিই অনেক পেছনে পড়ে গেছে। অন্য অনেক জিনিসের মতোই, সামনে অনেক কিছুই আছে। সে জিবরিলের ভেজা চেহারা দেখল, তারপর ভেজা চোখে নিজেও হাসল।

স্ক্র্যাপবুকটি দেখতেই ইমামা চিনে ফেলল। এটি তারই স্ক্র্যাপবুক। যেই স্ক্র্যাপবুকে সে তার স্বপ্নের বাড়ির ডিজাইন করেছে। বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন জিনিসের ছবি তুলে তুলে এখানে সে সব সংগ্রহ করেছে। নিজের বাড়ি বানানোর সময় সংগৃহীত বাড়ির মতো ডিজাইন করে করে বাড়ি বানাবে। তাতে নিজের হাতে আঁকা স্কেচের সঙ্গে ম্যাগাজিন থেকে কাটা অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ির ছবিও সেখানে লাগিয়ে রেখেছে।

কয়েক বছর আগে সে এটি পুরোনো জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হামিন তাকে ফেলতে দেয়নি। আর আজ ইমামা আবারও সেই স্ক্র্যাপবুকটি এখানে দেখছে, হামিন

সিকান্দারের এই পেন্টহাউসের একটি ড্রয়ারে। এটিকে মেরামত করা হয়েছে। একে এখন আগের চেয়ে অনেক ঝলমলে এবং যৌবনপ্রাপ্ত দেখাচ্ছে।

: 'এটা দিয়ে তুমি কী করবে?' হামিনকে সে জিজ্ঞেস করল।

: 'আপনাকে এমন একটি বাড়ি বানিয়ে দেব।' ইমামা সেই উত্তরই পেল, যা সে অনুমান করেছিল। হামিনের সারপ্রাইজগুলো অনুমান করতে সে পটু।

: 'আমার এখন আর এমন বাড়ির প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।' ইমামা তাকে বলল। 'একটা সময় ছিল, যখন আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। এখন আমার কেবল একটা ছোট বাড়ি দরকার। তোমার বাবাকে নিয়ে থাকার জন্য। আর তোমার বাবার তেমন একটা বাড়ি আছে। তাই তুমি এই বাড়ির জন্য তোমার শক্তি ও সময় নষ্ট করো না।

: 'এটা আমার ইচ্ছে, মাম্মি!' হামিন তাকে বলল।

: 'এই বাড়িটি আমি তোমার বাবার কাছে চেয়েছিলাম, তিনি দিতে পারেননি। এখন তোমার কাছ থেকেও আমি নেব না। আমি সালারকে কখনো এটা বুঝতে দেব না, যা তুমি আমাকে দিতে পারোনি, তা হামিন আমাকে দিয়েছে।' হামিন তার কথা বুঝতে পারল।

: 'ভেবে দেখুন।' ইমামাকে সে চ্যালেঞ্জের মতো করে বলল।

'ভেবেছি।' ইমামা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হাসতে লাগল।

: 'আপনি বাবা ছাড়া দুনিয়াতে আর কাউকে দেখতে পান না?'
হামিন

অভিযোগের সুরে বলল।

: 'হ্যাঁ, পাই না।' ইমামা হাসতে লাগল।

: 'এটা বাড়াবাড়ি।' হামিন প্রত্যুত্তর করল।

: 'এটুকু তো করতেই পারি।' ইমামা উত্তর দিয়ে তাকে জ্বালাতন করল।

: 'দাদা বলতেন, আপনারা দুজন প্রভুরের যুগে হলেও একে অপরকে খুঁজে

নিতেন।'

হামিন এখন তাকে জ্বালাতন করছে। ইমামা এবার অনিচ্ছাকৃতভাবে হেসে উঠল। অনেকক্ষণ হাসতে থাকল।

এখন সে সেই স্ক্র্যাপবুকটি খুলে পাতা উলটে উলটে দেখছে, যেন নিজের জীবনের পাতা ওলটাচ্ছে। সেটি আগে অর্ধেক

ফাঁকা ছিল। কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ ভরা। ইমামা আগ্রহ নিয়ে সামনের পৃষ্ঠাগুলোও দেখতে লাগল। সেগুলোতেও ছবি। সুন্দর সুন্দর মনোরম সব বাড়ির দৃশ্য। এগুলো মূলত হামিন সিকান্দারের পছন্দের বাড়ি। তার মতোই কেটে কেটে লাগানো সব ছবি। তবে পার্থক্য হলো, সেগুলো কোনো ম্যাগাজিনের ছবি নয়; ক্যামেরায় তোলা ছবি। হামিন সিকান্দারের নিজের বাড়ির ছবি। ইমামা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়ে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে সেগুলো দেখতে লাগল। সে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। ত্রিশ বছর বয়সের আগেই ডজনখানেক বাড়ির মালিক হয়ে গিয়েছে। তার সব সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য এবং সবচেয়ে উদার সে-ই।

সে তার প্রথম কোম্পানি ইমামার কাছ থেকে ধার নিয়ে শুরু করেছিল।

: 'আপনার কাছ থেকে ধার নিচ্ছি, কারণ বাবাও SIF আপনার থেকে ধার নিয়েই শুরু করেছিলেন।' ইমামাকে সে তখন এই



যুক্তি দেখিয়েছিল। ইমামা তখন প্রথমবারের মতো SIF-এর কাছে টাকা ফেরত চাইতেই, সালার তাকে সতর্ক করে বলে, 'দেখে নিয়ো, টাকাগুলো নিশ্চিত সে জলে ডোবাবো।' তখন তার বয়স ষোলো ও হয়নি। বাবা হিসেবে সালার তখন ভুল কিছু বলেনি।

: 'যখন আমি তোমাকে SIF শুরু করার সময় এই টাকা দিয়েছিলাম, তখন বাবাও এটাই বলেছিলেন। তাই বলে তুমি কি ডুবিয়েছিলে?' ইমামা তখন সালারকে উত্তর করেছিল।

: 'আমার সঙ্গে তুমি হামিনের তুলনা করছ?' সালার অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

: 'আজ প্রথম করছি না।' জবাবে ইমামা বলেছিল।

কত সময় কেটে গেছে। কেটে গেছে, নাকি বয়ে গেছে? যেটাই হোক, জীবন বহুদূর এগিয়ে গেছে। নফসের

আকাঙ্ক্ষাগুলো ব্যস্ততায় ঢাকা পড়ে গেছে। এক হাতে
জ্র্যাপবুকটি ধরে ইমামা অপর হাতে চায়ের কাপ ওঠাল। এরপর
চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক দিন আগেই সে
পাকিস্তান থেকে স্থায়ীভাবে আমেরিকায় চলে এসেছে।
হামিনের বাড়িতে এসে প্রথম উঠেছে। সালারও কয়েক দিনের
জন্য এখানে এসেছে। ঘুম ভাঙা ভোরে চা করে নিয়ে এখানে
বসেছে। মাথার উপর পেন্টহাউসের চাঁদ-ঝলমলে কাচের ছাদ।
শিশুদের মতো শান্ত নীরবতায় আকাশের নীলে ভাসমান
মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। আনমনে তাকিয়ে আছে, ক্ষণে
ক্ষণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া পাখির পানে। হঠাৎ পেছনে
কারও পায়ের শব্দে তার ধ্যান ভাঙে, তাকিয়ে দেখে সালার।
হাতে তার ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। চোখাচোখি হতেই একে
অপরের দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন নিঃশব্দ সংকেতে
সকালের সম্ভাষণ বিনিময়। কতকাল পর তারা এখানে, এভাবে
এই মার্কিন মুলুকে দু-দণ্ড স্বস্তিতে অবকাশ যাপন করছে। সব
ব্যস্ততাকে তালাবদ্ধ করে কিংবা সাময়িক ছুটির ইত্তেলা দিয়ে।

সালার তার কাছে, একদম পাশে, কাউচে এসে বসে পড়ল।
হাতে চায়ের কাপ, পাশাপাশি তারা, যেন আগের মতোই,
আগের সেই চিরচেনা কাপল। সালার স্বল্পভাষী, আর তার
মুখজুড়ে কথার ফোয়ারা। সালার মনোযোগী শ্রোতা আর সে
ননস্টপ সুরেলা বয়ান, আনমনা দিশেহারা। তবে তাদের
সময়টুকু যেন চায়ের কাপেই সীমাবদ্ধ, এক কাপ চায়ের আয়ু
সমান। চা শেষ হলেই সঙ্গতার এই মুহূর্ত বিলীন। চায়ের চুমুকে
কাটানো সময়টুকুই যেন তাদের সঙ্গতার জীবন। নরম-গরম,
থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বয়ে চলা সময়টুকু; যতটুকু থাকে,
ততটুকু ঘোর, তৃপ্তিতে ভরপুর। তার হাতের স্ক্র্যাপবুকটি সালার
মনোযোগ দিয়ে দেখল। কয়েক মুহূর্তে সেটি উলটেপালটে
দেখে আবার রেখে দিল। ভাবুক সুরে বলল, তোমার ছেলের
শখগুলো তোমার মতোই।

ইমামা হেসে উঠল। তারা দুজনেই এই প্রথম তার পেন্টহাউসে
এসেছে।



: 'এ বছর রিটার্নার হওয়ার কথা ভাবছ?' জবাবে ইমামা বলল।
সালার মৃদু হাসল।

: 'এখন তো তুমি আমেরিকায় চলে এসেছ, তাই অবসর নিতে পারি। আগে তো একা ছিলাম, বাধ্য হয়ে কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো।' সালার এখন তাকে জ্বালাতন করছে।

: আমি এখন বিশ বছরে হলে, তোমার এ কথায় খুশি হতাম।

: 'যাইহোক, ওই বয়সে আমার এ কথায় তুমি কখনোই খুশি হতে না।' সালারও পিঠাপিঠি উত্তর করল। তারপর দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

: 'এই বাড়িটি কি সেই বাড়ির মতো, যেটি তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে? হৃদের পাশে?'

সালার হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল।
সেও মাথা তুলে কাচের শরীর গলে আকাশের দিকে তাকাল।

: 'না, সেই রকম বাড়ি এটা নয়।' ইমামা এক মুহূর্ত পর বলল।
সিকান্দার উসমানের মৃত্যুর পর ইমামা আবারও সেই হ্রদের
পাশে একটা বাড়ি দেখেছিল। সেটি সে কিছুদিন পরপরই
দেখে। কিন্তু এবার অনেকদিন পর দেখেছিল। 'সেই বাড়িটি
এমন ছিল না।' ঘাড় ঘুরিয়ে পেন্টহাউসের চারপাশে তাকাল।
'সেই আকাশটা এমন ছিল না, সেই পাখিগুলো, সেই
খাঁচাগুলো এমন ছিল না। এমন বাড়ি পৃথিবীতে কোথাও
কখনো দেখিনি আমি।' সে বলে চলল। 'সেই বাড়ির সাজগোজ,
আসবাব পৃথিবী ঘুরেও কোথাও দেখিনি আমি। কখনো কখনো
আমার মনে হয়, সেই বাড়িটি হয়তো আমরা জান্নাতে পাব।'
বলতে বলতে ইমামা চুপ হয়ে গেল। সালারও নির্বিকার-নিশ্চুপ
বসে রইল।

: 'তুমি কিছু বললে না?' ইমামা তার নীরবতায় নাড়া দিল। সালার নিশ্চুপ রইল। অতঃপর হাসল। বলল, আমিন।

সালার আজও আগের মতোই আছে। সংক্ষিপ্ত অথচ প্রতিপক্ষকে বারুদ্ধ করে দেওয়ার মতো কথার জাদুকর। 'সেটা যদি জান্নাত হয়, তবে আমি তোমার আগে সেখানে যাব।' ইমামাকে সে বলল। 'তোমার মনে নেই? আমি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম?'

: 'এমনটাই হবে তা তো জরুরি নয়। স্বপ্নের সব সত্যি হয় না।' ইমামা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে উঠল। আজও বিচ্ছেদের ভাবনা তাকে অস্থির করে তুলল।

: 'যদি সত্যিই সেটা জান্নাত হয়, তাহলে তুমি কি চাও না, সেই স্বপ্নটা মিথ্যা হোক?' সালার অদ্ভুতভাবে হাসল। আবারও বাক্সদ্ধকারী এক বাক্য!

: 'চাই, তবে তুমি সেখানে আমার আগে যেয়ো না। আমরা দুজন একসাথেও তো যেতে পারি।' ইমামা চায়ের কাপ খালি করে সামনের টেবিলে রাখতে রাখতে বলল। এবার সে সালারের বাহুতে হাত রাখল। সালার হাসল।

: 'আবার বলো না!' ইমামা পীড়া দিল।

: 'কী?' সালার জিজ্ঞেস করল।

: আমিন।

সে হাসতে লাগল, 'আমিন।'

: 'তুমি তাকে কী বলেছ যে, সে আমার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে?' হিশামের সঙ্গে দেখা করার অনেকদিন পর রাইসা হঠাৎ হামিনকে জিজ্ঞেস করল। হিশামের এমন নিরুদ্দেশ তাকে চিন্তিত করছে।

: 'সে তোমার পিছু ছেড়ে দিয়েছে, এটা তো ভালো কথা। তুমি তো এটাই চেয়েছিলে, তাই না?' হামিন গম্ভীরভাবে বলল। রাইসা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। হামিন আজ তার ইউনিভার্সিটিতে এসেছে।

: 'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তাকে কী বলেছ?' রাইসা খানিক নিস্তেজ হয়ে বলল। হামিন তার জন্য একটি বাগার এনেছে। নিজেরটা পথে আসতে আসতেই খেতে শুরু করেছে। এখন তার ভাগের কেবল এক টুকরো বাকি আছে, সেটা সে গপগপ করে গিলছে। এদিকে রাইসা তার বাগার খেতে শুরু করল,

কারণ সে জানে, ওই এক টুকরো শেষ হতেই হামিন তারটাও খেতে শুরু করবে।

: 'আমি তাকে বলেছি, আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম, তাহলে রাজত্ব ছেড়ে দিতাম।' হামিন শেষ টুকরোটি গিলতে গিলতে বলল। মুহূর্তেই রাইসার ক্ষুধা উবে গেল। 'কী উদ্ভট পরামর্শ!' রাইসা মনে মনে ভাবল।

'কিন্তু আমি তাকে শুধু এটাই বলিনি।' হামিন তার আঙুল চাটতে চাটতে রাইসাকে নিশ্চিন্ত মনে বলল, 'তোমার তো ক্ষুধা উবে গেছে, আমার তো কেবল শুরু হয়েছে। তুমি যদি না খাও, তাহলে বাকিটাও আমি খেয়ে ফেলি?'

রাইসা চুপচাপ তার হাতে বার্গারটি ধরিয়ে দিল। সত্যিই তার ক্ষুধা উবে গেছে।

'আমি তাকে এও বলেছি, সে আসলে যুবরাজ হওয়ার মুনাসিব প্রার্থীই নয়। না আছে অধিকার, আর না আছে যোগ্যতা। তাছাড়া এই বিয়ে হোক বা না-হোক, এখন হোক বা পরে, এমনিই তাকে যুবরাজের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাই তার কাছে এখন দুটি পথ, হয় নিজের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে এখনই যুবরাজের পদ ছেড়ে দিক, নয়তো রাজত্বের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভালোবাসা আর সিংহাসন দুটোই হারাক।' হামিন অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে তাকে কথোপকথনের বাকি অংশ শোনাল।

: 'তুমি এসব তাকে এভাবে বলেছ?' রাইসা প্রচণ্ড আঘাত পেলে।

: 'না, এভাবে বলিনি। তোমাকে তো আমি ভদ্রভাবে বলছি। তাকে সোজাসুজি বলেছি, তোমার কাছে আর তিন মাস সময় আছে। তিন মাসের মধ্যে যদি পদচ্যুত না হ ও, তাহলে রাইসাকে দ্বিতীয় বিয়ে করে নিয়ো।'



রাইসা দাঁতে দাঁত চেপে হামিন সিকান্দারের দিকে তাকিয়ে রইল। এই কথোপকথনের পর যদি হিশাম বিন সাবাহ তাকে ছেড়ে যায়, তাহলে তা একজন আত্মসম্মানি ব্যক্তির কাজই হবে।

'সাবাহ বিন জাররার বিরুদ্ধে রাজপরিবারে তীব্র চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এদিকে সাবাহ বিন জাররাহ তার অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য পুরোনো আমিরের পরিবারে হিশামকে বিয়ে করাতে চায়। এটা হলেও সে বেশি দিন সিংহাসনে থাকতে পারবে না। কারণ, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা খুব শক্তিশালী এবং তারা সাবাহর চেয়েও যোগ্য শাসক। সাবাহ যদি সেখান থেকে সরে যায়, তাহলে হিশামকে কে থাকতে দেবে ওখানে? হিশামকে আমি এসব বলিনি, তোমাকে বলছি।' হামিন বার্গার শেষ করে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

: 'এজন্য তুমি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে টাকার জোগান দিচ্ছ?' তার কাছে হামিন সর্বশেষ এই প্রশ্নটিই প্রত্যাশা

করছিল। তারা একে অপরের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। তারপর হামিন বলল, 'আমি জাস্ট বিজনেস করছি। আমেরিকায় সাবাহর সঙ্গে, বাহরাইনে তার বিরোধীদের সঙ্গে।' এ এক অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

: 'কেন করছ?' রাইসা তার চেয়েও অধিক রুক্ষতায় জিজ্ঞেস করল। হামিন কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমার পরিবারের জন্য।

রাইসার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল।

: 'ভিক্ষা করা ভালোবাসার কোনো দরকার নেই আমার।' সে ভারী কণ্ঠে বলল।

: 'সে তোমার প্রতি আমার ধারণার চেয়েও বেশি আন্তরিক। যদি না হতো, তাহলে আমি তোমাকে আগেই সেটা বলতাম। দেখে

নিয়ো, তোমার জন্য সে সিংহাসন ছেড়ে দেবো" হামিন
স্পষ্টভাবে বলল। রাইসা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩২

ইনায়া তার হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রবেশ করতেই
আবদুল্লাহর কল দেখতে পেল। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাশ্রিত
হয়ে কল রিসিভ করল।

: 'দেখা করতে পারি?' সালাম বিনিময় করেই সে বলল। ইনায়া
এক মুহূর্ত চুপ রইল।

: 'তুমি এখানে?' সে জিজ্ঞেস করল।



: 'তোমার গাড়ির পেছনেই আমার গাড়ি।' ইনায়া অজান্তেই পেছনের আয়নায় আবদুল্লাহর গাড়িটির দিকে তাকাল। আবদুল্লাহ তার লাইট জ্বেলে তাকে ইশারা করছে।

দশ মিনিট পর গাড়ি পার্ক করে আবদুল্লাহ তার গাড়িতে এলো। তার হাতে একটি ফুলের সাথে দুটি ডাল। ইনায়া চুপচাপ তার দিকে তাকাল। ফুলগুলো হাতে নিল। সে আগেই তাকে আহসান ও আয়েশার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলেছিল।

: 'আই অ্যাম সরি!' আবদুল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করল।

: 'এর প্রয়োজন নেই।' ইনায়া উত্তর করল।

: 'হাসপাতালে আমি ডক্টর আহসানের পেছনে নামাজ পড়া বাদ দিয়ে দিয়েছি।'

ইনায়া চমকে তার দিকে তাকাল।

'তাকে বলেছি, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহারকারী ব্যক্তি কখনো ইমামতির যোগ্য নয়। আপনি যদি আবারও ইমামাতি করতে চান, তাহলে আয়েশার বিরুদ্ধে করা সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার পর।' আবদুল্লাহ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলে চলল।

: 'ওহ, এজন্যই তাহলে সে কেইস তুলে নিয়েছে?' ইনায়া অনিচ্ছাকৃতভাবে বলল। আবদুল্লাহ চমকে উঠল।

: তিনি কেইস তুলে নিয়েছেন?

: 'হ্যাঁ, জিবরিল আমাকে তা-ই বলল। আয়েশার কাছে নাকি ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠিও লিখেছে সে।' ইনায়া আরও জানাল।

: 'এসব এখন অর্থহীন। ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড ক্ষতি করে ফেলেছে তার।

: আয়েশার?

: 'না, নিজের।' আবদুল্লাহর কণ্ঠে বিষণ্ণতা। 'ভালো মানুষেরা তাদের প্রতিটি ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে, কারণ আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু খারাপরা তা পারে না।' আবদুল্লাহ বলে চলল। 'সে একজন ভয়ানক মিথ্যাবাদী।'

: 'সে তার বাবা-মাকে নিয়ে এসে পাপার কাছে অভিযোগ করে গেছে। জিবরিলের বিরুদ্ধে। পাপা তার বাবাকে বলেছেন, দেখো, তোমার মুনাফিকি আর সংকীর্ণচিন্তা তোমার একমাত্র ছেলেকে কী বানিয়ে দিয়েছে।'

: 'তারা কি লজ্জিত হয়েছিল?' আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করল।

: 'জানি না। চুপ হয়ে গিয়েছিল। তবে আহসান সাদের মা কাঁদতে শুরু করেছিল। জানি না কেন। তারপর তারা চলে গেছে।' ইনায়া বলল।

: 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ?' আবদুল্লাহ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। ইনায়া হাসল।

: হ্যাঁ, তোমার তো এমন কোনো বড় ভুল ছিল না যে, তোমাকে ক্ষমা করা যাবে না!

আবদুল্লাহ তার দিকে একটি কার্ড এগিয়ে দিল। সে অনিচ্ছাকৃত হাসল।

: 'সবকিছু এখন মুখে বলতে শিখো। এখনো লিখে কেন বলো?' ইনায়া কার্ডটি খুলতে খুলতে বলল। কার্ডটি খুলেই সে থমকে গেল। তাতে লেখা, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? ইনায়া হাত বাড়িয়ে আবদুল্লাহর শার্টের পকেট থেকে বলপেন নিয়ে, সেই

বাক্যটির নিচে লিখল, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ হেসে তার বলপেন ফেরত নিতে নিতে বলল, কখন? ইনায়া লিখল, ফুলের মৌসুমে।

: 'বসন্তে?' আবদুল্লাহ প্রশ্ন করল।

: 'হ্যাঁ।' উত্তরে ইনায়া লিখল।

আবদুল্লাহ একটি কার্ডে একটি হার্ট আঁকল, ইনায়া আরেকটি। আবদুল্লাহ একটি হাসির চিহ্ন আঁকল। ইনায়া আরেকটি। কার্ডটি রেখা, অক্ষর, সংখ্যা, এবং অনুভূতিতে ভরে উঠছিল। প্রতিটি জিনিসই ভালোবাসার জানান দিচ্ছে। আবদুল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ নিয়ামতগুলোর একটি এই ভালোবাসা। যে এটি পায় সে ভাগ্যবান। তারা দুজনও তেমনই ভাগ্যবান; এই কার্ডটিকে যারা প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিশ্রুতির নবায়নে ভরে তুলছে।

টেলিস্কোপে চোখ পেতে সে, আবারও ওই ব্যাস্কোয়েট হলের জানালা গলে ভেতরে তাকাল। ভেতরে নিরাপত্তারক্ষীরা যার যার জায়গায় সতর্ক হয়ে আছে। কেয়ারটেকার স্টাফরাও স্ব স্ব অবস্থানে নিয়োজিত। হলের গেটটি সেই বিশাল জানালার ঠিক সামনেই। তার বিপরীতেই যাট ফুট চওড়া, দু-পাশের প্রধান সড়ক। সড়কের ওপারে একটি তিনতলা ভবনের অ্যাপার্টমেন্টে লোকটি অবস্থান করছে। সেই অ্যাপার্টমেন্টের জানালার সামনে একটি চেয়ার পেতে, হাতে একটি আধুনিক স্নাইপার রাইফেল নিয়ে বসে আছে। গভীর মনে স্নাইপারের টেলিস্কোপিক সাইটে ঝুঁকে কাজক্ষিত শিকারের গতিবিধি লক্ষ করছে।

ব্যাঙ্কোয়েট হলের প্রবেশদ্বার একদম খোলা। অভ্যর্থনা জানাতে বিশেষায়িত লোকেরা করিডরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িতে এখন রাত নয়টা। প্রধান অতিথি সালার সিকান্দার নয়টা পনেরো মিনিটে করিডরে প্রবেশ করবেন। অতঃপর এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট অবস্থান করে বিদায় নিবেন। এদিকে প্রায় দেড় ঘণ্টার জন্য ওখানকার সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা জ্যাম হতে যাচ্ছে। এটি মূলত হাই সিকিউরিটির জন্য।

দেড় ঘণ্টায় সেখানে কোনো সেলফোন বা এ ধরনের কোনো ডিভাইস কাজ করবে না। কিন্তু সে একজন পেশাদার টার্গেট কিলার। এর আগেও সে এমন হাই সিকিউরিটির মাঝেও টার্গেট পূরণ করতে সফল হয়েছে। তাকে মূলত এজন্যই হায়ার করা হয়েছে। জীবনে সে কেবল দুজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং সেটি তার বড় দুর্ভাগ্য। প্রথমবার তার রাইফেলটি স্ট্যান্ড থেকে নড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার... যাক, দ্বিতীয়বারের গল্পটি অনেক দীর্ঘ।



গত দু-মাস ধরে সে এই অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করছে। এই হোটেলটি এই শহরে, এই তারিখে, এই অনুষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের নাম তালিকায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু চক্রান্তকারীরা জানত, অনুষ্ঠানটি ঠিক কোথায় হবে। দুই মাস আগে থেকেই কিলারকে সেই অ্যাপার্টমেন্টের এক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বলা হয়। মেয়েটির বয়স সাতাশ। তার একটি চার বছরের পুরোনো বয়ফ্রেন্ডও ছিল। এমনকি তিন সপ্তাহ পর তাদের বিয়ে হতেও চলেছিল। তার সেই সম্পর্ক ভাঙার জন্য একজন পেশাদার কল গার্ল ব্যবহার করা হয়। ছেলেটি ছিল একজন গাড়ি বিক্রেতা। কল গার্ল তাকে কল করে একটি গাড়ি কেনার ছলে তার সঙ্গে দেখা করে। তারপর ড্রিংকের প্রস্তাব করে একটি মোটеле নিয়ে যায়, তাকে নেশাগ্রস্ত করে কিছু আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে মেয়েটির কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মেয়েটি ছেলেটির কোনো কথা শুনতেই রাজি হয়নি। বিয়ে হতে চলা সম্পর্কের ভাঙনটি ছিল নিদারুণ দুঃসহ।

মেয়েটি রাগে তার বয়ফ্রেন্ডের জিনিসগুলো জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলো। জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে তার বয়ফ্রেন্ড ভাবতে থাকে, কিছুদিন পর তার রাগ পড়ে গেলে আবারও তারা এক হবে। চক্রান্তকারীরাও এই আশঙ্কা করছিল। তাই তারা বিষয়টিকে চূড়ান্ত করতে ছেলেটির কম্পিউটার হ্যাক করে। সেখান থেকে তার চার বছরের গার্লফ্রেন্ডের বিভিন্ন আপত্তিকর ছবি সংগ্রহ করে, তার কম্পিউটার থেকেই মেয়েটিকে একটি মেইল করে। মেইলে লিখে-তুমি যদি এই সম্পর্ক ঠিক না করো, তাহলে তোমার সব ছবি আমি বিভিন্ন সাইটে আপলোড করে দেব। এমনকি অনেক সাইটে আপলোড করেও দিয়েছি। এ দেখে মেয়েটি ক্ষিপ্ত হয়ে তার শো-রুমে চলে আসে। তাকে জনসমক্ষে মারধর করতে থাকে। ছেলেটি তখন একটি আধুনিক মডেলের গাড়ি বিক্রি করেই ফেলছিল, কিন্তু প্রেমিকার এই কাণ্ডে তা হাত ফসকে যায়। এটি ছিল চক্রান্তকারীদের পক্ষ থেকে কফিনের শেষ পেরেক। তাতে তারা সফল ও হয়।

মেয়েটি তাকে কাস্টমারের সামনে মারধর করেছে, এ নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার লজ্জা লেগেছে অন্য জায়গায়। 'Happy families drive this car. সুখী পরিবারের মানুষই এমন গাড়ি চালায়।' এই বাক্যটি সে কাস্টমারকে অন্তত ১৫৪ বার বলেছে। আর এখন তাদের সামনেই তার গার্লফ্রেন্ড এসে তার সাথে এমন ব্যবহার করেছে, ভাবতেই সে লজ্জায় ডুবে যাচ্ছে। তাকে অবাক করেছে তার গার্লফ্রেন্ডের অভিযোগ। তার কম্পিউটার থেকে তো সে তাকে কোনো মেইল করেনি। তাহলে করল কে? তাহলে কি মাতাল অবস্থায় করেছিল সে?

ব্রেকআপের এক সপ্তাহ পর, কিলার লোকটি নাইটক্লাবে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করল। কয়েকদিন এভাবেই তাদের উদ্দেশ্যহীন দেখাসাক্ষাৎ চলতে থাকল। মেয়েটি একজন মেডিকেল টেকনিশিয়ান, আর কিলার তার পরিচয় দিয়েছিল চিত্রশিল্পী হিসেবে। নাইটক্লাবের ড্রিংকসের বিল সবসময় সে-ই দিতে থাকল। কয়েকদিন এভাবে দেখাসাক্ষাৎ চলল। তারপর

মেয়েটি একদিন তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে আমন্ত্রণ জানাল।
এভাবে কিলার ছেলেটির যাতায়াত সেখানে বেড়ে গেল।
অ্যাপার্টমেন্টের সবার চোখে সে পরিচিত হয়ে উঠতে চাচ্ছিল।
ইতিমধ্যেই সে মেয়েটির অ্যাপার্টমেন্টের আরেকটি চাবিও
বানিয়ে ফেলল। মেয়েটি তখন বাইরে কোথাও গিয়েছে, সেই
ফাঁকে স্নাইপার রাইফেল ও অন্যান্য কিছু জিনিসপত্র সেখানে
লুকিয়ে রাখল। কারণ সে জানে, এই অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ
আগে এই এরিয়ার সব ভবনে নিরাপত্তা তল্লাশি হবে। তখন
কোনো ব্যাগ স্ক্রিনিং ছাড়া ভবনের ভেতরে নিতে পারবে না।
এমনকি তখনো সব ভবন কঠোর নিরাপত্তাধীন ছিল। মেয়েটির
সঙ্গে যদি সে নিয়মিত আসা-যাওয়া না করত, তাহলে সে
তখনো ওই ভবনে প্রবেশ করতে পারত না।

মেয়েটি এই মুহূর্তে তার অ্যাপার্টমেন্টে নেই। কারণ, এখান
থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে এক হসপিটালের কাজের বাহানায়
তারা তাকে আটকে রেখেছে। নয়তো সে এখন তার
অ্যাপার্টমেন্টেই থাকত। এমনকি পার্কিংয়ে রাখা তার গাড়ির

চারটি চাকারই বাতাস বের করে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি বাধা পেরিয়েও যদি সে অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে বের হয়, তাহলে তাকে থামানোর জন্য রাস্তায় আরও কিছু ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

ঘড়িতে এখন নয়টা বেজে তেরো। কিলার তার রাইফেল নিয়ে অতিথির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তার সামনের জানালাটি বুলেটপ্রুফ কাচনির্মিত। ডাবল গ্ল্যাজড বুলেটপ্রুফ কাচ। তাই এই জানালার সামনে কোনো নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়নি। যদি থাকত, তাহলে তার লক্ষ্য নির্ধারণে অবশ্যই সমস্যা হতো। কিন্তু এই মুহূর্তে সে এই প্রথম উপলব্ধি করছে, ইতিপূর্বে কাউকে মারার জন্য সে এমন কিন্তু এই মুহূর্তে সে এই প্রথম উপলব্ধি করছে, ইতিপূর্বে কাউকে মারার জন্য সে এমন চমৎকার সুবিধা পায়নি। অতিথিকে পুরো করিডর হেঁটে পার হতে হবে। লিফট থেকে বেরিয়ে করিডর অতিক্রম করে ব্যাল্কেইটেট হলের গেইট পর্যন্ত দুই মিনিটের দূরত্ব। শিকার করার জন্য তার হাতে পুরো দুই মিনিট সময়। তবে একবার যদি

সালার করিডর পার করে ব্যাঙ্কোয়েট হলের টেবিলের দিকে চলে যায়, তাহলে সে তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাবে। কিন্তু তার মতো একজন পেশাদার কিলারের জন্য দুই মিনিট সময় ই দুই ঘণ্টার সমান।

এই ব্যাঙ্কোয়েট হলের সবগুলো জানালাই বুলেটপ্রুফ। কেবল সেই জানালাটি ছাড়া, যেখানে টার্গেট করে সে বসে আছে। তিন সপ্তাহ আগে একটি দুর্ঘটনার বাহানায় সেই থাইটি ভেঙে, সেখানে ঝামেলাযুক্ত একটি থাই বসানো হয়। এটি কেবল চক্রান্তকারীরাই জানত, অন্য কেউ নয়। মঞ্চ প্রস্তুত। এবং সেই শিল্পীও এখানে আসতে চলেছে, যার জন্য এই নাটকের আয়োজন।

৩৪

: স্ত্রীকে খুন করলে কেন?



: এক বড়লোকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

: তারপর?

: তারপর জানতে পারলাম, যাকে আমি নিজের মেয়ে মনে করতাম, সেটাও তার মেয়ে।

: তারপর?

: 'আর সহ্য করতে পারলাম না। আত্মসম্মানি ছিলাম আমি। তাকেও খুন করলাম, বাকি সন্তানদেরও। জানি না, বাকি সন্তানগুলোও আমার ছিল কি না।

সিএনএন-এ গোলাম ফরিদের এই সাক্ষাৎকারটি ইংরেজি সাবটাইটেলসহ প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্বের সব বড় বড় চ্যানেল এই সাক্ষাৎকারটিকে ব্রেকিং নিউজ হিসেবে প্রচার করছে। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই পুরো বিশ্বে সালাহ সিকান্দার এবং SIF-এর

নাম আবারও সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে যাচ্ছে। তবে এবার খ্যাতি নয়, এই পরিবারের কলঙ্ক ছিল ভাগ্যে।

: 'সেই বড়লোকটি কে?' সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গোলাম ফরিদকে পরবর্তী প্রশ্নটি করল।

: আমি তার দারোয়ান ছিলাম, তার স্কুলের। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার নাজায়েজ সম্পর্ক ছিল বিধায়, আমাকে সে তার স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিল।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গোলাম ফরিদকে থামাল, 'সেই বড় লোকের নাম কী?'

: 'সালার সিকান্দার।' গোলাম ফরিদ অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল। বিশ্বের সব টিভি স্ক্রিনে একযোগে সালার সিকান্দারের ছবি ভেসে উঠল। তার সঙ্গে রাইসার ছবি।

এটি নিছক সিআইএ-র কোনো স্টিং অপারেশন নয়; এটি SIF-এর প্রতিষ্ঠাতা ও এই প্রতিষ্ঠানের ওপর দিন-দুপুরে সরাসরি আক্রমণ।

: 'গোলাম ফরিদ, তুমি কী চাও?' সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী এবার তাকে জিজ্ঞেস করল। গোলাম ফরিদ এক মুহূর্ত থামল, তারপর বলল, 'সালার সিকান্দারের ফাঁসি।'

৩৫

নাইরোবির এই ফাইভ-স্টার হোটেলে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি আফ্রিকার ইতিহাসে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর একটি। কয়েক ঘণ্টার জন্য, বিশ্বের সমস্ত অ্যাকোনোমিক্স মার্কেটের দৃষ্টি যেন

এই অনুষ্ঠানের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। SIF তাতে TIA-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আফ্রিকায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর্থিক তহবিল গঠনের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে। এটি কোনো সংমিশ্রণ নয়, অংশীদারত্ব। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান এই মুহূর্তে এই ফাইভ-স্টার হোটেলের ব্যান্ডে হলে উপস্থিত। তাতে রয়েছে বিশ্বের সেরা সব মস্তিষ্ক, আপন আপন ফিল্ডে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। এই সব মানুষের ভিড়ে সালার ও হামিন সিকান্দার সেই বৈশ্বিক তহবিলের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে, যার মূল্যমান বিশ্বের সব বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে যাবে।

রাত নয়টা চৌদ্দ মিনিটেও টেলিস্কোপের চোখে সেই টার্গেট কিলার ওত পেতে আছে। এখনো সালারকে লিফটের দরজা থেকে বের হতে দেখছে না। তবে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, টেলিস্কোপে দৃষ্টি স্থির করে, একটি আঙুল ট্র্যাকারের উপর রেখে, লিফটের দরজা খোলার অপেক্ষা করছে।

দশ... নয়... আট... সাত... ছয়... পাঁচ... চার... তিন... দুই...
এক...!



এই ব্যাস্কোয়েট হলের উপরের ফ্লোরের একটি কক্ষ থেকে আরও একটি টেলিস্কোপ রাইফেল ঠিক একইভাবে সেই টার্গেট কিলারকে নিশানা করে উলটো গণনা করছে। এটি চতুর্থ ফ্লোর। আর সেই কক্ষটি এই ফ্লোরের একটি স্টোররুম। তাতে ঝাড়ু, বালতি ও রুম পরিষ্কারের ট্রলিতে ভরপুর। সালারকে হত্যা করতে যারা ওই পেশাদার কিলারকে ভাড়া করেছে, তারাই আবার সেই কিলারকে হত্যা করতে অন্য একজনকে নিয়োগ দিয়েছে। চল্লিশ বছর বয়সি লোকটি ট্রিগারে আঙুল রেখে সেই টার্গেট কিলারের দিকে তাক করে বসে আছে। রুমটি সে ভেতর থেকে লক করে রেখেছে। সকালে পরিচ্ছন্ন

কাজের ফাঁকে এই রুমে এসে অবস্থান নিয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন এই রুমটিও সিলগালা করে দেওয়া হবে জেনেই, ভেতর থেকে সে নিজেই এটি তালাবদ্ধ করে দিয়েছে।

তার জানালার কাছে রাইফেলের জন্য একটি ছিদ্র আগে থেকেই করা। সাময়িকভাবে সেটি টেপ পৌঁচিয়ে আড়াল করে রেখেছে। টেপ সরানোর আগে টার্গেটের দিকে তাকিয়ে সে সময় আন্দাজ করে নিল। এখনো অনেকটা বাকি। তার জানালা থেকে সেই পেশাদার কিলারের জানালাটি অসাধারণ পজিশনে রয়েছে। প্রথম ফায়ার মিস করলেও টার্গেট তার নাগালেই থাকবে। তারা যেন আগে থেকেই সবকিছু একদম রেডি করে রেখেছে।

সে নিশ্চিত, এই জানালায় ঘাপটি মেরে বসার পর সেই পেশাদার কিলারটি টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে তার চারপাশটা একবার দেখে নিবে। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা আছে কি না পরখ করবে। তাই সে যদি এখন তার টেলিস্কোপ রাইফেলটি

জানালার কাছে লাগিয়ে বসে থাকে, তাহলে সে নিজে কিলারের চোখে না পড়লেও, তার রাইফেলের নলটি নিঃসন্দেহে কিলারের নজরে পড়বে। তাই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে জানালার কাছে এলো না। কিলারকে ফায়ার করতে তার খুব বেশি প্রস্তুতির ও প্রয়োজন নেই। সে তার খুব কাছাকাছিই আছে। অবশেষে একদম শেষ মুহূর্তে সে রাইফেলটি সেই ছিদ্রে স্থাপন করল। কিলার সালারকে শূট করার পরই তাকে শূট করতে হবে। সালারকে শুধু হত্যা করলেই হবে না, সেই সঙ্গে হত্যা-ষড়যন্ত্রের সমস্ত প্রমাণও মুছে ফেলতে হবে। ঘড়ির কাঁটা যেন দ্রুতবেগে ধাবমান হচ্ছে, টিক...টিক...টিক...। সেই সঙ্গে দুই পাশে দুটি আঙুল দুটি ট্রিগারের উপর তাদের চাপ বাড়িয়ে চলছে।



লিফটের দরজা খুলতেই সালার তার ঘড়ির দিকে তাকাল। তার দুজন বডিগার্ড আগেই লিফট থেকে নেমে পড়েছে। বাকি কর্মীরাও এখন লিফট থেকে নেমে তার পেছনে ছুটছে। করিডরে দ্রুত পায়ে হেঁটে সে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়ানো অফিসারদের সঙ্গে মোলাকাত করল। তারপর আবারও ঘড়ি দেখল। বরাবরের মতোই সে যথাসময়ে পৌঁছেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ব্যাঙ্কোয়েট হলে প্রবেশ করবে। সেখানে কী ঘটতে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে সে একেবারেই অজ্ঞাত। জ্ঞাত হওয়া উচিত ছিল। কারণ, অজ্ঞতা সবসময় নিয়ামত সাব্যস্ত হয় না।

টিভিতে সম্প্রচারিত সেই সংবাদ দেখে সালার হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনের এই পর্যায়ে এসে, সে কেবল এটিই প্রত্যাশা করেনি। অথচ এটিই হচ্ছে। করুণা করে লালনপালনকৃত মেয়েটিকে তার পাপের ফসল হিসেবে সারা বিশ্বে দেখানো হচ্ছে। সাক্ষাৎকারে এগুলো বলছে স্বয়ং বাচ্চাটির জন্মদাতা পিতা। যে নারীর চেহারা পর্যন্ত সালার

কখনো দেখেনি, সেই নারীর সঙ্গেই তার অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রচার করা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে, অবৈধ সন্তানের কথা। এটি ক্ষমতার খেলা। এটি তাদের কাছে যুদ্ধ, আর যুদ্ধে সবকিছুই জায়েজ। নাইরোবিতে হতে চলা TIA এবং SIF-এর পার্টনারশিপ চুক্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু তা নিষ্ফল।

সালার তখন নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে একটি ফ্লাইট ধরার অপেক্ষা করছে। তখন বিজনেস ক্লাসের ডিপার্চার লাউঞ্জে বসে প্রচারিত এই সংবাদটি দেখল। তার সফরসঙ্গী অফিসারগণ একের পর এক আপডেট নিউজ দিতে থাকল। ওখানে বসে সালার সবার আগে ইমামাকে কল করল। তার কিছু বলার আগেই ইমামা তাকে বলতে লাগল, 'আমাকে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাকেও না, আমার সন্তানদেরও না।'

: 'রাইসার সঙ্গে কথা বলো। আমার নিজের চেয়ে রাইসার ছবি প্রচার করাতে বেশি কষ্ট হচ্ছে।' সালার চিন্তিত হয়ে পড়েছে, ইমামা তার কণ্ঠ শুনেই বুঝতে পারছে।

: 'এই সময়ও কেটে যাবে, সালার! তুমি এর চেয়েও খারাপ সময় দেখেছ।' ইমামা তাকে সান্ত্বনার সুরে বলল। সালার মাথা নাড়ল। কৃতজ্ঞতার এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে ঘরে বসা এই নারীটি, তাদের সবার জন্য এক অদ্ভুত শক্তি। বড় অদ্ভুতভাবে তাদের সাহস জোগায়। অদ্ভুতভাবে তাদেরকে ভেঙে পড়া থেকে বাঁচায়। সঞ্জীবনী আশ্বাস দেয়।

ঠিক নয়টা পনেরো মিনিটে লিফটের দরজা খুলল। দুজন বডিগার্ড দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলো। সালার তার ঠিক পেছনে বেরিয়ে এলো। পুরো করিডরে আচমকা এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। আগে থেকেই সেখানে দাঁড়ানো গার্ড ও প্রটোকল কর্মীরা হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল। সে খুব দ্রুতপায়ে সেই দুজন বডিগার্ডের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। তার ঠিক পেছনে তার

ব্যক্তিগত কিছু অফিসার দ্রুত হেঁটে তার সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করছে। এক... দুই... তিন... চার... পাঁচ... ঠোঁটে ঠোঁটে গণনা করতে করতে সেই টার্গেট কিলার 'এক' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার রেঞ্জের আগত টার্গেটকে গুলি করল। সালার ব্যাঙ্কোয়েট হলের জানালার কাচের টুকরোগুলো ঝনঝন শব্দে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেখল।

লোকটি তার টেলিস্কোপ রাইফেল দিয়ে সেই টার্গেট কিলারের ট্রিগার চাপতে দেখল। ট্রিগার চেপে টার্গেট কিলার এক প্রশান্তির হাসি হাসছে। তারপর তাকে খুব শান্তভাবে টেলিস্কোপ রাইফেল থেকে চোখ সরাতে দেখল, ঠিক সেই মুহূর্তে সেও তাকে গুলি করল।

একটি হালকা 'টিক' শব্দ হলো, আর জানালা গলে তার মগজ উড়ে যেতে দেখল। এরপরই তার রুমের বাইরে হতুদন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তার মিশন সাকসেস। এখন তাকে এখান থেকে সরাতে তার লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছে। অবশেষে

ঠিক নয়টা পনেরো মিনিটে লিফটের দরজা খুলল। হামিন সিকান্দার তার দুজন ব্যক্তিগত বডিগার্ডের পেছনে নেমে এলো। পেছনে তার টিনের বাকি সদস্যরা। করিডরে প্রেস ফটোগ্রাফার এবং চ্যানেলের কর্মীরাও রয়েছে। তারা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আগমন কভার করছে। পাঁচ মিনিট আগেই সালার সিকান্দার এই জায়গাটি অতিক্রম করেছে, এখন অতিক্রম করছে সে। তারা দুজনেই আজকের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই ব্যক্তিত্ব। ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দিতে দ্রুতপায়ে হেঁটে সে করিডর অতিক্রম করে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে যেতে লাগল। হঠাৎ তার কিছু একটা মনে পড়তেই সে পেছনে ফিরে তার চিফ ফিন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজিস্টকে তা জিজ্ঞেস করতে নিল। ঠিক তখনই তার ঘাড়ের পেছনে রড ঢোকান মতো অনুভব করল। অতঃপর কাচ ভাঙার শব্দ, চিৎকার এবং তাকে মাটিতে ফেলে, কেউ যেন তার ওপর শুয়ে পড়ল। কেউ চিৎকার করে বলল, সামনের বিল্ডিং থেকে গুলি করা হয়েছে।

তখনই হামিন বুঝতে পারল তার ঘাড়ের পেছনে মূলত কী হয়েছে। ব্যথা ছিল তীব্র, অসহনীয়। তবে জ্ঞান হারায়নি। সবকিছু শুনতে পাচ্ছিল সে। তাকে এখন মাটিতে ছেঁচড়ে তার সিকিউরিটি টিম লিফটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার তখন সালার সিকান্দারের কথা মনে পড়ল। হঠাৎই তার মন ও মস্তিষ্ক একসঙ্গে তলিয়ে গেল।



সালার সিকান্দার ব্যাঙ্কোয়েট হলের মঞ্চে বসে, বক্তৃতার নোটের দিকে চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎ হলের গেইটের বিপরীত পাশে কাচ ভাঙার শব্দে চমকে উঠল। হতভম্ব হয়ে দূরের জানালার কাচ ভেঙে পড়তে দেখল।

'ওগুলো তো সাউন্ডপ্রুফ বুলেটপ্রুফ কাচ, তাহলে ভাঙল কীভাবে?' এক মুহূর্তের জন্য ভাবল সে। এরপরই সে হলের পেছনের দিকে এবং বাইরের করিডরে চিংকার শুনতে পেল।

সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, সে-সহ মঞ্চে বসা সবাইকে
সিকিউরিটি গার্ডরা টেনে মঞ্চের পেছনে নিয়ে গিয়ে, মাটিতে
শুয়ে পড়তে বলল। পুরো হলে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ল।
প্রত্যেক বডিগার্ড তার মালিককে সেইভ করতে তৎপর হয়ে
উঠল। এখানে উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তিই বিশেষ। এটি পৃথিবীর
সফলতম মানুষদের সমাবেশ। অথচ তারা এখন তাদের জীবন
বাঁচাতে ব্যস্ত।

মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়া সালারের হঠাৎ হামিনের কথা
মনে পড়ল। সে তো আমার পরেই হলে ঢোকান কথা ছিল।
কিন্তু সে তো আসেনি। তাহলে কি এই হামলা তার ওপর
হয়েছে? তার হৃদয় যেন কেউ মুঠো চেপে ধরল। সে আর
ভাবতে পারল না। মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। রক্ষীরা তাকে
থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সে তাদের ধাক্কা দিয়ে চিৎকার
করে বলল, সরে যাও!

তারা তার পেছনে ছুটে এলো। সালার মাটিতে শোয়া লোকদের ডিঙিয়ে, দাঁড়ানো গার্ডদের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে গেইটের কাছে চলে এলো। গেইট গার্ডে ভরপুর। এই ভিড়ের মধ্যেও সে রিসেপশন ডেস্কের পাশে সাদা মার্বেলের মেঝেতে লাল রক্ত রেখা দেখতে পেল, সেটি পুরো মেঝে বেয়ে লিফটের দিকে চলে গেছে।

: 'কার গুলি লেগেছে?' হিম শীতল দেহে এক গার্ডকে জিজ্ঞেস করল সে।

: হামিন সিকান্দার।

সালারের মনে হলো, তার পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গেছে। সে টালমাটাল হয়ে পড়ে গেল। দুজন গার্ড তাকে সামলে নিল।

: 'সে কি বেঁচে আছে?' সালার আবারও সেই গার্ডকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।



ইমামাও এই হোটেলের সপ্তম ফ্লোরে সালার সিকান্দারের রুমেই রয়েছে। এটি একটি বিশাল সুইট রুম। তাদের পাশের রুমেই ছিল হামিন। আমেরিকায় স্থায়ীভাবে চলে আসার পর, ইমামা প্রায় প্রতিটি সফরেই সালারের সঙ্গী হয়। এই সফরে হামিনও তাদের সঙ্গে ছিল। আজ তারা তাদের প্রাইভেট প্লেনে করে এসেছে।

দুই দশকেরও অধিক সময় পর তারা পুনরায় আফ্রিকায় এসেছে। এবার তারা কঙ্গোতেও যেতে চাচ্ছিল, পুরানো স্মৃতিগুলোর গায়ে সতেজতার জল ছিটাতে। একটু আগেই

তারা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সেরেছে। এই অনুষ্ঠান শেষ করে তারা বিকেলে কিনশাসায় যাবে। সেজন্য ইমামা তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। একটু আগেই সে হামিনের রুমে গিয়ে তার জিনিসগুলোও গুছিয়ে এসেছে।

ব্যাগের জিপার বন্ধ করতে করতে সে তার দরজায় জোরে ধাক্কার আওয়াজ পেল। ইমামা ভীষণ চমকে গেল। দরজা খুলে দেখল পুরো করিডর গার্ডে গার্ডে একাকার। প্রায় প্রতিটি রুমের দরজাতেই গার্ড।

: 'আপনি ঠিক আছেন?' তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল।

: 'হ্যাঁ, কেন?' ইমামা অবাক হলো।

তারা দুজন অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে ঢুকে জানালার খোলা ব্লাইন্ডগুলো বন্ধ করে

দিল। একজন হামিনের রুমের দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো।

: 'কী হয়েছে?' ইমামা এখন প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়ল।

: 'একটি ইমার্জেন্সি হয়ে গেছে। আপনি রুম থেকে বেরোবেন না। কোনো সমস্যা হলে আমাদের জানানো' কথাগুলো একজন বলে চলল, আরেকজন তার বাথরুম ও আলমারি দ্রুত চেক করে এলো। তারপর তারা যে গতিতে এসেছিল, ঠিক একই গতিতেই বাইরে চলে গেল। ইমামার মনে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। সালার কিংবা হামিনকেও ফোন করতে পারছে না, ফোন সার্ভিসও এখন কাজ করছে না। অস্থির হয়ে সে টিভি অন করল। তাতে একটু আগেও স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক চ্যানেলগুলো এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করছিল।

স্ক্রিনে প্রথম ছবিটি ভেসে উঠতেই ইমামা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ঠাস করে সোফায় বসে পড়ল। টিভিতে সেই ভাঙা

জানালা এবং ব্যাঙ্কোয়েট হলের বাইরে দৃশ্য দেখানো হচ্ছে।
ফ্রিনে বারবার শিরোনাম ভেসে উঠছে। তারা এই আন্তর্জাতিক
সম্মেলনের ওপর কৃত হামলা ও গোলাগুলির সংবাদ ব্রেকিং
নিউজ হিসেবে প্রচার করছে। ওগুলো তাকে মোটেও বিচলিত
করছে না। তাকে বিচলিত করছে অন্য একটি সংবাদ-TIA-এর
প্রধান হামিন সিকান্দার এই হামলায় গুরুতর আহত।

ইমামার মনে হলো তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে ওঠার
চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। চিৎকার করতে চাইল, তাতেও
সফল হলো না। 'আফ্রিকা তার জন্য অশুভ।' সে ভাবল। রুমের
দরজায় সে ধপাধপ ধাক্কার শব্দ শুনতে পেল। অতঃপর সে
হামিন সিকান্দারের কক্ষের দরজা খুলতে দেখল।



এটি আফ্রিকার ইতিহাসের স্মরণীয় একটি দিন। যেখানে বহু বছর পর ইতিহাস আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলের সকল প্রতিনিধি দল আবারও তাদের আসন গ্রহণ করেছে। চারপাশে ভয় ও আতঙ্কের এক অদ্ভুত পরিবেশ বিরাজ করছে। অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তবু সম্মেলন থেমে নেই। জানালার কাচটি ওভাবেই ভাঙা পড়ে আছে, তবে সামনের বিন্ডিংটি সিকিউরিটি গার্ডদের ঘেরাটোপে বন্দি। ঘণ্টাখানেক বিলম্বের পর সম্মেলন আবারও শুরু হয়েছে। সালার সিকান্দার ও হামিন দুজনেই এখন ইমামার রুমে। মেডিকেল টিম হামিনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে। গুলি তার ঘাড়ে লাগেনি। ঘাড়ের পেছনের অংশে ছুঁয়ে যাওয়ায় কিছুটা ক্ষত হয়েছে। মেডিকেল টিম তিন ইঞ্চি লম্বা এবং আধা ইঞ্চি গভীর একটি ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য, পেইন কিলার মেডিসিন দিয়ে জায়গাটি কিছুক্ষণের জন্য অবশ্য করে রাখা হয়েছে। রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তার, কিন্তু এই মুহূর্তে সে তাতে রাজি হয়নি। এখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

চক্রান্তকারীদের দেখানো যে, তারা তাকে হারাতে পারেনি।
আতঙ্কিতও করতে পারেনি।

সালার সিকান্দার তার আগেই রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল।
হামিনও এখন বের হবে। পোশাক পালটে ইমামাকে জড়িয়ে
ধরল সে। ইমামা তাকে থামাতে চেষ্টা করল না। সালার
সিকান্দারের সন্তান, তাকে কে আটকাতে পারে? ইমামা তাকে
জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলো। তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে
দিল।

সেই লিফটের দরজা রাত দশটা চল্লিশ মিনিটে আবারও খুলল।
এবার হামিন সিকান্দারের সঙ্গে কোনো সিকিউরিটি গার্ড নেই।
দুচারজন অফিসার। লিফট থেকে করিডরে পা রাখতেই
সেখানে করতালি শুরু হলো। এরা সবাই প্রেস ফটোগ্রাফার
এবং করিডরে দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ড, তার এই সাহসিকতার
জন্য তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে হলের দিকে এগিয়ে গেল। সামনের জানালার ভাঙা কাচের দিকেও তাকাল না। যদিও সেটার সামনে এখন সিকিউরিটি গার্ডদের বিশাল সারি। অবশেষে হামিন সিকান্দার হলে প্রবেশ করতেই হলজুড়ে করতালি গুঞ্জরিত হলো। হামিন সিকান্দার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে, মাথা নেড়ে নেড়ে সেই করতালির জবাব দিতে দিতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। মঞ্চে উপবিষ্ট সবাই একে একে দাঁড়াতে শুরু করল। তারপর হামিন সালার সিকান্দারকেও দাঁড়াতে দেখল। হামিন এগোতে এগোতে থেমে গেল। এই প্রথম সালার তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান দিচ্ছে। এক মুহূর্ত থেমে হামিন সিকান্দার সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠতে শুরু করল।

বিশ্বজুড়ে টিভি চ্যানেলগুলো এই দৃশ্য সম্প্রচার করছে। সাহসিকতার এক নতুন ইতিহাস তারা সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, যে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত বহু বছর পূর্বে সালার সিকান্দার এই আফ্রিকায় স্থাপন করেছিল। আফ্রিকার ইতিহাসে সেই দৃশ্যটি আজ হামিন সিকান্দারের হাতে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।



মঞ্চে এখন TIA এবং SIF-এর দুই প্রধান মিলিত হচ্ছে। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তির সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। অতঃপর হামিন সিকান্দার তার বক্তব্য রাখতে শুরু করল। সে তার বক্তব্য সেই কুরআনের আয়াত ও আখেরি খুতবা দিয়েই শুরু করল, যেভাবে তার বাবা বহু বছর আগে আফ্রিকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুরু করেছিলেন।

: 'অত্যন্ত বরকতময় সেই সত্তা, যার হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনিই সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।' সে সুরা মুলকের আয়াত দিয়ে তার বক্তৃতা শুরু করল। 'সেই মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে আমলের দিক থেকে সেরা। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।'

পুরো হলজুড়ে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যখন

বলেন 'হও', তখন তা হয়ে যায়। তিনি শত্রুদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেন। বহু বছর পূর্বে সুদের বিরুদ্ধে SIF-এর প্রথম লড়াই এই আফ্রিকা থেকেই শুরু হয়েছিল। এই সেই ভূমি, যেখানে আমার বাবা সুদি ব্যবস্থার এক যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে করতে, নিজেই সুদের বিরুদ্ধে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সুদ, যাকে আখেরি খুতবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম ঘোষণা করেছিলেন। আখেরি খুতবায় নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সুদের মূলোৎপাটনের কথাই বলেননি; তাতে সমতার কথাও বলেছেন। মানুষকে তাদের বর্ণ, জাতি, বংশীয় মর্যাদার ভিত্তিতে বিচার না করে, তাদেরকে কেবল তাকওয়া ও ধার্মিকতার ভিত্তিতে বিচার করতে নির্দেশ করেছেন। SIF ও TIA সেই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে।

সে কথা বলছে আর একযোগে পুরো বিশ্ব তাকে শুনছে। সে আখেরি নবির উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলছে, তবু তারা তা শুনতে



বাধ্য হয়ে আছে। কারণ, সবাই জানে, তারা আমলদার উত্তম মুসলমান। তাদের কথায় ও কাজে কোনো বৈপরীত্য নেই। ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেওনি। তারা ক্ষমতামশালী হতেই, পৃথিবীও তাদের ধর্মকে সম্মান দিতে শুরু করেছে। সম্মান দিচ্ছে তাদের ধর্মের মহান পয়গম্বরকেও। কিলারের যে গুলিটি পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিতে এসেছিল, তা এখন ভাগ্য-লেখকের সামনে অসহায় হয়ে গেল। ইতিহাস ঠিক সেভাবেই লেখা হচ্ছে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা চেয়েছিলেন। এবং তারাই লিখছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন।

নিঃসন্দেহে, সমস্ত শক্তির উৎস কেবল আল্লাহর মহান সত্তাই, যার ভালোবাসা সেই আবে হায়াতত-যা জীবনকে অমরত্ব দেয়, এই জগৎ থেকে পর জগৎ অবধি।



রাইসা সালার তার বাবার কাছে কেবল একটি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল। কেবল ছোট্ট একটি প্রশ্নের। কেন সে তার পরিবারকে মেরে ফেলল? সবাইকে যখন মেরেই ফেলল, তাহলে তাকে কেন ছেড়ে দিল? নাকি তার জীবন তার বাবার ভুলের ফসল?

প্রশ্নের একটি ভূপ জমে আছে তার মনে। ওয়েটিং রুমে বসে আবারও তার জ্বলন্ত চোখ দুটো মুছল। জানে না কত রাত ধরে সে ঘুমায়নি। গত দুটি সপ্তাহ তার এক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের মতো কেটেছে। যখন থেকে সে জানতে পেরেছে, তার বাবা কে, তার পরিচয় কী। আর কোথায় তার বাড়ি। সে সালার সিকান্দার ও ইমামা হাশেমের মেয়ে নয়, এতটুকু সে জানত। তবে তাকে বলা হয়েছিল, সে তার এক বন্ধুর মেয়ে। তার বাবা-মা এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। এরপর সালার তাকে দত্তক নিয়েছে।

কিন্তু আজ হুট করে তার জীবনে গোলাম ফরিদের আগমন ঘটেছে, যাকে টিভিতে দেখার পরও তার মন কোনোভাবে মানতে চাচ্ছে না, এই লোকটির সঙ্গে তার কোনোরূপ সম্পর্ক থাকতে পারে! কিন্তু মানতে না চাওয়াতে কিছু যায়-আসে না। বাস্তবতাকে সে অস্বীকার করতে পারে না।

সেই ঝড়ের মধ্যে হামিন, জিবরিল, ইনায়া, ইমামা, সালার তারা সবাই তার কাছে চলে এসেছিল। এবং হিশামও। তাকে বলছিল, 'তোমার পরিচয় কী, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তুমি আমাদের কাছে সেই আগের রাইসাই।' সে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। ঋণী। তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছে সে একদম ঠিক আছে। কিন্তু সে মোটেও ঠিক ছিল না। তার ভেতরে এক তীব্র ভাঙচুর চলছিল। বিশেষ করে এজন্য, যারা তার ওপর দয়া করে তাকে লালনপালন করেছিল, আজ সে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সালারের ওপর আনীত মিথ্যা অপবাদগুলো বুঝতে তার এক মুহূর্তও লাগেনি। অবশ্য ওইসব তুহমত-অপবাদের জন্যই আজ সে এখানে আসতে পেরেছে।

রাইসা আজ গোপনে এখানে এসেছে। চুপচাপ, নিরিবিলি।
পরিবারের কাউকে কিছু জানায়নি।

অবশেষে গোলাম ফরিদ জেলের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে
ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করল। দুজনেই নিঃশব্দে একে অপরের
দিকে তাকাল। জেলের সেই কর্মকর্তাটি চলে গেল। গোলাম
ফরিদকে কেমন ভীত দেখাতে লাগল। রাইসা কয়েক মুহূর্ত
তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শান্ত স্বরে বলল, আপনি কি
আমাকে চিনতে পারছেন?

: 'না' এক মুহূর্ত দেরি করে বলল ফরিদ।

: 'আমি আপনার সবচেয়ে ছোট মেয়ে, যাকে মারতে ভুলে
গিয়েছিলেন আপনি।' এটি বিদ্রূপ নয়, এটি আত্মপরিচয় প্রদান।
এছাড়া আর পরিচয় করানোর মতো তার কাছে কোনো বাক্য
নেই।

: 'চন্নি...!' অনেকক্ষণ রাইসার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে,
গোলাম ফরিদ অকপটে বিড়বিড় করল।

রাইসা ঠোঁট চেপে ধরল, পানিতে তার চোখ ভরে গেল। তার
বাবা তাকে চিনতে পেরেছে। যে নামের পরিচয় দিয়ে সে দেখা
করতে এসেছে, গোলাম ফরিদ যেন তার সেই রাইসা নামটি
মনে করতে পারছে না। সে চন্নিকে আরেকবার দেখল।
গভীরভাবে লক্ষ করল। তাকে মেম সাহেবের মতো লাগছে।
শ্যামলা রঙের এই মেয়েটিকে তার নিজের মেয়ে মনে হচ্ছিল
না। সে জানত, তার শেষ সন্তানকে সালার সিকান্দার
লালনপালন করছে। সাক্ষাৎকার নিতে এসে লোকেরা তাকে
এটি বলত।

চন্নিকে দেখে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। নীল জিন্স, সাদা শার্ট,
খোঁপা করা চুল আর চোখে চশমা পরে পায়ের উপর পা তুলে
বসে আছে চেয়ারে। গলায় আল্লাহর নামের চিকন লকেট,
হাতে একটি দামি ঘড়ি। অবিকল চন্নির মায়ের মতো। তার মুখের

গড়নও তার মতোই। ফরিদ কেবল তার মুখের গড়নটাই চিনতে পারছে। তার সেই অসুস্থ, দুর্বল, রোগা-পাতলা, অনবরত কান্নারত পিচ্চি চন্নিটা কীভাবে এমন মেম সাহেব হয়ে গেল! তার সামনে ফরিদের নিজেকে এখন তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

কিন্তু কেন জানি, তার বেঁচে থাকা একমাত্র সন্তানকে এমন ভালো অবস্থায় দেখে গোলাম ফরিদের মন এক অদ্ভুত আনন্দে নেচে উঠল। ক্ষণিকের জন্য সে ভুলে গেল, এই সন্তানকেই সে অবৈধ হওয়ার অপবাদ দিচ্ছে। বহু বছর পর সে কোনো আপনজন দেখল। আপনজন দেখে সবকিছু ভুলে গেল।

রাইসা খাবার-পানীয় ভরা একটি খাম তার বাবার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, এগুলো আমি আপনার জন্য এনেছি। গোলাম ফরিদ অবাক চোখে সেই খামটির দিকে তাকাল। কাঁপা হাতে সেটি আঁকড়ে ধরল। তাকে দেখে রাইসার সমস্ত প্রশ্ন যেন উধাও হয়ে গেল। যে জীর্ণশীর্ণ মানুষটি এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে প্রশ্ন করা অনর্থক। পড়ন্ত বেলার এই

মানুষটির প্রতি তার করুণা হলো। সে এখন আর তাকে কোনো কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় না। গোলাম ফরিদ চশমা খুলে চোখ মোছা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অদ্ভুত স্বরে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পড়ো?

রাইসা চোখ তুলে গোলাম ফরিদের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল। গোলাম ফরিদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

: আরও বেশি পড়বো।

রাইসার চোখে আবারও জল এলো।

: 'আমি আর তোমার মা ভাবতাম, বাচ্চাদের একসময় অনেক পড়াব... আর...' গোলাম ফরিদ তার স্মৃতির কোনো এক কুয়াশাকে শব্দে রূপ দিয়ে চুপ হয়ে গেল। 'ছাহেবকে আমার শুকরিয়া জানাবো। আর কখনো জেলে আসবে না।' কয়েক মুহূর্ত পর গোলাম ফরিদ বলল। রাইসার অশ্রু এখন গাল বেয়ে

পড়ছে। গোলাম ফরিদের কাছে সালার সিকান্দার আবারও 'ছাহেব' হয়ে গেছে।

রাইসার মনে হলো, নিজের সন্তানকে এমন ভালো অবস্থায় দেখে তার বাবা হয়তো লজ্জা পাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়াল। গোলাম ফরিদও উঠে পড়ল। খানিক এগিয়ে এসে রাইসার মাথায় হাত বোলাল। সে তাকে জড়িয়ে ধরতে ইতস্তত করছিল। হয়তো জড়িয়ে ধরতেই চাচ্ছে। রাইসা নিজে এগিয়ে এসে গোলাম ফরিদকে জড়িয়ে ধরল। গোলাম ফরিদ তাকে জড়িয়ে বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বাকি সন্তান ও স্ত্রীর নাম পুনরাবৃত্তি করতে থাকল।



একটি নির্ভার দেহে সে আমেরিকায় ফিরে এলো। এখানে পৌঁছে তার ফোন চালু করল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত বন্ধন জাগ্রত হয়ে উঠল। পরিবারের মেসেজ জমে ভূপ হয়ে আছে। এয়ারপোর্ট থেকে ঘরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেসব মেসেজ পড়ে ফেলল সে। ভেজা চোখে... একের পর এক মেসেজ...। অতঃপর হিশামের পাঠানো সর্বশেষ একটি মেসেজ, 'বাদশাহ তার সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছে।' কিন্তু কেন? তা সে লেখেনি। তার হামিনের কথা মনে পড়ল, তার সেই সব কথা।

বাড়ির বাইরে সালারের গাড়ির সঙ্গে হামিনের গাড়িও দেখতে পেল। রাইসা কলিং বেল বাজাল। কিছুক্ষণ পর সালার সিকান্দার দরজা খুলল। দুজনেই নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। সে এগিয়ে গিয়ে সালারকে জড়িয়ে ধরল, যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল তার দেড় বছর বয়সে, তারপর আর আলাদা হয়নি। সালার তাকে বাচ্চাদের মতো হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

আমেরিকায় ফেরার আগে পাকিস্তানে সে একটি প্রেস কনফারেন্সে তার পিতৃত্বের পরীক্ষা এবং গোলাম ফরিদের জবানবন্দি মিডিয়াকে দিয়ে এসেছে। একজন আইনজীবীর মাধ্যমে তার পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে, তার বাবাকে ক্ষমা করার একটি হলফনামাও জমা দিয়ে এসেছে। যে প্লাবন সালার সিকান্দার ও তার পরিবারকে নিমজ্জিত করতে এসেছিল, রাইসা তা রুখে দিয়েছে। অথচ সালার সিকান্দারের বুকে জড়িয়ে, শিশুর মতো কান্নারত এই মেয়েটিকে দেখে কেউ বুঝতেও পারবে না, সে এতটা সাহসী। আর যা-ই হোক, সেও তো সালার সিকান্দারেরই অংশ। রক্তের সম্পর্ক না হলেও, দয়া ও মায়ার গভীরতম বন্ধনে আবদ্ধ এক সদস্য।

তার নামের সঙ্গে সালারের নাম ব্যবহার করলেও, সে তার বাবার নাম জানত। কিন্তু সেই বাবা যে কারাগারে ফাঁসির আসামি, তা সে জানত না। আর যখন জানল, সেই পরিবারের কদর ও কিমত সে উপলব্ধি করতে পারল, যে পরিবারটি তার অতীত ও চলমান জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

: 'আমি তোমাকে কখনো কাঁদতে শেখাইনি, রাইসা। আর কাঁদার জন্যও তোমাকে বড় করিনি।' সালার তাকে বুক থেকে ছাড়িয়ে বলল। রাইসা তার অশ্রু সংবরণ করে, সালারের পেছনে খোলা দরজায় হামিন ও ইমামাকে দেখল।

: 'শেষবারের মতো কাঁদছি, বাবা।' ভেজা চোখে হাসতে হাসতে বলার চেষ্টা করল সে। তার গলা আবারও ভারী হয়ে উঠল।

খানায়ে কাবায় দাঁড়িয়ে আছে সালার, ঠিক মুলাতাজামের সামনে। কতবার সে এখানে এসেছে, কতবার এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার হিসাবও এখন তার মনে নেই। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে ভয়-ভক্তি ও বিনয়ের মিশেলে। পৃথিবীর কোনো স্থান সালারকে তুচ্ছ করতে পারে না, কেবল এখানে এলেই সে মাটি হয়ে যায়। মাটি হতেই সে এখানে আসে। প্রতিবার নিজের সক্ষমতা জানতে এবং অক্ষমতা উপলব্ধি করতে এখানে আসে। যখনই পৃথিবী তাকে খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত করে, তখনই সে তার গর্ব-অহংকারকে কবর দিতে এখানে চলে আসে। আজও এসেছে, বরং তাকে ডাকা হয়েছে।

খানায়ে কাবার দরজা খোলা হচ্ছে। সিঁড়ি পাতা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সেই দশজনের একজন সে, যাদেরকে খানায়ে কাবার অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার সৌভাগ্য লাভের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। কোন পুণ্যের বিনিময়ে এই সম্মান পেয়েছে, তা এখনো বুঝতে পারছে না সে। করুণা...!



করুণা তো তার ওপর সবসময় ই ছিল। তা সত্ত্বেও সে এখন তার আমলনামায় এমন কোনো পুণ্য খুঁজছে, যা এমন করুণার কারণ হতে পারে।

রাজপরিবারের অতিথি হয়ে গত কয়েক বছরে বহুবার হজ ও উমরার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে তার। ইমামাকে সঙ্গে করেও, তাকে ছাড়াও। কিন্তু এবারের এই আমন্ত্রণপত্রটি সালার সিকান্দারকে অন্য এক অনুভূতিতে লিপ্ত করেছে। এমন প্রতিদান এবং এত প্রতিদান! এমন করুণা আর এত করুণা! সে তো পাপী, গুনাহগার; এমন কী করেছে যে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমার বারিতে স্নাত করছেন! অকল্পনীয় ও অফুরন্ত দানে সন্তুষ্ট করছেন। ইমামাও এখানে রয়েছে, অন্য সারিতে, পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে। ওখানে দাঁড়িয়ে সালারকে সে খানায়ে কাবার খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে যেতে দেখছে। সে-ই সব শেষে প্রবেশ করেছে।

এটি এক মুজিজাই যে, সে জীবিত, সুস্থ, কর্মঠ আছে। এই বয়সেও বিশ-বাইশ ঘন্টা কাজ করতে পারে। ডাক্তাররা বলত, তার বেঁচে থাকা একটি মুজিজা। আর এমন সুস্থ জীবনযাপন মুজিজার চেয়েও বড় কিছু। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তার টিউমার হয়েছিল, এখন তার বয়স আটান্ন। যে টিউমার তার হয়েছিল, তা সাত থেকে দশ বছরের মধ্যেই যেকোনো মানুষকে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু সে ষোলো বছর ধরে বেঁচে আছে। প্রতি ছয় মাস পরপর সে তার রিপোর্ট যাচাই করে, দেখে। তার মস্তিষ্কে সেই টিউমার আজও আছে, সেই একই জায়গায়, একই আকারে। যে মহান রব সমুদ্রকে আটকে রাখেন, সীমা পেরোতে দেন না, তার কাছে এই ক্ষুদ্র টিউমার আর কী!

মৃত্যু ও তার মাঝে জীবন নয়, বরং দোয়া এসে দাঁড়িয়েছিল। খানায়ে কাবায় প্রবেশ করতে করতেও সালার সিকান্দারের মনে আছে, কার দোয়ার বরকতে আজও সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা ইমামা হাশিমের দোয়া ছাড়া আর কারও

দোয়া হতেই পারে না। তার দোয়াই তার জীবন হয়ে, জীবনের সঙ্গে মিশে আছে।

'কত বছর হয়ে গেল, নিজের জন্য কোনো দোয়া করি না। সকল দোয়া তুমি ও সন্তানদের থেকে শুরু হয়ে, তুমি ও সন্তানদের মাঝেই গিয়ে শেষ হয়। নিজের কথা মনে পড়তেই, দোয়া ভুলে যাই।' ইমামা প্রায়ই হাসতে হাসতে তাকে বলত। যেন এক মা ও স্ত্রীর পুরো গল্পই এতে লিখে দিত।

'দেখো, আল্লাহ তোমাকে কোথায় কোথায় ডাকছেন, কোথায় কোথায় দাঁড়িয়ে দোয়া করার সুযোগ দিচ্ছেন!' এখানে আসার সময় ইমামা বড় আক্ষেপ নিয়ে বলেছিল। এখন খানায়ে কাবার ভেতরে দাঁড়িয়ে, সালার তাকে বলতে চাচ্ছিল, আল্লাহ আমাকে যেখানেই নিয়ে যান, সেখানেই তোমার কথাও আমাকে মনে করিয়ে দেন। তিনি যেন আমাকে বোঝাতে চান- দেখো, তোমাকে কেমন মর্যাদাপূর্ণ নারীর জীবনসঙ্গী করেছি, দেখো!

এই ঘরের ভেতরের পৃথিবীটা অন্য এক পৃথিবী। এই মহাবিশ্বের অংশ হয়েও সেখানে কোটি কোটি, লক্ষ লক্ষ বা হাজার হাজার নয়, বরং প্রতি শতাব্দীতে কেবল কয়েকশ' মানুষ আগমনের সৌভাগ্য অর্জন করে। এমন এক বরকতময় শতাব্দী ছিল, যখন ওখানে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদার্পণ করেছিলেন।

: 'ভেতরে গিয়ে তুমি কী চাইবে, সালার?' খানায়ে কাবায় আসার পথে ইমামা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

: 'তুমি বলো, কী চাইব?' উত্তরে সালার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

: 'জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না।' বলেই ইমামা কাঁদতে শুরু করেছিল। সেই আমন্ত্রণপত্রটি দেখার পর থেকে বারবার এটাই

ঘটছিল। কথা বলতে গিয়েই বারবার সে কেঁদে ফেলছিল। হৃদয় যেন পূর্ণ হয়ে উঠছিল, আনন্দের সীমা যেন চূড়া ছুঁইছিল।

: 'সবগুলো স্তম্ভ তুমি স্পর্শ করে এসো। ছুঁয়ে এসো সমস্ত দেওয়াল। সেগুলোর কোনো না কোনো দেওয়ালে হয়তো নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছুঁয়ে থাকবেন। তারপর তুমি যখন বাইরে আসবে, তখন সবার আগে আমি তোমার হাত স্পর্শ করব।' শিশুর মতো বলে চলছিল ইমামা।

খানায়ে কাবার ভেতরের দেওয়ালগুলো, স্তম্ভগুলো জমজমের পানি দিয়ে ধুতে ধুতে, আপন হাতে ছুঁতে ছুঁতে সালার সিকান্দার বুঝতে পারল, এমন প্রতিটি জায়গায় কেন তার ইমামা হাশিমের কথা মনে পড়ে। কেন প্রতিটি দোয়ার জায়গায় সবার আগে তার জন্য দোয়ার কথা মনে আসে। কারণ, সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেক। তার প্রতি রয়েছে নিঃস্বার্থ, খাঁটি, আত্মত্যাগমিশ্রিত এক ভালোবাসা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সেই

ভালোবাসার প্রতিদান দিবেন না, তাকে ভুলে যাবেন, তা কী করে সম্ভব!

ভেতরে দাঁড়িয়ে বিয়ের আগের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তার। ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে হারামের চত্বরে দাঁড়ানো ইমামারও সেই একই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। খানায়ে কাবার এই খোলা দরজা, যেখান দিয়ে সালারকে আজ ভেতরে যেতে দেখল, স্বপ্নে সে এই খোলা দরজায় উঁকিও দিতে পারেনি।

আদম ও হাওয়ার যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং এই বৃত্তেই আবর্তিত হচ্ছে। কালও তারা ক্ষমা ও নিয়ামতের প্রত্যাশী ছিল, আজও সেভাবেই হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেজা চোখে ইমামা এখন সিঁড়ি বেয়ে সালারকে নিচে নামতে দেখল। সালার তার কাছে এলো। তার চোখও ভেজা। কথা বলার জন্য দুজনের কাছেই কোনো শব্দ নেই, আছে কেবল অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি আর হাসিমাখা মুখ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারা

আবারও খানায়ে কাবার সেই বন্ধসূয়মাণ দরজার দিকে তাকিয়ে
রইল। তবে তারা জানে, তাদের রবের রহমতের দরজা সবসময়
খোলা; তাদের জন্যও, সকল মানুষের জন্যও। রবের
ভালোবাসা সেই আবে হায়াত, যা দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত
করা হয়েছে। এটি সেই আবে হায়াত-যা পানকারী তার রবের
জান্নাতে অনন্ত জীবন লাভ করে।

آب حیات

To join our telegram group click here



[**Whispers of Stories**](#)

